অনুবাদ ও সম্পাদনায়

মাওলানা আহমদ মায়মূন
মুহাদ্দিস, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা-১২১৭

মুফতি আব্দুস সালাম
ফাযেলে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত

মাওলানা মোহাম্মদ সিদ্দীকুল্লাহ

প্রকাশনায়

ইসলামিয়া কুতুবখানা
৩০/৩২, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আনওয়ারুল মিশকাত শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ

অনুবাদ ও সম্পাদনায় ❖ মাওলানা আহমদ মায়মূন
মুফতি আব্দুস সালাম

প্রকাশক ❖ মাওলানা মুহাম্মদ মোস্তফা

সৌন্দর্য বর্ধনে ❖ মাহমূদ হাসান কাসেমী

শব্দবিন্যাস ❖ আল-মাহমূদ কম্পিউটার হোম, ৩০/৩২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে ❖ ইসলামিয়া অফসেট প্রেস, প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০

হাদিয়া ❖ ৩২৫.০০ [তিনশত পঁচিশ টাকা মাত্র]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ -

মিশকাত শরীফ হাদীস শরীফের এমন একটি গ্রন্থ, যার পরিচয় উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। কাওমী মাদরাসাগুলোতে দাওরায়ে হাদীসের পূর্ববর্তী শিক্ষাবর্ষে বেশ গুরুত্বের সাথে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সহকারে এ গ্রন্থখানির দরস দান করা হয়ে থাকে। দাওরায়ে হাদীসের বছর হাদীসের বিশাল সমুদ্রে সাঁতরাবার জন্য যে আত্মিক ও মানসিক শক্তি-সামর্থ্যের প্রয়োজন হয়, তা অর্জনের জন্যই এরূপ গুরুত্ব সহকারে গ্রন্থখানির পাঠদান করা হয়ে থাকে। এক সময় এসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আত্মস্থ করার জন্য গ্রন্থখানির আরবি ভাষ্যসমূহ ও সম্মানিত শিক্ষকের দরসের তাকরীরের উপরই ছাত্রদেরকে নির্ভর করতে হতো। অবশ্য সেটাই ছিল উত্তম– এতে কোনো সন্দেহ নেই। এতে ছাত্রদের যোগ্যতা তৈরি হয় এবং কিতাবাদি বুঝার ও মুতালা'আ করার আগ্রহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। এখনও আমরা ছাত্রদেরকে যে-কোনো গ্রন্থের আরবি ভাষ্য-গ্রন্থাবলি ও আসাতিযায়ে কেরামের তাকরীরের উপর নির্ভর করতে উৎসাহিত করি। তবে শত উৎসাহিত করলেও দুর্বল মেধার ছাত্ররা তাতে যথাযথ উপকৃত হতে সক্ষম হয় না। তাই তারা যাতে উপকৃত হতে পারে এজন্য কিতাবাদির সহজবোধ্য উর্দু ভাষ্য-গ্রন্থসমূহ যুগ-যুগ ধরে রচিত হয়ে আসছে। এখন অবশ্য উর্দু চর্চা কমে আসায় অনেকের পক্ষে উর্দু ভাষ্য-গ্রন্থাদি বুঝাও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা ছাড়া কিছুকাল যাবৎ আমাদের দেশে অনেক মাদরাসায় দীনী ও ইলমী কিতাবাদি নিজেদের মাতৃভাষায় বুঝার ও চর্চা করার এক প্রশংসনীয় ও শুভ উদ্যোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কোনো বিষয় নিজের মাতৃভাষায় বুঝা যত সহজ হয় তা অন্য কোনো ভাষায় হয় না। এজন্য কিছুকাল থেকে মাদরাসার দরসী কিতাবাদির বাংলা ভাষ্য-গ্রন্থাবলি রচিত হচ্ছে এবং ছাত্ররা উপকৃত হওয়ায় এগুলো দ্রুত সমাদৃত হচ্ছে। মিশকাত শরীফের দরসী গুরুত্ব বিবেচনা করে এরও একটি বাংলা-ভাষ্যগ্রন্থ প্রস্তুত করার প্রয়োজন দীর্ঘদিন থেকে তীব্রভাবে অনুভব করা হচ্ছিল। এ শূন্যতা পূরণের জন্যই এ ভাষ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করা হয়েছে। আমি গ্রন্থখানি আদ্যপান্ত সম্পাদনা করে দিয়েছি। আমি আশা করি, যেসব ছাত্র হাদীসের বিষয়বস্তু, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিজের মাতৃভাষায় চর্চা করতে, বুঝতে ও উপস্থাপন করতে আগ্রহী, তারা এর দ্বারা উপকৃত হতে পারবে। ইসলামিয়া কুতুবখানার স্বত্বাধিকারী বিশিষ্ট জ্ঞানহিতৈষী পরম শ্রদ্ধেয় মাওলানা মোস্তফা সাহেব মাদরাসার ছাত্রদের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে বাংলাভাষায় এরূপ একটি মূল্যবান ভাষ্যগ্রন্থ প্রস্তুত করিয়ে তা প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়ে ছাত্রদের ধন্যবাদ পাবার মতো একটি কাজ করেছেন। যুগ-যুগ ধরে তাঁর এ মহৎ উদ্যোগ প্রশংসিত হবে। আল্লাহ তা'আলা এ গ্রন্থের রচনা-সম্পাদনা, মুদ্রণ ও প্রকাশনার সাথে যারা জড়িত রয়েছেন তাদের সবাইকে ইখলাস দান করুন এবং গ্রন্থখানিকে সকলের পরকালীন নাজাতের অসিলা হিসেবে কবুল করুন, গ্রন্থখানিকে ছাত্রদের কাছে বিপুলভাবে সমাদৃত করুন এবং সবাইকে এর দ্বারা যথাযথ উপকৃত করুন। আমীন!

আহমদ মায়মূন
জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ
ঢাকা–১২১৭
তাং ০৬ / ১০ / ০৬ ইং

সূচিপত্র

اَلْمُقَدَّمَةُ لِلشَّيْخِ عَبْدِ الْحَقِّ الدِّهْلَوِيِّ رَحِمَهُ الْبَارِىْ

শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী [র.]-এর ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

مُقَدَّمَةٌ فِىْ بَيَانِ بَعْضِ مُصْطَلَحَاتِ عِلْمِ الْحَدِيْثِ مِمَّا يَكْفِىْ فِىْ شَرْحِ الْكِتَابِ مِنْ غَيْرِ تَطْوِيْلٍ وَاِطْنَابٍ

ইলমে হাদীসের কিছু পরিভাষাগত আলোচনা প্রসঙ্গে ভূমিকা, যা অতি সংক্ষেপে [অত্র] কিতাবের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য যথেষ্ট

اِعْلَمْ اَنَّ الْحَدِيْثَ فِىْ اِصْطِلَاحِ جُمْهُوْرِ الْمُحَدِّثِيْنَ يُطْلَقُ عَلٰى قَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ وَفِعْلِهٖ وَتَقْرِيْرِهٖ وَمَعْنَى التَّقْرِيْرِ اَنَّهٗ فَعَلَ اَحَدٌ اَوْ قَالَ شَيْئًا فِىْ حَضْرَتِهٖ ﷺ وَلَمْ يُنْكِرْهُ وَلَمْ يَنْهَهٗ عَنْ ذٰلِكَ بَلْ سَكَتَ وَقَرَّرَ وَكَذٰلِكَ يُطْلَقُ عَلٰى قَوْلِ الصَّحَابِىِّ وَفِعْلِهٖ وَتَقْرِيْرِهٖ وَعَلٰى قَوْلِ التَّابِعِىِّ وَفِعْلِهٖ وَتَقْرِيْرِهٖ ـ

অনুবাদ : তুমি জেনে রাখো যে, জুমহুর মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় নবী করীম ﷺ-এর বাণী, কাজ এবং সমর্থন বা অনুমোদনকে হাদীস বলা হয়ে থাকে। সমর্থনের অর্থ হলো কোনো ব্যক্তি [সাহাবী] রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপস্থিতিতে কোনো কাজ করেছিল বা কোনো কথা বলেছিল কিন্তু তিনি একে অস্বীকার করেননি এবং তা করতে নিষেধও করেননি; বরং তিনি নিশ্চুপ ছিলেন এবং সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। এমনিভাবে সাহাবীর কথা, কাজ ও সমর্থন এবং তাবেয়ীর কথা, কাজ ও সমর্থনকেও হাদীস হিসেবে অভিহিত করা হয়।

শাব্দিক অনুবাদ : اِعْلَمْ তুমি জেনে রাখো যে اَنَّ الْحَدِيْثَ فِىْ اِصْطِلَاحِ جُمْهُوْرِ الْمُحَدِّثِيْنَ يُطْلَقُ সকল মুহাদ্দিসের পরিভাষায় হাদীস ব্যবহৃত হয় عَلٰى قَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ وَفِعْلِهٖ وَتَقْرِيْرِهٖ নবী করীম ﷺ-এর কথা, কাজ ও নীরব সমর্থনকে وَمَعْنَى التَّقْرِيْرِ আর সমর্থনের অর্থ হলো اَنَّهٗ فَعَلَ اَحَدٌ اَوْ قَالَ شَيْئًا فِىْ حَضْرَتِهٖ ﷺ কোনো ব্যক্তি [সাহাবী] রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সম্মুখে কোনো কাজ করেছিল অথবা কোনো কথা বলেছিল وَلَمْ يُنْكِرْهُ কিন্তু তিনি তার প্রতিবাদ করেননি وَلَمْ يَنْهَهٗ عَنْ ذٰلِكَ এবং করতে বা বলতে নিষেধও করেননি بَلْ سَكَتَ বরং তিনি সে ব্যাপারে নীরব ছিলেন وَقَرَّرَ এবং অনুমোদন দিয়েছেন وَكَذٰلِكَ يُطْلَقُ এমনিভাবে হাদীস বলা হয় عَلٰى قَوْلِ الصَّحَابِىِّ সাহাবীর কথা وَفِعْلِهٖ وَتَقْرِيْرِهٖ কাজ ও সমর্থনকে وَعَلٰى قَوْلِ التَّابِعِىِّ وَفِعْلِهٖ وَتَقْرِيْرِهٖ এবং তাবেয়ীর বাণী, কাজ ও অনুমোদনকে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ فِىْ شَرْحِ الْكِتَابِ : কিতাব দ্বারা এখানে আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ওরফে খতীব তাবরেযী (র.) [মৃত. ৭৪০ হি.]-এর 'মিশকাতুল মাসাবীহ'কে বুঝানো হয়েছে। আর মিশকাত মূলত মুহীউস সুন্নাহ আল্লামা বাগাবী (র.) [মৃত. ৫১৬ হি.] সংকলিত "মাসাবীহুস সুন্নাহ" কিতাবের বর্ধিত সংস্করণ। এতে সিহাহ্ সিত্তাসহ অন্যান্য নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থ থেকে হাদীস চয়ন করা হয়েছে।

গ্রন্থকার কিতাবের বিভিন্ন স্থানে হাদীসের সাথে উক্ত হাদীস সম্পর্কে মুহাদ্দিস ইমামদের মন্তব্য জুড়ে দিয়েছেন। উসূলুল হাদীস জানা না থাকলে তার মর্মার্থ জানা অসম্ভব। তাই প্রয়োজন মাফিক শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এ রিসালাটি লেখেছেন। যা ভালোভাবে বুঝে মুখস্থ রাখা হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়নকারীদের জন্য অতিব জরুরি।

قَوْلُهُ اَنَّ الْحَدِيْثَ الخ : مَعْنَى الْحَدِيْثِ لُغَةً [হাদীসের আভিধানিক অর্থ] : اَلْحَدِيْثُ শব্দটি حَدَثٌ মূলধাতু হতে নির্গত। এটি একবচন, বহুবচনে اَلْاَحَادِيْثُ শব্দটি قَدِيْمٌ -এর বিপরীত। আভিধানিক অর্থ হলো– নতুন কিছু, বাণী, সংবাদ, খবর, কথা, ব্যাপার, বিষয়, নশ্বর, রচনা করা, বর্ণনা করা, উপদেশ, ঘটনা, কিসসা, গল্প ইত্যাদি। পবিত্র কুরআনে এ শব্দটি কয়েক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যথা–

১. বর্ণনা করা, যথা– فَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ
২. বৃত্তান্ত, যথা– هَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى
৩. উপদেশ, যথা– وَجَعَلْنَا هُمْ اَحَادِيْثَ
৪. কথা, যথা– فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُوْنَ
৫. সংবাদ, যথা– هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ
৬. রচনা, যথা– فَلْيَاْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِثْلِه

مَعْنَى الْحَدِيْثِ اِصْطِلَاحًا [হাদীসের পারিভাষিক সংজ্ঞা] :

اَلْحَدِيْثُ مَا اُضِيْفَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ قَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ اَوْ تَقْرِيْرٍ وَكَذٰلِكَ يُطْلَقُ عَلٰى قَوْلِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَفِعْلِهِمَا وَتَقْرِيْرِهِمَا .

অর্থ : হাদীস হলো এমন কথা, কাজ ও সমর্থন যা নবী করীম ﷺ -এর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। এমনিভাবে হাদীস শব্দটি সাহাবী ও তাবেয়ীদের কথা, কাজ ও সমর্থনের জন্য ও প্রযোজ্য হয়। এ কিতাবে হাদীসকে মাকবূল মারদূদ ইত্যাদি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। হাদীসের এ শ্রেণী বিভাগ উপরোক্ত সংজ্ঞার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। আর হাদীসের যে সংজ্ঞা মূল কিতাবে রয়েছে তথা قَوْلُ النَّبِيِّ الخ এ সংজ্ঞা অনুযায়ী হাদীস মারদূদ হওয়ার কোনো অবকাশ নেই; বরং শুধু মাকবুল হাদীসের উপরই প্রযোজ্য হবে।

জুমহুর মুহাদ্দিসগণের মতে, নবী করীম ﷺ তাঁর নবী জীবনে যা বলেছেন করেছেন বা সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন, তাকে হাদীস বলা হয়। ব্যাপক অর্থে সাহাবী তাবেয়ীগণের কথা, কাজ এবং সম্মতিকেই হাদীস বলা হয়।

অপর একদলের মতে, রাসূলের বাণী, কার্যাবলি, সমর্থন ও অনুমোদন এবং তাঁর গুণ এমনকি জাগরণ ও নিদ্রাবস্থায় তাঁর গতিবিধিও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই تَيْسِيْرُ عِلْمِ مُصْطَلَحِ الْحَدِيْثِ গ্রন্থকার حَدِيْثٌ -এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন– مَا اُضِيْفَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ قَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ اَوْ تَقْرِيْرٍ اَوْ صِفَةٍ বুখারী শরীফের ভূমিকায় বলা হয়েছে– হাদীস এমন জ্ঞান যার সাহায্যে নবী করীম ﷺ -এর কথা, কাজ এবং তাঁর অবস্থা জানা যায়। আর অত্র মিশকাত শরীফের ভূমিকায়ও বলা হয়েছে– মুহাদ্দিসীনের সমর্থিত পরিভাষায় ইলমে হাদীস বলতে নবী করীম ﷺ -এর কথা, কাজ এবং সমর্থন ও অনুমোদনের বিবরণ বুঝায়। অনুরূপভাবে সাহাবীর কথা, কাজ ও সমর্থন এবং তাবেয়ীর কথা, কাজ ও সমর্থনকেও হাদীস বলা হয়।

মোটকথা, 'হাদীস' একটি আভিধানিক শব্দই নয় মূলত এটা ইসলামের এক বিশেষ পরিভাষা। সে অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যে কথা যে কাজের বিবরণ কিংবা কথা ও কাজের সমর্থন ও অনুমোদন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত। ইসলামি পরিভাষায় তাই হাদীস নামে পরিচিত। হাদীসের উপরোল্লিখিত সংজ্ঞা হতে তিনটি বিষয় প্রতীয়মান হলো। তা হচ্ছে– ১. রাসূলের কথা, কোনো বিষয়ে রাসূল যা নিজে বলেছেন, তাকেই বলা হয় রাসূলের 'কাওলী হাদীস' [কথামূলক হাদীস], যাতে রাসূলের নিজের কোনো কথা উদ্ধৃত হয়েছে। ২. রাসূলের নিজস্ব কাজ-কর্ম ও আচার-আচরণের বিবরণ। যে হাদীসে রাসূল হিসেবে করা কোনো কাজের বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে, তাকে فِعْلِيْ হাদীস বলা হয়। ৩. তৃতীয় হলো রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিকট অনুমোদন ও সমর্থনপ্রাপ্ত সাহাবীদের কাজ। যে হাদীসে এ ধরনের কোনো ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় তা হলো تَقْرِيْرِيْ হাদীস। উল্লিখিত তিন পর্যায়ের তিনটি হাদীস পেশ করা হলো।

১. حَدِيْثٌ قَوْلِيٌّ [কাওলী হাদীস] : عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ عَنْ اُمَّتِيْ مَا وَسْوَسَتْ بِهِ صُدُوْرُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ اَوْ تَتَكَلَّمْ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) - (مِشْكٰوةْ بَابُ الْوَسْوَسَةِ)

অর্থাৎ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার উম্মতের অন্তরে যে ঘটনা বা ধাঁধাঁ সৃষ্টি হয় আল্লাহ তা'আলা তা ক্ষমা করে দেবেন যে পর্যন্ত তারা তা কার্যে পরিণত না করে বা কথায় প্রকাশ না করে।

২. حَدِيْثٌ فِعْلِيٌّ [ফি'লী হাদীস] : وَعَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتّٰى يَدْنُوَ مِنَ الْاَرْضِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ (مِشْكٰوةْ بَابُ اٰدَابِ الْخَلَاءِ)

অর্থাৎ হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন পায়খানা-প্রস্রাবের ইচ্ছা করতেন তখন তিনি মাটির নিকটবর্তী না হওয়া পর্যন্ত কাপড় উঠাতেন না।

৩. حَدِيْثُ تَقْرِيْرِيْ [হাদীসে তাকরীরী] : عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّوْنَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا جَاوَزُوْا بِنَا سَدَلَتْ اَحَدُنَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلٰى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُوْنَا كَشَفْنَاهُ ـ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَلِابْنِ مَاجَةَ مَعْنَاهُ - (مِشْكٰوة بَابُ مَايَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ)

অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে ইহরাম অবস্থায় ছিলাম, এমতাবস্থায় আরোহীগণ আমাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করত। যখন তারা আমাদের বরাবর আসত তখন আমাদের প্রত্যেকেই আপন আপন মাথার চাদর চেহারার উপর লটকিয়ে দিত। আর যখন তারা আমাদেরকে অতিক্রম করে চলে যেত, তখন আমরা তা খুলে দিতাম।

اَلْفَرْقُ بَيْنَ الْحَدِيْثِ وَالسُّنَّةِ [سُنَّة ও حَدِيْث -এর মধ্যে পার্থক্য] : سُنَّة শব্দটি একবচন; এর বহুবচন হলো سُنَنٌ শাব্দিক অর্থ হলো– কর্মনীতি, পথ, পদ্ধতি, নিয়মনীতি, রাস্তা ইত্যাদি। হাদীসের অপর নাম সুন্নাহ।

তবে ইমাম রাগেব বলেন, সুন্নত বলতে সে পথ ও পদ্ধতি বুঝায় যা নবী করীম ﷺ বেছে নিতেন ও অবলম্বন করে চলতেন। এটা কখনো হাদীস শব্দের সমার্থক রূপে ব্যবহৃত হয়।

আব্দুল আযীয আল-হানাফী (র.) বলেন, সুন্নত শব্দটি দ্বারা নবী করীম ﷺ -এর কথা ও কাজ বুঝায় এবং এটা নবী ও সাহাবীদের অনুসৃত বাস্তব কর্মনীতি অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

মূলকথা হচ্ছে, সুন্নত হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাস্তব কর্মনীতি আর হাদীস হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাজ, কথা ও সমর্থন।

اَلْفَرْقُ بَيْنَ الْحَدِيْثِ وَالْخَبَرِ [خَبَرْ ও حَدِيْث -এর মধ্যকার পার্থক্য] : اَلْخَبَرُ শব্দটি একবচন; বহুবচন হলো اَخْبَارٌ শাব্দিক অর্থ– اَلنَّبَأُ বা সংবাদ দেওয়া। خَبَرْ ও حَدِيْث -এর মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

১. অধিকাংশের মতে, حَدِيْث ও خَبَرْ উভয়ের অর্থ এক; উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

২. কারো মতে, যা নবী করীম ﷺ হতে এসেছে তা হলো حَدِيْث আর যা মহানবী ﷺ ব্যতীত অন্যদের থেকে এসেছে, তাকে خَبَرْ বলে।

৩. অথবা, হাদীস হলো যা নবী করীম ﷺ -এর পক্ষ হতে এসেছে আর خَبَرْ হলো যা মহানবী ﷺ ও অন্যদের থেকে এসেছে।

৪. نُزْهَةُ النَّظَرِ গ্রন্থকারের মতে, হাদীস হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবী ও তাবেয়ীদের কথা, কাজ ও সমর্থন আর খবর হলো হাদীসে উল্লিখিত প্রাচীন ঘটনাবলির ইতিহাস।

৫. কারো মতে, حَدِيْث হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবী ও তাবেয়ীদের কথা, কাজ ও সমর্থন আর خَبَرْ হলো প্রাচীনকালের ঘটনাবলি ও রাজা-বাদশাহদের কাহিনী ইত্যাদি।

اَلْفَرْقُ بَيْنَ الْحَدِيْثِ وَالْاَثَرِ [حَدِيْث ও اَثَرْ -এর মধ্যে পার্থক্য] : اَلْاَثَرُ -এর শাব্দিক অর্থ হলো– بَقِيَّةُ الشَّيْءِ কোনো বস্তুর অবশিষ্টাংশ। এদের মধ্যকার পার্থক্য নিম্নরূপ– ১. অধিকাংশের মতে, উভয়ে এক যেমনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দোয়াসমূহকে বলে اَلْاَدْعِيَةُ الْمَاثُوْرَةُ আর ইমাম আবূ জা'ফর ত্বাহাবী তাঁর হাদীসের কিতাবের নাম রেখেছেন شَرْحُ مَعَانِى الْاٰثَارِ - ২. কারো মতে, حَدِيْث مَقْطُوْع হলো اٰثَارْ আর مَوْقُوْف ও مَرْفُوْع হলো حَدِيْث ৩. কারো মতে, مَوْقُوْف ও مَقْطُوْع হলো اٰثَارْ আর مَرْفُوْع হলো হাদীস ৪. কারো মতে, রাসূলের সাথে সম্পৃক্ত বিষয় হাদীস আর সাহাবী ও তাবেয়ীদের সাথে সম্পৃক্ত বিষয় আছার।

تَعْرِيْفُ عِلْمِ الْحَدِيْثِ [عِلْمُ حَدِيْث -এর পরিচয়] : عِلْم حديث -এর পরিচয় সম্পর্কে ড. মাহমূদ আত্-ত্বহহান বলেন– عِلْمٌ بِاُصُوْلٍ وَقَوَاعِدَ يُعْرَفُ بِهَا اَحْوَالُ السَّنَدِ وَالْمَتَنِ مِنْ حَيْثُ الْقَبُوْلِ وَالرَّدِّ

অর্থাৎ এটা হলো এমন কিছু নিয়ম-কানুন জানার নাম যা ছাড়া গ্রহণ ও বর্জনের ভিত্তিতে সনদ ও মতনের অবস্থাসমূহ জানা যায়।

مَوْضُوْعُهُ [তার আলোচ্য বিষয়] : এর আলোচ্য বিষয় হলো– مَوْضُوْعُهُ السَّنَدُ وَالْمَتَنُ مِنْ حَيْثُ الْقَبُوْلِ وَالرَّدِّ

অর্থাৎ এর আলোচ্য বিষয় হলো সনদ ও মতন গ্রহণ ও বর্জনের দিক থেকে।

غَرْضُهُ [তার উদ্দেশ্য] : এর উদ্দেশ্য হলো– تَمْيِيْزُ الصَّحِيْحِ مِنَ السَّقِيْمِ مِنَ الْاَحَادِيْثِ অর্থাৎ সহীহ হাদীসসমূহকে গায়রে সহীহ হাদীস থেকে পৃথক করা।

فَمَا انْتَهٰى اِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُقَالُ لَهُ الْمَرْفُوْعُ وَمَا انْتَهٰى اِلَى الصَّحَابِيِّ يُقَالُ لَهُ الْمَوْقُوْفُ كَمَا يُقَالُ قَالَ اَوْ فَعَلَ اَوْ قَرَّرَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَوْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوْفًا اَوْ مَوْقُوْفٌ عَلٰى اِبْنِ عَبَّاسٍ وَمَا انْتَهٰى اِلَى التَّابِعِيِّ يُقَالُ لَهُ الْمَقْطُوْعُ وَقَدْ خَصَّصَ بَعْضُهُمُ الْحَدِيْثَ بِالْمَرْفُوْعِ وَالْمَوْقُوْفِ اِذِ الْمَقْطُوْعُ يُقَالُ لَهُ الْاَثَرُ وَقَدْ يُطْلَقُ الْاَثَرُ عَلَى الْمَرْفُوْعِ اَيْضًا كَمَا يُقَالُ الْاَدْعِيَةُ الْمَاثُوْرَةُ لِمَا جَاءَ مِنَ الْاَدْعِيَةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَالطَّحَاوِيُّ سَمّٰى كِتَابَهُ الْمُشْتَمِلَ عَلٰى بَيَانِ الْاَحَادِيْثِ النَّبَوِيَّةِ وَاٰثَارِ الصَّحَابَةِ بِشَرْحِ مَعَانِى الْاٰثَارِ وَقَالَ السَّخَاوِيُّ اَنَّ لِلطَّبَرَانِىْ كِتَابًا مُسَمًّى بِتَهْذِيْبِ الْاٰثَارِ مَعَ اَنَّهُ مَخْصُوْصٌ بِالْمَرْفُوْعِ وَمَا ذُكِرَ فِيْهِ مِنَ الْمَوْقُوْفِ فَبِطَرِيْقِ التَّبَعِ وَالتَّطَفُّلِ ـ

অনুবাদ : অতএব, যেসব হাদীসের বর্ণনার ধারাবাহিকতা নবী করীম ﷺ পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে হাদীসে মারফূ' বলে। যেসব হাদীসের বর্ণনা সূত্র শুধু সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে হাদীসে মাওকূফ বলে, যেমন বলা হয়– قَالَ اَوْ فَعَلَ اَوْ قَرَّرَ اِبْنُ عَبَّاسٍ اَوْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوْفًا اَوْ مَوْقُوْفٌ عَلٰى اِبْنِ عَبَّاسٍ [ইবনে আব্বাস বলেছেন বা করেছেন অথবা তিনি মৌন সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন অথবা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে মাওকূফ সনদে বর্ণিত অথবা মাওকূফ সনদটি ইবনে আব্বাস পর্যন্ত শেষ হয়েছে।] আর যেসব হাদীসের বর্ণনা সূত্র কোনো তাবেয়ী পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে হাদীসে মাকতূ বলে।

মুহাদ্দিসীনের কেউ কেউ হাদীস শব্দটিকে শুধু 'মারফূ' এবং 'মাওকূফ' -এর জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। এ জন্যই মাকতূ'কে [তাদের মতে] বলা হয়ে থাকে আছার (اَثَر)। আবার কখনো কখনো 'আছার' দ্বারা 'মারফূ'কেও বুঝানো হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, যে সকল দোয়া নবী করীম ﷺ হতে বর্ণিত হয়েছে সেগুলোকে اَدْعِيَةٌ مَاثُوْرَةٌ বলা হয়। ইমাম ত্বাহাবী তাঁর কিতাবের নাম রেখেছেন 'শরহু মা'আনিল আছার'। উল্লেখ্য যে, এ কিতাবটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীস এবং সাহাবায়ে কেরামের আছার সম্বলিত।

ইমাম সাখাবী বলেছেন যে, তাবারানীর একটি কিতাব রয়েছে, যার নাম হচ্ছে 'তাহযীবুল আছার', অথচ তিনি এ কিতাবখানিতে শুধু 'মারফূ' হাদীসসমূহ চয়ন করার জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। অবশ্য এতে সংকলিত 'মাওকূফ' (مَوْقُوْف) হাদীসগুলোকে শুধু প্রসঙ্গক্রমেই বর্ণনা করা হয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ : فَمَا انْتَهٰى اِلَى النَّبِيِّ ﷺ অতএব, যেসব হাদীসের বর্ণনা-সূত্র নবী করীম ﷺ পর্যন্ত পৌঁছেছে يُقَالُ لَهُ الْمَرْفُوْعُ তাকে হাদীসে মারফূ' বলা হয় وَمَا انْتَهٰى اِلَى الصَّحَابِيِّ আর যে সকল হাদীসের ধারাবাহিকতা সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে يُقَالُ لَهُ الْمَوْقُوْفُ তাকে হাদীসে মাওকূফ বলে كَمَا يُقَالُ যেমন বলা হয় قَالَ اَوْ فَعَلَ اَوْ قَرَّرَ ابْنُ عَبَّاسٍ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন বা করেছেন কিংবা সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন اَوْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوْفًا অথবা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে মাওকূফ সনদে বর্ণিত হয়েছে اَوْ مَوْقُوْفٌ عَلٰى اِبْنِ عَبَّاسٍ অথবা মাওকূফ সনদটি ইবনে আব্বাস পর্যন্ত শেষ হয়েছে। وَمَا انْتَهٰى اِلَى التَّابِعِيِّ আর যে সকল হাদীসের বর্ণনা সূত্র কোনো তাবেয়ী পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে يُقَالُ لَهُ الْمَقْطُوْعُ তাকে হাদীসে মাকতূ' বলে وَقَدْ خَصَّصَ بَعْضُهُمُ الْحَدِيْثَ আর কিছুসংখ্যক মুহাদ্দিস হাদীস শব্দটিকে নির্দিষ্ট করেছেন بِالْمَرْفُوْعِ وَالْمَوْقُوْفِ মারফূ' এবং মাওকূফ-এর জন্য اِذِ الْمَقْطُوْعُ يُقَالُ لَهُ الْاَثَرُ ফলে [তাদের মতে] মাকতূ' হাদীসকে বলা হয়ে থাকে আছার وَقَدْ يُطْلَقُ الْاَثَرُ আর কখনো আছার ব্যবহৃত হয় عَلَى الْمَرْفُوْعِ اَيْضًا মারফূ' হাদীসের উপর كَمَا يُقَالُ যেমন বলা হয় اَلْاَدْعِيَةُ الْمَاثُوْرَةُ দোয়ায়ে মাছূরাহ لِمَا جَاءَ مِنَ الْاَدْعِيَةِ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ যে সকল দোয়া নবী করীম ﷺ হতে বর্ণিত হয়েছে وَالطَّحَاوِيُّ سَمَّى كِتَابَهُ ইমাম ত্বাহাবী তাঁর কিতাবের নামকরণ করেছেন اَلْمُشْتَمِلُ যাতে একত্রিত হয়েছে عَلَى بَيَانِ الْاَحَادِيْثِ النَّبَوِيَّةِ নবী করীম ﷺ-এর হাদীসসমূহ وَاٰثَارِ الصَّحَابَةِ এবং সাহাবীগণের আছারগুলো بِشَرْحِ مَعَانِي الْاٰثَارِ শরহু মা'আনিল আছার নামে وَقَالَ السَّخَاوِيُّ আর ইমাম সাখাবী (র.) বলেন إِنَّ لِلطَّبَرَانِيِّ كِتَابًا ইমাম তাবারানীর একটি কিতাব রয়েছে مُسَمًّى بِتَهْذِيْبِ الْاٰثَارِ তাহযীবুল আছার নামে مَعَ اَنَّهُ مَخْصُوْصٌ بِالْمَرْفُوْعِ অথচ এতে শুধু মারফূ' হাদীসসমূহ চয়ন করার জন্য নির্দিষ্ট করেছেন وَمَا ذُكِرَ فِيْهِ مِنَ الْمَوْقُوْفِ তবে এতে উল্লিখিত মাওকূফ হাদীসগুলো فَبِطَرِيْقِ التَّبْعِ وَالتَّطَفُّلِ শুধু প্রাসঙ্গিক ও অতিরিক্ত হিসেবে এনেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حَدِيْثُ الْمَرْفُوْعِ -এর পরিচয় : مَرْفُوْعٌ শব্দটি رَفْعٌ মূলধাতু হতে নির্গত। শাব্দিক অর্থ হলো– উন্নতির মর্যাদাপ্রাপ্ত, উঁচু ইত্যাদি। পারিভাষিক পরিচয় সম্পর্কে ড. মাহমূদ আত্-ত্বাহহান বলেন–

اَلْمَرْفُوْعُ مَا اُضِيْفَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ قَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ اَوْ تَقْرِيْرٍ اَوْ صِفَةٍ

উদাহরণ : عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا لَبِسْتُمْ وَاِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوْا بِمَيَامِنِكُمْ - رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ

حَدِيْثُ الْمَوْقُوْفِ -এর পরিচয় : مَوْقُوْفٌ শব্দটি اَلْوَقْفُ মূলধাতু হতে নির্গত। শাব্দিক অর্থ হলো–মুলতুবি, স্থগিত বা নির্ভরশীল। এর পারিভাষিক পরিচয় সম্পর্কে ড. মাহমূদ আত্-ত্বাহহান বলেন–

اَلْمَوْقُوْفُ مَا اُضِيْفَ اِلَى الصَّحَابِيِّ مِنْ قَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ اَوْ تَقْرِيْرٍ

উদাহরণ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ (رضـ) حَدِّثُوْا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُوْنَ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ يُكَذَّبَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ

حَدِيْثُ الْمَقْطُوْعِ -এর পরিচয় : مَقْطُوْعٌ শব্দটি قَطْعٌ মূলধাতু হতে নির্গত। শাব্দিক অর্থ হলো– বর্ণিত বা বিচ্ছিন্ন। পরিভাষিক অর্থ হলো– اَلْمَقْطُوْعُ مَا اُضِيْفَ اِلَى التَّابِعِيِّ اَوْ مَنْ دُوْنَهُ مِنْ قَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ

উদাহরণ : قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصَرِيْ فِى الصَّلَاةِ خَلْفَ الْمُبْتَدِعِ وَصلِ عَلَيْهِ بِدْعَتَه

১. **اِبْنُ عَبَّاسٍ -এর পরিচিতি :** তাঁর নাম আব্দুল্লাহ, পিতার নাম আব্বাস, দাদার নাম আব্দুল মুত্তালিব। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চাচাত ভাই। হিজরতের তিন বছর পূর্বে নবুয়তের দশম বছরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জন্য ফিকহী জ্ঞান ও তা'বীলের দোয়া করেছিলেন। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.)-এর শাসন আমলে ৬৮ হিজরিতে তায়েফে ইন্তেকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৬৬০ টি।

২. **اَلطَّحَاوِيُّ -এর পরিচিতি :** তাঁর নাম আহমদ, উপনাম আবূ জা'ফর, পিতার নাম মুহাম্মদ। তিনি ২২৮ হিজরি সনে মিশরের 'ত্বাহা' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ত্বাহা-য় জন্মগ্রহণ করেন বলে তিনি 'ত্বাহাবী' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি হাদীস ও ফিক্হের প্রখ্যাত ইমাম ছিলেন। হিজরি ৩২১ সনে তিনি ইন্তেকাল করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৯২ বছর। তাঁকে হানাফী মাযহাবের ব্যারিস্টার বলা হয়ে থাকে।

৩. **اَلسَّخَاوِيُّ -এর পরিচিতি :** হাফেজ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান আস্ সাখাবী ৯০২ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন। তিনি একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে আস্ সাখাবীতে হাদীসের ব্যাপক শিক্ষা দান শুরু হয়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্র হতে নিম্নলিখিত মুহাদ্দিসগণ ভারতে আসেন। যথা– ১. আবুল ফাতাহ আর-রাযী আল-মাক্কী। ২. আহমদ ইবনে সালেহ মালবী। ৩. ওমর ইবনে মুহাম্মদ দামেশ্কী। ৪. আব্দুল আযীয ইবনে মাহমূদ তূসী প্রমুখ।

৪. **اَلطَّبَرَانِيُّ -এর পরিচিতি :** তাবারানীর পূর্ণ নাম হচ্ছে– আবুল কাশেম সুলাইমান ইবনে আহমদ আত্ তাবারানী। তিনি তিন ভাগে 'আল-মুনজিম' নামে হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেন। প্রতি ভাগের নাম যথাক্রমে আল-মু'জিমুল কাবীর, আল-মু'জিমুস সাগীর, আল-মু'জিমুল আওসাত। তিনি ৩১০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

تَعْرِيْفُ الصَّحَابِيِّ : اَلصَّحَابِيُّ একবচন; এর বহুবচন হলো اَصْحَابٌ ও صَحْبٌ শাব্দিক অর্থ হলো– সহচর বা সাথি। পারিভাষিক পরিচয় হলো– مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ ﷺ مُسْلِمًا وَمَاتَ عَلَى الْاِسْلَامِ (وَلَوْ تَخَلَّلَتْ ذٰلِكَ رِدَّةٌ عَلَى الْاَصَحِّ) অর্থাৎ যিনি মুসলমান অবস্থায় রাসূলের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং ইসলামের উপর থেকে মৃত্যুবরণ করেছেন।

تَعْرِيْفُ التَّابِعِيِّ : اَلتَّابِعِيُّ শব্দটি একবচন; এর বহুবচন হলো اَلتَّابِعُوْنَ শাব্দিক অর্থ হলো– অনুসারী বা অনুগামী। পরিভাষিক পরিচয় হলো– هُوَ مَنْ لَقِيَ صَحَابِيًّا مُسْلِمًا وَمَاتَ عَلَى الْاِسْلَامِ

অর্থাৎ যিনি ঈমান অবস্থায় কোনো সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং ইসলামের উপর থেকে মৃত্যুবরণ করেছেন।

কারো মতে, هُوَ مَنْ صَحِبَ الصَّحَابِيَّ

وَالْخَبَرُ وَالْحَدِيْثُ فِى الْمَشْهُوْرِ بِمَعْنى وَاحِدٍ وَبَعْضُهُمْ خَصُّوا الْحَدِيْثَ بِمَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَالْخَبَرَ بِمَا جَاءَ عَنْ اَخْبَارِ الْمُلُوْكِ وَالسَّلَاطِيْنِ وَالْاَيَّامِ الْمَاضِيَةِ وَلِهٰذَا يُقَالُ لِمَنْ يَشْتَغِلُ بِالسُّنَّةِ مُحَدِّثٌ وَلِمَنْ يَشْتَغِلُ بِالتَّوَارِيْخِ اَخْبَارِيٌّ وَالرَّفْعُ قَدْ يَكُوْنُ صَرِيْحًا وَقَدْ يَكُوْنُ حُكْمًا اِمَّا صَرِيْحًا فَفِى الْقَوْلِيِّ كَقَوْلِ الصَّحَابِيِّ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كَذَا اَوْ كَقَوْلِهٖ اَوْ قَوْلِ غَيْرِهٖ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهٗ قَالَ كَذَا وَفِى الْفِعْلِيِّ كَقَوْلِ الصَّحَابِيِّ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَعَلَ كَذَا اَوْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهٗ فَعَلَ كَذَا اَوْ عَنِ الصَّحَابِيِّ اَوْ غَيْرِهٖ مَرْفُوْعًا اَوْ رَفَعَهٗ اَنَّهٗ فَعَلَ كَذَا وَفِى التَّقْرِيْرِى اَنْ يَّقُوْلَ الصَّحَابِيُّ اَوْ غَيْرُهٗ فَعَلَ فُلَانٌ اَوْ اَحَدٌ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ كَذَا وَلَا يَذْكُرُ اِنْكَارَهٗ ـ

অনুবাদ : খবর এবং হাদীস উভয়ে একই অর্থে পরিচিত, তবে মুহাদ্দিসীনের কেউ কেউ শুধু রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবী (রা.) এবং তাবেয়ীগণের কথা, কাজ ও সমর্থনকেই হাদীস হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আর প্রাচীন রাজা-বাদশাহ ও বিগত দিনসমূহের কাহিনীকে 'খবর' বলে অভিহিত করেছেন। এ জন্যই যাঁরা হাদীসশাস্ত্রের গবেষণায় লিপ্ত থাকেন তাঁদেরকে মুহাদ্দিস এবং যাঁরা ইতিহাসশাস্ত্রে অথবা ঐতিহাসিক তথ্য উদ্‌ঘাটনে নিয়োজিত থাকেন তাঁদেরকে ইতিহাসবিদ বলা হয়ে থাকে।

হাদীসে মারফূ' ১. কখনো স্পষ্ট রফা' হবে (رَفْع صَرِيْحِىّ) ২. আর কখনো আইনসিদ্ধ বা আইনানুগ রফা' হবে (رَفْع حُكْمِىْ)। (অতঃপর এর প্রত্যেকটি তিন প্রকার) অতএব صَحِيْح টি ১. উক্তিমূলক স্পষ্ট রফা' হবে (رَفْع صَرِيْحِىّ قَوْلِىّ) যেমন, কোনো সাহাবীর বাণী– سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ يَقُوْلُ كَذَا অথবা কোনো সাহাবী বা তাবেয়ী হাদীস বর্ণনা করার সময় বলেন– قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ অথবা عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهٗ قَالَ كَذَا ২. আর কর্মসম্পাদনমূলক স্পষ্ট রফা' (رَفْع صَرِيْحِىْ فِعْلِىْ) যেমন, কোনো সাহাবী বলেন– رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهٗ قَالَ كَذَا اَوْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اَنَّهٗ فَعَلَ كَذَا ...... অথবা কোনো সাহাবী বা তাবেয়ী হাদীস বর্ণনা করার সময় বলেন, مَرْفُوْعًا اَوْ رَفَعَهٗ اَنَّهٗ فَعَلَ كَذَا ৩. এবং অনুমোদনমূলক স্পষ্ট রফা' (رَفْع صَرِيْحِىْ تَقْرِيْرِى) যেমন– কোনো সাহাবী অথবা তাবেয়ী বলেন, অমুক ব্যক্তি, অথবা কোনো ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপস্থিতিতে এরূপ কাজ করেছেন। অথবা, উক্ত সাহাবী এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কোনো অস্বীকৃতির কথা উল্লেখ করেননি।

শাব্দিক অনুবাদ : وَالْخَبَرُ وَالْحَدِيْثُ فِى الْمَشْهُوْرِ بِمَعْنى وَاحِدٍ খবর ও হাদীস উভয়ে প্রচলিতভাবে একই অর্থে পরিচিত وَبَعْضُهُمْ خَصُّوا الْحَدِيْثَ আর কিছুসংখ্যক মুহাদ্দিস হাদীসকে নির্দিষ্ট করেছেন بِمَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ যা নবী করীম ﷺ, সাহাবী ও তাবেয়ীদের নিকট হতে এসেছে وَالْخَبَرُ بِمَا جَاءَ আর খবর হলো যা এসেছে عَنْ اَخْبَارِ الْمُلُوْكِ وَالسَّلَاطِيْنِ রাজা-বাদশাহদের সংবাদ থেকে وَالْاَيَّامِ الْمَاضِيَةِ এবং বিগত দিনসমূহের কাহিনী

হতে وَلِهٰذَا يُقَالُ এ কারণেই বলা হয় لِمَنْ يَشْتَغِلُ بِالسُّنَّةِ مُحَدِّثٌ যে ব্যক্তি হাদীস গবেষণায় ব্যস্ত তাকে মুহাদ্দিস নামে وَلِمَنْ يَشْتَغِلُ بِالتَّوَارِيْخِ اَخْبَارِيٌّ আর যে ঐতিহাসিক তথ্য উদ্‌ঘাটনে ব্যস্ত, তাকে বলে ঐতিহাসিক وَالرَّفْعُ قَدْ يَكُوْنُ صَرِيْحًا আর মারফূ' হাদীস কখনো সুস্পষ্ট হবে وَقَدْ يَكُوْنُ حُكْمًا আর কখনো হুকুমী হবে اِمَّا صَرِيْحًا فَفِى الْقَوْلِيِّ অতএব صَرِيْح টি উক্তিমূলক স্পষ্ট রফা' হবে كَقَوْلِ الصَّحَابِىِّ যেমন– কোনো সাহাবীর উক্তি سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ يَقُوْلُ كَذَا আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ বলতে শুনেছি اَوْكَقَوْلِهِ اَوْ قَوْلِ غَيْرِهِ অথবা, সাহাবীর বা তাবেয়ীর কথা قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন اَنَّهُ قَالَ كَذَا অথবা, রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত তিনি এরূপ বলেছেন اَوْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَفِى الْفِعْلِىِّ আর কর্মসম্পাদন মূল স্পষ্ট মারফূ' হলো كَقَوْلِ الصَّحَابِىِّ যেমন– কোনো সাহাবী বললেন رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَعَلَ كَذَا আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ করতে দেখেছি اَوْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ فَعَلَ كَذَا অথবা, রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি এরূপ করেছেন اَوْ عَنِ الصَّحَابِىِّ اَوْ غَيْرِهِ مَرْفُوْعًا অথবা, সাহাবী বা তাবেয়ী হতে বর্ণিত আছে যে, اَوْ رَفَعَهُ اَنَّهُ فَعَلَ كَذَا মারফূ' সনদে বর্ণিত আছে যে, তিনি এরূপ করেছেন وَفِى التَّقْرِيْرِىِّ আর অনুমোদনমূলক স্পষ্ট রফা' হলো اَنْ يَّقُوْلَ الصَّحَابِىُّ اَوْ غَيْرُهُ কোনো সাহাবী বা তাবেয়ীর কথা فَعَلَ فُلَانٌ اَوْ اَحَدٌ بِحَضْرَةِ النَّبِىِّ ﷺ كَذَا নবী করীম ﷺ-এর উপস্থিতে অমুক ব্যক্তি অথবা কেউ এরূপ করেছে وَلَا يَذْكُرُ اِنْكَارَهُ এবং এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো অস্বীকৃতির কথা উল্লেখ করেননি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ مُحَدِّثٌ : যারা হাদীসশাস্ত্রের গবেষণায় ব্যস্ত থাকেন এবং হাদীস শিক্ষা দেন তাঁদের পরিভাষায় মুহাদ্দিস বলা হয়ে থাকে। আর যে মুহাদ্দিসের কমপক্ষে এক লক্ষ হাদীস মুখস্থ থাকে তাকে হাফিজে হাদীস বলা হয়, আর যার তিন লক্ষ হাদীস মুখস্থ থাকে তাকে হুজ্জাত বলা হয় এবং যার সমস্ত হাদীস সনদ, মতন, জারাহ ও তা'দীলসহ মুখস্থ থাকে তাকে হাকিমে হাদীস বলা হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ الرَّفْعُ الخ : হাদীসে মারফূ' প্রথমত দুই প্রকার– ১. রফা' সরীহ্‌ও ২. রফা' হুকমী। আবার প্রত্যেকটি তিন প্রকার। মোট হাদীসে মারফূ' ছয় প্রকার– ১. রফা' সরীহ্ কাওলী, ২. রফা' সরীহ ফি'লী, ৩. রফা' সরীহ্ তাকরীরী, ৪. রফা' হুকুমী কাওলী, ৫. রফা' হুকমী ফি'লী এবং ৬. রফা' হুকমী তাকরীরী।

قَوْلُهُ اَمَّا صَرِيْحًا : রফা' সরীহ্ তিন প্রকার :

১. **রফা' সরীহ কাওলী :** যেসব হাদীসে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কথা ও কথা জাতীয় বাণী স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ থাকে, সেসব হাদীসকে 'রফা' সরীহ কাওলী' বলা হয়। যেমন– সাহাবী অথবা তাবেয়ী হাদীস বর্ণনা করার সময় এভাবে বললেন–
سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا ـ وَعَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَذَا وَكَذَا ـ

২. **রফা' সরীহ্ ফি'লী :** যেসব হাদীসে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাসূলুল্লাহর কার্যক্রম স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ থাকে, সেসব হাদীসকে 'রফা' সরীহ ফি'লী' বলা হয়। যেমন– সাহাবী হাদীস বর্ণনাকালে এভাবে বললেন– رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَعَلَ كَذَا অথবা সাহাবী বা তাবেয়ীর কোনো কার্য 'মারফূ' হিসেবে বর্ণিত হয়।

৩. **রফা' সরীহ্ তাকরীরী :** যেসব হাদীসের বর্ণনায় সাহাবী এভাবে বর্ণনা করেন যে, কোনো সাহাবী বা কোনো ব্যক্তি হুযূর ﷺ -এর উপস্থিতিতে এরূপ করেছেন, অথচ বর্ণনাকারী তাঁর বর্ণনায় হুযূর ﷺ -এর নিষেধ বা অস্বীকৃতি কিছুই উল্লেখ করেননি এ ধরনের হাদীসকে 'রফা' সরীহ্ তাকরীরী' বলা হয়।

ড. মাহমূদ আত্-ত্বাহানের মতে, রফা' সরীহ ওয়াসফীও একপ্রকার রয়েছে যেমন, কোনো সাহাবী বলল–
كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحْسَنَ النَّاسِ خَلْقًا

وَاِمَّا حُكْمًا فَكَاِخْبَارِ الصَّحَابِيِّ الَّذِىْ لَمْ يُخْبِرْ عَنِ الْكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةِ مَا لَا مَجَالَ فِيْهِ لِلْاِجْتِهَادِ عَنِ الْاَحْوَالِ الْمَاضِيَةِ كَاِخْبَارِ الْاَنْبِيَاءِ اَوِ الْاٰتِيَةِ كَالْمَلَاحِمِ وَالْفِتَنِ وَاَهْوَالِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ اَوْ عَنْ تَرَتُّبِ ثَوَابٍ مَخْصُوْصٍ اَوْ عِقَابٍ مَخْصُوْصٍ عَلٰى فِعْلٍ فَاِنَّهٗ لَا سَبِيْلَ اِلَيْهِ اِلَّا السَّمَاعَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَوْ يَفْعَلُ الصَّحَابِيُّ مَا لَا مَجَالَ لِلْاِجْتِهَادِ فِيْهِ اَوْ يُخْبِرُ الصَّحَابِيُّ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ كَذَا فِىْ زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ لِاَنَّ الظَّاهِرَ اِطِّلَاعُهٗ ﷺ عَلٰى ذٰلِكَ وَنُزُوْلَ الْوَحْىِ بِهٖ اَوْ يَقُوْلُوْنَ وَمِنَ السُّنَّةِ كَذَا لِاَنَّ الظَّاهِرَ اَنَّ السُّنَّةَ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اَنَّهٗ يَحْتَمِلُ سُنَّةَ الصَّحَابَةِ وَسُنَّةَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ فَاِنَّ السُّنَّةَ يُطْلَقُ عَلَيْهِ ـ

অনুবাদ : ৪. আর রফা' হুকমী কাওলী (قَوْلِىْ رَفْعِ حُكْمِىْ) যেমন– কোনো সাহাবী অতীতকালের কোনো ঘটনাবলি হতে এমন কিছু বর্ণনা করেন অথচ তিনি পূর্ববর্তী কিতাব সম্পর্কে কোনো খবর রাখেন না যা পূর্ববর্তী কোনো কিতাবে উল্লেখ নেই। আর তাতে কোনো সাহাবীর ইজতিহাদ বা গবেষণারও কোনো অবকাশ নেই। যেমন– নবীদের খবর, ভবিষ্যদ্বাণী, যুদ্ধ, কিয়ামতের বিভীষিকা, ফিতনা অথবা কোনো কাজের ফলে নির্দিষ্ট শাস্তি ও ছওয়াব সম্পর্কে কোনো সাহাবীর বর্ণনা [এটাই হলো উক্তিমূলক আইনানুগ রফা'] কেননা, কোনো সাহাবী কর্তৃক অনুরূপ কাজ বা ঘটনার বিবরণ রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে শ্রবণ ব্যতীত প্রকাশ করার কোনো অবকাশ নেই। [৫. কর্ম সম্পাদনমূলক আইনসিদ্ধ রফা' (رَفْع حُكْمِىْ فِعْلِىْ) যেমন–] অথবা কোনো সাহাবীর এমন কোনো কাজ যাতে ইজতিহাদের কোনো সুযোগ নেই।

[৬. অনুমোদনমূলক আইনসিদ্ধ রফা' (رَفْع حُكْمِىْ تَقْرِيْرِىْ) যেমন–] অথবা কোনো সাহাবী এ খবর দিলেন যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জামানায় এরূপ কাজ করেছেন। কেননা, সে বিষয় নবী করীম ﷺ যে অবহিত ছিলেন তা সুস্পষ্ট। কারণ, তখন ওহী নাজিলের ধারা বলবৎ ছিল। অথবা সাহাবীগণ বলেন, এরূপ করাই সুন্নত। এখানে সুন্নত দ্বারা যে নবী করীম ﷺ -এর সুন্নতের কথা বুঝানো হয়েছে, তা সুস্পষ্ট। কোনো কোনো হাদীসশাস্ত্রবিদ বলেন, এটা দ্বারা সুন্নতে সাহাবা ও খোলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নত বুঝাবার সম্ভাবনাও বিদ্যমান। কেননা, সুন্নত কথাটি এগুলোর ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়।

শাব্দিক অনুবাদ : وَاِمَّا حُكْمًا আর মারফূয়ে হুকমী কাওলী হলো فَكَاِخْبَارِ الصَّحَابِيِّ কোনো সাহাবীর সংবাদ দেওয়া الَّذِىْ لَمْ يُخْبِرْ عَنِ الْكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةِ যিনি পূর্ববর্তী কিতাব সম্পর্কে কোনো খবর রাখেন না مَا لَا مَجَالَ فِيْهِ لِلْاِجْتِهَادِ যাতে ইজতিহাদের কোনো অবকাশ নেই عَنِ الْاَحْوَالِ الْمَاضِيَةِ অতীতকালের কোনো ঘটনাবলি সম্পর্কে كَاِخْبَارِ الْاَنْبِيَاءِ যেমন নবীদের খবর اَوِ الْاٰتِيَةِ অথবা ভবিষ্যদ্বাণী كَالْمَلَاحِمِ যেমন– যুদ্ধবিগ্রহ وَالْفِتَنِ ফিতনা-ফ্যাসাদ وَاَهْوَالِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ কিয়ামতের বিভীষিকা বা ভয়াবহতা اَوْ عَنْ تَرَتُّبِ ثَوَابٍ مَخْصُوْصٍ অথবা নির্দিষ্ট হাওয়া ছওয়াবা اَوْ عِقَابٍ مَخْصُوْصٍ অথবা নির্দিষ্ট শাস্তিযোগ্য হওয়া عَلٰى فِعْلٍ কোনো কাজের ফলে فَاِنَّهٗ لَا سَبِيْلَ اِلَيْهِ কেননা, কোনো সাহাবী কর্তৃক ইজতিহাদের অনুরূপ সুযোগ নেই اِلَّا السَّمَاعَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ একমাত্র নবী করীম ﷺ হতে শ্রবণ ব্যতীত اَوْ يَفْعَلُ

اَلصَّحَابِيُّ অথবা, কোনো সাহাবী এমন কাজ করে مَا لَا مَجَالَ لِلْاِجْتِهَادِ فِيْهِ যাতে ইজতিহাদের কোনো সুযোগ নেই [এটাই হলো রফা' হুকমী ফি'লী] اَوْ يُخْبِرُ الصَّحَابِيُّ অথবা, কোনো সাহাবী এ সংবাদ দিল যে بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ كَذَا যে তারা এরূপ করত ﷺ فِيْ زَمَانِ النَّبِيِّ নবী করীম ﷺ-এর যুগে لِاَنَّ الظَّاهِرَ اِطِّلَاعُهُ ﷺ عَلٰى ذٰلِكَ কেননা, সে বিষয়ে নবী করীম ﷺ যে অবহিত ছিলেন তা সুস্পষ্ট وَنُزُوْلُ الْوَحْيِ بِهٖ যেহেতু সে সময়ে ওহী নাজিলের ধারা বলবৎ ছিল اَوْ يَقُوْلُوْنَ وَمِنَ السُّنَّةِ كَذَا অথবা, সাহাবীগণ বললেন যে, এ করাই সুন্নত لِاَنَّ الظَّاهِرَ اَنَّ السُّنَّةَ কেননা, এটা সুস্পষ্ট যে, সুন্নত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ﷺ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নত (এটা হলো রফা' হুকমী তাকরীরী) وَقَالَ بَعْضُهُمْ আর কোনো কোনো মুহাদ্দিস বলেছেন اَنَّهُ يَحْتَمِلُ এ সুন্নত কথাটি সম্ভাবনা রাখে سُنَّةَ الصَّحَابَةِ وَسُنَّةَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ সাহাবী এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত فَاِنَّ السُّنَّةَ يُطْلَقُ عَلَيْهِ কেননা, সুন্নত কথাটি এগুলোর উপরও ব্যবহৃত হয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِمَّا حُكْمًا الخ : রফা' হুকমী তিন প্রকার :

১. **রফা' হুকমী কাওলী :** যেসব হাদীসে কোনো সাহাবী অতীতকালের এমন খবর বলল যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে উল্লেখ নেই এবং এক্ষেত্রে সাহাবী কর্তৃক ইজতিহাদেরও কোনো সুযোগ নেই। উদাহরণস্বরূপ কোনো সাহাবী পূর্ববর্তী যুগের নবীগণের কোনো কাহিনী অথবা নির্দিষ্ট কোনো শাস্তি কিংবা নির্দিষ্ট কোনো ছওয়াবের সম্পর্কে খবর দেন। এসব হাদীসকে 'রফা' হুকমী কাওলী' বলা হয়। এ ধরনের বিষয় সম্পর্কিত বর্ণনা একমাত্র নবী করীম ﷺ ছাড়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

২. **রফা' হুকমী ফি'লী :** যে সকল হাদীসে সাহাবীদের এমন কোনো কাজকর্মের উল্লেখ থাকে যাতে ইজতিহাদ বা গবেষণার সম্ভাবনা থাকে সে সকল হাদীসকে 'রফা' হুকমী ফি'লী' বলা হয়।

৩. **রফা' হুকমী তাকরীরী :** যে সকল হাদীস কোনো সাহাবী এমনভাবে বর্ণনা করেন যে, "আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময় এরূপ করেছি" অথবা "এ কাজ করেছি" অথবা বলেন, مِنَ السُّنَّةِ كَذَا তবে এ প্রকার হাদীসকে 'রফা' হুকমী তাকরীর' বলা হয়।

اَلْاِجْتِهَادُ-এর ব্যাখ্যা : اِجْتِهَادٌ শব্দটি جُهْدٌ ধাতু হতে গঠিত, বাবে اِفْتِعَالٌ -এর ক্রিয়ামূল। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ হতে এর অর্থ কোনো কিছু হাসিলের উদ্দেশ্যে সর্বাঙ্গীন চেষ্টা। ইসলামি পরিভাষায় শরিয়তের কোনো নির্দেশ সম্পর্কে সুষ্ঠু জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে সর্বাঙ্গীন প্রচেষ্টা ও সাধনার নাম ইজতিহাদ।

قَوْلُهُ اَلْوَحْيُ : اَلْوَحْيُ শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো– اَلْاِشَارَةُ [ইঙ্গিত করা], اَلْاِرْسَالُ [প্রেরণ করা], اَلْاِعْلَامُ فِيْ خَفَاءٍ [গোপনে কাউকে কিছু অবহিত করা বা প্রত্যাদেশ]।

পারিভাষিক পরিচয় : আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে নবীগণকে কোনো কিছু অবহিত করা তা ফেরেশতার মাধ্যমে হোক কিংবা স্বপ্নযোগে বা ইলহামের মাধ্যমে হোক।

فَصْلٌ اَلسَّنَدُ طَرِيْقُ الْحَدِيْثِ وَهُوَ رِجَالُهُ الَّذِيْنَ رَوَوْهُ وَالْاِسْنَادُ بِمَعْنَاهُ وَقَدْ يَجِيْءُ بِمَعْنٰى ذِكْرِ السَّنَدِ وَالْحِكَايَةِ عَنْ طَرِيْقِ الْمَتْنِ وَالْمَتْنُ مَا انْتَهٰى اِلَيْهِ الْاِسْنَادُ فَاِنْ لَمْ يَسْقُطْ رَاوٍ مِنَ الرُّوَاةِ مِنَ الْبَيْنِ فَالْحَدِيْثُ مُتَّصِلٌ وَيُسَمّٰى عَدَمُ السُّقُوْطِ اِتِّصَالًا وَاِنْ سَقَطَ وَاحِدٌ اَوْ اَكْثَرُ فَالْحَدِيْثُ مُنْقَطِعٌ وَهٰذَا السُّقُوطُ اِنْقِطَاعٌ وَالسُّقُوْطُ اِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ مِنْ اَوَّلِ السَّنَدِ وَيُسَمّٰى مُعَلَّقًا وَهٰذَا الْاِسْقَاطُ تَعْلِيْقًا وَالسَّاقِطُ قَدْ يَكُوْنُ وَاحِدًا وَقَدْ يَكُوْنُ اَكْثَرَ وَقَدْ يُحْذَفُ تَمَامُ السَّنَدِ كَمَا هُوَ عَادَةُ الْمُصَنِّفِيْنَ يَقُوْلُوْنَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالتَّعْلِيْقَاتُ كَثِيْرَةٌ فِيْ تَرَاجِمِ صَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ وَلَهَا حُكْمُ الْاِتِّصَالِ لِاَنَّهُ اِلْتَزَمَ فِيْ هٰذَا الْكِتَابِ اَنْ لَا يَاْتِيَ اِلَّا بِالصَّحِيْحِ وَلٰكِنَّهَا لَيْسَتْ فِيْ مَرْتَبَةِ مَسَانِيْدِهٖ اِلَّا مَا ذُكِرَ مِنْهَا مُسْنَدًا فِيْ مَوْضَعٍ اٰخَرَ مِنْ كِتَابِهٖ وَقَدْ يُفَرَّقُ فِيْهَا بِاَنَّ مَا ذُكِرَ بِصِيْغَةِ الْجَزْمِ وَالْمَعْلُوْمِ كَقَوْلِهٖ قَالَ فُلَانٌ اَوْ ذَكَرَ فُلَانٌ دَلَّ عَلٰى

অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : হাদীসের বর্ণনার সূত্রকে সনদ বলে তথা হাদীসের বর্ণনাকারীগণ যারা বর্ণনা করেন। আর এ **সনদ**ও সে অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর কখনো কখনো মতন বর্ণনার পদ্ধতিও সনদ বর্ণনার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর 'সনদ' সূত্র যে পর্যন্ত পৌঁছেছে এর পরবর্তী অংশকেই **মতন** বলা হয়। আর যেসব হাদীসের উপর হতে নিচ পর্যন্ত ধারাবাহিকতা পূর্ণরূপে রয়েছে কোনো স্তরেই কোনো বর্ণনাকারী বিলুপ্ত হয়নি, তাকে হাদীসে **মুত্তাসিল** বলা হয়। আর এ বাদ না পড়াকে **ইত্তিসাল** বলা হয়। আর যে সমস্ত হাদীসের সনদের [ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি] মাঝখান হতে এক বা একাধিক বর্ণনাকারী বাদ পড়ে যায়, তাকে হাদীসে **মুনকাতি'** বলা হয়। আর এই বাদ পড়াকে বলা হয় **ইনকিতা**। আর এই বাদ পড়া যদি সনদের প্রথম হতে হয়, তবে তাকে **'মু'আল্লাক'** বলা হয়। আর এই বাদ পড়াকে **তা'লীক** বলে। আর এই বাদ পড়া বর্ণনাকারী কখনো একজন হয়, আবার কখনো কখনো অধিক হয়ে থাকে। আবার কোনো কোনো সময় সমস্ত সনদটিকে বিলোপ করা হয়। যেমন– গ্রন্থকারগণের অভ্যাস, তারা বলে থাকেন قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ [রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন]। সহীহ বুখারী শরীফে অসংখ্য তা'লীকাত রয়েছে। তবে এ তা'লীকাতের হুকুম হলো ইত্তিসাল। কেননা, তিনি এ কিতাবে বিশুদ্ধ হাদীস গ্রহণ করাকেই নীতি হিসেবে অপরিহার্য করে নিয়েছিলেন। তবে এটা মুসনাদের পর্যায়ে তখন পর্যন্ত হবে না, যখন পর্যন্ত তাঁর কিতাবে অন্যস্থানে এটাকে মুসনাদ হিসেবে বর্ণনা না করে থাকেন। তবে এই তালিকাতগুলোর মধ্যে এভাবে পার্থক্য করা যায় যে, তিনি যাকে দৃঢ়তা ও দৃঢ়বিশ্বাসের শব্দ [মারূফের সীগাহ) দ্বারা বর্ণনা করেছেন, যেমন তার কথায় 'অমুক বলেছেন' বা 'অমুক উল্লেখ করেছেন'। এটা দ্বারা বুঝায় যে, এ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারীর

ثُبُوْتِ اِسْنَادِهٖ عِنْدَهٗ فَهُوَ صَحِيْحٌ قَطْعًا وَمَا ذَكَرَهٗ بِصِيْغَةِ التَّمْرِيْضِ وَالْمَجْهُوْلِ كَقِيْلَ وَيُقَالُ وَ ذُكِرَ فَفِيْ صِحَّتِهٖ عِنْدَهٗ كَلَامٌ وَلٰكِنَّهٗ لَمَّا اَوْرَدَهٗ فِيْ هٰذَا الْكِتَابِ كَانَ لَهٗ اَصْلٌ ثَابِتٌ وَلِهٰذَا قَالُوْا تَعْلِيْقَاتُ الْبُخَارِيِّ مُتَّصِلَةٌ صَحِيْحَةٌ ـ

নিকট প্রমাণিত, তবে তা নিঃসন্দেহে 'সহীহ' হবে। যদি দুর্বল ও মাজহূল [অজ্ঞতামূলক] শব্দ দ্বারা বর্ণনা করে থাকেন, যেমন– 'বলা হয়েছে', 'বলা যায়', অথবা 'বর্ণনা করা হয়েছে', তবে এগুলোর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে তাঁর কথা আছে– তাঁর নিকট দ্বন্দ্ব রয়েছে। কিন্তু তিনি যখন স্বীয় গ্রন্থে এগুলোকে বর্ণনা করেছেন তখন বুঝতে হবে– এর মূল তাঁর নিকট সুপ্রমাণিত। এজন্য মুহাদ্দিসগণ বলেছেন– ইমাম বুখারীর তা'লীকাত মুত্তাসিল ও সহীহ।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ اَلسَّنَدُ সনদ হলো طَرِيْقُ الْحَدِيْثِ হাদীসের বর্ণনার সূত্র وَهُوَ رِجَالُهُ الَّذِيْنَ رَوَوْهُ আর তা হলো বর্ণনাকারীগণ যারা বর্ণনা করেন وَالْاِسْنَادُ بِمَعْنَاهُ আর ইসনাদও সে অর্থে ব্যবহৃত হয় وَقَدْ يَجِيْئُ بِمَعْنٰى ذِكْرِ السَّنَدِ আর কখনো সনদ বর্ণনার অর্থে আসে وَالْحِكَايَةُ عَنْ طَرِيْقِ الْمَتَنِ মতন বর্ণনার পদ্ধতিও وَالْمَتَنُ مَا انْتَهٰى اِلَيْهِ الْاِسْنَادُ আর মতন হলো সনদ যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে তার পরের অংশকে فَاِنْ لَمْ يَسْقُطْ رَاوٍ مِنَ الرُّوَاةِ যদি কোনো বর্ণনাকারী বাদ পড়েনি مِنَ الْبَيْنِ হাদীস বর্ণনার মধ্যস্থল হতে فَالْحَدِيْثُ مُتَّصِلٌ তাহলে এরূপ হাদীসকে মুত্তাসিল বলা হবে وَيُسَمّٰى عَدَمُ السُّقُوْطِ اِتِّصَالًا আর এই বাদ না পড়াকে ইত্তিসাল বলা হয় وَاِنْ سَقَطَ وَاحِدٌ اَوْ اَكْثَرُ যদি এক বা একাধিক বর্ণনাকারী বাদ পড়ে فَالْحَدِيْثُ مُنْقَطِعٌ তাহলে এরূপ হাদীসকে মুনকাতি' বলা হয় وَهٰذَا السُّقُوْطُ اِنْقِطَاعٌ আর এই বাদ পড়াকে ইনকিতা' বলে وَالسُّقُوْطُ اِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ مِنْ اَوَّلِ السَّنَدِ আর এই বাদ পড়া যদি সনদের প্রথম হতে হয় وَيُسَمّٰى مُعَلَّقًا তবে তাকে মু'আল্লাক বলা হবে وَهٰذَا الْاِسْقَاطُ تَعْلِيْقًا এবং এই বাদ পড়াকে তা'লীক বলে وَالسَّاقِطُ قَدْ يَكُوْنُ وَاحِدًا এই বাদ পড়া বর্ণনাকারী কখনো একজন হয় وَقَدْ يَكُوْنُ اَكْثَرَ আর কখনো একাধিক হয় وَقَدْ يُحْذَفُ تَمَامُ السَّنَدِ আর কখনো পুরো সনদই বিলোপ করা হয় كَمَا هُوَ عَادَةُ الْمُصَنِّفِيْنَ যে রকম গ্রন্থকারগণের অভ্যাস يَقُوْلُوْنَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ [সনদ ফেলে দিয়ে] তারা বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন وَالتَّعْلِيْقَاتُ كَثِيْرَةٌ অনেক তা'লীকাত রয়েছে فِيْ تَرَاجِمِ صَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ সহীহ বুখারীতে وَلَهَا حُكْمُ الْاِتِّصَالِ তবে এগুলোর হুকুম হলো তা'লীকাতের হুকুম لِاَنَّهُ الْتَزَمَ فِيْ هٰذَا الْكِتَابِ কেননা, তিনি এ কিতাবের ব্যাপারে আবশ্যক করে নিয়েছেন যে, اَنْ لَا يَاْتِيَ اِلَّا بِالصَّحِيْحِ সহীহ ব্যতীত অন্য কোনো হাদীস গ্রহণ করবেন না وَلٰكِنَّهَا তবে এগুলো لَيْسَتْ فِيْ مَرْتَبَةِ مَسَانِيْدِهٖ মুসনাদের পর্যায়ে পরিগণিত হবে না اِلَّا مَا ذُكِرَ مِنْهَا مُسْنَدًا فِيْ مَوْضِعٍ اٰخَرَ যে পর্যন্ত না অন্য জায়গায় মুসনাদ হিসেবে বর্ণনা না করেন مِنْ كِتَابِهٖ তাঁর কিতাবের মধ্যে وَقَدْ يُفْرَقُ فِيْهَا তবে এই তা'লীকাতগুলোর মধ্যে এভাবে পার্থক্য করা যায় যে بِاَنَّ مَا ذُكِرَ بِصِيْغَةِ الْجَزْمِ وَالْمَعْلُوْمِ তিনি যেসব হাদীসকে দৃঢ়বিশ্বাসসূচক শব্দ এবং মা'রূফের সীগাহ দ্বারা বর্ণনা করেছেন كَقَوْلِهٖ যেমনি তাঁর কথায় قَالَ فُلَانٌ অমুকে বলেছেন اَوْ ذَكَرَ فُلَانٌ বা অমুকে উল্লেখ করেছেন دَلَّ عَلٰى ثُبُوْتِ اِسْنَادِهٖ عِنْدَهٗ এর দ্বারা বুঝা যায় যে, এ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রা.)-এর নিকট প্রমাণিত فَهُوَ صَحِيْحٌ قَطْعًا তবে এটা নিঃসন্দেহে সহীহ হবে وَمَا ذَكَرَهٗ بِصِيْغَةِ التَّمْرِيْضِ وَالْمَجْهُوْلِ আর যাকে তিনি দুর্বল ও মাজহূল শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেন كَقِيْلَ وَيُقَالُ যেমন– বলা হয়েছে বা বলা যায় وَ ذُكِرَ বা বর্ণনা করা হয়েছে فَفِيْ صِحَّتِهٖ عِنْدَهٗ كَلَامٌ তবে এগুলোর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে তাঁর কথা আছে وَلٰكِنَّهٗ لَمَّا اَوْرَدَهٗ فِيْ هٰذَا الْكِتَابِ কিন্তু তিনি এগুলোকে স্বীয় কিতাবে উল্লেখ করেছেন كَانَ لَهٗ اَصْلٌ ثَابِتٌ তখন বুঝতে হবে যে এর মূল তাঁর নিকট প্রমাণিত وَلِهٰذَا قَالُوْا এজন্যই মুহাদ্দিসগণ বলেছেন تَعْلِيْقَاتُ الْبُخَارِيِّ مُتَّصِلَةٌ صَحِيْحَةٌ ইমাম বুখারীর তা'লীকাতগুলো মুত্তাসিল এবং সহীহ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ السَّنَدُ الخ : مَعْنَى السَّنَدِ لُغَةً [সনদের আভিধানিক অর্থ] : اَلسَّنَدُ শব্দটি اِسْمٌ مَصْدَرٌ একবচন; বহুবচনে اَلْاَسَانِيْدُ শাব্দিক অর্থ হলো– اَلْاِعْتِمَادُ [নির্ভর করা] اَلثِّقَةُ [বিশ্বাস করা বা ভরসা করা]।

مَعْنَى السَّنَدِ اِصْطِلَاحًا [সনদের পারিভাষিক অর্থ] : কেউ কেউ বলেন, হাদীসে রাসূলের বর্ণনাধারাকে سَنَدٌ বলা হয়।

মুফতি আমীমুল ইহসান (র.) বলেন– اَلسَّنَدُ هُوَ الطَّرِيْقُ الْمُوْصِلَةُ اِلَى الْمَتْنِ

আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র.) বলেন, اَلسَّنَدُ طَرِيْقُ رِوَايَةِ الْحَدِيْثِ هُوَ رِجَالُهُ الَّذِيْنَ رَوَوْهُ

আল্লামা মাহমুদ আব্বাস (র.) বলেন– اَلسَّنَدُ هُوَ سِلْسِلَةُ الرِّجَالِ الْمُوْصِلَةُ اِلَى الْمَتْنِ

قَوْلُهُ وَالْاِسْنَادُ الخ : مَعْنَى الْاِسْنَادِ لُغَةً [ইসনাদের আভিধানিক অর্থ] : اَلْاِسْنَادُ শব্দটি বাবে اِفْعَالٌ-এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ হলো– কোনো কিছুর উপর হেলান দেওয়া, সম্পৃক্ত করে, দেওয়া, কারো প্রতি কোনো কথাকে সম্বন্ধ করা।

مَعْنَى الْاِسْنَادِ اِصْطِلَاحًا [ইসনাদের পারিভাষিক অর্থ] : পরিভাষায় اَلْاِسْنَادُ দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

১. সনদের সমার্থবোধক। ২. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন– اَلْاِسْنَادُ حِكَايَةُ طَرِيْقِ الْمَتْنِ

قَوْلُهُ اَلْمَتَنُ الخ : مَعْنَى اِصْطِلَاحًا [মতনের আভিধানিক অর্থ] : اَلْمَتْنُ শব্দটি একবচন, বহুবচনে اَلْمُتُوْنُ শাব্দিক অর্থ হলো– اَلصُّلْبُ الشَّدِيْدُ [খুব শক্ত] اَلظَّهْرُ [পৃষ্ঠ] اَلْاَصْلُ [মূল], اَلصُّلْبُ [দৃঢ়, মজবুত] ইত্যাদি।

مَعْنَى الْمَتَنِ اِصْطِلَاحًا [মতনের পারিভাষিক অর্থ] : মুফতি আমীমুল ইহসান (র.) বলেন– اَلْمَتْنُ هُوَ الَّذِىْ اَلْفَاظُ الْحَدِيْثِ

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন– اَلْمَتْنُ هُوَ غَايَةُ مَا يَنْتَهِىْ اِلَيْهِ اِسْنَادٌ مِنَ الْكَلَامِ

আল্লামা তীবী (র.) বলেন– اَلْمَتْنُ هُوَ اَلْفَاظُ الْحَدِيْثِ الَّتِىْ تَقُوْمُ بِهَا الْمَعْنٰى

ড. আদীব সালেহ (র.) বলেন– هُوَ مَا انْتَهٰى اِلَيْهِ السَّنَدُ مِنَ الْكَلَامِ

কারো মতে– هُوَ مَا انْتَهٰى اِلَيْهِ غَايَةُ السَّنَدِ مِنَ الْكَلَامِ

উদাহরণ : قَالَ الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَشْكَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ اِلَى الرَّحْمٰنِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِى الْمِيْزَانِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ -

অত্র হাদীসে ইমাম বুখারী (র.)-এর বক্তব্য حَدَّثَنَا হতে اَبُوْ هُرَيْرَةَ পর্যন্ত নামগুলোকে সনদ বলে আর قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ হতে সমগ্র ভাষ্যটিকে মতন বলা হয়। অত্র সনদ হতে কোনো বর্ণনাকারী বাদ পড়েনি বিধায় এ কারণে একে মুত্তাসিল বলা হয়।

قَوْلُهُ مُنْقَطِعٌ : হাকিম নিশাপুরী বলেছেন– যেখানে সনদ মুত্তাসিল হয় না তা যে কারণেই হোক না কেন তাকেই মুনকাতি' বলতে হবে– ভাষাগত দিক দিয়ে এ অর্থই নিকটতম। কেননা, মুনকাতি' মুত্তাসিলের বিপরীত। ফিক্হবিদগণের মতে অধিকতর যে অর্থে মুনকাতি' ব্যবহার হয় তা হলো সনদ হতে শুধু সাহাবী নয় যে কোনো একজন বর্ণনাকারী অপসারিত হওয়া তথা সনদের মধ্য হতে কখনো একজন বর্ণনাকারী অপসারিত হলেও একে মুনকাতি' বলা হয়।

قَوْلُهُ وَالسُّقُوْطُ الخ : মধ্যখান হতে বর্ণনাকারী বাদ পড়ার কয়েকটি অবস্থা রয়েছে। যথা–

১. যদি সনদের প্রথম হতে একজন অথবা দুজন বা সকল বর্ণনাকারী বাদ পড়ে, তাকে মু'আল্লাক বলে।

২. যদি সনদের শেষ হতে তথা তাবেয়ীর পরে রাবী বাদ পড়ে, তাকে হাদীসে **মুরসাল** বলে।

৩. যদি সনদের মধ্যখান হতে পর পর দুজন রাবী বাদ পড়ে, সেই হাদীস **মু'দ্বাল (مُعْضَلٌ)**।

كَمَا هُوَ عَادَةُ الْمُصَنِّفِيْنَ : যেমন হিদায়া গ্রন্থকার হিদায়া কিতাবে উল্লিখিত সকল হাদীসের সনদ বিলোপ করেছেন।

মুরসালের উদাহরণ : যেমন কোনো তাবেয়ী বললেন– قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَذَا اَوْ فَعَلَ اَوْ فُعِلَ بِحَضْرَتِهٖ كَذَا

যেমন– ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন যে, حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ثَنَا حُجَيْنٌ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُزَابَنَةِ ـ

এখানে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব হলেন বড় একজন তাবেয়ী, তবে তিনি তাঁর ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাঝের বর্ণনাকারী সাহাবীকে উল্লেখ করেননি।

مُعْضَل -এর পরিচয় : مَا سَقَطَ مِنْ اِسْنَادِهٖ اِثْنَانِ فَاَكْثَرُ عَلَى التَّوَالِىْ

مُعْضَلٌ-এর উদাহরণ– مَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ بِسَنَدِهٖ اِلَى الْقَعْنَبِىْ عَنْ مَالِكٍ اَنَّهٗ بَلَغَهٗ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلْمَمْلُوْكِ طَعَامُهٗ وَكِسْوَتُهٗ بِالْمَعْرُوْفِ الخ ـ

এখানে مَالِكٌ -এর পরে পর পর দুজন রাবী বাদ পড়েছে। উক্ত সনদটি ইমাম মালিক (র.) مُوَطَّا গ্রন্থে উল্লেখ করেন–

عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنِ ابْنِهٖ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) ـ

اَلْمُعَلَّقُ -এর পরিচয় : مَا حُذِفَ مِنْ مَبْدَاِ اِسْنَادِهٖ رَاوٍ فَاَكْثَرُ عَلَى التَّوَالِىْ

اَلْمُعَلَّقُ -এর উদাহরণ– مَا اَخْرَجَهُ الْبُخَارِىُّ فِىْ مُقَدَّمَةِ بَابِ مَا يُذْكَرُ فِى الْفَخِذِ وَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى (رضـ) غَطَّى النَّبِىُّ ﷺ رُكْبَتَيْهِ حِيْنَ دَخَلَ عُثْمَانُ ـ

এখানে ইমাম বুখারী সাহাবী আবূ মূসা ব্যতীত পুরো সনদ বাদ দিয়েছেন।

اَلتَّعْلِيْقَاتُ -এর বিশ্লেষণ : কোনো কোনো গ্রন্থকার কোনো কোনো হাদীসের পূর্ণ সনদকে বাদ দিয়ে কেবল মূল হাদীসটিকেই বর্ণনা করেছেন, এরূপ করাকে তা'লীক বলা হয়। বুখারী শরীফে ১,৩৪১ টি তা'লীকাত রয়েছে। মুহাদ্দিসীনের মতে বুখারী শরীফে উল্লেখকৃত তা'লীকাত মুত্তাসিল হাদীসের সমমর্যাদাসম্পন্ন এবং গ্রহণযোগ্য। কারণ, অনুসন্ধান করে জানা গেছে যে, ইমাম বুখারী (র.)-এর সমস্ত তা'লীকাতেরই মুত্তাসিল সনদ রয়েছে। তা ছাড়া তিনি তাঁর গ্রন্থে সহীহ হাদীস ব্যতীত কোনো হাদীস উদ্ধৃত করবেন না বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। তবে কেউ কেউ তা'লীকাতের মধ্যে এরূপ পার্থক্য করেছেন যে, যে সমস্ত তা'লীকাত তিনি প্রত্যয় ও দৃঢ়তাজ্ঞাপক শব্দযোগে উল্লেখ করেছেন। যেমন– তিনি قَالَ বা فَعَلَ অথবা ذَكَرَ শব্দ ব্যবহার করে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তা গ্রহণযোগ্য। আর যে সকল তা'লীকাত দুর্বল শব্দযোগে উল্লেখ করেছেন, যেমন– قِيْلَ বা ذُكِرَ অথবা حُكِىَ শব্দ ব্যবহার করে যে হাদীস উদ্ধৃত করেছেন তা গ্রহণ করা জরুরি নয়। প্রকৃত কথা হলো, ইমাম বুখারী (র.)-এর বর্ণিত তা'লীকাত সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণযোগ্য।

مُعَلَّقٌ হাদীসের উদাহরণ হলো–

مَا اَخْرَجَهٗ فِىْ مُقَدَّمَةِ بَابِ مَا يُذْكَرُ فِى الْفَخِذِ وَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى (رضـ) غَطَّى النَّبِىُّ ﷺ رُكْبَتَيْهِ اِذَا دَخَلَ عُثْمَانُ

قَوْلُهٗ مُسْنَدٌ الخ : مُسْنَدٌ শব্দটি سَنَدٌ শব্দ হতে নির্গত। শাব্দিক অর্থ হলো– নির্ভরশীল।

পারিভাষিক পরিচয় হলো– مَا اتَّصَلَ سَنَدُهٗ مَرْفُوْعًا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ তথা যার সনদ মারফূ' হিসেবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে মিলিত, তাকে মুসনাদ বলে।

مُسْنَدٌ হাদীসের উদাহরণ : مَا اَخْرَجَهُ الْبُخَارِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِىْ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا ـ

এখানে সনদটি প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত মিলিত এবং মারফূ'।

وَاِنْ كَانَ السُّقُوْطُ مِنْ اٰخِرِ السَّنَدِ فَاِنْ كَانَ بَعْدَ التَّابِعِىِّ فَالْحَدِيْثُ مُرْسَلٌ وَهٰذَا الْفِعْلُ اِرْسَالٌ كَقَوْلِ التَّابِعِىِّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ يَجِيْئُ عِنْدَ الْمُحَدِّثِيْنَ اَلْمُرْسَلُ وَالْمُنْقَطِعُ بِمَعْنًى وَالْاِصْطِلَاحُ اْلاَوَّلُ اَشْهَرُ وَحُكْمُ الْمُرْسَلِ التَّوَقُّفُ عِنْدَ جُمْهُوْرِ الْعُلَمَاءِ لِاَنَّهٗ لَا يُدْرٰى اَنَّ السَّاقِطَ ثِقَةٌ اَوْ لَا لِاَنَّ التَّابِعِىَّ قَدْ يَرْوِىْ عَنِ التَّابِعِىِّ وَفِى التَّابِعِيْنَ ثِقَاتٌ وَغَيْرُ ثِقَاتٍ وَعِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمَالِكٍ اَلْمُرْسَلُ مَقْبُوْلٌ مُطْلَقًا وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا اَرْسَلَهٗ لِكَمَالِ الْوُثُوْقِ وَالْاِعْتِمَادِ لِاَنَّ الْكَلَامَ فِى الثِّقَةِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهٗ صَحِيْحًا لَمْ يُرْسِلْهُ وَلَمْ يَقُلْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدَ الشَّافِعِىِّ اِنْ اعْتُضِدَ بِوَجْهٍ اٰخَرَ مُرْسَلٍ اَوْ مُسْنَدٍ وَاِنْ كَانَ ضَعِيْفًا قُبِلَ وَعَنْ اَحْمَدَ قَوْلَانِ وَهٰذَا كُلُّهٗ اِذَا عُلِمَ اَنَّ عَادَةَ ذٰلِكَ التَّابِعِىِّ اَنْ لَا يُرْسِلَ اِلَّا عَنِ الثِّقَاتِ وَاِنْ كَانَتْ عَادَتُهٗ اَنْ يُّرْسِلَ عَنِ الثِّقَاتِ وَعَنْ غَيْرِ الثِّقَاتِ فَحُكْمُهُ التَّوَقُّفُ بِالْاِتِّفَاقِ كَذَا قِيْلَ وَفِيْهِ تَفْصِيْلٌ اَزْيَدُ مِنْ ذٰلِكَ ذَكَرَهُ السَّخَاوِىُّ فِىْ شَرْحِ الْاَلْفِيَّةِ ـ

অনুবাদ : মুরসাল– যে হাদীসে সনদের রাবী বাদ পড়া শেষের দিকে হয়েছে, যদি তা তাবেয়ীর পরে হয় (সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে) তবে তাকে হাদীসে মুরসাল (حَدِيْث مُرْسَلْ) বলা হয়ে থাকে। আর এ কাজটিকে বলা হয় ইরসাল। যেমন তাবেয়ীর কথা– قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ; কোনো কোনো সময় মুহাদ্দিসীনের নিকট 'মুরসাল' ও 'মুনকাতি' একই অর্থে ব্যবহৃত হয়, তবে প্রথম পরিভাষাটিই প্রসিদ্ধ। হাদীসে মুসরসালের হুকুম– জুমহুর ওলামায়ে কেরামের মতানুসারে মুরসালের হুকুম মুলতুবি থাকবে। কারণ, বাদ পড়া বর্ণনাকারী (رَاوِىْ) গ্রহণযোগ্য কিনা তা জানা যায়নি। কেননা, এক তাবেয়ী অন্য তাবেয়ী হতে হাদীস বর্ণনা করে থাকেন। আর তাবেয়ীদের মধ্যে 'ছিকাহ' বা 'গায়রে ছিকাহ' উভয় হতে পারে। কাজেই অকাট্যভাবে কোনো হুকুম দেওয়া যায় না। অবশ্য ইমামদের মধ্য হতে ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম মালিক (র.) এ প্রকারের হাদীসকে সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য বলেছেন। তাঁদের বক্তব্য এই যে, বর্ণনাকারী বিশ্বাসের কারণেই হাদীস ইরসাল করেছেন। কেননা, কথাবার্তা তো দৃঢ়তা সম্পর্কেই। যদি তাঁদের নিকট হাদীসটি গ্রহণযোগ্য না হতো, তাহলে তাঁরা তা ইরসাল [বর্ণনা] করতেন না। আর এভাবে বর্ণনাও করতেন না قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ। ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর মতে মুরসাল হাদীস শুধু ঐ সময়েই গ্রহণযোগ্য হবে, যখন অপর কোনো মুরসাল হাদীস বা সনদ তার সহায়তা তথা সমর্থন করবে, তা দুর্বল (ضَعِيْف) হোক না কেন। এভাবে ইমাম আহমদ হতে দুটি মত রয়েছে। [একটি গ্রহণযোগ্য হওয়ার পক্ষে এবং অন্যটি গ্রহণযোগ্য হওয়ার বিপক্ষে।] এ সকল মতানৈক্য শুধু ঐ সময় হবে যখন বর্ণনাকারী তাবেয়ীর অভ্যাস এরূপ প্রমাণিত যে, তিনি ছিকাহ [নির্ভরযোগ্য] বর্ণনাকারী হতেই ইরসাল [বর্ণনা] করেন। যদি বর্ণনাকারী হতেই অভ্যাস প্রমাণিত হয় যে, তিনি ছিকাহ [নির্ভরযোগ্য] এবং গায়রে ছিকাহ [অনির্ভরযোগ্য] উভয় প্রকার বর্ণনাকারী হতেই বর্ণনা করেন, তবে সর্বসম্মতভাবে নীরবতা অবলম্বন করা হবে। হাদীসশাস্ত্রবিদগণ হতে এরূপ উক্তি পাওয়া যায়। এতে বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ রয়েছে, যা শরহে আলফিয়ায় ইমাম সাখাবী (র.) বর্ণনা করেছেন।

শাব্দিক অনুবাদ : وَإِنْ كَانَ السُّقُوْطُ مِنْ اٰخِرِ السَّنَدِ আর যদি রাবীর বাদ পড়া সনদের শেষ দিকে হয় فَإِنْ كَانَ بَعْدَ التَّابِعِيِّ যদি তা তাবেয়ীর পরে হয় فَالْحَدِيْثُ مُرْسَلٌ তবে তাকে হাদীসে মুরসাল বলা হয় وَهٰذَا الْفِعْلُ إِرْسَالٌ আর এ কাজটিকে বলা হয় ইরসাল كَقَوْلِ التَّابِعِيِّ যেমন কোনো তাবেয়ীর কথা قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন وَقَدْ يَجِيْءُ عِنْدَ الْمُحَدِّثِيْنَ আর কখনো মুহাদ্দিসগণের নিকট ব্যবহৃত হয় اَلْمُرْسَلُ وَالْمُنْقَطِعُ بِمَعْنًى মুরসাল ও মুনকাতি' একই অর্থে وَالْاِصْطِلَاحُ الْاَوَّلُ اَشْهَرُ তবে প্রথম পরিভাষাটিই অধিক প্রসিদ্ধ وَحُكْمُ الْمُرْسَلِ আর মুরসালের হুকুম হলো اَلتَّوَقُّفُ عِنْدَ جُمْهُوْرِ الْعُلَمَاءِ জুমহুর আলিমদের নিকট মূলতুবি থাকবে لِاَنَّهُ لَا يُدْرٰى কেননা, এ কথাটি জানা যায়নি যে, اَنَّ السَّاقِطَ ثِقَةٌ اَوْ لَا পড়ে যাওয়া রাবী গ্রহণযোগ্য কিনা لِاَنَّ التَّابِعِيَّ قَدْ يَرْوِىْ عَنِ التَّابِعِيِّ কেননা, এক তাবেয়ী অন্য তাবেয়ী হতে বর্ণনা করে থাকেন وَفِى التَّابِعِيْنَ ثِقَاتٌ وَغَيْرُ ثِقَاتٍ কেননা, তাবেয়ীদের মধ্যে ছিকাহ ও গায়রে ছিকাহ উভয় রাবী রয়েছে وَعِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمَالِكٍ আর ইমাম আবূ হানীফা ও মালিক (র.)-এর মতে اَلْمُرْسَلُ مَقْبُوْلٌ مُطْلَقًا মুরসাল হাদীস সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ তারা বলে থাকেন যে اِنَّمَا اَرْسَلَهُ لِكَمَالِ الْوُثُوْقِ وَالْاِعْتِمَادِ বর্ণনাকারী বিশ্বাসের কারণেই হাদীসকে ইরসাল করেছেন لِاَنَّ الْكَلَامَ فِى الثِّقَةِ কেননা, আলোচনা দৃঢ়তা সম্পর্কেই وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ صَحِيْحًا যদি হাদীসটি তাঁদের নিকট সহীহ না হতো لَمْ يُرْسِلْهُ তাহলে তাঁরা ইরসাল করতেন না وَلَمْ يَقُلْ এবং তাঁরা এরূপ বলতেন না যে, قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে اِنِ اعْتَضَدَ بِوَجْهٍ اٰخَرَ যদি অন্য কোনোভাবে সাহায্য করে مُرْسَلٌ اَوْ مُسْنَدٌ কোনো মুরসাল হাদীস অথবা মুসনাদ وَاِنْ كَانَ ضَعِيْفًا যদি তা দুর্বলও হয় قُبِلَ তাহলে গৃহীত হবে وَعَنْ اَحْمَدَ قَوْلَانِ আর ইমাম আহমদ (র.) হতে দুটি অভিমত পাওয়া যায় وَهٰذَا كُلُّهُ আর এসব মতানৈক্য তখনই হবে اِذَا عَلِمَ যখন জানা গেল যে, اَنَّ عَادَةَ ذٰلِكَ التَّابِعِيِّ উক্ত তাবেয়ীর এই অভ্যাস যে, اَنْ لَا يُرْسِلَ اِلَّا عَنِ الثِّقَاتِ তিনি একমাত্র ছিকাহ রাবী হতেই ইরসাল করেন وَاِنْ كَانَتْ عَادَتُهُ আর যদি তাঁর অভ্যাস এ রকম হয় যে اَنْ يُرْسِلَ عَنِ الثِّقَاتِ وَعَنْ غَيْرِ الثِّقَاتِ তিনি ছিকাহ ও গাইরে ছিকাহ উভয় হতে ইরসাল করেন فَحُكْمُهُ এর হুকুম হলো التَّوَقُّفُ بِالْاِتِّفَاقِ সর্বসম্মতভাবে নীরবতা অবলম্বন করা كَذَا قِيْلَ এ রকমই বলা হয়েছে وَفِيْهِ تَفْصِيْلٌ اَزْيَدُ مِنْ ذٰلِكَ এতে ব্যাপক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ রয়েছে ذَكَرَهُ السَّخَاوِىُّ যা ইমাম সাখাবী (র.) বর্ণনা করেছেন فِىْ شَرْحِ الْاَلْفِيَّةِ শরহে আলফিয়া নামক কিতাবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حُكْمُ الْمُرْسَلِ [মুরসালের হুকুম] : মুরসাল হাদীসের হুকুম সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

مَذْهَبُ جُمْهُوْرِ مُحَدِّثِيْنَ : জুমহুর মুহাদ্দেসীনদের মতে মুরসাল হাদীসের ক্ষেত্রে নীরবতা অবলম্বন করতে হবে। কেননা, বাদ পড়া রাবী ثِقَةٌ ও غَيْرُ ثِقَةٍ উভয়ই হতে পারে। এ ছাড়া একজন তাবেয়ী অপর একজন তাবেয়ী হতেও বর্ণনা করে থাকেন, আর তাবেয়ী ثِقَةٌ ও غَيْرُ ثِقَةٍ উভয়ই হয়ে থাকেন।

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمَالِكٍ (رحـ) : ইমাম আবূ হানীফা ও মালিক (র.)-এর মতে মুরসাল হাদীস সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য। কেননা, বর্ণনাকারী তার শায়খের উপর অধিক বিশ্বাসী হওয়ার কারণেই তাঁর নাম উল্লেখ না করে قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ বলেছেন।

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ (رحـ) : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে মুরসাল হাদীস ঐ সময়ই গ্রহণযোগ্য হবে যখন অপর কোনো মুরসাল হাদীস বা মুসনাদ হাদীস তার সহায়তা করবে, যদিও তা ضَعِيْفٌ হোকনা কেন।

مَذْهَبُ اَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ (رحـ) : ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর পক্ষ হতে দুটি অভিমত পাওয়া যায়– সাধারণভাবে গ্রহণীয় ও বর্জনীয়।

তবে এসব হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যখন জানা যায় যে, বর্ণনাকারী তাবেয়ী বিশ্বস্ত ব্যক্তি ব্যতীত হাদীস মুরসাল করেন না। আর যদি এটা জানা যায় যে, غَيْرُ ثِقَةٍ ও ثِقَةٌ উভয় হতে তার হাদীস মুরসাল করার অভ্যাস আছে তখন সর্বসম্মতভাবে حَدِيْثٌ مُرْسَلٌ -এর ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করতে হবে।

وَاِنْ كَانَ السُّقُوْط مِنْ اَثْنَاءِ الْاِسْنَادِ فَاِنْ كَانَ السَّاقِطُ اِثْنَيْنِ مُتَوَالِيًا يُسَمّٰى مُعْضَلًا بِفَتْحِ الضَّادِ وَاِنْ كَانَ وَاحِدًا اَوْ اَكْثَرَ مِنْ غَيْرِ مَوْضَعٍ وَاحِدٍ يُسَمّٰى مُنْقَطِعًا وَعَلٰى هٰذَا يَكُوْنُ الْمُنْقَطِعُ قِسْمًا مِنْ غَيْرِ الْمُتَّصِلِ وَقَدْ يُطْلَقُ الْمُنْقَطِعُ بِمَعْنٰى غَيْرِ الْمُتَّصِلِ مُطْلَقًا شَامِلًا لِجَمِيْعِ الْاَقْسَامِ وَبِهٰذَا الْمَعْنٰى يُجْعَلُ مَقْسَمًا وَيُعْرَفُ الْاِنْقِطَاعُ وَسُقُوْطُ الرَّاوِيْ بِمَعْرِفَةِ عَدَمِ الْمُلَاقَاةِ بَيْنَ الرَّاوِيْ وَالْمَرْوِيِّ عَنْهُ اِمَّا بِعَدَمِ الْمُعَاصَرَةِ اَوْ عَدَمِ الْاِجْتِمَاعِ اَوِ الْاِجَازَةِ عَنْهُ بِحُكْمِ عِلْمِ التَّارِيْخِ الْمُبَيِّنِ لِمَوَالِيْدِ الرُّوَاتِ وَ وَفَيَاتِهِمْ وَتَعْيِيْنِ اَوْقَاتِ طَلَبِهِمْ وَارْتِحَالِهِمْ وَبِهٰذَا صَارَ عِلْمُ التَّارِيْخِ اَصْلًا وَعُمْدَةً عِنْدَ الْمُحَدِّثِيْنَ ـ

অনুবাদ : আর যদি সনদের মধ্য হতে দুজন রাবীর পর পর তথা পর্যায়ক্রমে অপসারণ ঘটে, তবে সে হাদীসকে মু'দ্বাল (مُعْضَل) বলা হয়ে থাকে। (ض) -এর উপর ফাতাহ। আর যদি সনদের বিভিন্ন স্থান হতে একজন বা একাধিক রাবী বাদ পড়ে যায়, তবে সে হাদীসকে মুনকাতি' (مُنْقَطِعْ) বলে। এমতাবস্থায় হাদীসে মুনকাতি' হাদীসে গায়রে মুত্তাসিলের (غَيْر مُتَّصِلْ) একপ্রকার হবে। কোনো কোনো সময় মুনকাতি' সাধারণভাবে গায়রে মুত্তাসিলের [মুত্তাসিল নয় এমন] অর্থেই ব্যবহৃত হয়; যাতে সকল প্রকরণগুলো শামিল হয়, আর এ অর্থের ভিত্তিতেই মুনকাতি'-এর শ্রেণীবিন্যাস করা হবে। ইনকিতা ও রাবীর বাদ পড়ার বিষয়টি রাবী এবং যার নিকট হতে বর্ণনা করা হয় তাদের মধ্যে সাক্ষাৎ না হওয়ার দ্বারাই পরিচয় পাওয়া যায়। অথবা, এ সাক্ষাৎ না হওয়ার দ্বারাই পরিচয় পাওয়া যায়। অথবা, এ সাক্ষাৎ না হওয়ার কারণ হলো, তাদের উভয়ের সমসাময়িক যুগের না হওয়া অথবা উভয়ের মধ্যে সম্মিলিত না হওয়া ও হাদীস বর্ণনার অনুমতি না থাকা। এসব বিষয় রাবীদের জন্ম ও মৃত্যু, হাদীস আহরণের ও বিদেশ ভ্রমণের নির্দিষ্ট সময়কালের ঐতিহাসিক তত্ত্ব লাভের দ্বারাই জানার মাধ্যম। এজন্যই ইলমে তারীখ মুহাদ্দিসগণের কাছে মূল ও একটি উত্তম শাস্ত্র।

শাব্দিক অনুবাদ : وَاِنْ كَانَ السُّقُوْطُ مِنْ اَثْنَاءِ الْاِسْنَادِ আর যদি সনদের মধ্যস্থল হতে দুজন বর্ণনাকারী বাদ পড়ে যায় فَاِنْ كَانَ السَّاقِطُ اِثْنَيْنِ مُتَوَالِيًا যদি বাদ পড়া বর্ণনাকারীদ্বয় পর্যায়ক্রমে হয় يُسَمّٰى مُعْضَلًا তবে তকে মু'দ্বাল বলা হবে بِفَتْحِ الضَّادِ দ্বাদ বর্ণে যবরের সাথে وَاِنْ كَانَ وَاحِدًا اَوْ اَكْثَرَ আর যদি তা এক বা একাধিক হয় مِنْ غَيْرِ مَوْضَعٍ وَاحِدٍ বিভিন্ন স্থান হতে يُسَمّٰى مُنْقَطِعًا তবে তাকে মুনকাতি' বলা হবে وَعَلٰى هٰذَا يَكُوْنُ الْمُنْقَطِعُ এমতাবস্থায় হাদীসে মুনকাতি' হবে قِسْمًا مِنْ غَيْرِ الْمُتَّصِلِ গায়রে মুত্তাসিলের একপ্রকার وَقَدْ يُطْلَقُ الْمُنْقَطِعُ আর কখনো মুনকাতি' ব্যবহৃত হয় بِمَعْنٰى غَيْرِ الْمُتَّصِلِ مُطْلَقًا সাধারণভাবে গায়রে মুত্তাসিলের অর্থে شَامِلًا لِجَمِيْعِ الْاَقْسَامِ যাতে করে সকল প্রকারগুলো এতে শামিল হয় وَبِهٰذَا الْمَعْنٰى আর এ অর্থের ভিত্তিতেই يُجْعَلُ مَقْسَمًا মুনকাতি'কে শ্রেণীবিন্যাস করা হবে وَيُعْرَفُ আর জানা যায় الْاِنْقِطَاعُ وَسُقُوْطُ الرَّاوِيْ ইনকিতা' ও রাবীর বাদ পড়ার বিষয়টি بِمَعْرِفَةِ عَدَمِ الْمُلَاقَاةِ সাক্ষাৎ না পাওয়ার দ্বারাই بَيْنَ الرَّاوِيْ وَالْمَرْوِيِّ عَنْهُ বর্ণনাকারী ও যার থেকে বর্ণনা করা হয়েছে তার মধ্যে اِمَّا بِعَدَمِ الْمُعَاصَرَةِ কিংবা উভয়ে সমসাময়িক না হওয়ার কারণে اَوْ عَدَمِ الْاِجْتِمَاعِ অথবা উভয়ে মধ্যে সাক্ষাৎ না হওয়ার ফলে اَوِ الْاِجَازَةِ عَنْهُ অথবা হাদীস বর্ণনার অনুমতি না থাকার কারণে بِحُكْمِ عِلْمِ التَّارِيْخِ الْمُبَيِّنِ এসবই সুস্পষ্ট তাকিদ জানার মাধ্যমে হয় لِمَوَالِيْدِ الرُّوَاتِ রাবীদের জন্ম তারিখ وَ وَفَيَاتِهِمْ ও তাদের মৃত্যু তারিখ وَتَعْيِيْنِ اَوْقَاتِ طَلَبِهِمْ তাদের হাদীস অন্বেষণের নির্দিষ্ট সময় وَ ارْتِحَالِهِمْ এবং তাদের দেশ ভ্রমণের নির্দিষ্ট সময় وَبِهٰذَا صَارَ عِلْمُ التَّارِيْخِ اَصْلًا وَعُمْدَةً এসব কারণেই ইলমে তারীখ একটি মূল ও উত্তম শাস্ত্র عِنْدَ الْمُحَدِّثِيْنَ মুহাদ্দিসগণের নিকট।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ الْمُنْقَطِعُ الخ : الْمُنْقَطِعُ শব্দটি اِسْمُ فَاعِلْ -এর সীগাহ। শাব্দিক অর্থ হলো– কর্তিত, বিচ্ছিন্ন, লুপ্ত ইত্যাদি। পরিভাষিক পরিচয় হলো– إِنْ كَانَ السَّاقِطُ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِ مَوْضَعٍ وَاحِدٍ يُسَمّٰى مُنْقَطِعًا অর্থাৎ, যদি বিলুপ্ত রাবী বিভিন্ন স্থানে এক বা একাধিক হয়, তবে তাকে مُنْقَطِعْ বলে। কারো মতে– مَا لَمْ يَتَّصِلْ اِسْنَادُهُ عَلٰى اَيِّ وَجْهٍ كَانَ اِنْقِطَاعُهُ
উদাহরণ : مَارَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ يَثِيْعٍ عَنْ حُذَيْفَةَ مَرْفُوْعًا اِنْ وَلَّيْتُمُوْهَا اَبَابَكْرٍ فَقَوِيٌّ اَمِيْنٌ .
এখানে ثَوْرِىْ ও اَبِىْ اِسْحَاقْ -এর মধ্যস্থলে شَرِيْكْ -কে বাদ দেওয়া হয়েছে– উল্লিখিত সংজ্ঞার ভিত্তিতে মুনকাতি' হাদীস মুত্তাসিল নয় এমন শ্রেণীতে পরিণত হয়। আর কখনো কখনো মুনকাতি' কথাটি মুত্তাসিল নয় এমন অর্থে ব্যবহার হয়ে সমগ্র শ্রেণীকে অন্তর্ভুক্ত করে। এ অর্থের ভিত্তিতেই মুনকাতির শ্রেণীবিন্যাস করা যাবে।
ইনকিতা'করণ এবং বর্ণনাকারীর অপসারণ হওয়া বিষয়টি বর্ণনাকারী এবং যার নিকট হতে বর্ণনা করা হয় তাদের মধ্যে সাক্ষাৎ না হওয়ার জ্ঞান দ্বারা অবহিত হওয়া যায়। আর সাক্ষাৎ না ঘটার কারণ হলো, সমসমায়িক যুগে এবং সম্মিলিত না হওয়া অথবা হাদীস বর্ণনাকারীর অনুমতি না পাওয়া। আর এসব বিষয় রাবীদের জন্ম তারিখ, মৃত্যু তারিখ এবং জ্ঞান আহরণের ও জ্ঞান অন্বেষণে ভ্রমণের নির্দিষ্ট সময়কালটির জ্ঞাত হওয়ার দ্বারা জানা যায়। আর জানার মূল মাধ্যম হলো ইতিহাসশাস্ত্রের জ্ঞান।
হাকিম নিশাপুরী বলেছেন– যেখানে সনদ মুত্তাসিল হয় না তা যে কারণেই হোক না কেন তাকেই মুনকাতি' বলে। ভাষাগত দিক দিয়ে এ অর্থই নিকটবর্তী। কেননা, মুনকাতি' মুত্তাসিলের পরিপন্থি। ফিক্হবিদগণের মতে অধিকতর যে অর্থে মুনকাতি' ব্যবহার হয়, তা হলো সনদ হতে শুধু একজন (غَيْرُ صَحَابِىْ) অসাহাবী বর্ণনাকারী অপসারিত হওয়া। আর সনদের মধ্য হতে কখনো একজন রাবী অপসারিত হলেও একে মুনকাতি' বলা হয়।

قَوْلُهُ بِحُكْمِ عِلْمِ التَّارِيْخِ الخ : পূর্ববর্তী হাদীস বিশারদ মনীষীগণ হাদীস বর্ণনাকারী রাবীদের মান নির্ণয়ের জন্য ৫,০০০,০০ [পাঁচ লক্ষ] রাবীর জন্ম-মৃত্যুর তারিখ, পরিচিত-অপরিচিত নাম-উপনাম, উপাধী, বংশ-পরিচয়, বাসস্থান, শিক্ষাকেন্দ্র তার সমসাময়িক ও পরবর্তী হাদীসের ইমামগণ কর্তৃক তার সম্পর্কে মন্তব্য এবং তার গুণাবলী বা দোষ-ত্রুটি বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষায় রাবীদের এ জীবনেতিহাস বা জীবন-চরিতকে 'আসমাউর রিজাল' শাস্ত্র বলা হয়। হাদীস সমালোচক ইমামগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীসের বিশুদ্ধতা ও প্রামাণিকতা উর্ধ্ব তোলার জন্যে যে বিরাট ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন অন্য কোনো জাতি তাদের আল্লাহর কিতাবের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য এর একশতাংশও করতে পারেনি।
কিংবদন্তী মুহাদ্দিস বুখারী শরীফের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) কর্তৃক চার খণ্ডে সংকলিত 'আল-ইসাবাহ' নামক কিতাবে ১৯৯৩৯ জন রাবীর সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং তাঁরই এগার খণ্ডে সংকলিত 'তাহযীবুত তাহযীব' নামক কিতাবে ১২৪৫৫ জন রাবীর বিস্তারিত জীবনী বর্ণিত আছে। তাঁর পূর্বে হাফেজ শামসুদ্দীন যাহাবী (র.)-এর ন্যায় বড় বড় মনীষী এর বিষয়ে বহু কিতাব সংকলন করে গেছেন। এমনিভাবে এ শাস্ত্রে ৫,০০০,০০ [পাঁচ লক্ষ] রাবীর জীবনেতিহাস লিপিবদ্ধ রয়েছে। [তাদবীনে হাদীস] মুসলমানদের এ অমর কীর্তি বিজাতীরা, এমনকি অধুনা জ্ঞান-বিজ্ঞানের একচেটিয়া দাবিদার ইউরোপীয়নরা অকপটে স্বীকার করেছে।
প্রাচ্যবিদ ড. মার্গেলিউথ বলেন, "হাদীসের জন্য মুসলমানরা যতো ইচ্ছা গর্ভ করতে পারে; এটা তাদের পক্ষে শোভনীয়।" ড. স্প্রেঙ্গার [জার্মান] লিখেছেন, "দুনিয়ার বুকে এমন কোনো জাতি অতীতেও ছিল না, বর্তমানেও নেই যে জাতি মুসলমানদের ন্যায় আসমাউর রিজাল শাস্ত্র আবিষ্কার করতে স্বক্ষম হয়েছে। এ শাস্ত্রের সাহায্যে পাঁচলক্ষ মানুষের জীবন-চরিত জানা যায়।"
আমাদের পূর্বসুরী মুহাদ্দিস মনীষীগণ সীমাহীন ত্যাগ, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং নিরলস সাধনার মাধ্যমে হাদীসের প্রামাণিকতাকে নিশ্চিত করেছেন। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় বিংশ শতাব্দীর উষালগ্নে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের বৈষয়িক উন্নতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মুসলমানদের এক শ্রেণীর বুদ্দিজীবী ইসলামি বিধি-বিধানকে পাশ্চাত্য চিন্তাধারা মুতাবিক ব্যাখ্যা করেছেন। এদেরকে আহলে তাজাদ্দুদ বা আধুনিকতাবাদী বলা হয়। আর হাদীস শরীফে যেহেতু জীবনের প্রতিটি শাখার সাথে সংশ্লিষ্ট এরূপ বিষয়ের বিস্তারিত দিক নির্দেশনা রয়েছে যেগুলো পাশ্চাত্য চিন্তধারার সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। এ কারণেই তারা হাদীসের প্রামাণিকতাকে অস্বীকার করেছে। ভারত উপমহাদেশে স্যার সৈয়দ আহমদ, মিসরে তাহা হুসাইন, তুর্কীতে জিয়া গোগ আলফ এ শ্রেণীর পথ প্রদর্শক ছিলেন।

وَمِنْ اَقْسَامِ الْمُنْقَطِعِ الْمُدَلَّسُ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ اللَّامِ الْمُشَدَّدَةِ وَيُقَالُ لِهٰذَا الْفِعْلِ التَّدْلِيْسُ وَلِفَاعِلِهٖ مُدَلِّسٌ بِكَسْرِ اللَّامِ وَصُوْرَتُهٗ اَنْ لَّا يُسَمِّى الرَّاوِىْ شَيْخَهُ الَّذِىْ سَمِعَهٗ مِنْهُ بَلْ يَرْوِىْ عَمَّنْ فَوْقَهٗ بِلَفْظٍ يُوْهِمُ السَّمَاعَ وَلَا يُقْطَعُ كِذْبًا كَمَا يَقُوْلُ عَنْ فُلَانٍ وَقَالَ فُلَانٌ وَالتَّدْلِيْسُ فِى اللُّغَةِ كِتْمَانُ عَيْبِ السِّلْعَةِ فِى الْبَيْعِ وَقَدْ يُقَالُ اِنَّهٗ مُشْتَقٌّ مِنَ الدَّلَسِ وَهُوَ اِخْتِلَاطُ الظَّلَامِ وَاشْتِدَادُهٗ سُمِّىَ بِهٖ لِاِشْتِرَاكِهِمَا فِى الْخَفَاءِ قَالَ الشَّيْخُ وَحُكْمُ مَنْ ثَبَتَ عَنْهُ التَّدْلِيْسُ اَنَّهٗ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ اِلَّا اِذَا صَرَّحَ بِالتَّحْدِيْثِ قَالَ الشُّمُنِّىُّ التَّدْلِيْسُ حَرَامٌ عِنْدَ الْاَئِمَّةِ رُوِىَ عَنْ وَكِيْعٍ اَنَّهٗ قَالَ لَا يَحِلُّ تَدْلِيْسُ الثَّوْبِ فَكَيْفَ بِتَدْلِيْسِ الْحَدِيْثِ وَبَالَغَ شُعْبَةُ فِىْ ذَمِّهٖ ـ

অনুবাদ : মুনকাতি' হাদীসের প্রকারসমূহের মধ্যে একটি হলো, মুদাল্লাস [মীম বর্ণে পেশ ও তাশদীদযুক্ত লাম ফাতাহ]। এ কাজটিকে বলা হয় তাদলীস, আর এটার কর্তাকে বলা হয় মুদাল্লিস (ل -এর নিচে যের)। এটার সুরত হলো, রাবী যে শায়খের নিকট হতে হাদীসটি গ্রহণ করেছেন, তাঁর নাম উল্লেখ না করে তাঁর উপরের একজন রাবীর নাম এমন ভাষায় উল্লেখ করা হয়, যা দ্বারা এ ধারণা হয় যে, সে উপরের রাবী হতে শুনেছেন কিন্তু নিশ্চিতরূপে মিথ্যার ধারণা হয় না। যেমন বলে– عَنْ فُلَانٍ اَوْ قَالَ فُلَانٌ [মুদাল্লাস শব্দটি তাদলীস মাসদার হতে উদ্ভূত]। তাদলীস (تَدْلِيْس) -এর আভিধানিক অর্থ হলো– ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মালের দোষ-ত্রুটি গোপন করা। (كِتْمَانُ الْعَيْبِ عَنِ السِّلْعَةِ)। আবার কেউ কেউ বলেছেন– এটা دَلَسٌ হতে নির্গত। যার অর্থ অন্ধকার মিশ্রিত ও প্রগাঢ় হওয়া [বর্ণনাকারী যেহেতু নিজের ঊর্ধ্বতন বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করেনি, সেহেতু] এতে অস্পষ্টতা আসার কারণে [উক্ত বর্ণনাটিকে মুদাল্লাস (مُدَلَّسْ) এবং বর্ণনাকারীকে মুদাল্লিস (مُدَلِّسْ) বলা হয়ে থাকে।] এ নামে নামকরণ করা হয়েছে।

শায়খ [হাফেয আবুল ফযল আহমদ ইবনে আলী বলেন, যার এরূপ তাদলীসকরণ প্রমাণ হবে, তার নিকট হতে হাদীস গ্রহণ করা যাবে না। কিন্তু হাদীস বর্ণনা দ্বারা যদি তা স্পষ্ট করে দেয়, তবে তা গ্রহণ করা যাবে। হযরত ইমাম শুমুন্নী (র.) বলেন, আইম্মাদের নিকট তাদলীস হারাম। ওকী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'তাদলীসে ছাওব' যেহেতু জায়েজ নেই, তাহলে কিভাবে 'তাদলীসে হাদীস' জায়েজ হতে পারে? শো'বা ইবনে হাজ্জাজ এটার তীব্র নিন্দা করেছেন।

শাব্দিক অনুবাদ : وَمِنْ اَقْسَامِ الْمُنْقَطِعِ الْمُدَلَّسُ আর মুনকাতি' হাদীসের প্রকারসমূহের মধ্যে একটি হলো মুদাল্লাস بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ اللَّامِ الْمُشَدَّدَةِ এটা হবে মীমের উপর পেশ যোগে এবং লামের উপর তাশদীদযুক্ত যবর দ্বারা وَيُقَالُ لِهٰذَا الْفِعْلِ আর এ কাজকে বলা হয় التَّدْلِيْسُ তাদলীস وَلِفَاعِلِهٖ مُدَلِّسٌ আর এটার কর্তাকে বলে মুদাল্লিস بِكَسْرِ اللَّامِ লামের নিচে যের দিয়ে وَصُوْرَتُهٗ এর সুরত হলো اَنْ لَّا يُسَمِّى الرَّاوِىْ شَيْخَهٗ বর্ণনাকারী তার শায়খের নাম উল্লেখ না করে الَّذِىْ سَمِعَ مِنْهُ যার থেকে সে শুনেছে بَلْ يَرْوِىْ عَمَّنْ فَوْقَهٗ বরং সে তার উপরের বর্ণনাকারী হতে বর্ণনা করে بِلَفْظٍ এমন

শব্দ দ্বারা يُوْهِمُ السَّمَاعَ যার ফলে এ ধারণা হয় যে, সে উপরের রাবী হতে শুনেছে وَلاَ يَقْطَعُ كِذْبًا কিন্তু নিশ্চিতভাবে মিথ্যার ধারণা করা যায় না كَمَا يَقُوْلُ যেমন বলে عَنْ فُلاَنٍ وَقَالَ فُلاَنٌ অমুক হতে বা অমুকে বর্ণনা করেছেন وَالتَّدْلِيْسُ فِى اللُّغَةِ তাদলীস শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো كِتْمَانُ عَيْبِ السِّلْعَةِ فِى الْبَيْعِ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মালের দোষ-ত্রুটি গোপন করা وَقَدْ يُقَالُ আর কেউ বলেছেন أَنَّهٗ مُشْتَقٌّ مِنَ الدَّلَسِ তা دَلَس হতে নির্গত وَهُوَ إِخْتِلاَطُ الظَّلاَمِ যার অর্থ হলো– অন্ধকার মিশ্রিত হওয়া وَاشْتِدَادُهٗ এবং তা প্রগাঢ় হওয়া سُمِّىَ بِهٖ একে এ নামে নামকরণ করা হয়েছে لِإِشْتِرَاكِهِمَا فِى الْخَفَاءِ অস্পষ্টতা এ উভয়ে একত্রিত হওয়ার ফলে قَالَ الشَّيْخُ শায়খ বলেন وَحُكْمُ مَنْ ثَبَتَ عَنْهُ التَّدْلِيْسُ যে রাবী হতে তাদলীস করা প্রমাণ হবে أَنَّهٗ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ তার নিকট হতে হাদীস গ্রহণ করা যাবে না إِلاَّ إِذَا صَرَّحَ بِالتَّحْدِيْثِ তবে যদি হাদীস বর্ণনা করা ছাড়া তা স্পষ্ট করে দেয় قَالَ الشُّمُنِّىْ ইমাম শুমুন্নী (র.) বলেন التَّدْلِيْسُ حَرَامٌ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ ইমামদের নিকট তাদলীস হারাম رُوِىَ عَنْ وَكِيْعٍ أَنَّهٗ قَالَ ইমাম ওকী (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন لاَ يَحِلُّ تَدْلِيْسُ الثَّوْبِ তাদলীসে ছাওব জায়েজ নয় فَكَيْفَ بِتَدْلِيْسِ الْحَدِيْثِ তাদলীসে হাদীস কিভাবে জায়েজ হতে পারে وَبَالَغَ شُعْبَةُ فِىْ ذَمِّهٖ আর ইমাম শো'বা এর তীব্র নিন্দা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَالتَّدْلِيْسُ الخ -এর আলোচনা :

مَعْنَى التَّدْلِيْسِ لُغَةً **[তাদলীসের আভিধানিক অর্থ]** : اَلتَّدْلِيْسُ শব্দটি دَلْس মূলধাতু হতে নির্গত, যার অর্থ হলো– অন্ধকার বা অন্ধকার মিশ্রিত হওয়া। আর تَدْلِيْس -এর অর্থ হলো كِتْمَانُ عَيْبِ السِّلْعَةِ عَنِ الْمُشْتَرِىْ ক্রেতার নিকট হতে পণ্যের দোষ-ত্রুটি গোপন করা।

مَعْنَى التَّدْلِيْسِ إِصْطِلاَحًا **[তাদলীসের পারিভাষিক অর্থ]** : هُوَ أَنْ لاَّ يَذْكُرَ الرَّاوِىْ شَيْخَهٗ بَلْ يَرْوِىْ عَنْ فَوْقِهٖ بِلَفْظٍ يُوْهِمُ السَّمَاعَ وَلاَ يَقْطَعُ كِذْبًا অর্থাৎ বর্ণনাকারী যে শায়খ হতে হাদীস শুনেছে তাঁর নাম উল্লেখ না করে এর উপরের কোনো শায়খের নাম উল্লেখ করে এমন ভাষায় বর্ণনা করা যার ফলে উল্লিখিত শায়খ হতে হাদীস শুনার ধারণা সৃষ্টি হয় এতে নিশ্চিত মিথ্যার ধারণাও করা যায় না।

এ ধরনের বর্ণনাকারীকে مُدَلِّسْ আর হাদীসকে مُدَلَّسْ বলা হয়।

ড. মাহমূদ তাহ্হানের ভাষায়– إِخْفَاءُ عَيْبٍ فِى الْإِسْنَادِ وَتَحْسِيْنٌ لِظَاهِرِهٖ

উদাহরণ : مَا أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ بِسَنَدِهٖ إِلَى عَلِيِّ بْنِ خَشْرَمٍ قَالَ قَالَ لَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ

তখন ইবনে উয়াইনাকে বলা হলো যে, আপনি কি اَلزُّهْرِىّ থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন, না। এমনকি اَلزُّهْرِىّ -এর নিকট থেকে যিনি শুনেছেন তার নামও উল্লেখ করেননি। মূল সনদটি হলো– حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ এখানে اِبْنُ عُيَيْنَةَ যুহ্‌রী ও তার সাথের দু'জনকে পরিত্যাগ করেছেন।

وَجْهُ تَسْمِيَةِ التَّدْلِيْسِ **[তাদলীস নামকরণের কারণ]** :

فَكَأَنَّ الْمُدَلِّسَ لِتَغْطِيَتِهٖ عَلَى الْوَاقِفِ عَلَى الْحَدِيْثِ أَظْلَمَ أَمْرَهٗ فَصَارَ الْحَدِيْثُ مُدَلَّسًا ـ

মুদাল্লাস হাদীসে রাবী স্বীয় শায়খের নাম গোপন রাখেন যা অন্ধকার সমতুল্য এ কারণে তাকে مُدَلَّسْ করে নাম করণ করা হয়েছে।

أَقْسَامُ التَّدْلِيْسِ **[তাদলীসের প্রকারভেদ]** : তাদলীস মোট তিন প্রকার। যেমন–

১. تَدْلِيْسُ الشُّيُوْخِ ২. تَدْلِيْسُ الْإِسْنَادِ ৩. تَدْلِيْسُ التَّسْوِيَةِ

تَعْرِيْفُ تَدْلِيْسِ الشُّيُوْخِ [শায়খের ক্ষেত্রে তাদলীসের সংজ্ঞা] : তাদলীসে শুয়ূখ-এর সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) ও জুমহুরে মুহাদ্দেসীন বলেন, "শায়খ যে নাম বা কুনিয়াত দ্বারা পরিচিত ও বিখ্যাত তা বাদ দিয়ে অন্য অপ্রসিদ্ধ নাম বা কুনিয়তের মাধ্যমে شَيْخ -কে উল্লেখ করা।" যেমন–

قَوْلُ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُجَاهِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ لَا يُرِيْدُ بِهٖ اَبَا بَكْرِ بْنِ اَبِىْ دَاوُدَ السِّجِسْتَانِىْ–

تَعْرِيْفُ تَدْلِيْسِ الْاِسْنَادِ [সনদের ক্ষেত্রে তাদলীসের সংজ্ঞা] : তাদলীসে اِسْنَادْ-এর সংজ্ঞা প্রদানে জুমহুর মুহাদ্দেসীন বলেন– "রাবী কর্তৃক তার সমকালীন ব্যক্তি অথবা যার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে এমন ব্যক্তি থেকে এ ধরনের রেওয়ায়েত করা, যা সে উক্ত ব্যক্তি হতে শুনেনি। এরপরেও এমন শব্দ ব্যবহার করে, যাতে সে হাদীসটি তার কাছ থেকেই শুনেছে বলে মনে হয়। যেমন– রাবীর কথা عَنْ فُلَانٍ অথবা قَالَ فُلَانٌ। অথবা, এমন কোনো শব্দ ব্যবহার করল যাতে স্পষ্টভাবে তার سِمَاعٌ তথা শ্রবণ বুঝা যায় না; কিন্তু سِمَاعٌ-এর দিকে ইঙ্গিত প্রদান করে। উক্ত রাবীকে বলা হয় مُدَلِّسٌ فِى الْاِسْنَادِ। আর হাদীসকে বলা হয় مُدَلَّسٌ।

تَعْرِيْفُ تَدْلِيْسِ التَّسْوِيَةِ [তাদলীসে তাসবিয়ার সংজ্ঞা] : যাতে মুদাল্লিস আপন مَرْوِىْ عَنْهُ -কে বাদ দেয় না এবং দুর্বলতা বা অল্প বয়স্কের কারণে তার উপরের রাবীকে বাদ দেয়। উদ্দেশ্য এই থাকে যে, হাদীসটি যেন দোষমুক্ত থাকে। যেমন– بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ -এর কিছু বর্ণনা।

قَوْلُهٗ قَالَ الشَّيْخُ الخ : শায়খ দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হাফিয আবুল ফযল আহমদ ইবনে আলী।

قَوْلُهٗ اِذَا صَرَّحَ بِالتَّحْدِيْثِ : হাদীস বর্ণনা স্পষ্ট করে। অর্থাৎ যদি سَمِعْتُ . حَدَّثَنَا . اَنْبَانَا . اَخْبَرَنَا ইত্যাদি দ্বারা হাদীস বর্ণনা করে।

قَوْلُهٗ قَالَ الشُّمُنِّىْ الخ : অর্থাৎ আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ আবুল আব্বাস তাকীউদ্দীন আশ-শুমুন্নী (র.) [মৃত্যু ৮৭২ হিজরি]। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র.) তাঁর হিফযে হাদীস সম্পর্কে প্রশংসা করেছেন। তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর কথা দ্বারা ফতোয়া দিতেন।

قَوْلُهٗ وَكِيْع : ওকী ইবনে জারাহাল কূফী। তিনি ১৯৭ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র.) তাঁর হিফযে হাদীস সম্পর্কে প্রশংসা করেছেন। তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর কথা দ্বারা ফতোয়া দিতেন।

قَوْلُهٗ شُعْبَةُ : শো'বা ইবনে হাজ্জাজ ইবনে ওয়ারদ। তিনি ১৬০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তিনি হযরত আনাস (রা.) ও হযরত আমর ইবনে মুসলিম (রা.) এ দুজন সাহাবীকে দেখতে পেয়েছেন। এ কারণে তিনি তাবেয়ী পর্যায়ে হলেও জীবনী লেখকগণ তাঁকে তাবে' তাবেয়ীদের মধ্যে গণ্য করেছেন।

وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِىْ قَبُوْلِ رِوَايَةِ الْمُدَلِّسِ فَذَهَبَ فَرِيْقٌ مِنْ اَهْلِ الْحَدِيْثِ وَالْفِقْهِ اِلٰى اَنَّ التَّدْلِيْسَ جَرْحٌ وَاِنَّ مَنْ عُرِفَ بِهٖ لاَ يُقْبَلُ حَدِيْثُهٗ مُطْلَقًا وَقِيْلَ يُقْبَلُ وَ ذَهَبَ الْجَمْهُوْرُ اِلٰى قَبُوْلِ تَدْلِيْسِ مَنْ عُرِفَ اَنَّهٗ لاَ يُدَلِّسُ اِلاَّ عَنْ ثِقَةٍ كَابْنِ عُيَيْنَةَ وَاِلٰى رَدِّ مَنْ كَانَ يُدَلِّسُ عَنِ الضُّعَفَاءِ وَغَيْرِهِمْ حَتّٰى يَنُصَّ عَلٰى سِمَاعِهٖ بِقَوْلِهٖ سَمِعْتُ اَوْ حَدَّثَنَا اَوْ اَخْبَرَنَا وَالْبَاعِثُ عَلَى التَّدْلِيْسِ قَدْ يَكُوْنُ لِبَعْضِ النَّاسِ غَرْضٌ فَاسِدٌ مِثْلُ اِخْفَاءِ السَّمَاعِ مِنَ الشَّيْخِ لِصِغَرِ سِنِّهٖ اَوْعَدَمِ شُهْرَتِهٖ وَجَاهِهٖ عِنْدَ النَّاسِ وَالَّذِىْ وَقَعَ مِنْ بَعْضِ الْاَكَابِرِ لَيْسَ لِمِثْلِ هٰذَا بَلْ مِنْ جِهَةِ وُثُوْقِهِمْ لِصِحَّةِ الْحَدِيْثِ وَاسْتِغْنَاءٍ بِشُهْرَةِ الْحَالِ ـ

অনুবাদ : তাদলীস বর্ণনাকারীর হাদীস গ্রহণ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আহলে হাদীস ও ফিক্‌হবিদদের একটি দলের মতে তাদলীস দূষণীয়। অতএব, যে ব্যক্তি সম্পর্কে জানা যায় যে, সে তাদলীস করে তার হাদীস সাধারণভাবেই গ্রহণ করা যাবে না। তাদের কেউ বলেন, এটা গ্রহণযোগ্য। আর জুমহুরের অভিমত হলো, কোনো ব্যক্তি যদি বিশ্বস্ত লোক ব্যতীত অন্য কারো ব্যাপারে তাদলীস না করায় পরিচিত হয়; কেবল তখনই তার হাদীস গ্রহণীয় হবে। যেমন– ইবনে উয়াইনাহ। আর যারা দ্বা'ঈফ (ضَعِيْف) এবং দ্বা'ঈফ নয় (غَيْر ضَعِيْف) সব রকমের লোকদের ক্ষেত্রে তাদলীস করেন তাদের হাদীস প্রত্যাখ্যাত হবে। অবশ্য 'আমি শুনেছি' বা 'আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, বা 'আমাকে খবর দেওয়া হয়েছে', ইত্যাদি দ্বারা স্পষ্ট করে দেওয়া হয় তখন তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে। কতেক লোক তাদের হীন উদ্দেশ্যে তাদলীসকরণে উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকেন। যেমন– স্বীয় শায়খ অল্প বয়স্ক হওয়ার কারণে অথবা জনগণের মধ্যে তার পরিচিতি, নামকাম ও যশ-খ্যাতি না থাকার দরুন নিজে শ্রবণ করার বিষয়টি গোপন করেন। তবে কতেক শীর্ষস্থানীয় বুজুর্গান হতে যে হাদীস তাদলীসকরণের প্রমাণ বিদ্যমান তারা হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থের জন্য করতেন না, বরং তারা হাদীস সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে পূর্ণরূপে আস্থাবান ও সন্দেহমুক্ত থাকার ভিত্তিতে করতেন। কোনোরূপ নাম কাম ও খ্যাতি লাভ করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না।

শাব্দিক অনুবাদ : وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ আর ওলামাগণ মতভেদ করেছেন فِىْ قَبُوْلِ رِوَايَةِ الْمُدَلِّسِ তাদলীস বর্ণনাকারীদের হাদীস গ্রহণ করার ব্যাপারে فَذَهَبَ فَرِيْقٌ مِنْ اَهْلِ الْحَدِيْثِ وَالْفِقْهِ হাদীস বিশারদ ও ফিক্‌হবিদদের একদলের মতে اِلٰى اَنَّ التَّدْلِيْسَ جَرْحٌ তাদলীস দূষণীয় وَاِنَّ مَنْ عُرِفَ بِهٖ অতএব যার থেকে জানা গেল যে, সে তাদলীস করেছে لاَ يُقْبَلُ حَدِيْثُهٗ مُطْلَقًا তার হাদীস সাধারণভাবে গ্রহণ করা যাবে না وَقِيْلَ يُقْبَلُ কেউ বলেন গ্রহণ করা যাবে وَ ذَهَبَ الْجَمْهُوْرُ আর জুমহুর ওলামাগণ এই মতে গেলেন যে اِلٰى قَبُوْلِ تَدْلِيْسِ তাদলীস গ্রহণ করার ব্যাপারে مَنْ عُرِفَ اَنَّهٗ لاَ يُدَلِّسُ اِلاَّ عَنْ ثِقَةٍ যে ব্যক্তি সম্পর্কে জানা গেল যে সে বিশ্বস্ত লোক ব্যতীত অন্য কারো ব্যাপারে তাদলীস করে না كَابْنِ عُيَيْنَةَ যেমন– ইবনে উয়াইনাহ وَاِلٰى رَدِّ এবং পরিত্যাগ করার ব্যাপারে مَنْ كَانَ يُدَلِّسُ যে তাদলীস করে عَنِ الضُّعَفَاءِ

وَغَيْرِهِمْ দ্বা'ঈফ এবং গায়রে দ্বা'ঈফ সব রকম লোকের থেকে حَتَّى يَنُصَّ عَلَى سِمَاعِهِ এমনকি যে তার শুনার ব্যাপারে স্পষ্ট করে بِقَوْلِهِ তার এ কথা দ্বারা سَمِعْتُ اَوْ حَدَّثَنَا اَوْ اَخْبَرَنَا আমি শুনেছি, আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন অথবা আমাদের সংবাদ দিয়েছেন وَالْبَاعِثُ عَلَى التَّدْلِيْسِ আর তাসলীসকরণের কারণ হলো قَدْ يَكُوْنُ لِبَعْضِ النَّاسِ غَرْضٌ فَاسِدٌ কখনো হয়ে থাকে কিছুসংখ্যক লোকের হীন উদ্দেশ্য مِثْلُ اِخْفَاءِ السَّمَاعِ مِنَ الشَّيْخِ যেমন– শায়খ হতে শ্রবণ করার বিষয়টি গোপন রাখে لِصِغَرِ سِنِّهِ শায়খ অল্প বয়স্ক হওয়ার কারণে اَوْ عَدَمِ شُهْرَتِهِ وَجَاهِهِ অথবা তার প্রসিদ্ধি ও যশ-খ্যাতি না থাকার কারণে عِنْدَ النَّاسِ মানুষের নিকট وَالَّذِىْ وَقَعَ مِنْ بَعْضِ الْاَكَابِرِ তবে শীর্ষস্থানীয় কিছু বুজুর্গ হতে যে তাদলীসকরণ বিদ্যমান। لَيْسَ لِمِثْلِ هٰذَا তা ঐরূপ নয় بَلْ لِثِّجَهَةٍ وُثُوْقِهِمْ বরং পূর্ণ আস্থাবান থাকার কারণে لِصِحَّةِ الْحَدِيْثِ হাদীসের বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে وَاسْتِغْنَاءِ بِشُهْرَةِ الْحَالِ এবং যশ-খ্যাতি হতে মুখাপেক্ষীহীন থাকার ফলে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِىْ قَبُوْلِ رِوَايَةِ الْمُدَلِّسِ : মুদাল্লাস হাদীস গ্রহণযোগ্য কিনা এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে, নামবে যা নিম্নরূপ–

ফিক্হশাস্ত্রবিদগণ ও মুহাদ্দিসগণের মতে 'হাদীসে মুদাল্লাস' গ্রহণীয়। জুমহুর ওলামাগণের মতে বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী দ্বারা তাদলীস হলে তা গ্রহণীয় হবে, অর্থাৎ বর্ণনাকারী 'ছিকাহ' বলে পরিচিত থাকলে তার তাদলীসকৃত হাদীস গ্রহণযোগ্য। যেমন– বসরী, সুফিয়ান ছাওরী ও ইমাম ওয়াইনাহ প্রমুখের তাদলীসকৃত হাদীস গ্রহণযোগ্য।

আর যে মুদাল্লিস দ্বা'ঈফ ও গায়রে দ্বা'ঈফ সর্বশ্রেণীর বর্ণনাকারীর ক্ষেত্রে তাদলীস করে থাকেন তার তাদলীসকৃত হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে না, তবে حَدَّثَنَا – اَخْبَرَنَا অথবা سَمِعْتُ ইত্যাদি বলে স্পষ্ট করে দিলে গ্রহণযোগ্য হবে।

মোটকথা, পরিচিত ও খ্যাতনামা মুহাদ্দিসগণের তাদলীস ছাড়া সব তাদলীসই পরিত্যাজ্য। যেহেতু তাদের হাদীস বিশুদ্ধ হওয়ার উপর পূর্ণ ধারণা ও বিশ্বাস আছে। হাদীসের বিশুদ্ধতার সম্পর্কে তাদের পরিপূর্ণ জ্ঞান, সম্যক ধারণা থাকায় এবং তারা খ্যাতনামা হওয়ায় তাদের শায়খের নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় না। ইমাম শুমুন্নী (র.) এর সমর্থনে বলেন, খ্যাতনামা মুহাদ্দিসগণের তাদলীস গ্রহণযোগ্য।

ইমাম শো'বা (র.)-এর খুব নিন্দাবাদ করেছেন, এমনকি তিনি বলেছেন– اَلتَّدْلِيْسُ اَخُو الْكِذْبِ

ইমাম ওকী (র.) বলেন– لَا يَحِلُّ تَدْلِيْسُ الثَّوْبِ فَكَيْفَ تَدْلِيْسُ الْحَدِيْثِ

শুমুন্নী (র.) বলেন– اَلتَّدْلِيْسُ حَرَامٌ عِنْدَ الْاَئِمَّةِ

শায়খ হাফিজ আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে আলী (র.) বলেন–

مَنْ ثَبَتَ عَنْهُ التَّدْلِيْسُ اَنَّهُ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ اِلَّا اِذَا صَرَّحَ بِالتَّحْدِيْثِ

قَالَ الشُّمُنِّيُّ يَحْتَمِلُ اَنْ يَكُوْنَ قَدْ سَمِعَ الْحَدِيْثَ مِنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الثِّقَاتِ وَعَنْ ذٰلِكَ الرَّجُلِ فَاسْتَغْنٰى بِذِكْرِهِ عَنْ ذِكْرِ اَحَدِهِمْ اَوْ ذِكْرِ جَمِيْعِهِمْ لِتَحَقُّقِهِ بِصِحَّةِ الْحَدِيْثِ فِيْهِ كَمَا يَفْعَلُ الْمُرْسِلُ وَاِنْ وَقَعَ فِيْ اِسْنَادٍ اَوْ مَتْنٍ اِخْتِلَافٌ مِنَ الرُّوَاةِ بِتَقْدِيْمٍ وَتَاخِيْرٍ اَوْ زِيَادَةٍ وَنُقْصَانٍ اَوْ اِبْدَالِ رَاوٍ مَكَانَ رَاوٍ اٰخَرَ اَوْ مَتْنٍ مَكَانَ مَتْنٍ اَوْ تَصْحِيْفٍ فِيْ اَسْمَاءِ السَّنَدِ اَوْ اَجْزَاءِ الْمَتْنِ اَوْ بِاخْتِصَارٍ اَوْ حَذْفٍ اَوْ مِثْلِ ذٰلِكَ فَالْحَدِيْثُ مُضْطَرِبٌ فَاِنْ اَمْكَنَ الْجَمْعُ فَبِهَا وَاِلَّا فَالتَّوَقُّفُ وَاِنْ اَدْرَجَ الرَّاوِيْ كَلَامَهُ اَوْ كَلَامَ غَيْرِهِ مِنْ صَحَابِيٍّ اَوْ تَابِعِيٍّ مَثَلًا لِغَرَضٍ مِنَ الْاَغْرَاضِ كَبَيَانِ اللُّغَةِ اَوْ تَفْسِيْرٍ لِلْمَعْنٰى اَوْ تَقْيِيْدٍ لِلْمُطْلَقِ اَوْ نَحْوِ ذٰلِكَ فَالْحَدِيْثُ مُدْرَجٌ ـ

অনুবাদ : আল্লামা শুমুন্নী (র.) বলেন, একদল বিশ্বস্ত রাবী হতে হাদীস শোনার সম্ভাবনা আছে এবং উক্ত ব্যক্তি হতেও শুনেছেন এ কারণেই যাদের হাদীস শুনেছেন তাদের কোনো একজন বা সকলের নাম উল্লেখ করাকে প্রয়োজন মনে করেননি। কারণ, হাদীসটি শুদ্ধ হওয়ার বিষয়টি তাদের নিকট প্রমাণিত ছিল। যেমন– হাদীসে মুরসালের ক্ষেত্রে করা হয়।

আর যদি হাদীসে সনদ বা মতন বর্ণনায় রাবীদের মতান্তর আগ-পর বা কমবেশির কারণে হয় বা এক রাবীর স্থলে অপর রাবী বর্ণনা করা কিংবা এক মতনের স্থলে অপর মতন করা হয়। অথবা সনদের নাম কিংবা মতনের কোনো অংশসমূহে তাসহীফ হয় অথবা সংক্ষেপ হয় বা লুপ্ত হয় কিংবা অনুরূপ অন্য কিছু হয়, তখন সেই হাদীসকে হাদীসে মুদ্বত্বারিব (حَدِيْث مُضْطَرِبٌ) বলা হয়। [এর হুকুম হলো] কোনো দিক দিয়ে এতে সামঞ্জস্যতা বিধান সম্ভব হলে হাদীসটি গ্রহণীয় হবে। নচেৎ তাওয়াক্কুফ বা নীরবতা অবলম্বন করতে হবে।

আর যদি রাবী তার নিজের কিংবা কোনো সাহাবী বা তাবেয়ীর উক্তি ইদরাজ [এক বস্তুর মধ্যে অন্য বস্তু ঢুকানো] করেছেন। যেমন– সাহাবী বা তাবেয়ীর কথা বর্ণনায় অথবা কোনো অর্থের বিশ্লেষণ করণে কিংবা মুতলাককে মুকাইয়াদকরণের উদ্দেশ্যে কিংবা এমনিভাবে কোনো [কথা লিপিবদ্ধভাবে বর্ণনা করে] কিছু তবে সে হাদীসকে মুদরাজ বলা হয়।

শাব্দিক অনুবাদ : قَالَ الشُّمُنِّيُّ ইমাম শুমুন্নী (র.) বলেন يَحْتَمِلُ اَنْ يَكُوْنَ এটা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যে, قَدْ سَمِعَ الْحَدِيْثَ তিনি হাদীস শুনেছেন مِنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الثِّقَاتِ একদল বিশ্বস্ত রাবী হতে وَعَنْ ذٰلِكَ الرَّجُلِ এবং উক্ত ব্যক্তি হতেও শুনেছেন فَاسْتَغْنٰى بِذِكْرِهِ ফলে তিনি উক্ত লোকের নাম উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করেছেন عَنْ ذِكْرِ اَحَدِهِمْ اَوْ ذِكْرِ جَمِيْعِهِمْ কোনো একজন অথবা সকলের নাম উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করেননি لِتَحَقُّقِهِ بِصِحَّةِ الْحَدِيْثِ فِيْهِ কেননা, হাদীসটি শুদ্ধ হওয়ার বিষয়টি তার নিকট প্রমাণিত ছিল كَمَا يَفْعَلُ الْمُرْسِلُ যেমনি হাদীসে মুরসালের ক্ষেত্রে করা হয়ে থাকে وَاِنْ وَقَعَ فِيْ اِسْنَادٍ اَوْ مَتْنٍ যদি সনদ ও মতনের মধ্যে হয়ে থাকে اِخْتِلَافٌ مِنَ الرُّوَاةِ রাবীদের মধ্যে মতান্তর بِتَقْدِيْمٍ وَتَاخِيْرٍ পূর্বাপরের ফলে اَوْ زِيَادَةٍ وَنُقْصَانٍ অথবা কমবেশির ফলে اَوْ اِبْدَالِ رَاوٍ مَكَانَ رَاوٍ اٰخَرَ অথবা এক রাবীর স্থলে অপর রাবীর পরিবর্তনের কারণে اَوْ مَتْنٍ مَكَانَ مَتْنٍ অথবা এক মতনের স্থলে অপর মতন হয় اَوْ تَصْحِيْفٍ فِيْ

বা اَوْ بِاخْتِصَارِ اَسْمَاءِ السَّنَدِ কিংবা সনদের নামসমূহের মধ্যে তাসহীফ হয় اَوْ اَجْزَاءِ الْمَتْنِ বা মতনের কোনো অংশে সংক্ষেপ হয় اَوْ حَذْفٍ বা লুপ্ত হয় اَوْ مِثْلِ ذٰلِكَ অথবা অনুরূপ অন্য কিছু হয় فَالْحَدِيْثُ مُضْطَرِبٌ তখন উক্ত হাদীসকে হাদীসে মুদ্বত্বারিব বলা হবে فَاِنْ اَمْكَنَ الْجَمْعُ فَبِهَا এর মধ্যে যদি সামঞ্জস্যতা বিধান সম্ভব হয় তবে তা গ্রহণীয় وَاِلَّا فَالتَّوَقُّفُ অন্যথায় তাতে নীরবতা অবলম্বন করতে হবে وَاِنْ اَدْرَجَ الرَّاوِيْ আর যদি বর্ণনাকারী হাদীসের মধ্যে প্রবেশ করায় كَلَامَهُ اَوْ كَلَامَ غَيْرِهِ তার কথা বা অন্য কারো কথা مِنْ صَحَابِيٍّ اَوْ تَابِعِيٍّ কোনো সাহাবী বা তাবেয়ীর مَثَلًا لِغَرَضٍ مِنَ الْاَغْرَاضِ উদাহরণত কোনো উদ্দেশ্যে كَبَيَانِ اللُّغَةِ যেমন কোনো অর্থের বিশ্লেষণের اَوْ تَفْسِيْرٍ لِلْمَعْنٰى অথবা কোনো অর্থের ব্যাখ্যায় اَوْ تَقْيِيْدٍ لِلْمُطْلَقِ কিংবা মুতলাককে মুকাইয়্যাদকরণের উদ্দেশ্যে اَوْ نَحْوِ ذٰلِكَ অথবা অনুরূপ কিছু فَالْحَدِيْثُ مُدْرَجٌ তখন উক্ত হাদীসকে মুদরাজ বলা হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَعْنَى الْمُضْطَرِبِ لُغَةً [মুদ্বত্বারিবের আভিধানিক অর্থ] : اَلْمُضْطَرِبُ শব্দটি اِسْمُ فَاعِلٍ -এর সীগাহ। শাব্দিক অর্থ হলো– اِخْتِلَالُ الْاَمْرِ وَفَسَادُ نِظَامِهِ অর্থাৎ কোনো বিষয়ে বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া।

مَعْنَى الْمُضْطَرِبِ اِصْطِلَاحًا [মুদ্বত্বারিবের পারিভাষিক অর্থ] : পারিভাষিক পরিচয় হলো– যে হাদীসের সনদে রাবীর পূর্বাপর হওয়া বা এক রাবীর স্থলে অপর রাবী উল্লেখ হওয়া অথবা মতনের মধ্যে কমবেশি, এক মতনের স্থলে অপর মতন সংক্ষেপকরণ বা বিলুপ্তকরণ ইত্যাদি কারণ দেখা দেয়, তাকে হাদীসে مُضْطَرِبٌ বলে।

ইমাম নববী (র.) বলেন– اَلْمُضْطَرِبُ هُوَ الَّذِيْ يَرْوِيْ عَلٰى اَوْجُهٍ مُخْتَلِفَةٍ مُتَقَارِبَةٍ

ড. মাহমূদ আত–ত্বাহহান বলেন– مَا رُوِيَ عَلٰى اَوْجُهٍ مُخْتَلِفَةٍ مُتَسَاوِيَةٍ فِى الْقُوَّةِ

যেমন– حَدِيْثُ اَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَرَاكَ شِبْتَ قَالَ شَيَّبَتْنِيْ هُوْدٌ وَاَخَوَاتُهَا

উক্ত সনদের মধ্যে প্রায় দশ রকমের মতান্তর রয়েছে। এটা হলো مُضْطَرِبٌ سَنَدٌ -এর উদাহরণ। আর مُضْطَرِبٌ مَتَنٌ -এর উদাহরণ হলো قُلَّتَيْنِ -এর হাদীস। এতে কোথাও ثَلَاثُ قُلَلٍ আর কোথাও اَرْبَعُ قُلَلٍ ইত্যাদি বর্ণনা দেখা যায়।

اَقْسَامُ الْمُضْطَرِبِ [মুদ্বত্বারিবের প্রকারভেদ] :

মুদ্বত্বারিব দুই প্রকার : ১. مُضْطَرِبُ السَّنَدِ ২. مُضْطَرِبُ الْمَتَنِ

হাদীসে ইযতিরাব সংঘটিত হওয়া, রাবীর স্মরণশক্তির দুর্বলতা নির্দেশ করে। তাই মুযতারিব হাদীস পরস্পর মিলানো সম্ভব না হলে তা ضَعِيْفٌ রূপে পরিগণিত হবে।

مَعْنَى الْمُدْرَجِ لُغَةً [মুদরাজের আভিধানিক অর্থ] : مُدْرَجٌ শব্দটি اِسْمُ مَفْعُوْلٍ -এর সীগাহ। শাব্দিক অর্থ হলো –প্রবেশ করানো।

مَعْنَى الْمُدْرَجِ اِصْطِلَاحًا [মুদরাজের পারিভাষিক অর্থ] : পারিভাষিক পরিচয় হলো, যে হাদীসের সনদ বা মতনে অতিরিক্ত কোনো কথা প্রবেশ করানো।

ড. মাহমূদ আত্‌-ত্বাহান বলেন– مَا غُيِّرَ سِيَاقُ اِسْنَادِهٖ اَوْ اُدْخِلَ فِيْ مَتْنِهٖ مَا لَيْسَ مِنْهُ بِلَا فَصْلٍ

উদাহরণ : حَدِيْثُ عَائِشَةَ فِيْ بَدْءِ الْوَحْيِ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَحَنَّثُ فِيْ غَارِ حِرَاءٍ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيْ ذَوَاتِ الْعَدَدِ

এখানে وَهُوَ التَّعَبُّدُ অংশটি যুহরীর মুদরাজ।

اَقْسَامُ الْمُدْرَجِ [মুদরাজের প্রকারভেদ] :

মুদরাজ দুই প্রকার– ১. مُدْرَجُ الْاِسْنَادِ ২. مُدْرَجُ الْمَتْنِ

فَصْلٌ تَنْبِيْهٌ وَهٰذَا الْمَبْحَثُ يَنْجَرُّ اِلٰى رِوَايَةِ الْحَدِيْثِ وَنَقْلِهٖ بِالْمَعْنٰى وَفِيْهِ اِخْتِلَافٌ فَالْاَكْثَرُوْنَ عَلٰى اَنَّهٗ جَائِزٌ مِمَّنْ هُوَ عَالِمٌ بِالْعَرَبِيَّةِ وَمَاهِرٌ فِىْ اَسَالِيْبِ الْكَلَامِ وَعَارِفٌ بِخَوَاصِّ التَّرَاكِيْبِ وَمَفْهُوْمَاتِ الْخِطَابِ لِئَلَّا يُخْطِئَ بِزِيَادَةٍ وَنُقْصَانٍ وَقِيْلَ جَائِزٌ فِىْ مُفْرَدَاتِ الْاَلْفَاظِ دُوْنَ الْمُرَكَّبَاتِ وَقِيْلَ جَائِزٌ لِمَنْ اِسْتَحْضَرَ اَلْفَاظَهٗ حَتّٰى يَتَمَكَّنَ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيْهِ وَقِيْلَ جَائِزٌ لِمَنْ يَحْفَظُ مَعَانِىَ الْحَدِيْثِ وَنَسِىَ اَلْفَاظَهَا لِلضَّرُوْرَةِ فِىْ تَحْصِيْلِ الْاَحْكَامِ وَاَمَّا مَنِ اسْتَحْضَرَ الْاَلْفَاظَ فَلَا يَجُوْزُ لَهٗ لِعَدَمِ الضَّرُوْرَةِ وَهٰذَا الْخِلَافُ فِى الْجَوَازِ وَعَدَمِهٖ اَمَّا اَوْلَوِيَّةُ رِوَايَةِ اللَّفْظِ مِنْ غَيْرِ تَصَرُّفٍ فِيْهَا فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ لِقَوْلِهٖ ﷺ "نَضَّرَ اللّٰهُ اِمْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِىْ فَوَعَاهَا فَاَدَّاهَا كَمَا سَمِعَ الْحَدِيْثَ" وَالنَّقْلُ بِالْمَعْنٰى وَاقِعٌ فِى الْكُتُبِ السِّتَّةِ وَغَيْرِهَا ـ

অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : জ্ঞাতব্য– আমাদের উপরোল্লিখিত আলোচনা হতে মর্মগতরূপে হাদীস বর্ণনায় [রিওয়ায়াত বিল-মা'নায়] আলোচনা সৃষ্টি হয়।

মুহাদ্দিসগণের নিকট এ ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মত হলো, অর্থগত বর্ণনা শুধু ঐ সমস্ত লোকের জন্য জায়েজ, যারা আরবি ভাষা এবং বাক্য বিন্যাসের নিয়ম-পদ্ধতি সম্পর্কে পুরোপুরি অভিজ্ঞ। আর তারতীবের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত এবং ভাষণের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত আছেন। [কেননা বর্ণনাকারীর মধ্যে যদি উল্লিখিত গুণাবলি না থাকে, তাহলে] যাতে বর্ণনাকারী হাদীসের ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে কমবেশি করার ভ্রান্তিতে পতিত না হন।

আবার কেউ কেউ বলেন, অর্থগত রেওয়ায়েত একক শব্দসমূহে জায়েজ, যৌগিক শব্দসমূহে জায়েজ নয়। আবার কেউ কেউ বলেন, ঐ ব্যক্তির জন্য জায়েজ যার বর্ণনাকারীর মূলশব্দ স্মরণ আছে, যাতে সে চাহিদা অনুসারে শব্দ ব্যবহার করতে সমর্থ হবে। আবার কেউ কেউ বলেন, শরিয়তের বিধান লাভ করার প্রয়োজনে তার পক্ষে মর্মগত হাদীস বর্ণনা করা বৈধ যার হাদীসের মর্ম স্মরণ রয়েছে কিন্তু ভাষা স্মরণ নেই। আর যার ভাষা স্মরণ রয়েছে তার পক্ষে মর্মগতভাবে হাদীস বর্ণনা করা বৈধ নয়। কেননা, এখানে মর্মগতভাবে বর্ণনার কোনো প্রয়োজনই নেই। এই মতপার্থক্য হলো বৈধ হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে। তবে উত্তম হলো হাদীসে কোনোরূপ পরিবর্তন না করে তার বর্ণিত ভাষাকে হুবহু বর্ণনা করা– আর এটাই সর্বসম্মত মত। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– "আল্লাহ সে লোকের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল উদ্ভাসিত করবেন, [চির-সবুজ চির-তাজা করে রাখবেন] যে আমার কথা শুনে তা স্মৃতিপটে সংরক্ষিত রাখবে এবং যেরূপ শুনেছে অনুরূপভাবে তা বর্ণনা করবে।" বিশুদ্ধ ছয়টি হাদীসগ্রন্থসহ অন্যান্য গ্রন্থে অর্থগত বর্ণনা বিপুল পরিমাণে বিদ্যমান রয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ تَنْبِيْهٌ জ্ঞাতব্য যে, وَهٰذَا الْمَبْحَثُ উল্লিখিত আলোচনাটি يَنْجَرُّ اِلٰى رِوَايَةِ الْحَدِيْثِ হাদীস বর্ণনার দিকে টেনে নেয় وَنَقْلِهٖ بِالْمَعْنٰى এবং অর্থগতভাবে হাদীস বর্ণনার আলোচনা সৃষ্টি হয় وَفِيْهِ اِخْتِلَافٌ আর তাতে মতভেদ রয়েছে فَالْاَكْثَرُوْنَ عَلٰى اَنَّهٗ جَائِزٌ অধিকাংশের মতে এটা ঐ সব ব্যক্তিদের জন্য জায়েজ مِمَّنْ

هُوَ عَالِمٌ بِالْعَرَبِيَّةِ যারা আরবি ভাষায় অভিজ্ঞ وَمَاهِرٌ فِي أَسَالِيبِ الْكَلَامِ এবং বাক্য বিন্যাসের পদ্ধতি সম্পর্কে প্রসিদ্ধ وَعَارِفٌ بِخَوَاصِّ التَّرَاكِيبِ আর তারকীবের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পরিচিত وَمَفْهُومَاتِ الْخِطَابِ ভাষণের বিষয়বস্তু সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত لِئَلَّا يُخْطِئَ بِزِيَادَةٍ وَنُقْصَانٍ যাতে কমবেশি করার ভ্রান্তিতে পতিত না হয় وَقِيلَ جَائِزٌ فِي مُفْرَدَاتِ الْأَلْفَاظِ কারো মতে একক শব্দসমূহে এরূপ করা জায়েজ دُونَ الْمُرَكَّبَاتِ যৌগিক শব্দসমূহে জায়েজ নয় وَقِيلَ আর কেউ বলেন جَائِزٌ لِمَنْ اسْتَحْضَرَ أَلْفَاظَهُ ঐ ব্যক্তির জন্য জায়েজ যার মূলশব্দ স্মরণ থাকে حَتَّى يَتَمَكَّنَ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهِ যাতে সামর্থানুসারে শব্দ ব্যবহার করতে সক্ষম হবে وَقِيلَ আর কেউ বলেন جَائِزٌ لِمَنْ يَحْفَظُ مَعَانِي الْحَدِيثِ ঐ ব্যক্তির জন্য জায়েজ যার হাদীসের অর্থ মুখস্থ আছে وَنَسِيَ أَلْفَاظَهَا হাদীসের মূলশব্দ সে ভুলে গেছে لِلضَّرُورَةِ فِي تَحْصِيلِ الْأَحْكَامِ শরিয়তের বিধান লাভ করার প্রয়োজনে وَأَمَّا مَنْ اسْتَحْضَرَ الْأَلْفَاظَ তবে যে ব্যক্তির ভাষা স্মরণ আছে فَلَا يَجُوزُ لَهُ তার জন্য এটা জায়েজ নেই لِعَدَمِ الضَّرُورَةِ প্রয়োজন না থাকার কারণে وَهَذَا الْخِلَافُ فِي الْجَوَازِ وَعَدَمِهِ এই মতভেদ হলো জায়েজ হওয়া এবং না হওয়ার ব্যাপারে أَمَّا أَوْلَوِيَّةُ তবে উত্তম হলো رِوَايَةُ اللَّفْظِ مِنْ غَيْرِ تَصَرُّفٍ فِيهَا হাদীসে কোনোরূপ পরিবর্তন না করে হুবহু বর্ণনা করা فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ আর এটাই সর্বসম্মত لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন نَضَّرَ اللّٰهُ امْرَأً আল্লাহ তা'আলা সে ব্যক্তিকে উজ্জ্বল করুন سَمِعَ مَقَالَتِي যে আমার কথা শুনেছে فَوَعَاهَا এবং তা সংরক্ষণ করবে فَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَ الْحَدِيثَ অতঃপর যেরূপ সে শুনেছে সেরূপ তা বর্ণনা করবে وَالنَّقْلُ بِالْمَعْنَى অর্থগত বর্ণনা وَاقِعٌ فِي الْكُتُبِ السِّتَّةِ وَغَيْرِهَا সিহাহ সিত্তাহ সহ অন্যান্য কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের হুবহু শব্দ ও বাক্যানুযায়ী বর্ণনা না করে তার ভাবার্থ বর্ণনা করা জায়েজ কিনা? এ ব্যাপারে ওলামাদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন–

১. ইমাম চতুষ্টয়সহ অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে, এরূপ বর্ণনা করা জায়েজ। তবে শর্ত হলো–

ক. বর্ণনাকারীদেরকে হাদীসের শব্দাবলি, ভাব এবং তার যথাযথ উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হতে হবে।

খ. হাদীসের ব্যাকরণগত দিকসহ আনুষঙ্গিক সবকিছু জানতে হবে।

২. একদল ওলামার মতে, رِوَايَةٌ بِالْمَعْنَى বৈধ নয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন جَوَامِعُ الْكَلِمِ আর হাদীসের ভাবার্থ বর্ণনা করা হলে جَوَامِعُ الْكَلِمِ -এর বৈশিষ্ট্য থাকে না।

৩. কেউ বলেন যে, رِوَايَةٌ بِالْمَعْنَى বৈধ। তাঁদের দলিল হলো মহানবী ﷺ -এর বাণী–

إِذَا لَمْ تُحِلُّوا حَرَامًا وَلَمْ تُحَرِّمُوا حَلَالًا وَأَصَبْتُمُ الْمَعْنَى فَلَا بَأْسَ

৪. কুরআন মাজীদের আয়াতসমূহ মু'জিয, তাই نَقْلُ الْقُرْآنِ بِالْمَعْنَى অবৈধ। কিন্তু হাদীসের শব্দাবলি মু'জিয নয়, তাই এটা বৈধ।

৫. أَدْعِيَةٌ مَأْثُورَةٌ -এর ক্ষেত্রে رِوَايَةٌ بِالْمَعْنَى বৈধ নয়।

৬. কারো মতে, مُفْرَدَاتٌ -এর মধ্যে رِوَايَةٌ بِالْمَعْنَى বৈধ, তবে مُرَكَّبَاتٌ -এর মধ্যে বৈধ নয়।

৭. কাযী আয়ায বলেন– رِوَايَةٌ بِالْمَعْنَى বৈধ নয়। কেননা, এতে করে অজ্ঞ লোকেরা হাদীস বর্ণনায় যথেষ্ট সুযোগ পেয়ে যাবে এবং এর ফলে হাদীসের বিকৃতি ঘটতে পারে।

৮. কারো মতে, যে ব্যক্তির হাদীসের মূলশব্দ মুখস্থ আছে ঐ ব্যক্তির জন্য জায়েজ, যাতে করে তিনি প্রয়োজনের সময় মূলশব্দ ব্যবহার করতে পারেন।

৯. কারো মতে, শরিয়তের হুকুম বাস্তবায়নের জন্য যার শুদ্ধ অর্থ মুখস্থ আছে তার জন্য জায়েজ আর যার মূলশব্দ হিফজ আছে তার জন্য জায়েজ নয়।

وَالْعَنْعَنَةُ رِوَايَةُ الْحَدِيْثِ بِلَفْظِ عَنْ فُلَانٍ عَنْ فُلَانٍ وَالْمُعَنْعَنُ حَدِيْثٌ رُوِىَ بِطَرِيْقِ الْعَنْعَنَةِ وَيُشْتَرَطُ فِى الْعَنْعَنَةِ الْمُعَاصَرَةُ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَاللِّقَاءُ عِنْدَ الْبُخَارِىِّ وَالْاَخْذُ عِنْدَ قَوْمٍ اُخَرِيْنَ وَمُسْلِمٌ رَدَّ عَلَى الْفَرِيْقَيْنِ اَشَدَّ الرَّدِّ وَبَالَغَ فِيْهِ وَعَنْعَنَةُ الْمُدَلِّسِ غَيْرُ مَقْبُوْلٍ وَكُلُّ حَدِيْثٍ مَرْفُوْعٍ سَنَدُهُ مُتَّصِلٌ فَهُوَ مُسْنَدٌ هٰذَا هُوَ الْمَشْهُوْرُ الْمُعْتَمَدُ عَلَيْهِ وَبَعْضُهُمْ يُسَمِّىْ كُلَّ مُتَّصِلٍ مُسْنَدًا وَاِنْ كَانَ مَوْقُوْفًا اَوْ مَقْطُوْعًا وَبَعْضُهُمْ يُسَمِّىْ الْمَرْفُوْعَ مُسْنَدًا وَاِنْ كَانَ مُرْسَلًا اَوْ مُعْضَلًا اَوْ مُنْقَطِعًا ـ

অনুবাদ : অমুকের নিকট হতে অমুকের নিকট হতে (عَنْ فُلَانٍ عَنْ فُلَانٍ) এরূপ শব্দ ব্যবহার করে যে হাদীস বর্ণনা করা হয়, তাকে 'আন'আনা (عَنْعَنَةٌ) বলা হয়। আর মু'আন'আন (مُعَنْعَنٌ) ঐ হাদীসকে বলে যা 'আন'আনার পদ্ধতিতে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। আর 'আন'আনা পদ্ধতিতে হাদীস বর্ণনার জন্য ইমাম মুসলিম (র.)-এর নিকট সমসাময়িক হওয়া প্রয়োজন। অথচ ইমাম বুখারী (র.)-এর নিকট শুধু সমসাময়িক হলেই চলবে না, তার সাথে রাবীর সাক্ষাৎ প্রয়োজন। আর অন্যান্য মুহাদ্দিসগণের মতে গ্রহণ করা (اَخْذ) শর্ত। ইমাম মুসলিম (র.) অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তাঁদের বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করেছেন। মুদাল্লিসের 'আন'আনা গ্রহণযোগ্য নয়। মুসনাদ (مُسْنَدٌ) – যে মারফূ' হাদীসের সনদ সম্পূর্ণ মুত্তাসিল সে হাদীসকে হাদীসে মুসনাদ বলা হয়। মুসনাদের এ সংজ্ঞাই প্রসিদ্ধ এবং নির্ভরযোগ্য। আর কারো কারো নিকট প্রত্যেক মুত্তাসিল হাদীসই মুসনাদ, যদিও তা মাওকূফ অথবা মাকতূ'। আবার কেউ কেউ মারফূ'কে মুসনাদ নাম রেখেছেন, যদিও তা মুরসাল, মু'দ্বাল, অথবা মুনকাতি' হোকনা কেন।

শাব্দিক অনুবাদ : وَالْعَنْعَنَةُ আর হাদীসে 'আন'আনা হলো رِوَايَةُ الْحَدِيْثِ হাদীস বর্ণনা করা بِلَفْظِ عَنْ فُلَانٍ عَنْ فُلَانٍ অমুকের নিকট হতে অমুকের নিকট হতে এরূপ শব্দ দ্বারা وَالْمُعَنْعَنُ আর মু'আন'আন হলো حَدِيْثٌ رُوِىَ بِطَرِيْقِ الْعَنْعَنَةِ সেই হাদীস যা 'আন'আনার পদ্ধতিতে বর্ণনা করা হয় وَيُشْتَرَطُ فِى الْعَنْعَنَةِ আর হাদীসে 'আন'আনার জন্য শর্ত হলো اَلْمُعَاصَرَةُ সমসাময়িক হওয়া عِنْدَ مُسْلِمٍ ইমাম মুসলিম (র.)-এর নিকট وَاللِّقَاءُ عِنْدَ الْبُخَارِىِّ আর ইমাম বুখারী মতে উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ হওয়া وَالْاَخْذُ عِنْدَ قَوْمٍ اُخَرِيْنَ অপর একদলের মতে গ্রহণ করা শর্ত وَمُسْلِمٌ رَدَّ عَلَى الْفَرِيْقَيْنِ ইমাম মুসলিম এ উভয় দলের বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করেছেন اَشَدَّ الرَّدِّ অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে وَبَالَغَ فِيْهِ এবং এতে অধিক জোর দিয়েছেন وَعَنْعَنَةُ الْمُدَلِّسِ মুদাল্লিস ব্যক্তির 'আন'আনাহ غَيْرُ مَقْبُوْلٍ গ্রহণযোগ্য নয় وَكُلُّ حَدِيْثٍ مَرْفُوْعٍ আর যেসব মারফূ' হাদীস سَنَدُهُ مُتَّصِلٌ যার সনদ মুত্তাসিল فَهُوَ مُسْنَدٌ তাকে মুসনাদ বলা হয় هٰذَا هُوَ الْمَشْهُوْرُ এ সংজ্ঞাটি প্রসিদ্ধ اَلْمُعْتَمَدُ عَلَيْهِ নির্ভরযোগ্য وَبَعْضُهُمْ يُسَمِّىْ كُلَّ مُتَّصِلٍ مُسْنَدًا আর কিছু সংখ্যকের মতে সকল মুত্তাসিল হাদীসই মুসনাদ وَاِنْ كَانَ مَوْقُوْفًا اَوْ مَقْطُوْعًا যদিও তা মাওকূফ ও মাকতূ' হোকনা কেন وَبَعْضُهُمْ يُسَمِّىْ الْمَرْفُوْعَ مُسْنَدًا আর কিছুসংখ্যক মারফূকে মুসনাদ বলেছেন وَاِنْ كَانَ مُرْسَلًا اَوْ مُعْضَلًا اَوْ مُنْقَطِعًا যদিও তা মুরসাল মু'দ্বাল অথবা মুনকাতি' হোকনা কেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حَدِيْثُ مُعَنْعَنٍ-এর পরিচয় :

مَعْنَى الْعَنْعَنَةِ لُغَةً [আনআনার আভিধানিক অর্থ] : اَلْمُعَنْعَنُ শব্দটি فَعْلَلَةٌ বাবের عَنْعَنَةٌ মাসদার থেকে اِسْم مَفْعُوْل-এর সীগাহ। এ শব্দটি عَنْ বর্ণের দ্বিতীয় রূপ নিয়ে فَعْلَلَةٌ বাব থেকে মাসদার গঠন করা হয়েছে। এর অর্থ عَنْ ـ عَنْ শব্দ প্রয়োগে বক্তব্য উপস্থাপন করা।

مَعْنَى الْعَنْعَنَةِ اِصْطِلَاحًا [আনআনার পরিভাষিক সংজ্ঞা] :

১. মীযানুল আখবার প্রণেতা বলেন– مَا عَنْعَنَ فَهُوَ مُعَنْعَنٌ অর্থাৎ যে সনদে এক রাবী অন্য রাবী হতে عَنْ শব্দ প্রয়োগে হাদীস বর্ণনা করেন, তাকে مُعَنْعَنٌ বলে।

২. আল্লামা আব্দুল হক দেহলবী (র.) বলেন– اَلْمُعَنْعَنَةُ مَا رُوِىَ عَنْ طَرِيْقِ الْعَنْعَنَةِ অর্থাৎ যে হাদীস عَنْ ـ عَنْ শব্দ প্রয়োগে বর্ণনা করা হয়, তাকে مُعَنْعَنٌ হাদীস বলে।

উদাহরণ : যেমন ইমাম বুখারী (র.) বলেন–

حَدَّثَنَا مَكِّيُّ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ وَهُوَ ابْنُ الْاَكْوَعِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَقُلْ عَلَىَّ مَا لَمْ اَقُلْ فَلْيَتَبَوَّاْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ ـ

اَلْمُعَنْعَنُ হাদীসের হুকুম : عَنْ পদ্ধতিতে বর্ণিত হাদীসে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। যথা–

১. ইমাম মুসলিম (র.)-এর মতে, সমকালীন রাবীদের বর্ণিত مُعَنْعَنٌ হাদীস مُتَّصِلٌ।
তবে তিনি মু'আন'আন হাদীস গ্রহণ করার জন্য রাবীদের সমসাময়িক যুগের হওয়াকে শর্তারোপ করেছেন।

২. ইমাম বুখারী (র.)-এর মতে, مُعَنْعَنٌ হাদীস যদি যে কোনো এক বর্ণনায় سَمِعْتُ অথবা حَدَّثَنِىْ বলে এবং বাকি রেওয়ায়েত عَنْ ـ عَنْ বলে উল্লেখ করে তাহলে তা مُتَّصِلٌ হবে, অন্যথায় তা مُعَنْعَنٌ থেকে যাবে, যা গ্রাহ্য নয়। তবে তাঁর মতে, রাবী ও মারবী আনহুর মধ্যে কমপক্ষে জীবনে একবার সাক্ষাৎ হওয়া শর্ত।

৩. কোনো কোনো মুহাদ্দিসের মতে, মু'আন'আন হাদীস গ্রহণ করার জন্য اَخْذ শর্ত।

৪. জুমহুর মুহাদ্দিস ও ফকীহ্দের মতে, ছিকাহ রাবীর مُعَنْعَنٌ হাদীস গ্রাহ্য। কিন্তু مُرْسَلٌ (মুরসিল) ও মুদাল্লিস রাবীর মু'আন'আন হাদীস গ্রাহ্য নয়।

قَوْلُهٗ فَهُوَ مُسْنَدٌ :

مَعْنَى الْمُسْنَدِ لُغَةً [মুসনাদের আভিধানিক অর্থ] : مُسْنَدٌ শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো– উঁচু করা বা উন্নত বিষয়।

مَعْنَى الْمُسْنَدِ اِصْطِلَاحًا [মুসনাদের পারিভাষিক অর্থ] : পারিভাষিক পরিচয় হলো–

كُلُّ حَدِيْثٍ مَرْفُوْعٍ سَنَدُهٗ مُتَّصِلٌ فَهُوَ مُسْنَدٌ ـ

অর্থাৎ যে মারফূ' হাদীসের সনদ মুত্তাসিল, তাকে মুসনাদ বলা হয়

কারো মতে, প্রত্যেক মুত্তাসিল সনদযুক্ত হাদীসই مُسْنَدٌ চাই তা مَوْقُوْف হোক বা مَقْطُوْع হোক।

আরেক দলের মতে, প্রত্যেক মারফূ' হাদীসই مُسْنَدٌ চাই তা مُرْسَلٌ হোক বা مُعْضَلٌ হোক কিংবা مُنْقَطِعٌ তবে প্রথম সংজ্ঞাটিই অধিক বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য।

উদাহরণ : ইমাম ইবনে মাজাহ (র.) বলেন,

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلٰى مَيَامِنِ الصُّفُوْفِ ـ

فَصْلٌ وَمِنْ اَقْسَامِ الْحَدِيْثِ اَلشَّاذُّ وَالْمُنْكَرُ وَالْمُعَلَّلُ وَالشَّاذُّ فِى اللُّغَةِ مَنْ تَفَرَّدَ مِنَ الْجَمَاعَةِ وَخَرَجَ مِنْهَا وَفِى الْاِصْطِلَاحِ مَا رُوِىَ مُخَالِفًا لِمَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ رُوَاتُهُ ثِقَةً فَهُوَ مَرْدُوْدٌ وَاِنْ كَانَ ثِقَةً فَسَبِيْلُهُ التَّرْجِيْحُ بِمَزِيْدِ حِفْظٍ وَضَبْطٍ اَوْ كَثْرَةِ عَدَدٍ وَ وُجُوْهٍ اُخَرَ مِنَ التَّرْجِيْحَاتِ فَالرَّاجِحُ يُسَمّٰى مَحْفُوْظًا وَالْمَرْجُوْحُ شَاذًّا ـ

অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : হাদীসের শ্রেণীসমূহের মধ্যে শায, মুনকার ও মু'আল্লাল (شَاذٌ ، مُنْكَرٌ ، مُعَلَّلٌ) অন্তর্ভুক্ত। শায-এর আভিধানিক অর্থ হলো– যে দল হতে পৃথক হয়ে যায় এবং দল হতে বের হয়ে পড়ে। মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় সে হাদীসকে শায বলা হয়, যা ছিকাহ রাবীদের বিপরীত বর্ণিত হয়। যদি সে হাদীসের রাবী ছিকাহ না হয়, তাহলে তা মারদূদ বা পরিত্যাজ্য হবে। আর ছিকাহ হলে মুখস্থশক্তি, স্মরণ রাখা, সংখ্যাধিক্য ও অন্যান্য সূত্রের ভিত্তিতে প্রাধান্য দেবে। যে হাদীসটি প্রাধান্য লাভ করবে, তাকে মাহফূয বলা হবে। আর যার উপরে প্রাধান্য দেওয়া হবে, তাকে শায বলা হবে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَمِنْ اَقْسَامِ الْحَدِيْثِ হাদীসের প্রকারভেদসমূহের মধ্যে কয়েকটি হলো اَلشَّاذُّ وَالْمُنْكَرُ وَالْمُعَلَّلُ শায, মুনকার ও মু'আল্লাল وَالشَّاذُّ فِى اللُّغَةِ শাযের শাব্দিক অর্থ হলো مَنْ تَفَرَّدَ مِنَ الْجَمَاعَةِ যে দল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে وَخَرَجَ مِنْهَا এবং তা হতে বের হয়ে পড়ে وَفِى الْاِصْطِلَاحِ আর পরিভাষায় বলা হয় مَا رُوِىَ مُخَالِفًا যা বিপরীত বর্ণনা করা হয় لِمَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীগণ যা বর্ণনা করেছেন فَاِنْ لَمْ يَكُنْ رُوَاتُهُ ثِقَةً আর যদি সে হাদীসের রাবী ছিকাহ না হয় فَهُوَ مَرْدُوْدٌ তাহলে তা পরিত্যাজ্য وَاِنْ كَانَ ثِقَةً আর যদি বিশ্বস্ত হয় فَسَبِيْلُهُ التَّرْجِيْحُ তাহলে তাতে প্রাধান্য লাভ করবে بِمَزِيْدِ حِفْظٍ وَضَبْطٍ অধিক স্মরণশক্তি ও সংরক্ষণের কারণে اَوْ كَثْرَةِ عَدَدٍ অথবা সংখ্যাধিক্যের কারণে وَ وُجُوْهٍ اُخَرَ مِنَ التَّرْجِيْحَاتِ অন্যান্য প্রাধান্য লাভের বিষয়াদির ফলে فَالرَّاجِحُ يُسَمّٰى مَحْفُوْظًا তখন প্রাধান্য লাভকারী হাদীসকে বলবে মাহফূয وَالْمَرْجُوْحُ شَاذًّا আর যার উপর প্রাধান্য দেওয়া হবে তাকে বলবে শায।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَ الشَّاذُّ الخ-এর আলোচনা :

مَعْنَى الشَّاذِّ لُغَةً **[শাযের আভিধানিক অর্থ] :** اَلشَّاذُّ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো اَلْخُرُوْجُ عَنِ الْجَمَاعَةِ অর্থাৎ জামাত হতে পৃথক হয়ে যাওয়া।

مَعْنَى الشَّاذِّ اِصْطِلَاحًا **[শাযের পারিভাষিক অর্থ] :** পারিভাষিক পরিচয় হলো– مَا رَوَاهُ الْمَقْبُوْلُ مُخَالِفٌ لِمَنْ هُوَ اَوْلٰى مِنْهُ অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি তার চেয়ে উত্তম ব্যক্তির বর্ণনার বিপরীত যা বর্ণনা করেন, তাই শায। আর অত্র গ্রন্থকারের মতে, যে হাদীসটি বিশ্বস্ত কোনো বর্ণনাকারীর বর্ণনার পরিপন্থি হয়, সে হাদীসকে শায বলা হয়। যদি সে হাদীসের রাবী বিশ্বস্ত না হয়, তাহলে তা মারদূদ বা পরিত্যাজ্য হবে। আর বিশ্বস্ত হলে মুখস্থশক্তি, হিফজ, সংখ্যাধিক্য ও অন্যান্য সূত্রের ভিত্তিতে প্রাধান্য দেবে। যে হাদীসটি প্রাধান্য লাভ করবে তাকে মাহফূয বলা হয়। আর যার উপর প্রাধান্য দেওয়া হবে, তাকে শায নামে আখ্যায়িত করা হয়।

وَالْمُنْكَرُ حَدِيْثٌ رَوَاهُ ضَعِيْفٌ مُخَالِفٌ لِمَنْ هُوَ اَضْعَفُ مِنْهُ وَمُقَابِلُهُ الْمَعْرُوْفُ فَالْمُنْكَرُ وَالْمَعْرُوْفُ كِلَا رَاوِيْهِمَا ضَعِيْفٌ وَاَحَدُهُمَا اَضْعَفُ مِنَ الْاٰخَرِ وَفِي الشَّاذِ وَالْمَحْفُوْظِ قَوِيٌّ اَحَدُهُمَا اَقْوٰى مِنَ الْاٰخَرِ وَالشَّاذُ وَالْمُنْكَرُ مَرْجُوْحَانِ وَالْمَحْفُوْظُ وَالْمَعْرُوْفُ رَاجِحَانِ وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَشْتَرِطُوْا فِي الشَّاذِ وَالْمُنْكَرِ قَيْدَ الْمُخَالَفَةِ لِرَاوٍ اٰخَرَ قَوِيًّا كَانَ اَوْ ضَعِيْفًا وَقَالُوا اَلشَّاذُ مَا رَوَاهُ الثِّقَةُ وَتَفَرَّدَ بِهٖ وَلَا يُوْجَدُ لَهٗ اَصْلٌ مُوَافِقٌ وَمُعَاضِدٌ لَهٗ وَهٰذَا صَادِقٌ عَلٰى فَرْدِ ثِقَةٍ صَحِيْحٍ وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَعْتَبِرُوْا الثِّقَةَ وَلَا الْمُخَالَفَةَ وَكَذٰلِكَ الْمُنْكَرُ لَمْ يَخُصُّوْهُ بِالصُّوْرَةِ الْمَذْكُوْرَةِ وَسَمُّوْا حَدِيْثَ الْمَطْعُوْنِ بِفِسْقٍ اَوْ فَرْطِ غَفْلَةٍ وَكَثْرَةِ غَلَطٍ مُنْكَرًا وَهٰذِهٖ اِصْطِلَاحَاتٌ لَا مَشَاحَةَ فِيْهَا ـ

অনুবাদ : আর مُنْكَرْ [মুনকার], যে হাদীসটি কোনো দুর্বল রাবী বর্ণনা করেন এবং তা সে রাবীর বর্ণিত হাদীসের পরিপন্থি হয় যার বর্ণনাকারী তার তুলনায় খুবই দুর্বল। মুনকারের বিপরীত হলো মারফূ'। মুনকার ও মারফূ' উভয়ের রাবীই দুর্বল হয়, কিন্তু একজন অপরজনের তুলনায় অধিক দুর্বল হয়। আর শায ও মাহফূয হাদীসের রাবীদ্বয় একজন অপরজনের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী হয়। সুতরাং শায ও মুনকার হাদীস কম প্রাধান্যশীল। আর মাহফূয ও মারফূ' হাদীসদ্বয় অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত হয়। কতেক মুহাদ্দীস শায ও মুনকারের ক্ষেত্রে অপর কোনো দুর্বল বা শক্তিশালী রাবীর পরিপন্থি হওয়ার শর্ত আরোপ করেন না। তারা বলেন, সে হাদীসকেই শায বলা হয় যার রাবী বিশ্বস্ত একক হয় এবং এর অনুকূলে বা প্রতিকূলে মূলত কোনো হাদীস পাওয়া যায় না। আর এ সংজ্ঞা অনুযায়ী বিরোধিতা ছাড়াই শুধু একজন ثِقَةْ [বিশ্বস্ত] রাবীর একক ছহীহ বর্ণনাকেও شَاذْ বলা হবে। আর কোনো কোনো মুহাদ্দিস ছিকাহ এবং বিরোধিতার বিষয় গণনা করেননি। অনুরূপভাবে মুনকারের উল্লিখিত অবস্থায় বিবেচনা করা হয় না। আর যে হাদীসটির রাবী ফাসিকীর দোষে অথবা অধিকতর অমনোযোগিতা ও ভুলভ্রান্তির দোষে দুষ্ট হয়, তারা একেই মুনকার হাদীস নামে আখ্যায়িত করেন। আর এটাই মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায়, এতে কোনো দোষ বা ঝগড়া নেই।

শাব্দিক অনুবাদ : وَالْمُنْكَرُ حَدِيْثٌ মুনকার হলো এমন হাদীস رَوَاهُ ضَعِيْفٌ যা দুর্বল রাবী বর্ণনা করেছেন مُخَالِفٌ لِمَنْ هُوَ اَضْعَفُ مِنْهُ ঐ হাদীসের বিপরীত হয় যার রাবী এর থেকেও অধিক দুর্বল وَمُقَابِلُهُ الْمَعْرُوْفُ এটা মা'রূফের বিপরীত فَالْمُنْكَرُ وَ الْمَعْرُوْفُ মুনকার ও মা'রূফ كِلَا رَاوِيْهِمَا ضَعِيْفٌ উভয়ের রাবীই দুর্বল وَاَحَدُهُمَا اَضْعَفُ مِنَ الْاٰخَرِ তবে একজন অপরজনের তুলনায় অধিক দুর্বল وَفِي الشَّاذِ وَالْمَحْفُوْظِ قَوِيٌّ আর শায ও মাহফূযের রাবীদ্বয় শক্তিশালী اَحَدُهُمَا اَقْوٰى مِنَ الْاٰخَرِ তবে একজন হতে অপরজন বেশি শক্তিশালী وَالشَّاذُ وَالْمُنْكَرُ مَرْجُوْحَانِ তাই শায ও মুনকার অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত নয় وَالْمَحْفُوْظُ وَالْمَعْرُوْفُ رَاجِحَانِ আর মাহফূয ও মা'রূফ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَشْتَرِطُوْا فِي الشَّاذِ وَالْمُنْكَرِ আর কিছুসংখ্যক মুহাদ্দিস শায ও মুনকারের বেলায় শর্তারোপ করেন না قَيْدَ الْمُخَالَفَةِ لِرَاوٍ اٰخَرَ এক রাবীর বিপরীতে অন্য রাবীর শর্ত قَوِيًّا كَانَ اَوْ ضَعِيْفًا দুর্বল হোক কিংবা শক্তিশালী وَقَالُوْا আর তারা বলেন اَلشَّاذُ مَا رَوَاهُ الثِّقَةُ শায হলো ঐ হাদীস যা বিশ্বস্ত রাবী বর্ণনা করেন وَتَفَرَّدَ بِهٖ এবং তিনি একক হবেন وَلَا يُوْجَدُ لَهٗ اَصْلٌ তার বিপরীতে

কোনো হাদীস পাওয়া যায় না مُوَافِقٌ وَمُعَاضِدٌ لَهٗ এর অনকূলে বা প্রতিকূলে وَهٰذَا صَادِقٌ আর এটাই প্রমাণ দেয় عَلٰى فَرْدٍ ثِقَةٍ صَحِيْحٍ রাবীর এককতা, বিশ্বস্তা এবং বিশুদ্ধতা وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَعْتَبِرُوْا আর কিছুসংখ্যক মুহাদ্দিস গণনা করেন না لَمْ يَخُصُّوْهُ بِالصُّوْرَةِ الثِّقَةَ وَلَا الْمُخَالَفَةَ রাবীর দৃঢ়তা ও বিরোধিতা وَكَذٰلِكَ الْمُنْكَرُ এরকমই হলো হাদীসে মুনকার الْمَذْكُوْرَةِ উল্লিখিত বিষয়াবলিকে গণ্য করা হয় না وَسَمُّوْا আর তারা নামকরণ করেন حَدِيْثَ الْمَطْعُوْنِ بِفِسْقٍ ফাসিকীর দোষে দুষ্ট হাদীসকে أَوْ فَرْطِ غَفْلَةٍ অথবা অধিক অমনোযোগিতার দোষে وَكَثْرَةِ غَلَطٍ ও অধিক ভুল-ভ্রান্তির দোষে مُنْكَرًا মুনকার নামে وَهٰذِهِ اِصْطِلَاحَاتٌ এগুলো হলো পরিভাষায় لَا مُشَاحَةَ فِيْهَا যাতে কোনো দোষ নেই।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَ الْمُنْكَرُ الخ -এই আলোচনা :

مَعْنَى الْمُنْكَرِ لُغَةً [মুনকারের আভিধানিক অর্থ] : مُنْكَرْ শব্দটি اِسْمُ مَفْعُوْلٍ -এর সীগাহ। শাব্দিক অর্থ হলো– অপরিচিত।

مَعْنَى الْمُنْكَرِ اِصْطِلَاحًا [মুনকারের পারিভাষিক অর্থ] :

১. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন– اِنْ خَالَفَ رِوَايَةَ الثِّقَاتِ فَمُنْكَرٌ যদি ছিকাহ রাবীর বিপরীত বর্ণনা হয় তবে তাকে مُنْكَرٌ বলে।

২. مُقَدَّمَةُ الشَّيْخِ -এর মতে, وَالْمُنْكَرُ حَدِيْثٌ رَوَاهُ ضَعِيْفٌ مُخَالِفٌ لِمَنْ هُوَ اَضْعَفُ مِنْهُ অত্র সংজ্ঞাতে কিছুটা গড়বড় মনে হয়।

৩. কারো মতে, هُوَ الْحَدِيْثُ الَّذِىْ رَوَاهُ الضَّعِيْفُ مُخَالِفًا لِمَا رَوَاهُ الثِّقَةُ

৪. আর কারো মতে,

اِنْ كَانَ مَعَ ضُعْفِهِ مُخَالِفًا لِمَا رَوَى الْمَقْبُوْلُ اَوْ كَانَ غَافِلًا اَوْ نَاسِيًا كَثِيْرَ الْوَهْمِ فَالْحَدِيْثُ مُنْكَرٌ

উদাহরণ : مَا رَوَاهُ النَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ مِنْ رِوَايَةِ اَبِىْ زُكَيْرٍ يَحْيٰى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوْعًا كُلُوْا الْبَلَحَ بِالتَّمْرِ فَاِنَّ ابْنَ اٰدَمَ اِذَا اَكَلَهٗ غَضِبَ الشَّيْطَانُ ـ
قَالَ النَّسَائِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ مُنْكَرٌ تَفَرَّدَ بِهٖ اَبُوْ زُكَيْرٍ ـ

উল্লেখ্য যে, হাদীসে মুনকারের বিপরীত হলো মা'রূফ অর্থাৎ কোনো ضَعِيْف রাবীর হাদীস অপর কোনো ضَعِيْف রাবীর হাদীসের বিরোধী হলে অপেক্ষাকৃত অধিক দ্বা'ঈফ রাবীর হাদীসকে বলে مُنْكَرٌ আর অপেক্ষাকৃত কম ضَعِيْف রাবীর হাদীসকে বলে مَعْرُوْف, ফলে مَحْفُوْظ ও مَعْرُوْف হাদীস شَاذّ ও مُنْكَرْ -এর উপর প্রাধান্য পাবে।

وَالْمُعَلَّلُ بِفَتْحِ اللَّامِ اِسْنَادٌ فِيْهِ عِلَلٌ وَاَسْبَابٌ غَامِضَةٌ خُفْيَةٌ قَادِحَةٌ فِي الصِّحَّةِ يَتَنَبَّهُ لَهَا الْحَذَّاقُ الْمَهَرَةُ مِنْ اَهْلِ هٰذَا الشَّانِ كَارْسَالٍ فِي الْمَوْصُوْلِ وَ وَقْفٍ فِي الْمَرْفُوْعِ وَنَحْوِ ذٰلِكَ وَقَدْ يَقْتَصِرُ عِبَارَةُ الْمُعَلِّلِ بِكَسْرِ اللَّامِ عَنْ اِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلٰى دَعْوَاهُ كَالصَّيْرَفِيِّ فِيْ نَقْدِ الدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ ـ

অনুবাদ : মু'আল্লাল (مُعَلَّلٌ) শব্দে লাম (ل) -এ ফাতাহ। মু'আল্লাল হলো সে হাদীস যার সনদের মধ্যে বিশুদ্ধতা বিনষ্টকারী এমন কোনো গোপন ও সূক্ষ্ম কারণ বা দুর্বলতা থাকে, যা হাদীস বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে অন্তরায় বলে গণ্য হবে। সে সমস্ত কারণ শুধু এ বিষয়ে অভিজ্ঞ মুহাদ্দিসগণই জানতে পারেন। যেমন– মাওসূলকে মুরসাল করা, মারফূ'কে মাওকূফ করা ইত্যাদি। মু'আল্লিল مُعَلِّلٌ শব্দে লাম (ل) -এ কাসরা সর্বদা নিজের দাবির পক্ষে দলিল উপস্থাপনে অপারগই থাকে। যেমন– দীনার ও দিরহাম পরীক্ষা- নিরীক্ষাকারী নিজের দাবি প্রমাণের দলিল উপস্থাপন করতে পারে না।

শাব্দিক অনুবাদ : وَالْمُعَلَّلُ بِفَتْحِ اللَّامِ মুআল্লাল শব্দে لَام -এ ফাতাহ দিয়ে اِسْنَادٌ فِيْهِ যার মধ্যে সম্বন্ধযুক্ত عِلَلٌ কোনো কারণ وَاَسْبَابٌ غَامِضَةٌ خُفْيَةٌ এবং সূক্ষ্ম ও গোপন দুর্বলতাসমূহ قَادِحَةٌ فِي الصِّحَّةِ যা বিশুদ্ধতার বিনষ্টকারী يَتَنَبَّهُ لَهَا যেসব কারণ অবহিত আছেন الْحَذَّاقُ الْمَهَرَةُ শুধু অভিজ্ঞ ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গ مِنْ اَهْلِ هٰذَا الشَّانِ এ বিষয়ের মুহাদ্দিসগণ كَارْسَالٍ فِي الْمَوْصُوْلِ যেমন– মাওসূলকে মুরসাল করা وَ وَقْفٍ فِي الْمَرْفُوْعِ এবং মারফূ'কে মাওকূফ করা وَنَحْوِ ذٰلِكَ এরূপ অন্যান্য وَقَدْ يَقْتَصِرُ عِبَارَةُ الْمُعَلِّلِ আর কখনো اَلْمُعَلِّلُ -কে যের দিয়ে পড়া হয় بِكَسْرِ اللَّامِ লামের নিচে যের দিয়ে عَنْ اِقَامَةِ الْحُجَّةِ তখন অর্থ হবে প্রমাণ পেশে অক্ষম ব্যক্তি عَلٰى دَعْوَاهُ তার দাবির উপরে كَالصَّيْرَفِيِّ যেমন– অর্থ পরীক্ষাকারী فِيْ نَقْدِ الدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ যে তার দীনার ও দিরহামের বিষয়ে দাবি পেশ করতে অক্ষম।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْمُعَلَّلُ الخ -এর আলোচনা :

مَعْنَى الْمُعَلَّلِ لُغَةً [মু'আল্লালের আভিধানিক অর্থ] : مُعَلَّلٌ শব্দটি বাবে تَفْعِيْل থেকে اِسْمُ مَفْعُوْل একবচন। মাসদার হচ্ছে اَلتَّعْلِيْل মূলবর্ণ (ع ـ ل ـ ل) জিনসে مُضَاعَفْ ثُلَاثِيْ আভিধানিক অর্থ হচ্ছে–

১. সমস্যাগ্রস্ত ২. রুগ্ন ৩. ইল্লতযুক্ত ইত্যাদি।

مَعْنَى الْمُعَلَّلِ اِصْطِلَاحًا [মু'আল্লালের পারিভাষিক অর্থ] :

১. উসূলে হাদীসের পরিভাষায় مُعَلَّلٌ এমন হাদীসকে বলা হয়, যার মধ্যে صَحِيْح হাদীসের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যমান থাকে। কিন্তু এর অভ্যন্তরে এমন কিছু সূক্ষ্ম ত্রুটি রয়ে যায়, যা কেবলমাত্র অভিজ্ঞ লোকজনই উদ্‌ঘাটন করতে পারেন।

২. কেউ কেউ বলেন– اِنْ كَانَ سَبَبُ الطَّعْنِ فِى الرَّاوِىْ هُوَ الْوَهْمُ فَحَدِيْثُهُ يُسَمّٰى الْمُعَلَّلُ

৩. ড. আদীব সালিহ বলেন– اَلْمُعَلَّلُ هُوَ الْحَدِيْثُ الَّذِىْ اِطَّلَعَ فِيْهِ عَلٰى عِلَّةٍ قَادِحَةٍ مَعَ اَنَّ الظَّاهِرَ سَلَامَةٌ مِنْهَا

উদাহরণ : حَدِيْثُ يَعْلَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ـ

অত্র সনদে يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ রাবী سُفْيَانُ ثَوْرِى -এর উপর ধারণা করেছেন যে, عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَار অত্র سَنَدْ টি সহীহ যদিও তাতে عِلَّةُ الْغَلَطِ রয়েছে।

وَاِذَا رَوٰى رَاوٍ حَدِيْثًا وَ رَوٰى رَاوٍ اٰخَرُ حَدِيْثًا مُوَافِقًا لَهٗ يُسَمّٰى هٰذَا الْحَدِيْثُ مُتَابِعًا بِصِيْغَةِ اِسْمِ الْفَاعِلِ وَهٰذَا مَعْنٰى مَا يَقُوْلُ الْمُحَدِّثُوْنَ تَابَعَهٗ فُلَانٌ وَكَثِيْرًا مَا يَقُوْلُ الْبُخَارِيُّ فِىْ صَحِيْحِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ وَلَهٗ مُتَابِعَاتٌ وَالْمُتَابَعَةُ يُوْجِبُ التَّقْوِيَةَ وَالتَّايِيْدَ وَلَا يَلْزَمُ اَنْ يَّكُوْنَ الْمُتَابِعُ مُسَاوِيًا فِى الْمَرْتَبَةِ لِلْاَصْلِ وَاِنْ كَانَ دُوْنَهٗ يَصْلُحُ لِلْمُتَابَعَةِ وَالْمُتَابَعَةُ قَدْ يَكُوْنُ فِىْ نَفْسِ الرَّاوِىْ وَقَدْ يَكُوْنُ فِىْ شَيْخٍ فَوْقَهٗ وَالْاَوَّلُ اَتَمُّ وَاَكْمَلُ مِنَ الثَّانِىْ لِاَنَّ الْوَهْنَ فِىْ اَوَّلِ الْاِسْنَادِ اَكْثَرُ وَاَغْلَبُ وَالْمُتَابِعُ اِنْ وَافَقَ الْاَصْلَ فِى اللَّفْظِ وَالْمَعْنٰى يُقَالُ مِثْلُهٗ وَاِنْ وَافَقَ فِى الْمَعْنٰى دُوْنَ اللَّفْظِ يُقَالُ نَحْوُهٗ ـ

অনুবাদ : যদি কোনো একজন রাবী একটি হাদীস বর্ণনা করলেন এবং অপর একজন রাবীও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করলেন, তবে দ্বিতীয় রাবীর হাদীসটিকে [প্রথম রাবীর হাদীসের] মুতাবি' (مُتَابِعٌ) বলা হয়ে থাকে। [مُتَابِعٌ ইসমে ফায়িল] মুহাদ্দিসগণ تَابَعَهٗ فُلَانٌ [অমুকের অনুগামী] বলে থাকেন। তাঁর এটা দ্বারা এ অর্থই বুঝানো হয়। ইমাম বুখারী (র.) সহীহ বুখারীতে বহু স্থানেই এরূপ বলেছেন। মুহাদ্দিসগণ وَلَهٗ مُتَابِعَاتٌ বলে এটা প্রকাশ করেন। এর অর্থ এটাই। মুতাবিয়াত শক্তি এবং সহায়তা আবশ্যক করে। তবে এটা জরুরি নয় যে, মুতাবি' মর্যাদায় মূলের সমকক্ষ হবে। যদি মর্যাদায় নিম্নমানেরও হয়, তবুও মুতাবিয়াতের শক্তি রাখবে। মুতাবিয়াত কখনও স্বয়ং রাবীর মধ্যে হয়, কখনও তার উপরস্থ শায়খের মধ্যে হয়। প্রথমটি দ্বিতীয়টি হতে পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। কেননা, দুর্বলতা প্রথম সনদে অধিকাংশ সময় হয়ে থাকে। মুতাবি' যদি শব্দ ও অর্থ উভয়ের মধ্যে মূলের মতো হয়, তখন তাকে مِثْلُهٗ (মিছলাহু) বলা হয়। যদি শুধু অর্থের অনুরূপ হয় শব্দের অনুরূপ না হয়, তখন তাকে نَحْوُهٗ [নাহবাহু] বলে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَاِذَا رَوٰى رَاوٍ حَدِيْثًا যদি কোনো একজন রাবী একটি হাদীস বর্ণনা করলেন وَ رَوٰى رَاوٍ اٰخَرُ حَدِيْثًا আর অপর কোনো রাবীও একটি হাদীস বর্ণনা করলেন مُوَافِقًا لَهٗ এর অনুরূপ يُسَمّٰى هٰذَا الْحَدِيْثُ مُتَابِعًا তবে দ্বিতীয় হাদীসকে বলবে মুতাবি' بِصِيْغَةِ اِسْمِ الْفَاعِلِ ইসমে ফায়িলের সীগার দ্বারা وَهٰذَا مَعْنٰى مَا يَقُوْلُ الْمُحَدِّثُوْنَ এ অর্থের উপরে ভিত্তি করেই মুহাদ্দিসগণ বলে থাকেন যে تَابَعَهٗ فُلَانٌ অমুকে তার অনুসরণ করেছে وَكَثِيْرًا مَا يَقُوْلُ الْبُخَارِيُّ فِىْ صَحِيْحِهٖ ইমাম বুখারী (র.) তাঁর সহীহ বুখারীতে বহু স্থানেই এরূপ বলেছেন وَيَقُوْلُوْنَ وَلَهٗ مُتَابِعَاتٌ আর মুহাদ্দিসগণ "وَلَهٗ مُتَابِعَاتٌ" বলে এটা বুঝাতেন وَالْمُتَابَعَةُ আর মুতাবি' يُوْجِبُ التَّقْوِيَةَ وَالتَّايِيْدَ শক্তি ও সহায়তাকে আবশ্যক করে وَلَا يَلْزَمُ আর এটা আবশ্যক নয় যে, اَنْ يَّكُوْنَ الْمُتَابِعُ মুতাবি' হবে مُسَاوِيًا فِى الْمَرْتَبَةِ لِلْاَصْلِ মর্যাদায় মূলের সমকক্ষ وَاِنْ كَانَ دُوْنَهٗ যদি তা মর্যাদায় কমও হয় يَصْلُحُ لِلْمُتَابَعَةِ মুতাবিয়াত হওয়ার ক্ষমতা রাখে وَالْمُتَابَعَةُ قَدْ يَكُوْنُ فِىْ نَفْسِ الرَّاوِىْ আর মুতাবিয়াত কখনো স্বয়ং রাবীর মধ্যেও হয় وَقَدْ يَكُوْنُ فِىْ شَيْخٍ فَوْقَهٗ আর কখনো উপরস্থ শায়খের

فِىْ মধ্যেও হয় لِاَنَّ الْوَهْنَ কেননা, দুর্বলতা وَالْاَوَّلُ اَتَمُّ وَاَكْمَلُ مِنَ الثَّانِىْ তবে প্রথমটি দ্বিতীয়টি হতে অধিক পরিপূর্ণ হবে اَوَّلِ الْاِسْنَادِ اَكْثَرُ وَاَغْلَبُ প্রথম সনদের মধ্যে অধিক হয়ে থাকে وَالْمُتَابِعُ اِنْ وَافَقَ الْاَصْلَ আর মুতাবি' যদি মূলের (প্রথম হাদীসের) অনুরূপ হয় وَاِنْ وَافَقَ فِى اللَّفْظِ وَالْمَعْنٰى শব্দ ও অর্থ উভয়ের মধ্যে يُقَالُ مِثْلُهٗ তখন তাকে "مِثْلُهٗ" বলা হবে فِى الْمَعْنٰى আর যদি শুধু অর্থগতভাবে হয় دُوْنَ اللَّفْظِ শব্দ ব্যতীত يُقَالُ نَحْوُهٗ তখন তাকে " نَحْوُهٗ " বলবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَاِذَا رَوٰى رَاوٍ الخ -এর আলোচনা :

مَعْنَى الْمُتَابِعِ لُغَةً [মুতাবি'-এর আভিধানিক অর্থ] : اَلْمُتَابِعُ শব্দটি اِسْمُ فَاعِلٍ -এর সীগাহ। শাব্দিক অর্থ হলো- اَلْمُوَافِقُ বা অনুযায়ী, অনুসারী।

مَعْنَى الْمُتَابِعِ اِصْطِلَاحًا [মুতাবি'-এর পারিভাষিক অর্থ] : পারিভাষিক পরিচয় হলো- ড. মাহমূদ আত্-ত্বাহহানের মতে,
هُوَ اَنْ يُشَارِكَ الرَّاوِىْ غَيْرَهٗ فِىْ رِوَايَةِ الْحَدِيْثِ

مُقَدَّمَةُ الشَّيْخِ -এর মতে, وَاِذَا رَوٰى رَاوٍ حَدِيْثًا وَ رَوٰى رَاوٍ اٰخَرُ حَدِيْثًا مُوَافِقًا لَهٗ سُمِّىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مُتَابِعًا

উদাহরণ : مَا رَوَاهُ الشَّافِعِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلشَّهْرُ تِسْعٌ وَّعِشْرُوْنَ فَلَا تَصُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوُا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِيْنَ۔

অত্র হাদীসের مُتَابِعٌ تَامٌّ হলো- فَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىِّ عَنْ مَالِكٍ بِالْاِسْنَادِ نَفْسِهٖ وَفِيْهِ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِيْنَ۔

আর مُتَابِعٌ قَاصِرٌ হলো- فَمَا رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ طَرِيْقِ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَدِّهٖ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ "فَكَمِّلُوْا ثَلَاثِيْنَ"۔

قَوْلُهٗ وَلَهٗ مُتَابِعَاتٌ : মুহাদ্দিসগণ وَلَهٗ مُتَابِعَاتٌ বলে এটা প্রকাশ করেন, এর অর্থও এটাই। মুতাবিয়াত শক্তি এবং সহায়তা বর্ধিত করে। তবে মুতাবি' মর্যাদায় মূলের সমকক্ষ হওয়া জরুরি নয়, নিম্নমানেরও হয়। তবুও মুতাবিয়াতের শক্তি থাকবে। মুতাবিয়াত কখনো স্বয়ং রাবীর মধ্যে হয়, আর কখনো তার উপরস্থ শায়খের মধ্যে হয়। প্রথমটি দ্বিতীয়টি হতে পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। কেননা, প্রথম সনদে অধিকাংশ সময় দুর্বলতা হয়ে থাকে। মুতাবি' হাদীসের জন্য শর্ত উভয় হাদীসের রাবী একই ব্যক্তি হবেন।

مُتَابِعٌ সাধারণত দু প্রকার- ১. مُتَابِعٌ تَامٌّ ও ২. مُتَابِعٌ قَاصِرٌ

১. যদি মূল বর্ণনাকারীর ক্ষেত্রে مُتَابَعَتْ হয়, তবে مُتَابَعَتْ تَامٌّ বা 'পূর্ণ অনুসরণ' বলা হয়।

২. আর যদি রাবীর উপরে শায়খ অথবা শায়খের উপরে হয়, তাহলে একে مُتَابَعَتْ قَاصِرٌ বলা হয়।

প্রকাশ থাকে যে, যদি مُتَابِعٌ অনুসৃত হাদীসটি শব্দ ও অর্থ উভয় দিক হতে হুবহু হয়, তাকে نَحْوُهٗ বলে। যেমন- رَوٰى نَحْوُهٗ فُلَانٌ অর্থাৎ অমুকও তদনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আর শব্দের দিক হতে ভিন্ন থাকলেও অর্থের দিক হতে যদি উভয়টি অভিন্ন হয়, তবে তাকে مِثْلُهٗ বলে। যেমন- رَوٰى مِثْلُهٗ فُلَانٌ অর্থাৎ অমুকও তারই ন্যায় বর্ণনা করেছেন। এ শব্দের পার্থক্য এটাই।

وَيُشْتَرَطُ فِى الْمُتَابَعَةِ اَنْ يَّكُوْنَ الْحَدِيْثَانِ مِنْ صَحَابِيٍّ وَاحِدٍ وَاِنْ كَانَا مِنْ صَحَابِيَّيْنِ يُقَالُ لَهٗ شَاهِدٌ كَمَا يُقَالُ لَهٗ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيْثِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَيُقَالُ لَهٗ شَوَاهِدُ وَيَشْهَدُ بِهٖ حَدِيْثُ فُلَانٍ وَبَعْضُهُمْ يَخُصُّوْنَ الْمُتَابَعَةَ بِالْمُوَافَقَةِ فِى اللَّفْظِ وَالشَّاهِدَ فِى الْمَعْنٰى سَوَاءٌ كَانَ مِنْ صَحَابِىٍّ وَاحِدٍ اَوْ مِنْ صَحَابِيَيْنِ وَقَدْ يُطْلَقُ الشَّاهِدُ وَالْمُتَابِعُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ وَالْاَمْرُ فِىْ ذٰلِكَ بَيِّنٌ وَتَتَبُّعُ طُرُقِ الْحَدِيْثِ وَاَسَانِيْدِهَا لِقَصْدِ مَعْرِفَةِ الْمُتَابِعِ وَالشَّاهِدِ يُسَمَّى الْاِعْتِبَارُ -

অনুবাদ : مُتَابِعَاتٌ [মুতাবিয়াত]-এর জন্য শর্ত হলো যে, উভয় হাদীসের রাবী তথা সাহাবী একই ব্যক্তি হবেন। যদি একাধিক সাহাবী হতে বর্ণিত হয়, তবে তাকে শাহিদ (شَاهِدٌ) বলা হয়। যেমন, মুহাদ্দিসগণ বলেন– "আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীস দ্বারা এর সাক্ষী পাওয়া যায়"। আর বলা হয় وَيَشْهَدُ بِهٖ حَدِيْثُ فُلَانٍ কতেক মুহাদ্দিস ভাষার ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যতাকে মুতাবিয়াতের জন্য এবং শাহিদকে অর্থগত সামঞ্জস্যের জন্য খাস করেন। চাই উভয় হাদীস একজন সাহাবী বা একাধিক সাহাবী হতে বর্ণিত হোকনা কেন। কখনও কখনও মুতাবি' ও শাহিদ একই অর্থে ব্যবহৃত হয় এর কারণ সুস্পষ্ট। আর মুতাবি' ও শাহিদকে জানার উদ্দেশ্যে হাদীস বর্ণনার পদ্ধতি এবং এর সনদসমূহের সন্ধানকে ই'তিবার বলা হয়।

فَصْلٌ وَاَصْلُ اَقْسَامِ الْحَدِيْثِ ثَلٰثَةٌ صَحِيْحٌ وَحَسَنٌ وَضَعِيْفٌ فَالصَّحِيْحُ اَعْلٰى مَرْتَبَةً وَالضَّعِيْفُ اَدْنٰى وَالْحَسَنُ مُتَوَسِّطٌ وَسَائِرُ الْاَقْسَامِ الَّتِىْ ذُكِرَتْ دَاخِلَةٌ فِىْ هٰذِهِ الثَّلٰثَةِ فَالصَّحِيْحُ مَا يَثْبُتُ بِنَقْلِ عَدْلٍ تَامِّ الضَّبْطِ غَيْرِ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٍّ فَاِنْ كَانَتْ هٰذِهِ الصِّفَاتُ عَلٰى وَجْهِ الْكَمَالِ وَالتَّمَامِ فَهُوَ الصَّحِيْحُ لِذَاتِهٖ وَاِنْ كَانَ فِيْهِ نَوْعُ قُصُوْرٍ وَ وُجِدَ مَا يَجْبُرُ ذٰلِكَ الْقُصُوْرَ مِنْ كَثْرَةِ الطُّرُقِ فَهُوَ الصَّحِيْحُ لِغَيْرِهٖ وَاِنْ لَمْ يُوْجَدْ فَهُوَ الْحَسَنُ لِذَاتِهٖ وَمَا فُقِدَ فِيْهِ الشَّرَائِطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِى الصَّحِيْحِ كُلًّا اَوْ بَعْضًا فَهُوَ الضَّعِيْفُ -

পরিচ্ছেদ : মূলত হাদীস তিন প্রকার– ১. সহীহ, ২. হাসান ও ৩. দ্বা'ঈফ। মানের দিক দিয়ে সহীহ হচ্ছে সর্বোচ্চ এবং দ্বা'ঈফ হচ্ছে সর্বনিম্ন, আর হাসান হচ্ছে মধ্যম মানের। উপরে হাদীসের যতগুলো প্রকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা সবই এ তিন শ্রেণীর অন্তর্গত। সে হাদীসকে সহীহ বলা হয় যার রাবী আদিল [মুত্তাকী -পরহেজগার] ও তাম্মুযযবত [পূর্ণমাত্রায় সংরক্ষণকারী] হয় এবং মু'আল্লাল ও শায হয় না। এ বিশেষণসমূহ পূর্ণমাত্রায় পাওয়া গেলে তাকে সহীহ লি-যাতিহী বলা হয়। আর যদি তার মধ্যে কোনোরূপ দোষত্রুটি থাকে এবং তা বহুসূত্রে বর্ণিত হওয়ার দরুন সে দোষত্রুটিও ক্ষতিপূরণ হয়, তবে এ হাদীসকে সহীহ লি-গায়রিহী বলা হয়। আর যদি এ দোষত্রুটিও ক্ষতিপূরণ করার কোনো কিছু না পাওয়া যায়, তবে সে হাদীসকে হাসান লি-যাতিহী (সহজাত উত্তম) বলা হয়। আর হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য যেসব শর্তারোপ হয়, সে শর্তাবলি যদি কোনো হাদীসে পূর্ণ মাত্রায় বা আংশিকভাবে না পাওয়া যায়, তবে সে হাদীসকে দ্বা'ঈফ হাদীস বলা হয়।

শাব্দিক অনুবাদ : وَيُشْتَرَطُ فِى الْمُتَابَعَةِ আর মুতাবিয়াতের জন্য শর্ত হলো أَنْ يَكُوْنَ الْحَدِيْثَانِ مِنْ صَحَابِيٍّ وَاحِدٍ উভয় হাদীস একই সাহাবী হতে হবে وَإِنْ كَانَا مِنْ صَحَابِيَّيْنِ আর যদি উভয় হাদীস দুজন সাহাবী হতে হয় يُقَالُ لَهُ شَاهِدٌ তবে তাকে শাহেদ বলবে كَمَا يُقَالُ যেমনি বলা হয় لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيْثِ أَبِىْ هُرَيْرَةَ আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীস দ্বারা এর সাক্ষ্য পাওয়া যায় وَيَشْهَدُ بِهِ حَدِيْثُ فُلَانٍ ; لَهُ شَاهِدٌ এবং বলা হয় شَاهِدٌ এবং অমুকের হাদীস এর شَاهِدٌ হয়েছে وَيُقَالُ لَهُ شَوَاهِدُ وَبَعْضُهُمْ يَخُصُّوْنَ আর কিছু সংখ্যক সাহাবী মুতাবিয়াতের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন بِالْمُوَافَقَةِ فِى اللَّفْظِ ভাষার ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যতাকে الْمُتَابَعَةَ وَالشَّاهِدُ আর শাহিদকে অর্থের জন্য নির্দিষ্ট করেন فِى الْمَعْنٰى أَوْ مِنْ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ صَحَابِيٍّ وَاحِدٍ চাই তা একজন সাহাবীর থেকে হোক صَحَابِيَّيْنِ কিংবা দুজন সাহাবী থেকে হোক وَقَدْ يُطْلَقُ আর কখনো ব্যবহৃত হয় الشَّاهِدُ وَالْمُتَابِعُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ শাহিদ ও মুতাবি'কে একই সাথে وَالْأَمْرُ فِىْ ذٰلِكَ بَيِّنٌ আর এ বিষয়ে কারণ সুস্পষ্ট وَتَتَبُّعُ আর তালাশ করা طُرُقِ الْحَدِيْثِ হাদীসে বর্ণনার পদ্ধতি وَأَسَانِيْدِهَا এবং তার সনদসমূহ لِقَصْدِ مَعْرِفَةِ الْمُتَابِعِ وَالشَّاهِدِ মুতাবি' ও শাহিদকে জানার উদ্দেশ্যে يُسَمَّى الْاِعْتِبَارُ একে ই'তিবার বলা হয় فَصْلٌ পরিচ্ছেদ وَأَصْلُ أَقْسَامِ الْحَدِيْثِ ثَلَاثَةٌ মূলত হাদীস তিন ভাগে বিভক্ত صَحِيْحٌ وَحَسَنٌ وَضَعِيْفٌ সহীহ হাসান ও দ্বা'ঈফ فَالصَّحِيْحُ أَعْلٰى مَرْتَبَةً সহীহ হচ্ছে সর্বোচ্চ মর্যাদার وَالضَّعِيْفُ أَدْنٰى আর দ্বা'ঈফ হচ্ছে সর্বনিম্ন وَالْحَسَنُ مُتَوَسِّطٌ আর হাসান হচ্ছে মধ্যম মানের وَسَائِرُ الْاَقْسَامِ الَّتِىْ ذُكِرَتْ উপরে যেসব প্রকার উল্লিখিত হয়েছে সবগুলো دَاخِلَةٌ فِىْ هٰذِهِ الثَّلَاثَةِ এই তিন প্রকারের অন্তর্ভুক্ত فَالصَّحِيْحُ অতএব সহীহ হলো مَا يَثْبُتُ যা সাব্যস্ত হয়েছে بِنَقْلِ عَدْلٍ تَامِّ الضَّبْطِ ন্যায়সঙ্গত ও পরিপূর্ণ সংরক্ষণকারী বর্ণনা দ্বারা غَيْرِ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٍّ যা মু'আল্লাল ও শায নয় فَإِنْ كَانَتْ هٰذِهِ الصِّفَاتُ এ গুণগুলো যদি থাকে عَلٰى وَجْهِ الْكَمَالِ وَالتَّمَامِ পরিপূর্ণভাবে فَهُوَ الصَّحِيْحُ لِذَاتِهِ তাহলে একে সহীহ লিযাতিহী বলবে وَإِنْ كَانَ فِيْهِ আর যদি তাতে থাকে نَوْعُ قُصُوْرٍ কোনো প্রকারের দোষত্রুটি وَ وُجِدَ এবং এমন কিছু পাওয়া যায় مَا يُجْبَرُ ذٰلِكَ الْقُصُوْرُ যার দ্বারা এ দোষগুলো ক্ষতিপূরণ হয় مِنْ كَثْرَةِ الطُّرُقِ যথা বহু সনদের বর্ণনা فَهُوَ الصَّحِيْحُ لِغَيْرِهٖ তাহলে তাকে সহীহ লিগাইরিহী বলবে وَإِنْ لَمْ يُوْجَدْ আর যদি এ ক্ষতিপূরণের কিছু পাওয়া না যায় فَهُوَ الْحَسَنُ لِذَاتِهٖ তাহলে একে হাসান লিযাতিহী বলে وَمَا فَقَدَ فِيْهِ الشَّرَائِطُ আর ঐ সব শর্ত হারিয়ে যায় الْمُعْتَبَرَةُ فِى الصَّحِيْحِ যা সহীহ হবার জন্য পরিগণিত كُلًّا أَوْ بَعْضًا পূর্ণ মাত্রায় বা আংশিক فَهُوَ الضَّعِيْفُ তাহলে তাকে দ্বা'ঈফ হাদীস বলে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ فِى الْمُتَابَعَةِ الخ -এর আলোচনা :

مَعْنَى الشَّاهِدِ لُغَةً : اَلشَّاهِدُ শব্দটি اَلشَّهَادَةُ মাসদার হতে নির্গত। শাব্দিক অর্থ হলো– সাক্ষ্য প্রদানকারী। যেহেতু এটা অপর হাদীসের সাক্ষ্য দেয় এবং তাকে শক্তিশালী করে।

مَعْنَى الشَّاهِدِ اِصْطِلَاحًا [শাহিদের পারিভাষিক অর্থ] : পারিভাষিক পরিচয় হলো–

هُوَ الْحَدِيْثُ الَّذِىْ يُشَارِكُ فِيْهِ رُوَاتُهُ رُوَاةَ الْحَدِيْثِ الْفَرْدِ لَفْظًا وَمَعْنًى أَوْ مَعْنًى فَقَطْ مَعَ الْاِخْتِلَافِ فِى الصَّحَابِىِّ -

উদাহরণ : مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَمَةَ الْقَعْنَبِيِّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَفِيْهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِيْنَ -

অত্র হাদীসে শাহিদ হলো– مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَفِيْهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِيْنَ -

উল্লেখ্য যে, مُتَابِعٌ হাদীসের ক্ষেত্রে শর্ত হলো উভয় হাদীস একই সাহাবী হতে বর্ণিত হতে হবে। আর যদি একই সাহাবী হতে বর্ণিত না হয়, তবে একটি অপরটির জন্য شَاهِدٌ হিসাবে পরিগণিত হবে। কিছুসংখ্যক বলেন, উভয় হাদীস ভাষাগত দিক দিয়ে এক হলে বলবে مُتَابِعٌ আর অর্থগত দিক দিয়ে একইরূপ হলে বলবে شَاهِدٌ আর مُتَابِعٌ ও شَاهِدٌ -এর নির্ণয় এবং তাদের পরিচয় জানার জন্য হাদীসের পন্থা প্রক্রিয়া ও সনদসমূহ অন্বেষণ করাকে اِعْتِبَارٌ বা পর্যবেক্ষণ বলা হয়।

اَلصَّحِيْحُ -এর ব্যাখ্যা : যে হাদীসের সনদ মুত্তাসিল হবে, প্রত্যেক স্তরের বর্ণনাকারীগণ সর্বোতভাবে বিশ্বস্ত (عَادِلْ) ও পূর্ণমাত্রায় ধারণশক্তি সম্পন্ন (تَامُّ الضَّبْطِ) হবে এবং হাদীস মু'আল্লাল (مُعَلَّلْ) ও শায (شَاذْ) হবে না এবং যাদের সংখ্যা কোনো স্তরেই একজন হয়নি, এ প্রকার হাদীসকে সহীহ্ হাদীস বলা হয়।

ইমাম নববী (র.) লেখেছেন, যে হাদীসের সনদ নির্ভরযোগ্য ও সঠিকরূপে সংরক্ষণকারী বর্ণনাকারীদের সংযোজন পরম্পর পূর্ণ ও যাতে বিরল ও ত্রুটিযুক্ত রাবী একজনও নেই, তা-ই হাদীসে সহীহ। (اَلْمُقَدِّمَةُ عَلَى الْمُسْلِمِ)

আর উপরিউক্ত সকল গুণ বর্তমান থাকার পর রাবীদের স্মরণশক্তি যদি কিছুটা দুর্বল প্রমাণিত হয়, তবে সে হাদীসের পারিভাষিক নাম 'হাদীসে হাসান'।

ইমাম নববী (র.) বলেন, যে হাদীসের উৎস সর্বজন জ্ঞাত ও যার রাবীগণ সু-প্রখ্যাত, তা-ই 'হাদীসে হাসান'।

উল্লেখ্য যে, 'সহীহ' হাদীস চার ভাগে বিভক্ত। যথা–১. صَحِيْحٌ لِذَاتِهٖ ২. صَحِيْحٌ لِغَيْرِهٖ ৩. حَسَنٌ لِذَاتِهٖ ৪. حَسَنٌ لِغَيْرِهٖ

বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নরূপ :

ক. صَحِيْحٌ لِذَاتِهٖ -এর পরিচিতি :

১. মুফতী আমীমুল ইহসান (র.) বলেন– هُوَ خَبَرُ الْوَاحِدِ الْمُتَّصِلُ سَنَدُهٗ بِنَقْلِ عَدْلٍ تَامِّ الضَّبْطِ غَيْرُ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٍّ
অর্থাৎ এমন খবরে ওয়াহিদকে صَحِيْحٌ لِذَاتِهٖ বলা হয়, যা পূর্ণ সংরক্ষণশীল ও ন্যায়পরায়ণ রাবীর বর্ণনায় মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত হয়, যা মু'আল্লাল এবং শায হবে না।

২. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন– هُوَ مَا يُوْجَدُ فِيْهِ صِفَةُ مَقْبُوْلٍ وَالضَّبْطُ وَالْعَدَالَةُ غَيْرُ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٍّ

৩. কেউ কেউ বলেন, যে হাদীসের মধ্যে নিম্নলিখিত পাঁচটি শর্ত পাওয়া যাবে, তাকে صَحِيْحٌ لِذَاتِهٖ হাদীস বলা হবে। শর্তগুলো হচ্ছে– ক. হাদীসটি মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত হবে। খ. ন্যায়পরায়ণ রাবী বর্ণনা করবে। গ. পূর্ণ সংরক্ষণশীল রাবী কর্তৃক বর্ণিত হবে। ঘ. হাদীসটি মু'আল্লাল হবে না। ঙ. হাদীসটি শাযও হবে না।

উদাহরণ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِنِ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى التَّيْمِيُّ اَنَّهٗ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ الخ -

অত্র হাদীসটি মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত হয়েছে এবং এর বর্ণনাকারীগণ ন্যায়পরায়ণ এবং পূর্ণ সংরক্ষণকারী।

খ. صَحِيْحٌ لِغَيْرِهٖ -এর পরিচিতি :

১. উসূলুল হাদীসের পরিভাষায়, এমন খবরে ওয়াহিদকে صَحِيْحٌ لِغَيْرِهٖ বলে, যার মধ্যে صَحِيْحٌ لِذَاتِهٖ -এর সব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে, তবে এতে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় এবং তা বহুসূত্রে বর্ণনার ফলে দূরীভূত হয়ে যায়।

২. মুফতী আমীমুল ইহসান (র.) বলেন–

هُوَ خَبَرُ الْوَاحِدِ الْمُتَّصِلُ سَنَدُهٗ بِنَقْلِ عَدْلٍ تَامِّ الضَّبْطِ غَيْرِ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٍّ فَاِنْ تَعَدَّدَتْ طُرُقُهٗ فَهُوَ الصَّحِيْحُ لِغَيْرِهٖ -

উদাহরণ : حَدَّثَنَا اَبُوْكُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِيْ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ -

অত্র হাদীসের বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইবনে আমর একজন ন্যায়পরায়ণ রাবী হওয়া সত্ত্বেও তার স্মৃতিশক্তি কিছুটা কম ছিল।

গ. اَلْحَسَنُ لِذَاتِهٖ -এর পরিচিতি :

১. উসূলুল হাদীসের পরিভাষায়– هُوَ الْحَدِيْثُ الَّذِىْ لَا يُوْجَدُ فِيْهِ كُلُّ شَرَائِطِ لِلْحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ

অর্থাৎ এমন হাদীসকে حَسَنْ لِذَاتِهٖ হাদীস বলা হয়, যে হাদীসে صَحِيْح হাদীসের সকল বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় না।

২. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, যে হাদীসের মধ্যে সহীহ হাদীসের বৈশিষ্ট্য কম থাকে এবং তা দূর করার কোনো পদ্ধতি থাকে না, তাকে حَسَنْ لِذَاتِهٖ হাদীস বলা হয়।

উদাহরণ :

عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُوْرُ ـ

এ হাদীসটিতে সহীহ হাদীসের যাবতীয় শর্তাবলি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও একজন বর্ণনাকারীর স্মরণশক্তিতে কিছুটা দুর্বলতা আছে।

৪. اَلْحَسَنُ لِغَيْرِهٖ -এর পরিচিতি :

১. هُوَ الْحَدِيْثُ الضَّعِيْفُ الَّذِىْ رُوِىَ مُخْتَلِفًا فَيَكُوْنُ مُوَافِقًا لِدَلِيْلِ الشَّرِيْعَةِ ـ

অর্থাৎ এমন দুর্বল হাদীসকে حَسَنْ لِغَيْرِهٖ হাদীস বলা হয়, যে হাদীস বিভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে এবং তা শরিয়তের দলিলের উপযোগী হয়েছে।

২. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, যে খবরে ওয়াহিদ-এর মধ্যে কবুল এবং রদ উভয় দিকই সমপর্যায়ের হয়, আর উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়ার ফলে কবুলের দিক অগ্রাধিকার লাভ করে, তাকে حَسَنْ لِغَيْرِهٖ হাদীস বলা হয়।

৩. ড. মাহমূদ আত্-ত্বাহহানের মতে, هُوَ الضَّعِيْفُ إِذَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهٗ وَلَمْ يَكُنْ سَبَبُ ضُعْفِهٖ فِسْقَ الرَّاوِىْ اَوْكِذْبَهٗ

উদাহরণ : طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ

এ হাদীসের প্রতিটি সনদ مَرْفُوْعٌ হওয়া সত্ত্বেও দুর্বল। সনদ দুর্বল হলেও একাধিক পদ্ধতিতে বর্ণিত হওয়ায় হাদীসখানি শক্তিশালী হয়েছে এবং বর্জনের স্তর থেকে গ্রহণযোগ্যতার স্তরে উন্নীত হয়েছে।

وَالضَّعِيْفُ اِنْ تَعَدَّدَ طُرُقُهٗ وَانْجَبَرَ ضُعْفُهٗ يُسَمّٰى حَسَنًا لِغَيْرِهٖ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ اَنَّهٗ يَجُوْزُ اَنْ يَكُوْنَ جَمِيْعُ الصِّفَاتِ الْمَذْكُوْرَةِ فِى الصَّحِيْحِ نَاقِصًا فِى الْحَسَنِ لٰكِنَّ التَّحْقِيْقَ اَنَّ النُّقْصَانَ الَّذِىْ اُعْتُبِرَ فِى الْحَسَنِ اِنَّمَا هُوَ بِخِفَّةِ الضَّبْطِ وَبَاقِى الصِّفَاتِ بِحَالِهَا ـ

অনুবাদ : আর দ্বা'ঈফ হাদীস যদি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয় এবং এর দুর্বলতা দূরীভূত হয়ে যায় তবে এই হাদীসকে হাদীসে হাসান লিগাইরিহী (حَسَنٌ لِغَيْرِهٖ) বলা হয়। অতএব, বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য যাবতীয় বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি যা সহীর ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছে হাসান হাদীসের ক্ষেত্রে তা নাকিস বা অপূর্ণ। কিন্তু গভীর নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণ দ্বারা প্রমাণ হয় যে, হাসান হাদীসের ক্ষেত্রে যে দোষত্রুটির কথা গণ্য হয় তা হলো রাবীর স্মরণশক্তির স্বল্পতা। আর অন্যান্য বৈশিষ্ট্যাবলি পুরা মাত্রায়ই বহাল থাকে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَالضَّعِيْفُ اِنْ تَعَدَّدَ طُرُقُهٗ আর দ্বা'ঈফ যদি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয় وَانْجَبَرَ ضُعْفُهٗ এবং তার দুর্বলতা দূরীভূত হয় يُسَمّٰى حَسَنًا لِغَيْرِهٖ তবে তাকে হাসান লিগাইরিহী বলা হয় فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ অতএব তাদের এ কথা দ্বারা বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় যে, اَنَّهٗ يَجُوْزُ اَنْ يَكُوْنَ جَمِيْعُ الصِّفَاتِ এটা বিশুদ্ধ যে, যেসব গুণাবলি পাওয়া যায় الْمَذْكُوْرَةِ فِى الصَّحِيْحِ যা সহীর মধ্যে উল্লিখিত হয়েছে نَاقِصًا فِى الْحَسَنِ তা হাসানের ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ পাওয়া যাবে لٰكِنَّ التَّحْقِيْقَ কিন্তু গভীর পরীক্ষা দ্বারা বুঝা যায় যে, اَنَّ النُّقْصَانَ যেসব অসম্পূর্ণতা الَّذِىْ اُعْتُبِرَ فِى الْحَسَنِ যা হাসানের ক্ষেত্রে গণ্য হয় اِنَّمَا هُوَ بِخِفَّةِ الضَّبْطِ তা হলো রাবীর স্মরণশক্তির স্বল্পতা وَبَاقِى الصِّفَاتِ بِحَالِهَا আর অন্যান্য গুণাবলি পূর্ণই বহাল থাকবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَ الضَّعِيْفُ اِنْ تَعَدَّدَ الخ -এর আলোচনা :

مَعْنَى الضَّعِيْفِ لُغَةً [দ্বা'ঈফের আভিধানিক অর্থ] : ضَعِيْفٌ শব্দটি قَوِىٌّ -এর বিপরীত। এর শাব্দিক অর্থ হলো– দুর্বল। মূলত ضَعِيْفٌ দুই রকম حِسِّىٌّ ও مَعْنَوِىٌّ এখানে ضَعِيْفٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اَلضَّعِيْفُ الْمَعْنَوِىُّ

مَعْنَى الضَّعِيْفِ اِصْطِلَاحًا [দ্বা'ঈফের পারিভাষিক অর্থ] : هُوَ مَا لَمْ يَجْمَعْ صِفَةُ الْحَسَنِ بِفَقْدِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوْطِهٖ অর্থাৎ যার মধ্যে حَسَنٌ -এর শর্তসমূহ হতে কোনো শর্ত পাওয়া যায়নি।

ইমাম اليقونى বলেন– وَكُلُّ مَا عَنْ رُتْبَةِ الْحَسَنِ قَصُرَ فَهُوَ الضَّعِيْفُ

আর مقدمة الشيخ -এর মতে, اِمَّا فُقِدَ فِيْهِ الشَّرَائِطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِى الصَّحِيْحِ كُلًّا اَوْ بَعْضًا فَهُوَ الضَّعِيْفُ

উদাহরণ :

مَا اَخْرَجَهُ التِّرْمِذِىُّ مِنْ طَرِيْقِ حَكِيْمِ الْاَثْرَمِ عَلٰى اَبِىْ تَمِيْمَةَ الْهُجَيْمِىْ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَتٰى حَائِضًا اَوْ اِمْرَاَةً فِىْ دُبُرِهَا اَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا اُنْزِلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ ـ ثُمَّ وَضَعَّفَ الْبُخَارِىُّ هٰذَا الْحَدِيْثَ مِنْ قِبَلِ اِسْنَادِهٖ ـ

وَالْعَدَالَةُ مَلَكَةٌ فِى الشَّخْصِ تَحْمِلُهُ عَلٰى مُلَازَمَةِ التَّقْوٰى وَالْمُرُوَّةِ وَالْمُرَادُ بِالتَّقْوٰى اِجْتِنَابُ الْاَعْمَالِ السَّيِّئَةِ مِنَ الشِّرْكِ وَالْفِسْقِ وَالْبِدْعَةِ وَفِى الْاِجْتِنَابِ عَنِ الصَّغِيْرَةِ خِلَافٌ وَالْمُخْتَارُ عَدَمُ اِشْتِرَاطِهِ لِخُرُوْجِهِ عَنِ الطَّاقَةِ اِلَّا الْاِصْرَارُ عَلَيْهَا لِكَوْنِهِ كَبِيْرَةً وَالْمُرَادُ بِالْمُرُوَّةِ التَّنَزُّهُ عَنْ بَعْضِ الْخَسَائِسِ وَالنَّقَائِصِ الَّتِىْ هِىَ خِلَافُ مُقْتَضَى الْهِمَّةِ وَالْمُرُوَّةِ مِثْلُ بَعْضِ الْمُبَاحَاتِ الدَّنِيْئَةِ كَالْاَكْلِ وَالشُّرْبِ فِى السُّوْقِ وَالْبَوْلِ فِى الطَّرِيْقِ وَاَمْثَالُ ذٰلِكَ وَيَنْبَغِىْ اَنْ يُعْلَمَ اَنَّ عَدْلَ الرِّوَايَةِ اَعَمُّ مِنْ عَدْلِ الشَّهَادَةِ فَاِنَّ عَدْلَ الشَّهَادَةِ مَخْصُوْصٌ بِالْحُرِّ وَعَدْلُ الرِّوَايَةِ يَشْتَمِلُ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ وَالْمُرَادُ بِالضَّبْطِ حِفْظُ الْمَسْمُوْعِ وَتَثْبِيْتُهُ مِنَ الْفَوَاتِ وَالْاِخْتِلَالِ بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ مِنْ اِسْتِحْضَارِهٖ وَهُوَ قِسْمَانِ ضَبْطُ الصَّدْرِ وَضَبْطُ الْكِتَابِ فَضَبْطُ الصَّدْرِ بِحِفْظِ الْقَلْبِ وَوَعْيِهٖ وَضَبْطُ الْكِتَابِ بِصِيَانَتِهٖ عِنْدَهٗ اِلٰى وَقْتِ الْاَدَاءِ .

অনুবাদ : আদালাত হলো ব্যক্তির এমন একটি শক্তি বা গুণ যা মানুষকে আল্লাহভীতি ও সৌজন্যবোধে অভ্যস্ত করে। আল্লাহভীতি বা তাকওয়ার অর্থ এই যে, মন্দকর্ম বা শিরক, ফিসক [অপকর্ম] ও বিদআত হতে মুক্ত থাকা। তবে সগীরা গুনাহ হতে বিরত থাকার বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। গ্রহণীয় মত হলো, এক্ষেত্রে সগীরা গুনাহ পরিহার করা শর্ত নয়। কেননা, এটা মানুষের ক্ষমতা বহির্ভূত কাজ। অবশ্য বারবার তথা পর্যায়ক্রমে সগীরা গুনাহ করতে থাকলে তা কবীরা গুনাহে পরিণত হয় (اِصْرَارُ الصَّغِيْرَةِ كَبِيْرَةٌ)

আর সৌজন্যবোধ (مُرُوَّتْ) দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে যে, এমন কিছু হীন ও নিকৃষ্ট আচরণ হতে নিজকে মুক্ত রাখা যা সাহসিকতা ও মনুষ্যত্ব বিরোধী। যেমন কিছু নিকৃষ্ট ও নিচু বৈধ বস্তু উদাহরণত বাজারে পানাহার করা, রাস্তাঘাটে প্রস্রাব করা ইত্যাদি।

আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে যে, হাদীস রেওয়ায়েতের আদালাত ও শাহাদাতের আদালাতের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। হাদীস বর্ণনার আদালাত, শাহাদাতের [সাক্ষ্য] আদালাত হতে সাধারণ। কারণ, আদলে শাহাদাত মুক্ত ও স্বাধীন হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত, আর হাদীস রেওয়ায়েতের জন্য স্বাধীন ব্যক্তি ও কৃতদাস উভয়ই শামিল রয়েছে।

মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় বর্ণিত ضَبْط [সংরক্ষণ শক্তি] দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, শ্রুত জিনিসগুলো যাতে শ্রবণকারী মনের মধ্যে গেঁথে রাখতে সমর্থ হয় এবং ছুটে যাওয়া ও জড়তা হতে দৃঢ় হওয়া। এমন স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়া এবং প্রয়োজনবোধে তা উপস্থাপন করতে সমর্থ হওয়া। আর স্মরণশক্তি (ضَبْط) দু প্রকার– ক. যব্‌তে সদর, খ. যব্‌তে কিতাব। অন্তর তথা হৃদয়পটে সংরক্ষিত রাখার নাম হলো যব্‌তে সদর ও অন্যের নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত তাকে নিজের নিকট লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করার নামই হলো যব্‌তে কিতাব।

শাব্দিক অনুবাদ : وَالْعَدَالَةُ مَلَكَةٌ فِى الشَّخْصِ আদালাত হলো মানুষের এমন গুণ বা শক্তি تَحْمِلُهُ যা তাকে বাধ্য করে عَلٰى مُلَازَمَةِ التَّقْوٰى وَالْمُرُوَّةِ আল্লাহভীরুতা ও মানবতাকে আঁকড়ে ধরতে وَالْمُرَادُ بِالتَّقْوٰى আর আল্লাহ ভীতি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اِجْتِنَابُ الْاَعْمَالِ السَّيِّئَةِ মন্দ কর্ম হতে বেঁচে থাকা مِنَ الشِّرْكِ وَالْفِسْقِ وَالْبِدْعَةِ শিরক, অপকর্ম ও

বিদআত হতে وَفِي الْاِجْتِنَابِ عَنِ الصَّغِيْرَةِ خِلَافٌ আর সগীরা গুনাহ হতে বেঁচে থাকার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে وَالْمُخْتَارُ তবে গ্রহণীয় মত হলো عَدَمُ اِشْتِرَاطِهِ সগীরা গুনাহ হতে বিরত থাকা শর্ত নয় لِخُرُوْجِهِ عَنِ الطَّاقَةِ কেননা, এটা মানুষের ক্ষমতা বহির্ভূত اِلَّا الْاِصْرَارُ عَلَيْهَا তবে তা বারবার করা শর্ত لِكَوْنِهِ كَبِيْرَةً কেননা, এর ফলে কবীরা হয়ে যায় وَالْمُرَادُ بِالْمُرُوْءَةِ আর মানবিকতা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اَلتَّنَزُّهُ মুক্ত রাখা عَنْ بَعْضِ الْخَسَائِسِ وَالنَّقَائِصِ কতিপয় হীন ও নিকৃষ্ট আবরণ হতে مِثْلُ بَعْضِ الْمُبَاحَاتِ الَّتِيْ هِيَ خِلَافُ مُقْتَضَى الْهِمَّةِ وَالْمُرُوْءَةِ যা মনুষ্যত্ব ও সাহসিকতা বিরোধী যেমন কিছু নিকৃষ্ট ও নিচু বৈধ বস্তু كَالْاَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي السُّوْقِ উদাহরণত বাজারে পানাহার করা وَالْبَوْلِ فِي الدَّنِيَّةِ রাস্তায় পেশাব করা وَاَمْثَالُ ذٰلِكَ এরূপ অন্যান্য وَيَنْبَغِيْ اَنْ يُعْلَمَ আর এটা জেনে রাখা উচিত যে اَنَّ عَدْلَ الرِّوَايَةِ الطَّرِيْقِ হাদীস বর্ণনার আদালাত اَعَمُّ مِنْ عَدْلِ الشَّهَادَةِ শাহাদাতের আদালাত হতে সাধারণ فَاِنَّ عَدْلَ الشَّهَادَةِ কেননা, শাহাদাতের আদালাত مَخْصُوْصٌ بِالْحُرِّ স্বাধীন হওয়ার সাথে নির্দিষ্ট وَعَدْلُ الرِّوَايَةِ আর রেওয়ায়েতের আদালাত يَشْتَمِلُ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ স্বাধীন ও দাস উভয়কে শামিল করে وَالْمُرَادُ بِالضَّبْطِ আর সংরক্ষণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো حِفْظُ الْمَسْمُوْعِ শ্রুত জিনিস মুখস্থ রাখা وَتَثْبِيْتُهُ مِنَ الْفَوَاتِ وَالْاِخْتِلَالِ এবং তা ছুটে যাওয়া ও জড়তা সৃষ্টি হতে দৃঢ় থাকা بِحَيْثُ এভাবে যে, يَتَمَكَّنُ مِنْ اِسْتِحْضَارِهِ প্রয়োজন বোধে তা উপস্থাপন করতে সক্ষম হয় وَهُوَ قِسْمَانِ আর এই ضَبْطٌ দু প্রকার ضَبْطُ الصَّدْرِ وَضَبْطُ الْكِتَابِ যবতে সদর ও যবতে কিতাব فَضَبْطُ الصَّدْرِ আর যবতে সদর হলো بِحِفْظِ الْقَلْبِ وَ وَعْيِهِ অন্তর তথা স্মৃতিপটে সংরক্ষণ করা وَضَبْطُ الْكِتَابِ আর যবতে কিতাব হলো بِصِيَانَتِهِ عِنْدَهُ তার নিজের নিকট সংরক্ষণ করা اِلٰى وَقْتِ الْاَدَاءِ অন্যের নিকট পৌছানো পর্যন্ত।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْعَدَالَةُ الخ -এর আলোচনা :

مَعْنَى الْعَدَالَةِ لُغَةً [আদালাতের আভিধানিক অর্থ] : عَدَالَةٌ শব্দটি বাবে ضَرَبَ -এর মাসদার, মূলবর্ণ (ع ـ د ـ ل) জিনসে صَحِيْح আভিধানিক অর্থ হচ্ছে–

১. ন্যায়পরায়ণতা। এ অর্থে কুরআনে এসেছে– اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى

২. সমান সমান হওয়া। যেমন বলা হয়– عَدَلَ الْمِيْزَانُ

৩. অংশীদারিত্ব স্থাপন করা। এ অর্থে কুরআনে এসেছে– " ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ "

৪. ইনসাফ করা ইত্যাদি।

مَعْنَى الْعَدَالَةِ اِصْطِلَاحًا [আদালতের পারিভাষিক অর্থ] :

১. উসূলে হাদীসের পরিভাষায়–

اَلْعَدَالَةُ هِيَ اَنْ يَكُوْنَ الرَّاوِيْ صَادِقًا فِيْ رِوَايَةِ الْحَدِيْثِ مُحَافِظًا عَلَى التَّقْوٰى وَسَالِمًا مِنْ اَسْبَابِ الْفِسْقِ وَخَوَادِمِ الْمُرُوْءَةِ ـ

অর্থাৎ عَدَالَتْ হচ্ছে বর্ণনাকাকারী হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সত্যবাদী হওয়া, আল্লাহ ভীরুতার প্রতি যত্নবান হওয়া এবং পাপচারিতা ও ভদ্রতাবিরোধী যাবতীয় উপায়-উপকরণ থেকে নিরাপদ থাকা।

২. مَنَار গ্রন্থকার বলেন– اَلْعَدَالَةُ هِيَ الْاِسْتِقَامَةُ فِي الدِّيْنِ

৩. শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (র.) বলেন–

اَلْعَدَالَةُ هِيَ مَلَكَةٌ فِي الشَّخْصِ تَحْمِلُهُ عَلٰى مُلَازَمَةِ الْمُرُوْءَةِ وَالتَّقْوٰى

৪. ড. আদীব সালিহ বলেন–

اَلْعَدَالَةُ هِيَ مَلَكَةٌ تَحْمِلُ صَاحِبَهَا عَلٰى مُلَازَمَةِ الدِّيْنِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى التَّقْوٰى وَالْاَخْلَاقِ وَالْمُرُوْءَةِ مِمَّا يُبْعَثُ عَلَى الثِّقَةِ بِصِدْقِهٖ وَاَمَانَتِهٖ ـ

৫. فَتْحُ الْمُلْهِمْ -এর গ্রন্থকার বলেন– اَلْعَدَالَةُ هِيَ مَلَكَةٌ تَمْنَعُ عَنْ اِقْتِرَانِ الْكَبَائِرِ وَالْاِصْرَارِ عَلَى الصَّغَائِرِ

قَوْلُهٗ وَالْمُرَادُ بِالْمُرُوْءَةِ الخ :

مَعْنَى الْمُرُوْءَةِ لُغَةً [مُرُوْءَةٌ-এর আভিধানিক অর্থ] : مُرُوْءَةٌ -এর আভিধানিক অর্থ– মানবিকতা।

مَعْنَى الْمُرُوْءَةِ اِصْطِلَاحًا [مُرُوْءَةٌ-এর পারিভাষিক অর্থ] : পারিভাষিক পরিচয় হলো– হীন, তুচ্ছ ও অশোভনীয় কাজ হতে বিরত থাকা যা উচ্চ মান-মর্যাদার পরিপন্থি। যেমন– বাজারে প্রকাশ্যে পানাহার করা, রাস্তাঘাটে পায়খানা পেশাব করা।

اَلْفَرْقُ بَيْنَ عَدْلِ الشَّهَادَةِ وَعَدْلِ الرِّوَايَةِ [رِوَايَة-এর عَدْل ও شَهَادَة-এর عَدْل -এর মাঝে পার্থক্য] :

১. رِوَايَة -এর عَدْل হলো عَامّ আর شَهَادَة -এর عَدْل হলো খাস।

২. عَدْلُ الشَّهَادَةِ স্বাধীন ব্যক্তির সাথে নির্দিষ্ট, কিন্তু عَدْلُ الشَّهَادَةِ এরূপ নয়।

৩. বর্ণনার জন্য পূর্ণাঙ্গ আদালাত শর্ত আর شَهَادَة -এর জন্য পূর্ণাঙ্গ আদালত শর্ত নয়।

قَوْلُهٗ وَالْمُرَادُ بِالضَّبْطِ الخ -এর আলোচনা :

مَعْنَى الضَّبْطِ لُغَةً [যবতের আভিধানিক অর্থ] : ضَبْط শব্দটি বাবে ضَرَبَ -এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ হলো– আত্মস্থ করা, সংরক্ষণ করা, শক্তিশালী করা এবং মজবুত করা ইত্যাদি।

مَعْنَى الضَّبْطِ اِصْطِلَاحًا [যবতের পারিভাষিক অর্থ] :

১. مُقَدَّمَةُ الشَّيْخ এ বর্ণিত হয়েছে যে اَلضَّبْطُ هُوَ حِفْظُ الْمَسْمُوْعِ وَتَثْبِيْتُهٗ مِنَ الْفَوَاتِ وَالْاِخْتِلَافِ حَيْثُ يَتَمَكَّنُ مِنْ اِسْتِحْضَارِهٖ অর্থ শ্রুত বিষয়কে জড়তা ও বিনষ্ট হওয়া থেকে এমনভাবে সংরক্ষণ করা যাতে প্রয়োজনের সময় উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়।

২. মোল্লাজীয়ন (র.)-এর মতে,

اَلضَّبْطُ هُوَ سَمَاعُ الْكَلَامِ كَمَا يَحِقُّ سَمَاعَهٗ ثُمَّ فَهْمُهٗ بِمَعْنَاهُ الَّذِيْ اُرِيْدَ بِهٖ ثُمَّ حِفْظُهٗ بِبَذْلِ الْجُهُوْدِ ـ

৩. عِلْمُ الْمُصْطَلَح গ্রন্থকার বলেন– اَلضَّبْطُ هُوَ الْجَزْمُ فِي الْحِفْظِ

اَقْسَامُ الضَّبْطِ وَتَعْرِيْفُهَا [যবতের প্রকারভেদ ও তার সংজ্ঞা] :

ضَبْط দু প্রকার– ১. ضَبْطُ الصَّدْرِ ও ২. ضَبْطُ الْكِتَابِ

হাদীস শিক্ষাদানকারীর শব্দাবলি সংরক্ষণ করাকে ضَبْطُ الصَّدْرِ বলে আর যে কিতাবে শায়খের শব্দাবলি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তা অন্যের নিকট বর্ণনা করা পর্যন্ত সংরক্ষণ করাকে ضَبْطُ الْكِتَابِ বলা হয়।

فَصْلٌ اَمَّا الْعَدَالَةُ فَوُجُوْهُ الطَّعْنِ الْمُتَعَلِّقَةُ بِهَا خَمْسٌ اَلْاَوَّلُ بِالْكِذْبِ وَالثَّانِىْ بِاتِّهَامِه بِالْكِذْبِ وَالثَّالِثُ بِالْفِسْقِ وَالرَّابِعُ بِالْجَهَالَةِ وَالْخَامِسُ بِالْبِدْعَةِ وَالْمُرَادُ بِكِذْبِ الرَّاوِىْ اَنَّهٗ ثَبَتَ كِذْبُهٗ فِى الْحَدِيْثِ النَّبَوِىِّ ﷺ اِمَّا بِاِقْرَارِ الْوَاضِعِ اَوْ بِغَيْرِ ذٰلِكَ مِنَ الْقَرَائِنِ وَالْحَدِيْثُ الْمَطْعُوْنُ بِالْكِذْبِ يُسَمّٰى مَوْضُوْعًا وَمَنْ ثَبَتَ عَنْهُ تَعَمُّدُ الْكِذْبِ فِى الْحَدِيْثِ وَاِنْ كَانَ وُقُوْعُهٗ فِى الْعُمُرِ مَرَّةً وَاِنْ تَابَ مِنْ ذٰلِكَ لَمْ يُقْبَلْ حَدِيْثُهٗ اَبَدًا بِخِلَافِ شَاهِدِ الزُّوْرِ اِذَا تَابَ فَالْمُرَادُ بِالْحَدِيْثِ الْمَوْضُوْعِ فِىْ اِصْطِلَاحِ الْمُحَدِّثِيْنَ هٰذَا لَا اَنَّهٗ ثَبَتَ كِذْبُهٗ وَعُلِمَ ذٰلِكَ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ بِخُصُوْصِه وَالْمَسْاَلَةُ ظَنِّيَّةٌ وَالْحُكْمُ بِالْوَضْعِ وَالْاِفْتِرَاءِ بِحُكْمِ الظَّنِّ الْغَالِبِ وَلَيْسَ اِلَى الْقَطْعِ وَالْيَقِيْنِ بِذٰلِكَ سَبِيْلٌ فَاِنَّ الْكَذُوْبَ قَدْ يَصْدُقُ وَبِهٰذَا يَنْدَفِعُ مَا قِيْلَ فِىْ مَعْرِفَةِ الْوَضْعِ بِاِقْرَارِ الْوَاضِعِ اِنَّهٗ يَجُوْزُ اَنْ يَكُوْنَ كَاذِبًا فِىْ هٰذَا الْاِقْرَارِ فَاِنَّهٗ يُعْرَفُ صِدْقُهٗ بِغَالِبِ الظَّنِّ وَلَوْلَا ذٰلِكَ لَمَا سَاغَ قَتْلُ الْمُقِرِّ بِالْقَتْلِ وَلَا رَجْمُ الْمُعْتَرِفِ بِالزِّنَا فَافْهَمْ ـ

অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : যে সকল কাজ আদালাতের অন্তরায় বা বৈপরীত্য তা হলো পাঁচটি– ১. রাবী মিথ্যাবাদী হওয়া, ২. মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়া, ৩. ফাসিকীর সাথে যুক্ত হওয়া, ৪. রাবীর অপরিচিতি, ৫. রাবী বিদ'আতী হওয়া। كِذْب رَاوِىْ (রাবীর মিথ্যাবাদী হওয়া)-এর অর্থ হলো– হাদীসে নববীতে স্বয়ং রাবীর স্বীকারোক্তিতে অথবা অন্য নিদর্শনের মাধ্যমে মিথ্যা প্রমাণিত হওয়া। সুতরাং যার হাদীসে মিথ্যার দোষে দুষ্ট প্রমাণিত হয় তা-ই মাওযূ। আর যার সম্পর্কে হাদীসের ব্যাপারে ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা বলা প্রমাণিত হয়, তার হাদীস কখনও গ্রহণযোগ্য হবে না, যদিও সে জীবনে মাত্র একবারই এরূপ করে থাকে না কেন? তারপর খালিস তওবাও করে তবুও না। পক্ষান্তরে সাক্ষীর ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হলে হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো দুষ্ট প্রভাব রাখে না যদি সে তওবা করে। মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় মাওযূ হাদীসের অর্থ এটাই। যার পক্ষ হতে মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে তার হাদীস মাওযূ হবে এমন অর্থ নয়। এই মিথ্যাবাদিতা বিশেষভাবে এ হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট একথা ভালোভাবে জেনে রাখা উচিত। এটা একটি ধারণাগত বিষয়, আর প্রবল ধারণার ভিত্তিতেই মিথ্যা রচনা সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করা যায়। তবে এ মিথ্যা প্রতিপন্ন করাটা নিশ্চিতভাবে ও দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলার কোনো অবকাশ নেই। এটা হচ্ছে মিথ্যা আবিষ্কারের পথ। কেননা, মিথ্যাবাদী ব্যক্তি কোনো কোনো সময় সত্যও বলে থাকে। হাদীস রচনাকারীর স্বীকারোক্তি দ্বারা যে মিথ্যা রচনার কথা জানা যাবে, এটা দ্বারা তা প্রত্যাখ্যাত হয়। কেননা, এ স্বীকারোক্তিতেও সে মিথ্যাবাদী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কাজেই প্রবল ধারণা দ্বারাই তার সত্যতার পরিচয়ও পাওয়া যেতে পারে। যদি এরূপ না হতো তবে হত্যার অপরাধ স্বীকারকারীকে হত্যা করা এবং ব্যভিচারের স্বীকারোক্তিকারীকে রজমের শাস্তি দেওয়া বৈধ হতো না। অতএব, বিষয়টি ভালোভাবে বুঝে নাও।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ أَمَّا الْعَدَالَةُ অতএব আদালত فَوُجُوهُ الطَّعْنِ الْمُتَعَلِّقَةُ بِهَا এর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্তরায়সমূহ خَمْسٌ পাঁচটি الْأَوَّلُ بِالْكِذْبِ প্রথম হলো রাবী মিথ্যাবাদী হওয়া وَالثَّانِي بِاتِّهَامِهِ بِالْكِذْبِ দ্বিতীয় হলো মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়া وَالثَّالِثُ بِالْفِسْقِ তৃতীয় হলো ফাসিকী কাজ করা وَالرَّابِعُ بِالْجَهَالَةِ চতুর্থ হলো রাবী অপরিচিত হওয়া وَالْخَامِسُ بِالْبِدْعَةِ আর পঞ্চম হলো রাবী বিদআতী হওয়া وَالْمُرَادُ بِكِذْبِ الرَّاوِيْ রাবীর মিথ্যাবাদী হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো أَنَّهُ ثَبَتَ كِذْبُهُ فِي الْحَدِيْثِ النَّبَوِيِّ ﷺ হাদীসে নববীতে তার মিথ্যা প্রমাণিত হওয়া إِمَّا بِإِقْرَارِ الْوَاضِعِ হয়তো বা তা রাবীর স্বীকারোক্তির মাধ্যমে أَوْ بِغَيْرِ ذٰلِكَ مِنَ الْقَرَائِنِ অথবা অন্য কোনো নিদর্শনের মাধ্যমে وَالْحَدِيْثُ الْمَطْعُوْنُ بِالْكِذْبِ সুতরাং মিথ্যার অভিযোগ অভিযুক্ত হাদীসকে يُسَمّٰى مَوْضُوْعًا মাওযূ বলা হবে وَمَنْ ثَبَتَ عَنْهُ আর যার থেকে এটা প্রমাণিত হবে যে, تَعَمُّدُ الْكِذْبِ فِي الْحَدِيْثِ হাদীসের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় মিথ্যা বলা وَإِنْ كَانَ وُقُوْعُهُ فِي الْعُمْرِ مَرَّةً যদিও সে তার জীবনে এটা একবার বলুক وَإِنْ تَابَ مِنْ ذٰلِكَ যদি সে এটা হতে তওবাও করে لَمْ يُقْبَلْ حَدِيْثُهُ أَبَدًا তার হাদীস কখনো গৃহীত হবে না بِخِلَافِ شَاهِدِ الزُّوْرِ মিথ্যা সাক্ষী এর বিপরীত إِذَا تَابَ যদি সে তওবা করে فَالْمُرَادُ আর হাদীসে মাওযূ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো فِي اصْطِلَاحِ الْمُحَدِّثِيْنَ মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় هٰذَا এটাই بِالْحَدِيْثِ الْمَوْضُوْعِ যার পক্ষ হতে মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে তার হাদীস মাওযূ হবে এমন নয় لَا أَنَّهُ ثَبَتَ كِذْبُهُ ذٰلِكَ وَعُلِمَ ফলে এটা জানা গেল যে وَالْمَسْأَلَةُ ظَنِّيَّةٌ এ মিথ্যাবাদিতা শুধু এ হাদীসের সাথেই নির্দিষ্ট فِي هٰذَا الْحَدِيْثِ بِخُصُوْصِهِ আর এটা একটি ধারণাগত বিষয় وَالْحُكْمُ بِالْوَضْعِ وَالْاِفْتِرَاءِ আর মিথ্যা ও বানানো রচনা সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করা যায় بِحُكْمِ الظَّنِّ الْغَالِبِ প্রবল ধারণার ভিত্তিতেই وَلَيْسَ إِلَى الْقَطْعِ وَالْيَقِيْنِ তবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করাটা অকাট্য ও নিশ্চিতভাবে বলা যায় না بِذٰلِكَ سَبِيْلٌ এটা মিথ্যা বের করার পথ فَإِنَّ الْكَذُوْبَ قَدْ يَصْدُقُ কেননা, মিথ্যাবাদী ব্যক্তিও কখনো সত্য বলে থাকে وَبِهٰذَا يَنْدَفِعُ এর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হবে مَا قِيْلَ فِي مَعْرِفَةِ الْوَضْعِ যা বলা হয়েছে মিথ্যা জানার ব্যাপারে بِإِقْرَارِ الْوَاضِعِ রচনাকারীর স্বীকারোক্তির মাধ্যমে أَنَّهُ يَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ كَاذِبًا কেননা, তার মিথ্যাবাদী হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে فِي هٰذَا الْإِقْرَارِ এ স্বীকারোক্তিতে فَإِنَّهُ يُعْرَفُ صِدْقُهُ যেহেতু তার সত্যতা জানা যেতে পারে بِغَالِبِ الظَّنِّ প্রবল ধারণার দ্বারা وَلَوْلَا ذٰلِكَ যদি এরূপই না হতো لَمَا سَاغَ قَتْلُ الْمُقِرِّ بِالْقَتْلِ তাহলে হত্যার অপরাধ স্বীকারকারীকে হত্যা করা হতো না وَلَا رَجْمُ الْمُعْتَرِفِ بِالزِّنَا এবং জেনার স্বীকারকারীকে প্রস্তারাঘাত করা বৈধ হতো না فَافْهَمْ কাজেই ব্যাপারটি ভালো করে বুঝে নাও।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْحَدِيْثُ الْمَطْعُوْنُ الخ -এর আলোচনা :

مَعْنَى الْمَوْضُوْعِ لُغَةً [মাওযূ'-এর আভিধানিক অর্থ] : اَلْمَوْضُوْعُ শব্দটি বাবে فَتَحَ -এর اَلْوَضْعُ মাসদার থেকে إِسْمُ مَفْعُوْل -এর সীগাহ। আভিধানিক অর্থ– হীন বানানো, নিচে রাখা, স্থাপিত, নির্মিত ইত্যাদি।

مَعْنَى الْمَوْضُوْعِ اِصْطِلَاحًا [মাওযূ'-এর পারিভাষিক অর্থ] :

১. মীযানুল আখবার গ্রন্থ প্রণেতা বলেন– إِنْ كَانَ الرَّاوِيْ مَطْعُوْنًا فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فِي الْحَدِيْثِ فَحَدِيْثُهُ مَوْضُوْعٌ
অর্থাৎ বর্ণনাকারী যদি সমালোচিত ব্যক্তি হন, আর যদি তিনি হাদীস বর্ণনায় মিথ্যাবাদী হন, তবে তাঁর বর্ণিত হাদীসকে مَوْضُوْع হাদীস বলা হয়।

২. ড. মাহমূদ আত্‌-ত্বাহহান বলেন– اَلْمَوْضُوْعُ هُوَ الْكِذْبُ الْمُخْتَلَقُ الْمَصْنُوْعُ الْمَنْسُوْبُ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

৩. আল্লামা সুয়ূতী (র.) বলেন– هُوَ الْمُخْتَلَقُ الْمَصْنُوْعُ وَشَرُّ الضَّعِيْفِ

৪. আল-কামূসুল ফিক্‌হীতে বলা হয়েছে– هُوَ الْكِذْبُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

উদাহরণ : كَإِقْرَارِ أَبِيْ عِصْمَةَ نُوْحِ بْنِ أَبِيْ مَرْيَمَ بِأَنَّهُ وَضَعَ حَدِيْثَ فَضَائِلِ سُوَرِ الْقُرْآنِ سُوْرَةً سُوْرَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

এর হুকুম : সকল ওলামা এ কথার উপর একমত যে, এরূপ হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– مَنْ حَدَّثَ عَنِّيْ بِحَدِيْثٍ يُرٰى أَنَّهُ كِذْبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ

وَاَمَّا اِتِّهَامُ الرَّاوِيْ بِالْكِذْبِ فَبِاَنْ يَكُوْنَ مَشْهُوْرًا بِالْكِذْبِ وَمَعْرُوْفًا بِهٖ فِيْ كَلَامِ النَّاسِ وَلَمْ يَثْبُتْ كِذْبُهٗ فِي الْحَدِيْثِ النَّبَوِيِّ وَفِيْ حُكْمِهٖ رِوَايَةُ مَا يُخَالِفُ قَوَاعِدَ مَعْلُوْمَةً ضَرُوْرِيَّةً فِي الشَّرْعِ كَذَا قِيْلَ وَيُسَمّٰى هٰذَا الْقِسْمُ مَتْرُوْكًا كَمَا يُقَالُ حَدِيْثُهٗ مَتْرُوْكٌ وَفُلَانٌ مَتْرُوْكُ الْحَدِيْثِ وَهٰذَا الرَّجُلُ اِنْ تَابَ وَصَحَّتْ تَوْبَتُهٗ وَظَهَرَتْ اَمَارَاتُ الصِّدْقِ مِنْهُ جَازَ سَمَاعُ الْحَدِيْثِ وَالَّذِيْ يَقَعُ مِنْهُ الْكِذْبُ اَحْيَانًا نَادِرًا فِيْ كَلَامِهٖ غَيْرُ الْحَدِيْثِ النَّبَوِيِّ فَذٰلِكَ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ فِيْ تَسْمِيَةِ حَدِيْثِهٖ بِالْمَوْضُوْعِ اَوِ الْمَتْرُوْكِ وَاِنْ كَانَتْ مَعْصِيَةً وَاَمَّا الْفِسْقُ فَالْمُرَادُ بِهِ الْفِسْقُ فِي الْعَمَلِ دُوْنَ الْاِعْتِقَادِ فَاِنَّ ذٰلِكَ دَاخِلٌ فِي الْبِدْعَةِ وَاَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ الْبِدْعَةُ فِي الْاِعْتِقَادِ وَالْكِذْبُ وَاِنْ كَانَ دَاخِلًا فِي الْفِسْقِ لٰكِنَّهُمْ عَدُّوْهُ اَصْلًا عَلٰى حِدَةٍ لِكَوْنِ الطَّعْنِ بِهٖ اَشَدَّ وَاَغْلَظَ

অনুবাদ : রাবী মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়া এভাবে যে, (اِتِّهَامُ بِالْكِذْبِ اِتِّهَامٌ) সে লোক সমাজে মিথ্যাবাদী হিসেবে পরিচিত হবে এবং প্রসিদ্ধি লাভ করবে, কিন্তু হাদীসে নববীতে মিথ্যাবাদী হিসেবে পরিচিত হবে না।

এ বিধানের মধ্যে সে ব্যক্তির বর্ণনাও শামিল, যা শরিয়তের একান্ত অনিবার্য বিধানের বিরোধিতা করে এরূপই বলা হয়েছে। এ শ্রেণীর রাবীদের হাদীসের নামকরণ করা হয়েছে মাতরূক হাদীস বলে। যেমন বলা হয় فُلَانٌ مَتْرُوْكُ الْحَدِيْثِ ـ حَدِيْثُهٗ مَتْرُوْكٌ এহেন লোক যদি তওবা করে এবং তার তওবা সঠিক ও বিশুদ্ধ হয় আর তার সত্যবাদিতার লক্ষণ প্রকাশ পায়, তবে তার নিকট হতে হাদীস শ্রবণ ও গ্রহণ করা বৈধ। আর যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীস ব্যতীত কথাবার্তায় কখনো কখনো মিথ্যার প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে এটা হাদীসকে মাওযূ বা মাতরূক বলার ক্ষেত্রে কোনো মন্দ প্রভাব রাখে না, যদিও এটা গুনাহের কাজ।

আর ফিসকে রাবী (فِسْقُ رَاوِيْ)-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কার্যকলাপে ফিসক-ফুজুরী তথা সীমালঙ্ঘনের কাজ বিশ্বাসগত ক্ষেত্রে নয় (কিন্তু বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কাবীরা গুনাহ বলেই বিশ্বাস করে।) কেননা, বিশ্বাসের ক্ষেত্রের ফাসিকী বিদআতের অন্তর্ভুক্ত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিদআতের ব্যবহার বিশ্বাসের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে; মিথ্যাচারিতা যদিও ফাসিকীর অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু এটাকে একটি স্বতন্ত্র মৌলিক বিষয়রূপে গণ্য করা হয়। কেননা, এটা একটি কঠোরতম দূষণীয় কাজ।

শাব্দিক অনুবাদ : وَاَمَّا اِتِّهَامُ الرَّاوِيْ بِالْكِذْبِ রাবীর মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়া فَبِاَنْ يَكُوْنَ مَشْهُوْرًا بِالْكِذْبِ এভাবে যে, মিথ্যা বলায় প্রসিদ্ধি লাভ করবে وَمَعْرُوْفًا بِهٖ فِيْ كَلَامِ النَّاسِ জনগণের সাথে কথাবার্তায় মিথ্যাবাদী হিসাবে পরিচিত হবে وَلَمْ يَثْبُتْ كِذْبُهٗ فِي الْحَدِيْثِ النَّبَوِيِّ কিন্তু হাদীসে নববীতে মিথ্যাবাদী রূপে সাব্যস্ত নয় وَفِيْ حُكْمِهٖ

قَوَاعِدَ مَعْلُوْمَةً ضَرُوْرِيَّةً فِي الشَّرْعِ এ বিধানের মধ্যে ঐ ব্যক্তির বর্ণনাও সংযোজিত مَا يُخَالِفُ যা বিপরীত হয় رِوَايَةً শরিয়তের প্রয়োজনীয় বিধানাবলির كَذَا قِيْلَ এরূপই বলা হয়েছে وَيُسَمّٰى هٰذَا الْقِسْمُ مَتْرُوْكًا এ শ্রেণীর হাদীসের নামকরণ করা হয়েছে মাতরূক হিসেবে كَمَا يُقَالُ যেমন বলা হয় حَدِيْثُهُ مَتْرُوْكٌ তার হাদীস পরিত্যক্ত وَفُلَانٌ مَتْرُوْكُ الْحَدِيْثِ অমুক হাদীসশাস্ত্রে বর্জনীয় وَهٰذَا الرَّجُلُ إِنْ تَابَ এরূপ ব্যক্তি যদি তওবা করে وَصَحَّتْ تَوْبَتُهُ এবং তার তওবা বিশুদ্ধ হয় وَظَهَرَتْ أَمَارَاتُ الصِّدْقِ مِنْهُ এবং তার সত্যবাদিতার লক্ষণ প্রকাশ পায় جَازَ سَمَاعُ الْحَدِيْثِ তাহলে এরূপ ব্যক্তির হাদীস গ্রহণ করা বৈধ وَالَّذِيْ يَقَعُ مِنْهُ الْكِذْبُ আর যদি তার থেকে মিথ্যা প্রকাশ পায় أَحْيَانًا نَادِرًا কখনো খুব কম فِيْ كَلَامِهٖ তার কথাবার্তায় غَيْرِ الْحَدِيْثِ النَّبَوِيِّ হাদীসে নববী ব্যতীত فَذٰلِكَ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ তাহলে এটা কোনো প্রভাব রাখে না فِيْ تَسْمِيَةِ حَدِيْثِهٖ بِالْمَوْضُوْعِ তার হাদীসকে মাওযূ বলার ক্ষেত্রে أَوِ الْمَتْرُوْكِ অথবা মাতরূক বলায় وَإِنْ كَانَتْ مَعْصِيَةً যদিও তা পাপের কাজ হোকনা কেন অতএব ফিসক فَالْمُرَادُ بِهِ الْفِسْقُ আর ফিসক দ্বারা উদ্দেশ্য হলো فِي الْعَمَلِ دُوْنَ الْاِعْتِقَادِ কার্যকলাপে বিশ্বাসগত ক্ষেত্রে নয় فَإِنَّ ذٰلِكَ دَاخِلٌ فِي الْبِدْعَةِ কেননা, বিশ্বাসের ক্ষেত্রের ফাসিকী বিদআতের অন্তর্ভুক্ত وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ الْبِدْعَةُ فِي الْاِعْتِقَادِ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিদআতের ব্যবহার বিশ্বাসের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে وَالْكِذْبُ وَإِنْ كَانَ دَاخِلًا فِي الْفِسْقِ মিথ্যাচারিতা যদিও ফাসেকীর অন্তর্ভুক্ত لٰكِنَّهُمْ عَدُّوْهُ أَصْلًا عَلٰى حِدَةٍ কিন্তু একে একটি স্বতন্ত্র মৌলিক বিষয় রূপে গণ্য করা হয় لِكَوْنِ الطَّعْنِ بِهٖ أَشَدَّ وَأَغْلَظَ কেননা, এটা একটি কঠোরতম দূষণীয় কাজ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَيُسَمّٰى هٰذَا الْقِسْمُ الخ -এর আলোচনা :

مَعْنَى الْمَتْرُوْكِ لُغَةً [মাতরূকের আভিধানিক অর্থ] : مَتْرُوْكٌ শব্দটি বাবে نَصَرَ -এর اَلتَّرْكُ মাসদার থেকে اِسْمِ مَفْعُوْل -এর সীগাহ। এর আভিধানিক অর্থ– পরিত্যক্ত, বর্জিত, পরিত্যাজ্য, প্রত্যাখ্যাত ইত্যাদি।

مَعْنَى الْمَتْرُوْكِ اِصْطِلَاحًا [মাতরূকের পারিভাষিক অর্থ] :

১. মীযানুল আখবার প্রণেতা বলেন– إِنْ كَانَ الرَّاوِيْ مُتَّهَمًا بِالْكِذْبِ فِيْ كَلَامِهٖ لَا فِي الْحَدِيْثِ فَحَدِيْثُهُ مَتْرُوْكٌ
অর্থাৎ বর্ণনাকারী যদি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী অভিযুক্ত না হয়ে কথা বলার ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী অভিযুক্ত হন, তবে তাঁর বর্ণিত হাদীসকে হাদীসে مَتْرُوْك বলা হয়।

২. ড. মাহমূদ আত্-ত্বাহহান বলেন– هُوَ الْحَدِيْثُ الَّذِيْ فِيْ إِسْنَادِهٖ رُوَاتُهُمْ مُتَّصِفٌ بِالْكِذْبِ
উদাহরণ : حَدِيْثُ عَمْرِو بْنِ شِمْرِ الْجُعْفِيِّ الْكُوْفِيِّ الشِّيْعِيِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ
عَنْ عَلِيٍّ وَعَمَّارٍ قَالَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ وَيُكَبِّرُ يَوْمَ عَرَفَةَ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَيَقْطَعُ صَلَاةَ الْعَصْرِ أٰخِرَ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ -

অত্র হাদীসের রাবী সম্পর্কে ইমাম নাসায়ী, দারকুতনী সহ অন্যান্যরা বলেছেন যে, عَمْرُو بْنُ شِمْرِ الْجُعْفِيّ হলেন مَتْرُوْكُ الْحَدِيْثِ

হুকুম : এরূপ বর্ণনাকারী যদি তওবা করে এবং তার তওবা বিশুদ্ধ হয় এবং তওবার সত্যতা প্রমাণিত হয়, তাহলে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে।

وَاَمَّا جَهَالَةُ الرَّاوِىْ فَاِنَّهٗ اَيْضًا سَبَبٌ لِلطَّعْنِ فِى الْحَدِيْثِ لِاَنَّهٗ لَمَّا لَمْ يُعْرَفْ اِسْمُهٗ وَ ذَاتُهٗ لَمْ يُعْرَفْ حَالُهٗ وَاَنَّهٗ ثِقَةٌ اَوْ غَيْرُ ثِقَةٍ كَمَا يَقُوْلُ حَدَّثَنِىْ رَجُلٌ اَوْ اَخْبَرَنِىْ شَيْخٌ وَيُسَمّٰى هٰذَا مُبْهَمًا وَحَدِيْثُ الْمُبْهَمِ غَيْرُ مَقْبُوْلٍ اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ صَحَابِيًّا لِاَنَّهُمْ عُدُوْلٌ وَاِنْ جَاءَ الْمُبْهَمُ بِلَفْظِ التَّعْدِيْلِ كَمَا يَقُوْلُ اَخْبَرَنِىْ عَدْلٌ اَوْ حَدَّثَنِىْ ثِقَةٌ فَفِيْهِ اِخْتِلَافٌ وَالْاَصَحُّ اَنَّهٗ لَا يُقْبَلُ لِاَنَّهٗ يَجُوْزُ اَنْ يَكُوْنَ عَدْلٌ فِىْ اِعْتِقَادِهٖ لَا فِىْ نَفْسِ الْاَمْرِ وَاِنْ قَالَ ذٰلِكَ اِمَامٌ حَاذِقٌ قُبِلَ ـ

অনুবাদ : আর রাবী অপরিচিত হওয়া (جَهَالَتُ رَاوِىْ) হাদীসের মধ্যে দোষের কার্যকারণ বিশেষ। কেননা, বর্ণনাকারীর নাম ও ব্যক্তিত্ব জানা না গেলে তখন তার অবস্থা সম্পর্কে পরিচিতি লাভ হয় না। সে বিশ্বস্ত কি অবিশ্বস্ত তা জানা যায় না। যেমন কোনো ব্যক্তি حَدَّثَنِىْ رَجُلٌ বা اَخْبَرَنِىْ شَيْخٌ বললে কে তার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছে, তা সম্পূর্ণ অস্পষ্ট থাকে। সুতরাং এ ধরনের হাদীসকে মুবহাম হাদীস নামকরণ করা হয়। আর মুবহাম হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়, তবে রাবী সাহাবী হলে গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, সমগ্র সাহাবীই আদালতের গুণে গুণান্বিত। আর মুবহাম হাদীস যদি তা'দীল শব্দ দ্বারা ব্যবহার করে, তবে তা গ্রহণযোগ্য হওয়া না হওয়ার ক্ষেত্রে মতানৈক্য বিদ্যমান; যেমন কেউ বলল اَخْبَرَنِىْ عَدْلٌ অথবা اَخْبَرَنِىْ ثِقَةٌ কিন্তু সঠিক কথা হলো গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, রাবীর ধারণা-বিশ্বাসে সে লোক আদিল হওয়া এবং বাস্তব ক্ষেত্রে আদিল না হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে হাদীসশাস্ত্রে পারদর্শী কোনো ইমাম বর্ণনা করলে সে হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَاَمَّا جَهَالَةُ الرَّاوِىْ আর রাবীর অপরিচিত হওয়া فَاِنَّهٗ اَيْضًا سَبَبٌ لِلطَّعْنِ فِى الْحَدِيْثِ হাদীসের ক্ষেত্রে দোষের কারণ لِاَنَّهٗ لَمَّا لَمْ يُعْرَفْ اِسْمُهٗ وَ ذَاتُهٗ কেননা, বর্ণনাকারীর নামও ব্যক্তির জানা না থাকলে لَمْ يُعْرَفْ حَالُهٗ তখন তার অবস্থা সম্পর্কেও পরিচিতি লাভ হয় না وَاَنَّهٗ ثِقَةٌ اَوْ غَيْرُ ثِقَةٍ সে বিশ্বস্ত কি অবিশ্বস্ত তা জানা যায় না كَمَا يَقُوْلُ যেমন– কেউ বলল حَدَّثَنِىْ رَجُلٌ আমার নিকট এক ব্যক্তি বর্ণনা করল اَوْ اَخْبَرَنِىْ شَيْخٌ অথবা আমাকে একজন শায়খ খবর দিয়েছে وَيُسَمّٰى هٰذَا مُبْهَمًا এরূপ হাদীসকে মুবহাম বলা হয় وَحَدِيْثُ الْمُبْهَمِ আর হাদীসে মুবহাম غَيْرُ مَقْبُوْلٍ গ্রহণযোগ্য নয় اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ صَحَابِيًّا তবে রাবী সাহাবী হলে গ্রহণযোগ্য হবে لِاَنَّهُمْ عُدُوْلٌ কেননা, তারা সকলেই হলেন বিশ্বস্ত وَاِنْ جَاءَ الْمُبْهَمُ بِلَفْظِ التَّعْدِيْلِ আর মুবাহাম হাদীস যদি তা'দীল শব্দ যোগে ব্যবহার হয় كَمَا يَقُوْلُ যেমন– কেউ বলল اَخْبَرَنِىْ عَدْلٌ আমাকে আদেল ব্যক্তি খবর দিয়েছেন اَوْ حَدَّثَنِىْ ثِقَةٌ অথবা আমার নিকট বিশ্বস্ত ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন فَفِيْهِ اِخْتِلَافٌ এরূপ হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়া ও না হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে وَالْاَصَحُّ اَنَّهٗ لَا يُقْبَلُ বিশুদ্ধ অভিমত হলো তা গৃহীত হবে না لِاَنَّهٗ يَجُوْزُ اَنْ يَكُوْنَ عَدْلٌ فِىْ اِعْتِقَادِهٖ কেননা, রাবীর ধারণার বা বিশ্বাসে সে আদিল হতে পারে لَا فِىْ نَفْسِ الْاَمْرِ বাস্তব ক্ষেত্রে আদিল না হওয়া وَاِنْ قَالَ ذٰلِكَ اِمَامٌ حَاذِقٌ আর যদি কোনো পারদর্শী ইমাম এরূপ বললে قُبِلَ তা গৃহীত হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَعْنَى الْمُبْهَمِ لُغَةً [মুবহামের আভিধানিক অর্থ] : اَلْمُبْهَمُ শব্দটি اِسْمِ مَفْعُوْلٍ -এর সীগাহ। অর্থ–অস্পষ্ট।

مَعْنَى الْمُبْهَمِ اِصْطِلَاحًا [মুবহামের পারিভাষিক অর্থ] : ড. মাহমূদ আত্-ত্বাহহান বলেন–

وَالْحَدِيْثُ الْمُبْهَمُ هُوَ الْحَدِيْثُ الَّذِىْ فِيْهِ رَاوٍ لَمْ يُصَرَّحْ بِاِسْمِهٖ

অর্থাৎ মুবহাম হলো এমন হাদীস যার মধ্যে এমন একজন রাবী রয়েছে যার নাম স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয় না।

ইমাম اَلْبَيْقُوْنِىْ বলেন– وَمُبْهَمٌ مَا فِيْهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ কারো মতে, هُوَ مَنْ لَمْ يُصَرَّحْ بِاِسْمِهٖ فِى الْحَدِيْثِ

হুকুম : এ রকম হাদীসের হুকুম হলো, উক্ত রাবীর নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা ব্যতীত তা গৃহীত হবে না।

আর যদি تَعْدِيْل শব্দ দ্বারা উল্লেখ করা হয় তথাপিও বিশুদ্ধ অভিমত হলো এরূপ বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, এরূপ বর্ণনা ثِقَةْ ও غَيْرِ ثِقَة উভয় হতে বর্ণিত হতে পারে। তবে যদি কোনো হাদীস বিশারদ দক্ষ ইমাম এরূপ শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেন, তবে তা গৃহীত হবে।

وَاَمَّا الْبِدْعَةُ فَالْمُرَادُ بِهٖ اِعْتِقَادُ اَمْرٍ مُحْدَثٍ عَلٰى خِلَافِ مَا عُرِفَ فِى الدِّيْنِ وَمَا جَاءَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابِهٖ بِنَوْعِ شُبْهَةٍ وَتَاوِيْلٍ لَا بِطَرِيْقِ جُحُوْدٍ وَاِنْكَارٍ فَاِنَّ ذٰلِكَ كُفْرٌ وَحَدِيْثُ الْمُبْتَدِعِ مَرْدُوْدٌ عِنْدَ الْجُمْهُوْرِ وَعِنْدَ الْبَعْضِ اِنْ كَانَ مُتَّصِفًا بِصِدْقِ اللَّهْجَةِ وَصِيَانَةِ اللِّسَانِ قُبِلَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنْ كَانَ مُنْكِرًا لِاَمْرٍ مُتَوَاتِرٍ فِى الشَّرْعِ وَقَدْ عُلِمَ بِالضَّرُوْرَةِ كَوْنُهُ مِنَ الدِّيْنِ فَهُوَ مَرْدُوْدٌ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ بِهٰذِهِ الصِّفَةِ يُقْبَلُ وَاِنْ كَفَرَهُ الْمُخَالِفُوْنَ مَعَ وُجُوْدِ ضَبْطٍ وَ وَرَعٍ وَتَقْوٰى وَاحْتِيَاطٍ وَصِيَانَةٍ وَالْمُخْتَارُ اَنَّهُ اِنْ كَانَ دَاعِيًا اِلٰى بِدْعَتِهٖ وَمُرَوِّجًا لَهُ رُدَّ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ كَذٰلِكَ قُبِلَ اِلَّا اَنْ يَرْوِىَ شَيْئًا يَقْوِىْ بِهٖ بِدْعَتُهُ فَهُوَ مَرْدُوْدٌ قَطْعًا وَبِالْجُمْلَةِ الْاَئِمَّةُ مُخْتَلِفُوْنَ فِىْ اَخْذِ الْحَدِيْثِ مِنْ اَهْلِ الْبِدَعِ وَالْاَهْوَاءِ وَاَرْبَابِ الْمَذَاهِبِ الزَّائِغَةِ.

অনুবাদ : রাবী বিদআত (بِدْعَت رَاوِىْ) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রাবীর অনুমান ও স্বীয় ব্যাখ্যার ভিত্তিতে দীনের মশহুর বিষয়গুলোর বিপরীত এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবী (রা.)-এর নিকট হতে যা কিছু বিবৃত হয়েছে তার বিপরীত নতুন কিছুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা কোনো রকম সন্দেহ ও ব্যাখ্যার ভিত্তিতে– অস্বীকার ও বিরুদ্ধাচরণের ভিত্তিতে নয়; কেননা এটা কুফরি।

বিদআতী রাবীর হাদীস জুমহূর মুহাদ্দেসীনে কেরামের নিকট পরিত্যক্ত। অবশ্য কারো কারো নিকট তা গ্রহণযোগ্য। তবে শর্ত হচ্ছে সততার গুণে ভঙ্গিমা ও যবানী সংরক্ষণের গুণে গুনান্বিত হবে। আবার কেউ বলেছেন, ধারাবাহিক পর্যায়ে চলে আসা শরিয়ত দ্বারা স্বীকৃত কোনো বিষয় যদি উক্ত বিদআতী রাবী অস্বীকার করে, তবে তার হাদীস অগ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি এমন কিছু না হয় তবে গ্রহণযোগ্য হবে। যদিও হাদীসকে যবত, তাকওয়া, পরহেযগারী, সতর্কতা ও সংরক্ষণ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও বিরুদ্ধবাদীগণ তাকে অস্বীকার করে। গ্রহণযোগ্য কথা হলো, বিদআতের দিকে আহ্বানকারী এবং তা প্রচলনের তৎপরতা চালালে তার বর্ণিত হাদীস অগ্রহণযোগ্য হবে, অন্যথায় গ্রহণযোগ্য হবে। তবে যদি সে এমন বিষয় বর্ণনা করে যা তার বিদআতের সহায়ক হয়, তাহলে তা নিশ্চিতভাবে পরিত্যাজ্য হবে।

সারকথা হলো, বিদআতী রাবী এবং বাতিল মাযহাবের অনুসারীদের হাদীস গ্রহণ সম্পর্কে ইমামগণ অনেক মতভেদ করেছেন।

শাব্দিক অনুবাদ : وَاَمَّا الْبِدْعَةُ অতএব বিদআত فَالْمُرَادُ بِهٖ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اِعْتِقَادُ اَمْرٍ مُحْدَثٍ কোনো নতুন কিছুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা عَلٰى خِلَافِ مَا عُرِفَ فِى الدِّيْنِ এখানে প্রসিদ্ধ বিষয়াবলির বিপরীত وَمَا جَاءَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابِهٖ এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ হতে যা এসেছে তার বিপরীত بِنَوْعِ شُبْهَةٍ وَتَاوِيْلٍ কোনো রকম স্বীয় ব্যাখ্যা ও তাবীলের মাধ্যমে لَا بِطَرِيْقِ جُحُوْدٍ وَاِنْكَارٍ অস্বীকার ও বিরুদ্ধাচারণের ভিত্তিতে নয় فَاِنَّ ذٰلِكَ كُفْرٌ কেননা, এটা কুফরি وَحَدِيْثُ الْمُبْتَدِعِ مَرْدُوْدٌ বিদাআতী রাবীর হাদীস পরিত্যক্ত عِنْدَ الْجُمْهُوْرِ জুমহুর মুহাদ্দেসীনদের মতে

وَصِيَانَةٍ আর কিছু সংখ্যকের মতে وَعِنْدَ الْبَعْضِ যদি সে সততার গুণে গুণান্বিত হয় إِنْ كَانَ مُتَّصِفًا بِصِدْقِ اللَّهْجَةِ আর কিছুসংখ্যক বলেন وَقَالَ بَعْضُهُمْ তাহলে তা গৃহীত হবে قُبِلَ এবং মৌখিক সংরক্ষণের গুণে إِنْ كَانَ مُنْكِرًا اللِّسَانِ যদি সে শরিয়তের এমন কোনো বিষয়ে অস্বীকারকারী হয় مُتَوَاتِرٍ فِى الشَّرْعِ যা ধারাবাহিকভাবে চলে আসা শরিয়তের لِأَمْرٍ স্বীকৃত বিষয় وَقَدْ عُلِمَ بِالضَّرُوْرَةِ আবশ্যকীয়ভাবে জানা গেল যে, كَوْنُهُ مِنَ الدِّيْنِ যে দীনেরই একটি বিষয় فَهُوَ مَرْدُوْدٌ তাহলে এরূপ ব্যক্তির বর্ণনা পরিত্যক্ত হবে وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهٰذِهِ الصِّفَةِ আর যদি এমন কিছু গুণ যুক্ত না হয় يُقْبَلُ তবে তা গৃহীত হবে وَإِنْ كَفَّرَهُ الْمُخَالِفُوْنَ আর যদি বিরুদ্ধাবাদীগণ তাকে অস্বীকার করে مَعَ وُجُوْدِ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ضَبْطٍ وَ وَرَعٍ وَتَقْوٰى সংরক্ষণ, পরহেযগারী ও আল্লাহভীরুতা وَاحْتِيَاطٍ وَصِيَانَةٍ সতর্কতা ও হেফাজত وَالْمُخْتَارُ মূলত গ্রহণযোগ্য কথা হলো أَنَّهُ إِنْ كَانَ دَاعِيًا إِلٰى بِدْعَتِهِ যদি সে বিদআতের দিকে আহ্বানকারী হয় وَمُرَوِّجًا لَهُ এবং তার প্রচলনকারী হয় رُدَّ তাহলে তা পরিত্যাজ্য হবে وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذٰلِكَ قُبِلَ যদি এ রকম না হয়, তাহলে গৃহীত হবে إِلَّا أَنْ يَرْوِىَ شَيْئًا তবে শর্ত হলো সে এমন বিষয় বর্ণনা করবে না يَقْوٰى بِهِ بِدْعَتُهُ যা তার বিদআতকে শক্তিশালী করে فَهُوَ مَرْدُوْدٌ قَطْعًا তাহলে তা নিশ্চিতভাবে পরিত্যাজ্য হবে وَبِالْجُمْلَةِ সারকথা হলো اَلْاَئِمَّةُ مُخْتَلِفُوْنَ ইমামগণ ব্যাপাক মতভেদ করেছেন فِىْ أَخْذِ الْحَدِيْثِ হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالْأَهْوَاءِ বিদআতী বাতিল মতাবলম্বীদের وَأَرْبَابِ الْمَذَاهِبِ الزَّائِغَةِ বক্র ও বাতিল মাযহাবপন্থিদের।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَأَمَّا الْبِدْعَةُ الخ -এর **আলোচনা :**

مَعْنَى الْبِدْعَةِ لُغَةً [**বিদআতের আভিধানিক অর্থ**] : اَلْبِدْعَةُ শব্দটি মাসদার بِدْعٌ মূলধাতু হতে নির্গত। আভিধানিক অর্থ– إِنْشَاءٌ বা উদ্ভাবন করা।

مَعْنَى الْبِدْعَةِ اِصْطِلَاحًا [**বিদআতের পারিভাষিক অর্থ**] : পারিভাষিক পরিচয় হলো– اَلْحَدَثُ فِى الدِّيْنِ بَعْدَ الْإِكْمَالِ অর্থাৎ দীন পরিপূর্ণ হওয়ার পর তাতে নতুন কিছু সৃষ্টি করা।

কারো মতে, مَا اسْتُحْدِثَ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْأَهْوَاءِ وَالْأَعْمَالِ

ইমাম নববী (র.) বলেন– اَلْبِدْعَةُ كُلُّ شَيْءٍ عَلٰى غَيْرِ مِثَالٍ سَبَقَ অর্থাৎ যে জিনিস নতুন আবিষ্কৃত হয়েছে যার উদাহরণ পূর্ববর্তী যুগে নেই, তাই বিদআত।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন– কুরআন, সুন্নাহ, আছার ও ইজমার পরিপন্থি কাজ ও বিষয়ই বিদআত নামে অভিহিত হয়।

মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, কোনো লোক ইসলামে যদি এমন কোনো নতুন কাজ উদ্ভাবন করে, যার অনুমোদন কুরআন ও সুন্নতে প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে বর্তমান নেই এবং এর ভিত্তিতে ইস্তিম্বাত বা নির্গতও করা হয়নি, তা-ই বিদ্আত। আর এটা বাতিল। ইসলামি চিন্তাবিদগণের উপরিউক্ত সংজ্ঞার আলোকে সারকথা এই হয় যে, কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের এবং পূর্বের তিনটি কল্যাণময় যুগের কোনো একটিতেও কোনো অনুমোদন পাওয়া না যায়, তবে তাই বিদআতের অন্তর্ভুক্ত হবে।

حُكْمٌ : বিদআতকারীর হাদীস গ্রহণযোগ্য কিনা এ বিষয়ে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে, তবে জুমহুর মুহাদ্দেসীনের মতে বিদআতীর হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে না।

وَقَالَ صَاحِبُ جَامِعِ الْاُصُوْلِ اَخَذَ جَمَاعَةً مِنْ اَئِمَّةِ الْحَدِيْثِ مِنْ فِرْقَةِ الْخَوَارِجِ وَالْمُنْتَسِبِيْنَ اِلَى الْقَدْرِ وَالتَّشَيُّعِ وَالرَّفْضِ وَسَائِرِ اَصْحَابِ الْبِدْعِ وَالْاَهْوَاءِ وَقَدْ اِحْتَاطَ جَمَاعَةٌ اٰخَرُوْنَ وَتَوَرَّعُوْا مِنْ اَخْذِ حَدِيْثٍ مِنْ هٰذِهِ الْفِرَقِ وَلِكُلٍّ مِّنْهُمْ نِيَّاتٌ اِنْتَهٰى وَلَاشَكَّ اَنَّ اَخْذَ الْحَدِيْثِ مِنْ هٰذِهِ الْفِرَقِ يَكُوْنُ بَعْدَ التَّحَرِّىْ وَالْاِسْتِصْوَابِ وَمَعَ ذٰلِكَ الْاِحْتِيَاطُ فِىْ عَدَمِ الْاَخْذِ لِاَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ اَنَّ هٰؤُلَاءِ الْفِرَقَ كَانُوْا يَضَعُوْنَ الْاَحَادِيْثَ لِتَرْوِيْجِ مَذَاهِبِهِمْ وَكَانُوْا يُقِرُّوْنَ بِهٖ بَعْدَ التَّوْبَةِ وَالرُّجُوْعِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ ـ

অনুবাদ : জামেউল উসূল গ্রন্থকার বলেন, হাদীসশাস্ত্রের কতেক ইমাম খারেজী সম্প্রদায় এবং কাদেরিয়া, শিয়া ও রাফেজী সহ অন্যান্য বিদআতী লোকদের নিকট হতে হাদীস গ্রহণ করেছেন। আর অপর একদল মুহাদ্দিস হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে খুব সতর্কতা অবলম্বন করেছেন এবং এসব সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট হতে হাদীস গ্রহণে এড়িয়ে চলতেন। এদের প্রত্যেকের নিজ নিজ উদ্দেশ্য ও নিয়ত ছিল। এসব সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট হতে হাদীস গ্রহণ যে, খুব চিন্তা-ভাবনার পরই হতো তাতে কোনো সন্দেহ নেই, তদুপরি তাদের হতে হাদীস গ্রহণ না করাই সতর্ক পথ। কেননা, তারা নিজেদের বাতিল মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে হাদীস বানোয়াট করে রচনা করত এবং তওবা ও প্রত্যাবর্তনের পর এরূপ [ন্যাক্কারজনক] কাজের স্বীকার করত। আল্লাহই অধিক জানেন।

শাব্দিক অনুবাদ : وَقَالَ صَاحِبُ جَامِعِ الْاُصُوْلِ আর জামেউল উসূল গ্রন্থকার বলেন اَخَذَ جَمَاعَةٌ مِنْ اَئِمَّةِ الْحَدِيْثِ হাদীসশাস্ত্রের কিছুসংখ্যক ইমাম গ্রহণ করেছেন مِنْ فِرْقَةِ الْخَوَارِجِ খারেজী সম্প্রদায় হতে وَالْمُنْتَسِبِيْنَ اِلَى الْقَدْرِ কাদেরিয়াদের থেকে وَالتَّشَيُّعِ শিয়াদের থেকে وَالرَّفْضِ রাফেজীদের থেকে وَسَائِرِ اَصْحَابِ الْبِدْعِ وَالْاَهْوَاءِ এবং অন্যান্য বিদআতী লোকদের থেকে وَقَدْ اِحْتَاطَ جَمَاعَةٌ اٰخَرُوْنَ আর অপর একদল খুব সতর্কতা অবলম্বন করেছেন وَتَوَرَّعُوْا مِنْ اَخْذِ حَدِيْثٍ এবং হাদীস গ্রহণে খুব সতর্কতা অবলম্বন করেছেন বা এড়িয়ে চলতেন مِنْ هٰذِهِ الْفِرَقِ এ সম্প্রদায় হতে وَلِكُلٍّ مِّنْهُمْ نِيَّاتٌ اِنْتَهٰى এদের প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য ও নিয়ত ছিল وَلَاشَكَّ এতে কোনো সংশয় নেই যে, اَنَّ اَخْذَ الْحَدِيْثِ مِنْ هٰذِهِ الْفِرَقِ এসব সম্প্রদায়ের নিকট হতে হাদীস গ্রহণ يَكُوْنُ بَعْدَ التَّحَرِّىْ وَالْاِسْتِصْوَابِ খুব চিন্তাভাবনার পরই হতো وَمَعَ ذٰلِكَ الْاِحْتِيَاطِ তদুপরি সতর্কতা হলো فِىْ عَدَمِ الْاَخْذِ তাদের থেকে হাদীস গ্রহণ না করা لِاَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ কেননা, এ বিষয়টি স্বীকৃত যে اَنَّ هٰؤُلَاءِ الْفِرَقَ এসব সম্প্রদায় كَانُوْا يَضَعُوْنَ الْاَحَادِيْثَ তারা হাদীস রচনা করত لِتَرْوِيْجِ مَذَاهِبِهِمْ তাদের নিজস্ব মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে وَكَانُوْا يُقِرُّوْنَ بِهٖ بَعْدَ التَّوْبَةِ وَالرُّجُوْعِ এবং তাওবা ও প্রত্যাবর্তনের পরও এরূপ কাজের স্বীকার করত وَاللّٰهُ اَعْلَمُ আল্লাহই অধিক জানেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَعْرِيْفُ صَاحِبِ جَامِعِ الْاُصُوْلِ : জামেউল উসূল গ্রন্থকারের নাম হলো আবূ সাদাত মুবারক ইবনে আবূ করম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল কারীম আশ-শায়বানী আল-জাযরী মৃত্যু ৬০৬ খ্রিস্টাব্দ।

تَعْرِيْفُ الْخَوَارِجِ : اَلْخَوَارِجُ অর্থ– দলত্যাগী। এরা কূফার নিকটবর্তী حَرُوْرَاء অঞ্চলের লোক। প্রথমে তারা হযরত আলী (রা.)-এর সাথে ছিল, দুমাতুল জানদালের শালিশের রায়ের পর এরা দলত্যাগী হয়ে যায়, তখন তারা বলতে থাকে اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ এদের লক্ষ্য করেই হযরত আলী (রা.) বলেন, كَلِمَةُ حَقٍّ أُرِيْدَ بِهَا الْبَاطِلُ বিশ্বাসগত দিক হতে আহলে কেবলা হলেও তারা হযরত আলী, মুআবিয়া, আয়েশা, ত্বালহা, ওসমান (রা.)-কে কাফির মনে করত। এরা সংখ্যায় সর্বমোট ১২,০০০ [বারো হাজার] ছিল। হযরত আলী (রা.) তাদের অধিকাংশকেই ধ্বংস করেছেন। এদের থেকে ২০ টি فِرْقَة বের হয়। মূল হলো সাতটি যথা– اَلْمُحَكِّمَةُ – اَلْهَيْسِيَّةُ ـ اَلْاَزَارِقَةُ ـ اَلنَّجَدَاتُ ـ اَلْاَصْفَرِيَّةُ ـ اَلْاِبَاضِيَّةُ ـ اَلْعَجَارِدَةُ এরা সকলেই জাহান্নামী।

قَوْلُهُ اَلْقَدَرُ : কাদরিয়া একটি মতবাদ অবলম্বী দল। যারা এ মতবাদের বিশ্বাসী, তাদেরকে কাদরয়িা বলা হয়। তারা মনে করে যে, প্রত্যেক মানুষেরই নিজস্ব কর্মশক্তি ও ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা রয়েছে। মানুষ যে কোনো প্রকার স্বাধীন ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারে। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও স্বাধীন কর্মক্ষমতা আছে বলে তারা সর্বপ্রকার ভালো-মন্দ কাজের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট জবাবদিহি হবে। মানুষ নৈতিক জীব এবং সে কারণে তারা নিজস্ব কার্যকলাপের উপর কদর বা শক্তি রয়েছে। এ কদর বা শক্তির উপর বিশ্বাসী বলে তাদেরকে কাদরিয়া বলা হয়।

تَعْرِيْفُ الشِّيْعَةِ : এরা হযরত আলী (রা.)-এর উপর বায়'আত করেছে তবে তারা এ বিশ্বাস করত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পর সত্য ইমাম হলেন একমাত্র হযরত আলী (রা.) আর অবশিষ্টরা হলো জালিম। তারা এটা বিশ্বাস করত যে, হযরত আলী (রা.)-এর বংশধর ব্যতীত অন্য কেউ ইমামতের যোগ্যতা রাখে না। এরা সর্বমোট ২০টি দল-একদল অপর দলকে কাফির বলে। তাদের মূল হলো তিনটি যথা– (الف) غُلَاة (ب) زَيْدِيَة (د) اِمَامِيَة এরপর غُلَاة দলটি অপর ১৮টি দলে বিভক্ত।

تَعْرِيْفُ الرَّوَافِضِ : এরা এমন সম্প্রদায় যারা হযরত আলী (রা.) ব্যতীত অপর তিন খলীফার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করত। তাদেরকে এ নামে নামকরণ করার কারণ হলো, এরা একবার زَيْدُ بْنُ زَيْنِ الْعَابِدِيْنَ بْنِ الْحُسَيْنِ (رض) -কে খলীফা নির্বাচিত করল ইত্যবসরে উমাইয়াদের সেনাদল এসে উপস্থিত, তখন তারা হযরত যায়েদকে বলল যে, আপনি হযরত আবূ বকর ও ওমর (রা.)-কে পরিহার করুন তাহলে আমরা আপনাকে সাহায্য করবো। জবাবে তিনি বললেন, আমি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দুই সাহাবীকে পরিত্যাগ করবো? ফলে তারা তাঁকে রেখে চলে গেল এবং তাঁকে উমাইয়ারা শহীদ করল। এজন্য তাদেরকে এ নামে আখ্যায়িত করা হয়। কারো মতে তারা সত্য দীন পরিহার করেছিল বিধায় তাদেরকে এ নামে আখ্যায়িত করা হয়। এরা فِرْقَة بَاطِلَة হিসাবে পরিগণিত।

فَصْلٌ وَاَمَّا وُجُوْهُ الطَّعْنِ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالضَّبْطِ فَهِىَ اَيْضًا خَمْسَةٌ اَحَدُهَا فَرْطُ الْغَفْلَةِ وَثَانِيْهَا كَثْرَةُ الْغَلَطِ وَثَالِثُهَا مُخَالَفَةُ الثِّقَاتِ وَرَابِعُهَا الْوَهْمُ وَخَامِسُهَا سُوْءُ الْحِفْظِ اَمَّا فَرْطُ الْغَفْلَةِ وَكَثْرَةُ الْغَلَطِ فَمُتَقَارِبَانِ فَالْغَفْلَةُ فِى السَّمَاعِ وَتَحَمُّلِ الْحَدِيْثِ وَالْغَلَطُ فِى الْاِسْمَاعِ وَالْاَدَاءِ وَمُخَالَفَةُ الثِّقَاتِ فِى الْاِسْنَادِ وَالْمَتْنِ يَكُوْنُ عَلَى اَنْحَاءٍ مُتَعَدِّدَةٍ تَكُوْنُ مُوْجِبَةً لِلشُّذُوْذِ وجَعَلَهُ مِنْ وُجُوْهِ الطَّعْنِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالضَّبْطِ مِنْ جِهَةِ اَنَّ الْبَاعِثَ عَلَى مُخَالَفَةِ الثِّقَاتِ اِنَّمَا هُوَ عَدَمُ الضَّبْطِ وَالْحِفْظِ وَعَدَمُ الصِّيَانَةِ عَنِ التَّغْيِيْرِ وَالتَّبْدِيْلِ وَالطَّعْنُ مِنْ جِهَةِ الْوَهْمِ وَالنِّسْيَانِ الَّذِيْنَ اَخْطَأَ بِهِمَا وَ رَوَى عَلَى سَبِيْلِ التَّوَهُّمِ اِنْ حَصَلَ الْاِطِّلَاعُ عَلَى ذٰلِكَ بِقَرَائِنَ دَالَّةٍ عَلَى وُجُوْهِ عِلَلٍ وَاَسْبَابٍ قَادِحَةٍ كَانَ الْحَدِيْثُ مُعَلَّلًا

অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : যেসব কারণে রাবীগণের স্মরণশক্তিতে ঘাটতি দেখা যায় তাও পাঁচটি– ১. অধিক অমনোযোগিতা (فَرْط غَفْلَتْ), ২. অধিক (كَثْرَت غَلَطْ), ৩. ছিকাহ রাবীর বিরোধিতা) (مُخَالَفَة ثِقَة), ৪. ধারণা (وَهْم), ৫. ত্রুটিপূর্ণ স্মরণশক্তি (سُوْء حِفْظ) । মোটকথা, অধিক অমনোযোগিতা ও অধিক ভুল উভয়ের মর্ম কাছাকাছি। তবে অধিক অমনোযোগিতা হাদীস শ্রবণ ও গ্রহণের সাথে সংশ্লিষ্ট, আর অধিক ভুল হাদীস বর্ণনাকরণ ও অপরের নিকট পৌঁছে দেওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট। আর ছিকাহ রাবীর বিরোধিতা সনদ ও মতনে কয়েকভাবে হতে পারে এবং তা শায হওয়ার কারণ হয়। আর এটাকে যব্‌ত দূষিতকরণের কারণের মধ্যে পরিগণিত এজন্য করা হয়েছে যে, সিকাহ রাবীর বিরোধিতার কারণ হলো হিফ্‌জ না থাকা পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের হাত হতে সংরক্ষণ না করা। ধারণা ও ভুলের কারণে হাদীস 'ত্বান' যুক্ত হয়। এ দুটি কারণেই ভুল হয় এবং ধারণার ভিত্তিতে হাদীস বর্ণনা করা হয়। সুতরাং বর্ণনাটি সম্পর্কে যদি এমন কোনো লক্ষণ দ্বারা অবহিতি লাভ করা যায় যা সনদের সূক্ষ্ম ত্রুটি-বিচ্যুতির পরিচয় বহন করে, তবে সে হাদীসকে মু'আল্লাল বলে।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ وَاَمَّا وُجُوْهُ الطَّعْنِ অতএব সেসব ত্রুটি الْمُتَعَلِّقَةُ بِالضَّبْطِ যা স্মরণশক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট فَهِىَ اَيْضًا خَمْسَةٌ এগুলোও পাঁচটি اَحَدُهَا فَرْطُ الْغَفْلَةِ প্রথমত অধিক অমনোযোগিতা وَثَانِيْهَا كَثْرَةُ الْغَلَطِ দ্বিতীয়ত অধিক ভুল وَثَالِثُهَا مُخَالَفَةُ الثِّقَاتِ তৃতীয়ত বিশ্বস্ত রাবীর বিরোধিতা وَرَابِعُهَا الْوَهْمُ চতুর্থ হলো ধারণা وَخَامِسُهَا سُوْءُ الْحِفْظِ আর পঞ্চম হলো স্মৃতিশক্তির ত্রুটি اَمَّا فَرْطُ الْغَفْلَةِ وَكَثْرَةُ الْغَلَطِ অতএব অধিক অমনোযোগিতা ও অধিক ভুল فَمُتَقَارِبَانِ উভয়ে কাছাকাছি فَالْغَفْلَةُ তবে অধিক অমনোযোগিতা فِى السَّمَاعِ وَتَحَمُّلِ الْحَدِيْثِ হাদীস শ্রবণ ও গ্রহণের সাথে সংশ্লিষ্ট وَالْغَلَطُ আর অধিক ভুল فِى الْاِسْمَاعِ وَالْاَدَاءِ হাদীস বর্ণনা করা এবং অন্যের নিকট পৌঁছে দেওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট وَمُخَالَفَةُ الثِّقَاتِ আর ছিকাহ রাবীর বিরোধিতা فِى الْاِسْنَادِ وَالْمَتْنِ সনদ ও মতনের সাথে সংশ্লিষ্ট يَكُوْنُ عَلَى اَنْحَاءٍ مُتَعَدِّدَةٍ এটা কয়েকভাবে হতে পারে تَكُوْنُ مُوْجِبَةً لِلشُّذُوْذِ আর এটা শায হওয়ার কারণ হয় وَجَعَلَهُ مِنْ وُجُوْهِ الطَّعْنِ আর একে সেসব দোষগুলোর সাথে গণ্য করা হয় الْمُتَعَلِّقَةِ بِالضَّبْطِ যা যবতের সাথে সংশ্লিষ্ট مِنْ جِهَةِ এদিক হতে যে اَنَّ الْبَاعِثَ عَلَى مُخَالَفَةِ الثِّقَاتِ ছিকাহ রাবীর

বিরোধিতার কারণ হলো إِنَّمَا هُوَ عَدَمُ الضَّبْطِ وَالْحِفْظِ যবত ও হিফজ না থাকা وَعَدَمُ الصِّيَانَةِ عَنِ التَّغْيِيْرِ وَ التَّبْدِيْلِ এবং পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হতে সংরক্ষণ না হওয়া وَالطَّعْنُ مِنْ جِهَةِ الْوَهْمِ وَالنِّسْيَانِ ধারণা ও ভুলের কারণে হাদীস দোষযুক্ত হয় الَّذِيْنَ أَخْطَأُ بِهِمَا তারা এ দুই কারণেই ভুল করে وَ رَوٰى عَلٰى سَبِيْلِ التَّوَهُّمِ এবং ধারণার ভিত্তিতে হাদীস বর্ণনা করে إِنْ حَصَلَ الْإِطِّلَاعُ عَلٰى ذٰلِكَ অতএব যদি এটার উপর জানা যায় بِقَرَائِنَ কোনো লক্ষণের দ্বারা دَالَّةٍ عَلٰى وُجُوْهِ عِلَلٍ যা ঐ সব কারণের উপর বুঝায় وَأَسْبَابٍ قَادِحَةٍ এবং সূক্ষ্ম কারণের উপর كَانَ الْحَدِيْثُ مُعَلَّلًا তাহলে সে হাদীসটি মু'আল্লাল হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَأَمَّا وُجُوْهُ الطَّعْنِ الخ -এর আলোচনা :

مَعْنَى الضَّبْطِ لُغَةً [যবতের আভিধানিক অর্থ] : اَلضَّبْطُ শব্দটি বাবে نَصَرَ -এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ হলো– সংরক্ষণ করা, মজবুত করা, স্মৃতিপটে ধরে রাখা, নিয়ন্ত্রণ করা ইত্যাদি।

مَعْنَى الضَّبْطِ اِصْطِلَاحًا [যবতের পারিভাষিক অর্থ] :

১. শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী (র.) বলেন–

اَلضَّبْطُ هُوَحِفْظُ الْمَسْمُوْعِ وَتَثْبِيْتُهُ مِنَ الْفَوَاتِ وَالْاِخْتِلَاطِ بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ مِنْ اِسْتِحْضَارِهٖ ـ

অর্থাৎ ضَبْط হচ্ছে শ্রুত বিষয়কে জড়তা ও বিনষ্ট হওয়া থেকে এমনভাবে সংরক্ষণ করা যেন তা যথাযথভাবে বর্ণনা করা সম্ভব হয়।

২. ড. মাহমূদ আত্-ত্বাহহান বলেন– اَلضَّبْطُ هُوَ الْجَزْمُ فِى الْحِفْظِ

৩. ড. আব্দুল হালীম আখন্দ বলেন– اَلضَّبْطُ هُوَ اَنْ يُثْبِتَ الرَّاوِىْ مَا سَمِعَهُ فِىْ صَدْرِهٖ اَوْ كِتَابِهٖ

৪. ড. আদীব সালিহ বলেন–

اَلضَّبْطُ اَنْ يَكُوْنَ الرَّاوِىْ غَيْرَ مُخَالِفٍ لِلثِّقَاتِ لَا سُوْءُ الْحِفْظِ وَلَا حَتَّى الْغَلَطِ وَلَا مُغَفَّلًا وَلَا كَثِيْرَ الْاَوْهَامِ ـ

اَقْسَامُ الضَّبْطِ [যবতের প্রকারভেদ] : মুহাদ্দিসগণ ضَبْط -কে দুভাগে ভাগ করেছেন। যেমন–

১. ضَبْطُ الصَّدْرِ বা স্মৃতিতে সংরক্ষণ। ২. ضَبْطُ الْكِتَابِ বা লিখনিতে সংরক্ষণ।

১. ضَبْطُ الصَّدْرِ -এর পরিচিতি : ضَبْطُ الصَّدْرِ -এর সংজ্ঞা হলো–

هُوَ اَنْ يُثْبِتَ مَا سَمِعَهُ بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ مِنْ اِسْتِحْضَارِهٖ مَتٰى شَاءَ ـ

অর্থাৎ ضَبْطُ الصَّدْرِ বলা হয় শ্রুত বিষয়কে এমনভাবে সংরক্ষণ কারা যাতে ইচ্ছানুযায়ী উপস্থাপন করা যায়।

২. ضَبْطُ الْكِتَابِ -এর পরিচিতি : ضَبْطُ الْكِتَابِ -এর সংজ্ঞা হলো–

هُوَ صِيَانَةٌ لَدَيْهِ مُنْذُ سَمِعَ فِيْهِ مَصْحَفَهُ اِلٰى اَنْ يُؤَدِّيَهُ مِنْهُ ـ

অর্থাৎ যে মাসহাফে শায়খের শব্দাবলি লিপিবদ্ধ ছিল সে মাসহাফ বর্ণনাকারী বর্ণনা করা পর্যন্ত স্মরণ রাখাকে ضَبْطُ الْكِتَابِ বলা হয়।

وُجُوْهُ الطَّعْنِ لِلضَّبْطِ : যে সকল কারণে ضَبْط বিনষ্ট হয়, মুহাদ্দিসীনের মতে তা হচ্ছে নিম্নরূপ–

১. **فَرْط غَفْلَة বা অধিক অমনোযোগিতা :** যে বর্ণনাকারী স্বীয় ওস্তাদ থেকে হাদীস শ্রবণ করার সময় তা স্মরণ রাখতে ভুল করে।

২. **كَثْرَة غَلَط বা অধিক মাত্রায় ভুল :** বর্ণনাকারী হাদীস বর্ণনায় যদি নিজের দরুন অধিক ভুল করেন।

৩. **مُخَالَفَة ثِقَة বা বিশ্বস্ততার বিরোধিতা :** যদি বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত রাবীর বিরোধিতা করেন।

৪. **وهم বা ধারণা :** এ ক্ষেত্রে বর্ণনাকারী ধারণা প্রসূত ভুল বর্ণনা করেন।

৫. **سوء حفظ বা স্মরণশক্তির ত্রুটি :** এ ক্ষেত্রে বর্ণনাকারী স্মরণশক্তি হারিয়ে ভুলের সাথে হাদীস বর্ণনা করেন।

وَهٰذَا اَغْمَضُ عُلُوْمِ الْحَدِيْثِ وَاَدَقُّهَا وَلَا يَقُوْمُ بِهٖ اِلَّا مَنْ رُزِقَ فَهْمًا وَحِفْظًا وَاسِعًا وَمَعْرِفَةً تَامَّةً بِمَرَاتِبِ الرُّوَاةِ وَاَحْوَالِ الْاَسَانِيْدِ وَالْمُتُوْنِ كَالْمُتَقَدِّمِيْنَ مِنْ اَرْبَابِ هٰذَا الْفَنِّ اِلٰى اَنْ اِنْتَهٰى اِلَى الدَّارَ قُطْنِىْ وَيُقَالُ لَمْ يَاْتِ بَعْدَهٗ مِثْلُهٗ فِىْ هٰذَا الْاَمْرِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ -

অনুবাদ : এটা হাদীসশাস্ত্রে অতিশয় সূক্ষ্ম ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা দান করেছেন গভীর জ্ঞান, প্রখর স্মরণশক্তি এবং পরিপূর্ণ অবহিতশক্তি রাবীদের স্তর সম্পর্কে এবং সনদ ও মতনের অবস্থা সম্পর্কে তাঁরা ব্যতীত এ বিষয় কেউ জানতে পারে না। পূর্বসূরিদের মধ্যে এ ধরনের বহু ব্যক্তিই বিদ্যমান ছিলেন। ইমাম দারাকুতনী এদের সর্বশেষ ব্যক্তি। বলা হয় যে, তাঁর পরে এ বিষয়ে অনুরূপ কোনো ব্যক্তির আগমন ঘটেনি। আল্লাহই অধিক জানেন।

وَاَمَّا سُوْءُ الْحِفْظِ فَقَالُوْا اِنَّ الْمُرَادَ بِهٖ اَنْ لَا يَكُوْنَ اِصَابَتُهٗ اَغْلَبَ عَلٰى خَطَائِهٖ وَحِفْظُهٗ وَاِتْقَانُهٗ اَكْثَرَ مِنْ سَهْوِهٖ وَنِسْيَانِهٖ يَعْنِىْ اِنْ كَانَ خَطَأُهٗ وَنِسْيَانُهٗ اَغْلَبَ اَوْ مُسَاوِيًا لِصَوَابِهٖ وَاِتْقَانِهٖ كَانَ دَاخِلًا فِىْ سُوْءِ الْحِفْظِ فَالْمُعْتَمَدُ عَلَيْهِ صَوَابُهٗ وَاِتْقَانُهٗ وَكَثْرَتُهُمَا وَسُوْءُ الْحِفْظِ اِنْ كَانَ لَازِمَ حَالِهٖ فِىْ جَمِيْعِ الْاَوْقَاتِ وَمُدَّةِ عُمُرِهٖ لَا يُعْتَبَرُ بِحَدِيْثِهٖ وَعِنْدَ بَعْضِ الْمُحَدِّثِيْنَ هٰذَا اَيْضًا دَاخِلٌ فِى الشَّاذِ وَاِنْ طَرَأَ سُوْءُ الْحِفْظِ لِعَارِضٍ مِثْلُ اِخْتِلَالٍ فِى الْحَافِظَةِ بِسَبَبِ كِبَرِ سِنِّهٖ اَوْ ذَهَابِ بَصَرِهٖ اَوْ فَوَاتِ كُتُبِهٖ فَهٰذَا يُسَمّٰى مُخْتَلَطًا فَمَا رَوٰى قَبْلَ الْاِخْتِلَاطِ وَالْاِخْتِلَالِ مُتَمَيِّزًا عَمَّا رَوَاهُ بَعْدَ هٰذِهِ الْحَالِ قُبِلَ وَاِنْ لَمْ يَتَمَيَّزْ تُوُقِّفَ وَاِنِ اشْتَبَهَ فَكَذٰلِكَ وَاِنْ وُجِدَ لِهٰذَا الْقِسْمِ مُتَابِعَاتٌ وَشَوَاهِدُ تَرَقّٰى مِنْ مَرْتَبَةِ الرَّدِّ اِلَى الْقَبُوْلِ وَالرُّجْحَانِ وَهٰذَا حُكْمُ اَحَادِيْثِ الْمَسْتُوْرِ وَالْمُدَلَّسِ وَالْمُرْسَلِ

মুহাদ্দিসগণ বলেন, ত্রুটিপূর্ণ স্মরণশক্তির (سُوْء حِفْظ) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, রাবীর নির্ভুলতা ভুলের চেয়ে বেশি হবে না এবং তার স্মরণশক্তি ও এর বলিষ্ঠতা ভুল-ভ্রান্তি ও বিস্মৃতি হতে অধিক হবে না। অর্থাৎ ভুলভ্রান্তি যদি নির্ভুলতা ও মুখস্থকরণের তুলনায় অত্যধিক বা সমপরিমাণ হয়, তবে এটা سُوْء حِفْظ -এর মধ্যে পরিগণিত হবে। সুতরাং তার নির্ভুলতা ও সংরক্ষণশীলতার আধিক্যই হবে নির্ভরযোগ্য বিষয়। (سُوْء حِفْظ) স্মৃতিশক্তির ত্রুটি যদি জীবনভরই বর্ণনাকারীর মধ্যে সর্বদা অনিবার্যরূপে থাকে, তবে তার বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে না। আর কিছুসংখ্যক মুহাদ্দিসের মতে তার এই হাদীসও শায-এর অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যদি سُوْء حِفْظ কোনো প্রতিবন্ধকতার দরুন হয়, যেমন বয়োবৃদ্ধতা, দৃষ্টিশক্তি হীনতা, অথবা লিখিত গ্রন্থ ধ্বংস হওয়া ইত্যাদি কারণে স্মৃতি ক্ষমতায় জড়তা ও অসুবিধা দেখা দেয়, তবে তার নামকরণ করা হয় মুখতালাত। সুতরাং এহেন মিশ্রতা ও জড়তা সৃষ্টির পূর্বে যে হাদীস তার নিকট হতে বর্ণিত হয়েছে, তা বাছাই করা সম্ভব হলে গ্রহণীয় হবে। আর বাছাই করা সম্ভব না হলে সে হাদীসের হুকুম মুলতুবি থাকবে। আর সন্দেহযুক্ত হলে তার ক্ষেত্রেও এ একই বিধান প্রযোজ্য হবে। আর যদি সে হাদীসের অনুকূলে মুতাবিয়াত ও শাহিদ রেওয়ায়েত পাওয়া যায়, তবে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পরিবর্তে গ্রহণীয় ও প্রাধান্যের মর্যাদা লাভ করবে। এ হুকুম মাসতূর, মুদাল্লাস ও মুরসাল হাদীসেরও।

শাব্দিক অনুবাদ : وَهٰذَا اَغْمَضُ عُلُوْمِ الْحَدِيْثِ এটা হাদীসশাস্ত্রের অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় وَاَدَقُّهَا এবং অতি সূক্ষ্ম وَلَا يَقُوْمُ بِهٖ কেউ এটা জানতে পারে না اِلَّا مَنْ رُزِقَ فَهْمًا তবে যাকে আল্লাহ গভীর জ্ঞান দান করেছেন وَحِفْظًا وَاسِعًا প্রখর স্মরণশক্তি وَمَعْرِفَةً تَامَّةً এবং পরিপূর্ণ অবহিতশক্তি بِمَرَاتِبِ الرُّوَاةِ রাবীদের স্তর সম্পর্কে وَاَحْوَالِ الْاَسَانِيْدِ وَالْمُتُوْنِ সনদ ও মতনের অবস্থা সম্পর্কে كَالْمُتَقَدِّمِيْنَ مِنْ اَرْبَابِ هٰذَا الْفَنِّ যেমন পূর্বসূরিদের মধ্যে এ ধরনের জ্ঞানী বহু ব্যক্তিত্ব ছিলেন اِلٰى اَنْ اِنْتَهٰى اِلَى الدَّارَ قُطْنِىْ ইমাম দারাকুতনী এদের সর্বশেষ ব্যক্তি وَيُقَالُ এবং বলা হয় لَمْ يَاْتِ بَعْدَهٗ مِثْلُهٗ তাঁর পরে অনুরূপ কোনো ব্যক্তির আগমন ঘটেনি فِىْ هٰذَا الْاَمْرِ এ বিষয়ে وَاللّٰهُ اَعْلَمُ আল্লাহই অধিক জানেন وَاَمَّا سُوْءُ الْحِفْظِ আর ত্রুটিপূর্ণ স্মরণশক্তি فَقَالُوْا মুহাদ্দিসগণ বলেন اِنَّ الْمُرَادَ بِهٖ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اَنْ لَا يَكُوْنَ اِصَابَتُهٗ তার নির্ভুলতা না হওয়া اَكْثَرَ مِنْ سَهْوِهٖ ভুলের থেকে বেশি وَحِفْظُهٗ وَاِتْقَانُهٗ এবং তার স্মরণশক্তি ও স্মৃতিশক্তির বলিষ্ঠতা اَغْلَبَ عَلٰى خَطَائِهٖ وَنِسْيَانِهٖ ভুলভ্রান্তি হতে অধিক হবে না يَعْنِىْ অর্থাৎ اِنْ كَانَ خَطَاؤُهٗ وَنِسْيَانُهٗ যদি তার ভুলভ্রান্তি হয় اَغْلَبَ অধিক اَوْ مُسَاوِيًا অথবা সমান لِصَوَابِهٖ وَاِتْقَانِهٖ তার নির্ভুলতা ও মুখস্থকরণের তুলনায় كَانَ دَاخِلًا فِىْ سُوْءِ الْحِفْظِ তাহলে এটা স্মৃতিশক্তির ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার মধ্যে পরিগণিত হয় فَالْمُعْتَمَدُ عَلَيْهِ সুতরাং নির্ভরযোগ্যতা বিষয় হলো صَوَابُهٗ وَاِتْقَانُهٗ তার নির্ভুলতা এবং সংরক্ষণশীলতা وَكَثْرَتُهُمَا এবং এ দুটি অধিক্যতা وَسُوْءُ الْحِفْظِ আর স্মৃতিশক্তির ত্রুটিপূর্ণতা اِنْ كَانَ لَازِمَ حَالِهٖ যদি তার সাথে আবশ্যকীয়ভাবে থাকে فِىْ جَمِيْعِ الْاَوْقَاتِ সর্বসময়ে وَمُدَّةِ عُمُرِهٖ তার জীবনটাই لَا يُعْتَبَرُ بِحَدِيْثِهٖ তাহলে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে না وَعِنْدَ بَعْضِ الْمُحَدِّثِيْنَ আর কিছুসংখ্যক মুহাদ্দিসের মতে هٰذَا اَيْضًا دَاخِلٌ فِى الشَّاذِّ এ হাদীসও শাযের অন্তর্ভুক্ত হবে وَاِنْ طَرَاَ سُوْءُ الْحِفْظِ আর যদি স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা সৃষ্টি হয় لِعَارِضٍ কোনো কারণবশত مِثْلُ اِخْتِلَالٍ فِى الْحَافِظَةِ যেমন– স্মৃতিশক্তির মধ্যে দুর্বলতা بِسَبَبِ كِبَرِ سِنِّهٖ বয়োবৃদ্ধতার কারণে اَوْ ذَهَابِ بَصَرِهٖ অথবা দৃষ্টিশক্তিহীনতা اَوْ فَوَاتِ كُتُبِهٖ অথবা লিখিত কিতাব ধ্বংস হওয়া فَهٰذَا يُسَمّٰى مُخْتَلِطًا তখন একে নামকরণ করা হয় মুখতালাত নামে فَمَا رَوٰى অতএব যা বর্ণনা করা হয়েছে قَبْلَ الْاِخْتِلَاطِ وَالْاِخْتِلَالِ মিশ্রণ ও জড়তা সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে مُتَمَيِّزًا عَمَّا رَوَاهُ যা বর্ণনা করেছে তা হতে পৃথক করা সম্ভব হলে بَعْدَ هٰذِهِ الْحَالِ এ অবস্থার قُبِلَ তাহলে তা গ্রহণীয় হবে وَاِنْ لَمْ يَتَمَيَّزْ আর যদি পৃথক করা সম্ভব না হয় تُوُقِّفَ তাহলে উক্ত হাদীস মুলতুবি থাকবে وَاِنِ اشْتَبَهَ فَكَذٰلِكَ আর সন্দেহযুক্ত হলেও মুলতুবি থাকবে وَاِنْ وُجِدَ لِهٰذَا الْقِسْمِ আর যদি এসব হাদীসের অনুকূলে পাওয়া যায় مُتَابِعَاتٌ وَشَوَاهِدُ মুতাবিয়াত ও শাহিদ تَرَقّٰى مِنْ مَرْتَبَةِ الرَّدِّ اِلَى الْقَبُوْلِ وَالرُّجْحَانِ তখন এটা প্রত্যাখ্যাতের মর্যাদা হতে কবুল ও প্রাধান্যের মর্যাদা লাভ করবে وَهٰذَا حُكْمُ আর এ হুকুম اَحَادِيْثِ الْمَسْتُوْرِ وَالْمُدَلَّسِ وَالْمُرْسَلِ মাসতূর, মুদাল্লাস ও মুরসাল হাদীসের ক্ষেত্রেও।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَعْرِيْفُ الْمُخْتَلِطِ : বর্ণনাকারীর স্মৃতিশক্তিতে যদি কোনো কারণে যেমন– বার্ধক্য, দৃষ্টিহীনতা বা লিখিত গ্রন্থ বিনষ্ট বা হারিয়ে যাওয়ার ফলে জড়তা বা সমস্যা দেখা দেয়, তবে তার বর্ণিত হাদীসকে মুখতালাত বলে।

এরূপ ব্যক্তির হাদীস মুলতুবি থাকবে, তবে জড়তা আর পূর্বেকার হাদীসসমূহ নির্ণয় করা সম্ভব হলে পূর্বেরগুলো গৃহীত হবে।

فَصْلٌ اَلْحَدِيْثُ الصَّحِيْحُ اِنْ كَانَ رَاوِيْهِ وَاحِدًا يُسَمّٰى غَرِيْبًا وَاِنْ كَانَ اِثْنَيْنِ يُسَمّٰى عَزِيْزًا وَاِنْ كَانُوْا اَكْثَرَ يُسَمّٰى مَشْهُوْرًا اَوْمُسْتَفِيْضًا وَاِنْ بَلَغَتْ رُوَاتُهُ فِى الْكَثْرَةِ اِلٰى اَنْ يَسْتَحِيْلَ الْعَادَةُ تَوَاطُئَهُمْ عَلَى الْكِذْبِ يُسَمّٰى مُتَوَاتِرًا وَيُسَمَّى الْغَرِيْبُ فَرْدًا اَيْضًا وَالْمُرَادُ بِكَوْنِ رَاوِيْهِ وَاحِدًا كَوْنُهُ كَذٰلِكَ وَلَوْ فِىْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ مِنَ الْاِسْنَادِ لٰكِنَّهُ يُسَمّٰى فَرْدًا نَسَبِيًّا وَاِنْ كَانَ فِىْ كُلِّ مَوْضِعٍ مِنْهُ يُسَمّٰى فَرْدًا مُطْلَقًا وَالْمُرَادُ بِكَوْنِهِمَا اِثْنَيْنِ اَنْ يَكُوْنَا فِىْ كُلِّ مَوْضِعٍ كَذٰلِكَ فَاِنْ كَانَ فِىْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ مَثَلًا لَمْ يَكُنِ الْحَدِيْثُ عَزِيْزًا بَلْ غَرِيْبًا وَعَلٰى هٰذَا الْقِيَاسِ مَعْنٰى اِعْتِبَارِ الْكَثْرَةِ فِى الْمَشْهُوْرِ اَنْ يَكُوْنَ فِىْ كُلِّ مَوْضِعٍ اَكْثَرُ مِنْ اِثْنَيْنِ وَهٰذَا مَعْنٰى قَوْلِهِمْ اِنَّ الْاَقَلَّ حَاكِمٌ عَلَى الْاَكْثَرِ فِىْ هٰذَا الْفَنِّ فَافْهَمْ ـ

অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : সহীহ হাদীসের বিবরণ : যদি সহীহ হাদীসের রাবী একজন হয় তবে তাকে হাদীসে গরীব (غَرِيْب حَدِيْث) বলে। যে হাদীসের রাবীর সংখ্যা দু'জন হয় তাকে হাদীসে আযীয حَدِيْث) (عَزِيْز বলে। যে সহীহ হাদীসের রাবীর সংখ্যা দুই হতে অধিক তাকে হাদীসে মাশহূর বা মুস্তাফীয বলে। আর যদি হাদীসের (সকল স্তরে) রাবীর সংখ্যা এত বেশি যে, স্বভাবতই তাদের সকলের একত্রিত হয়ে মিথ্যা রচনা করা বা বলা কোনো ক্রমেই সম্ভব নয়, এরূপ হাদীসকে হাদীসে মুতাওয়াতির বলা হয়। গরীব হাদীসকে ফরদ নামেও অভিহিত করা হয়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কোনো একস্থানে রাবী একজন হবে। সনদের কোনো এক স্থানে রাবী একজন হলে, তবে তাকে ফরদে নাসাবী বলে। আর প্রত্যেক স্তরে হলে তাকে ফরদে মুতলাক বলে। আর রাবী দুজন হওয়ার উদ্দেশ্য হলো সর্বস্থানে এরূপ হওয়া। কিন্তু এক স্থানে হলে সে হাদীসকে আযীয বলা হবে না; বরং গরীব বলা হবে। এমনিভাবে মাশহূর হাদীসে অনেক রাবী হওয়ার অর্থ হলো প্রত্যেক স্থানে রাবীর সংখ্যা দুয়ের অধিক হবে। اَلْاَقَلُّ حَاكِمٌ عَلَى الْاَكْثَرِ [অতিশয় স্বল্পতা অনেকের উপর পরিচালক] হাদীসশাস্ত্রে মুহাদ্দিসগণের এ কথাটির অর্থ এটাই। সুতরাং ভালো করে অনুধাবন করো।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ اَلْحَدِيْثُ الصَّحِيْحُ সহীহ হাদীস সম্পর্কে اِنْ كَانَ رَاوِيْهِ وَاحِدًا যদি উক্ত সহীহ হাদীসের বর্ণনাকারী একজন হয় يُسَمّٰى غَرِيْبًا তবে তাকে গরীব হাদীস বলে وَاِنْ كَانَ اِثْنَيْنِ আর যদি দুজন হয় يُسَمّٰى عَزِيْزًا তবে তাকে হাদীসে আযীয বলা হবে وَاِنْ كَانُوْا اَكْثَرَ يُسَمّٰى مَشْهُوْرًا আর যদি দুই হতে অধিক হয়, তবে তাকে مَشْهُوْر বলা হয় اَوْ مُسْتَفِيْضًا বা মুস্তাফীযও বলা হয় وَاِنْ بَلَغَتْ رُوَاتُهُ فِى الْكَثْرَةِ আর যদি রাবীর সংখ্যা এত বেশি হয় যে, اِلٰى اَنْ يَسْتَحِيْلَ الْعَادَةُ تَوَاطُئَهُمْ عَلَى الْكِذْبِ তাদের সকলের একত্রে মিথ্যার উপর একমত হওয়া অসম্ভব يُسَمّٰى مُتَوَاتِرًا এরূপ হাদীসকে মুতাওয়াতির বলা হয়

وَيُسَمَّى الْغَرِيْبُ فَرْدًا اَيْضًا আর গরীব হাদীসকে ফরদও বলা হয় وَالْمُرَادُ بِكَوْنِ رَاوِيْهِ وَاحِدًا এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রাবী একজন হওয়া لٰكِنَّهُ يُسَمَّى فَرْدًا كَوْنُهُ كَذٰلِكَ অনুরূপ হওয়া وَلَوْ فِىْ مَوْضَعٍ وَاحِدٍ مِنَ الْاِسْنَادِ আর যদি তা সনদের কোনো এক স্থানে হয় يُسَمَّى فَرْدًا نَسَبِيًّا তবে তাকে ফরদে নাসাবী বলে وَاِنْ كَانَ فِىْ كُلِّ مَوْضَعٍ আর প্রত্যেক স্তরে একজন হলে يُسَمَّى فَرْدًا مُطْلَقًا তখন তাকে ফরদে মুতলাক বলে وَالْمُرَادُ بِكَوْنِهِمَا اِثْنَيْنِ আর রাবীর সংখ্যা দুজন হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اَنْ يَكُوْنَا فِىْ كُلِّ مَوْضَعٍ كَذٰلِكَ সর্বস্থানে এরূপ হওয়া فَاِنْ كَانَ فِىْ مَوْضَعٍ وَاحِدٍ مَثَلًا যদি তা একস্থানে হয় لَمْ يَكُنِ الْحَدِيْثُ عَزِيْزًا তাহলে উক্ত হাদীস আযীয হবে না بَلْ غَرِيْبًا বরং গরীব হবে وَعَلٰى هٰذَا الْقِيَاسِ আর এভাবেই مَعْنٰى اِعْتِبَارِ الْكَثْرَةِ فِى الْمَشْهُوْرِ মাশহুর হাদীসে অনেক রাবী হওয়ার অর্থ হলো اَنْ يَكُوْنَ فِىْ كُلِّ مَوْضَعٍ اَكْثَرَ مِنَ اثْنَيْنِ প্রত্যেক স্তরে দুয়ের অধিক বর্ণনাকারী হওয়া وَهٰذَا مَعْنٰى قَوْلِهِمْ আর এ বিষয়ে মুহাদ্দিসগণের এ কথাটির অর্থ হলো اِنَّ الْاَقَلَّ حَاكِمٌ عَلَى الْاَكْثَرِ অতি স্বল্পতা অনেকের উপর পরিচালক فِىْ هٰذَا الْفَنِّ এ বিষয়ে فَافْهَمْ অতএব ভালো করে বুঝে নাও।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْحَدِيْثُ الصَّحِيْحُ الخ : সহীহ হাদীস প্রথমত দু প্রকার– ১. اٰحَادٌ ২. مُتَوَاتِرٌ

[اٰحَادٌ আহাদ] আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা– ১. غَرِيْبٌ ২. عَزِيْزٌ ৩. مَشْهُوْرٌ বা مُسْتَفِيْضٌ

قَوْلُهُ غَرِيْبًا -এর আলোচনা :

مَعْنَى الْغَرِيْبِ لُغَةً **[গারীবের আভিধানিক অর্থ] :** غَرِيْبٌ শব্দটি صِفَةٌ شِبْهٌ -এর সীগাহ। শাব্দিক অর্থ হলো– দুষ্প্রাপ্য, অপরিচিত, দরিদ্র ইত্যাদি।

مَعْنَى الْغَرِيْبِ اِصْطِلَاحًا **[গারীবের পারিভাষিক অর্থ] :** পারিভাষিক পরিচয় হলো– فَاِذَا انْفَرَدَ الرَّاوِىْ بِالْحَدِيْثِ فَهُوَ غَرِيْبٌ অর্থাৎ, যখন হাদীসের রাবীর সংখ্যা একজন হয়, তবে তাকে হাদীসে গরীব বলা হয়।

অত্র গ্রন্থকারের মতে, اَلْحَدِيْثُ الصَّحِيْحُ اِنْ كَانَ رَاوِيْهِ وَاحِدًا يُسَمَّى غَرِيْبًا

উল্লেখ্য যে, গরীব হাদীসকে فرد ও বলা হয়

اَقْسَامُ الْفَرْدِ **[ফরদের প্রকারভেদ] :** ফরদ আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত– ১. فَرْد نِسْبِىْ ২. فَرْد مُطْلَقٌ

১. فَرْد نِسْبِىْ : সনদের কোনো স্তরে যদি একজন রাবী হয়, তবে তাকে ফরদে নসবী বলে।

২. فَرْد مُطْلَقٌ : সনদের প্রত্যেক স্তরেই যদি রাবী একজন হয়, তবে তাকে ফরদে মুতলাক বলা হয়।

قَوْلُهُ عَزِيْزًا -এর আলোচনা :

مَعْنَى الْعَزِيْزِ لُغَةً **[আযীযের আভিধানিক অর্থ] :** عَزِيْزٌ শব্দটি صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ -এর সীগাহ। শাব্দিক অর্থ হচ্ছে– মজবুত বা শক্তিশালী হওয়া।

مَعْنَى الْعَزِيْزِ اِصْطِلَاحًا **[আযীযের পারিভাষিক অর্থ] :** পারিভাষিক পরিচয় হলো– اِنْ كَانَ اِثْنَيْنِ يُسَمَّى عَزِيْزًا অর্থাৎ যদি বর্ণনাকারী দুজন হয়, তবে তাকে আযীয বলে।

ড. আদীব সালিহের মতে, اَلْعَزِيْزُ هُوَ الْحَدِيْثُ الَّذِىْ رَوَاهُ عَنِ اثْنَيْنِ فِىْ جَمِيْعِ طَبَقَاتِ السَّنَدِ

মুফতি আমীমুল ইহসানের মতে, مَارَوَاهُ اِثْنَانِ فَهُوَ عَزِيْزٌ

قَوْلُهُ مَشْهُوْرًا -এর আলোচনা :

مَعْنَى الْمَشْهُوْرِ لُغَةً **[মাশহুরের আভিধানিক অর্থ] :** مَشْهُوْر শব্দটি বাবে فَتَحَ থেকে اِسْم مَفْعُوْل একবচন। মাসদার হচ্ছে اَلشُّهْرُ মূলবর্ণ (ش . ه . ر) জিনসে صَحِيْح আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– ১. প্রখ্যাত ২. বিখ্যাত ৩. প্রসিদ্ধ।

مَعْنَى الْمَشْهُوْرِ اِصْطِلَاحًا [মাশহূরের পারিভাষিক অর্থ] :

১. উসূল হাদীসের পরিভাষায় مَشْهُوْر বলা হয় এমন হাদীসকে, যে হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা দুয়ের অধিক, তবে হাদীসে مُتَوَاتِرْ-এর সীমা পর্যন্ত পৌছেনি।

২. تَيْسِيْرُ عَلَى الْمُصْطَلَحِ-এর গ্রন্থকার বলেন- هُوَ مَا رَوَاهُ ثَلٰثَةٌ فَاَكْثَرُ فِىْ كُلِّ طَبْقَةٍ مَا لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ التَّوَاتُرِ

৩. মুফতি আমীমুল ইহসান (র.) বলেন- اِنْ كَانَ لَهُ طُرُقٌ مَحْصُوْرَةٌ بِاَكْثَرَ مِنْ اِثْنَيْنِ وَلَمْ يَبْلُغْ حَدَّ التَّوَاتُرِ فَهُوَ مَشْهُوْرٌ

৪. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন- هُوَ مَا لَهُ طُرُقٌ مَحْصُوْرَةٌ بِاَكْثَرَ مِنْ اِثْنَيْنِ

قَوْلُهُ مُتَوَاتِرًا-এর আলোচনা :

مَعْنَى الْمُتَوَاتِرِ لُغَةً [মুতাওয়াতিরের আভিধানিক অর্থ] : مُتَوَاتِرٌ শব্দটি اَلتَّوَاتُرُ থেকে নির্গত। শাব্দিক অর্থ হলো-ধারাবাহিকতা, অনবরত বা বিরতিহীন ইত্যাদি।

مَعْنَى الْمُتَوَاتِرِ اِصْطِلَاحًا [মুতাওয়াতিরের পারিভাষিক অর্থ] :

১. পারিভাষিক পরিচয় হলো-

اَلْمُتَوَاتِرُ هُوَ الْحَدِيْثُ الَّذِىْ رَوَاهُ قَوْمٌ لَا يُحْصٰى عَدَدُهُمْ وَلَا يُتَوَهَّمُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكِذْبِ بِكَثْرَةِ عَدَدِهِمْ وَتَبَاعُدِ اَمَاكِنِهِمْ ـ

অর্থাৎ এমন হাদীসকে মুতাওয়াতির হাদীস বলা হয়, যা অসংখ্য রাবী বর্ণনা করেছেন। যাদের সংখ্যাধিক্য ও বাসস্থানের দূরত্বের কারণে তাদের মিথ্যার উপর ঐকমত্য হওয়ার ধারণা করা যায় না।

২. ড. মাহমূদ আত্-ত্বাহহানের মতে, اَلْمُتَوَاتِرُ مَا رَوَاهُ عَدَدٌ كَثِيْرٌ تُحِيْلُ الْعَادَةُ تَوَاطُؤَهُمْ عَلَى الْكِذْبِ

৩. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন- اَلْخَبَرُ اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ لَهُ طَرِيْقٌ بِلَا عَدَدٍ مُعَيَّنٍ فَهُوَ الْمُتَوَاتِرُ

৪. مُقَدَّمَةُ الشَّيْخِ-এ রয়েছে যে,

وَاِنْ بَلَغَتْ رُوَاتُهُ فِى الْكَثْرَةِ اِلٰى اَنْ يَسْتَحِيْلَ الْعَادَةُ تَوَاطُئَهُمْ عَلَى الْكِذْبِ يُسَمّٰى مُتَوَاتِرًا

قَوْلُهُمْ اِنَّ الْاَقَلَّ حَاكِمٌ عَلَى الْاَكْثَرِ فِىْ هٰذَا الْفَنِّ-এর আলোচনা : মুহাদ্দিসগণের উক্তি যে, হাদীস শাস্ত্রে রাবীর সংখ্যা স্বল্পতা বিধান আরোপ করে সংখ্যাধিক্যের উপর।-এর ব্যাখ্যা হলো সনদের কোনো স্তরে রাবী সংখ্যা কম হলে উক্ত কম সংখ্যক রাবীর হিসেবেই সে হাদীসের মান নির্ণয় করা হয় বা প্রকার নির্ধারিত করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ ইমাম বুখারী (র.) পর্যন্ত পৌছার একটি সনদে ছয়টি স্তর রয়েছে। উক্ত সনদের কোনো এক স্তরে যদি রাবী একজন হয়। তাহলে [অপরাপর সকল স্তরে রাবী একাধিক হলেও] উক্ত হাদীসকে গরীব বলা হবে।

وَعُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ اَنَّ الْغَرَابَةَ لَا تُنَافِى الصِّحَّةَ وَيَجُوْزُ اَنْ يَكُوْنَ الْحَدِيْثُ صَحِيْحًا غَرِيْبًا بِاَنْ يَكُوْنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ رِجَالِهٖ ثِقَةً وَالْغَرِيْبُ قَدْ يَقَعُ بِمَعْنَى الشَّاذِّ اَىْ شُذُوْذًا هُوَ مِنْ اَقْسَامِ الطَّعْنِ فِى الْحَدِيْثِ وَهٰذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِ صَاحِبِ الْمَصَابِيْحِ مِنْ قَوْلِهٖ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لِمَا قَالَ بِطَرِيْقِ الطَّعْنِ وَبَعْضُ النَّاسِ يُفَسِّرُوْنَ الشَّاذَّ بِمُفْرَدِ الرَّاوِىْ مِنْ غَيْرِ اِعْتِبَارِ مُخَالَفَتِهٖ لِلثِّقَاتِ كَمَا سَبَقَ وَيَقُوْلُوْنَ صَحِيْحٌ شَاذٌّ وَصَحِيْحٌ غَيْرُ شَاذٍّ فَالشُّذُوْذُ بِهٰذَا الْمَعْنَى اَيْضًا لَا يُنَافِى الصِّحَّةَ كَالْغَرَابَةِ وَالَّذِىْ يُذْكَرُ فِىْ مَقَامِ الطَّعْنِ هُوَ مُخَالِفٌ لِلثِّقَاتِ ـ

অনুবাদ : এ আলোচনা দ্বারা এ কথাও জানা যায় যে, غَرَابَتْ বা একজন রাবী হওয়া সহীহ-এর পরিপন্থি (অন্তরায়) নয়। সহীহ হাদীসও গরীব হতে পারে, আর তা এভাবে যে হাদীসের সকল রাবী বিশ্বস্ত হবেন। গরীব কথাটি কখনো শায অর্থে ব্যহৃত হয় তথা সেই শায যা হাদীসশাস্ত্রে দুর্বলতার অভিযোগের শ্রেণীভুক্ত। মাসাবীহ গ্রন্থকারের মন্তব্য هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ দ্বারা এ মর্মার্থই বুঝিয়েছেন, যখন হাদীসের উপর আপত্তি প্রকাশের জন্য বলে।

আর কতেক মুহাদ্দিস বিশ্বস্ত রাবীর বিরোধিতার বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য না করেই রাবীর মুফরাদ (একক) হওয়া দ্বারা শাযের বিশ্লেষণ দিয়ে থাকেন। যেমন– ইতঃপূর্বে আলোচিত হয়েছে। তারা বলেন, সহীহ হাদীস শাযও হয় এবং সহীহ হাদীস গায়রে শাযও হয়। [অর্থাৎ এ হাদীস সহীহ, কিন্তু শায নয়।] সুতরাং এ অর্থ অনুযায়ী শায হাদীসও গরীব হাদীসের ন্যায় সহীহের পরিপন্থি নয়। অবশ্য যখন তা দুর্বল প্রকাশের স্থানে বলা হয় তখন সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে বুঝতে হবে যে, এর দ্বারা রাবীদের বিরোধী হওয়ায় মর্ম বুঝানো হয়েছে। এ কারণেই তা সহীহের মুখালিফ।

শাব্দিক অনুবাদ : وَعُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ আর উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা এটাও জানা যায় যে, اَنَّ الْغَرَابَةَ لَا تُنَافِى الصِّحَّةَ রাবী একজন হওয়া সহীহ-এর বিপরীত নয় وَيَجُوْزُ اَنْ يَكُوْنَ الْحَدِيْثُ صَحِيْحًا غَرِيْبًا আর সহীহ হাদীস গরীবও হতে পারে بِاَنْ يَكُوْنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ رِجَالِهٖ ثِقَةً আর তা এভাবে যে, হাদীসের রাবীগণের প্রত্যেকেই ছিকাহ হবে وَالْغَرِيْبُ قَدْ يَقَعُ بِمَعْنَى الشَّاذِّ গরীব কথাটিও কখনো শায অর্থে ব্যবহৃত হয় اَىْ شُذُوْذًا অর্থাৎ সে শ্রেণীর শায هُوَ مِنْ اَقْسَامِ الطَّعْنِ فِى الْحَدِيْثِ যা হাদীসের ক্ষেত্রে দোষযুক্ত وَهٰذَا هُوَ الْمُرَادُ আর এটাই হলো উদ্দেশ্য مِنْ قَوْلِ صَاحِبِ الْمَصَابِيْحِ মাসাবীহ গ্রন্থকারের কথা দ্বারা مِنْ قَوْلِهٖ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ তার এ কথা দ্বারা যে, এ হাদীসটি গরীব لِمَا قَالَ بِطَرِيْقِ الطَّعْنِ আর যখন হাদীসের উপর আপত্তি প্রকাশের জন্য বলে وَبَعْضُ النَّاسِ আর কতেক মুহাদ্দিস يُفَسِّرُوْنَ الشَّاذَّ শাযের বিশ্লেষণ করে থাকেন بِمُفْرَدِ الرَّاوِىْ রাবীর মুফরাদ হওয়ার দ্বারা مِنْ غَيْرِ اِعْتِبَارِ লক্ষ্য না করেই مُخَالَفَتِهٖ لِلثِّقَاتِ বিশ্বস্ত রাবীর বিরোধিতার প্রতি كَمَا سَبَقَ যেমনি পূর্বে আলোচিত হয়েছে وَيَقُوْلُوْنَ আর তারা বলে থাকেন صَحِيْحٌ شَاذٌّ সহীহ হাদীস ও শায وَصَحِيْحٌ غَيْرُ شَاذٍّ এবং সহীহ হাদীস ও শায নয় فَالشُّذُوْذُ بِهٰذَا الْمَعْنَى اَيْضًا সুতরাং এ অর্থানুযায়ী শায হাদীসও لَا يُنَافِى الصِّحَّةَ সহীহের বিপরীত নয় كَالْغَرَابَةِ গরীব হাদীসের ন্যায় وَالَّذِىْ يُذْكَرُ فِىْ مَقَامِ الطَّعْنِ তবে যখন তা দুর্বলতা প্রকাশের স্থানে উল্লেখ করা হয় هُوَ مُخَالِفٌ لِلثِّقَاتِ তখন তা ছিকাহ রাবীদের বিরোধী বুঝাবে।

فَصْلٌ اَلْحَدِيْثُ الضَّعِيْفُ هُوَ الَّذِىْ فُقِدَ فِيْهِ الشَّرَائِطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِى الصِّحَّةِ وَالْحَسَنِ كُلًّا اَوْ بَعْضًا وَيُذَمُّ رَاوِيْهِ بِشُذُوْذٍ اَوْ نَكَارَةٍ اَوْ عِلَّةٍ وَبِهٰذَا الْاِعْتِبَارِ يَتَعَدَّدُ اَقْسَامُ الضَّعِيْفِ وَيَكْثُرُ اَفْرَادًا وَتَرْكِيْبًا وَمَرَاتِبُ الصَّحِيْحِ وَالْحَسَنِ لِذَاتِهِمَا وَلِغَيْرِهِمَا اَيْضًا بِتَفَاوُتِ الْمَرَاتِبِ وَالدَّرَجَاتِ فِىْ كَمَالِ الصِّفَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ الْمَاخُوْذَةِ فِىْ مَفْهُوْمَيْهِمَا مَعَ وُجُوْدِ الْاِشْتِرَاكِ فِىْ اَصْلِ الصِّحَّةِ وَالْحَسَنِ وَالْقَوْمُ ضَبَطُوْا مَرَاتِبَ الصِّحَّةِ وَعَيَّنُوْهَا وَ ذَكَرُوْا اَمْثِلَتَهَا مِنَ الْاَسَانِيْدِ وَقَالُوْا اِسْمُ الْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ يَشْمُلُ رِجَالَهَا كُلَّهَا وَلٰكِنَّ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ وَاَمَّا اِطْلَاقُ اَصَحِّ الْاَسَانِيْدِ عَلٰى سَنَدٍ مَخْصُوْصٍ عَلَى الْاِطْلَاقِ فَفِيْهِ اِخْتِلَافٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اَصَحُّ الْاَسَانِيْدِ زَيْنُ الْعَابِدِيْنَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ وَقِيْلَ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَقِيْلَ الزُّهْرِىْ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالْحَقُّ اَنَّ الْحُكْمَ عَلٰى اِسْنَادٍ مَخْصُوْصٍ بِالْاَصَحِّيَّةِ عَلَى الْاِطْلَاقِ غَيْرُ جَائِزٍ اِلَّا اَنَّ فِى الصِّحَّةِ مَرَاتِبَ عُلْيَا وَعِدَّةٌ مِنَ الْاَسَانِيْدِ يَدْخُلُ فِيْهَا وَلَوْ قُيِّدَ بِقَيْدٍ بِاَنْ يُقَالَ اَصَحُّ اَسَانِيْدِ الْبَلَدِ الْفُلَانِىِّ اَوْ فِى الْبَابِ الْفُلَانِىِّ اَوْ فِى الْمَسْأَلَةِ الْفُلَانِيَّةِ يَصِحُّ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ ـ

অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : দ্বা'ঈফ হলো সেই হাদীস যাতে সহীহ ও হাসান হাদীসের জন্য গ্রহণযোগ্য শর্তসমূহ আংশিকভাবে বা পুরোপুরি অনুপস্থিত। আর তার রাবী হয় শায, মুনকার ও মু'আল্লালের দোষে দুষ্ট। এদিক দিয়ে দ্বা'ঈফ হাদীস কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত। সহীহ লিযাতিহী ও সহীহ লিগায়রিহী এবং হাসান লিযাতিহী ও হাসান লিগায়রিহীর ক্ষেত্রেও প্রকৃতপক্ষে মিশ্রিতভাবে হাসান হওয়া সত্ত্বেও তাদের ব্যাখ্যার বেলায় নির্ভরযোগ্য ও পূর্ণতম গুণাবলির শ্রেণীগত ব্যবধানের কারণে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। হাদীসশাস্ত্রবিদগণ বিশুদ্ধতার শ্রেণী ও পর্যায়সমূহ নির্ণয় করেছেন এবং তাদের উদাহরণ সনদ দ্বারা দিয়েছেন। আর তারা বলেছেন, আদালত ও যব্‌ত এ দুটি বৈশিষ্ট্য রাবীদের সকলের মধ্যে থাকতে হবে। কিন্তু তাদের কতক কতকের উপর মর্যাদাশালী। বিশেষ কোনো সনদকে সাধারণভাবে اَصَحُّ الْاَسَانِيْدِ [সমগ্র সনদের মধ্যে বিশুদ্ধ সনদ] বলার ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কাজেই কিছুসংখ্যক মুহাদ্দিস বলেন, زَيْنُ الْعَابِدِيْنَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ এ সনদটি সমগ্র সনদের মধ্যে বিশুদ্ধ সনদ। কতকের মতে আসাহহুল আসানীদ হলো مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ আবার কতকের মতে عَنْ زُهْرِىْ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ সনদটি আসাহহুল আসানীদ। কিন্তু কথা হলো, বিশেষ কোনো সনদের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে আসাহহুল আসানীদ কথাটি ব্যবহার করা জায়েজ নয়। কেননা, বিশুদ্ধতার অনেক শ্রেণী ও স্তর রয়েছে এবং তাতে অনেক সনদই অন্তর্ভুক্ত হয়। আর যদি তাকে এভাবে সীমায়িত করা হয় যে, এ সনদটি অমুক শহরে আসাহহুল আসানীদ অথবা অমুক অধ্যায় বা অমুক বিষয়ে আসাহহুল আসানীদ তবে তা সঠিক হবে। সঠিক কথা আল্লাহই সর্বজ্ঞাত।

শাব্দিক অনুবাদ : اَلْحَدِيْثُ الضَّعِيْفُ দ্বা'ঈফ হাদীস হলো هُوَ الَّذِيْ فَقَدَ فِيْهِ যাতে হারিয়ে গেছে বা অনুপস্থিত اَلشَّرَائِطُ الْمُعْتَبَرَةُ গ্রহণযোগ্য শর্তসমূহ فِى الصِّحَّةِ وَالْحَسَنِ সহীহ ও হাসান كُلًّا اَوْ بَعْضًا আংশিক বা পুরোপুরি وَيُذَمُّ رَاوِيْهِ আর তার বর্ণনাকারীকে দোষযুক্ত করা হয়েছে بِشُذُوْذٍ اَوْ نَكَارَةٍ اَوْ عِلَّةٍ শায, মুনকার ও মু'আল্লাল হওয়ার দোষে وَبِهٰذَا الْاِعْتِبَارِ এ হিসেবে يَتَعَدَّدُ اَقْسَامُ الضَّعِيْفِ দ্বা'ঈফ হাদীস কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত وَيَكْثُرُ اَفْرَادًا وَتَرْكِيْبًا এবং তা একক ও সংযোগভাবেও অনেক হয় وَمَرَاتِبُ الصَّحِيْحِ আর সহীহের স্তরসমূহ তথা সহীহ লিগায়রিহী ও সহীহ লিযাতিহী وَ الْحَسَنِ لِذَاتِهَا وَلِغَيْرِهِمَا اَيْضًا এবং হাসান লিযাতিহী ও হাসান লিগায়রিহীও يَتَفَاوَتُ الْمَرَاتِبِ وَالدَّرَجَاتِ বিভিন্ন স্তরে বিন্যাস হয় فِىْ كَمَالِ الصِّفَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ الْمَاخُوْذَةِ গ্রহণযোগ্য পরিপূর্ণ গুণাবলির ব্যাপারে فِىْ مَفْهُوْمَيْهِمَا তাদের ব্যাখ্যার বেলায় مَعَ وُجُوْدِ الْاِشْتِرَاكِ فِىْ اَصْلِ الصِّحَّةِ وَالْحَسَنِ হাসান ও সহীহ মূলগতভাবে মিশ্রিত হওয়ার ফলে وَالْقَوْمُ ضَبَطُوْا আর হাদীসশাস্ত্রবিদগণ নির্ণয় করেছেন مَرَاتِبَ الصِّحَّةِ সহীহ ও হাসানের স্তরসমূহ وَعَيَّنُوْهَا এবং তা নির্দিষ্ট করেছেন وَ ذَكَرُوْا اَمْثِلَتَهَا مِنَ الْاَسَانِيْدِ এবং তারা এর উদাহরণসমূহ সনদ দ্বারা প্রদান করেছেন وَقَالُوْا আর তারা বলেছেন اِسْمُ الْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ আদালত ও যবত يَشْمُلُ رِجَالَهَا كُلَّهَا রাবীদের সকলের মধ্যে থাকতে হবে وَلٰكِنَّ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ তবে তাদের কিছুসংখ্যক অপর কিছুসংখ্যকের উপর মর্যাদাশীল وَاَمَّا اِطْلَاقُ اَصَحِّ الْاَسَانِيْدِ তবে اَصَحُّ الْاَسَانِيْدِ কথাটি ব্যবহৃত হয় عَلٰى سَنَدٍ مَخْصُوْصٍ عَلَى الْاِطْلَاقِ সাধারণভাবে কোনো বিশেষ সনদের উপর فَفِيْهِ اِخْتِلَافٌ তবে এতেও মতভেদ রয়েছে فَقَالَ بَعْضُهُمْ অতএব, কিছুসংখ্যক মুহাদ্দিস বলেন اَصَحُّ الْاَسَانِيْدِ সবচেয়ে বিশুদ্ধ সনদ হলো زَيْنُ الْعَابِدِيْنَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ এ সনদটি وَقِيْلَ আর কারো মতে مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ এটি বিশুদ্ধ সনদ وَقِيْلَ আবার কেউ বলেন اَلزُّهْرِىُّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ এটি অতি বিশুদ্ধ সনদ وَالْحَقُّ তবে বিশুদ্ধ কথা হলো اَنَّ الْحُكْمَ عَلٰى اِسْنَادٍ مَخْصُوْصٍ কোনো বিশেষ সনদের ক্ষেত্রে এ হুকুম দেওয়া عَلَى الْاِطْلَاقِ غَيْرُ جَائِزٍ মুতলকভাবে জায়েজ নয় اِلَّا اَنَّ فِى الصِّحَّةِ بِالْاَصَحِّيَّةِ কেননা, বিশুদ্ধ সনদের অনেক স্তর আছে وَعِدَّةٌ مِنَ الْاَسَانِيْدِ يَدْخُلُ فِيْهَا এবং তাতে অনেক সনদই অন্তর্ভুক্ত مَرَاتِبُ عُلْيَا وَلَوْ قُيِّدَ তবে যদি কোনো শর্ত দ্বারা সীমিত করে যে بِاَنْ يُقَالَ এভাবে বলে যে اَصَحُّ اَسَانِيْدِ الْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ এ সনদটি অমুক শহরের মধ্যে অধিক বিশুদ্ধ اَوْ فِى الْبَابِ الْفُلَانِيِّ অথবা, অমুক অধ্যায়ের মধ্যে اَوْ فِى الْمَسْاَلَةِ الْفُلَانِيَّةِ অথবা, অমুক বিষয়ের মধ্যে بِقَيْدٍ يَصِحُّ তাহলে তা সঠিক হবে وَاللّٰهُ اَعْلَمُ আল্লাহই অধিক জানেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَعْنَى الضَّعِيْفِ لُغَةً **[দ্বা'ঈফের আভিধানিক অর্থ] :** ضَعِيْفٌ শব্দটি قَوِىٌّ শব্দের বিপরীত। শাব্দিক অর্থ– অক্ষম, দুর্বল ইত্যাদি।

مَعْنَى الضَّعِيْفِ اِصْطِلَاحًا **[দ্বা'ঈফের পারিভাষিক অর্থ] :**

১. مُقَدِّمَةُ الشَّيْخِ -এর মতে, اَلضَّعِيْفُ هُوَ الَّذِىْ فَقَدَ فِيْهِ الشَّرَائِطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِى الصِّحَّةِ وَالْحَسَنِ كُلًّا اَوْ بَعْضًا অর্থাৎ যাতে সহীহ ও হাসানের শর্তাবলি পুরোপুরি বা আংশিক পাওয়া যায় না, তাকে اَلضَّعِيْفُ বলে।

২. ড. মাহমূদ আত্-ত্বাহহানের মতে, هُوَ مَا لَمْ يَجْمَعْ صِفَةَ الْحَسَنِ بِفَقْدِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوْطِهٖ

৩. ইমাম البيقوني বলেন– وَكُلُّ مَا عَنْ رُتْبَةِ الْحَسَنِ قَصُرْ فَهُوَ الضَّعِيْفُ

قَوْلُهُ اَلشَّرَائِطُ الْمُعْتَبَرَةُ : গ্রহণযোগ্য শর্ত ছয়টি। যথা– ১. সনদ মুত্তাসিল হওয়া ২. আদালাতসম্পন্ন হওয়া ৩. ضَبْط বা স্মরণশক্তি পরিপূর্ণ থাকা ৪. মুতাবিয়াত হবে ৫. মু'আল্লাল হবে না ৬. এবং শায হতে পারবে না। এর মধ্যে ضَبْط ব্যতীত অপর শর্তগুলো হাসান হাদীসের।

قَوْلُهُ اَلْحَدِيْثُ الضَّعِيْفُ الخ : রাবীর দুর্বলতা আধিক্য স্বল্পতার কারণে যঈফ হাদীসের মধ্যে দুর্বল্য হ্রাস-বৃদ্ধি হয়ে থাকে। যেমনিভাবে সহীহ হাদীসের রাবীর গুণাবলি পূর্ণতা ও অপূর্ণতার দিক দিয়ে তার বিশুদ্ধতা বৃদ্ধি ও হ্রাস পায়। সহীহ হাদীসের মধ্যে যেমনিভাবে اَصَحُّ الْاَسَانِيْدِ [সর্বাধিক সহী সনদ] রয়েছে। তেমনিভাবে যঈফ হাদীসের মধ্যেও সর্বাধিক যঈফ হাদীস রয়েছে। যাকে اَوْهَى الْاَسَانِيْدُ বলে।

হাকীম আবূ আব্দিল্লাহ নিশাপুরী (র.) মা'রিফাতু উলূমিল হাদীস গ্রন্থে اَوْهَى الْاَسَانِيْدُ এর বিভিন্ন প্রকার উল্লেখ করেছেন।

১. কোনো সাহাবী থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহের মধ্যে সর্বাধিক যঈফ হাদীস। যেমন– صَدَقَةُ بْنُ مُوْسَى الدَّقِيْقِىُّ عَنْ فَرْقَدٍ السَّبْخِىِّ عَنْ مُرَّةَ الطَّيِّبِ عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ (رض) হযরত আবূ বকর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহের মধ্যে সর্বাধিক যঈফ হাদীস।

২. কোনো এক শহরবাসীর বর্ণিত হাদীসসমূহের মধ্যে সর্বাধিক যঈফ হাদীস হলো– مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ الْمَصْلُوْبِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ زَحْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ শামবাসীদের থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহের মধ্যে সর্বাধিক যঈফ হাদীস।

فَصْلٌ مِنْ عَادَةِ التِّرْمِذِيِّ اَنْ يَّقُوْلَ فِىْ جَامِعِهٖ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ حَسَنٌ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ وَلَا شُبْهَةَ فِىْ جَوَازِ اِجْتِمَاعِ الْحَسَنِ وَالصِّحَّةِ بِاَنْ يَكُوْنَ حَسَنًا لِذَاتِهٖ وَصَحِيْحًا لِغَيْرِهٖ وَكَذٰلِكَ فِىْ اِجْتِمَاعِ الْغَرَابَةِ وَالصِّحَّةِ كَمَا اَسْلَفْنَا وَاَمَّا اِجْتِمَاعُ الْغَرَابَةِ وَالْحَسَنِ فَيَسْتَشْكِلُوْنَهٗ بِاَنَّ التِّرْمِذِىَّ اِعْتَبَرَ فِى الْحَسَنِ تَعَدُّدَ الطُّرُقِ فَكَيْفَ يَكُوْنُ غَرِيْبًا وَيُجِيْبُوْنَ بِاَنَّ اِعْتِبَارَ تَعَدُّدِ الطُّرُقِ فِى الْحَسَنِ لَيْسَ عَلَى الْاِطْلَاقِ بَلْ فِىْ قِسْمٍ مِنْهُ وَحَيْثُ حَكَمَ بِاجْتِمَاعِ الْحَسَنِ وَالْغَرَابَةِ اَلْمُرَادُ قِسْمٌ اٰخَرُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّهٗ اَشَارَ بِذٰلِكَ اِلٰى اِخْتِلَافِ الطُّرُقِ بِاَنْ جَاءَ فِىْ بَعْضِ الطُّرُقِ غَرِيْبًا وَفِىْ بَعْضِهَا حَسَنًا وَقِيْلَ اَلْوَاوُ بِمَعْنٰى اَوْ بِاَنَّهٗ يَشُكُّ وَيَتَرَدَّدُ فِىْ اَنَّهٗ غَرِيْبٌ اَوْ حَسَنٌ لِعَدَمِ مَعْرِفَتِهٖ جَزْمًا وَقِيْلَ اَلْمُرَادُ بِالْحَسَنِ هٰهُنَا لَيْسَ مَعْنَاهُ الْاِصْطِلَاحِىْ بَلِ اللُّغَوِىُّ بِمَعْنٰى مَا يَمِيْلُ اِلَيْهِ الطَّبْعُ وَهٰذَا الْقَوْلُ بَعِيْدٌ جِدًّا ـ

অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : ইমাম তিরমিযী (র.)-এর অভ্যাস স্বীয় 'জামিউত তিরমিযী' তে (এ নীতিমালা অনুসরণ করেছেন যে,) প্রত্যেক হাদীসের শেষে حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ـ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ حَسَنٌ ـ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ পরিভাষা উল্লেখ করে হাদীসটির শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা সম্পর্কে স্বীয় মতামত পেশ করেছেন। হাসান ও সহীহ এ দুই বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় হওয়ার বৈধতার ক্ষেত্রে কোনো সন্দেহ নেই। হাসানুন সহীহুন দ্বারা হাসান লিযাতিহী এবং সহীহ লিগায়রিহী উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। এমনিভাবে গরীব ও সহীহের একত্র হওয়ার ক্ষেত্রেও কোনো সন্দেহ নেই। যেমন আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি। কিন্তু গরীব ও হাসান এ দুটি বৈশিষ্ট্যের একত্র হওয়ার ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ প্রশ্ন তুলেছেন। কেননা, ইমাম তিরমিযী (র.)-এর মতে হাদীস হাসান হওয়ার ব্যাপারে তা বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত ও সংকলিত হওয়ার শর্তটি বিশেষভাবে পরিগণিত। সুতরাং তা কিরূপে গরীব হতে পারে? এ প্রশ্নের জবাবে মুহাদ্দিসগণ বলেছেন যে, হাদীস হাসান হওয়ার ক্ষেত্রে তা বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়ার গ্রহণযোগ্য শর্তটির সাধারণ প্রয়োগ শর্ত নয়; বরং তা দ্বারা হাদীসের একটি প্রকার বুঝানো হয়েছে। আর যখন কোনো হাদীসে হাসান ও গরীব বৈশিষ্ট্যদ্বয়ের একত্র হওয়ার কথা বলা হয়, তখন তা দ্বারা অন্য একটি প্রকরণ বুঝানো হয়ে থাকে। কিছুসংখ্যক বলেন যে, এর দ্বারা বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ কোনো সূত্রে গরীব এবং কোনো সূত্রে হাসান বর্ণিত হয়েছে।

কারো কারো মতে এখানে و অক্ষরের অর্থ হলো اَوْ এটা দ্বারা হাদীসটি নিশ্চিত পরিচয় না জানা থাকার কারণে সংশয় প্রকাশ করা হয় যে, হাদীসটি গরীব, না হয় হাসান। আর কারো মতে এখানে হাসান দ্বারা পারিভাষিক অর্থে হাসান উদ্দেশ্য নয়; বরং সে আভিধানিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, যার দিকে স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মন ধাবিত হয়। কিন্তু এ মতটিও অসামঞ্জস্যশীল ও দূরবর্তী।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ مِنْ عَادَةِ التِّرْمِذِيِّ ইমাম তিরমিযী (র.)-এর অভ্যাস হলো اَنْ يَّقُوْلَ فِىْ جَامِعِهٖ তাঁর স্বীয় জামে কিতাবের মধ্যে প্রত্যেক হাদীসের পরে এ কথা বলা যে حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ হাদীসটি হাসান ও সীগাহ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ حَسَنٌ হাদীসটি গরীব ও হাসান حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ হাদীসটি হাসান গরীব ও সহীহ وَلَا شُبْهَةَ فِىْ جَوَازِ اِجْتِمَاعِ الْحَسَنِ وَالصِّحَّةِ

আর হাসান ও সহীহ এ দুই বৈশিষ্ট্যের হাদীস একত্রিত হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই بِاَنْ يَكُوْنَ এভাবে হবে যে حَسَنًا لِذَاتِهٖ হাসান দ্বারা হাসান লিযাতিহী وَصَحِيْحًا لِغَيْرِهٖ আর সহীহ দ্বারা সহীহ লিগাইরিহী বুঝানো হয়েছে وَكَذٰلِكَ فِىْ اِجْتِمَاعِ الْغَرَابَةِ وَالصِّحَّةِ এমনিভাবে গরীব ও হাসান এই দুই বৈশিষ্ট্যের একত্রিত হওয়াতে কোনো সংশয় নেই كَمَا اَسْلَفْنَا যেমনি আমরা ইতপূর্বে আলোচনা করেছি وَاَمَّا اِجْتِمَاعُ الْغَرَابَةِ وَالْحَسَنِ তবে গরীব ও হাসান একত্রিত হওয়ার ব্যাপারে فَيَسْتَشْكِلُوْنَهٗ মুহাদ্দিসগণ কঠিন মনে করেছেন بِاَنَّ التِّرْمِذِىْ اِعْتَبَرَ فِى الْحَسَنِ কেননা, ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীস হাসান হওয়ার ব্যাপারে এ শর্তটি গণ্য করেছেন যে, تَعَدُّدُ الطُّرُقِ বিভিন্ন সনদে বা পদ্ধতিতে বর্ণিত হওয়া فَكَيْفَ يَكُوْنُ غَرِيْبًا সুতরাং কিভাবে গরীব হতে পারে وَيُجِيْبُوْنَ আর মুহাদ্দিসগণ এর জবাবে বলেছেন যে بِاَنَّ اِعْتِبَارَ تَعَدُّدِ الطُّرُقِ فِى الْحَسَنِ হাসান হাদীসের ব্যাপারে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত গ্রহণযোগ্য শর্তটি لَيْسَ عَلَى الْاِطْلَاقِ সাধারণ হিসাবে গণ্য হয় না بَلْ فِىْ قِسْمٍ مِنْهُ বরং এর দ্বারা হাদীসের একটি প্রকার বুঝায়। وَحَيْثُ حَكَمَ بِاِجْتِمَاعِ الْحَسَنِ وَالْغَرَابَةِ আর যেখানে হাসান ও গরীব বৈশিষ্ট্যদ্বয়ে একত্রিত হওয়ার কথা বলা হয় اَلْمُرَادُ قِسْمٌ اٰخَرُ তখন এর দ্বারা একটি প্রকার বুঝানো হয় وَقَالَ بَعْضُهُمْ আর কিছু সংখ্যক বলেছেন اِنَّهٗ اَشَارَ بِذٰلِكَ اِلٰى اِخْتِلَافِ الطُّرُقِ এর দ্বারা সূত্রে বিভিন্নতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে بِاَنْ جَاءَ فِىْ بَعْضِ الطُّرُقِ غَرِيْبًا এভাবে যে কোনো সূত্রে তা গরীব সনদে এসেছে وَفِىْ بَعْضِهَا حَسَنًا আর কোনো সূত্রে হাসান সনদে وَقِيْلَ اَلْوَاوُ بِمَعْنٰى اَوْ আর কেউ বলেন এখানে وَاوْ টি اَوْ অর্থে এসেছে بِاَنَّهٗ يَشُكُّ وَيَتَرَدَّدُ কেননা, এ বিষয়ে তার সন্দেহ-সংশয় ছিল فِىْ اَنَّهٗ غَرِيْبٌ اَوْ حَسَنٌ এ বিষয়ে যে অত্র সনদটি গরীব অথবা হাসান لِعَدَمِ مَعْرِفَتِهٖ جَزْمًا নিশ্চিত পরিচয় না থাকার ফলে وَقِيْلَ اَلْمُرَادُ بِالْحَسَنِ هٰهُنَا আর কেউ বলেন, এখানে হাসান দ্বারা উদ্দেশ্য হলো لَيْسَ مَعْنَاهُ الْاِصْطِلَاحِىْ পরিভাষিক অর্থ নয় بَلِ اللُّغَوِىُّ বরং শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্য بِمَعْنٰى এই অর্থে যে مَا يَمِيْلُ اِلَيْهِ الطَّبْعُ যার দিকে স্বাভাবিকভাবে মন ধাবিত হয় وَهٰذَا الْقَوْلُ بَعِيْدٌ جِدًّا তবে এ অর্থটি অধিক দূরবর্তী বা অসামঞ্জস্য।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

نَبْذًا مِنْ حَيَاةِ اِمَامِ تِرْمِذِىْ [ইমাম তিরমিযী (র.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী] :

নাম ও পরিচিতি : তাঁর নাম মুহাম্মদ উপনাম আবূ ঈসা; পিতার নাম ঈসা ইবনে সাওরাহ। তিনি তাঁর জন্মস্থানের নামেই সমধিক পরিচিত। তাঁর পূর্ণ পরিচিতি হলো - اَبُوْ عِيْسٰى مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى بْنِ سَوْرَةَ بْنِ مُوْسٰى بْنِ ضَحَّاكِ التِّرْمِذِىُّ

জন্ম : তিনি ২০৯ হিজরিতে জায়াহুন নদীর তীরবর্তী তিরমিয নামক শহরেজন্ম গ্রহণ করেন।

وَفَاتُهٗ : তিনি ৭০ বছর বয়সে ২৭৯ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

خِدْمَتُهٗ : হাদীসশাস্ত্রে তাঁর বিরাট এক খেদমত রয়েছে তাঁর সংকলিত جَامِع تِرْمِذِىْ -এর অন্যতম। এটি একাধারে جَامِعٌ অন্যদিকে سُنَنٌ এ বৈশিষ্ট্য অপর কোনো গ্রন্থে নেই। ওলামায়ে কেরাম এ গ্রন্থটিকে صِحَاحِ سِتَّه -এর মধ্যে গণ্য করেছেন।

فَصْلٌ اَلْاِحْتِجَاجُ فِى الْاَحْكَامِ بِالْخَبَرِ الصَّحِيْحِ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَكَذٰلِكَ بِالْحَسَنِ لِذَاتِهٖ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ وَهُوَ مُلْحَقٌ بِالصَّحِيْحِ فِىْ بَابِ الْاِحْتِجَاجِ وَاِنْ كَانَ دُوْنَهٗ فِى الْمَرْتَبَةِ وَالْحَدِيْثُ الضَّعِيْفُ الَّذِىْ بَلَغَ بِتَعَدُّدِ الطُّرُقِ مَرْتَبَةَ الْحَسَنِ لِغَيْرِهٖ اَيْضًا مُجْمَعٌ وَمَا اشْتُهِرَ اَنَّ الْحَدِيْثَ الضَّعِيْفَ مُعْتَبَرٌ فِىْ فَضَائِلِ الْاَعْمَالِ لَا فِىْ غَيْرِهَا اَلْمُرَادُ مُفْرَدَاتُهٗ لَا مَجْمُوْعُهَا لِاَنَّهٗ دَاخِلٌ فِى الْحَسَنِ لَا فِى الضَّعِيْفِ صَرَّحَ بِهِ الْاَئِمَّةُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنْ كَانَ الضَّعِيْفُ مِنْ جِهَةِ سُوْءِ حِفْظٍ اَوْ اِخْتِلَاطٍ اَوْ تَدْلِيْسٍ مَعَ وُجُوْدِ الصِّدْقِ وَالدِّيَانَةِ يَنْجَبِرُ بِتَعَدُّدِ الطُّرُقِ وَاِنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ اِتِّهَامِ الْكِذْبِ اَوِ الشُّذُوْذِ اَوْ فُحْشِ الْغَلَطِ لَا يَنْجَبِرُ بِتَعَدُّدِ الطُّرُقِ وَالْحَدِيْثُ مَحْكُوْمٌ عَلَيْهِ بِالضُّعْفِ وَمَعْمُوْلٌ بِهٖ فِىْ فَضَائِلِ الْاَعْمَالِ وَعَلٰى مِثْلِ هٰذَا يَنْبَغِىْ اَنْ يُحْمَلَ مَا قِيْلَ اَنَّ لُحُوْقَ الضَّعِيْفِ بِالضَّعِيْفِ لَا يُفِيْدُ قُوَّةً وَاِلَّا فَهٰذَا الْقَوْلُ ظَاهِرُ الْفَسَادِ فَتَدَبَّرْ ـ

অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : সহীহ হাদীস দ্বারা শরিয়তের বিধান প্রমাণ গ্রহণের (হুজ্জত হওয়া) ক্ষেত্রে সকল মুহাদ্দিস একমত। এমনিভাবে সাধারণ ওলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত মতে, হাসান লিযাতিহী হাদীসও সহীহ হাদীসের সাথে হুজ্জাত হওয়ার যোগ্যতা রাখে, যদিও মর্যদাগত দিক থেকে তার তুলনায় কম হয়। আর দ্বা'ঈফ হাদীস যদি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়ার দরুন হাসান লিগায়রিহী সমপর্যায়ে উন্নীত হয়, তা হুজ্জত হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত। প্রসিদ্ধ কথা হলো দ্বা'ঈফ হাদীস আমলের ফজিলতের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য, অন্য কোনো ক্ষেত্রে নয়। এ প্রসিদ্ধ কথার মর্ম হচ্ছে তার মুফরাদসমূহ [একক ও বিশেষ হাদীস], সামগ্রিকভাবে নয়। কেননা, তা হাসানের অন্তর্ভুক্ত, দ্বা'ঈফের অন্তর্ভুক্ত নয়। ইমামগণ এরূপই ব্যাখ্যা করেছেন। কোনো কোনো মুহাদ্দিস বলেছেন, বিশ্বস্ততা ও দিয়ানতাদারী সত্ত্বেও যদি মুখস্থের দুষ্টতা, সংমিশ্রণ ও তাদলীসের কারণে হাদীস দ্বা'ঈফ হয়, তবে বহু সূত্রে বর্ণিত হওয়ার দ্বারা তার ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়। আর যদি মিথ্যাচারিতার দোষে বা শায হওয়ার কারণে অথবা ভ্রান্তির কারণে দ্বা'ঈফ হয়, তবে বহু সূত্রে বর্ণিত হওয়ার দ্বারাও তার ক্ষতিপূরণ হয় না। হাদীসটি দ্বা'ঈফ হিসেবেই নির্ধারিত হবে, তবে আমলের ফজিলতের ক্ষেত্রে কার্যকরী হবে। এ একই কথা মুহাদ্দিসীনে কেরামের সে উক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে, "দ্বা'ঈফ দ্বা'ঈফের সাথে মিলিত হয়ে কোনো শক্তি ক্ষেত্রে কার্যকর নয়।" নতুবা এ কথাটির দুষ্টতা স্পষ্ট। সুতরাং বিষয়টি সম্পর্কে ভালোভাবে চিন্তা করো।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ اَلْاِحْتِجَاجُ فِى الْاَحْكَامِ শরিয়তের বিধান প্রমাণ গ্রহণ করা بِالْخَبَرِ الصَّحِيْحِ সহীহ হাদীস দ্বারা مُجْمَعٌ عَلَيْهِ সকলে এতে একমত وَكَذٰلِكَ بِالْحَسَنِ لِذَاتِهٖ এমনিভাবে হাসান লিযাতিহীও عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ সাধারণ ওলামাদের মতে وَهُوَ مُلْحَقٌ بِالصَّحِيْحِ তাও সহীহের সাথে সংশ্লিষ্ট فِىْ بَابِ الْاِحْتِجَاجِ প্রমাণ গ্রহণের ক্ষেত্রে وَاِنْ كَانَ دُوْنَهٗ فِى

الَّذِىْ بَلَغَ যা পৌঁছেছে الْمَرْتَبَةِ যদিও তা মর্যাদাগত দিক থেকে সহীহ হাদীসের থেকে কম وَالْحَدِيْثُ الضَّعِيْفُ আর দ্বা'ঈফ হাদীস اَيْضًا مُجْمَعٌ তাও সকলের بِتَعَدُّدِ الطُّرُقِ বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়ার ফলে مَرْتَبَةَ الْحَسَنِ لِغَيْرِهٖ হাসান লিগাইরিহী-এর মানে ঐকমত্যে হয়েছে وَمَا اشْتُهِرَ আর প্রসিদ্ধ কথা হলো اَنَّ الْحَدِيْثَ الضَّعِيْفَ مُعْتَبَرٌ দ্বা'ঈফ হাদীস গ্রহণযোগ্য فِىْ فَضَائِلِ الْاَعْمَالِ আমলের ফজিলতের ক্ষেত্রে لَا فِىْ غَيْرِهَا অন্য কোনো ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয় اَلْمُرَادُ مُفْرَدَاتُهٗ এ প্রসিদ্ধ কথার উদ্দেশ্য হলো এককসমূহে لَا مَجْمُوْعُهَا সামাগ্রিকভাবে নয় لِاَنَّهٗ دَاخِلٌ فِى الْحَسَنِ কেননা, এটা হাসানের অন্তর্ভুক্ত لَا فِى الضَّعِيْفِ দ্বা'ঈফের অন্তর্ভুক্ত নয় صَرَّحَ بِهِ الْاَئِمَّةُ ইমামগণ এরূপই ব্যাখ্যা করেছেন وَقَالَ بَعْضُهُمْ কিছু সংখ্যক বলেছেন اِنْ كَانَ الضَّعِيْفُ যদি দ্বা'ঈফ হয় مِنْ جِهَةِ سُوْءِ حِفْظٍ স্মরণশক্তির কমের দিক থেকে اَوْ اِخْتِلَاطٍ অথবা সংমিশ্রণের ফলে اَوْ تَدْلِيْسٍ অথবা তাদলীসের কারণে مَعَ وُجُوْدِ الصِّدْقِ وَالدِّيَانَةِ রাবীর বিশ্বস্ততা দিয়ানতদারী সত্ত্বেও يَنْجَبِرُ بِتَعَدُّدِ الطُّرُقِ তবে তা বহু সূত্রে বর্ণিত হওয়ার মাধ্যমে তার ক্ষতিপূরণ হবে وَاِنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ اِتِّهَامِ الْكِذْبِ যদিও তা মিথ্যাবাদীতার অভিযোগে অভিযুক্ত اَوِ الشُّذُوْذِ اَوْ فُحْشِ الْغَلَطِ অথবা শায বা ভ্রান্তির কারণে لَا يَنْجَبِرُ بِتَعَدُّدِ الطُّرُقِ তখন বহু সূত্রে বর্ণিত হওয়ার ফলেও ক্ষতিপূরণ হবে না وَالْحَدِيْثُ مَحْكُوْمٌ عَلَيْهِ بِالضُّعْفِ হাদীসটি দ্বা'ঈফ হিসেবেই নির্ধারিত হবে وَمَعْمُوْلٌ بِهٖ فِىْ فَضَائِلِ الْاَعْمَالِ তবে আমলের ফজিলতের ক্ষেত্রে কার্যকরী হবে وَعَلٰى مِثْلِ هٰذَا يَنْبَغِىْ আর একথাই প্রযোজ্য হবে اَنْ يُحْمَلَ مَا قِيْلَ মুহাদ্দিসগণ যা বলেছেন তার উপরে যে, اَنَّ لُحُوْقَ الضَّعِيْفِ بِالضَّعِيْفِ নিশ্চয়ই দ্বা'ঈফ দ্বা'ঈফের মিলনের ফলে لَا يُفِيْدُ قُوَّةً শক্তির ক্ষেত্রে কোনো উপকার প্রদান করবে না وَاِلَّا فَهٰذَا اَلْقَوْلُ ظَاهِرُ الْفَسَادِ অন্যথায় এ পরিভাষাটির বিপর্যয় প্রকাশ্য فَتَدَبَّرْ অতএব বিষয়টি ভালো করে বুঝে নাও।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اَلْاِحْتِجَاجُ فِى الْاَحْكَامِ بِالْخَبَرِ : মুহাদ্দিসগণ যেসব হাদীস দ্বারা শরিয়তের দলিল গ্রহণে ঐকমত্য হয়েছেন তা হলো নিম্নরূপ :

১. সহীহ হাদীস যার রাবীগণ বর্ণনার গুণসমূহে গুণান্বিত এবং বর্ণনাও ধারাবাহিক, এরূপ হাদীসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে সকল উম্মত একমত।

২. এমনিভাবে حَسَنٌ لِذَاتِهٖ হাদীস দ্বারাও দলিল গ্রহণ করা যাবে। এতে সাধারণ ওলামাগণ একমত পোষণ করেছেন যদিও তা মর্যাদার দিক থেকে সহীহের থেকে কিছুটা নিম্নে।

৩. আর যে ضَعِيْف হাদীস বিভিন্ন সনদে বর্ণনার ফলে حَسَنٌ لِغَيْرِهٖ -এর মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে তা দ্বারাও দলিল গ্রহণ করা জায়েজ এ বিষয়েও সকলে একমত। তবে সাধারণত ضَعِيْف হাদীস আমলের ফজিলত সম্পর্কে গ্রহণ করা যাবে।

فَصْلٌ لَمَّا تَفَاوَتَتْ مَرَاتِبُ الصَّحِيْحِ وَالصِّحَاحُ بَعْضُهَا اَصَحُّ مِنْ بَعْضٍ فَاعْلَمْ اَنَّ الَّذِىْ تَقَرَّرَ عِنْدَ جُمْهُوْرِ الْمُحَدِّثِيْنَ اَنَّ صَحِيْحَ الْبُخَارِىْ مُقَدَّمٌ عَلٰى سَائِرِ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ حَتّٰى قَالُوْا اَصَحُّ الْكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ اللّٰهِ صَحِيْحُ الْبُخَارِىْ وَبَعْضُ الْمَغَارِبَةِ رَجَّحُوْا صَحِيْحَ مُسْلِمٍ عَلٰى صَحِيْحِ الْبُخَارِىْ وَالْجُمْهُوْرُ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ هٰذَا فِيْمَا يَرْجِعُ اِلٰى حُسْنِ الْبَيَانِ وَجَوْدَةِ الْوَضْعِ وَالتَّرْتِيْبِ وَ رِعَايَةِ دَقَائِقِ الْاِشَارَاتِ وَمَحَاسِنِ النُّكَاتِ فِى الْاَسَانِيْدِ وَهٰذَا خَارِجٌ عَنِ الْمَبْحَثِ وَالْكَلَامُ فِى الصِّحَّةِ وَالْقُوَّةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا وَلَيْسَ كِتَابٌ يُسَاوِىْ صَحِيْحَ الْبُخَارِىْ فِىْ هٰذَا الْبَابِ بِدَلِيْلِ كَمَالِ الصِّفَاتِ الَّتِىْ اُعْتُبِرَتْ فِى الصِّحَّةِ فِىْ رِجَالِهٖ وَبَعْضُهُمْ تَوَقَّفَ فِىْ تَرْجِيْحِ اَحَدِهِمَا عَلَى الْاٰخِرِ وَالْحَقُّ هُوَ الْاَوَّلُ ـ

অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : যখন সহীহ হাদীসের মধ্যে মানগত ব্যবধান রয়েছে, কোনোটি কোনোটি হতে অধিক সহীহ। তখন এটা জেনে রাখা উচিত যে, জুমহূর মুহাদ্দিসীনের নিকট এটা প্রমাণিত যে, সহীহ বুখারী সকল সংকলিত গ্রন্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এমনকি তারা বলেছেন, কিতাবুল্লাহর পর সবচেয়ে সহীহ কিতাব হলো সহীহ আল-বুখারী। কতক পশ্চিমা মুহাদ্দিস সহীহ মুসলিমকে সহীহ বুখারীর উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। জুমহূর মুহাদ্দিসগণ বলেন, এ প্রাধান্য দান হলো বর্ণনার সৌন্দর্য, শ্রেণীবিন্যাসের সৌন্দর্য, সূক্ষ্ম ইঙ্গিত এবং সনদের সূক্ষ্মতার উৎকৃষ্টতা সম্পর্কে। এটা আলোচনা বহির্ভূত জিনিস। মূলকথা হলো, হাদীসের বিশুদ্ধতা, শক্তি এবং তার সাথে সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কে। ইমাম বুখারী হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধি প্রমাণের জন্য রাবীদের সম্পর্কে যে সমস্ত শর্তারোপ করেছেন, তার ভিত্তিতে বিশুদ্ধতা ও শক্তির দিক হতে সহীহ বুখারীর তুলনায় আর কোনো কিতাব নেই। কোনো কোনো মুহাদ্দিস উভয়ের মধ্যে প্রাধান্য দেওয়ার ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন, কিন্তু প্রথম মতটি যথার্থ সঠিক।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ لَمَّا تَفَاوَتَتْ যখন ব্যবধান দেখা দেয় مَرَاتِبُ الصَّحِيْحِ وَالصِّحَاحُ সহীহ হাদীসের মধ্যে মানগত দিক থেকে بَعْضُهَا اَصَحُّ مِنْ بَعْضٍ কোনোটি হতে কোনোটি অধিক বিশুদ্ধ فَاعْلَمْ তখন তুমি জেনে রেখো যে اَنَّ الَّذِىْ تَقَرَّرَ عِنْدَ جُمْهُوْرِ الْمُحَدِّثِيْنَ জুমহুর মুহাদ্দেসীনের নিকট এটা প্রমাণিত اَنَّ صَحِيْحَ الْبُخَارِىْ নিশ্চয়ই সহীহ বুখারী مُقَدَّمٌ عَلٰى سَائِرِ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ সকল সংকলিত কিতাবের মধ্যে অগ্রগামী حَتّٰى قَالُوْا এমনকি তারা বলেছেন اَصَحُّ الْكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার কিতাবের পর বিশুদ্ধ কিতাব হলো صَحِيْحُ الْبُخَارِىْ সহীহ বুখারী وَبَعْضُ الْمَغَارِبَةِ আর কিছুসংখ্যক পশ্চিমা মুহাদ্দিস رَجَّحُوْا صَحِيْحَ مُسْلِمٍ সহীহ মুসলিমকে প্রাধান্য দিয়েছেন عَلٰى صَحِيْحِ الْبُخَارِىْ সহীহ বুখারীর উপরে وَالْجُمْهُوْرُ يَقُوْلُوْنَ আর জুমহুর মুহাদ্দিসগণ বলেন اِنَّ هٰذَا এই প্রাধান্য দান فِيْمَا يَرْجِعُ اِلٰى حُسْنِ الْبَيَانِ বর্ণনার সৌন্দর্যতার ফলে وَجَوْدَةِ الْوَضْعِ وَالتَّرْتِيْبِ শ্রেণীবিন্যাসের উৎকর্ষতার ফলে وَ رِعَايَةِ دَقَائِقِ الْاِشَارَاتِ সূক্ষ্ম তত্ত্বের দিকে ইঙ্গিতের ফলে وَمَحَاسِنِ النُّكَاتِ فِى الْاَسَانِيْدِ এবং সনদের নিখুঁত সৌন্দর্যের দিকে প্রযোজ্য হবে وَهٰذَا خَارِجٌ عَنِ الْمَبْحَثِ অথচ এটা আলোচনার বহির্ভূত জিনিস وَالْكَلَامُ فِى الصِّحَّةِ وَالْقُوَّةِ আর মূল

আলোচনা হলো হাদীসের বিশুদ্ধতা ও শক্তি সম্পর্কে وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا এবং এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে وَلَيْسَ بِدَلِيْلِ كَمَالِ فِىْ هٰذَا الْبَابِ كِتَابٌ يُسَاوِىْ صَحِيْحَ الْبُخَارِىْ সহীহ বুখারীর সমকক্ষ কোনো কিতাব নেই এই বিষয়ে পরিপূর্ণ দলিলের ভিত্তিতে الَّتِىْ اُعْتُبِرَتْ যা গণ্য করা হয়েছে فِى الصِّحَّةِ فِىْ رِجَالِهِ বিশুদ্ধতার বিষয়ে তাঁর الصِّفَاتِ হাদীসের রাবীগণের ব্যাপারে وَبَعْضُهُمْ تَوَقَّفَ কিছুসংখ্যক মুহাদ্দিস নীরবতা পালন করেছেন فِىْ تَرْجِيْحِ اَحَدِهِمَا عَلَى الْاٰخَرِ এগুলোর একটির উপর অপরটিকে প্রাধান্য দেওয়ার ব্যাপারে وَالْحَقُّ هُوَ الْاَوَّلُ তবে প্রথম সত্যটিই সঠিক।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَالصِّحَاحُ بَعْضُهَا اَصَحُّ مِنْ بَعْضٍ : বুখারী ও মুসলিম শরীফের মধ্যে কোন কিতাবটি উর্ধ্বে স্থান পাবে এ বিষয়ে কিছুটা মতভেদ দেখা যায়। তবে জুমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে হাদীসগ্রন্থসমূহের মধ্যে বুখারীর স্থানই শীর্ষে। এমনকি তারা বলেন, আল্লাহর কিতাব পবিত্র কুরআনের পর সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ হলো বুখারী শরীফ। কিন্তু হাফেজ আবূ আলী নিশাপুরী এবং কিছু পাশ্চাত্য আলিম বুখারীর উপর মুসলিমকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

জুমহূরে মুহাদ্দিসীন এর জবাবে বলেন যে, বর্ণনার সৌন্দর্যতা, শ্রেণীবিন্যাসের উৎকৃষ্টতা, সূক্ষ্ম তত্ত্বের ইঙ্গিত প্রদান, সনদের সূক্ষ্মতার সৌন্দর্য ইত্যাদি দিক দিয়ে মুসলিম শরীফ প্রাধান্য পেতে পারে; কিন্তু এটা আমাদের আলোচনার বহির্ভূত বিষয়। আমাদের বক্তব্য হলো, হাদীসের বিশুদ্ধতা শক্তি ও তার সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে সম্পর্কে। আর এদিক দিয়ে সহীহ আল-বুখারীর সমমানের আর কোনো গ্রন্থ নেই। কেননা, ইমাম বুখারী হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধির জন্য রাবীদের সম্পর্কে যে সমস্ত শর্তারোপ করেছেন যেমন مُعَنْعَنْ -এর ক্ষেত্রে رَاوِىْ ও مَرْوِىْ عَنْهُ -এর মাঝে সাক্ষাৎ সংঘটিত হওয়া ইত্যাদি এগুলো হাদীসশাস্ত্রের জন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিষয়।

قَوْلُهُ جَوْدَةِ الْوَضْعِ : হাদীস বর্ণনার পদ্ধতিতে বিভিন্ন সনদের সাথে একস্থানে একত্র করা।

قَوْلُهُ دَقَائِقِ الْاِشَارَاتِ : যেমন– মুজমাল, মুশকিল, মানসূখ, মুবহাম ইত্যাদিকে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা।

قَوْلُهُ وَلَيْسَ كِتَابٌ يُسَاوِىْ الخ : আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.) নুযহাতুন নযর ফী তাওযীহি নুখবাতিল ফিকার গ্রন্থে শুদ্ধতার বিচারে সহীহ মুসলিমের উপর সহীহ বুখারীর প্রাধান্য পাওয়ার সাতটি কারণ বর্ণনা করেছেন। আর সেগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো–

১. রাবীদের গুণাবলির উপর হাদীসের শুদ্ধতা নির্ভরশীল। যে সকল গুণাবলি সহীহ বুখারীর রাবীদের মধ্যে সহীহ মুসলিমের রাবীদের তুলনায় অধিক হারে রয়েছে।
২. ইমাম বুখারী (র.)-এর সহীহ বুখারী রচনার ক্ষেত্রে অনুসৃত নীতিমালা ইমাম মুসলিম (র.)-এর অনুসৃত নীতিমালা অপেক্ষা অধিক কঠোর ও ত্রুটিমুক্ত।
৩. مُعَنْعَنْ হাদীস مُتَّصِلُ السَّنَدِ হওয়ার জন্য ইমাম বুখারী (র.) رَاوِىْ ও مَرْوِىْ عَنْهُ-এর মাঝে জীবনে কমপক্ষে একবার সাক্ষাৎ প্রমাণিত হওয়ার শর্তারোপ করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম মুসলিম (র.) শুধুমাত্র সমকালীন হওয়ার শর্তারোপ করেছেন।
৪. সহীহ বুখারীর রাবীগণ সহীহ মুসলিমের রাবীদের তুলনায় বেশি শ্রেষ্ঠ।
৫. ইমাম বুখারী (র.)-এর যে সকল রাবীদের সমালোচনা করা হয়েছে তাদের সংখ্যা নিতান্তই স্বল্প, তাছাড়া তাদের অধিকাংশ তার ওস্তাদ। যাদের সম্পর্কে তিনি সম্যকজ্ঞাত। পক্ষান্তরে ইমাম মুসলিম (র.)-এর যে সকল রাবী সমালোচিত তাদের সংখ্যা অধিক। তদুপরি তাদের অধিকাংশই তার ওস্তাদ নন।
৬. شَاذٌ ও مَعْلُوْل হাদীসের সংখ্যা সহীহ বুখারীতে সহীহ মুসলিম অপেক্ষা অত্যান্ত স্বল্প।
৭. ইলমে হাদীসে ইমাম বুখারী (র.) ইমাম মুসলিম (র.) অপেক্ষা বেশি অভিজ্ঞ ও দক্ষ ছিলেন। তাছাড়া ইমাম বুখারী (র.) ইমাম মুসলিম (র.) এর ওস্তাদও ছিলেন। আর ছাত্রের উপর ওস্তাদের শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজন স্বীকৃত।

قَوْلُهُ اُعْتُبِرَتْ : যেমন– ইমাম বুখারী حَدِيْثُ مُعَنْعَنْ -এর ক্ষেত্রে রাবী ও মারবী আনহু-এর মধ্যে সাক্ষাৎ শর্ত করেছেন; কিন্তু ইমাম মুসলিম শুধু যুগের শর্ত করেছেন– সাক্ষাৎ শর্ত করেননি।

وَالْحَدِيْثُ الَّذِىْ اِتَّفَقَ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ عَلٰى تَخْرِيْجِهٖ يُسَمّٰى مُتَّفَقًا عَلَيْهِ وَقَالَ الشَّيْخُ بِشَرْطِ اَنْ يَكُوْنَ عَنْ صَحَابِىٍّ وَاحِدٍ وَقَالُوْا مَجْمُوْعُ الْاَحَادِيْثِ الْمُتَّفَقَةِ عَلَيْهَا اَلْفَانِ وَثَلٰثُ مِائَةٍ وَسِتَّةٌ وَّعِشْرُوْنَ وَبِالْجُمْلَةِ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ مُقَدَّمٌ عَلٰى غَيْرِهٖ ثُمَّ مَا تَفَرَّدَ بِهِ الْبُخَارِىُّ ثُمَّ مَا تَفَرَّدَ بِهٖ مُسْلِمٌ ثُمَّ مَا كَانَ عَلٰى شَرْطِ الْبُخَارِىْ وَمُسْلِمٍ ثُمَّ مَا هُوَ عَلٰى شَرْطِ الْبُخَارِىْ ثُمَّ مَا هُوَ عَلٰى شَرْطِ مُسْلِمٍ ثُمَّ مَا هُوَ رَوَاهُ مَنْ غَيْرُهُمْ مِنَ الْاَئِمَّةِ الَّذِيْنَ الْتَزَمُوا الصِّحَّةَ وَصَحَّحُوْهُ فَالْاَقْسَامُ سَبْعَةٌ وَالْمُرَادُ بِشَرْطِ الْبُخَارِىْ وَمُسْلِمٍ اَنْ يَكُوْنَ الرِّجَالُ مُتَّصِفِيْنَ بِالصِّفَاتِ الَّتِىْ يَتَّصِفُ بِهَا رِجَالُ الْبُخَارِىْ وَمُسْلِمٍ مِنَ الضَّبْطِ وَالْعَدَالَةِ وَعَدَمِ الشُّذُوْذِ وَالنَّكَارَةِ وَالْغَفْلَةِ وَقِيْلَ الْمُرَادُ بِشَرْطِ الْبُخَارِىْ وَمُسْلِمٍ رِجَالُهُمَا اَنْفُسُهُمْ وَالْكَلَامُ فِىْ هٰذَا طَوِيْلٌ ذَكَرْنَاهُ فِىْ مُقَدِّمَةِ شَرْحِ سِفْرِ السَّعَادَةِ ـ

অনুবাদ : যে হাদীস প্রকাশ করার ব্যাপারে বুখারী ও মুসলিম ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন তাকে 'মুত্তাফাকুন আলাইহি' হাদীস বলে। আর শায়খ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, তবে শর্ত হলো, তা একই সাহাবী হতে বর্ণিত হবে। মুহাদ্দিসগণ বলেন, মুত্তাফাক আলাইহি ২৩২৬ টি হাদীস। মোটকথা যে হাদীস নির্গত করার ব্যাপারে ইমাম বুখারী ও মুসলিম ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন, তা অপরাপর হাদীস হতে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হবে। তারপর যা শুধু ইমাম বুখারী রিয়ায়াত করেছেন। এরপর যা শুধু ইমাম মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এরপর যা বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর যা বুখারীর শর্তানুযায়ী বর্ণিত, তারপর যা মুসলিমের শর্তানুযায়ী বর্ণিত হয়েছে। তৎপর এটা ছাড়া ঐ সমস্ত ইমামের বর্ণিত হাদীসসমূহের স্থান, যারা হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতা অপরিহার্য করে নিয়েছেন এবং তা সহীহ বলে বর্ণনা করেছেন। কাজেই এটা সর্বমোট সাত প্রকার।

বুখারী ও মুসলিমের শর্তের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হাদীস বর্ণনাকারীগণ (رِجَال حَدِيْث) সেসব গুণে গুণান্বিত হবেন, যে গুণে বুখারী ও মুসলিমের রাবীগণ গুণান্বিত হয়েছেন। আর সে গুণাবলি হলো রাবীর মধ্যে যবৃত ও আদালত হবে; শায, মুনকার ও গাফলাতের দোষে দোষী হবে না। কোনো কোনো মুহাদ্দিস বলেছেন, বুখারী ও মুসলিমের শর্তের অর্থ হলো, তাঁদের রাবী সে সমস্ত লোক হবেন যা বুখারী মুসলিমের। এ বিষয়ে অনেক বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে যা আমি [আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী] শরহে সফরুস সাদাত গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছি।

শাব্দিক অনুবাদ : وَالْحَدِيْثُ الَّذِىْ اِتَّفَقَ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ যে হাদীসে ইমাম বুখারী ও মুসলিম ঐকমত্য পোষণ করেছেন عَلٰى تَخْرِيْجِهٖ বর্ণনা করার ব্যাপারে يُسَمّٰى مُتَّفَقًا عَلَيْهِ তাকে মুত্তাফাকুন আলাইহি হাদীস বলা হয় وَقَالَ الشَّيْخُ। আর শায়খ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, بِشَرْطِ اَنْ يَكُوْنَ عَنْ صَحَابِىٍّ وَاحِدٍ তবে শর্ত হলো তা একই সাহাবী হতে বর্ণিত হতে হবে। وَقَالُوْا মুহাদ্দিসগণ বলেন مَجْمُوْعُ الْاَحَادِيْثِ الْمُتَّفَقَةِ عَلَيْهَا মুত্তাফাক আলাইহ হাদীস

مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ সর্বসাকুল্যে হলো وَبِالْجُمْلَةِ ২৩২৬ টি اَلْفَانِ وَثَلٰثُمِائَةٍ وَسِتَّةٌ وَعِشْرُوْنَ আর মূলকথা হলো যার উপর ইমাম বুখারী ও মুসলিম ঐকমত্য পোষণ করেছেন مُقَدَّمٌ عَلٰى غَيْرِهٖ তা অপরাপর হাদীস হতে অগ্রগামী হবে ثُمَّ مَا تَفَرَّدَ بِهِ الْبُخَارِىُّ এরপর যা ইমাম বুখারী (র.) এককভাবে বর্ণনা করেছেন ثُمَّ مَا تَفَرَّدَ بِهٖ مُسْلِمٌ এরপর ইমাম মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন ثُمَّ مَا كَانَ عَلٰى شَرْطِ الْبُخَارِىْ وَمُسْلِمٍ অতঃপর যা ইমাম বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী বর্ণিত হয়েছে ثُمَّ مَا هُوَ عَلٰى شَرْطِ الْبُخَارِىْ এরপর যা ইমাম বুখারীর শর্তানুসারে বর্ণিত হয়েছে ثُمَّ مَا هُوَ عَلٰى شَرْطِ مُسْلِمٍ তারপর যা ইমাম মুসলিমের শর্তানুসারে বর্ণিত হয়েছে ثُمَّ مَا هُوَ رَوَاهُ مَنْ غَيْرُهُمْ مِنَ الْاَئِمَّةِ এরপর স্থান হলো ঐ সব হাদীসের যা অন্যান্য ইমামগণ বর্ণনা করেছেন اَلَّذِيْنَ الْتَزَمُوا الصِّحَّةَ যারা হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতা অপরিহার্য করে নিয়েছেন وَصَحَّحُوْهُ এবং তা সহীহ হিসাবে বর্ণনাও করেছেন فَالْاَقْسَامُ سَبْعَةٌ এতে সর্বমোট সাত প্রকার হলো وَالْمُرَادُ بِشَرْطِ الْبُخَارِىْ وَمُسْلِمٍ ইমাম বুখারীর ও মুসলিমের শর্ত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اَنْ يَكُوْنَ الرِّجَالُ مُتَّصِفِيْنَ হাদীস বর্ণনাকারীগণ সেসব গুণে গুণান্বিত হবেন بِالصِّفَاتِ الَّتِىْ يَتَّصِفُ بِهَا رِجَالُ الْبُخَارِىْ وَمُسْلِمٍ যে গুণে ইমাম বুখারী ও মুসলিমের রাবীগণ গুণান্বিত হবেন مِنَ الضَّبْطِ وَالْعَدَالَةِ যেমন যবত, আদালত وَعَدَمِ الشُّذُوْذِ وَالنَّكَارَةِ وَالْغَفْلَةِ শায, মুনাকার ও গলতের দোষে দোষী হবে না وَقِيْلَ আর কোনো কোনো মুহাদ্দিস বলেছেন اَلْمُرَادُ بِشَرْطِ الْبُخَارِىْ وَمُسْلِمٍ আর বুখারী ও মুসলিমের শর্তের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো رِجَالُهُمَا اَنْفُسُهُمْ তাঁদের রাবীগণ সেসব লোক হবেন যারা বুখারী ও মুসলিমের وَالْكَلَامُ فِىْ هٰذَا طَوِيْلٌ আর এ বিষয়ে অনেক বিস্তারিত কথা রয়েছে ذَكَرْنَاهُ যা আমি উল্লেখ করেছি فِىْ مُقَدَّمَةِ شَرْحِ سِفْرِ السَّعَادَةِ শরহে সফরুস সা'আদাত গ্রন্থের ভূমিকায় বর্ণনা করেছি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ ثُمَّ مَا كَانَ عَلٰى شَرْطِ الْبُخَارِىْ وَمُسْلِمٍ : ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.)-এর নিকট হাদীস গ্রহণের জন্য শর্তগুলো হলো– ১. مُتَّصِلُ السَّنَدِ ২. اَنْ يَكُوْنَ عَادِلًا ৩. اَنْ يَكُوْنَ تَامَّ الضَّبْطِ ৪. غَيْرَ مُعَلَّلٍ ৫. وَلَا شَاذٍّ

এ ছাড়া مُعَنْعَنْ হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে ইমাম বুখারীর শর্ত হলো رَاوِىْ ও مَرْوِىْ عَنْهُ-এর সাথে সাক্ষাৎ হতে হবে। ضَبْط -এর দিক থেকে রাবীদের সর্বমোট পাঁচটি স্তর। যথা–

(١) كَثِيْرُ الضَّبْطِ وَالْحِفْظِ وَالْاِتْقَانِ وَكَثِيْرُ الْمُلَازَمَةِ مَعَ الشَّيْخِ
(٢) كَثِيْرُ الضَّبْطِ وَالْحِفْظِ وَالْاِتْقَانِ وَقَلِيْلُ الْمُلَازَمَةِ مَعَ الشَّيْخِ
(٣) قَلِيْلُ الضَّبْطِ وَالْحِفْظِ وَالْاِتْقَانِ وَكَثِيْرُ الْمُلَازَمَةِ مَعَ الشَّيْخِ
(٤) قَلِيْلُ الضَّبْطِ وَالْحِفْظِ وَالْاِتْقَانِ وَقَلِيْلُ الْمُلَازَمَةِ مَعَ الشَّيْخِ بِغَيْرِ جَرْحٍ
(٥) قَلِيْلُ الضَّبْطِ وَالْحِفْظِ وَالْاِتْقَانِ وَقَلِيْلُ الْمُلَازَمَةِ مَعَ الشَّيْخِ مَعَ جَرْحٍ

ইমাম বুখারী (র.) এ পাঁচ স্তর হতে প্রথম স্তরের রাবীদের থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন আর একান্ত প্রয়োজনে দ্বিতীয় স্তরের রাবীদের থেকেও হাদীস নিয়েছেন, কিন্তু এর পরের রাবীদের থেকে হাদীস নেননি।

পক্ষান্তরে ইমাম মুসলিম প্রথম দুই স্তরের রাবীদের থেকে হাদীস নিয়েছেন আর প্রয়োজনে তৃতীয় স্তরের লোকদের থেকেও হাদীস নিয়েছেন।

فَصْلٌ اَلْاَحَادِيْثُ الصَّحِيْحَةُ لَمْ تَنْحَصِرْ فِىْ صَحِيْحَيِ الْبُخَارِىْ وَمُسْلِمٍ وَلَمْ يَسْتَوْعِبَا الصِّحَاحَ كُلَّهَا بَلْ هُمَا مُنْحَصِرَانِ فِى الصِّحَاحِ وَالصِّحَاحُ الَّتِىْ عِنْدَهُمَا وَعَلٰى شَرْطِهِمَا اَيْضًا لَمْ يُوْرِدَاهُمَا فِىْ كِتَابَيْهِمَا فَضْلًا عَمَّا عِنْدَ غَيْرِهِمَا قَالَ الْبُخَارِىُّ مَا اَوْرَدْتُ فِىْ كِتَابِىْ هٰذَا اِلَّا مَا صَحَّ وَلَقَدْ تَرَكْتُ كَثِيْرًا مِنَ الصِّحَاحِ وَقَالَ مُسْلِمٌ اَلَّذِىْ اَوْرَدْتُ فِىْ هٰذَا الْكِتَابِ مِنَ الْاَحَادِيْثِ صَحِيْحٌ وَلَا اَقُوْلُ اِنَّ مَا تَرَكْتُ ضَعِيْفٌ وَلَابُدَّ اَنْ يَكُوْنَ فِىْ هٰذَا التَّرْكِ وَالْاِتْيَانِ وَجْهُ تَخْصِيْصِ الْاِيْرَادِ وَالتَّرْكِ اِمَّا مِنْ جِهَةِ الصِّحَّةِ اَوْ مِنْ جِهَةِ مَقَاصِدَ اُخَرَ -

অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : সহীহ হাদীসসমূহ শুধু বুখারী ও মুসলিমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আর তাঁরা সকল সহীহ হাদীসও সংকলন করেননি; বরং গ্রন্থ দুটিতে সহীহ হাদীসসমূহের সমাবেশ ঘটেছে। এমন অনেক হাদীস রয়েছে যা এ গ্রন্থকারদ্বয়ের নিকট সহীহ ছিল এবং তাঁদের শর্তানুযায়ীও ছিল, কিন্তু তাঁরা এমন সব হাদীসও গ্রহণ করতেন যা তাদের ছাড়া অন্যান্যের নিকটও সহীহ ছিল বা তাদের শর্তানুযায়ী ছিল। ইমাম বুখারী (র.) বলেছেন, আমি আমার গ্রন্থে শুধু সহীহ হাদীসই আনয়ন করেছি এবং অনেক সহীহ হাদীস ছেড়ে দিয়েছি। ইমাম মুসলিম (র.) বলেছেন, আমি আমার গ্রন্থে সহীহ হাদীস লিপিবদ্ধ করেছি। কিন্তু আমি এটা বলি না যে, আমি যেসব হাদীস এতে লিপিবদ্ধ করিনি তা দ্বা'ঈফ। অবশ্য এ গ্রহণ ও বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো কারণ রয়েছে। আর তা অবশ্যই তাঁদের দৃষ্টিতে সম্মুখে ছিল।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ اَلْاَحَادِيْثُ الصَّحِيْحَةُ لَمْ تَنْحَصِرْ সহীহ হাদীসসমূহ সীমাবদ্ধ নয় فِىْ صَحِيْحَيِ الْبُخَارِىْ وَمُسْلِمٍ শুধু সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফে وَلَمْ يَسْتَوْعِبَا الصِّحَاحَ كُلَّهَا আর তারা সকল সহীহ হাদীসও সংকলন করেননি بَلْ هُمَا مُنْحَصِرَانِ فِى الصِّحَاحِ বরং গ্রন্থদ্বয়ে সহীহ হাদীসসমূহের সমাবেশ ঘটেছে وَالصِّحَاحُ الَّتِىْ عِنْدَهُمَا এমন অনেক সহীহ হাদীস ছিল যা তাদের নিকট সহীহ ছিল وَعَلٰى شَرْطِهِمَا اَيْضًا এবং তাদের শর্তানুযায়ীও ছিল لَمْ يُوْرِدَاهُمَا فِىْ كِتَابَيْهِمَا অথচ তারা তা নিজেদের গ্রন্থে সংকলন করেননি فَضْلًا عَمَّا عِنْدَ غَيْرِهِمَا অন্যের নিকট যা সহীহ ছিল এ রকম হাদীসও তারা গ্রহণ করেছেন قَالَ الْبُخَارِىُّ ইমাম বুখারী (র.) বলেন مَا اَوْرَدْتُ فِىْ كِتَابِىْ هٰذَا اِلَّا مَا صَحَّ আমি আমার এ কিতাবে সহীহ ব্যতীত কোনো হাদীস আনয়ন করিনি وَلَقَدْ تَرَكْتُ كَثِيْرًا مِنَ الصِّحَاحِ আর আমি অনেক সহীহ হাদীস ছেড়ে দিয়েছি وَقَالَ مُسْلِمٌ আর ইমাম মুসলিম (র.) বলেন اَلَّذِىْ اَوْرَدْتُ فِىْ هٰذَا الْكِتَابِ مِنَ الْاَحَادِيْثِ صَحِيْحٌ আমি এ কিতাবে শুধু সহীহ হাদীসসমূহই সংকলন করেছি وَلَا اَقُوْلُ আর আমি এটা বলি না যে اِنَّ مَا تَرَكْتُ ضَعِيْفٌ আমি যা পরিত্যাগ করেছি তা দ্বা'ঈফ وَلَابُدَّ اَنْ يَكُوْنَ فِىْ هٰذَا التَّرْكِ وَالْاِتْيَانِ অবশ্যই এ বাদ দেওয়া ও গ্রহণ করার ক্ষেত্রে وَجْهُ تَخْصِيْصِ الْاِيْرَادِ وَالتَّرْكِ গ্রহণ ও বর্জনের বিশেষ কোনো কারণ ছিল اِمَّا مِنْ جِهَةِ الصِّحَّةِ হয়তো বা তা বিশুদ্ধতার দিক থেকে হবে اَوْ مِنْ جِهَةِ مَقَاصِدَ اُخَرَ অথবা অন্য কোনো উদ্দেশ্য বা কারণ রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْاَحَادِيْثُ الصَّحِيْحَةُ لَمْ تَنْحَصِرْ الخ : সহীহ হাদীসসমূহ শুধু বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে এটা নয়, তবে সহীহ হাদীস সংকলিত হওয়ার দিক থেকে এ গ্রন্থ দুটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এ ছাড়া অন্যান্য সহীহ গ্রন্থসমূহ হলো–

১. جَامِع تِرْمِذِىْ .২ سُنَن اَبِىْ دَاوُد .৩ سُنَن نَسَائِى .৫ مُوَطَّا اِمَام مَالِك .৬ سُنَن دَارِمِى .৭ صَحِيْح اِبْن خُزَيْمَة
৮. صَحِيْح اِبْن حِبَّان .৯ صَحِيْح اِبْن سَكَن .১০ اَلْمُسْتَدْرَك .১১ اَلْمُنْتَقَع .১২ اَلْمُسْتَخْرَج .১৩ مُصَنَّف اِبْن اَبِىْ
شَيْبَة .১৪ شَرْح مَعَانِى الْآثَار ইত্যাদি।

وَالْحَاكِمُ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ النَّيْسَافُوْرِىْ صَنَّفَ كِتَابًا سَمَّاهُ الْمُسْتَدْرَكَ بِمَعْنٰى اَنَّ مَا تَرَكَهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ مِنَ الصِّحَاحِ اَوْرَدَهٗ فِىْ هٰذَا الْكِتَابِ وَتَلَافٰى وَاسْتَدْرَكَ بَعْضَهَا عَلٰى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَبَعْضَهَا عَلٰى شَرْطِ اَحَدِهِمَا وَبَعْضَهَا عَلٰى غَيْرِ شَرْطِهِمَا وَقَالَ اِنَّ الْبُخَارِىْ وَمُسْلِمًا لَمْ يَحْكُمَا بِاَنَّهٗ لَيْسَ اَحَادِيْثُ صَحِيْحَةٌ غَيْرُ مَا خَرَّجَاهُ فِىْ هٰذَيْنِ الْكِتَابَيْنِ وَقَالَ قَدْ حَدَثَ فِىْ عَصْرِنَا هٰذَا فِرْقَةٌ مِنَ الْمُبْتَدِعَةِ اَطَالُوْا اَلْسِنَتَهُمْ بِالطَّعْنِ عَلٰى اَئِمَّةِ الدِّيْنِ بِاَنَّ مَجْمُوْعَ مَا صَحَّ عِنْدَكُمْ مِنَ الْاَحَادِيْثِ لَمْ يَبْلُغْ زُهَاءَ عَشَرَةِ اٰلَافٍ ـ

অনুবাদ : হাকিম আবূ আব্দুল্লাহ নিশাপুরী (র.) একখানা হাদীস গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন, যার নাম রেখেছেন 'আল-মুসতাদরাক'। যার উদ্দেশ্য হলো, ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) যেসব সহীহ হাদীস নিজ নিজ গ্রন্থে সংকলন করেননি, তিনি তাতে ঐ সকল হাদীস লিপিবদ্ধ করে তার ক্ষতিপূরণ করেছেন। এটা ছাড়া তিনি তাতে এমন সব হাদীসও সংকলন করেছেন, যা শায়খাইন বা তাদের কোনো একজনের শর্ত অনুসারে ছিল। অথবা তাঁদের ব্যতীত অন্য কোনো ইমামদের শর্ত অনুযায়ী ছিল। তিনি বলেছেন, ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) কখনো এ কথা বলেননি যে, তাঁরা নিজেদের গ্রন্থে যেসব হাদীস সংকলন করেছেন তা ব্যতীত অন্য কোনো হাদীস সহীহ নয়। তিনি আরো বলেছেন যে, আমাদের যুগের বিদআতীগণ দীনের ইমামগণের নামে অপবাদ বর্ণনা করে এই বলে অনেক নিন্দাবাদ করেছেন যে, তোমাদের নিকট হাদীসের যেসব সংকলন বর্তমান রয়েছে তাতে সহীহ হাদীসের সংখ্যা দশ হাজারের বেশি নয়।

শাব্দিক অনুবাদ : وَالْحَاكِمُ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ النَّيْسَافُوْرِىْ আর হাকিম আবূ আব্দুল্লাহ আন-নিশাপুরী صَنَّفَ كِتَابًا একখানা কিতাব প্রণয়ন করেছেন سَمَّاهُ الْمُسْتَدْرَكَ যাকে মুসতাদরাক নামে নামকরণ করেছেন بِمَعْنٰى যার মর্মার্থ হলো اَنَّ مَا تَرَكَهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ مِنَ الصِّحَاحِ ইমাম বুখারী ও মুসলিম যেসব সহীহ হাদীস পরিত্যাগ করেছেন اَوْرَدَهٗ فِىْ هٰذَا الْكِتَابِ তিনি ঐ সব হাদীসকে এ গ্রন্থে আনয়ন করেছেন وَتَلَافٰى এবং তার ক্ষতিপূরণ করেছেন وَاسْتَدْرَكَ بَعْضَهَا আর তাতে তিনি এমন হাদীসও সংকলন করেছেন عَلٰى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ যা শায়খাইনের শর্তানুযায়ী ছিল وَبَعْضَهَا عَلٰى شَرْطِ اَحَدِهِمَا এবং কিছুসংখ্যক তাদের কোনো একজনের শর্তে ছিল وَبَعْضَهَا عَلٰى غَيْرِ شَرْطِهِمَا আর কিছু হাদীস তাঁরা ব্যতীত অন্যান্যদের শর্তানুযায়ী ছিল وَقَالَ আর তিনি বলেন اِنَّ الْبُخَارِىْ وَمُسْلِمًا لَمْ يَحْكُمَا ইমাম বুখারী ও মুসলিম কখনো এ কথা বলেননি যে بِاَنَّهٗ لَيْسَ اَحَادِيْثُ صَحِيْحَةٌ غَيْرُ مَا خَرَّجَاهُ তাঁরা নিজেদের গ্রন্থে আনয়ন করেছেন তা ব্যতীত আর কোনো সহীহ হাদীস নেই فِىْ هٰذَيْنِ الْكِتَابَيْنِ এ কিতাবদ্বয়ে وَقَالَ তিনি আরো বলেছেন যে قَدْ حَدَثَ فِىْ عَصْرِنَا هٰذَا فِرْقَةٌ مِنَ الْمُبْتَدِعَةِ আমাদের যুগে একদল বিদআতী বের হয়েছে اَطَالُوْا اَلْسِنَتَهُمْ بِالطَّعْنِ তারা অপবাদের জিহ্বাকে প্রসারিত করেছে তথা তারা অপবাদ দিয়েছে عَلٰى اَئِمَّةِ الدِّيْنِ দীনের ইমামগণের উপর بِاَنَّ مَجْمُوْعَ مَا صَحَّ عِنْدَكُمْ مِنَ الْاَحَادِيْثِ এভাবেই যে তোমাদের নিকট যেসব সহীহ হাদীস রয়েছে لَمْ يَبْلُغْ زُهَاءَ عَشَرَةِ اٰلَافٍ তা সর্বোচ্চ দশ হাজারের বেশি নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ الْمُسْتَدْرَكُ : যেসব হাদীস বিশেষ কোনো হাদীসগ্রন্থে শামিল করা হয়নি অথচ তা সে গ্রন্থকারের অনুসৃত শর্তে পূর্ণমাত্রায় উত্তীর্ণ হয়, তা যে গ্রন্থে একত্র করা হয় তাকে আল-মুস্তাদরাক বলা হয়। যেমন– হাকিম আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ তা উল্লেখ করে সে ক্ষতি পূরণ করেছেন। ইমাম হাকিম বিপুল পরিমাণ সংগ্রহ করে স্বতন্ত্র দুই খণ্ডবিশিষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তাঁর ধারণা এই যে, এ সমস্ত হাদীসই ইমাম বুখারী ও মুসলিমের হাদীস গ্রহণের শর্তে পূর্ণমাত্রায় উত্তীর্ণ এবং সহীহ; কিন্তু উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে তা শামিল করা হয়নি। যদিও হাদীস বিশেষজ্ঞদের মতে উক্ত গ্রন্থে বহু হাসান, দ্বা'ঈফ, মুনকার এমনকি মাওযূ হাদীসও বিদ্যমান রয়েছে।

وَنُقِلَ عَنِ الْبُخَارِيْ اَنَّهُ قَالَ حَفِظْتُ مِنَ الصِّحَاحِ مِائَةَ اَلْفِ حَدِيْثٍ وَمِنْ غَيْرِ الصِّحَاحِ مِائَتَيْ اَلْفٍ وَالظَّاهِرُ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ اَنَّهُ يُرِيْدُ الصَّحِيْحَ عَلٰى شَرْطِهِ وَمَبْلَغُ مَا اَوْرَدَ فِيْ هٰذَا الْكِتَابِ مَعَ التَّكْرَارِ سَبْعَةُ اٰلَافٍ وَمِائَتَانِ وَخَمْسٌ وَّسَبْعُوْنَ حَدِيْثًا وَبَعْدَ حَذْفِ التَّكْرَارِ اَرْبَعَةُ اٰلَافٍ وَلَقَدْ صَنَّفَ الْاٰخَرُوْنَ مِنَ الْاَئِمَّةِ صِحَاحًا مِثْلَ صَحِيْحِ ابْنِ خُزَيْمَةَ الَّذِيْ يُقَالُ لَهُ اِمَامُ الْاَئِمَّةِ وَهُوَ شَيْخُ ابْنِ حِبَّانٍ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانٍ فِيْ مَدْحِهِ مَا رَاَيْتُ عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ اَحَدًا اَحْسَنَ فِيْ صَنَاعَةِ السُّنَنِ وَاَحْفَظَ لِلْاَلْفَاظِ الصَّحِيْحَةِ مِنْهُ كَاَنَّ السُّنَنَ وَالْاَحَادِيْثَ كُلَّهَا نَصْبُ عَيْنِهِ وَمِثْلَ صَحِيْحِ ابْنِ حِبَّانٍ تِلْمِيْذِ ابْنِ خُزَيْمَةَ ثِقَةٌ ثَبْتٌ فَاضِلٌ اِمَامٌ فَهَّامٌ ـ

অনুবাদ : ইমাম বুখারী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন– 'আমার এক লাখ সহীহ হাদীস এবং দুই লাখ গায়রে সহীহ হাদীস মুখস্থ ছিল।' একথা দ্বারা স্পষ্টভাবে এটাই বুঝায় যে, (আল্লাহই অধিক জানেন) সহীহ হাদীস তার শর্তানুযায়ী হবে। আর তার গ্রন্থে একই হাদীস বারবার উল্লেখ (তাকরার) সহ সর্বমোট হাদীসের সংখ্যা হচ্ছে ৭২৭৫। আর তাকরারে হাদীস বাদ দিলে সংখ্যা দাঁড়ায় চার হাজার। অন্যান্য ইমামগণও সহীহ হাদীস সংকলন করেছেন। যেমন– সহীহ ইবনে খুযায়মাহ যাকে ইমামদের নেতা বলা হয়, তিনি বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনে হাব্বানের ওস্তাদ ছিলেন। তাঁর প্রশংসায় ইবনে হাব্বান বলেছেন, 'হাদীসশাস্ত্রে তাঁর চেয়ে বড় কোনো জ্ঞানী লোককে এ ধরাপৃষ্ঠে আমি দেখিনি এবং হাদীসের বিশুদ্ধ শব্দের হাফিয হিসাবেও। মনে হতো যেন সমগ্র হাদীসই তাঁর দৃষ্টি সম্মুখে ছিল।' আর ইবনে খুযায়মার শাগরিদ ইবনে হাব্বানও একজন বিশ্বস্ত, আস্থাভাজন, মর্যাদাশীল ও প্রখর ধীশক্তিসম্পন্ন ইমাম ছিলেন।

শাব্দিক অনুবাদ : وَنُقِلَ عَنِ الْبُخَارِيْ اَنَّهُ قَالَ ইমাম বুখারী (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন حَفِظْتُ مِنَ الصِّحَاحِ مِائَةَ اَلْفِ حَدِيْثٍ আমার এক লাখ সহীহ হাদীস মুখস্থ ছিল وَمِنْ غَيْرِ الصِّحَاحِ مِائَتَيْ اَلْفٍ এবং দু লাখ গায়রে সহীহ হাদীস وَالظَّاهِرُ এর দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, وَاللّٰهُ اَعْلَمُ আল্লাহই অধিক জানেন اَنَّهُ يُرِيْدُ الصَّحِيْحَ عَلٰى شَرْطِهِ সহীহ হাদীস তাঁর শর্তানুযায়ী হবে وَمَبْلَغُ مَا اَوْرَدَ فِيْ هٰذَا الْكِتَابِ তিনি এ গ্রন্থে যে হাদীস উল্লেখ করেছেন তা সর্বসাকুল্যে مَعَ التَّكْرَارِ তাকরারসহ سَبْعَةُ اٰلَافٍ وَمِائَتَانِ وَخَمْسٌ وَّسَبْعُوْنَ حَدِيْثًا সাত হাজার দুশত পঁচাত্তরটি হাদীস وَبَعْدَ حَذْفِ التَّكْرَارِ আর তাকরার বাদ দিলে দাঁড়াবে اَرْبَعَةُ اٰلَافٍ চার হাজার وَلَقَدْ صَنَّفَ الْاٰخَرُوْنَ مِنَ الْاَئِمَّةِ صِحَاحًا অন্যান্য ইমামগণও সহীহ হাদীস সংকলন করেছেন مِثْلَ صَحِيْحِ ابْنِ خُزَيْمَةَ যেমন– সহীহ ইবনে খুযাইমা الَّذِيْ يُقَالُ لَهُ اِمَامُ الْاَئِمَّةِ যাকে ইমামদের নেতা বলা হয় وَهُوَ شَيْخُ ابْنِ حِبَّانٍ তিনি ছিলেন বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনে হাব্বানের ওস্তাদ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانٍ فِيْ مَدْحِهِ ইবনে হাব্বান তার প্রশংসায় বলেছেন مَا رَاَيْتُ عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ اَحَدًا আমি জমিনের উপরে কাউকে দেখিনি اَحْسَنَ فِيْ صَنَاعَةِ السُّنَنِ হাদীস প্রণয়নে অধিক সুন্দর বা বিশুদ্ধ ব্যক্তি وَاَحْفَظَ لِلْاَلْفَاظِ الصَّحِيْحَةِ مِنْهُ এবং তিনি হতে অধিক বিশুদ্ধ শব্দের হাফিজ كَاَنَّ السُّنَنَ وَالْاَحَادِيْثَ كُلَّهَا نَصْبُ عَيْنِهِ মনে হয় যেন সমগ্র হাদীস ও সুনানই তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে ছিল وَمِثْلَ صَحِيْحِ ابْنِ حِبَّانٍ تِلْمِيْذِ ابْنِ خُزَيْمَةَ আর ইবনে খুযাইমার ছাত্র ইবনে হাব্বানও ছিলেন ثِقَةٌ ثَبْتٌ فَاضِلٌ বিশ্বস্ত, আস্থাভাজন, মর্যাদাশীল اِمَامٌ فَهَّامٌ ও প্রখর ধীশক্তিসম্পন্ন ইমাম।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ : ইবনে খুযায়মার পূর্ণ নাম হচ্ছে– মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক আবূ বকর ইবনে খুযায়মা নীশাপুরী। তিনি হাদীসের একজন বড় ইমাম। তিনি হাদীসে ও দীনি মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে বিপুল সংখ্যক গ্রন্থ প্রণয়ন করছেন। ৩১১ হিজরি সনে তাঁর ইন্তেকাল হয়।

قَوْلُهُ ابْنُ حِبَّانٍ : ইবনে হাব্বানের পূর্ণ নাম হচ্ছে– মুহাম্মদ ইবনে হাব্বান ইবনে আহমদ ইবনে হাব্বান আবূ হাতেম আল-বস্তী। তিনি হাদীসের বড় হাফিজ ছিলেন। ইবনে খুযায়মার পর প্রকৃত সহীহ হাদীসের সমন্বয়ে গ্রন্থ রচনা করে থাকেন, তাহলে ইবনে হাব্বানকে উল্লেখ করতে হয়। তিনি ৩৫৪ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন।

وَقَالَ الْحَاكِمُ كَانَ ابْنُ حِبَّانٍ مِنْ اَوْعِيَةِ الْعِلْمِ وَاللُّغَةِ وَالْحَدِيْثِ وَالْوَعْظِ وَكَانَ مِنْ عُقَلَاءِ الرِّجَالِ وَمِثْلَ صَحِيْحِ الْحَاكِمِ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ النَّيْسَافُوْرِىْ اَلْحَافِظِ الثِّقَةِ الْمُسَمّٰى بِالْمُسْتَدْرَكِ وَقَدْ تَطَرَّقَ فِىْ كِتَابِهٖ هٰذَا التَّسَاهُلَ وَاَخَذُوْا عَلَيْهِ وَقَالُوْا اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانٍ اَمْكَنُ وَاَقْوٰى مِنَ الْحَاكِمِ وَاَحْسَنُ وَاَلْطَفُ فِى الْاَسَانِيْدِ وَالْمُتُوْنِ وَمِثْلَ الْمُخْتَارَةِ لِلْحَافِظِ ضِيَاءِ الدِّيْنِ الْمُقَدَّسِىْ وَهُوَ اَيْضًا خَرَّجَ صِحَاحًا لَيْسَتْ فِى الصَّحِيْحَيْنِ وَقَالُوْا كِتَابُهٗ اَحْسَنُ مِنَ الْمُسْتَدْرَكِ وَمِثْلَ صَحِيْحِ ابْنِ عَوَانَةَ وَابْنِ السَّكَنِ وَالْمُنْتَقٰى لِاِبْنِ جَارُوْدٍ وَهٰذِهِ الْكُتُبُ كُلُّهَا مُخْتَصَّةٌ بِالصِّحَاحِ وَلٰكِنَّ جَمَاعَةً اِنْتَقَدُوْا عَلَيْهَا تَعَصُّبًا اَوْ اِنْصَافًا وَفَوْقَ كُلِّ ذِىْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ ـ

অনুবাদ : হাকিম তাঁর সম্পর্কে বলেন যে, জ্ঞান জগতে ইবনে হাব্বানের মধ্যে অভিধানশাস্ত্র, হাদীসশাস্ত্র এবং ওয়াজ-নসিহতের বিরাট এক ভাণ্ডার ছিল। তিনি ছিলেন যুগের একজন জ্ঞানসিদ্ধ পুরুষরূপে। এমনিভাবে হাকিম আবূ আব্দুল্লাহ নীশাপুরী সংকলিত একখানা বিশুদ্ধ হাদীসগ্রন্থ রয়েছে। যিনি ছিলেন হাফিজ ও বিশ্বস্ত। যার নাম 'আল-মুসতাদরাক'। হাদীস সংকলন করতে গিয়ে তিনি এ গ্রন্থে সনদে অনেক অস্বীকৃত পন্থা অবলম্বন করেছেন, যা মুহাদ্দিসগণ বেছে বের করেছেন। মুহাদ্দিসগণ বলেছেন, হাকিমের তুলনায় ইবনে খুযায়মা ও ইবনে হাব্বান হাদীসশাস্ত্রে খুব দক্ষ ও শক্তিশালী এবং সনদ ও মতনের ক্ষেত্রে খুব মনোমুগ্ধকর পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। এটা ছাড়া হাকিম যিয়াউদ্দিন মুকাদ্দাসীও আল-মুখতারা গ্রন্থে বহু সহীহ হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা বুখারী ও মুসলিমে নেই। মুহাদ্দিসগণের মতে তাঁর গ্রন্থ 'আল-মুস্তাদরাক' গ্রন্থের তুলনায় অনেক উত্তম। আর সহীহ ইবনে আওয়ানা, ইবনুস সাকান, ইবনে মুনতাকা এবং ইবনে জারূদ প্রভৃতি এসবগুলো সহীহ হাদীসগ্রন্থ। কিন্তু একদল মুহাদ্দিস এসব গ্রন্থের অমূলক বা ন্যায়ানুগ সমালোচনা করেছেন। প্রত্যেক জ্ঞানী-গুণীর উপর একজন মহাজ্ঞানী রয়েছেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

শাব্দিক অনুবাদ : وَقَالَ الْحَاكِمُ আর হাকিম তাঁর সম্পর্কে বলেন كَانَ ابْنُ حِبَّانٍ مِنْ اَوْعِيَةِ ইবনে হাব্বান ছিলেন একটি ভাণ্ড الْعِلْمِ وَاللُّغَةِ জ্ঞান ও ভাষার وَالْحَدِيْثِ وَالْوَعْظِ হাদীস এবং ওয়াজ-নসিহতের وَكَانَ مِنْ عُقَلَاءِ الرِّجَالِ আর তিনি ছিলেন যুগের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী وَمِثْلَ صَحِيْحِ الْحَاكِمِ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ النَّيْسَافُوْرِىْ অনুরূপ হাফিজ আবূ আব্দুল্লাহ নীশাপুরী সহীহ গ্রন্থ اَلْحَافِظِ الثِّقَةِ যিনি ছিলেন হাফিজ ও ছিকাহ الْمُسَمّٰى بِالْمُسْتَدْرَكِ যার নাম ছিল আল-মুসতাদরাক وَقَدْ تَطَرَّقَ فِىْ كِتَابِهٖ আর তিনি তাঁর কিতাবে অনেক পন্থা অবলম্বন করেছেন هٰذَا التَّسَاهُلَ এরূপ গড়বড় وَاَخَذُوْا عَلَيْهِ মুহাদ্দিসগণ তা খুঁজে বের করেছেন وَقَالُوْا আর মুহাদ্দিসগণ বলেন اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانٍ ইবনে খুযাইমা ও ইবনে হাব্বান اَمْكَنُ وَاَقْوٰى مِنَ الْحَاكِمِ হাকিম হতে অধিক দক্ষ ও শক্তিশালী وَاَحْسَنُ وَاَلْطَفُ فِى الْاَسَانِيْدِ وَالْمُتُوْنِ আর মতন ও সনদের ক্ষেত্রে খুবই মনোমুগ্ধকর পন্থা অবলম্বন করেছেন وَمِثْلَ الْمُخْتَارَةِ لِلْحَافِظِ ضِيَاءِ الدِّيْنِ الْمُقَدَّسِىْ এমনিভাবে হাফিজ যিয়াউদ্দীন আল-মুকাদ্দাসীর মুখতার গ্রন্থ وَهُوَ اَيْضًا خَرَّجَ صِحَاحًا তাতেও তিনি অনেক সহীহ হাদীস বর্ণনা করেছেন لَيْسَتْ فِى الصَّحِيْحَيْنِ যা বুখারী ও মুসলিম শরীফে নেই وَقَالُوْا মুহাদ্দিসগণ বলেন كِتَابُهٗ اَحْسَنُ مِنَ الْمُسْتَدْرَكِ তাঁর কিতাবটি মুসতাদরাক হতে অনেক উত্তম وَمِثْلَ صَحِيْحِ ابْنِ عَوَانَةَ এমনিভাবে সহীহ ইবনে আওয়ানা وَابْنِ السَّكَنِ ইবনুস সাকান وَالْمُنْتَقٰى لِاِبْنِ جَارُوْدٍ এবং ইবনে জারূদের মুনতাকা وَهٰذِهِ الْكُتُبُ كُلُّهَا এসবগুলো কিতাবই مُخْتَصَّةٌ بِالصِّحَاحِ বিশেষভাবে সহীহ গ্রন্থ وَلٰكِنَّ جَمَاعَةً اِنْتَقَدُوْا عَلَيْهَا তবে একদল মুহাদ্দিস এগুলোর সমালোচনা করেছেন تَعَصُّبًا اَوْ اِنْصَافًا অন্যায়ভাবে অথবা ন্যায়সঙ্গতভাবে وَفَوْقَ كُلِّ ذِىْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ আর প্রত্যেক জ্ঞানীর উপর একজন মহাজ্ঞানী রয়েছেন وَاللّٰهُ اَعْلَمُ আল্লাহই সর্বাধিক জানেন।

فَصْلٌ اَلْكُتُبُ السِّتَّةُ الْمَشْهُوْرَةُ الْمُقَرَّرَةُ فِي الْإِسْلَامِ الَّتِيْ يُقَالُ لَهَا الصِّحَاحُ السِّتُّ هِيَ صَحِيْحُ الْبُخَارِيْ وَصَحِيْحُ مُسْلِمٍ وَالْجَامِعُ لِلتِّرْمِذِيِّ وَالسُّنَنُ لِاَبِيْ دَاوٗدَ وَالنَّسَائِيْ وَسُنَنُ ابْنِ مَاجَةَ وَعِنْدَ الْبَعْضِ الْمُوَطَّأُ بَدَلَ ابْنِ مَاجَةَ وَصَاحِبُ جَامِعِ الْاُصُوْلِ اِخْتَارَ الْمُوَطَّأَ وَفِيْ هٰذِهِ الْكُتُبِ الْاَرْبَعَةِ اَقْسَامٌ مِنَ الْاَحَادِيْثِ مِنَ الصِّحَاحِ وَالْحِسَانِ وَالضِّعَافِ وَتَسْمِيَتُهَا بِالصِّحَاحِ السِّتِّ بِطَرِيْقِ التَّغْلِيْبِ وَسَمّٰى صَاحِبُ الْمَصَابِيْحِ اَحَادِيْثَ غَيْرِ الشَّيْخَيْنِ بِالْحِسَانِ وَهُوَ قَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ قَرِيْبٌ مِنَ الْمَعْنَى اللُّغَوِيْ اَوْ هُوَ اِصْطِلَاحٌ جَدِيْدٌ مِنْهُ ـ

অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : যে ছয়খানা গ্রন্থ ইসলামি জগতে হাদীসশাস্ত্রে খুব প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত, তাকে 'সিহাহ সিত্তা' (ছয়খানা বিশুদ্ধ গ্রন্থ) বলা হয়। আর তা হলো– ১. সহীহ বুখারী, ২. সহীহ মুসলিম, ৩. জামি' তিরমিযী, ৪. সুনানে আবূ দাঊদ, ৫. সুনানে নাসায়ী, ৬. সুনানে ইবনে মাজাহ। কোনো কোনো মুহাদ্দিস ইবনে মাজাহর স্থলে 'মুয়াত্তা'-কে স্থান দিয়ে থাকেন। জামিউল উসূলের গ্রন্থকার মুয়াত্তাকেই গ্রহণ করেছেন। শেষোক্ত চারখানা গ্রন্থে সহীহ, হাসান ও দ্বা'ঈফ সর্বপ্রকার হাদীসই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সহীহ হাদীসের আধিক্যের ভিত্তিতেই 'সিহাহ সিত্তা' নামকরণ করা হয়েছে। 'মাসাবীহ' গ্রন্থকার শায়খাইনের হাদীস ব্যতীত অন্যান্য হাদীসগ্রন্থের যে হাসান নামকরণ করেছেন, তা আভিধানিক অর্থের প্রায় কাছাকাছি এবং তা তার একটি নতুন পরিভাষা।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ اَلْكُتُبُ السِّتَّةُ الْمَشْهُوْرَةُ ছয়টি প্রসিদ্ধ কিতাব الْمُقَرَّرَةُ فِي الْإِسْلَامِ যা ইসলামে স্বীকৃত اَلَّتِيْ يُقَالُ لَهَا الصِّحَاحُ السِّتُّ যাদেরকে সিহাহ সিত্তাহ বলা হয় هِيَ আর তা হলো صَحِيْحُ الْبُخَارِيْ সহীহ বুখারী وَصَحِيْحُ مُسْلِمٍ সহীহ মুসলিম وَالْجَامِعُ لِلتِّرْمِذِيِّ জামি' তিরমিযী وَالسُّنَنُ لِاَبِيْ دَاوٗدَ সুনানে আবূ দাঊদ وَالنَّسَائِيْ সুনানে নাসায়ী وَسُنَنُ ابْنِ مَاجَةَ এবং সুনানে ইবনে মাজাহ وَعِنْدَ الْبَعْضِ আর কিছুসংখ্যক মুহাদ্দিস الْمُوَطَّأُ بَدَلَ ابْنِ مَاجَةَ ইবনে মাজাহর স্থানে মুয়াত্তাকে স্থান দিয়েছেন وَصَاحِبُ جَامِعِ الْاُصُوْلِ اِخْتَارَ الْمُوَطَّأَ আর জামেউল উসূল গ্রন্থকার মুয়াত্তাকে পছন্দ করেছেন وَفِيْ هٰذِهِ الْكُتُبِ الْاَرْبَعَةِ আর শেষোক্ত এই চার কিতাবে اَقْسَامٌ مِنَ الْاَحَادِيْثِ অনেক প্রকারের হাদীস রয়েছে مِنَ الصِّحَاحِ وَالْحِسَانِ وَالضِّعَافِ সহীহ, হাসান ও দ্বা'ঈফ وَتَسْمِيَتُهَا بِالصِّحَاحِ السِّتِّ আর এদেরকে সিহাহ সিত্তাহ নামে নামকরণের কারণ হলো بِطَرِيْقِ التَّغْلِيْبِ সহীহ হাদীসের আধিক্যতার কারণে وَسَمّٰى صَاحِبُ الْمَصَابِيْحِ আর মাসবীহ গ্রন্থকার নামকরণ করেছেন اَحَادِيْثَ غَيْرِ الشَّيْخَيْنِ بِالْحِسَانِ বুখারী ও মুসলিমের হাদীস ব্যতীত অন্যান্য হাদীসগ্রন্থকে হাসান নামে وَهُوَ قَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ এটা এদিক থেকে নিকটবর্তী قَرِيْبٌ مِنَ الْمَعْنَى اللُّغَوِيْ অভিধানিক অর্থের নিকটবর্তী وَهُوَ اِصْطِلَاحٌ جَدِيْدٌ مِنْهُ আর এটা তার একটা নতুন পরিভাষা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَعِنْدَ الْبَعْضِ الْمُوَطَّأُ : সিহাহ সিত্তার ষষ্ঠ কিতাব কোনটি এ বিষয়ে কিছুটা মতভেদ রয়েছে।

হাফিজ আবুল ফজল ইবনে তাহির (র.) সহ অধিকাংশের মতে, সিহাহ সিত্তার ষষ্ঠ গ্রন্থ হলো সুনানে ইবনে মাজাহ।

আর কিছুসংখ্যক মুহাদ্দিসের মতে, ইমাম মালিক (র.) সংকলিত মুয়াত্তায়ে ইমাম মালিক হলো ষষ্ঠ স্থানে।

আরেক ওলামার মতে, দারিমী গ্রন্থটি ষষ্ঠ সহীহ গ্রন্থ।

وَقَالَ بَعْضُهُمْ كِتَابُ الدَّارِمِيِّ اَحْرٰى وَالْيَقُ بِجَعْلِهٖ سَادِسَ الْكُتُبِ لِاَنَّ رِجَالَهٗ اَقَلُّ ضُعْفًا وَ وُجُوْدُ الْاَحَادِيْثِ الْمُنْكَرَةِ وَالشَّاذَّةِ فِيْهِ نَادِرٌ وَلَهٗ اَسَانِيْدُ عَالِيَةٌ وَثُلَاثِيَاتُهٗ اَكْثَرُ مِنْ ثُلَاثِيَاتِ الْبُخَارِىْ وَهٰذِهِ الْمَذْكُوْرَاتُ مِنَ الْكُتُبِ اَشْهَرُ الْكُتُبِ وَغَيْرُهَا مِنَ الْكُتُبِ كَثِيْرَةٌ شَهِيْرَةٌ وَلَقَدْ اَوْرَدَ السُّيُوْطِىُّ فِىْ كِتَابِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ مِنْ كُتُبٍ كَثِيْرَةٍ يَتَجَاوَزُ خَمْسِيْنَ مُشْتَمِلَةً عَلَى الصِّحَاحِ وَالْحِسَانِ وَالضِّعَافِ وَقَالَ مَا اَوْرَدْتُ فِيْهَا حَدِيْثًا مَوْسُوْمًا بِالْوَضْعِ اِتَّفَقَ الْمُحَدِّثُوْنَ عَلٰى تَرْكِهٖ وَ رَدِّهٖ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ ـ

অনুবাদ : আর কিছুসংখ্যক মুহাদ্দিসীনের মতে দারিমী গ্রন্থকে ষষ্ঠ সহীহ গ্রন্থ হিসেবে পরিগণিত করা অধিক অগ্রগণ্য। কেননা, সে গ্রন্থের হাদীসসমূহের রাবীদের মধ্যে দুর্বল রাবীদের সংখ্যা খুবই স্বল্প এবং তাতে মুনকার ও শায হাদীসও নিতান্ত অল্প। এর সনদমূহ খুব উন্নতমানের। তার ছুলাছিয়াত বুখারীর ছুলাছিয়াতের তুলনায় বেশি। উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ হলো প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এ ছাড়াও অনেক প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ রয়েছে।

ইমাম সুয়ূতী (র.) 'জামউল জাওয়ামি' গ্রন্থে অনেক কিতাব হতে হাদীস গ্রহণ করেছেন, যার সংখ্যা পঞ্চাশের অধিক। সেসব গ্রন্থে সহীহ, হাসান ও দ্বা'ঈফ হাদীস বিদ্যমান। তিনি সে গ্রন্থে বলেছেন যে, আমি এ গ্রন্থে বিখ্যাত কোনো মাওযূ' হাদীস এবং যে হাদীস প্রত্যাখ্যান ও বর্জনে মুহাদ্দিসগণ একমত এরূপ হাদীস উল্লেখ করিনি। আল্লাহই ভালো জানেন।

শাব্দিক অনুবাদ : وَقَالَ بَعْضُهُمْ আর কতেক মুহাদ্দিস বলেছেন كِتَابُ الدَّارِمِيِّ اَحْرٰى وَالْيَقُ ইমাম দারিমীর কিতাব অধিক অগ্রাধিকারযোগ্য بِجَعْلِهٖ سَادِسَ الْكُتُبِ তাকে ষষ্ঠ কিতাব হিসেবে পরিগণিত করার দিক থেকে لِاَنَّ رِجَالَهٗ اَقَلُّ ضُعْفًا কেননা, উক্ত গ্রন্থের রাবীগণের মধ্যে দুর্বল রাবী খুবই কম وَ وُجُوْدُ الْاَحَادِيْثِ الْمُنْكَرَةِ وَالشَّاذَّةِ فِيْهِ نَادِرٌ আর তাতে মুনকার ও শায হাদীসও খুব কম পাওয়া যায় وَلَهٗ اَسَانِيْدُ عَالِيَةٌ এর সনদসমূহও খুবই উন্নত وَثُلَاثِيَاتُهٗ اَكْثَرُ مِنْ ثُلَاثِيَاتِ الْبُخَارِىْ এতে বুখারী থেকে অনেক বেশি ছুলাছিয়াত রয়েছে وَهٰذِهِ الْمَذْكُوْرَاتُ مِنَ الْكُتُبِ এ উল্লিখিত কিতাবসমূহ اَشْهَرُ الْكُتُبِ প্রসিদ্ধ গ্রন্থ وَغَيْرُهَا مِنَ الْكُتُبِ كَثِيْرَةٌ شَهِيْرَةٌ এগুলো ব্যতীতও হাদীসের প্রসিদ্ধ অনেক কিতাব রয়েছে وَلَقَدْ اَوْرَدَ السُّيُوْطِىُّ ইমাম সুয়ূতী (র.) উল্লেখ করেছেন فِىْ كِتَابِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ জমউল জাওয়ামি নামক গ্রন্থে مِنْ كُتُبٍ كَثِيْرَةٍ অনেক কিতাব হতে يَتَجَاوَزُ خَمْسِيْنَ যা পঞ্চাশেরও অধিক مُشْتَمِلَةً عَلَى الصِّحَاحِ وَالْحِسَانِ وَالضِّعَافِ সেসব গ্রন্থে সহীহ, হাসান ও দ্বা'ঈফ হাদীসসমূহ বিদ্যমান রয়েছে وَقَالَ আর তিনি বলেছেন مَا اَوْرَدْتُ فِيْهَا حَدِيْثًا আমি তাতে এমন কোনো হাদীস আনয়ন করিনি مَوْسُوْمًا بِالْوَضْعِ যা মাওযূ হিসেবে চিহ্নিত اِتَّفَقَ الْمُحَدِّثُوْنَ عَلٰى تَرْكِهٖ وَ رَدِّهٖ যে হাদীস পরিত্যক্ত ও বর্জনে মুহাদ্দিসগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন وَاللّٰهُ اَعْلَمُ আল্লাহই সর্বাধিক জানেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَعْرِيْفُ الثُّلَاثِيَاتِ : যেসব হাদীসের সনদে রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত তিনজন বর্ণনাকারী হয়, তাকে ছুলাছিয়াত বলা হয়। যেমন– ইমাম বুখারীর একটি ثُلَاثِى হাদীস– قَالَ الْبُخَارِىُّ (رحـ) حَدَّثَنَا مَكِّىُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ وَهُوَ ابْنُ الْاَكْوَعِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَقُلْ عَلَىَّ مَا لَمْ اَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ ـ

বুখারী শরীফে সর্বমোট ২২টি ثلاثيات রয়েছে।

قَوْلُهٗ جَمْعُ الْجَوَامِعِ : সাধারণত হাদীসের ঐ কিতাবকে جَامِعْ বলে যাতে আট প্রকারের عِلْم আছে। আর তা হলো সিয়ার, আদাব, তাফসীর, আকাইদ, কিতাল, আহকাম, আশরাত এবং মানাকেব।

سِيَر وَآدَب وَتَفْسِيْر وَعَقَائِد * فِتَن وَاَحْكَام وَاَشْرَاط وَمَنَاقِب

বুখারী ও তিরমিযী শরীফ হলো জামি'। মুসলিম শরীফে তাফসীর কম থাকার কারণে তাকে জামি' বলা হয় না।

وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمِشْكٰوةِ فِىْ دِيْبَاجَةِ كِتَابِهٖ جَمَاعَةً مِنَ الْاَئِمَّةِ الْمُتْقِنِيْنَ وَهُمُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ وَالْاِمَامُ مَالِكٌ وَالْاِمَامُ الشَّافِعِىُّ وَالْاِمَامُ اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالتِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوٗدَ وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِىُّ وَالدَّارَ قُطْنِىْ وَالْبَيْهَقِىُّ وَ رَزِيْنٌ وَاَجْمَلَ فِىْ ذِكْرِ غَيْرِهِمْ وَكَتَبْنَا اَحْوَالَهُمْ فِىْ كِتَابٍ مُفْرَدٍ مُسَمًّى بِالْاِكْمَالِ بِذِكْرِ اَسْمَاءِ الرِّجَالِ وَمِنَ اللّٰهِ التَّوْفِيْقُ وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ فِى الْمَبْدَاِ وَالْمَالِ وَاَمَّا الْاِكْمَالُ فِىْ اَسْمَاءِ الرِّجَالِ لِصَاحِبِ الْمِشْكٰوةِ فَهُوَ مُلْحَقٌ فِىْ اٰخِرِ هٰذَا الْكِتَابِ ـ

অনুবাদ : মিশকাত গ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থের ভূমিকায় বড় বড় ইমামগণের নাম উল্লেখ করেছেন, তাঁদের নাম হলো– ইমাম বুখারী [মৃত্যু ২৫৬ হি.] ইমাম মুসলিম [মৃত্যু ২৬১ হি.] ইমাম মালিক [মৃত্যু ১৭৯ হি.] ইমাম শাফিয়ী [মৃত্যু ২০৪ হি.] ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল [মৃত্যু ২৪১ হি.] ইমাম তিরমিযী [মৃত্যু ২৭৯ হি.] ইমাম নাসায়ী [মৃত্যু ৩০৩ হি.] ইবনে মাজাহ [মৃত্যু ২৭৩ হি.] ইমাম আবূ দাউদ [মৃত্যু ২৭৫ হি.] দারেমী [মৃত্যু ২৫৫ হি.] দারাকুতনী, [মৃত্যু ৩৮৫ হি.] বায়হাকী [মৃত্যু ৪৫৮ হি.] রাযীন [মৃত্যু ৫২৫ হি.] প্রমুখ মনীষীবৃন্দ। তাঁদের ছাড়া অন্যান্য ইমামের নামও সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। আমারা তাঁদের জীবনী মুফরাদ গ্রন্থে যার নামকরণ করা হয়েছে اَلْاِكْمَالُ بِذِكْرِ اَسْمَاءِ الرِّجَالِ -এ লেখেছি। আল্লাহর পক্ষ হতে তৌফিক [কাজ করার ক্ষমতা] পাওয়া যায়, কাজেই প্রথমে ও শেষে তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। আর মিশকাত গ্রন্থকারের اَلْاِكْمَالُ فِىْ اَسْمَاءِ الرِّجَالِ গ্রন্থখানা এ গ্রন্থের শেষে সংযোজিত।

শাব্দিক অনুবাদ : وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمِشْكٰوةِ فِىْ دِيْبَاجَةِ كِتَابِهٖ আর মিশকাত গ্রন্থকার স্বীয় কিতাবের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন جَمَاعَةً مِنَ الْاَئِمَّةِ الْمُتْقِنِيْنَ বিশ্বস্ত একদল ইমামের নাম وَهُمْ আর তাঁরা হলেন اَلْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ বুখারী, মুসলিম وَالْاِمَامُ مَالِكٌ ইমাম মালিক, وَالْاِمَامُ الشَّافِعِىُّ ইমাম শাফিয়ী وَالْاِمَامُ اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, وَالتِّرْمِذِىُّ তিরমিযী وَاَبُوْ دَاوٗدَ وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ ইমাম আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ وَالدَّارِمِىُّ وَالدَّارَ قُطْنِىْ وَالْبَيْهَقِىُّ وَ رَزِيْنٌ ইমাম দারেমী, দারাকুতনী, বায়হাকী ও রাযীন وَاَجْمَلَ فِىْ ذِكْرِ غَيْرِهِمْ এবং অন্যান্যদেরকেও সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন وَكَتَبْنَا اَحْوَالَهُمْ فِىْ كِتَابٍ مُفْرَدٍ আমরা তাঁদের জীবনী মুফরাদ নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছি مُسَمًّى بِالْاِكْمَالِ بِذِكْرِ اَسْمَاءِ الرِّجَالِ যার নামকরণ করা হয়েছে اَلْاِكْمَالُ بِذِكْرِ اَسْمَاءِ الرِّجَالِ নামে وَمِنَ اللّٰهِ التَّوْفِيْقُ আল্লাহর পক্ষ হতেই তৌফিক وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ তিনিই সাহায্যকারী فِى الْمَبْدَاِ وَالْمَالِ কাজের প্রথমে ও শেষে وَاَمَّا الْاِكْمَالُ فِىْ اَسْمَاءِ الرِّجَالِ لِصَاحِبِ الْمِشْكٰوةِ আর মিশকাত গ্রন্থকারের اَلْاِكْمَالُ فِىْ اَسْمَاءِ الرِّجَالِ নামক গ্রন্থটি فَهُوَ مُلْحَقٌ فِىْ اٰخِرِ هٰذَا الْكِتَابِ এ কিতাবের শেষে সংযোজিত।

مقدمة الكتاب
কিতাবের ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

خُطْبَةُ الْكِتَابِ

কিতাবের ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ
وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا
وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا
مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَاَشْهَدُ
اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ شَهَادَةً تَكُوْنُ لِلنَّجَاةِ
وَسِيْلَةً وَلِرَفْعِ الدَّرَجَاتِ كَفِيْلَةً وَاَشْهَدُ اَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ الَّذِىْ بَعَثَهٗ وَطُرُقُ
الْاِيْمَانِ قَدْ عَفَتْ اٰثَارُهَا وَخَبَتْ اَنْوَارُهَا وَ
وَهَنَتْ اَرْكَانُهَا وَجُهِلَ مَكَانُهَا فَشَيَّدَ
صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَامُهٗ مِنْ مَعَالِمِهَا
مَاعَفَا وَشَفٰى مِنَ الْعَلِيْلِ فِىْ تَائِيْدِ كَلِمَةِ
التَّوْحِيْدِ مَنْ كَانَ عَلٰى شَفَا وَ اَوْضَحَ سَبِيْلَ
الْهِدَايَةِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّسْلُكَهَا وَاَظْهَرَ كُنُوْزَ
السَّعَادَةِ لِمَنْ قَصَدَ اَنْ يَّمْلِكَهَا -

অনুবাদ : সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি, তাঁরই সাহায্য চাচ্ছি এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমরা আমাদের অন্তরের যাবতীয় কুমন্ত্রণা ও অন্যায় কর্মসমূহ হতে তাঁরই নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যাকে মহান আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেন, তাকে কেউই পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তাকে পথ দেখাবার শক্তিও কারো নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। আর এ সাক্ষ্যই হলো [আমার] মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় এবং উঁচু মর্যাদা লাভের মাধ্যম। আমি আরও ঘোষণা করছি যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এমন এক সময় প্রেরণ করেছেন, যখন ঈমানের পথে চলার নিদর্শনসমূহ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, তার জ্যোতিসমূহ নিভে গেছে, তার স্তম্ভসমূহ দুর্বল হয়ে গেছে এবং তার স্থানসমূহ পর্যন্তও বিস্মৃত হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি [নবী করীম ﷺ] এসে সেই স্তম্ভ ও নিশানাগুলোকে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করলেন, যেগুলো ইতঃপূর্বে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। আর যারা গোমরাহীর আবর্তে পড়ে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছিল তাদেরকে তিনি তাওহীদের কালিমার সাহায্যে আরোগ্য করলেন। আর যারা হিদায়েতের পথ অন্বেষণ করছিল তাঁদেরকে তিনি সরল পথের সন্ধান দিলেন এবং যারা সৌভাগ্য ভাণ্ডারের অধিকারী হতে ইচ্ছা করেছিল তিনি তাঁদেরকে তা লাভের পথ উন্মুক্ত করে দিলেন।

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ التَّمَسُّكَ بِهَدْيِهِ لَايَسْتَتِبُّ اِلَّا بِالْاِقْتِفَاءِ لِمَا صَدَرَ مِنْ مِشْكٰوتِهِ وَالْاِعْتِصَامَ بِحَبْلِ اللّٰهِ لَايَتِمُّ اِلَّا بِبَيَانِ كَشْفِهِ ـ وَكَانَ كِتَابُ الْمَصَابِيْحِ الَّذِى صَنَّفَهُ الْاِمَامُ مُحْىُ السُّنَّةِ قَامِعُ الْبِدْعَةِ اَبُوْ مُحَمَّدٍ اِلْحُسَيْنُ بْنُ مَسْعُوْدِ اِلْفَرَّاءُ الْبَغَوِىُّ رَفَعَ اللّٰهُ دَرَجَتَهُ اَجْمَعَ كِتَابٍ صُنِّفَ فِىْ بَابِهِ وَاَضْبَطَ لِشَوَارِدِ الْاَحَادِيْثِ وَ اَوَابِدِهَا وَلَمَّا سَلَكَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ طَرِيْقَ الْاِخْتِصَارِ وَحَذَفَ الْاَسَانِيْدَ تَكَلَّمَ فِيْهِ بَعْضُ النُّقَّادِ وَاِنْ كَانَ نَقْلُهُ وَاِنَّهُ مِنَ الثِّقَاتِ كَالْاِسْنَادِ لٰكِنْ لَيْسَ مَا فِيْهِ اِعْلَامٌ كَالْاِغْفَالِ ـ فَاسْتَخَرْتُ اللّٰهَ وَاسْتَوْفَقْتُ مِنْهُ فَاَعْلَمْتُ مَا اَغْفَلَهُ فَاَوْدَعْتُ كُلَّ حَدِيْثٍ مِنْهُ فِىْ مَقَرِّهِ كَمَا رَوَاهُ الْاَئِمَّةُ الْمُتْقِنُوْنَ وَالثِّقَاتُ الرَّاسِخُوْنَ مِثْلُ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْمٰعِيْلَ الْبُخَارِىِّ وَ اَبِى الْحُسَيْنِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْقُشَيْرِىِّ وَاَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ الْاَصْبَحِىِّ وَاَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ مُحَمَّدِ بْنِ اِدْرِيْسَ الشَّافِعِىِّ وَ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلِ الشَّيْبَانِىِّ وَاَبِىْ عِيْسٰى مُحَمَّدِ بْنِ عِيْسٰى التِّرْمِذِىِّ وَاَبِىْ دَاؤُدَ سُلَيْمَانَ بْنِ الْاَشْعَثِ السِّجِسْتَانِىِّ -

অনুবাদ : অতঃপর [মনে রাখতে হবে যে] মহানবী ﷺ-এর আদর্শ আঁকড়ে ধরা যথার্থ হয় না যতক্ষণ না তাঁর আলোকদান তথা মুখনিঃসৃত বাণীসমূহের পরিপূর্ণ অনুসরণ করা হয়। আর আল্লাহ তা'আলার রজ্জু [তথা কুরআন]-কে শক্ত করে ধারণ করা পরিপূর্ণ হবে না যতক্ষণ না তাঁর পক্ষ হতে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। আর ইমাম মুহিউস সুন্নাহ [সুন্নত পুনর্জীবন দানকারী] কামিউল বিদআহ [বিদআত নির্মূলকারী] আবূ মুহাম্মদ হুসাইন ইবনে মাসঊদ আল-ফাররা আল-বাগাবী [আল্লাহ তা'আলা তাঁর মর্যাদা উঁচু করুন।] কর্তৃক সংকলিত 'মাসাবীহ' নামক হাদীসের কিতাবটি তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ে রচিত একখানা সমৃদ্ধ গ্রন্থ এবং [হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থাবলিতে] আপাত বিক্ষিপ্ত ও ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন বিষয়ের হাদীসমূহের একটি সুবিন্যস্ত ও সুলিখিত কিতাব। গ্রন্থকার যখন সংক্ষিপ্ততার পথ অবলম্বন করলেন এবং সনদসমূহকে বিলুপ্ত করে দিলেন, তখন কিছু সংখ্যক সমালোচক এর সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন। যদিও তাঁর মতো একজন নির্ভরশীল ব্যক্তির হাদীসের উৎকলন ও সংকলনই সনদতুল্য তবু এটা অনস্বীকার্য যে, চিহ্নযুক্ত পথ বা জায়গা অপরিচিত ও চিহ্নবিহীন জায়গার মতো নয়। [অর্থাৎ 'সনদবিহীন' গ্রন্থ সনদবিশিষ্ট গ্রন্থের মতো হতে পারে না।] অতএব আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট কল্যাণ কামনা করলাম এবং [এ ব্যাপারে একটি সমাধানের জন্য] তাঁর নিকট তৌফিক প্রার্থনা করলাম। অতঃপর তিনি যা উল্লেখ করেননি, আমি তার যথাস্থান নির্দেশ করেছি এবং [মাসাবীহ]-এর প্রতিটি হাদীসকে তার স্বস্থানে সন্নিবেশিত করেছি। যেমনিভাবে সুদৃঢ় প্রজ্ঞার অধিকারী ইমামগণ [শাস্ত্রজ্ঞগণ] এবং আস্থা ভাজন ও লব্ধ প্রতিষ্ঠ হাদীসবিদগণ বর্ণনা করেছেন। যেমন– ১. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী [জন্ম ১৯৪ হি: মৃ: ২৫৬ হি:]। ২. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশায়রী [জন্ম ২০৪ হি: মৃ: ২৬১ হি:]। ৩. আবূ আব্দুল্লাহ মালিক ইবনে আনাস আল-আসবাহী [জন্ম ৯৩ হি: মৃ: ১৭৯ হি:]। ৪. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রীস শাফেয়ী [জন্ম ১৫০ হি: মৃ: ২০৪ হি:]। ৫. আবূ আব্দুল্লাহ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল আশ-শায়বানী [জন্ম ১৬৪ হি: মৃ: ২৪১ হি:]। ৬. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিযী [জন্ম ২০৯ হি: মৃ: ২৭৯ হি:]। ৭. আবূ দাউদ সুলাইমান ইবনে আশআছ আস-সিজিস্তানী [জন্ম ২০২ হি: মৃ: ২৭৫ হি:]।

وَاَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبِ النَّسَائِىِّ وَاَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ مَاجَةَ الْقَزْوِيْنِىِّ وَ اَبِىْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِىِّ وَاَبِى الْحَسَنِ عَلِىِّ بْنِ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِىِّ وَاَبِىْ بَكْرٍ اَحْمَدَ بْنِ حُسَيْنِ الْبَيْهَقِىِّ وَاَبِى الْحَسَنِ رَزِيْنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعَبْدَرِىِّ وَغَيْرِهِمْ وَقَلِيْلٌ مَّا هُوَ وَاِنِّىْ اِذَا نَسَبْتُ الْحَدِيْثَ اِلَيْهِمْ كَاَنِّىْ اَسْنَدْتُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ لِاَنَّهُمْ قَدْ فَرَغُوْا مِنْهُ وَاَغْنَوْنَا عَنْهُ ـ وَسَرَدْتُّ الْكِتٰبَ وَ الْاَبْوَابَ كَمَا سَرَدَهَا وَاقْتَفَيْتُ اَثْرَهٗ فِيْهَا وَقَسَمْتُ كُلَّ بَابٍ غَالِبًا عَلٰى فُصُوْلٍ ثَلٰثَةٍ اَوَّلُهَا مَا اَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ اَوْ اَحَدُهُمَا وَاَكْتَفَيْتُ بِهِمَا وَ اِنِ اشْتَرَكَ فِيْهِ الْغَيْرُ لِعُلُوِّ دَرَجَتِهِمَا فِى الرِّوَايَةِ وَثَانِيْهَا مَا اَوْرَدَهٗ غَيْرُهُمَا مِنَ الْاَئِمَّةِ الْمَذْكُوْرِيْنَ وَ ثَالِثُهَا مَا اشْتَمَلَ عَلٰى مَعْنَى الْبَابِ مِنْ مُلْحَقَاتٍ وَمُنَاسَبَةٍ مَعَ مُحَافَظَةٍ عَلَى الشَّرِيْطَةِ وَاِنْ كَانَ مَاثُوْرًا عَنِ السَّلَفِ وَ الْخَلَفِ ـ

অনুবাদ : ৮. আবূ আব্দুর রহমান আহমদ ইবনে শোয়াইব আন-নাসাঈ [জন্ম ২১৫ হি: মৃ: ৩০৩ হি:] ৯. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মাজাহ্ আল-কাযবীনী [জন্ম ২০৯ হি: মৃ: ২৭৩ হি:]। ১০. আবূ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান আদ-দারিমী [জন্ম ১৮১ হি: মৃ: ২৫৫ হি:] ১১. আবুল হাসান আলী ইবনে ওমর আদ-দারাকুতনী [জন্ম ৩০৬ হি: মৃ: ৩৮৫ হি:]। ১২. আবূ বকর আহমদ ইবনে হুসাইন আল-বায়হাকী [জন্ম ৩৮৪ হি: মৃ: ৪৫৮ হি:] ১৩. এবং আবুল হাসান রাযীন ইবনে মুয়াবিয়া আল-আবদারী [মৃত্যু ৫৩৫ হি:] প্রমুখ মুহাদ্দেসীনে কেরাম। আর এ ছাড়া স্বল্প সংখ্যক অন্য বর্ণনাকারীও রয়েছেন। আর যখন আমি কোনো হাদীসকে কোনো ইমামের দিকে সম্পর্কিত করেছি [অর্থাৎ হাদীসের শেষে কোনো ইমামের নাম উল্লেখ করেছি] তখন [পাঠকের] বুঝতে হবে যে, আমি উক্ত হাদীসকে নবী করীম ﷺ পর্যন্ত সনদ নির্ভর করে দিয়েছি। কেননা, তাঁরা [তাঁদের গ্রন্থে] উক্ত কার্য সুসম্পন্ন করেছেন এবং আমাদেরকেও অব্যাহতি দান করেছেন। আর আমি পর্ব এবং অধ্যায়সমূহকে সেভাবে সাজিয়েছি যেভাবে মাসাবীহ গ্রন্থকার সাজিয়েছিলেন এবং এ ব্যাপারে তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছি। আর আমি প্রায় প্রতিটি অধ্যায়কে তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছি। প্রথম পরিচ্ছেদে সেসব হাদীস সন্নিবেশিত করেছি যা ইমাম বুখারী ও মুসলিম অথবা তাঁদের কোনো একজন বর্ণনা করেছেন। তাঁরা ছাড়া ঐ হাদীসগুলো অন্যান্যরা বর্ণনা করলেও তাঁদের সুউচ্চ মর্যাদার প্রতি দৃষ্টি রেখে কেবলমাত্র তাঁদের দু'জনের নাম উল্লেখ করাটাকেই আমি যথেষ্ট মনে করেছি। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বুখারী-মুসলিম ব্যতীত উল্লিখিত অন্যান্য ইমামগণের বর্ণনাকৃত হাদীস এনেছি। আর তৃতীয় পরিচ্ছেদে আমি আলোচ্য অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ও সাদৃশ্যপূর্ণ হাদীসসমূহ বর্ণনা করেছি। অবশ্য এ ব্যাপারে হাদীস বর্ণনার যাবতীয় শর্তাবলি বজায় রেখেছি। [অর্থাৎ প্রতিটি হাদীসের সাথে রাবীর নাম এবং যে কিতাব হতে নেওয়া হয়েছে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।] যদিও এর কিছু পূর্ববর্তী [সাহাবী] এবং পরবর্তীদের [তাবেয়ীদের] থেকে বর্ণিত।

ثُمَّ اِنَّكَ اِنْ فَقَدْتَّ حَدِيْثًا فِىْ بَابٍ فَذٰلِكَ عَنْ تَكْرِيْرٍ اُسْقِطُهٗ وَاِنْ وَجَدْتَّ اٰخَرَ بَعْضَهٗ مَتْرُوْكًا عَلٰى اِخْتِصَارِهٖ اَوْ مَضْمُوْمًا اِلَيْهِ تَمَامُهٗ فَعَنْ دَاعِىْ اِهْتِمَامٍ اَتْرُكُهٗ وَاُلْحِقُهٗ وَاِنْ عَثَرْتَ عَلٰى اِخْتِلَافٍ فِى الْفَصْلَيْنِ مِنْ ذِكْرِ غَيْرِ الشَّيْخَيْنِ فِى الْاَوَّلِ وَ ذِكْرِهِمَا فِى الثَّانِىْ فَاعْلَمْ اَنِّىْ بَعْدَ تَتَبُّعِىْ كِتَابَىِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ لِلْحُمَيْدِيِّ وَجَامِعِ الْاُصُوْلِ اِعْتَمَدْتُّ عَلٰى صَحِيْحَىِ الشَّيْخَيْنِ وَ مَتْنَيْهِمَا وَاِنْ رَاَيْتَ اِخْتِلَافًا فِىْ نَفْسِ الْحَدِيْثِ فَذٰلِكَ مِنْ تَشَعُّبِ طُرُقِ الْاَحَادِيْثِ وَلَعَلِّىْ مَا اطَّلَعْتُ عَلٰى تِلْكَ الرِّوَايَةِ الَّتِىْ سَلَكَهَا الشَّيْخُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَقَلِيْلًا مَا تَجِدُ اَقُوْلُ مَا وَجَدْتُّ هٰذِهِ الرِّوَايَةَ فِىْ كُتُبِ الْاُصُوْلِ اَوْ وَجَدْتُّ خِلَافَهَا فِيْهَا فَاِذَا وَقَفْتَ عَلَيْهِ فَانْسُبِ الْقُصُوْرَ اِلَىَّ لِقِلَّةِ الدِّرَايَةِ لَا اِلٰى جَنَابِ الشَّيْخِ رَفَعَ اللّٰهُ قَدْرَهٗ فِى الدَّارَيْنِ حَاشَا لِلّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ رَحِمَ اللّٰهُ مَنْ اِذَا وَقَفَ عَلٰى ذٰلِكَ نَبَّهَنَا عَلَيْهِ وَاَرْشَدَنَا طَرِيْقَ الصَّوَابِ وَلَمْ اٰلُ جُهْدًا فِى التَّنْقِيْرِ وَالتَّفْتِيْشِ بِقَدْرِ الْوُسْعِ وَ الطَّاقَةِ -

অনুবাদ : অতঃপর যদি তুমি [ইমাম বাগাবীর] সংগৃহীত কোনো হাদীস [আমার গ্রন্থের] কোনো অধ্যায়ে না পাও, তখন মনে করতে হবে যে, অন্য অধ্যায়ে এরূপ হাদীস রয়েছে বলেই আমি তা বাদ দিয়েছি। আবার যদি সংক্ষিপ্ততার কারণে কোনো হাদীসের কিছু অংশ পরিত্যক্ত অথবা পরিপূর্ণতার লক্ষ্যে অতিরিক্ত সংযোজন দেখতে পাও, তবে বুঝতে হবে যে, বিশেষ কোনো প্রয়োজনের তাগিদেই বাদ দিয়েছি বা সংযোজন করেছি। এমনিভাবে ইমাম বাগাবীর সাথে যদি আমার কোথাও কোনো মতভেদ বুঝতে পার। যেমন– দু' পরিচ্ছেদের প্রথম পরিচ্ছেদে শায়খাইন ব্যতীত অন্য কারো নাম উল্লেখ করেছি এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উক্ত দু'জনের কারো নাম উল্লেখ করেছি; তবে জেনে রাখবে যে, ইমাম হুমাইদী কৃত اَلْجَمْعُ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ এবং [ইমাম জাযারী কৃত] جَامِعُ الْاُصُوْلِ কিতাবদ্বয়ের মধ্যে অনুসন্ধানের পরই ইমাম বুখারী ও মুসলিমের সহীহ কিতাবদ্বয়ের মূলগ্রন্থ ও মতনের উপর নির্ভর করেছি। আর যদি তুমি মূল হাদীসে কোনো প্রকার পার্থক্য দেখতে পাও তাহলে বুঝতে হবে যে, হাদীসের সনদের বিভিন্নতার কারণেই তা হয়েছে। অথবা এ কারণে যে, সম্ভবত ইমাম বাগাবী (র.) যে রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন আমি তা অবগত হইনি। আর এরূপ স্থান খুব কমই দেখতে পাবে যে, আমি বলেছি "হাদীসের প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহে এটা পাইনি" অথবা "এর বিপরীত পেয়েছি"। যখন তুমি এরূপ পাও তখন দোষত্রুটি আমার দিকেই ফিরিয়ে দেবে যে, আমার অনুসন্ধানের সীমাবদ্ধতার কারণেই এরূপ হয়েছে; এটার ত্রুটি ইমাম বাগাবীর দিকে ফিরাবে না। আল্লাহ তা'আলা উভয় জাহানে তাঁর মর্যাদাকে উঁচু করুন। এরূপ অভিযোগ উত্থাপন থেকে আল্লাহর পানাহ। সে ব্যক্তির উপর আল্লাহ রহম করুন, যে এরূপ কোনো ত্রুটি সম্পর্কে অবগত হলে সে আমাকে তা জানাবে এবং সঠিক বিষয়ের দিকে পথ দেখাবে। তবে এটা সত্য যে, আমি আমার সাধ্য ও সামর্থ্য মুতাবিক তাহকীক ও অনুসন্ধানের কাজে কোনোরূপ ত্রুটি করিনি।

وَنَقَلْتُ ذٰلِكَ الْاِخْتِلَافَ كَمَا وَجَدْتُّ وَ مَا اَشَارَ اِلَيْهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مِنْ غَرِيْبٍ اَوْ ضَعِيْفٍ اَوْ غَيْرِهِمَا بَيَّنْتُ وَجْهَهٗ غَالِبًا وَ مَا لَمْ يُشِرْ اِلَيْهِ مِمَّا فِى الْاُصُوْلِ فَقَدْ قَفَّيْتُهٗ فِىْ تَرْكِهٖ اِلَّا فِىْ مَوَاضِعَ لِغَرَضٍ وَ رُبَمَا تَجِدُ مَوَاضِعَ مُهْمَلَةً وَ ذٰلِكَ حَيْثُ لَمْ اَطَّلِعْ عَلٰى رَاوِيْهِ فَتَرَكْتُ الْبَيَاضَ فَاِنْ عَثَرْتَ عَلَيْهِ فَاَلْحِقْهُ بِهٖ اَحْسَنَ اللّٰهُ جَزَاءَكَ وَسَمَّيْتُ الْكِتَابَ بِمِشْكٰوةِ الْمَصَابِيْحِ وَاَسْاَلُ اللّٰهَ التَّوْفِيْقَ وَ الْاِعَانَةَ وَ الْهِدَايَةَ وَ الصِّيَانَةَ وَتَيْسِيْرَ مَا اَقْصُدُهٗ وَ اَنْ يَّنْفَعَنِىْ فِى الْحَيٰوةِ وَ بَعْدَ الْمَمَاتِ وَ جَمِيْعَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمَاتِ حَسْبِىَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ وَ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ـ

অনুবাদ : আর এ [হাদীস বর্ণনার] ক্ষেত্রে আমি রিওয়ায়াতের বিভিন্নতা যেভাবে পেয়েছি সেভাবে বর্ণনা করেছি। আর তিনি যেসব হাদীসের ব্যাপারে 'গারীব' অথবা 'যা'ঈফ' ইত্যাদির দিকে ইশারা করেছেন, অধিকাংশ স্থানে আমি তার কারণ বর্ণনা করেছি। আর যেসব হাদীসকে প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহে 'গারীব', 'যা'ঈফ' বলা সত্ত্বেও তিনি তার প্রতি কোনো প্রকার ইঙ্গিত করেননি আমি তাতে তার অনুসরণ করেছি। তবে কোনো কোনো স্থানে প্রয়োজনবোধে আমি এর ব্যতিক্রমও করেছি। আর কোনো কোনো স্থানে এরূপও দেখতে পাবে, যেখানে আমি কারও উদ্ধৃতি দেইনি। এর কারণ এই যে, আমি কোথাও এর বর্ণনাকারীর সন্ধান পাইনি। ফলে আমি স্থানটি খালি রেখে দিয়েছি। অতএব যদি আপনি কোথাও তার সন্ধান পেয়ে থাকেন তবে [অনুগ্রহপূর্বক] আপনি যথাস্থানে তা যুক্ত করে দিন। আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আর আমি এ কিতাবের নামকরণ করলাম 'মেশকাতুল মাসাবীহ'। আল্লাহর নিকট শক্তি, সাহায্য, সুপথ এবং হেফাজত ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি এবং স্বীয় মঞ্জিলে মাকসূদে পৌঁছার ক্ষেত্রে তিনি যেন আমাকে সহজ-সরল পথ প্রদর্শন করেন। তিনি যেন এর দ্বারা আমার এবং সমগ্র মুসলমান নারী-পুরুষের ইহকাল ও পরকালে কল্যাণ সাধন করেন। আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট এবং সর্বোৎকৃষ্ট কার্যনির্বাহী। মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ ছাড়া কারো কোনো শক্তি ও সামর্থ্য নেই।

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلَى اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ فَهِجْرَتُهٗ اِلَى اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِ امْرَاَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهٗ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

অনুবাদ : হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– সকল কর্মই নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেক মানুষের জন্য তাই রয়েছে যা সে নিয়ত করে। অতএব যার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে হবে; তাঁর হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যেই [পরিগণিত] হবে। আর যার হিজরত দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে কিংবা কোনো নারীকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হবে ; তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই গণ্য হবে যে উদ্দেশ্যে সে হিজরত করেছে।–[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এ হাদীসটি ইসলামি জীবন ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হাদীস। মানুষের সকল প্রকার কাজকর্মের গ্রহণযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য হওয়া একমাত্র নিয়তের উপরই নির্ভরশীল। অর্থাৎ যে কাজ সৎ নিয়তে বা সৎ উদ্দেশ্যে করা হবে তা সৎকাজ রূপেই গণ্য হবে এবং আল্লাহর দরবারে একমাত্র তা-ই গ্রহণযোগ্য হবে ; পক্ষান্তরে মন্দ উদ্দেশ্যে করা হলে তা আল্লাহর দরবারে সৎ কর্ম হিসেবে গ্রহণীয় হবে না। এমনকি ভালো কাজও মন্দ নিয়তে করলে তাও গৃহীত হয় না। এ জন্য সৎ কর্মের সাথে সাথে পূর্ণ আন্তরিকতা থাকা একান্ত আবশ্যক। কেননা, আল্লাহর নিকট নিয়ত অনুযায়ী-ই বান্দার কর্মের প্রতিদান নির্ণয় হয়। তাই আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত নিয়তকে পরিশুদ্ধ করে নেওয়া। রাসূল ﷺ এ বিষয়ে অন্যত্র বলেছেন, "তোমাদের প্রতিপালক অত্যন্ত দয়ালু। কারণ, যে ব্যক্তি শুধু একটি সৎ কাজের ইচ্ছা প্রকাশ করে তার জন্য একটি নেকী লেখা হয়। ইচ্ছাকে কর্মে পরিণত করুক আর নাই করুক। অতঃপর যখন সে সৎ কাজটি সম্পাদন করে তখন তার আমল নামায় ১০টি নেকী লিখে দেওয়া হয়।"

سَبَبُ وُرُوْدِ الْحَدِيْثِ হাদীসের পটভূমি : দীনের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে রাসূলে কারীম ﷺ মহান আল্লাহর নির্দেশে মক্কা হতে মদীনায় হিজরত করেন এবং অন্যান্য সকল মুসলমানকেও মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ প্রদান করেন। তখন একনিষ্ঠ মুসলমানগণ রাসূলের আহ্বানে সাড়া দিয়ে দলে দলে মদীনায় পাড়ি জমান। এদের মধ্যে অজ্ঞাত নামা জনৈক সাহাবী 'উম্মে কায়স' বা 'কায়লা' নামক একজন মুহাজিরা মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হিজরত করেন। লোকটির হিজরতের একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল মহিলাকে বিবাহ করা। হিজরত তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। মহানবী ﷺ-এর দরবারে এ বিষয়টি আলোচিত হলে রাসূল ﷺ এ হাদীসটি ইরশাদ করে বলেন যে, হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্যই হওয়া উচিত। এ জন্য এ হাদীসকে হাদীসে উম্মে কায়সও বলা হয়।

سَبَبُ اِيْرَادِ الْحَدِيْثِ فِىْ بَدْءِ الْكِتَابِ কিতাবের শুরুতে হাদীসটি উল্লেখ করার কারণ : গ্রন্থকার তাঁর কিতাবের ভূমিকায় আলোচ্য হাদীসটি কেন পেশ করেছেন? হাদীস শাস্ত্রবিদগণ এর কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন। যথা–

১. আল্লামা زَرْكَشِىْ বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ তাই গ্রন্থকার নিয়তকে পরিশুদ্ধ করা এবং আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থে উক্ত হাদীসকে কিতাবের শুরুতে উল্লেখ করেছেন।
২. হযরত ওমর (রা.) ভাষণের শুরুতেই এ হাদীসখানী পাঠ করতেন, তাই গ্রন্থকারও হযরত ওমর (রা.)-এর অনুসরণে উক্ত হাদীসখানীকে কিতাবের শুরুতে এনেছেন।
৩. ইমাম বুখারী, মুসলিম, খাত্তাবীসহ প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ যেহেতু নিজ নিজ গ্রন্থের সূচনাতে এ হাদীসখানা এনেছেন, তাই মেশকাত প্রণেতাও তাঁদের অনুসরণে এ হাদীসটি কিতাবের শুরুতে এনেছেন।
৪. হাফেজ ইবনে মাহদী, ইমাম নববীসহ প্রমুখ বলেছেন– مَنْ اَرَادَ اَنْ يُّصَنِّفَ كِتَابًا فَلْيَبْدَأْ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ এ উক্তির ভিত্তিতেই গ্রন্থকার তাঁর কিতাবের সূচনাতে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।
৫. অথবা, مُقَدِّمَةْ তে হাদীসখানী এনে গ্রন্থকার অধ্যয়নকারীদের পরিশুদ্ধ নিয়তের প্রতি অনুপ্রাণিত করেছেন।
৬. অথবা, مُقَدِّمَةْ -এর পর পরই ঈমান, ইবাদতসহ বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা। আর সকল ইবাদত নিয়তের উপর নির্ভরশীল বিধায় প্রথমেই হাদীসটি এনে বিশুদ্ধ নিয়তের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।
৭. কারো মতে, এ হাদীসটি مُتَوَاتِرْ হওয়ার কারণে সকল হাদীসের পূর্বে এনেছেন।

مَعْنَى النِّيَّةِ নিয়াতের অর্থ :

مَعْنَى النِّيَّةِ لُغَةً : نِيَّةٌ শব্দটি একবচন, এর বহুবচন হল نِيَّاتٌ শাব্দিক অর্থ হলো– اَلْقَصْدُ وَ الْاِرَادَةُ ইচ্ছা বা সংকল্প করা।

مَعْنَى النِّيَّةِ اِصْطِلَاحًا : শরিয়তের পরিভাষায় নিয়তের সংজ্ঞা–

১. ইমাম খাত্তাবী (র.) বলেন– هُوَ قَصْدُكَ لِشَيْءٍ بِقَلْبِكَ وَتَحَرِّى الطَّلَبِ مِنْكَ لَهُ অর্থাৎ তোমার অন্তর দ্বারা কোনো কাজের সংকল্প করা এবং তা বাস্তবায়নের জন্য চেষ্টা করা।
২. ফাতহুর রব্বানী গ্রন্থকারের মতে– اَلنِّيَّةُ هُوَ تَوَجُّهُ الْقَلْبِ جِهَةَ الْفِعْلِ اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَامْتِثَالًا لِأَمْرِهِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন ও তাঁর আদেশ পালনের উদ্দেশ্যে কোনো কিছু করার প্রতি হৃদয় ও মনের অভিনিবিষ্ট হওয়াকে نِيَّةٌ বলে।

৩. আল্লামা বায়যাবী (র.) বলেন–

اَلنِّيَّةُ عِبَارَةٌ عَنْ اِنْبِعَاثِ الْقَلْبِ نَحْوَ مَايَرَاهُ مُوَافِقًا لِغَرْضٍ مِنْ جَلْبِ نَفْعٍ اَوْ دَفْعِ ضَرَرٍ حَالًا اَوْ مَالًا-

৪. আল্লামা আইনী (র.) বলেন– اَلنِّيَّةُ هِيَ الْقَصْدُ اِلَى الْفِعْلِ

৫. اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْطُ গ্রন্থকারের মতে– اَلنِّيَّةُ هِيَ تَوَجُّهُ النَّفْسِ نَحْوَ الْفِعْلِ

৬. تَنْظِيْمُ الْاَشْتَاتِ গ্রন্থকারের মতে– هِيَ تَوَجُّهُ الْقَلْبِ نَحْوَ الْفِعْلِ اِبْتِغَاءً لِوَجْهِ اللّٰهِ تَعَالٰى

اَلْفَرْقُ بَيْنَ النِّيَّةِ وَالْاِرَادَةِ নিয়ত ও ইরাদার মধ্যে পার্থক্য : نِيَّةٌ ও اِرَادَةٌ শব্দদ্বয়ের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে– ইচ্ছা বা সংকল্প করা। উভয়ের অর্থ এক হলেও প্রয়োগ ক্ষেত্রে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

১. نِيَّةٌ শব্দটি خَاصٌ যা শুধু বান্দার জন্য ব্যবহৃত হয়, আর اِرَادَةٌ টি عَامٌ যা বান্দা ও আল্লাহ উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। এ জন্য اَرَادَ اللّٰهُ বলা হয় نَوَى اللّٰهُ বলা হয় না।

২. نِيَّةٌ শব্দটি مُعَلَّلٌ بِالْاَغْرَاضِ তথা নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের উপর ব্যবহৃত হয়। আর اِرَادَةٌ টি উদ্দেশ্য থাকুক বা না থাকুক উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।

৩. আবুল হাসান আলী-মুকাদ্দেসী (র.) বলেন, نِيَّةٌ, قَصْدٌ, اِرَادَةٌ, عَزْمٌ সবগুলোর অর্থ একই; অর্থাৎ এ শব্দসমূহের শাব্দিক ও আভিধানিক অর্থ এক ও অভিন্ন, শুধু প্রয়োগ পদ্ধতি ভিন্ন।

اَلْفَرْقُ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالْعَمَلِ ফে'ল ও আমলের মধ্যে পার্থক্য :

১. عَمَلٌ শব্দটি خَاصٌ যা শুধু বান্দার ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। আর فِعْلٌ টি عَامٌ যা আল্লাহ ও বান্দা উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।

২. عَمَلٌ -এর মধ্যে طَوَالَتْ বা দীর্ঘতা হয়ে থাকে, আর فِعْلٌ -এর মধ্যে طَوَالَتْ বা দীর্ঘতা হয় না। যেমন–

١. اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ٠ ٢. اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ٠

৩. عَمَلٌ শব্দটি ذَوِى الْعُقُوْلِ -এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, আর فِعْلٌ শব্দটি ذَوِى الْعُقُوْلِ ও غَيْرُ ذَوِى الْعُقُوْلِ উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।

৪. عَمَلٌ হলো عَامٌ যা جَوَارِحٌ ও غَيْرُ جَوَارِحٍ উভয় হতে প্রকাশিত কাজের উপর ব্যবহৃত হয়। আর فِعْلٌ টি হলো خَاصٌ যা শুধু جَوَارِحٌ তথা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হতে প্রকাশিত কাজের উপর ব্যবহৃত হয়।

كُلُّ نَوْعٍ مِنَ الْعِبَادَاتِ مَوْقُوْفٌ عَلَى النِّيَّةِ اَمْ لَا প্রত্যেক প্রকারের ইবাদত নিয়তের উপর নির্ভরশীল কিনা? : সকল ইবাদত নিয়তের উপর নির্ভরশীল কিনা এ বিষয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়–

১. ইমাম শাফেয়ী, মালিক, আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) সহ অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনে কেরামের মতে, সকল প্রকার ইবাদতের [তথা مَقْصُوْدَةٌ হোক বা غَيْرُ مَقْصُوْدَةٍ হোক] জন্য নিয়ত শর্ত। নিয়ত ছাড়া কোনো ইবাদতই গ্রহণযোগ্য হবে না। তাঁদের দলিল এই– قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ এখানে اَلْاَعْمَالُ -এর اَلِفْ لَامْ টি اِسْتِغْرَاقِىْ আর অর্থের বিবেচনায় এ হাদীসের বক্তব্য এর কম– اِنَّمَا صِحَّةُ الْاَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ ٠

২. ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ ও ইমাম মালিক (র.)-এর অভিমত অনুযায়ী عِبَادَةٌ مَقْصُوْدَةٌ (যেমন– সাওম, সালাত, হজ ইত্যাদি)-এর জন্য নিয়ত শর্ত। কিন্তু عِبَادَةٌ غَيْرُ مَقْصُوْدَةٍ (যেমন– অজু)-এর জন্য নিয়ত শর্ত নয়। তাঁদের দলিল– اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ -এর মধ্যে اَلِفْ لَامْ টি عَهْدِ خَارِجِىْ আর এর মূল অর্থ হচ্ছে– اِنَّمَا ثَوَابُ الْاَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ এ ছাড়া এটা সুস্পষ্ট যে, নিয়ত ব্যতীত কোনো কোনো আমল বিশুদ্ধ হয়ে যায়; কিন্তু নিয়ত ব্যতিরেকে ছওয়াব পাওয়া যায় না। তাই বলা যায় যে, সকল عِبَادَةٌ নিয়তের উপর নির্ভরশীল নয়।

مَعْنَى الْهِجْرَةِ হিজরতের অর্থ : هِجْرَةٌ -এর শাব্দিক অর্থ হলো– اَلتَّرْكُ বা পরিত্যাগ করা। اَلْخُرُوْجُ مِنْ اَرْضٍ اِلٰى اَرْضٍ اُخْرٰى এক দেশ থেকে অন্য দেশে চলে যাওয়া।

হিজরতের পারিভাষিক সংজ্ঞা হলো–

১. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন– هُوَ تَرْكُ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যা নিষেধ করেছেন, তা পরিত্যাগ করাই হলো হিজরত।

২. আল্লামা আইনী (র.) বলেন– هِيَ مُفَارَقَةُ دَارِ الْكُفْرِ إِلٰى دَارِ الْإِسْلَامِ خَوْفًا لِلْفِتْنَةِ وَطَلَبًا لِإِقَامَةِ الدِّيْنِ অর্থাৎ বিপর্যয়ের ভয়ে এবং দীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কুফরি রাষ্ট্র ছেড়ে ইসলামি রাষ্ট্রে চলে যাওয়াকে হিজরত বলে।

৩. اَلْقَامُوْسُ الْفِقْهِيْ-এর মধ্যে রয়েছে যে,

اَلْهِجْرَةُ هِيَ تَرْكُ الْوَطَنِ الَّذِيْ بَيْنَ الْكُفَّارِ وَالْاِنْتِقَالُ إِلٰى بِلَادِ الْإِسْلَامِ

سَبَبُ إِيْرَادِ الْاِسْمِ الظَّاهِرِ دُوْنَ الضَّمِيْرِ **সর্বনামের পরিবর্তে প্রকাশ্য ইসম ব্যবহারের কারণ :** অত্র হাদীসে فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ এ বাক্যটিতে اَللّٰه ও رَسُوْل এ শব্দ দু'টি পুনর্বার উল্লেখ করা হয়েছে, অথচ এ নামদ্বয় পূর্বে উল্লেখ থাকার কারণে সংক্ষিপ্তকরণের লক্ষ্যে ضَمِيْر বা সর্বনাম ব্যবহার করে إِلَيْهِمَا উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হতো। তবে এরূপ উল্লেখ করার কয়েকটি কারণ রয়েছে। যথা–

১. اَللّٰه এবং رَسُوْل শব্দদ্বয় বারবার ব্যবহার করে আত্মতৃপ্তি লাভ করার উদ্দেশ্যেই اِسْم ضَمِيْر-এর স্থলে اِسْم ظَاهِرْ নেওয়া হয়েছে।

২. আল্লাহ ও তদীয় রাসূল ﷺ-এর নামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের লক্ষ্যেই اِسْم ضَمِيْر-এর স্থলে اِسْم ظَاهِرْ ব্যবহার করা হয়েছে।

"إِلَى امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا" অর্থাৎ "اَلْمَرْأَةُ الَّتِيْ أُشِيْرَتْ بِقَوْلِهِ "إِلَى امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا" **দ্বারা যে মহিলার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে :** মহানবী ﷺ-এর উল্লিখিত হাদীসে "أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا" -এর মধ্যস্থিত اِمْرَأَةٌ হলো "أُمُّ قَيْسٍ" নামক জনৈকা মহিলা, সে জনৈক সাহাবীকে হিজরতের শর্তে বিয়ে করতে রাজি হয়। ফলে উক্ত সাহাবী তাকে বিয়ে করার মানসে মদীনায় হিজরত করেন। উক্ত মহিলার নাম হলো قَيْلَةُ (কায়লা), আর উপনাম হলো أُمّ قَيْس (উম্মে কায়স)।

بِمَ تَتَعَلَّقُ قَوْلُهُ بِالنِّيَّاتِ **উক্ত হাদীসে بِالنِّيَّاتِ শব্দটি কার সাথে যুক্ত হয়েছে? :** ইমাম শাফেয়ী, আহমদ (র.) সহ অধিকাংশ মুহাদ্দেসীনে কেরামের মতে بِالنِّيَّاتِ শব্দটি উহ্য تَصِحُّ বা صَحِيْحَةٌ -এর সাথে সংযুক্ত হয়েছে। ফলে বাক্যটির অর্থ হবে– إِنَّمَا الْأَعْمَالُ صَحِيْحَةٌ أَوْ تَصِحُّ بِالنِّيَّاتِ নিশ্চয়ই আমল নিয়ত দ্বারাই বিশুদ্ধ হয়।

ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের মতে بِالنِّيَّاتِ শব্দটি উহ্য كَامِلَةٌ অথবা تَكْمُلُ -এর সাথে যুক্ত হয়েছে। তখন মূল বাক্যটি হবে– إِنَّمَا الْأَعْمَالُ كَامِلَةٌ أَوْ تَكْمُلُ بِالنِّيَّاتِ অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমল নিয়ত দ্বারা পরিপূর্ণ হয়। তবে مُعْتَبَرَةٌ বা تُعْتَبَرُ উহ্য মেনে নেওয়াই উত্তম। তখন পূর্ণ বাক্যটি হবে– إِنَّمَا الْأَعْمَالُ مُعْتَبَرَةٌ أَوْ تُعْتَبَرُ بِالنِّيَّاتِ অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমল নিয়ত দ্বারাই ধর্তব্য হবে। তথা ইবাদত যদি মাকসূদা হয়, তবে নিয়ত দ্বারা তার বিশুদ্ধতা ধর্তব্য হবে, আর যদি غَيْرُ مَقْصُوْدَةٍ হয়, তবে নিয়ত দ্বারা তার ছওয়াব ধর্তব্য হবে।

وَجْهُ تَخْصِيْصِ الْمَرْأَةِ بَعْدَ ذِكْرِ عُمُوْمِ الدُّنْيَا **ব্যাপক অর্থবোধক دُنْيَا শব্দটি উল্লেখের পর আবার বিশেষভাবে اِمْرَأَةٌ শব্দটি উল্লেখের কারণ :** আলোচ্য হাদীসে ব্যাপক অর্থবোধক دُنْيَا শব্দটি উল্লেখের পর আবার বিশেষভাবে মহিলার কথা উল্লেখের কারণ হলো, মহিলাই হচ্ছে দুনিয়ার বড় ফিতনা। যত বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলা এদের দ্বারাই হয়ে থাকে, যেমনি পবিত্র কুরআনে এসেছে– زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ الخ এমনিভাবে নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– مَا تَرَكْتُ بَعْدِيْ فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

অথবা, উক্ত হাদীসটি উম্মে কায়স নাম্নী মহিলাকে কেন্দ্র করে বর্ণিত হয়েছে বিধায় এখানে মহিলাকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

هَلِ الْهِجْرَةُ مَشْرُوْعَةٌ إِلَى الْأَبَدِ أَمْ لَا؟ **হিজরতের বিধান চিরদিনের জন্য, নাকি সাময়িক?**

১. কিছু সংখ্যক ওলামায়ে কেরামের মতে, মক্কা বিজয়ের পর হিজরতের আর আবশ্যকতা নেই। কেননা, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ তথা মক্কা বিজয়ের পর হিজরতের আর আবশ্যকতা নেই।

২. জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, হিজরতের বিধান চিরদিনের জন্য বহাল রয়েছে। তাঁদের দলিল হলো–

١. قَوْلُهُ تَعَالَىٰ "اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا" –

٢. قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ " لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتّٰى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ" –

তাঁদের উল্লিখিত হাদীসের জবাবে বলা যায় যে, মক্কা বিজয়ের পর মক্কা হতে মদীনায় হিজরতের কোনো আবশ্যকতা নেই। কেননা, তখন তা দারুল ইসলামে পরিণত হয়েছে।

حَيَاةُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رض) হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-এর জীবনী :

১. **নাম ও পরিচয়** তাঁর নাম ওমর, উপনাম আবূ হাফস, উপাধি ফারূক। পিতার নাম খাত্তাব, মাতার নাম খাত্‌না মতান্তরে হানতামা বিনতে হাশিম ইবনে মুগীরা।

২. **জন্ম ও বংশ পরিচয় :** তিনি বিখ্যাত কুরাইশ বংশে হিজরতের ৪০ বছর পূর্বে রাসূল ﷺ-এর জন্মের ১৩ বছর পর ৫৮৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

৩. **ইসলাম গ্রহণ :** নবুয়তের ৫ম / ৬ষ্ঠ বছর রাসূল ﷺ-কে হত্যা করতে এসে আরকামের ঘরে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ৪০ তম মুসলমান।

৪. **খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ :** হযরত আবূ বকর (রা.)-এর ইন্তেকালের পর হিজরি ১৩ সালে ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

৫. **হাদীসের খেদমত :** তিনি সর্বমোট ৫৩৯ টি হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিতভাবে ১০টি এবং ইমাম বুখারী এককভাবে ৯ টি আর ইমাম মুসলিম ১৫টি হাদীস বর্ণনা করেন।

৬. **শাহাদাত লাভ :** হিজরি ২৩ সালে ২৪শে জিলহজ বুধবার মসজিদে নববীতে ইশার/ ফজরের নামাজে মুগীরা ইবনে শো'বার দাস আবূ লু'লুর তরবারির আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে তিনদিন পর শাহাদাত লাভ করেন।

৭. **দাফন ও জানাযা :** হযরত সুহাইব (রা.) তাঁর জানাযার নামাজ পড়ান। হযরত আয়েশা (রা.)-এর অনুমতিক্রমে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.)-এর বাম পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

اَلْمَسَائِلُ الْفِقْهِيَّةُ الَّتِىْ تَتَعَلَّقُ بِالنِّيَّاتِ নিয়ত সংক্রান্ত ফিকহী মাসআলাসমূহ :

১. নিয়ত অন্তরের সাথে সম্পর্কিত। কাজেই কোনো ইবাদতের সময় শুধু মুখে মুখে উচ্চারণ করলে চলবে না; বরং অন্তরে সংকল্প করে মুখে উচ্চারণ না করলেও চলে। মুখে উচ্চারণের অতিরিক্ত কোনো ছওয়াব নেই।

২. যদি কোনো ব্যক্তি জোহরের নামাজ আদায় করার সময় অন্তরে জোহর নামাজ আদায়ের সংকল্প করে আর অন্য নামাজের কথা উচ্চারণ করে, তবে তার নামাজ জোহর হিসেবেই আদায় হবে।

৩. কোনো কাজে একাধিক নিয়ত বা উদ্দেশ্য থাকতে পারে। যেমন– কোনো নিকটতম দরিদ্র আত্মীয়কে দান-সদকা করা। এরূপ দানে দু'টি উদ্দেশ্য হতে পারে–

প্রথমত : দরিদ্র আত্মীয়ের অভাব বিমোচন,

দ্বিতীয়ত : আত্মীয়তা রক্ষা। এতে কোনোরূপ ক্ষতি নেই; বরং ছওয়াবই হবে।

৪. সৎ নিয়তে যে কোনো বৈধ কাজ করা হলে আল্লাহ তার প্রতিদান প্রদান করবেন।

كِتَابُ الْاِيْمَانِ

অধ্যায় : ঈমান

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

١ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ اِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَايُرٰى عَلَيْهِ اَثَرُ السَّفَرِ وَلَايَعْرِفُهُ مِنَّا اَحَدٌ حَتّٰى جَلَسَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ اِلٰى رُكْبَتَيْهِ وَ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلٰى فَخِذَيْهِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِسْلَامِ قَالَ الْاِسْلَامُ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَتُقِيْمَ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِىَ الزَّكٰوةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اِنِ اسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا قَالَ صَدَقْتَ فَعَجِبْنَا لَهٗ يَسْأَلُهٗ وَيُصَدِّقُهٗ قَالَ فَاَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِيْمَانِ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ قَالَ

১. অনুবাদ : হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূল ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ একজন আগন্তুক এসে উপস্থিত হলো। তাঁর পরিধেয় পোশাক ছিল ধবধবে সাদা, মাথার চুল ছিল কুচকুচে কালো। তাঁর গায়ে সফরের কোনো চিহ্ন দৃষ্ট হয়নি। অথচ আমাদের মধ্য হতে কেউ তাঁকে চিনতে পারেনি। অবশেষে লোকটি রাসূল ﷺ-এর (খুব) নিকটে এসে বসল এবং তার হাঁটুদ্বয়কে রাসূল ﷺ-এর হাঁটুর সাথে মিলিয়ে এবং তার দু' হাত তাঁর দু' উরুর উপর রাখল। অতঃপর লোকটি বলতে লাগল, হে মুহাম্মদ ﷺ ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করুন। [তথা ইসলাম কাকে বলে?] রাসূল ﷺ বললেন, ইসলাম হচ্ছে– ১. তুমি এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল, ২. নামাজ প্রতিষ্ঠা করবে, ৩. জাকাত আদায় করবে, ৪. রমজান মাসের রোজা রাখবে ৫. এবং পথ খরচে সামর্থ্য হলে হজব্রত পালন করবে। রাসূল ﷺ-এর জবাব শুনে লোকটি বলে উঠল আপনি সত্যই বলেছেন। বর্ণনাকারী [হযরত ওমর (রা.)] বলেন, আমরা আশ্চর্যান্বিত হলাম যে, লোকটি [অজ্ঞের মতো] প্রশ্ন করছে এবং [বিজ্ঞের মতো] উত্তরের সত্যায়ন করছে। লোকটি পুনরায় বলল যে, আমাকে ঈমান সম্পর্কে অবহিত করুন। নবী করীম ﷺ উত্তরে বললেন, ঈমান হচ্ছে– আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাকুল, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং ভাগ্যের ভালো-মন্দের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, [যে, সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়।] জবাব শুনে আগত লোকটি বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন। এরপর লোকটি বলল, আমাকে ইহসান সম্পর্কে বলুন। জবাবে রাসূল ﷺ বললেন, তোমার এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করো, যেমন তুমি তাঁকে

صَدَقْتَ قَالَ فَاَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِحْسَانِ قَالَ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ فَاَخْبِرْنِىْ عَنِ السَّاعَةِ قَالَ مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ فَاَخْبِرْنِىْ عَنْ اَمَارَاتِهَا قَالَ اَنْ تَلِدَ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا وَاَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُوْنَ فِى الْبُنْيَانِ قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ لِىْ يَا عُمَرُ اَتَدْرِىْ مَنِ السَّائِلُ قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّهُ جِبْرَئِيْلُ اَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوَاهُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ مَعَ اِخْتِلَافٍ وَفِيْهِ وَاِذَا رَاَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الصُّمَّ الْبُكْمَ مُلُوْكَ الْاَرْضِ فِىْ خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ ثُمَّ قَرَأَ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ اَلْاٰيَةَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

দেখতে পাচ্ছ, আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও; তাহলে মনে করবে যে, তিনি তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন। অতঃপর লোকটি বলল, আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে অবহিত করুন, [তথা কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে?] তখন রাসূল ﷺ বললেন, [এ বিষয়ে] যাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে সে প্রশ্নকারীর চেয়ে বেশি অবহিত নয় [তথা বেশি জানে না]। সে বলল, তাহলে আমাকে কিয়ামতের নিদর্শন সম্পর্কে অবহিত করুন। নবী করীম ﷺ বললেন, [তার নিদর্শন হচ্ছে-] ১. দাসী তার মনিবকে প্রসব করবে, ২. [দ্বিতীয়ত] তুমি দেখতে পাবে যে, যাদের পায়ে জুতা ও পরনে কাপড় নেই, নিঃস্ব এবং বকরির রাখাল তারা বড় বড় প্রাসাদ তৈরিতে পরস্পর প্রতিযোগিতা করছে।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর লোকটি চলে গেল এবং আমরা বেশ কিছু সময় হতভম্ব হয়ে বসে থাকলাম। তারপর রাসূল ﷺ আমাকে সম্বোধন করে বললেন, হে ওমর! তুমি কি জান প্রশ্নকারী লোকটি কে? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-ই ভালো জানেন। রাসূল ﷺ বললেন, লোকটি হলেন হযরত জিবরাঈল (আ.) তোমাদেরকে দীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য আগমন করেছিলেন। -[মুসলিম]

এ হাদীসটি কিছুটা বর্ণনাগত পার্থক্য সহকারে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন। তাতে এ কথাগুলো রয়েছে যে, যখন তুমি নগ্নপদ ও নগ্নদেহ বিশিষ্ট বধির ও বোবাদেরকে পৃথিবীর শাসক হিসেবে দেখতে পাবে। [আর এ কথাও আছে যে,] এমন পাঁচটি বিষয় আছে যেগুলোর জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। অবশেষে নবী করীম ﷺ কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করলেন যে, اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ (اَلْاٰيَةَ) অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে এবং কখন বৃষ্টি বর্ষণ করবেন তা তিনিই জানেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর স্বশরীরে অবস্থান ও তাঁর প্রশ্নের মাধ্যমে এ হাদীসটির অবতারণা হয়েছে বলে একে হাদীসে জিবরাঈল বলা হয়।

কোনো কোনো হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর এই আগমন মহানবী ﷺ-এর জীবনের শেষভাগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ সাক্ষাৎকার দ্বারা তেইশ বছরে অবতীর্ণ দীনের সার-নির্যাস সকলের সম্মুখে স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। এ জন্য এ হাদীসকে اُمُّ السُّنَّةِ বা اُمُّ الْاَحَادِيْثِ বলা হয়। যেমনিভাবে সূরা ফাতিহাকে 'উম্মুল কুরআন' বলা হয়। গভীরভাবে চিন্তা করলে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, দীনের মূল হচ্ছে তিনটি কথা, আর তা এ হাদীসেই আলোচিত হয়েছে। সে তিনটি কথা হলো-

প্রথমত : "বিশ্বাস" অর্থাৎ আল্লাহর নবীগণ যেসব গুরুত্বপূর্ণ অদৃশ্য বিষয়াবলি পেশ করেছেন এবং যা মেনে নেওয়ার দাওয়াত প্রদান করেছেন তা সত্য বলে মেনে নেওয়া ; একেই বলে ঈমান।

দ্বিতীয়ত : "ইবাদত" তথা বান্দা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করবে এবং নামাজ, রোজা, হজ, জাকাতসহ যাবতীয় বিধিবিধান যথাযথভাবে পালন করবে।

তৃতীয়ত : "নিষ্ঠা" তথা ঈমান ও ইসলামের অধ্যায় অতিক্রম করার পর তৃতীয় ও শেষ পর্ব হচ্ছে আল্লাহকে এমনভাবে মান্য করা যে, তিনি সর্বস্রষ্টা ও সর্বদর্শী। একথা মেনে নেওয়া যে, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সকল কাজকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ প্রত্যক্ষভাবে অবহিত; একে বলে ইহসান। সুফিদের ভাষায় একে "তাসাওউফ" বলা হয়। এ তিনটি বিষয়কে নিজের জীবনে যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করতে পারলেই একজন মানুষ খাঁটি মু'মিন হিসেবে পরিগণিত হবে।

وَجْهُ التَّسْمِيَةِ নামকরণের কারণ : এ হাদীসটির নাম হলো হাদীসে জিবরাঈল। যেহেতু প্রশ্নকারী ছিলেন হযরত জিবরাঈল (আ.) এ জন্য হাদীসটিকে 'হাদীসে জিবরাঈল' বলা হয়। এ ছাড়া হাদীসটিকে أُمُّ السُّنَّةِ বা أُمُّ الْاَحَادِيْثِ ও বলা হয়। কেননা, হাদীসটিতে ইসলামের সব মৌলিক বিষয় সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত হয়েছে।

سَبَبُ اِرْشَادِ الْحَدِيْثِ হাদীস বর্ণনার উপলক্ষ : এ হাদীসটি ইরশাদ করার কারণ প্রসঙ্গে মুহাদ্দিসগণ নিম্নোক্ত ঘটনা পেশ করেছেন– আল্লাহ তা'আলা যখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন যে, لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ অর্থাৎ তোমরা নবীর কথার উপর তোমাদের আওয়াজকে উঁচু কর না, তখন সাহাবীগণ অত্যন্ত ভয় পেয়ে যান এবং প্রয়োজন থাকলেও রাসূল ﷺ-কে প্রশ্ন করতে সাহসী হতেন না। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা সাহাবীদেরকে শিষ্টাচার, চলাফেরা, উঠাবসা, প্রশ্ন করার রীতিনীতি ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়ার জন্য হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে মানুষের আকৃতিতে প্রেরণ করেন ; যাতে সাহাবীগণ নির্ধারিত পদ্ধতি মোতাবেক রাসূল ﷺ-এর খেদমতে এসে তাঁদের প্রয়োজনীয় বিষয়াবলি অবগত হতে পারেন।

سَبَبُ تَقْدِيْمِ حَدِيْثِ جِبْرَائِيْلَ فِىْ بَابِ الْاِيْمَانِ হাদীসে জিবরাঈলকে ঈমান অধ্যায়ে সর্বাগ্রে আনয়ন করার কারণ : মেশকাত শরীফের প্রণেতা ঈমান পর্বের প্রথমে হাদীসে জিবরাঈলকে আনয়ন করেছেন। কেননা, হাদীসটি আকাইদ, ইবাদত ও ইখলাস সম্পর্কিত যাবতীয় বিধিবিধানের সার-সংক্ষেপ। এ জন্য এ হাদীসকে أُمُّ السُّنَّةِ বা أُمُّ الْاَحَادِيْثِ বলা হয়। যেমনিভাবে সূরায়ে ফাতিহার মধ্যে কুরআনে হাকীমের যাবতীয় বিষয়কে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে বিধায় একে কুরআনের শুরুতে আনয়ন করা হয়েছে। আর সূরা ফাতিহাকেই أُمُّ الْقُرْاٰنِ বলা হয়।

দ্বিতীয়ত মেশকাত প্রণেতা اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ সর্বপ্রথম এনেছেন, এরপর حَدِيْثُ جِبْرَائِيْلَ-কে এনেছেন। ফলে اِنَّمَا الْاَعْمَالُ টি বিসমিল্লাহ তুল্য আর حَدِيْثُ جِبْرَائِيْلَ সূরা ফাতিহার মতো হয়েছে। তবে এ তুলনা বরকত হাসিলের দিক বিবেচনায়, বাস্তব ও অর্থগত দিক হতে নয়।

তৃতীয়ত আল্লামা তীবী (র.) বলেন, হাদীস দু'টিকে অগ্রে স্থান দিয়ে সম্মানিত গ্রন্থকার পবিত্র কুরআনের অনুসরণ করেছেন।

اَلْحِكْمَةُ فِىْ اِتْيَانِ جِبْرَائِيْلَ وَسُؤَالِهٖ হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর আগমন ও প্রশ্ন করার হিকমত :

১. উপস্থিত সাহাবীদেরকে দীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি আগমন করেছেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন। যেমনি হাদীসের শেষাংশে এসেছে যে, اَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ
২. অথবা, তিনি প্রশ্ন করার পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে আগমন করেছিলেন।
৩. কিংবা শিক্ষকের সম্মুখে ছাত্রের বসার পদ্ধতি কি রকম হবে তা শিক্ষা দেওয়ার জন্য আগমন করেছেন।
৪. অথবা, কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা অবহিত করার লক্ষ্যে আগমন করেছেন।
৫. অথবা, সাহাবীদের অন্তর হতে রাসূল ﷺ-কে প্রশ্ন করার ভয় দূর করার জন্য এসেছেন।

وَجْهُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ بِقَوْلِهٖ يَا مُحَمَّدُ মহানবী ﷺ-কে 'হে মুহাম্মদ' বলে ডাকার কারণ : মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন যে, তোমরা একে অপরকে ডাকার মতো নবীকে ডেকো না তথা নবীর নাম ধরে ডেকো না। এ নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও আগত লোকটি নবী করীম ﷺ-কে নাম ধরে ডাকার কারণ হলো–

১. কুরআনের নির্দেশ হলো মানুষের জন্য; কিন্তু আগন্তুক তো ফেরেশতা ; মানুষ নয়। সুতরাং তাঁর জন্য এ নিষেধাজ্ঞা নয়।

২. অথবা, মুহাম্মদ দ্বারা এখানে নির্দিষ্ট নাম উদ্দেশ্য নয় ; বরং এর দ্বারা গুণবাচক অর্থই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ হে প্রশংসিত।

৩. অথবা, নিজের পরিচয় গোপন রাখার লক্ষ্যেই হযরত জিবরাঈল (আ.) এরূপ বলেছেন তথা সে অনেক দূরের লোক, ইসলামের রীতি-নীতি সম্পর্কে সে অবহিত নয়।

اَلْفَرْقُ بَيْنَ الْاِيْمَانِ وَالْاِسْلَامِ ঈমান ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য :

১. اَلْاِيْمَانُ শব্দের অর্থ اَلتَّصْدِيْقُ বা বিশ্বাস করা, আর اَلْاِسْلَامُ শব্দের অর্থ হচ্ছে اَلْاِنْقِيَادُ বা আনুগত্য করা।

২. اِيْمَانٌ বলতে অভ্যন্তরীণ কার্যাবলিকে বুঝায়, আর اِسْلَامٌ বলতে বাহ্যিক কার্যাবলিকে বুঝায়।

৩. اِيْمَانٌ শুধু قَلْبٌ-এর সাথে সম্পৃক্ত, আর اِسْلَامٌ ক্বলব ও লিসান উভয়ের সাথে সম্পৃক্ত।

৪. ইমাম বুখারীসহ একদল ওলামার মতে, اِيْمَانٌ ও اِسْلَامٌ একই বস্তু। উভয়ের মধ্যে نِسْبَةُ تَسَاوِىْ-এর সম্পর্ক। যেমনি কুরআনে এসেছে- فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ এখানে মু'মিন ও মুসলিম বলতে একই পরিবারভুক্তকে বুঝানো হয়েছে।

৫. কিছু সংখ্যকের মতে, উভয়টি একটি অপরটির বিপরীতধর্মী। যেমনি কুরআনে এসেছে- قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوْا وَ لٰكِنْ قُوْلُوْا اَسْلَمْنَا ۔

৬. অন্য একদলের মতে, উভয়ের মধ্যে عُمُوْم وَ خُصُوْص مُطْلَقْ-এর সম্পর্ক তথা ঈমান হচ্ছে عَامٌ আর اِسْلَامٌ হচ্ছে খাস, তাই বলা যায় যে, فَكُلُّ مُؤْمِنٍ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ وَكُلُّ مُسْلِمٍ مُؤْمِنٌ

৭. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন- اِنَّهُمَا كَالْفَقِيْرِ وَالْمِسْكِيْنِ اِذَا اجْتَمَعَا اِفْتَرَقَا وَاِذَا افْتَرَقَا اِجْتَمَعَا অর্থাৎ উভয়টি فَقِيْر ও مِسْكِيْن-এর ন্যায়। যখন একসাথে আসবে তখন পৃথক পৃথক অর্থ প্রদান করবে, আর যখন পৃথক পৃথক স্থানে আসবে তখন একই অর্থ দেবে।

৮. কারো মতে- هُمَا كَالظَّهْرِ مَعَ الْبَطْنِ لَايَنْفَصِلُ اَحَدُهُمَا عَنِ الْاٰخَرِ فَالْاِيْمَانُ لَايَنْفَصِلُ عَنِ الْاِسْلَامِ وَالْاِسْلَامُ لَايَنْفَصِلُ عَنِ الْاِيْمَانِ ۔
অর্থাৎ এ দু'টি পেট ও পিঠের মতো, একটি অপরটি হতে পৃথক হতে পারে না। কাজেই ঈমান ইসলাম হতে এবং ইসলাম ঈমান হতে পৃথক নয়।

مَعْنَى الْاِيْمَانِ ঈমানের অর্থ :

مَعْنَى الْاِيْمَانِ لُغَةً ঈমানের শাব্দিক অর্থ : اِيْمَانٌ শব্দের অর্থ হল- اَلْاِنْقِيَادُ আনুগত্য করা, اَلتَّصْدِيْقُ বিশ্বাস করা, اَلْخُضُوْعُ অবনত হওয়া, اَلْوُثُوْقُ নির্ভর করা, اَلْاِذْعَانُ স্বীকৃতি দেওয়া ইত্যাদি।

مَعْنَى الْاِيْمَانِ اِصْطِلَاحًا ঈমানের পারিভাষিক অর্থ :

১. ইমাম গাযালী (র.) বলেন- اَلْاِيْمَانُ هُوَ تَصْدِيْقُ النَّبِيِّ ﷺ بِجَمِيْعِ مَا جَاءَ بِهٖ অর্থাৎ নবী করীম ﷺ-এর আনীত সকল বিধানসহ তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

২. ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন- هُوَ التَّصْدِيْقُ بِالْجِنَانِ وَالْاِقْرَارُ بِاللِّسَانِ অর্থাৎ আন্তরিক বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকৃতি হলো ঈমান।

৩. জমহুর মুহাদ্দিস ও তিন ইমামের মতে- اَلْاِيْمَانُ هُوَ التَّصْدِيْقُ بِالْجِنَانِ وَالْاِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَالْعَمَلُ بِالْاَرْكَانِ অর্থাৎ অন্তরের বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকারোক্তি এবং আরকানসমূহ কার্যে পরিণত করার নাম ঈমান। তবে তাঁদের নিকট মৌখিক স্বীকারোক্তি এবং আরকান কার্যে পরিণত করা এ দু'টি ঈমান পূর্ণ হওয়ার অংশ, মৌলিক অংশ নয়। কাজেই তাঁদের নিকট ইবাদত ত্যাগকারী এবং কবীরা গুনাহকারী ফাসিক, কাফির নয়।

مَعْنَى الْاِسْلَامِ ইসলামের অর্থ :

مَعْنَى الْاِسْلَامِ لُغَةً : اِسْلَامٌ-এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে- اَلْاِنْقِيَادُ الظَّاهِرُ তথা বাহ্যিক আনুগত্য, اَلْاِطَاعَةُ মান্য করা, اَلْاِخْلَاصُ নিষ্ঠার সাথে কাজ করা, اَلْخُضُوْعُ বশ্যতা স্বীকার করা, اَلدُّخُوْلُ فِىْ دِيْنِ الْاِسْلَامِ ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করা ইত্যাদি।

مَعْنَى الْإِسْلَامِ شَرْعًا ইসলামের পারিভাষিক অর্থ :

১. ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে- اَلتَّسْلِيْمُ وَالْاِنْقِيَادُ لِأَوَامِرِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَ رَسُوْلِهٖ ﷺ অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশসমূহ মেনে চলাই হলো ইসলাম।

২. আল্লামা আইনী (র.) বলেন- هُوَ الْاِنْقِيَادُ لِلّٰهِ تَعَالٰى بِقَبُوْلِ اَمْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالتَّلَفُّظُ بِكَلِمَةِ الشَّهَادَةِ وَالْاِتْيَانُ بِالْوَاجِبَاتِ وَالْاِمْتِنَاعُ عَنِ الْمُنْكَرَاتِ . অর্থাৎ রাসূলের আদেশ মান্য করে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করা, কালিমায়ে শাহাদাত উচ্চারণ করা এবং আবশ্যকীয় কার্যসমূহ পালন করা আর নিষিদ্ধ কাজসমূহ বর্জন করা।

মোটকথা, যাবতীয় বিধিবিধানকে একাগ্রচিত্তে মেনে চলা ও নিষিদ্ধ কাজসমূহ পরিহার করাকেই ইসলাম বলে।

مَعْنَى الزَّكٰوةِ জাকাতের অর্থ :

مَعْنَى الزَّكٰوةِ لُغَةً : زَكٰوة শব্দটি মাসদার। এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে-

১. اَلنُّمُوُّ وَ الزِّيَادَةُ বৃদ্ধি পাওয়া। যথা- زَكَى الزَّرْعُ

২. اَلطَّهَارَةُ পবিত্রতা অর্জন করা। যথা- قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا

৩. اَلْمَدْحُ বা প্রশংসা করা। যেমন- زَكّٰى نَفْسَهٗ اِذَا مَدَحَ

৪. اَلْبَرَكَةُ বা বরকত হওয়া। যথা- زَكَتِ الْبُقْعَةُ اِذَا بُوْرِكَ فِيْهَا

مَعْنَى الزَّكٰوةِ اِصْطِلَاحًا যাকাতের পারিভাষিক অর্থ : ১. دُرُّ الْمُخْتَارِ গ্রন্থকারের মতে-

اَلزَّكٰوةُ هِىَ تَمْلِيْكُ جُزْءِ مَالٍ عَيَّنَهُ الشَّارِعُ مِنْ مُسْلِمٍ فَقِيْرٍ غَيْرِ هَاشِمِيٍّ وَلَامَوْلَاهُ مَعَ قَطْعِ الْمَنْفَعَةِ عَنِ الْمُمَلِّكِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِلّٰهِ تَعَالٰى .

অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত মালের বনূ হাশেম গোত্রীয় লোকজন হাশেমী ও তাঁদের দাস-দাসী ব্যতীত অন্য মুসলিম দরিদ্রকে বিনা স্বার্থে প্রদান করার নাম হচ্ছে যাকাত।

২. আল্লামা আইনীর ভাষায়- اَلزَّكٰوةُ اِيْتَاءُ جُزْءِ مَالٍ مِنَ النِّصَابِ بَعْدَ حَوَلَانِ الْحَوْلِ اِلٰى فَقِيْرٍ غَيْرِ هَاشِمِيٍّ

এক কথায় নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়ার প্রেক্ষিতে শরীয়তের নির্ধারিত হারে ও ক্ষেত্রে বৎসরান্তে সম্পদ ব্যয় করাকে যাকাত বলা হয়।

مَتٰى فُرِضَتِ الزَّكٰوةُ জাকাত কখন ফরজ হয়েছে :

১. ইবনে খুযাইমা বলেন, হিজরতের পূর্বে জাকাত ফরজ হয়েছে।

২. জমহুর ওলামার মতে, হিজরতের পরে ফরজ হয়েছে। তবে কোন সনে ফরজ হয়েছে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে, (ক) ইমাম নববীর মতে, ২য় হিজরিতে। (খ) কিছু সংখ্যকের মতে, ১ম হিজরিতে। (গ) ইবনুল আছীরের মতে ৯ম হিজরিতে ফরজ হয়েছে।

اَلْحِكْمَةُ فِىْ مَشْرُوْعِيَّةِ الزَّكٰوةِ জাকাত বিধিবদ্ধ হওয়ার হিকমত : জাকাত ইসলামের অন্যতম রোকন এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ ও আর্থিক ইবাদত। ইসলামি সমাজ ব্যবস্থায় এর তাৎপর্য অনেক বেশি। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে-

১. জাকাত দ্বারা দাতার সম্পদ ও অন্তর পরিশুদ্ধ হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا -

২. এর ফলে সমাজে দরিদ্রতা দূর হয়ে সম্পদ কয়েকজনের মধ্যে পুঞ্জিভূত থাকে না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

كَىْ لَايَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ -

৩. এর দ্বারা অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীভূত হয়।

৪. ধনী এবং দরিদ্রের মাঝে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি হয়।

দাতার জীবনে জাকাতের প্রভাব : ১. জাকাত লোভ নিবারক। ২. দানের অভ্যাস গড়ে তোলে। ৩. আল্লাহর নিয়ামতের শোকর আদায় হয়। ৪. কৃপণতার রোগ হতে মুক্ত রাখে। ৫. পারস্পরিক ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। ৬. মনের অহঙ্কার দূর হয়। ৭. অন্যের প্রতি করুণা ও অনুগ্রহের ভাবধারা সৃষ্টি হয়।

সম্পদের উপর জাকাতের প্রভাব : ১. যাকাত ধন-সম্পদের পবিত্রতা বিধান করে। ২. জাকাত মূলধনে প্রবৃদ্ধি সাধন করে। ৩. একহাতে জমা না থেকে অনেকের মাঝে বিতরণ হয়। ৪. সম্পদের ময়লা দূর হয়ে যায়।

اَلْفَرْقُ بَيْنَ الْقَدْرِ وَ الْقَضَاءِ কদর ও কাযার মধ্যকার পার্থক্য :

১. قَدْرٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ– ভাগ্য বা অদৃষ্ট আর قَضَاءٌ শব্দের অর্থ– ফয়সালা বা সিদ্ধান্ত।

২. আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির আদিতে সৃষ্টি জগতের যে চিত্র 'লওহে মাহফূজে' অঙ্কিত করে রেখেছে, তাই قَدْرٌ নামে আখ্যায়িত। আর সে চিত্রের আলোকে তা কার্যকর করার প্রক্রিয়ার নামই হচ্ছে قَضَاءٌ। যেমন– কোনো প্রকৌশলী প্রথমে গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে একটি নকশা তৈরি করেন. অতঃপর সে নকশার আলোকে গৃহ নির্মাণ কার্য সম্পাদন করে থাকেন।

এক কথায়, قَدْرٌ হলো বিশ্বজগত সম্পর্কিত নকশা, আর তা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করাকে قَضَاءٌ বলে।

مَعْنَى الْاِحْسَانِ ইহসানের অর্থ :

مَعْنَى الْاِحْسَانِ لُغَةً : اِحْسَانٌ শব্দটি حُسْنٌ মূলধাতু হতে নির্গত। শাব্দিক অর্থ হলো–

১. اَلتَّرَحُّمُ বা দয়া। যেমন– وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

২. اِجَادَةٌ বা সুন্দর করা। যথা– وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ

৩. فِعْلٌ جَيِّدٌ বা উত্তম কাজ করা। যেমন– لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ

৪. اَلْاِخْلَاصُ তথা নিষ্ঠার সাথে কাজ করা।

مَعْنَى الْاِحْسَانِ اِصْطِلَاحًا ইহসানের পারিভাষিক অর্থ : শরিয়তের পরিভাষায় اِحْسَانٌ হচ্ছে–

هُوَ اِصْلَاحُ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ وَالْعَمَلُ بِجَمِيْعِ شَرَائِطِهٖ وَاٰدَابِهٖ مَعَ الْخُشُوْعِ وَالْخُضُوْعِ .

অর্থাৎ প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য বিষয়াবলি সংশোধন করা এবং ভীত কম্পিত ও নম্রতার সাথে আমলের সব রকমের শর্ত ও শিষ্টাচারসহ কাজ সম্পাদন করা।

বস্তুত ইহসান বলতে ইখলাস ও একাগ্রতার সাথে আল্লাহর সমীপে উপস্থিত হওয়া তথা দুনিয়ার সমস্ত খেয়ালকে দূরীভূত করে আল্লাহকে হাজের ও নাজের জেনে ইবাদত করা। এ জন্য اِحْسَانٌ-এর পরিচয় সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন–

اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهٗ يَرَاكَ .

مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ দ্বারা উদ্দেশ্য : হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবে রাসূল ﷺ لَسْتُ بِاَعْلَمَ بِهَا বা مَا اَعْلَمُ بِهَا না বলে مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ এরূপ দীর্ঘ জবাব দেওয়ার কারণসমূহ নিম্নরূপ–

১. এর দ্বারা তিনি একথা বুঝিয়েছেন যে, কিয়ামত সম্পর্কে আমি যে জানি না শুধু এটা নয়; বরং যে কেউ জিজ্ঞাসিত হবে এবং যে জিজ্ঞাসা করবে উভয়ের অবস্থা একই। তা কখন সংঘটিত হবে কেউই জানে না।

২. অথবা, যেহেতু ইঙ্গিতমূলক বক্তব্য প্রকাশ্য বক্তব্যের তুলনায় অধিক মনোযোগ আকর্ষণ করে, তাই রাসূল ﷺ لَسْتُ بِاَعْلَمَ না বলে ইঙ্গিতমূলক বাক্য مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ বলেছেন। কেননা, صَرِيْحٌ-এর চেয়ে كِنَايَةٌ-এর গুরুত্ব অত্যধিক। পবিত্র কুরআনে এরূপ রয়েছে। যেমন– وَرَاوَدَتْهُ الَّتِىْ هُوَ فِىْ بَيْتِهَا

৩. অথবা, এর দ্বারা এটা বুঝানো হয়েছে যে, যেন মানুষ অহেতুক কিয়ামত সম্পর্কে কাউকে প্রশ্ন না করে।

৪. আল্লামা সিন্ধী (র.) বলেছেন, এভাবে উত্তর দিয়ে রাসূল ﷺ এটা বুঝিয়েছেন যে, কিয়ামত কখন হবে তা যে আমি জানি না শুধু তাই নয়, প্রশ্নকারী জিবরাঈল (আ.)ও তা জানেন না।

৫. অথবা, কালামের সৌন্দর্যের জন্য তিনি এরূপ জবাব প্রদান করেছেন।

وَجْهُ تَخْصِيْصِ رِعَاءِ الشَّاءِ ছাগল রক্ষকের কথা বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ : রাসূল ﷺ কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে মেষ রক্ষকের প্রাসাদ নির্মাণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো–

১. ছাগলের রক্ষক উটের রাখাল হতে অনেক দুর্বল হয়ে থাকে, তাই তার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

২. ফাতহুল বারীতে উল্লেখ আছে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নিঃস্ব ও রিক্তহস্তগণ। যেমন অন্য হাদীসে এসেছে–

يُحْشَرُ النَّاسُ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا –

"اَنْ تَلِدَ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا" -এর দ্বারা উদ্দেশ্য : হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসার জবাবে রাসূল ﷺ বলেছিলেন যে, اَنْ تَلِدَ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا অর্থাৎ দাসী তার মনিবকে প্রসব করবে। এর দ্বারা কি উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে এ ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন। যথা–

১. আল্লামা আইনী (র.)-এর মতে, যুদ্ধে বিপুল সংখ্যক নারী দাসী হয়ে আসবে এবং মালিকের সহবাসে সন্তান প্রসব করবে। এরপর মালিকের মৃত্যুর পর সে সন্তান এ মালিকের স্থলাভিষিক্ত হয়ে প্রভুর মতো মাকে ব্যবহার করবে।
২. অথবা, এটা দ্বারা অধিক মাত্রায় পিতামাতাকে কষ্ট দান বুঝিয়েছেন, অর্থাৎ যখন পিতামাতার নাফরমানী অধিক দেখবে মনে করবে যে, কিয়ামত নিকটবর্তী।
৩. যে দাসীর গর্ভে সন্তান জন্মায় সে দাসী আর দাসী থাকে না; বরং সন্তানের কারণে সে দাসত্ব হতে মুক্তি পায়। আর সন্তান যেহেতু দাসী স্বাধীন হওয়ার কারণ; এ হিসেবে সে মায়ের নেতা হলো।
৪. অথবা, তা দ্বারা ব্যাপক মূর্খতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, অর্থাৎ যখন দেখবে মানুষের মূর্খতার পরিমাণ সীমা ছেড়ে গিয়েছে তখন মনে করবে যে, কিয়ামত নিকটবর্তী।
৫. অথবা, তা দ্বারা দাসীর সন্তানের রাজত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যাতে তার মাতা প্রজার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। কাজেই সন্তান নেতা হবে।
৬. যে দাসীর গর্ভে সন্তান জন্মায় সে দাসীকে বলা হয় 'উম্মে ওয়ালাদ'। ইসলামি শরিয়ত মতে, উম্মে ওয়ালাদের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ। তবে কিয়ামতের পূর্বে এমন এক সময় আসবে, যখন ব্যাপকভাবে উম্মে ওয়ালাদ ক্রয়-বিক্রয় হতে থাকবে। তাতে একদিন সন্তানের হাতে মা এসে যাবে, আর সন্তান তার নেতা হবে।
৭. অথবা, এটা দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, পৃথিবীর রীতি-নীতি পরিবর্তন হয়ে যাবে। শরীফ, সম্ভ্রান্ত ও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির কোনো মর্যাদা থাকবে না। নিকৃষ্ট ও মূর্খ লোকেরা মর্যাদার দাবিদার হবে। অনুপযুক্ত ব্যক্তির হাতে সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষমতা চলে আসবে। এক কথায় পৃথিবীর সর্বত্র অরাজকতা, অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করবে।
৮. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) বলেছেন, এর দ্বারা রাসূলের অপর বাণী– إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ -এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَجْهُ إِطْلَاقِ رَبَّةٍ دُوْنَ رَبّ : رَبٌّ ব্যবহার না করে رَبَّةٌ তথা স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার করার কারণ :

১. رَبَّةٌ-কে স্ত্রীলিঙ্গ নেওয়ার কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলার সম্মান ও মহত্ত্বের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা, যাতে আল্লাহ তা'আলার নামের সাথে সাদৃশ্য ও অংশীদারিত্ব প্রমাণিত না হয়। যদিও رَبٌّ শব্দটি إِضَافَةٌ-এর সময় আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উপর ব্যবহৃত হয়।
২. অথবা, এখানে "ة" টি مُبَالَغَةٌ -এর জন্য এনে رَبَّةٌ করা হয়েছে। তখন অর্থ হবে– যখন দাস কোনো মহিলা মনিবের এবং সন্তান মাতার নাফরমানী করবে তখন তারা সহজভাবেই মনিব অথবা পিতার নাফরমানী করবে। এটা কিয়ামতের আলামত।

مَرْجِعُ الضَّمِيْرِ فِيْ قَوْلِهِ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَفَخِذَيْهِ : উক্ত হাদীসে رُكْبَتَيْهِ ও فَخِذَيْهِ-এর ضَمِيْر-এর প্রত্যাবর্তন স্থল : فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ -এর মধ্যে প্রথম رُكْبَتَيْهِ-এর যমীর হযরত জিব্রাঈল (আ.)-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। আর إِلَى رُكْبَتَيْهِ-এর যমীর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। এর অর্থ হবে হযরত জিব্রাঈল (আ.) তাঁর দুই হাঁটুকে রাসূল ﷺ-এর হাঁটুর দিকে ফিরিয়ে অত্যন্ত আদবের সাথে বসেছিলেন। এর দ্বারা হযরত জিব্রাঈল (আ.)-এর উদ্দেশ্য ছিল এটা শিক্ষা দেওয়া যে, শিক্ষকের সামনে এভাবে বসতে হয়।

আর وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ-এর উভয় যমীর জিব্রাঈল (আ.)-এর দিকে প্রত্যাবর্তিত, যা অধিক আদবের প্রমাণ বহন করে। অথবা, فَخِذَيْهِ-এর যমীর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে প্রত্যাবর্তিত, তখন অর্থ হবে লোকটি নিজের হস্তদ্বয় রাসূলুল্লাহর রানের উপর রেখেছেন। উদ্দেশ্য হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নিজের দিকে ভালোভাবে মনোযোগী করা। নাসাঈর এক রিওয়ায়াতে এ মতেরই সমর্থন পাওয়া যায়।

تَعْلِيْمُ الْحَدِيْثِ وَتَنْفِيْذِهِ الْإِسْتِخْدَامِيْ হাদীসটির শিক্ষা ও বাস্তব প্রয়োগ : হযরত ওমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীসটি দ্বারা আমরা জানতে পারি যে, একজন ছাত্রকে কিভাবে তার ওস্তাদের নিকট বসতে হয় এবং কোন পদ্ধতিতে প্রশ্ন করতে হয়। এর দ্বারা আরো অবহিত হতে পারি যে, দীনের মৌলিক বিষয়গুলোর সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি কি ? এবং মহাপ্রলয়ের নির্দিষ্ট সময় আল্লাহর নিকটই রয়েছে এ বিষয়ে অন্য কেউ বিন্দুমাত্রও অবহিত নয়। তবে এর কিছু পূর্ব লক্ষণ রয়েছে যার আংশিক বিষয় হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

সুতরাং আমাদের বাস্তব জীবনেও এ হাদীসের গুরুত্ব অনেক বেশি। শিক্ষকের নিকট কিভাবে বসতে ও প্রশ্ন করতে হবে তা এখান থেকে শিখতে হবে। আর ঈমান, ইসলাম, ইহসান ইত্যাদি বিষয়াবলি অনুযায়ী মানবজীবন গড়তে হবে, কিয়ামত সম্পর্কে পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে, আর নিজেকে আল্লাহমুখি করতে যথাসাধ্য চেষ্টা চালাতে হবে।

وَعَنْ ٢ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ وَاِقَامُ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءُ الزَّكٰوةِ وَالْحَجُّ وَصَوْمُ رَمَضَانَ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত। আর সেগুলো হচ্ছে- ১. এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রভু নেই। আর হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল, ২. নামাজ প্রতিষ্ঠা করা, ৩. জাকাত প্রদান করা, ৪. হজ করা এবং ৫. রমজান মাসে রোজা রাখা। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীসে ইসলামি জীবন ব্যবস্থা যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এগুলোকে ভিত্তি বা খুঁটির সাথে তুলনা করা হয়েছে। বস্তুত ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার নাম। যে জীবন ব্যবস্থাটি একটি মজবুত অট্টালিকাস্বরূপ। আর এ অট্টালিকাটি পাঁচটি খুঁটি বা স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান রয়েছে। খুঁটি বা স্তম্ভ ব্যতীত যেমনি কোনো বিল্ডিংয়ের কল্পনা করা যায় না, তেমনি এ পাঁচটি বিষয়ের কোনো একটিকে বাদ দিয়ে ইসলামের কল্পনাও করা যেতে পারে না। এ খুঁটিগুলোকে কেন্দ্র করেই গোটা ইসলামি জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত।

سَبَبُ وُرُوْدِ الْحَدِيْثِ **হাদীস বর্ণনার প্রেক্ষাপট :** কোনো ব্যক্তি ঈমান গ্রহণের পর সে যেসব বিষয়ের সম্মুখীন হয় তা হলো ইসলামের ভিত্তিসমূহ। অর্থাৎ কোন কোন মূল কাঠামোর উপর ইসলাম নির্ভরশীল, তা জানা প্রতিটি মু'মিন ব্যক্তির জন্য একান্ত আবশ্যক। এ সমস্যার সমাধান কল্পেই রাসূলে করীম ﷺ আলোচ্য হাদীসটি ইরশাদ করেছেন। এতে বলা হয়েছে যে, ঈমান তথা গোটা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রাসাদটি পাঁচটি স্তম্ভের ওপর নির্ভরশীল, আর সেগুলো হল- ১. কালিমা, ২. নামাজ, ৩. জাকাত, ৪. হজ ও ৫. রোজা।

هَلِ الْاِسْلَامُ مُنْحَصِرٌ فِى الْاَرْكَانِ الْخَمْسِ الْمَذْكُوْرَةِ **ইসলাম উল্লিখিত পঞ্চ আরকানে সীমিত কিনা ? :** ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ আনুগত্যের নামই হলো ইসলাম। তা ইবাদত বা মু'আমালাত হোক কিংবা মু'আশারাত হোক। এ হিসেবে ইসলাম একটি ব্যাপকার্থক। তথাপিও একে পঞ্চ আরকানে সীমিত করা হয়েছে। এর কারণ হলো- ১. কোনো ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ হয়তো মৌখিকভাবে করবে, আর তারই প্রতীক হলো তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করা। ২. কিংবা সে আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ কর্মের মাধ্যমে ঘটাবে, আর তারই প্রতীক হলো নামাজ। ৩. অথবা তা অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন করবে ; আর তা হলো জাকাত ও হজ। ৪. কিংবা সে তার আনুগত্য প্রমাণ করার জন্য নির্দিষ্ট কর্ম হতে বিরত থাকবে, আর তারই প্রতীক হলো রোজা। বান্দা এ পাঁচটি উপায়েই কেবল মহান আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ করতে পারে ; এ জন্য ইসলামকে এই পঞ্চ স্তম্ভে সীমিত করা হয়েছে।

اِقَامَةُ الصَّلٰوةِ**-এর অর্থ :** মুহাদ্দিসগণ اِقَامَةُ الصَّلٰوةِ-এর কয়েকটি ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন, যা নিম্নরূপ-

১. নামাজের শর্ত, রোকন, সুন্নত, মোস্তাহাব ইত্যাদিসহ যথাযথভাবে নামাজ আদায় করাকে اِقَامَةُ الصَّلٰوةِ বলা হয়।

২. অথবা, اِقَامَةُ الصَّلٰوةِ দ্বারা নিয়মিত নামাজ আদায় করাকে বুঝানো হয়েছে।

৩. অথবা, একনিষ্ঠভাবে নামাজ আদায়ের জন্য এমনভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করা যাতে ছুটে না যায়।

৪. কারো মতে, জামাতের সাথে নামাজ আদায় করাকে اِقَامَةُ الصَّلٰوةِ বলে।

عِقَابُ تَارِكِ الصَّلٰوةِ **নামাজ ত্যাগকারীর শাস্তি :** ১. হাম্বলী মাযহাবের ফতোয়া মতে ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ ত্যাগকারীকে তিনদিন পর্যন্ত সুযোগ দিয়ে তাকে বুঝাতে হবে। এতে যদি সে নামাজের প্রতি যত্নবান না হয়, তাহলে তাকে কাফির হিসেবে হত্যা করতে হবে। এটা কিছু সংখ্যক মালেকীদেরও অভিমত।

২. ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.)-এর মতে, তাকে কাফির হিসেবে নয়, বরং নামাজ ত্যাগকারী হিসেবে হত্যা করতে হবে।

৩. ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, তাকে এমনভাবে প্রহার করবে, যাতে তার শরীর হতে রক্ত প্রবাহিত হয়।

[ফয়যুল বারী ও ফাতহুল মুলহিম]

تَعْلِيْمُ الْحَدِيْثِ وَتَنْفِيْذُهُ الْاِسْتِخْدَامِيْ হাদীসটির শিক্ষা ও বাস্তব প্রয়োগ : একজন মুসলমান হিসেবে ইসলামের এ পাঁচটি ভিত্তিকে একাগ্রচিত্তে মেনে নিতে হবে এবং ইসলামের অন্যান্য সকল হুকুম-আহকামও মেনে চলতে হবে। এ পাঁচটি ভিত্তিকেই যথেষ্ট মনে করা যাবে না ; বরং অন্যান্য সকল বিধি-বিধানও অম্লান বদনে মেনে নিতে হবে। একত্ববাদ ও নবীর রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করে নামাজ, রোজা, হজ, জাকাতসহ সকল আনুষ্ঠানিক ইবাদতসমূহকে পালনের মাধ্যমে ইসলামের ভিত্তিমূলকে সুদৃঢ় করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে হবে। কেননা, অন্যান্য আহকাম বাদ দিয়ে শুধু এ পাঁচটি স্তম্ভকে ধরে রাখলে এগুলোও এক সময় লোপ পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে।

وَعَنْ ـ٣ـ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُوْنَ شُعْبَةً فَاَفْضَلُهَا قَوْلُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَدْنٰهَا اِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩. **অনুবাদ** : আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন–ঈমানের সত্তরটিরও বেশি শাখা-প্রশাখা রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম শাখা হচ্ছে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা। [তথা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করা] আর সর্বনিম্ন শাখা হচ্ছে পথের মধ্য হতে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করে দেওয়া এবং লজ্জা হলো ঈমানের একটি [গুরুত্বপূর্ণ] শাখা বিশেষ।–[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে মহানবী ﷺ ইসলামের সর্বোত্তম শাখা হিসেবে কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুকে ঘোষণা করেছেন। অর্থাৎ এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো প্রভু নেই। এটা মনে-প্রাণে বিশ্বাস স্থাপন করা। আর ঈমানের সর্বনিম্ন শাখা হচ্ছে– মানুষের চলাচলের পথ হতে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া। এখানে ঈমানের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন শাখার কথা বলা হয়েছে। এ দুই শাখার মধ্যবর্তী যত ভালো কাজ রয়েছে তাও ঈমানের শাখা-প্রশাখা। আর লজ্জাবোধও ঈমানের একটি অন্যতম শাখা। এর মাধ্যমে মানুষ প্রকৃত বান্দা হিসেবে পরিগণিত হয়। কেননা, লজ্জা না থাকলে মানুষ যা ইচ্ছা তাই করতে পারে।

مَعْنَى الْبِضْعِ : بِضْعٌ-এর অর্থ :

مَعْنَى الْبِضْعِ لُغَةً : بِضْعٌ শব্দটি بَضَاعَةٌ থেকে নির্গত। শাব্দিক অর্থ হচ্ছে– قِطْعَةٌ مِنَ الشَّئْ অর্থাৎ কোনো কিছুর টুকরা। অতঃপর শব্দটিকে عَدَدٌ বা সংখ্যা বুঝাবার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

مَعْنَى الْبِضْعِ اِصْطِلَاحًا : بِضْعٌ-এর পারিভাষিক পরিচয় নিয়ে ইমামদের মাঝে অনেক মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

১. ইমাম খলীলের মতে, بِضْعٌ অর্থ– সাত। যেমন কুরআনে এসেছে– فَلَبِثَ فِى السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ اَىْ سَبْعَ سِنِيْنَ অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ.) কারাগারে ৭ বৎসর অবস্থান করেন।
২. হযরত কাতাদাহ (র.) ও আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন– اَلْبِضْعُ مِنَ الثَّلَاثِ اِلَى التِّسْعِ অর্থাৎ তিন থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যাকে بِضْعٌ বলে।
৩. ইমাম মাতুরীদি বলেন– اَلْبِضْعُ مِنْ بَيْنِ الْاَرْبَعِ اِلَى التِّسْعِ অর্থাৎ ৪ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যাই হলো– بِضْعٌ।
৪. ইমাম ফাররা বলেন, সাধারণত তিন থেকে নয় পর্যন্ত বেজোড় সংখ্যার উপর بِضْعٌ শব্দটি প্রয়োগ হয়।
৫. কারো মতে, এক থেকে বার পর্যন্ত সংখ্যা হলো– بِضْعٌ তবে এ হাদীসে بِضْعٌ দ্বারা নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা উদ্দেশ্য নয়, বরং সংখ্যাধিক্যই উদ্দেশ্য।

مَعْنَى الْحَيَاءِ হায়া-এর অর্থ :

مَعْنَى الْحَيَاءِ لُغَةً : حَيَاءٌ শব্দটি حَيٰوةٌ থেকে নির্গত। এর শাব্দিক অর্থ হলো– ১. اَلتَّغَيُّرُ পরিবর্তন হওয়া, ২. اَلْاِنْكِسَارُ নম্রতা, ৩. اَلْاِسْتِحْيَاءُ লজ্জা করা, ৪. اَلْاِنْقِبَاضُ সংকোচবোধ করা, ৫. اَلْخَجَلُ লজ্জিত হওয়া।

مَعْنَى الْحَيَاءِ اِصْطِلَاحًا :

১. ইমাম রাগেব (র.) বলেন– هُوَ اِنْقِبَاضُ النَّفْسِ مِنَ الْقَبِيْحِ অর্থাৎ মন্দকর্ম হতে অন্তরের সংকোচবোধ করা।
২. আল্লামা আইনী (র.) বলেন– اَلْحَيَاءُ هُوَ اِنْحِصَارُ النَّفْسِ خَوْفَ اِرْتِكَابِ الْقَبَائِحِ অর্থাৎ মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় আত্মাকে দমন করাই হলো হায়া।

৩. ইমাম বায়যাবী (র.) বলেন– هُوَ انْقِبَاضُ النَّفْسِ عَنِ الْقَبَائِحِ مَخَافَةَ الذَّمِّ

৪. কারো মতে– اَلْحَيَاءُ اِنْقِبَاضُ النَّفْسِ عَمَّا لَا يَلِيْقُ بِشَانِهَا

৫. কেউ কেউ বলেন– هُوَ انْقِبَاضُ النَّفْسِ لِخَوْفِ اِرْتِكَابِ مَا يَكْرَهُ

৬. জুনাইদ বাগদাদী (র.) বলেন– اَلْحَيَاءُ هُوَ الْحَالَةُ الَّتِىْ تَحْدُثُ فِىْ قُلُوْبِنَا بَعْدَ رُؤْيَةِ نِعَمِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَضُعْفِنَا

وَجْهُ تَخْصِيْصِ الْحَيَاءِ بِالذِّكْرِ হায়াকে বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ : হায়াকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণসমূহ নিম্নরূপ–

১. আল্লামা তীবী (র.) বলেন– اَفْرَدَ الْحَيَاءَ بِالذِّكْرِ لِاَنَّ بَيْنَ الْحَيَاءِ وَالْاِيْمَانِ تَعَلُّقٌ عَمِيْقٌ অর্থাৎ হায়ার সাথে ঈমানের গভীর সম্পর্ক রয়েছে বিধায় حَيَاءٌ-কে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

২. কারো মতে, ঈমানের পরিপূর্ণতার জন্য حَيَاءٌ অতীব প্রয়োজনীয়, তাই একে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

৩. অথবা, যেহেতু লজ্জা সৃষ্টিগত ও অভ্যাসগত ব্যাপার। এটা মন হতে গাফেল হতে পারে, তাই একে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।— (كَمَا فِىْ فَيْضِ الْبَارِىْ)

৪. অথবা, যেহেতু লজ্জা অভ্যাসগতভাবে সৎকর্মের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে আর অসৎকর্ম থেকে নিষেধ করে সেহেতু একে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।— (كَمَا فِىْ فَتْحِ الْمُلْهِمِ وَالتَّعْلِيْقِ)

৫. অথবা, حَيَاءٌ মানুষকে পাপ হতে বিরত রাখে, যেমন ঈমান পাপ থেকে বিরত রাখে। এ জন্য حَيَاءٌ-কে ঈমানের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে।— (كَمَا فِىْ فَتْحِ الْبَارِىْ)

৬. অথবা, রাসূল ﷺ ছিলেন আধ্যাত্মিক ব্যাধির চিকিৎসক। যে সময় তিনি اُمُوْرِ اِيْمَانْ-এর বর্ণনা দিচ্ছিলেন তখন উপস্থিত কারো মাঝে حَيَاءٌ-এর অভাব প্রত্যক্ষ করেছেন, তাই তিনি اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْاِيْمَانِ বলেছেন।

اَقْسَامُ الْحَيَاءِ হায়ার প্রকারভেদ : فَتْحُ الْمُلْهِمِ গ্রন্থকারের মতে, حَيَاءٌ বা লজ্জা প্রথমত তিন প্রকার। যথা–

১. حَيَاءٌ شَرْعِىٌّ যার অভাবে মানুষ ফাসিক হয়। ২. حَيَاءٌ عَقْلِىٌّ যার অভাবে মানুষ পাগল হয়ে পড়ে। ৩. حَيَاءٌ عُرْفِىٌّ যার অভাবে মানুষ বিবেক-বুদ্ধিহীন হয়ে পড়ে।

তারপর حَيَاءٌ আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা– ১. حَيَاءٌ وَاجِبٌ এটা হারামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ২. حَيَاءٌ مَنْدُوْبٌ এটা মাকরূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। ৩. حَيَاءٌ عُرْفِىٌّ এটা মুবাহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।— (كَمَا فِىْ فَتْحِ الْمُلْهِمِ)

كَمْ وَجْهًا لِلْحَيَاءِ 'হায়া'-এর ধরন কয়টি : حَيَاءٌ-এর ধরন মোট সাতটি। যথা–

১. حَيَاءُ الْجِنَايَةِ যেমন– আদম (আ.)-এর حَيَاءٌ

২. حَيَاءُ التَّقْصِيْرِ যেমন– ফেরেশতাদের হায়া। কেননা, তারা বলেন– يَقُوْلُوْنَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ

৩. حَيَاءُ الْاِجْلَالِ যেমন– ইসরাফীল (আ.) কর্তৃক আল্লাহ তা'আলার সামনে লজ্জাবনত হয়ে ডানাকে নিচু করা।

৪. حَيَاءُ الْكَرَمِ যেমন– নবী করীম ﷺ তাঁর উম্মতকে তাঁর ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়ার কথা বলতে লজ্জাবোধ করতেন।

৫. حَيَاءُ الْحِشْمَةِ যেমন– হযরত আলী (রা.) নবী ﷺ-এর নিকট মযীর হুকুম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে حَيَاءٌ করেছেন।

৬. حَيَاءُ الْاِسْتِحْقَارِ যেমন–হযরত মূসা (আ.) দুনিয়াবী কোনো বিষয় নিয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট আবেদন করতে লজ্জাবোধ করতেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বলেন, سَلْنِىْ حَتّٰى مِلْحَ عَجِيْنِكَ وَعَلَفَ شَاتِكَ অর্থাৎ তুমি আমার কাছে তোমার প্রয়োজন পূরনের জন্য প্রার্থনা কর, এমনকি যদি তা তোমার আটায় ব্যবহারের লবন বা তোমার বকরির ঘাসের ন্যায় অতি নগণ্য জিনিসও হয় তবু তুমি আমার কাছে চাও।

৭. حَيَاءُ الْاِنْعَامِ যেমন–হাশরের দিন বান্দগণের পুলসিরাত অতিক্রম করার পর লজ্জাবশত তাদের কৃতকর্ম প্রকাশ না করে একটি বন্ধ চিঠিতে তাকে ক্ষমার ঘোষণা দিয়ে দেবেন।

اَلْمُرَادُ بِشُعْبَةٍ : شُعْبَةٌ শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো– গাছের ডাল (غُصْنُ الشَّجَرِ) অর্থাৎ কোনো মূল বস্তুর শাখা-প্রশাখা। অতএব ঈমান হলো বহু শাখা বিশিষ্ট একটি সতেজ গাছের তুল্য। আ'মালগুলো হলো শাখাস্বরূপ। ঈমান এমন গাছ নয় যে, তার কোনো শাখা ধ্বংস বা কেটে গেলে মূলই ধ্বংস হয়ে যাবে ; বরং শাখা ছাড়াও ঈমান নামক গাছটি অবশিষ্ট থাকে। কেননা, ঈমান হলো (اَلتَّصْدِيْقُ الْبَسِيْطُ) একক আন্তরিক বিশ্বাস। (كَمَا فِى الْفَتْحِ وَالْفَيْضِ الْبَارِىْ)

اَلتَّطْبِيْقُ بَيْنَ سَبْعُوْنَ وَسِتُّوْنَ : سِتُّوْنَ ও سَبْعُوْنَ-এর মধ্যে সামঞ্জস্য : উক্ত হাদীসে ঈমানের সত্তরটি শাখা বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে বুখারী শরীফে ষাটটির কথা উল্লিখিত হয়েছে। এ দু'য়ের মধ্যে যে ব্যবধান পরিলক্ষিত হয় তার সমাধান নিম্নরূপ–

১. فَتْحُ الْمُلْهِمْ গ্রন্থকারের মতে, عَدَدٌ قَلِيْلٌ তথা স্বল্প সংখ্যা عَدَدٌ كَثِيْرٌ তথা অধিক সংখ্যার বিপরীত নয়।

২. আল্লামা তীবী (র.) বলেন, প্রথমে নবী করীম ﷺ ৬০-এর সংবাদ দিয়েছেন, এরপর ওহীর মাধ্যমে আরও বেশি সম্পর্কে অবগতির পর ৭০-এর সংবাদ প্রদান করেছেন। কেননা, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى

৩. কাজী ইয়ায (র.) বলেন, সত্তরের বর্ণনাটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ বলে মনে হয়।

৪. ইমাম আবূ হাতিম (র.) বলেন, ঈমানের শাখা মোট সত্তরের চেয়ে কিছু বেশি। আর কখনো রাসূল ﷺ সব শাখা উদ্দেশ্য না করে بِضْعٌ وَّ سِتُّوْنَ বলেছেন।

৫. অথবা, রাসূল ﷺ بِضْعٌ وَّ سَبْعُوْنَ-ই বলেছেন ; কিন্তু বর্ণনাকারীর শ্রুতিভ্রম হয়েছে, ফলে بِضْعٌ وَّسِتُّوْنَ বলেছেন।

৬. অথবা, ৬০-এর হাদীসটি পূর্বের আর ৭০-এর হাদীসটি পরের। তাই পূর্বের হাদীসখানা পরের হাদীস দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে।

৭. কিছু সংখ্যকের মতে ৬০ বা ৭০ বুঝানো উদ্দেশ্য নয় ; বরং অগণিত সংখ্যা বুঝানোই উদ্দেশ্য।

৮. ইমাম আবূ হাতিম ইবনে হাব্বান (র.) বলেন, قُرْاٰن ও حَدِيْث -এ যেসব বিষয়কে ঈমানের শাখা বলা হয়েছে তা بِضْعٌ وَّ سَبْعُوْنَ এ থেকে বেশি বা কম নয়, তাই بِضْعٌ وَّ سَبْعُوْنَ -এর হাদীসই বিশুদ্ধ।

حَيَاةُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর জীবনী :

১. **পরিচিতি :** সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী, আহলে সুফফার অন্যতম সদস্য এবং রাসূল ﷺ-এর নিত্য সঙ্গী হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)।

২. **নাম নিয়ে মতান্তর :** তাঁর নাম সম্পর্কে ৪০টিরও বেশি মতামত পাওয়া যায়। ইসলাম-পূর্ব যুগের কয়েকটি প্রসিদ্ধ নাম হচ্ছে– (১) عَبْدُ الشَّمْسِ , (২) عَبْدُ عَمْرٍو , (৩) عَبْدُ اللَّاتِ , (৪) عَبْدُ الْعُزّٰى ইত্যাদি।
আর ইসলাম পরবর্তী কয়েকটি নাম হলো– (১) عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ صَخْرٍ , (২) عُمَيْرُ بْنُ عَامِرٍ , (৩) عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَخْرٍ ইত্যাদি। তবে اَبُوْ هُرَيْرَةَ উপনামেই তিনি সর্বাধিক খ্যাতি।

৩. **জন্ম ও বংশ পরিচয় :** তাঁর পিতার নাম সখর, আর মাতার নাম উম্মিয়া বিনতে সাফিয়াহ। তিনি বিখ্যাত দাউসী গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। এ জন্য তাঁকে দাউসী বলা হয়। তবে তাঁর জন্ম তারিখ সঠিকভাবে জানা যায়নি।

৪. **ইসলাম গ্রহণ :** তিনি ৩২৯ খ্রিস্টাব্দে ৭ম হিজরিতে খায়বার যুদ্ধের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন।

৫. **আবূ হুরায়রা নামে প্রসিদ্ধির কারণ :** তিনি একদা একটি বিড়াল ছানা জামার আস্তিনে নিয়ে রাসূল ﷺ-এর দরবারে আগমন করেন। হঠাৎ বিড়ালটি সকলের সামনে বেরিয়ে পড়ে। রাসূল ﷺ এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে রসিকতা করে তাকে "يَا اَبَا هُرَيْرَةَ" 'হে বিড়াল ছানার বাপ' বলে ডাকেন। ফলে তিনি এ নামকে অত্যধিক পছন্দ করেন। আর তখন থেকেই তিনি এ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

৬. **তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা :** আল্লামা বদরুদ্দীন আইনীর মতে, তিনি ৫৩৭৪টি হাদীস বর্ণনা করেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে যৌথভাবে বর্ণিত হয়েছে ৩২৫টি। এককভাবে বুখারীতে ৭৯টি, আর মুসলিমে ৯৩টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৭. **মৃত্যু :** তিনি মতান্তরে ৫৭ বা ৫৮ বা ৫৯ হিজরিতে মদীনার অদূরে 'কাসবা' নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। হযরত ওয়ালীদ ইবনে ওকবা তাঁর নামাজে জানাযা পড়ান এবং মদীনার জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

اِعْرَابُ لَفْظِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ বা اَبُوْ هُرَيْرَةَ শব্দের ই'রাব : اَبُوْ هُرَيْرَةَ শব্দটি اَبُوْ ও هُرَيْرَةَ এ দু'টি শব্দ দ্বারা গঠিত। اَبُوْ টি اَسْمَاءُ سِتَّةٌ مُكَبَّرَةٌ যা مُنْصَرِفٌ আর هُرَيْرَةٌ শব্দটি هِرَّةٌ-এর تَصْغِيْر এটিও مُنْصَرِفٌ তবে হাদীস বিশারদদের একটি দল اَبُوْ هُرَيْرَة শব্দটিকে একটি শব্দ স্থির করে غَيْرُ مُنْصَرِفٌ পড়ে থাকেন। এতে দু'টি سَبَبٌ হলো عَلَمٌ ও تَاءُ تَانِيْث।

"اَلْمُرَادُ بِقَوْلِهِ "مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ মুত্তাফাকুন আলাই-এর দ্বারা উদ্দেশ্য : مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ দ্বারা সে হাদীসকে বুঝানো হয়, যা ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়েই সংকলন করেছেন। কারো মতে একই বর্ণনাকারী হতে একই শব্দসমূহে হওয়া আবশ্যক।

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ . هٰذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَلِمُسْلِمٍ قَالَ اِنَّ رَجُلاً سَاَلَ النَّبِيَّ ﷺ اَيُّ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرٌ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ -

৪. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– সে-ই [প্রকৃত] মুসলমান ; যার হাত ও জবান হতে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে। আর [প্রকৃত] মুহাজির সে ব্যক্তি যে আল্লাহ তা'আলা যা নিষেধ করেছেন তা পরিহার করে চলে। এটা ইমাম বুখারীর বর্ণনা। আর ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলেন [হে আল্লাহর রাসূল] মুসলমানদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি কে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যার জবান ও হাত হতে মুসলমানগণ নিরাপদ রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ প্রকৃত মুসলমান ও প্রকৃত মুহাজিরের পরিচয় তুলে ধরেছেন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুসলিম ও মুহাজিরের সংখ্যা অসংখ্য; কিন্তু আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য মুসলমান ও মুহাজিরের পরিচয় রাসূলের জবানিতে প্রকাশ পেয়েছে। অর্থাৎ যার কথাবার্তা ও হাত তথা সর্বাঙ্গ দ্বারা কষ্ট দেওয়া হতে মুসলমানগণ রক্ষা পায় ; তাকেই প্রকৃত মুসলমান বলে। আর যে আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ কার্যসমূহকে সর্বাবস্থায় পরিহার করে চলে সেই হলো প্রকৃত মুহাজির। وَ قَالَ الْخَطَّابِيُّ اَفْضَلُ الْمُسْلِمِيْنَ مَنْ اَدّٰى حُقُوْقَ الْمُسْلِمِيْنَ مَعَ اَدَاءِ حُقُوْقِ اللّٰهِ وَ اَفْضَلُ الْمُهَاجِرِ مَنْ تَرَكَ وَطَنَهٗ مَعَ تَرْكِ الْمُحَرَّمَاتِ .

سَبَبُ تَخْصِيْصِ اللِّسَانِ وَالْيَدِ হাত ও জবানকে বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ : আলোচ্য হাদীসে মানবতার মহান শিক্ষক হযরত মুহাম্মদ ﷺ مُسْلِمْ كَامِلْ -এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় মুখের ভাষা ও হাত সংবরণ করাকে বিশেষিত করার যৌক্তিকতা সম্পর্কে مُحَدِّثِيْنِ كِرَامْ থেকে নিম্নরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

১. ব্যক্তিগত জীবনে মানুষ বেশির ভাগ কাজই এ দু'টি অঙ্গ দ্বারা সিদ্ধ করে থাকে, তাই এ দু'টি অঙ্গ সংযত রাখার কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

২. অথবা, যেহেতু মানুষের সার্বিক আচরণ এতদুভয় অঙ্গ দ্বারাই প্রকাশিত হয়, তাই বিশেষভাবে এ দু'টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. অথবা, অধিকাংশ সময় অপরের কল্যাণ বা অকল্যাণ করার ক্ষেত্রে এ দু'টি অঙ্গই মানুষের প্রধান হাতিয়ার হয়ে থাকে, তাই বিশেষভাবে এ দু'টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. অথবা, যেহেতু মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুখের ভাষা ও হাত দ্বারাই অপরকে কষ্ট দিয়ে থাকে, তাই এ দু'টি অঙ্গকে সংযত রাখার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

اِيْذَاءُ اللِّسَانِ -এর অর্থ এবং একে পূর্বে আনার কারণ : মুখ দ্বারা কষ্ট দেওয়ার অর্থ হলো গালমন্দ করা, অভিসম্পাত করা, অপবাদ দেওয়া, দোষ-ত্রুটি বলে বেড়ানো, চোগলখুরি করা ইত্যাদি।

উক্ত হাদীসে لِسَانْ -কে يَدْ -এর পূর্বে উল্লেখ করার কয়েকটি কারণ নিম্নে প্রদত্ত হলো–

১. অন্যকে কষ্ট দেওয়ার কাজটা বেশির ভাগ মুখ দ্বারাই হয়ে থাকে।

২. মুখ দ্বারা অন্যকে কষ্ট দেওয়া অত্যধিক সহজ।

৩. মুখ দ্বারা জীবিত, মৃত, উঁচু, নিচু সকলকে কষ্ট দেওয়া যায়।

৪.হাতের চেয়ে ও মুখ দ্বারা অধিক কষ্ট দেওয়া যায়। যেমন কবি বলেন–

جَرَاحَاتُ السِّنَانِ لَهَا الْتِيَامُ * وَلَا يَلْتَامُ مَاجَرَحَ اللِّسَانُ

مَعْنَى الْهِجْرَةِ وَمَرَاتِبُهَا হিজরতের অর্থ ও স্তর :

مَعْنَى الْهِجْرَةِ لُغَةً : هِجْرَةٌ শব্দটি বাবে **نَصَرَ**-এর মাসদার। এর শাব্দিক অর্থ হলো–

১. **اَلتَّرْكُ** পরিত্যাগ করা। যেমন, কুরআনে এসেছে– **وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ**

২. **قَطْعُ الصِّلَةِ** সম্পর্কচ্ছেদ করা। যথা– **قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَايَنْبَغِيْ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ**

৩. **تَرْكُ الْوَطَنِ** দেশ ত্যাগ করা। যথা– **قَوْلُهُ تَعَالٰى : اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا**

مَعْنَى الْهِجْرَةِ اِصْطِلَاحًا :

১. **اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْطُ** গ্রন্থকারের মতে– **هِيَ الْخُرُوْجُ مِنْ اَرْضٍ اِلٰى اَرْضٍ اُخْرٰى**

২. কারো মতে– **هُوَ الْاِنْتِقَالُ مِنْ دَارِ الْكُفْرِ اِلٰى دَارِ الْاَمَانِ**

বস্তুত এখানে **اَلْمُهَاجِرُ**-এর মধ্যে **اَلِفْ لَامْ جِنْسِىْ** হওয়াতে দু'রকম হিজরত উদ্দেশ্য।

ক. **ظَاهِرِىْ** তথা– **هِيَ الْفِرَارُ بِالدِّيْنِ مِنَ الْفِتَنِ**

খ. **بَاطِنِىْ** অর্থাৎ **هِيَ تَرْكُ مَا تَدْعُوْ اِلَيْهِ النَّفْسُ الْاَمَّارَةُ وَالشَّيْطَانُ**

হিজরতের স্তর : হিজরতের স্তর মোট পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা– ১. মক্কা হতে আবিসিনিয়ায় হিজরত। ২. মক্কা হতে মদীনায় হিজরত। ৩. রাসূল ﷺ-এর দিকে অন্যান্য গোত্রসমূহের হিজরত। ৪. মক্কার ইসলাম গ্রহণকারীদের হিজরত। ৫. আল্লাহর নিষেধাজ্ঞাসমূহ পরিহার করার হিজরত।

এ ছাড়া হিজরতের আরো কয়েকটি স্তর রয়েছে। যথা– ১. **دَارُ الْكُفْرِ** হতে **دَارُ الْاِسْلَامِ** এ হিজরত। ২. **دَارُ الْخَوْفِ** হতে **دَارُ الْاَمَانِ**-এর দিকে হিজরত। ৩. ফিতনা-ফ্যাসাদের সময় এক দেশ হতে অন্য দেশে হিজরত।

اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْاَحَادِيْثِ হাদীসসমূহের মধ্যে পারস্পরিক বাহ্যিক অর্থগত বিরোধ : মুসলিম শরীফের বর্ণনা মোতাবেক এখানে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে, **اَيُّ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرٌ** অর্থাৎ উত্তম মুসলমান কারা ? তদুত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– **مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ** [যার জবান ও হাত হতে অপর মুসলমান নিরাপদ রয়েছে]। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, যে মুসলমান অন্য মুসলমানকে কষ্ট দেয় না, সে-ই উত্তম মুসলমান। অথচ ঠিক একই ধরনের প্রশ্নের তিনি অন্যত্র ভিন্নরূপে উত্তর দিয়েছেন। যেমন কেউ তাঁকে প্রশ্ন করেছেন **اَيُّ الْاِسْلَامِ خَيْرٌ** [কোন্ ইসলাম উত্তম ?] তদুত্তরে তিনি বলেছেন, **اِطْعَامُ الطَّعَامِ** [অভুক্তকে খাদ্য দান করা]। যার দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, অভুক্তকে খাদ্য দানকারী মুসলমানই উত্তম মুসলমান। আবার **اَيُّ الْاَعْمَالِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ** [কোন্ আমল আল্লাহ তা'আলার নিকট অধিক প্রিয় ?] এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন, **اَلصَّلٰوةُ لِوَقْتِهَا** [যথাসময়ে নামাজ পড়া]। যার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়, যথাসময় নামাজ আদায়কারী মুসলমানই উত্তম মুসলমান। সুতরাং দেখা যায়, আলোচ্য হাদীসটির সাথে আরো কতিপয় হাদীসের বাহ্যিক অর্থবিরোধ রয়েছে।

বিরোধের সমাধান :

১. উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর এই যে, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতের আধ্যাত্মিক চিকিৎসক। শারীরিক চিকিৎসকগণ যেমন রোগীর অবস্থাভেদে তার জন্য ব্যবস্থাপত্র দান করে থাকেন, বাহ্যিক দৃষ্টিতে অনেক সময় দেখা যায় একই রোগের জন্য বিভিন্ন রোগীকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হচ্ছে। তদ্রূপ রাসূলুল্লাহ ﷺ আধ্যাত্মিক চিকিৎসক হিসেবে রোগীর অবস্থা বিবেচনায় ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা দান করেছেন। যেমন– যার মধ্যে অন্যকে কষ্ট দেওয়ার স্বভাব রয়েছে, তাকে সেই কাজ হতে নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে বলেছেন– যে মুসলমান অন্যকে কষ্ট দেয় না, সে-ই উত্তম মুসলমান। আর যার মধ্যে কার্পণ্যের দোষ রয়েছে, তাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন– অভুক্তকে খাদ্যদানকারী ব্যক্তিই উত্তম মুসলমান। আবার যার মধ্যে সময়মতো নামাজ আদায়ে গাফলতি রয়েছে, তাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, যথাসময় নামাজ আদায়কারী ব্যক্তিই উত্তম মুসলমান। এক কথায়, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ আধ্যাত্মিক চিকিৎসক হিসেবে রোগীর অবস্থাভেদে বিভিন্ন ব্যবস্থা প্রদান করেছেন। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে উপরে উল্লিখিত হাদীসগুলোর মধ্যে অর্থগত কোনো বিরোধ নেই।

২. আল্লামা ওসমানী (র.) বলেন, এ বাহ্যিক অর্থগত বিরোধ বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে উত্তমতা হিসেবে হয়েছে। যেমন– أَرْحَمُ أُمَّتِىْ হিসেবে (رضـ) اَبُوْ بَكْر শ্রেষ্ঠ। اَشَدُّ فِىْ اَمْرِ اللّٰهِ হিসেবে ওমর (রা.) শ্রেষ্ঠ। حَيَاءٌ -এর দিক থেকে ওসমান (রা.) শ্রেষ্ঠ। قَضَاءٌ -এর দিক থেকে আলী (রা.) শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি।—(كَمَا فِىْ فَتْحِ الْمُلْهِمْ)

৩. অথবা, পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করার জন্য তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়কে সর্বোত্তম ইসলাম বলেছেন। তাই হাদীসসমূহের মধ্যে আর বাহ্যিক অর্থগত বিরোধ থাকল না।

وَعَنْ [৫] اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫. **অনুবাদ :** হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না ; যে পর্যন্ত আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং অন্যান্য সকল মানুষ হতে অধিক ভালোবাসার পাত্র না হব। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীসে পরিপূর্ণ ঈমানদারের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে, অর্থাৎ পৃথিবীর সব কিছু হতে রাসূল ﷺ-কে বেশি ভালোবাসতে হবে। প্রকৃতপক্ষে নবী করীম ﷺ-এর উপর আন্তরিক ও নিষ্ঠাপূর্ণ ভালোবাসা না থাকলে তার আদর্শের যথাযথ অনুসরণ করা সম্ভব হয় না। আর তার আদর্শ অনুসরণ করতে না পারলে প্রকৃত ঈমানদার হওয়া যায় না। পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি সব কিছুর উপর হযরত রাসূল ﷺ-এর মর্যাদা দিতে হবে। রাসূলের ভালোবাসা ও পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততির ভালবাসার মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব দেখা দিলে প্রকৃত ঈমানদারের কাজ হবে হযরত রাসূল ﷺ -এর ভালোবাসাকে প্রাধান্য দেওয়া।

বুখারী শরীফে একটি ঘটনা বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রা.) বললেন, হে রাসূল ﷺ ! সবকিছুর চেয়ে আপনাকে বেশি ভালোবাসি ; তবে আমার আত্মা ব্যতীত। হযরত রাসূল ﷺ বললেন, না তোমার আত্মা বা জীবন হতেও আমাকে অধিক প্রিয় মনে করতে হবে। হযরত ওমর (রা.) বললেন, হাঁ ; এখন আপনি আমার জীবন হতেও অধিক প্রিয়। তখন হযরত রাসূল ﷺ বললেন, এখন তুমি পরিপূর্ণ ঈমানদার হয়েছ।

مَعْنَى الْمَحَبَّةِ وَاَقْسَامُهَا **মহব্বতের অর্থ ও প্রকারভেদ :**

مَعْنَى الْمَحَبَّةِ لُغَةً : مَحَبَّةٌ শব্দটি বাবে ضَرَبَ থেকে مَصْدَرْ مِيْمِىْ বা اِسْمُ مَصْدَرْ শাব্দিক অর্থ হলো–

১. اَلْمَيْلُ [ঝুঁকে পড়া।] ২. اَلشَّوْقُ [উৎসাহ-উদ্দীপনা।] ৩. تَوَجُّهُ الْقَلْبِ [অন্তরের আগ্রহ।]

مَعْنَى الْمَحَبَّةِ اِصْطِلَاحًا :

مَحَبَّةٌ **শব্দটির পারিভাষিক সংজ্ঞা :** مَيَلَانُ الْقَلْبِ اِلَى الشَّئِ الْمَرْغُوْبِ অর্থাৎ পছন্দনীয় বস্তুর প্রতি আকর্ষণকে مَحَبَّةٌ বলে।

২. কারো মতে, مَيَلَانُ الْقَلْبِ اِلٰى شَئٍ لِكَمَالِهٖ فِيْهِ অর্থাৎ কোনো বস্তুর পরিপূর্ণতার কারণে তার দিকে অন্তর ধাবিত হওয়া।

৩. কিছু সংখ্যকের মতে, مَيَلَانُ الْقَلْبِ اِلَى الْاَشْخَاصِ اَوِ الْاَشْيَاءِ الْعَزِيْزَةِ অর্থাৎ প্রিয় বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি হৃদয়ের ঝুঁকে যাওয়া।

اَقْسَامُ الْمَحَبَّةِ : ইসলামি চিন্তাবিদগণ مَحَبَّةٌ-কে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন–

১. مَحَبَّةٌ طَبْعِىْ [স্বভাবগত ভালোবাসা] বাহ্যিক কোনো প্রভাব ব্যতিরেকে শুধুমাত্র অন্তরের টানে কাউকে ভালোবাসা। যেমন– পিতা, মাতা ও সন্তান-সন্ততির প্রতি ভালোবাসা।

২. مَحَبَّةٌ عَقْلِىْ [বুদ্ধি বা যুক্তিগত ভালোবাসা] কারো জ্ঞান-গরিমায় মুগ্ধ হয়ে নিজের বিবেক তাড়িত হয়ে তার প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা। যেমন– কোনো জ্ঞানী গুণীকে ভালোবাসা।

৩. مَحَبَّةٌ اِيْمَانِىْ [বিশ্বাসগত ভালোবাসা] শুধুমাত্র ঈমানের দাবিতে কাউকে ভালোবাসা। যেমন– আল্লাহ, তাঁর রাসূল, সাহাবী ও বুজুর্গানে দীনকে ভালোবাসা।

اَلْمُرَادُ بِالْمَحَبَّةِ هٰهُنَا হাদীসে বর্ণিত ভালোবাসার মর্ম : হযরত রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কোনো লোকই পূর্ণাঙ্গ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকট সমস্ত কিছুর চেয়ে অধিক প্রিয়পাত্র না হব। অতএব, এ বাণী দ্বারা বুঝা যায় যে, পূর্ণাঙ্গ ঈমান লাভের জন্য মহানবীর ভালোবাসা পূর্বশর্ত। বাহ্যিকরূপে হাদীসের ভাষা দ্বারা বুঝা যায় যে, এখানে স্বভাবগত ভালোবাসার কথা বুঝানো হয়েছে। কেননা, পিতা-মাতার ভালোবাসা হয় স্বভাবগত। কিন্তু স্বভাবগত ভালোবাসার জন্য শরিয়ত কখনও নির্দেশ দিতে পারে না, এ কারণেই স্বভাবগত ভালোবাসার কথা এখানে বুঝানো হয়নি; বরং হাদীসে ঈমানভিত্তিক ভালোবাসার কথা বুঝানো হয়েছে। আর হয়তো গুণ-বুদ্ধিগত ভালোবাসার কথাও বুঝানো যেতে পারে। কেননা, গুণ-বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে মহানবী ﷺ হলেন সমগ্র মানবকুলের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি ও মহামানব। সুতরাং এহেন গুণ-বৈশিষ্ট্যের কারণেই মানুষ তাঁকে ভালোবাসবে বলে বুঝানো হয়েছে। এ কথাও বলা যেতে পারে যে, এখানে স্বভাবগত ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে যে, তোমাদের অন্তরে আমার ভালোবাসা অধিক মাত্রায় থাকা উচিত। কেননা, ভালোবাসার উপকরণসমূহের মধ্যে কোনো একটি বর্তমান থাকলেই ভালোবাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং মহানবী ﷺ-এর মধ্যে ভালোবাসার সমুদয় উপকরণই যথা– সৌন্দর্য, চরিত্র, জ্ঞান-বুদ্ধি প্রভৃতির পূর্ণ সমাবেশ ঘটেছে। সুতরাং স্বভাবগত ভালোবাসার চেয়ে তাঁর প্রতি অধিক ভালোবাসা থাকা বাঞ্ছনীয়।

স্বভাবগত ভালোবাসায় নিয়ত করা অনৈচ্ছিক। সুতরাং তার নির্দেশ প্রদান করা যেতে পারে না। এটার অর্থ এই যে, প্রথমত নিজের মনে বিবেক ও বিশ্বাসভিত্তিক ভালোবাসা সৃষ্টি করতে হবে। এরূপ ক্রমান্বয়ে মহানবীর চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে স্বভাবগত ও আত্মিক ভালোবাসা সৃষ্টি করতে সক্ষম হওয়া যাবে।

সারকথা হলো, মহানবী ﷺ-এর প্রতি সর্ব প্রকার ভালোবাসাই থাকা উচিত এবং সর্ব বস্তুর উপর তাঁর ভালোবাসাকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত।

سَبَبُ اِشْتِرَاطِ مَحَبَّةِ النَّبِيِّ ﷺ لِلْاِيْمَانِ ঈমানের জন্য হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভালোবাসার শর্তারোপ করার কারণ : আলোচ্য হাদীসে মহানবী ﷺ তাঁর ভালবাসাকে পরিপূর্ণ ঈমানের জন্য শর্ত স্থির করার যৌক্তিকতা সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ নিম্নোক্ত মতামত পেশ করেছেন–

জমহুর মুহাদ্দেসীনের মতে, আল্লাহ ও বান্দার মাঝে হযরত রাসূল ﷺ-ই একমাত্র সেতুবন্ধনকারী। এ কারণে মহান আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক রাসূল ﷺ-এর আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল। যেমন আল্লাহ ত'আলা বলেন–

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ الخ .

আর একজন মানুষ তখনই অপর একজন লোকের পরিপূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণ করে যখন সে ঐ ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা পোষণ করে। আর তার মধ্যে এসব গুণাবলির অনুপস্থিতিতে তাকে স্বভাবিকভাবেই আনুগত্য বিমুখ করে দেয়। এ কারণেই উক্ত হাদীসে রাসূলের ভালোবাসাকে পরিপূর্ণ ঈমানের জন্য শর্ত স্থির করা হয়েছে।

اَلْمُرَادُ بِالْاِيْمَانِ هٰهُنَا এখানে ঈমান দ্বারা উদ্দেশ্য : এখানে ঈমান দ্বারা اِيْمَانٌ كَامِلٌ বা পরিপূর্ণ ঈমানকে বুঝানো হয়েছে, সাধারণ অর্থে ঈমান উদ্দেশ্য করা হয়নি। কারণ, সাধারণ ঈমান তো মৌখিক স্বীকারোক্তি দ্বারাই অর্জিত হয়। যেমন বলা হয়– فُلَانٌ لَيْسَ بِاِنْسَانٍ অর্থাৎ فُلَانٌ لَيْسَ بِاِنْسَانٍ كَامِلٍ।

وَجْهُ عَدَمِ ذِكْرِ الْاُمِّ মাকে উল্লেখ না করার কারণ : মানুষের নিকট মা-ই হলো সবচেয়ে প্রিয়, অথচ মায়ের কথা উল্লেখ করা হয়নি। এর কারণসমূহ নিম্নরূপ–

১. হাদীসে وَالِدٌ শব্দ এসেছে, আর আরবি ভাষায় وَالِدٌ দ্বারা পিতামাতা উভয়কেই বুঝানো হয়ে থাকে। তাই মাতাকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

২. অথবা, وَالِدٌ শব্দের অর্থ হলো مَنْ لَهُ وَلَدٌ তথা যার সন্তান রয়েছে। আর মাতাও এর আওতাধীন হওয়াতে পৃথকভাবে মাকে উল্লেখ করা হয়নি।

৩. অথবা, "اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ" হিসেবে শুধু পিতাকে উল্লেখ করা হয়েছে, আর মাতাকে تَابِعٌ হিসেবে রাখা হয়েছে।

৪. অথবা, সংসারের দায়িত্বশীল পিতা হওয়ার কারণে তাঁর উল্লেখ মানে সকলের উল্লেখ। এ জন্য পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

৫. অথবা, মাতা وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ-এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বিধায় মাকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

سَبَبُ عَدَمِ ذِكْرِ النَّفْسِ وَالْمَالِ **সম্পদ ও জীবনকে উল্লেখ না করার কারণ** : মানুষের নিকট সবচেয়ে প্রিয় বস্তু হলো নিজের জীবন ও সম্পদ। এগুলো উল্লেখ না করার কারণসমূহ নিম্নরূপ–

১. বস্তুত জ্ঞানগতভাবে মানুষের ধন-সম্পদ ও নিজের জীবনের চেয়েও পিতামাতা এবং সন্তান-সন্ততি অধিক প্রিয়। কেননা, মানুষ অনেক সময় ধন-সম্পদ ও নিজের জীবন দিয়ে হলেও তাদের বাঁচাবার চেষ্টা করে। এ জন্য অত্র হাদীসে نَفْس ও مَالْ-এর উল্লেখ নেই ; বরং وَالِدْ ও وَلَدْ-এর উল্লেখই ঐগুলোর জন্য যথেষ্ট। তবে عَبْدُ بْنُ هِشَامٍ বর্ণিত হাদীসে نَفْس-এর কথাও উল্লেখ আছে, ফলে আর কোনো تَعَارُضْ থাকে না।

وَجْهُ ذِكْرِ الْوَالِدِ قَبْلَ الْوَلَدِ **সন্তানের পূর্বে পিতামাতাকে উল্লেখের কারণ** :

১. পিতামাতা ও সন্তান-সন্ততির মাঝে সম্পর্ক হলো– جُزْئِيَّتْ ও بَعْضِيَّتْ কিন্তু وَالِدْ-এর সাথে جُزْئِيَّتْ-এর সম্পর্ক প্রথমে, তাই وَلَدْ-এর পূর্বে وَالِدْ-এর উল্লেখ হয়েছে।

২. অথবা, وَالِدْ সম্মান ও সময়ের দিক থেকে অগ্রগামী, তাই وَالِدْ-কে وَلَدْ-এর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে মুসলিমের মধ্যে وَلَدْ-কে যে وَالِدْ-কে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তা অধিক ভালোবাসার কারণে হয়েছে।

وَعَنْـــ٦ـــهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلٰثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ مَنْ كَانَ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ اَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهٗ اِلَّا لِلّٰهِ وَمَنْ يَكْرَهُ اَنْ يَعُوْدَ فِى الْكُفْرِ بَعْدَ اَنْ اَنْقَذَهُ اللّٰهُ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُلْقٰى فِى النَّارِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬. **অনুবাদ** : হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– এমন তিনটি বস্তু রয়েছে, যে ব্যক্তির মধ্যে সেগুলো বিদ্যমান থাকবে কেবল সে-ই এগুলোর কারণে ঈমানের স্বাদ অনুভব করতে পারবে। সেগুলো হলো– ১. যার নিকট আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা সকল কিছু হতে অধিক পরিমাণে রয়েছে, ২. যে ব্যক্তি কোনো বান্দাকে শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে ভালোবাসে এবং ৩. যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা কুফর হতে মুক্তি দেওয়ার পর পুনরায় কুফরিতে ফিরে যাওয়াকে অনুরূপভাবে অপছন্দ করে যেমন অপছন্দ করে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : ইসলামি জীবন বিধানের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস। ঈমানের প্রকৃত স্বাদ অনুভব তিনটি মৌলিক বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। প্রথমত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা এটি প্রধান ও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ঈমানের মূল এতেই নিহিত রয়েছে। দ্বিতীয়ত কোনো মানুষকে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালোবাসা। তৃতীয়ত আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে মুসলমান হওয়ার পর পুনরায় কুফরিতে ফিরে যাওয়াকে অপছন্দ ও ঘৃণা করা। প্রকৃত ঈমানদারের নিকট এ তিনটি বিষয় মেনে নেওয়া একেবারে সহজ।

مَعْنٰى حَلَاوَةِ الْاِيْمَانِ **ঈমানের স্বাদের অর্থ** : উক্ত হাদীসে রাসূলে কারীম ﷺ ঈমানের স্বাদ বলতে কি বুঝিয়েছেন এ বিষয়ে কিছুটা মতবিরোধ রয়েছে। যেমন–

১. শায়খ মহীউদ্দীন ইবনুল আরাবীর মতে, حَلَاوَةُ الْاِيْمَانِ বলতে ইবাদতে আগ্রহ বোধ করা, তৃপ্তি অনুভূত হওয়া, দীনের পথে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার মানসিকতা সৃষ্টি হওয়া এবং জাগতিক বিষয়ের উপর দীনকে প্রাধান্য দান করার মনোবৃত্তি গড়ে উঠা।

২. কাজী বায়যাবী (র.)-এর মতে, শরিয়তের অনুশাসন ও বিধিবিধান পালন করা স্বভাবগত কষ্টকর মনে হলেও তার উপকারিতা ও প্রতিদানের প্রত্যাশায় তা যথাযথ পালনে আগ্রহ সৃষ্টি হওয়ার নামই হলো– حَلَاوَةُ الْاِيْمَانِ বা ঈমানের স্বাদ।

حَقِيْقَةُ حُبِّ اللّٰهِ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভালোবাসার তাৎপর্য :

১. আল্লামা তীবী (র.) বলেন, কালামশাস্ত্রবিদগণের দৃষ্টিতে আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভালোবাসা বলতে তাঁর ইবাদতে একাগ্রতা, তাঁর অনুগ্রহ ও প্রতিদান লাভের ঐকান্তিক বাসনাকেই বুঝায়।

২. সূফিয়ায়ে কেরামের মতে, কোনো কিছুর প্রত্যাশা ব্যতীত আল্লাহর সত্তাকে ভালোবাসা আবশ্যক। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ –(كَمَا فِىْ فَتْحِ الْمُلْهِمِ وَالتَّعْلِيْقِ)

اَلتَّعَارُضُ দ্বন্দ্ব : উক্ত হাদীসে مِمَّا سِوَاهُمَا শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যাতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে একত্রে বুঝানো হয়েছে। অথচ অন্যত্র বর্ণিত আছে যে, একদা জনৈক খতীব وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَقَدْ غَوٰى বলাতে রাসূল ﷺ তাকে বললেন, بِئْسَ الْخَطِيْبُ اَنْتَ এতে উভয় হাদীসের মধ্যে تَعَارُضْ পরিলক্ষিত হয়। তার সমাধান নিম্নরূপ–

১. উক্ত ব্যক্তির খুতবার বিষয়বস্তু ব্যাখ্যামূলক ও সুস্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল, যা জনসাধারণের জন্য সহজবোধ্য হয়; কিন্তু উক্ত খতীব দ্বিবচন ব্যবহার করে সংক্ষেপ-নীতি অনুসরণ করায় তাতে কিছুটা অস্পষ্টতা সৃষ্টি হয়, তাই রাসূল ﷺ তাকে ভর্ৎসনা করেছেন।

২. অথবা, যেখানে অস্বীকার করার সম্ভাবনা দেখা যায় কিংবা অগ্রাধিকার দেওয়া উদ্দেশ্য হয় সেখানে عَامْ বা ব্যাপকভাবে উল্লেখ করা আবশ্যক। আর রাসূল ﷺ যে, وَمَنْ يَّعْصِهِمَا বলেছেন তা বিশেষ ঘটনা বা কর্মের উপলক্ষে বলেছেন।

৩. অথবা, হুযূর ﷺ-এর জন্য সংক্ষেপ করা জায়েজ, অন্যের জন্য জায়েজ নেই। এটি তাঁর বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। এ জন্য রাসূল ﷺ তাকে তিরস্কার করেছেন।

৪. অথবা, এখানে مِمَّا سِوَاهُمَا দ্বারা এটা বুঝানো উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মহব্বত একই সূত্রে গাঁথা, একটি ব্যতীত অন্যটির কল্পনাও করা যায় না। এ জন্য আল্লাহ ব্যতীত রাসূলের মহব্বত এবং রাসূল ব্যতীত আল্লাহকে ভালোবাসার দাবি অমূলক। যেমন, আল্লাহ বলেছেন– قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ এ জন্য রাসূল ﷺ উভয়কে একসাথে যমীর দ্বারা উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে খতীবের সেখানে এরূপ উদ্দেশ্য নয়; বরং পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেকেই উদ্দেশ্য।

وَمَنْ يَّكْرَهُ اَنْ يَّعُوْدَ فِى الْكُفْرِ الخ-এর ব্যাখ্যা : اِنْقَاذْ তথা মুক্তি দেওয়া। এটি عَامْ অর্থাৎ ১. প্রথমেই আল্লাহ তাকে মুক্তি দিয়েছেন এভাবে যে, সে ইসলামের উপরই জন্মগ্রহণ করেছে এবং তার উপর বহাল রয়েছে।

২. অথবা, কুফরি হতে ইসলামের দিকে বের হয়ে আসা, তথা ইসলাম গ্রহণ করা।

প্রথম অবস্থায় يَعُوْدُ فِى الْكُفْرِ-এর অর্থ হলো কাফির হওয়া বা কুফরি অবলম্বন করা। আর দ্বিতীয় অবস্থায় يَعُوْدُ فِى الْكُفْرِ-এর অর্থ হলো ঈমান গ্রহণের পর পুনরায় কুফরের দিকে প্রত্যাবর্তন করা।

আল্লামা আইনী (র.) বলেন, এর দ্বারা ঐ ব্যক্তির মর্যাদা ফুটে উঠেছে, যাকে কুফরির উপর জবরদস্তি করা হয়েছে; কিন্তু এ অবস্থা থেকে বাঁচার চেয়ে সে মৃত্যুকে অধিক পছন্দ করেছে। –(كَمَا فِىْ فَتْحِ الْمُلْهِمِ)

وَعَنْ ـ٧ـ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاقَ طَعْمَ الْاِيْمَانِ مَنْ رَضِىَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৭. অনুবাদ : হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– সেই ব্যক্তিই ঈমানের স্বাদ পেয়েছে যে আল্লাহ তা'আলাকে প্রভু, ইসলামকে দীন এবং মুহাম্মদ ﷺ-কে রাসূল হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছে।–[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে ঈমানের তিনটি বুনিয়াদি বিষয় সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। আর উক্ত তিনটি বিষয় একান্ত আন্তরিকতার সাথে যে গ্রহণ করেছে সে ঈমানের প্রকৃত স্বাদ অনুভব করতে পারবে। উক্ত তিনটির কোনো একটি না মানলে তার ঈমান থাকবে না, ফলে সে ঈমানের স্বাদও লাভ করতে পারবে না। আর সে বিষয়গুলো হলো–১. মহান আল্লাহকে তাঁর যাবতীয় গুণাবলিসহ বিশ্বাস করা, ২. হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে আল্লাহর রাসূল হিসেবে মেনে তাঁর যাবতীয় আদেশ-নিষেধকে যথাযথভাবে মেনে চলা এবং ৩. ইসলামকে নিজের জীবন বিধান হিসেবে মেনে তদনুযায়ী চলা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীসে ঈমানের তিনটি বুনিয়াদি বিষয় সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। আর উক্ত তিনটি বিষয় একান্ত আন্তরিকতার সাথে যে গ্রহণ করেছে সে ঈমানের প্রকৃত স্বাদ অনুভব করতে পারবে। উক্ত তিনটির কোনো একটি না মানলে তার ঈমান থাকবে না, ফলে সে ঈমানের স্বাদও লাভ করতে পারবে না। আর সে বিষয়গুলো হলো–১. মহান আল্লাহকে তাঁর যাবতীয় গুণাবলিসহ বিশ্বাস করা, ২. হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে আল্লাহর রাসূল হিসেবে মেনে তাঁর যাবতীয় আদেশ-নিষেধকে যথাযথভাবে মেনে চলা এবং ৩. ইসলামকে নিজের জীবন বিধান হিসেবে মেনে তদনুযায়ী চলা।

مَاهُوَ ذَوْقُ طَعْمِ الْإِيْمَانِ **ঈমানের স্বাদ কি ?**

১. কাজী ইয়ায (র.) বলেন, কোনো ব্যক্তির যখন কোনো বস্তু পছন্দনীয় ও মনঃপূত হয় এবং সে তা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে সে প্রিয় বস্তু লাভ করার পর তার মধ্যে যে আত্মতৃপ্তি লাভ হয়, তা-ই হলো সে বস্তুর মজা বা স্বাদ। এমনিভাবে যখন কোনো ব্যক্তি উল্লিখিত তিনটি বিষয় তথা اِيْمَان بِاللّٰه ، دِيْن اِسْلَام এবং رِسَالَة مُحَمَّد ﷺ-কে মনে-প্রাণে মেনে নেয়, তখন সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এগুলো মিশে যায় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য তার জন্য সহজ এবং মধুময় হয়ে যায়। আর এগুলোর উপর সন্তুষ্টির কারণে স্বাদ অনুভবের পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

২. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (র.) বলেন, আলোচ্য হাদীসে এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যেমন খাদ্য দ্বারা আত্মতৃপ্তি লাভ হয়, তদ্রূপ যে সকল অন্তর অলসতা ও অভিলাষের রোগ হতে নিরাপদ হয় তা বাতেনী স্বাদের তৃপ্তি লাভ করতে পারে, তবে অলসতা ও রোগ হতে নিরাপত্তা লাভ উল্লিখিত তিনটি বিষয়ের দ্বারা হতে পারে।

مَعْنَى الرِّضَاءِ بِاللّٰهِ রিযা বিল্লাহ **-এর অর্থ :** اَلرِّضَاءُ-এর অর্থ হলো এরূপ তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হওয়া যার সাথে অন্য কিছুর আকাঙ্ক্ষা থাকে না, অর্থাৎ প্রভুত্বের ব্যাপারে আল্লাহ্ ব্যতীত, দীনের ব্যাপারে ইসলাম ব্যতীত এবং নবুয়তের ব্যাপারে হযরত মুহাম্মদ ﷺ ব্যতীত কারো তালাশ বা চাহিদা না হওয়া।

- মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, رِضَاء দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ظَاهِرِىْ ও بَاطِنِىْ আনুগত্য। আর رِضَاء-এর মধ্যে পরিপূর্ণ হলো মসিবতে ধৈর্যধারণ, নিয়ামতের উপর কৃতজ্ঞতা, খোদায়ী সিদ্ধান্ত (قَدْر)-এ সন্তুষ্টি এবং শরয়ী আদেশ পালন, নিষেধ বর্জন করে শরিয়তের উপর আমল এবং সকল বিষয়ে রাসূলে কারীম ﷺ-এর পরিপূর্ণ আনুগত্য করা।

কোনো কোনো বুজুর্গ বলেন, رِضَاء হলো আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জনকারীদের উন্নত স্থান। এ জন্য সকল নৈকট্য অর্জনকারীদের মধ্য হতে সাহাবায়ে কেরামগণ সর্বোচ্চ পর্যায়ে অধিষ্ঠিত। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের শানে ইরশাদ করেছেন– رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ

وَعَنْ ٨ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ ﷺ بِيَدِهٖ لَايَسْمَعُ بِىْ اَحَدٌ مِّنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ يَهُوْدِىٌّ وَلَانَصْرَانِىٌّ ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِىْ اُرْسِلْتُ بِهٖ اِلَّا كَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মদের জীবন ! এ উম্মতের যে কেউ চাই সে ইহুদি হোক বা নাসারা ; আমার রিসালাতের কথা শুনে, অথচ আমি যা সহকারে প্রেরিত হয়েছি তার উপর ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করে, সে অবশ্যই জাহান্নামের অধিবাসী হবে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, মহানবী ﷺ-এর নবুয়ত দুনিয়ার সমগ্র মানব ও জিনের জন্য। তাঁর নবুয়তপ্রাপ্তির সাথে সাথে পৃথিবীর সকল ধর্ম রহিত হয়ে গেছে। তাঁর মাধ্যমেই নবীদের আগমনধারা সমাপ্ত হয়ে গেছে, ফলে কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর আনীত জীবন বিধানই অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় হয়ে থাকবে। সুতরাং সকল ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে তাঁর ধর্মই গ্রহণ করতে হবে। তাঁর উপর ঈমান আনয়নই মুক্তির একমাত্র পথ। অন্যথা কেউই মুক্তি লাভে সমর্থ হবে না এবং পরকালে অনন্তকাল পর্যন্ত জাহান্নামে জ্বলতে থাকবে।

اَلْمُرَادُ بِاَحَدٍ 'আহাদ' শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য : اَحَدٌ শব্দটি একবচন, বহুবচন اٰحَادٌ -শব্দটির অর্থ- যে কেউ, তবে এখানে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সেসব লোক যারা বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতে আসবে।

اُمَّةٌ শব্দের অর্থ ও প্রকারভেদ : اُمَّةٌ শব্দের অর্থ হলো- দল বা জামাআত, যাদের প্রতি কোনো নবী বা রাসূল প্রেরিত হয়েছেন, শরিয়তের পরিভাষায় তাদেরকে উম্মত বলা হয়। আর রাসূলের উম্মত হলেন- রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়ত লাভের সময় হতে কিয়ামত পর্যন্ত যত লোক পৃথিবীতে আগমন করেছে এবং করবে তারা সকলেই তাঁর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত।

اَقْسَامُ الْاُمَّةِ : اُمَّةٌ দু' শ্রেণীতে বিভক্ত : যথা-

১. اُمَّةُ اِجَابَةٍ তথা যারা নবী করীম ﷺ-এর ডাকে সাড়া দিয়ে ইসলাম কবুল করেছে, তারাই হলো উম্মতে ইজাবত।

২. اُمَّةُ دَعْوَتٍ তথা যারা রাসূলের ডাকে সাড়া দেয়নি বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর ঈমান আনয়ন করেনি, তারা হলো উম্মতে দাওয়াত। এ হিসেবে পৃথিবীর সকল মানুষই রাসূলের উম্মত হিসেবে পরিগণিত।

سَبَبُ تَخْصِيْصِ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى بِالذِّكْرِ ইহুদি ও খ্রিস্টান জাতিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ : কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষ রাসূল ﷺ-এর উম্মতে দাওয়াতের অন্তর্ভুক্ত হলেও তিনি বিশেষ করে ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে উল্লেখ করার কারণ হলো, এরা শেষ নবীর আগমনের সময় একটি ঐশী ধর্মমতের অনুসারী হলেও রাসূলের উপর ঈমান না আনার কারণে পথভ্রষ্টই রয়ে গেছে। কেননা, রাসূলের আগমনের ফলে সকল ধর্ম রহিত হয়ে গেছে। তাই তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করলে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে অবস্থান করবে। এ জন্য তাদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

مَعْنٰى قَوْلِهٖ "ثُمَّ يَمُوْتُ" তথা ثُمَّ يَمُوْتُ -এর অর্থ : মহানবী ﷺ ثُمَّ يَمُوْتُ দ্বারা এ কথার দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি গড়গড়ার পূর্বেও ঈমান আনয়ন করে, তবে তার ঈমান গৃহীত হবে এবং সে নাজাতের অধিকারী হবে, জাহান্নাম হতে মুক্তি পাবে।

تَوْضِيْحُ قَوْلِهٖ اِلَّا كَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ :

اِلَّا كَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ-এর ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তির নিকট দাওয়াত পৌছার পরও কুফরির উপর অটল থেকে তার উপরই মৃত্যুবরণ করেছে, সে নিশ্চিতভাবে জাহান্নামী হয়ে গেছে। কেননা, মহান আল্লাহ বান্দার কল্যাণের জন্য যে ব্যবস্থা করেছেন সে তার বিরোধিতা করেছে এবং সে নিজেকে আল্লাহ ও ফেরেশতাদের অভিসম্পাতের যোগ্য করেছে এবং মুক্তির পথ হতে বিচ্যুত হয়ে গেছে। তবে যে ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর নবুয়তের কথা শুনে ঈমান গ্রহণ করেছে, সে জাহান্নামী হবে না। আর যে ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর নবুয়তের কথা শুনেনি এবং সে বিষয়ের উপর ঈমানও গ্রহণ করেনি সে উল্লিখিত শাস্তি হতে পৃথক থাকবে। তার ব্যাপারে আল্লাহই ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। (فَتْحُ الْمُلْهِمِ)

وَعَنْ ٩ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلٰثَةٌ لَهُمْ اَجْرَانِ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اٰمَنَ بِنَبِيِّهٖ وَاٰمَنَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوْكُ اِذَا اَدّٰى حَقَّ اللّٰهِ وَحَقَّ مَوَالِيْهِ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهٗ اَمَةٌ يَطَأُهَا فَاَدَّبَهَا فَاَحْسَنَ تَأْدِيْبَهَا وَعَلَّمَهَا فَاَحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا ثُمَّ اَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهٗ اَجْرَانِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৯. **অনুবাদ :** হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন- তিন ব্যক্তির জন্য দ্বিগুণ ছওয়াব রয়েছে- ১. সেই আহলে কিতাব যে তার নবীর উপর ঈমান আনয়ন করেছে এবং মুহাম্মদ ﷺ-এর উপরও ঈমান এনেছে। ২. সেই ক্রীতদাস যে আল্লাহ্‌র হক আদায় করার সাথে সাথে মনিবের হকও আদায় করেছে। ৩. আর যে ব্যক্তির কোনো ক্রীতদাসী ছিল, যার সাথে সে সহবাস করত, এরপর সে তাকে আদব-কায়দা শিক্ষা দিয়েছে এবং উত্তমরূপেই তাকে আদব-কায়দা শিখিয়েছে। আর তাকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছে, আর সে উত্তমরূপে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছে। এরপর তাকে আজাদ করে বিবাহ করেছে। এমন ব্যক্তির জন্যও দ্বিগুণ প্রতিদান রয়েছে। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَنْ هُمْ اَهْلُ الْكِتَابِ আহলে কিতাব কারা? : اَهْلُ الْكِتَابِ অর্থ– কিতাবের অধিকারী বা কিতাবধারী। কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে মহান আল্লাহ ১০০ টি সহীফা এবং তিনটি প্রধান আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করেছিলেন। আহলে কিতাব বলতে সাধারণত এসব কিতাবের অনুসারীদেরকেই বুঝানো হয়ে থাকে। তবে অধিকাংশ মুহাদ্দেসীনে কেরাম এ কথার উপর একমত যে, আহলে কিতাব বলতে তাওরাতের অনুসারী ইহুদিগণ এবং ইনজীলের অনুসারী খ্রিস্টানগণকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, রাসূলের যুগে এ দুই দলই বিদ্যমান ছিল। তাঁরা দলিল হিসেবে আরো বলেন যে, হযরত সালমান ফারসী (রা.) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে খ্রিস্টান এবং আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) ইহুদি ছিলেন।

اَلْمُرَادُ بِالْكِتَابِ فِىْ قَوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ : اَهْلُ الْكِتَابِ-এর মধ্যে اَلْكِتَابُ দ্বারা উদ্দেশ্য : এখানে اَلْكِتَابُ শব্দটি عَام বা ব্যাপক হওয়া সত্ত্বেও এর দ্বারা উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট তথা আল্লাহ্র পক্ষ হতে অবতারিত কিতাব। তবে এই অবতারিত কোন কোন কিতাব উদ্দেশ্য এ বিষয়ে কিছুটা মতান্তর রয়েছে। যথা–

১. অধিকাংশের মতে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাওরাত ও ইনজীল কিতাব। কেননা, পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে– اُولٰئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا . এ আয়াত হযরত সালমান ও আবদুল্লাহ ইবনে সালামের শানে অবতীর্ণ হয়েছে। এদের প্রথমজন ছিলেন নাসারা, আর দ্বিতীয়জন ছিলেন ইহুদি।

২. কিছু সংখ্যকের মতে, এখানে اَلْكِتَابُ দ্বারা ইনজীল কিতাবই উদ্দেশ্য। যেমন বুখারী শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে– قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ : فَاِذَا اٰمَنَ بِعِيْسٰى ثُمَّ اٰمَنَ بِىْ فَلَهٗ اَجْرَانِ .

এছাড়া তাওরাতের অনেক হুকুম ইনজীল দ্বারা রহিত হয়ে গেছে এবং হযরত ঈসা (আ.)-ই পরবর্তীতে গোটা বনী ইসরাঈল জাতির নিকট প্রেরিত হয়েছেন, ফলে ইহুদিগণ প্রকৃতপক্ষে কোনো নবীর উপর ঈমান আনয়নকারী ছিল না।

তবে বিশুদ্ধ কথা হলো, এখানে কিতাব দ্বারা তাওরাত ও ইনজীল উভয়ই উদ্দেশ্য। (كَمَا فِىْ فَتْحِ الْمُلْهِمِ وَالتَّعْلِيْقِ)

وَجْهُ ضِعْفِ الْاَجْرِ দ্বিগুণ প্রতিদানের কারণ :

اَهْلُ الْكِتَابِ-এর দ্বিগুণ ছওয়াব লাভের কারণ :

১. একজন লোক কোনো একজন নবীর উপর ঈমান আনয়ন করত তাঁর ধর্ম মতে জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠার পর নতুন ধর্মের অনুসারী হওয়া স্বভাবত একটা কঠিন কাজ। তদুপরি লজ্জাবোধ, অহঙ্কার, মোহ-লোভ ইত্যাদি ত্যাগ করাও অত্যন্ত কঠিন। এসব কিছু পরিত্যাগ করে ঈমান আনয়নের কারণে আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ ছওয়াব প্রদান করবেন।

২. অথবা, অধিক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করার কারণে তাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেওয়া হবে। (كَمَا فِىْ فَتْحِ الْمُلْهِمِ)

৩. আল্লামা তীবী (র.) বলেন, হুযূর ﷺ-এর উপর ঈমান আনয়নের কারণে তার পূর্ববর্তী ঈমান-আমলও গৃহীত হয়ে দ্বিগুণ ছওয়াবপ্রাপ্ত হবে। (كَمَا فِى التَّعْلِيْقِ)

৪. কারো পূর্ববতী নবীর উপর ঈমান এবং মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর ঈমান এ দু'বার ঈমানের কারণে দ্বিগুণ ছওয়াব পাবে।

عَبْدٌ مَمْلُوْكٌ-এর দ্বিগুণ প্রতিদান লাভের কারণ :

১. ক্রীতদাস তার মনিবের কর্ম সম্পাদনের পর আল্লাহর হক আদায় করা অত্যন্ত কষ্টকর, তাই তাকে দ্বিগুণ ছওয়াব দেওয়া হবে।

২. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) ইবনে আবদুল বার (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, অধিক কষ্টের জন্য দ্বিগুণ প্রতিদান পাবে, দু'জনের কর্মের জন্য নয়। এর ফলে এ দ্বিগুণ ছওয়াব শুধু গোলামের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায় না। (فَتْحُ الْمُلْهِمِ)

৩. অথবা, আল্লাহর হক ও বান্দার হক এ দুই হক আদায়ের জন্য দ্বিগুণ ছওয়াব পাবে।

ক্রীতদাসীর মালিকের দ্বিগুণ ছওয়াব লাভের কারণ :

১. ক্রীতদাসীকে আদব-কায়দা ও দীনি শিক্ষা দান করত আজাদ করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে গ্রহণ করা বিরাট ত্যাগ ও সাধনার কাজ। ফলে অত্যন্ত দুঃসাধ্য কাজকে সম্পাদন করার কারণে মহান আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ ছওয়াব প্রদান করবেন।

২. অথবা, মুক্তিদান ও বিবাহ করার কারণে দু'টি ছওয়াব পাবে।

৩. অথবা, শিক্ষা ও উত্তমতার জন্য একটি আর মুক্তি ও বিবাহের একটি ছওয়াব পাবে। (اَلتَّعْلِيْقُ)

وَجْهُ تَخْصِيْصِ الثَّلَاثَةِ তিন ব্যক্তিকে বিশিষ্ট করার কারণ : আলোচ্য হাদীসে মহানবী ﷺ তিন ব্যক্তিকে দ্বিগুণ ছওয়াব লাভে বিশেষিত করার কারণ হলো, এরা মূল দায়িত্ব পালনের পর আরও অনেক অতিরিক্ত ও কষ্টকর কাজ স্বেচ্ছায় সম্পাদন করেছে। কাজেই তারা তাদের সমগ্র জীবনে যেসব পুণ্যময় কাজ করবে, যেমন– নামাজ, রোজা, হজ ইত্যাদিতে তারা দ্বিগুণ ছওয়াব লাভ করবে। যেমন– সাধারণভাবে কোনো লোক পাঁচটি ছওয়াব লাভ করলে এরা লাভ করবে দশটি।

مَعْنَى الْاَجْرِ বা اَجْر-এর অর্থ : اَلْاَجْرُ শব্দটি একবচন, বহুবচন হলো اُجُوْرٌ ; শাব্দিক অর্থ হলো– প্রতিদান, পুরস্কার, বিনিময়, প্রাপ্য ইত্যাদি।

▮ **اَجْر-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা :** اَلْاَجْرُ هُوَ الَّذِىْ يَكْفِى الْعَامِلَ لِيَعِيْشَ অর্থাৎ পরিশ্রমী ব্যক্তিকে তার কাজের বিনিময়ে যা কিছু প্রদান করা হয়, যাতে সে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে।

▮ কারো মতে, هُوَ مَا يُعْطَى الْاَجِيْرُ جَزَاءَ عَمَلِهِ অর্থাৎ নেক কাজের বিনিময়ে যা দেওয়া হয়, তাকে اَجر বলে।

مَعْنَى الْاَدَبِ বা اَدَب -এর অর্থ :

مَعْنَى الْاَدَبِ لُغَةً : اَدَب -এর আভিধানিক অর্থ : اَلْاَدَبُ শব্দটি اِسْم مَصْدَرْ একবচন, বহুবচনে اَلْاٰدَابُ শাব্দিক অর্থ হলো– শিষ্টাচার, সভ্যতা, ভদ্রতা, মননশীল আচরণ ইত্যাদি।

مَعْنَى الْاَدَبِ اِصْطِلَاحًا : اَدَب -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. اَلْاَدَبُ هُوَ وَضْعُ الشَّيْئِ فِىْ مَحَلِّهِ অর্থাৎ বস্তুকে তার যথাযথ স্থানে রাখার নামই হলো আদব বা শিষ্টাচার।

২. কারো কারো মতে– هِىَ رِيَاضَةُ النَّفْسِ بِالتَّعْلِيْمِ وَالتَّهْذِيْبِ عَلٰى مَا يَنْبَغِىْ

৪. ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, আদব হলো এমন আচরণ বা গুণ যা মানুষকে অভদ্র কার্যকলাপ হতে বাঁচিয়ে রাখে।

৫. আল্লামা আযহারী বলেন, اَدَبٌ হলো এমন আচরণ বা গুণ, যা মানুষকে অশালীন কার্যকলাপ হতে বাঁচিয়ে রাখে।

فَلَهُ اَجْرَانِ -কে দ্বিরুক্তিকরণের কারণ : এ হাদীসের প্রথমে ثَلَاثَةٌ لَهُمْ اَجْرَانِ বলার পর পুনরায় হাদীসের শেষে فَلَهُ اَجْرَانِ বলার কারণ হলো–

১. لَهُمْ اَجْرَانِ বলার পর দীর্ঘ আলোচনা হওয়ায় শ্রোতাকে পুনরায় মনোযোগী করার জন্য দ্বিতীয়বার তা উল্লেখ করা হয়েছে।

২. অথবা, فَلَهُ اَجْرَانِ অংশটি দাসী সংক্রান্ত বক্তব্যের পর আনয়ন করে দাসীর প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কেননা, মানুষ দাসীকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে।

৩. অথবা, "لَهُ"-এর "ه" যমীরটি পৃথক পৃথকভাবে বর্ণিত তিন ব্যক্তির প্রত্যেকের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে এবং এর দ্বারা تَاكِيْد করা হয়েছে। (اَلتَّعْلِيْقُ)

حَيَاةُ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ হযরত আবূ মূসা আল-আশআরী (রা.)-এর জীবনী :

১. **নাম ও পরিচিতি :** তাঁর নাম আবদুল্লাহ, উপনাম আবূ মূসা। এ নামে তিনি অত্যধিক পরিচিত। পিতার নাম কায়স, মাতার নাম তায়্যেবা। তিনি ইয়ামেনের আল-আশআর গোত্রের লোক ছিলেন বিধায় তাঁকে আল-আশআরী বলা হয়।

২. **ইসলাম গ্রহণ :** তিনি মক্কা নগরীতে ইসলামের প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইয়ামেন থেকে এসে রাসূলের সান্নিধ্য অর্জন করেন। প্রথমে হাবশায় এরপর মদীনায় হিজরত করেন।

৩. **রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন :** রাসূল ﷺ তাঁকে ১০ম হিজরিতে আদনার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। হযরত ওমর (রা.)-এর শাসনামলে বসরা ও কূফার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন।

৪. **স্বভাব চরিত্র :** তিনি অত্যন্ত সহজ-সরল ও উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। আল্লাহর ভয়ে সর্বদা অশ্রু বিসর্জন করতেন।

৫. **হাদীস শাস্ত্রে অবদান :** তিনি اَلْمُقِلُّوْنَ তথা তৃতীয় স্তরের রাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সর্বমোট ৩৬০ খানা হাদীস রেওয়ায়েত করেন। ৫০ টি হাদীস مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ আর ৪৫ টি ইমাম বুখারী এবং ২৬ টি ইমাম মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেন।

৬. **ইন্তেকাল :** আল্লামা আইনীর মতে, ৫৪ হিজরিতে ৬৩ বছর বয়সে কূফায় ইন্তেকাল করেন। মিশকাতের আসমাউর রিজালের বর্ণনা অনুসারে তিনি ৫২ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

وَعَنْ ١٠ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ فَإِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَصَمُوْا مِنِّىْ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . إِلَّا أَنَّ مُسْلِمًا لَمْ يَذْكُرْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ .

১০. **অনুবাদ :** হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– আমাকে এ মর্মে আদেশ করা হয়েছিল যে, যে পর্যন্ত লোকেরা এ সাক্ষ্য প্রদান না করে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল, আর নামাজ প্রতিষ্ঠা না করে, জাকাত আদায় না করে, সে পর্যন্ত আমি যেন তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাই। অতঃপর তারা যখন এসব কাজ করবে তখন আমার পক্ষ হতে তাদের জীবন ও সম্পদ নিরাপদ থাকবে। কিন্তু ইসলামের বিধানানুযায়ী কোনো দণ্ড পাওয়ার যোগ্য অপরাধ করলে তা তাকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে। আর তাদের [অন্তরের ব্যাপারে] হিসাব নিকাশের ভার আল্লাহর উপরই ন্যস্ত।–[বুখারী ও মুসলিম] কিন্তু ইমাম মুসলিম إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ [ইসলামের দণ্ড ব্যতীত] বাক্যটির উল্লেখ করেননি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে মহানবী ﷺ তিনটি কাজ পরিত্যাগকারীর বিরুদ্ধে লড়াই করার আবশ্যকতার বিষয় তুলে ধরেছেন। সে কাজগুলো হলো– ১. ঈমান, ২. নামাজ প্রতিষ্ঠা ও ৩. জাকাত প্রদান করা। কোনো ব্যক্তি যদি এ কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পাদন করে তবে তার জীবন ও ধন-সম্পদ ইসলামি রাষ্ট্রের পক্ষ হতে নিরাপত্তা লাভ করবে। আর যদি এর কোনো একটির ব্যতিক্রম হয় তথা অস্বীকার করে, তাহলে তার বিরুদ্ধে লড়াই করার ঘোষণা রয়েছে।

এর দ্বারা এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, উল্লিখিত তিনটি কর্ম যার মধ্যে পাওয়া যাবে তার জীবন ও সম্পদ নিরাপদে থাকবে, যদিও সে অন্যান্য বিধান অস্বীকার করুক না কেন। তবে শরিয়ত মতে যদি সে কোনো শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে, তবে তাকে তা অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

سَبَبُ إِرْشَادِ الْحَدِيْثِ হাদীস বর্ণনার উপলক্ষ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রা.) বলেন, খায়বার যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে একদা নবী করীম ﷺ বললেন, আগামীকাল এমন এক ব্যক্তির হাতে ঝাণ্ডা দেব, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে, আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও তাকে ভালোবাসেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ আরো বললেন, ইন্শাআল্লাহ সেই ব্যক্তির হাতেই আল্লাহ মু'মিনদেরকে বিজয় দান করবেন। অতঃপর পরদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আলী (রা.)-কে ডেকে তাঁর হাতে ঝাণ্ডা দিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, আলী! তোমার হাতেই আল্লাহ বিজয় দান করবেন। তখন হযরত আলী (রা.) বললেন, হে আল্লাহর নবী ! আমি তাদের বিরুদ্ধে কখন পর্যন্ত লড়াই করব ? তখন নবী করীম ﷺ উল্লিখিত হাদীসটি বর্ণনা করলেন।

لِمَ لَمْ يَذْكُرِ الصُّلْحَ وَالْجِزْيَةَ؟ কেন সন্ধি ও জিজিয়ার কথা উল্লেখ করলেন না? : আলোচ্য হাদীসে সন্ধি ও জিজিয়া (কর) প্রদানকে লড়াইয়ের উদ্দেশ্য নিরূপণ না করার কারণ হলো, হাদীসে বর্ণিত اَلنَّاسُ (মানুষ) দ্বারা শুধু তৎকালীন আরবের লোকদের কথা বুঝানো হয়েছে। কেননা, বৈয়াকরণিকদের মতে, اَلنَّاسُ (মানুষ) শব্দের আলিফ লামটি আহাদ অর্থাৎ নির্দিষ্ট অর্থবোধক। অথবা এখানে اَلنَّاسُ শব্দ দ্বারা আরব অনারব সকল লোকের কথা বুঝানো হয়েছে, যেমন– حَتّٰى يَشْهَدَ ভাষ্য দ্বারা বুঝা যায়, অর্থাৎ লোকগণ যদি মুসলমানদের আরোপিত শর্তসমূহ মেনে নেয় যদিও ঈমান এনে বা সন্ধি জিজিয়া (কর) প্রদান করে হোকনা কেন, তবেই তাদের সাথে লড়াই বন্ধ থাকবে। অতএব এ ক্ষেত্রে বুঝা যায় যে, এখানে حَتّٰى শব্দটি লড়াইয়ের কারণ বর্ণনার জন্য উল্লেখ হয়েছে। আর আলোচ্য হাদীসে সন্ধি ও জিজিয়া (কর)-এর কথা উল্লেখ না করার এ কারণও হতে পারে যে, এ দু'টি বিষয় কুরআন মাজীদের লড়াইয়ের মর্ম সম্বলিত আয়াতে বর্ণিত রয়েছে। সুতরাং এখানে বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন।

وَجْهُ عَدَمِ ذِكْرِ الصَّوْمِ وَالْحَجِّ রোজা ও হজের উল্লেখ না করার কারণ : রোজা ও হজ ইসলামের অন্যতম দু'টি স্তম্ভ হওয়া সত্ত্বেও উক্ত হাদীসে এ দু'টির কথা উল্লেখ না করার কারণসমূহ নিম্নরূপ–

১. ইবাদত মূলত দুই প্রকার। যথা– عِبَادَةٌ مَالِي এবং بَدَنِي উক্ত হাদীসে عِبَادَةٌ بَدَنِي -এর মধ্য হতে صَلَاة আর عِبَادَةٌ مَالِي হতে زَكُوة -কে উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে হজ ও সওম এগুলোর মধ্যে শামিল হয়ে গেছে।

২. শাইখুল হিন্দ আল্লামা মাহমূদ হাসান (র.) বলেন, যেখানে أَرْكَان বর্ণনা উদ্দেশ্য হয়; সেখানে সমস্ত আরকান উল্লেখ করা হয়। যেমন– بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ। الخ আর যেখানে اركان। বর্ণনা করা উদ্দেশ্য হয় না সেখানে বিশেষ কয়েকটি উল্লেখ করা হয়। এ রকম কুরআনেও পাওয়া যায়। যেমন– فَإِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ الخ এখানে তিনটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. আল্লামা ইবনু সালাহ (র.) বলেন, মূলত হাদীসের মধ্যে صَوْم ও حَجّ -এর উল্লেখ ছিল, কিন্তু বর্ণনাকারী তা উল্লেখ করেননি।

৪. অথবা, উল্লিখিত তিনটি কাজ কারো দ্বারা সম্পাদিত হলে বাকিগুলো সে অনায়াসেই করতে পারবে। তাই সওম ও হজকে উল্লেখ করা হয়নি।

৫. কিছু সংখ্যকর মতে, আলোচ্য হাদীসটি বর্ণনার সময় صَوْم ও حَجّ ফরজ হয়নি, তাই এগুলোর উল্লেখ হয়নি।

إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ -এর অর্থ : কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনয়ন করে, নামাজ পড়ে ও জাকাত প্রদান করে, সে তার জান ও মালের নিরাপত্তা লাভ করবে। কিন্তু ইসলামের বিধান মতে কোনো হক বিনষ্ট করলে, তথা শরিয়ত সম্মত কোনো শাস্তির উপযুক্ত হলে, তা হতে রেহাই পাবে না। যেমন অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, ব্যভিচার করা, চুরি করা ইত্যাদির শাস্তি। এ সকল ক্ষেত্রে সে শুধু মুসলমান হওয়ার কারণে শাস্তি হতে রেহাই পাবে না ; বরং তার উপর قِصَاص ও حَدّ জারি হবেই। এটাই ইসলামের হক। এক্ষেত্রে মানুষের কোনো এখতিয়ার নেই।

وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ -এর অর্থ : মহানবী ﷺ -এর বাণী وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ -এর মর্মার্থ হলো মৌখিক স্বীকৃতি ও বাহ্যিক কাজকর্মে ঠিক থেকে যদি কোনো ব্যক্তি তার অন্তরে নেফাকী, কুফরি ও পাপাচার লুকিয়ে রাখে, তবে এর দায়িত্ব রাসূলের বা কোনো মানুষের উপর ন্যস্ত হবে না। কেননা, তা মানুষের সাধ্যের বাইরে ; তাই তার অন্তরের বিষয়াবলির দায়িত্ব কেবল মহান আল্লাহর উপরই ন্যস্ত। কেননা, তিনিই হলেন অন্তর্যামী। কাজেই আল্লাহ তার হিসাব-নিকাশ নিবেন, এ দিকে ইঙ্গিত করেই মহান আল্লাহ রাসূল ﷺ কে লক্ষ্য করে বলেছেন–

مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ.

আল্লামা আহমদ আলী সাহারানপুরী (র.) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, وَحِسَابُهُمْ بَعْدَ هٰذِهِ الْاَشْيَاءِ عَلَى اللّٰهِ فِيْ أَمْرِ سَرَائِرِهِمْ

اَلْقِتَالُ يَنْتَهِيْ بِالشَّهَادَةِ فَمَا فَائِدَةُ ذِكْرِ الصَّلٰوةِ وَ الزَّكَاةِ শাহাদাতের মাধ্যমে লড়াই বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও صلوة ও زَكٰوة -এর উল্লেখের উপকারিতা কি? : ঈমান আনয়নের মাধ্যমে যদিও ব্যক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ স্থগিত হয়ে যায় তথাপি সালাত ও জাকাতের কথা উল্লেখের কারণ নিম্নরূপ–

১. ঈমান আনয়ন তো শুধু মৌখিক স্বীকারোক্তি, আর সালাত ও জাকাত আদায় তো সত্যিকারের মু'মিন হওয়ার নিদর্শন। এ কারণে এগুলোকে পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেন।

২. কারো মতে, এসব বিধিবিধান পালনের মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করা যায়, তাই এগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. কিছু সংখ্যকের মতে, ইসলামের এসব গুরুত্বপূর্ণ রোকনসমূহের বাস্তবায়ন দ্বারা ঈমানের দৃঢ়তা হয় এবং ঈমানদার ক্রমান্বয়ে পরিপূর্ণতার স্তরে উপনীত হয়।

৪. কোনো কোনো মুহাদ্দেসীনের মতে, শরিয়তের ফরজ ওয়াজিব তরককারীদের বিরুদ্ধেও জিহাদ অপরিহার্য। যেমন– হযরত আবূ বকর (রা.) জাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন। এমনকি আজান, খুতবা ইত্যাদি ইসলামের শেয়ারসমূহের বিরুদ্ধাচারীদের বিরুদ্ধেও জিহাদ ফরজ।

إِقَامَةُ الصَّلٰوةِ দ্বারা উদ্দেশ্য :

১. إِقَامَةُ الصَّلٰوةِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ধীরস্থিরভাবে নামাজের রোকনসমূহকে আদায় করা।

২. অথবা, নামাজ শর্তসমূহের সাথে আদায় করার ব্যাপারে দৃঢ় থাকা।

৩. অথবা, অলসতা ও ক্রটি-বিচ্যুতি ব্যতীত নামাজ আদায় করার ব্যাপারে দৃঢ় থাকা।

৪. অথবা, إِقَامَةُ الصَّلٰوةِ দ্বারা সাধারণভাবে নামাজ আদায় করাকে বুঝানো হয়েছে।

৫. হাদীসে বর্ণিত নামাজ দ্বারা ফরজ নামাজকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

وَعَنْ ١١ اَنَسٍ (رضـ) اَنَّهٗ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى صَلٰوتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَاَكَلَ ذَبِيْحَتَنَا فَذٰلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِىْ لَهٗ ذِمَّةُ اللّٰهِ وَذِمَّةُ رَسُوْلِهٖ فَلَا تُخْفِرُوا اللّٰهَ فِىْ ذِمَّتِهٖ ـ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

১১. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– যে ব্যক্তি আমাদের ন্যায় নামাজ পড়ে, আমাদের কেবলাকেই কেবলা হিসেবে স্বীকার করে এবং আমাদের জবাইকৃত পশু খায় ; সে অবশ্যই মুসলমান। তার [জীবন ও সম্পদ রক্ষার] ব্যাপারে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই জিম্মাদার। অতএব তোমরা আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কর না। [অর্থাৎ ইসলামি বিধান ব্যতীত তার জীবন, সম্পদ ও ইজ্জত - আবরুর উপর হস্তক্ষেপ করো না।] –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে মহানবী ﷺ তিনটি জিনিসকে প্রকৃত মুসলমান হওয়ার নিদর্শন বলেছেন। আর সে তিনটি নিদর্শন হলো–

১. নামাজ পড়া, ২. কা'বা শরীফকে কেবলারূপে গ্রহণ করা এবং ৩. মুসলমানদের জবাইকৃত প্রাণীর গোশত ভক্ষণ করা। উল্লেখ্য যে, এখানে কালিমার সাক্ষ্যের কথা বলা হয়নি। কেননা, যারা কালিমায় বিশ্বাস করে না, তাদের নামাজ পড়ার প্রশ্নই আসে না। নামাজ আদায় করলে বুঝতে হবে যে, সে ব্যক্তি অবশ্যই কালিমায় বিশ্বাসী।

مَنْ صَلّٰى صَلٰوتَنَا বলার পর اِسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا বলার কারণ : মুসলমানগণ স্বভাবতই কিবলামুখি হয়ে নামায আদায় করে। তারপরও এখানে اِسْتِقْبَال قِبْلَة -এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো, রাসূল ﷺ-এর যুগে অনেক ইহুদি-নাসারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল ; কিন্তু তারা তাদের পূর্ববর্তী কেবলা বাইতুল মুকাদ্দাসকে ছেড়ে দিতে ইতস্তত প্রকাশ করে। ফলে মহানবী ﷺ তাদের মন জয় করার জন্য ১৬/১৭ মাস বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামাজ আদায় করেন। এরপর রাসূল ﷺ -এর একান্ত মনের ইচ্ছানুযায়ী মহান আল্লাহ কেবলাকে পরিবর্তন করে বাইতুল্লাহমুখি করলে ইহুদি নাসারাগণ কা'বার দিকে ফিরে নামাজ পড়তে অনীহা প্রকাশ করে। তখন মহানবী ﷺ এ বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপের জন্য اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ -এর কথা উল্লেখ করেন।

"اَكَلَ ذَبِيْحَتَنَا"-এর ব্যাখ্যা : ذَبِيْحَة শব্দটি এখানে مَذْبُوْحَة তথা জবাইকৃত অর্থে ব্যবহৃত, তথা জবাইকৃত পশুর গোশ্ত। এ হাদীসে মুসলমানদের জবাইকৃত পশুর গোশ্ত খাওয়া ইসলামের নিদর্শন হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। যেহেতু ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যের কারণে বিধর্মীগণ মুসলমানদের জবাইকৃত পশুর গোশ্ত ভক্ষণ করে না।

এ ছাড়া অভিশপ্ত ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মধ্যে যারা মুসলমান হওয়ার দাবি করত ; তারা হিংসাবশত মুসলমানদের জবাইকৃত পশুর গোশ্ত খেত না। তাদের এই হঠকারিতার জন্য পরিপূর্ণ মুসলমান হওয়ার লক্ষ্যে মুসলমানদের জবাইকৃত পশুর গোশত খাওয়ার আবশ্যকতা রয়েছে।

অথবা, উপস্থিত সাহাবীদের মধ্যে মুসলমানদের জবাইকৃত গোশ্ত খেতে কারো অনীহা লক্ষ্য করেই তা সংশোধনের জন্য রাসূলে কারীম ﷺ উল্লিখিত কথাটি বলেছেন।

شَهَادَتَيْنِ -এর উল্লেখ না করার কারণ : আলোচ্য হাদীসে মহানবী ﷺ ইসলামের মৌলিক তিনটি বিষয় উল্লেখ করেছেন, অথচ شَهَادَتَيْنِ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ হওয়া সত্ত্বেও তা উল্লেখ করেননি। এর কয়েকটি কারণ হতে পারে, যা নিম্নরূপ–

১. নামাজ আদায় করতে হলে যে কোনো ব্যক্তিকে অবশ্যই شَهَادَتَيْنِ গ্রহণ করতে হবে। কেননা, شَهَادَتَيْنِ ব্যতীত ঈমানই হবে না, নামাজ তো পরের কথা। এ কারণে شَهَادَتَيْنِ -এর কথা ভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

২. অথবা, হাদীসটি ইহুদি-খ্রিস্টানদের এমন একটি বিশেষ দলের প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, যারা شَهَادَتَيْنِ -এর সাক্ষ্য প্রদান করত; কিন্তু সালাতসহ অন্যান্য বিষয়ের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করত না। তাই উক্ত হাদীসে পরিপূর্ণ মু'মিন হওয়ার জন্য উল্লিখিত বিষয়াবলির শর্তারোপ করা হয়েছে।

৩. কারো মতে, شَهَادَتَيْنِ -এর ব্যাপারটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ থাকায় তা উল্লেখ করা হয়নি।

مَعْنٰى قَوْلِهٖ ذِمَّةُ اللّٰهِ وَ ذِمَّةُ رَسُوْلِهٖ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জিম্মার অর্থ : ذِمَّةٌ শব্দের অর্থ হলো– নিরাপত্তার দায়িত্বভার নেওয়া বা নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া। কাজেই উক্ত হাদীসাংশের অর্থ হবে– আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। একজন মানুষ যখনই আল্লাহ প্রদত্ত এবং রাসূল ﷺ প্রদর্শিত জীবন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে মনে-প্রাণে মেনে নেবে তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। যেমন কুরআন হাকীমে ইরশাদ হয়েছে–

١. اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الخ ٢. ثُمَّ نُنَجِّيْ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَذٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ -

এমনিভাবে রাসূলে কারীম ﷺ -এর পক্ষ হতেও নিরাপত্তার জিম্মাদারি রয়েছে। যেমন অন্য হাদীসে এসেছে–

١. مَنْ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ عَصَمُوْا مِنِّيْ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلَّا بِحَقِّ الْاِسْلَامِ .

وَعَنْ ١٢ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ اَتٰى اَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ دُلَّنِيْ عَلٰى عَمَلٍ اِذَا عَمِلْتُهٗ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَاتُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلٰوةَ الْمَكْتُوْبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكٰوةَ الْمَفْرُوْضَةَ وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ . قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَا اَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا شَيْئًا وَلَا اَنْقُصُ مِنْهُ . فَلَمَّا وَلّٰى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَنْظُرَ اِلٰى رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ اِلٰى هٰذَا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১২. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলে কারীম ﷺ -এর দরবারে একজন বেদুঈন আগমন করে বলল, [হে আল্লাহর নবী!] আমাকে এমন একটি কাজের দিকে পথ প্রদর্শন করুন, যা করলে আমি বেহেশতে প্রবেশ করতে পারব। রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবে না, ফরজ নামাজসমূহ যথাযথভাবে আদায় করবে, নির্ধারিত জাকাত প্রদান করবে এবং রমজানের রোজা রাখবে। অতঃপর বেদুঈন লোকটি বলল, সে সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন ! আমি এর বেশি কিছু করব না এবং কমও করব না। এরপর যখন লোকটি প্রস্থান করল, তখন নবী কারীম ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি কোনো জান্নাতী লোক দেখে খুশি হতে চায়; সে যেন এ লোকটিকে দেখে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَعَارُفُ الْاَعْرَابِيِّ গ্রাম্য লোকটির পরিচয় : হাদীসে উল্লিখিত اَعْرَابِيٌّ তথা বেদুঈন লোকটি ছিলেন কায়স গোত্রের সর্দার। তাঁর নাম ছিল ইবনুল মুলতাফিক।

ইমাম সায়রাফী (র.)-এর মতে, উক্ত লোকটির নাম ছিল (لَقِيْطُ بْنُ صَبُرَةَ) লাকীত ইবনে সাবুরা। তিনি বনী মুলতাফিকের সর্দার ছিলেন। ৭ম হিজরিতে রাসূলের দরবারে এসে জান্নাত লাভের উপায় সম্পর্কে উক্ত প্রশ্নটি করেছিলেন।

لَا اَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا وَلَا اَنْقُصُ -এর দ্বারা উদ্দেশ্য : আগন্তুক বেদুঈন লোকটির উক্তি لَا اَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا وَلَا اَنْقُصُ مِنْهُ شَيْئًا -এর কয়েকটি ব্যাখ্যা হতে পারে, যা নিম্নরূপ–

১. فَيْضُ الْبَارِيْ গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, বাক্যে هٰذَا এবং مِنْهُ উভয়টি দ্বারা শরিয়তের ফরজ বিধানসমূহের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাই মূল বাক্যটি হবে– لَا اَزِيْدُ عَلٰى هٰذِهِ الْاُمُوْرِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِيْ عَلَّمَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَا اَنْقُصُ مِنْهَا
অর্থাৎ রাসূলে কারীম ﷺ শরিয়তের যে বিধানাবলি আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন তার সীমার মধ্যে কমবেশি করব না।

২. আল্লামা তীবী (র.) বলেন, উল্লিখিত উক্তি দ্বারা تَصْدِيْق ও কবুল সম্পর্কে তাঁর স্বীকৃতি পাওয়া গেছে। তাই মূল ব্যক্যটি হবে– قَبِلْتُ كَلَامَكَ قَبُوْلًا فَلَا اَزِيْدُ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ السُّؤَالِ وَلَا اَنْقُصُ فِيْهِ مِنْ طَرِيْقِ الْقَبُوْلِ
অর্থাৎ আমি আপনার কথা কবুল করে নিলাম। কাজেই এর উপর কোনো প্রশ্ন করব না এবং কবুলের দিক থেকেও কমাব না।

৩. فَتْحُ الْمُلْهِمِ গ্রন্থকার এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, لَا اَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا بِالنَّوَافِلِ وَلَا اَنْقُصُ مِنَ الْفَرَائِضِ অর্থাৎ আমি কোনো ফরজকে কমাব না এবং তার সাথে কোনো নফল সংযোজন করব না।

৪. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) বলেন যে, লোকটি রাসূলের নিকট শরিয়তের ব্যাপারে কিছুটা رُخْصَةٌ চেয়েছিল। রাসূল ﷺ তাকে رُخْصَةٌ দেওয়ায় সে বলেছিল আমি رُخْصَةٌ -এর উপর কমবেশি করব না।

৫. অথবা, লোকটি যেহেতু তার গোত্রের প্রতিনিধি ছিল, সেহেতু তাঁর কথার অর্থ হলো–
لَا اَزِيْدُ عَلٰى مَاسَمِعْتُ وَلَا اَنْقُصُ مِنْهُ فِى التَّبْلِيْغِ .
৬. অথবা, এখানে هٰذَا দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اَلسُّؤَالُ আর "مِنْهُ" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اَلْعَمَلُ সুতরাং তখন বাক্যটির অর্থ হবে– لَا اَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا السُّؤَالِ وَلَا اَنْقُصُ مِنْهُ فِى الْعَمَلِ অর্থাৎ আমি আর অতিরিক্ত প্রশ্ন করব না এবং আমলের দিক থেকে এর থেকে কমাব না।
৭. অথবা, এখানে هٰذَا দ্বারা نَوَافِلْ আর مِنْهُ দ্বারা فَرَائِضْ উদ্দেশ্য ; তাই বাক্যটির অর্থ হবে–
لَا اَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا بِالنَّوَافِلِ وَلَا اَنْقُصُ مِنَ الْفَرَائِضِ .
৮. অথবা, এ উক্তি দ্বারা আগত লোকটির শরিয়তের বিধানের উপর সুদৃঢ় থাকার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

وَجْهُ عَدَمِ ذِكْرِ الشَّهَادَةِ **কালিমায়ে শাহাদাত উল্লেখ না করার কারণ** : উল্লিখিত হাদীসে شَهَادَة উল্লেখ না করার পিছনে হাদীস বিশারদগণ নিম্নোক্ত কারণসমূহ উল্লেখ করেছেন–

১. আল্লামা কিরমানী (র.) বলেন, প্রশ্নকারী বেদুঈন লোকটি পূর্ব হতেই মুসলমান ছিল, তাই شَهَادَة -এর উল্লেখ করা হয়নি।
২. অথবা, شَهَادَة -এর ব্যাপারটি অতি প্রসিদ্ধ থাকায় তা উল্লেখ করা হয়নি।
৩. কিংবা لَاتُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا -এর মধ্যে شَهَادَة -এর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, তাই উল্লেখ করা হয়নি।
৪. অথবা, شهادة -এর কথা উল্লেখ করা হয়েছিল ; কিন্তু বর্ণনাকারী দূরত্বের কারণে তা শুনতে পাননি।
৫. অথবা, বর্ণনাকারী সংক্ষেপ করার জন্য شَهَادَة -এর কথা উল্লেখ করেননি।
৬. অথবা, প্রশ্নকারীর প্রশ্নানুপাতে রাসূল ﷺ উত্তর প্রদান করেছেন, ফলে তার প্রশ্নে شَهَادَة -এর সম্পর্কে ছিল না। বিধায় উল্লেখ করা হয়নি।
৭. কিংবা شَهَادَة ব্যতীত তো ঈমানই হবে না ; নামাজ তো দূরের কথা! এ কারণেই উল্লেখ করা হয়নি।

وَجْهُ عَدَمِ ذِكْرِ الْحَجِّ **হজের উল্লেখ না করার কারণ** : আলোচ্য হাদীসে বেদুঈনের প্রশ্নের জবাবে নামাজ, রোজা ও জাকাতের বিষয় উল্লেখ থাকলেও হজের বিষয় উল্লেখ করা হয়নি। এর কয়েকটি কারণ রয়েছে–

১. বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে হজ তখনও ফরজ হয়নি। কেননা, বেদুঈন লোকটি ৫ম হিজরিতে মহানবী ﷺ-এর নিকট এসেছিল। আর হজ ফরজ হয়েছিল ৯ম হিজরিতে।
২. অথবা, হজ যেহেতু সামর্থ্যবানদের উপর ফরজ হয়ে থাকে। প্রশ্নকারী লোকটি দরিদ্র ছিল বিধায় হজের কথা উল্লেখ করা হয়নি।
৩. অথবা, হাদীসে নিত্য-নৈমিত্তিক ও সাংবাৎসরিক আমলসমূহের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। হজ যেহেতু জীবনে একবার এবং দৈহিক ও আর্থিক সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল। তাই হজের বিষয় উল্লেখ করা হয়নি।
৪. কিংবা সংক্ষিপ্তকরণ বা ভুলের কারণে বর্ণনাকারী তা উল্লেখ করেননি।
৫. অথবা, হজ বিলম্বে অবকাশের সাথে আদায় করা যায় বলে এর উল্লেখ করা হয়নি।
৬. অথবা, হজের বিষয়টি আরবদের নিকট পূর্ব হতেই প্রসিদ্ধ ছিল বিধায় উল্লেখ করেননি।

وَعَنْ ۱۳ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الثَّقَفِيِّ (رض) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُلْ لِّيْ فِى الْاِسْلَامِ قَوْلًا لَا اَسْاَلُ عَنْهُ اَحَدًا بَعْدَكَ وَفِىْ رِوَايَةٍ غَيْرَكَ قَالَ قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৩. **অনুবাদ** : হযরত সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ ছাকাফী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ! ইসলাম সম্পর্কে আমাকে এমন একটি কথা বলে দিন, যা সম্পর্কে আপনার পরে আর কাউকে জিজ্ঞাসা করব না। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে, আপনি ব্যতীত আর কাউকে জিজ্ঞাসা করব না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আল্লাহর ওপর ঈমান আনয়ন করেছি' এটা বল এবং এর উপর অবিচল থাক। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِسْتِقَامَةَ **-এর অর্থ** : اِسْتِقَامَةَ শব্দটি মাসদার, শাব্দিক অর্থ– স্থির থাকা, প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং স্থিতিশীল থাকা। শরিয়তের পরিভাষায়, অনুকূল-প্রতিকূল সর্বাবস্থায় ঈমানের উপর অবিচল থাকাকে اِسْتِقَامَةَ বলা হয়।

عَلَّامَةْ طِيْبِيْ(رح) বলেন– اَلْإِسْتِقَامَةُ هِيَ الْإِتْيَانُ لِجَمِيْعِ الْأَوَامِرِ وَالْإِنْتِهَاءُ عَنْ جَمِيْعِ الْمَنَاهِيْ অর্থাৎ শরিয়তের যাবতীয় আদেশ পালন করা এবং সব রকম নিষেধ বর্জন করাই হলো اِسْتِقَامَة কেননা, যদি কেউ কোনো আদেশকে পরিহার করে আর কোনো নিষেধকে পালন করে তবে اِسْتِقَامَة হবে না, আর এটা অত্যন্ত কঠিন কাজ। এ জন্য স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– اِسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ তোমাকে যেরূপ আদেশ করা হয়েছে তদ্রূপ তুমি ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক।

হযরত ওমর (রা.) বলেন– اَلْإِسْتِقَامَةُ اَنْ تَسْتَقِيْمَ عَلَى الْاَمْرِ وَ النَّهْيِ وَلَاتَرُوْغَ رَوْغَانَ الثَّعَالِب অর্থাৎ শরিয়তের যাবতীয় আদেশ নিষেধের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকাই اِسْتِقَامَة; খেকশিয়ালের ন্যায় সুবিধাবাদীর ভূমিকায় থেক না।

হযরত আবূ বকর (রা.) বলেন– اَلْإِسْتِقَامَةُ اَنْ لَاتُشْرِكَ بِاللّٰهِ شَيْئًا (يُرِيْدُ الْإِسْتِقَامَةُ مَحْضَ التَّوْحِيْدِ)

হযরত ওসমান (রা.) বলেন– اِسْتَقِيْمُوْا اَىْ اَخْلِصُوا الْعَمَلَ لِلّٰهِ

হযরত আলী ও ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– اِسْتَقِيْمُوْا اَىْ اَدُّوا الْفَرَائِضَ

বস্তুত বিভিন্ন পরিচয় প্রদান করলেও সবার উদ্দেশ্য এক, এর উপর অবিচল থাকা অত্যন্ত কঠিন কাজ। এ জন্য সূফিয়ায়ে কেরাম বলেছেন– اَلْإِسْتِقَامَةُ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ كَرَامَةٍ অর্থাৎ اِسْتِقَامَة সহস্র কারামাত হতেও উত্তম।

ইমাম গাযালী (র.) বলেছেন যে, পার্থিব জীবনে ইস্তিকামাতের অধিকারী হওয়া এমন কঠিন, যেমন পুলসিরাত অতিক্রম করা কঠিন হবে।

وَعَنْ ١٤ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ (رضـ) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّاْسِ نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهٖ وَلَانَفْقَهُ مَايَقُوْلُ حَتّٰى دَنَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْاِسْلَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ فَقَالَ لَا اِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهٗ قَالَ لَا اِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ قَالَ وَ ذَكَرَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الزَّكٰوةَ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا فَقَالَ لَا اِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ قَالَ فَاَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ لَا اَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا وَلَا اَنْقُصُ مِنْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْلَحَ الرَّجُلُ اِنْ صَدَقَ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৪. অনুবাদ : হযরত ত্বালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে নজদের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত এক ব্যক্তি আগমন করল, যার মাথায় চুল ছিল বিক্ষিপ্ত। আমরা তার ফিসফিস আওয়াজ শুনছিলাম; কিন্তু কিছুই বুঝছিলাম না। এমনকি সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটবর্তী হলো এবং ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করল। জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা। অতঃপর লোকটি বলল, এ ছাড়া আমার উপর আর কোনো [ফরজ নামাজ] আছে কিনা? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, না, তবে নফল পড়তে পার। এরপর রাসূল ﷺ বললেন, আর রমজান মাসে রোজা রাখা। লোকটি বলল, এটা ব্যতীত আমার উপর আর কোনো কর্তব্য [ফরজ রোজা] আছে কিনা ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, না, তবে নফল হিসেবে রাখতে পার।

বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার নিকট জাকাতের কথাও উল্লেখ করলেন। এরপর সে বলল, এটা ব্যতীত আমার উপর আর কোনো কর্তব্য আছে কি ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, না, তবে নফল হিসেবে দান করতে পার।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর লোকটি একথা বলতে বলতে চলে গেল যে, আল্লাহর কসম আমি এর চেয়ে বেশি কিছু করব না এবং এর থেকে কমও করব না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, লোকটি যদি সত্য বলে থাকে তবে সে সফলকাম হয়েছে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَعَارُفُ ثَائِرِ الرَّأْسِ বিক্ষিপ্তচুল বিশিষ্ট লোকটির পরিচয় : আল্লামা ইবনু আবদিল বার, ইবনু বাত্তাল, ইবনুল আরাবী এবং মুনযিরসহ প্রমুখ ওলামায়ে কেরামের মতে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে আগত বিক্ষিপ্ত চুল বিশিষ্ট লোকটির নাম ছিল (ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ) যিমাম ইবনে ছা'লাবা। তিনি নজদ প্রদেশের বনী সা'দ গোত্রের প্রতিনিধি হিসেবে রাসূলের নিকট এসেছিলেন।

مَتٰى جَاءَ الرَّجُلُ؟ লোকটি কখন এসেছে? : ১. অধিকাংশের মতে, লোকটি ৫ম হিজরিতে রাসূলে কারীম ﷺ-এর নিকট আগমন করেছেন। ২. কারো মতে, ৬ষ্ঠ হিজরিতে এসেছে। ৩. কিছু সংখ্যক বলেন, ৭ম হিজরিতে আগমন করেছেন। ৪. আরেক দল ওলামার মতে, ৯ম হিজরিতে হজ ফরজ হওয়ার প্রাক্কালে এসেছে।

إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ দ্বারা উদ্দেশ্য : [অথবা نَفْل শুরু করলে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব কিনা ?]

উল্লিখিত হাদীসে রাসূলে কারীম ﷺ-এর বাণী "إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ" -এর মর্মার্থ নিয়ে ফুকাহাদের মাঝে মতানৈক্য বিদ্যমান, যা নিম্নরূপ–

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ (رح) : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, এখানে إِسْتِثْنَاء টি হলো مُنْفَصِلْ তাই মূল ইবারত হবে– إِلَّا إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَطَوَّعَ فَذٰلِكَ لَكَ অর্থাৎ তোমার উপর আর কোনো কিছু ফরজ নেই, কিন্তু যদি নফল হিসেবে আর কোনো ইবাদত করতে চাও, তবে তা তোমার ইচ্ছাধীন। আর নফল শুরু করলে তা পরিপূর্ণ করা তোমার উপর [ওয়াজিব] আবশ্যক নয়। তিনি দলিল হিসেবে বলেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন– اَلصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيْرٌ عَلٰى نَفْسِهِ

مَذْهَبُ الْأَحْنَافِ : হানাফীদের মতে, এখানে إِسْتِثْنَاء টি হলো مُتَّصِلْ তাই বাক্যটির অর্থ হবে, তোমার উপর আর কোনো ফরজ নেই; কিন্তু নফল হিসেবে কোনো কাজ শুরু করলে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়ে পড়বে। তাঁদের দলিল হলো–

(١) قَوْلُهُ تَعَالٰى "لَا تُبْطِلُوْا أَعْمَالَكُمْ" . (٢) قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ إِقْضِ مَكَانَهَا .

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নফল আরম্ভ করার পর তা ওয়াজিব হয়ে যায়, তা ছাড়া অতিরিক্ত ছওয়াবের জন্য যদি কেউ মানত করে, তাহলে এটাকেও পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। আর নাম উল্লেখ করে আরম্ভ করলে তাহলে তা সম্পাদন করা ওয়াজিব হবেই।

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الشَّوَافِعِ : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর হাদীসের জবাবে বলা যায় যে, أَمِيْرٌ عَلٰى نَفْسِهِ -এর অর্থ হলো, নফল কাজ আরম্ভ করতে সে ব্যক্তি নিজের সত্তার উপর আমীর বা শাসনকর্তার মতো। তার স্বাধীনতা রয়েছে যে, সে নফল কর্ম শুরু করবে কি করবে না? কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, সে ব্যক্তি আরম্ভ করার পরও أَمِيْرٌ عَلٰى نَفْسِهِ হবে। কেননা, এর প্রতিকূলে কুরআনের আয়াত রয়েছে যে, لَاتُبْطِلُوْا أَعْمَالَكُمْ

سَبَبُ عَدَمِ ذِكْرِ الشَّهَادَةِ – শাহাদাত-এর উল্লেখ না করার কারণ : উল্লিখিত হাদীসে شَهَادَةْ -এর উল্লেখ না করার কতগুলো কারণ হাদীস বিশারদগণ উল্লেখ করেছেন। যেমন–

১. আল্লামা কিরমানী (র.) বলেন, লোকটি পূর্ব হতেই মুসলমান ছিল, তাই شَهَادَةْ -এর উল্লেখ করা হয়নি।
২. অথবা, شَهَادَةْ -এর ব্যাপারটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ থাকার কারণে উল্লেখ করা হয়নি।
৩. অথবা, شَهَادَةْ -এর কথা উল্লেখ করা হয়েছিল, কিন্তু বর্ণনাকারী দূরত্বের কারণে তা শুনতে পাননি।
৪. কিংবা বর্ণনাকারী শুনেছেন কিন্তু সংক্ষেপ করার কারণে তা উল্লেখ করেননি।
৫. অথবা, প্রশ্নকারীর প্রশ্নানুসারে উত্তর দেওয়া হয়েছিল। প্রশ্নকারী شَهَادَةْ সম্পর্কে প্রশ্ন করেননি বিধায় উল্লেখ করেননি।

سَبَبُ عَدَمِ ذِكْرِ الْحَجِّ হজ প্রসঙ্গ উল্লেখ না করার কারণ :

১. বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে, হজ তখনও ফরজ হয়নি। কেননা, আগমনকারী লোকটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ৭ম হিজরিতে আগমন করেছেন, আর হজ ফরজ হয়েছে ৯ম হিজরিতে।

২. অথবা, বর্ণনাকারী ভুলক্রমে উল্লেখ করেননি।

৩. কিংবা লোকটির পূর্ব থেকেই হজ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকার কারণে হজের কথা উল্লেখ করেননি।

৪. কিংবা প্রশ্নকারী লোকটি গরিব ছিল বিধায় হজের কথা উল্লেখ করা হয়নি।

৫. অথবা, হজ বিলম্বের অবকাশসহ আদায় করা যায় বলে উল্লেখ করেননি।

৬. অথবা, হজের বিষয়টি অতি প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণে তা উল্লেখ করা হয়নি।

৭. কিংবা সংক্ষিপ্তকরণের নিমিত্ত বর্ণনাকারী তা উল্লেখ করেননি।

আগন্তুকের لَا أَزِيْدُ عَلَى هٰذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ এ কথা দ্বারা উদ্দেশ্য : আলোচ্য হাদীসে নজদ প্রদেশ হতে আগত ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ-এর لَا أَزِيْدُ عَلَى هٰذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ-এর তাৎপর্য বর্ণনায় মুহাদ্দিসগণ নিম্নোক্ত মতামত পেশ করেছেন–

১. فَيْضُ الْبَارِى গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, উক্ত বাক্যে هٰذَا এবং مِنْهُ উভয়টি দ্বারা শরিয়তের ফরজ বিধানসমূহের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, তাই মূল বাক্যটি হবে–

لَا أَزِيْدُ عَلَى هٰذِهِ الْأُمُوْرِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِىْ عَلَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَا أَنْقُصُ مِنَ الْأُمُوْرِ الشَّرْعِيَّةِ .

২. আল্লামা তীবী (র.) বলেন, উল্লিখিত উক্তি দ্বারা تَصْدِيْق ও قَبُوْل সম্পর্কে তার স্বীকৃতি পাওয়া যায়, তাই তার কথার অর্থ হলো– قَبِلْتُ كَلَامَكَ قَبُوْلًا لَا أَزِيْدُ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ السُّؤَالِ وَلَا أَنْقُصُ فِيْهِ مِنْ طَرِيْقِ الْقَبُوْلِ

৩. فَتْحُ الْمُلْهِمِ গ্রন্থকারের মতে, তার কথার অর্থ হলো–

لَا أَزِيْدُ عَلَى هٰذَا بِالنَّوَافِلِ وَلَا أَنْقُصُ مِنَ الْفَرَائِضِ -

৪. অথবা, এ কথাটি দ্বারা আগত লোকটির শরিয়তের বিধানের উপর সুদৃঢ় থাকার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

৫. আল্লামা ইদরীস কান্ধলবী (র.) বলেছেন– এর অর্থ হলো, আমি আমার মন মতো কোনো রকম কমবেশি করব না।

إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِىْ بِهٖ مِنْ غَيْرِ تَغَيُّرٍ وَلَا تَبْدِيْلٍ .

৬. অথবা, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ফরজ বিধানের বেলায় আপনি যেভাবে বর্ণনা করেছেন তাতে আমি কমবেশি করব না।

أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ-এর ব্যাখ্যা : নজদ প্রদেশ হতে আগত লোকটি রাসূলের নিকট হতে ইসলামের পালনীয় বিষয়াবলি জেনে তা দৃঢ়ভাবে পালন করার ইচ্ছা প্রকাশ করে বলেছিলেন যে, لَا أَزِيْدُ عَلَى هٰذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ তখন রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, সে যদি তার কথায় সত্যবাদী হয়, তবে সে সফলকাম হবে।

এখানে সফলতা দ্বারা পরকালীন সফলতা উদ্দেশ্য। মহানবী ﷺ বলতে চাচ্ছেন যে, লোকটি যদি নির্দেশিত বিষয়াবলি পালনে ত্রুটি না করে এবং ঈমানের উপর অটল থাকে, তাহলে সে জান্নাতী হবে এতে কোনোরূপ সন্দেহ নেই। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বনী মুলতাফিক গোত্রের প্রতিনিধি لَقِيْطُ بْنُ صَبِرَةَ-এর ব্যাপারে বলেছেন–

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلٰى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلٰى هٰذَا .

অথবা, মহানবী ﷺ ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছেন যে, লোকটি ঈমানের উপর অবিচল থাকবে, তাই তিনি তার সফলতার কথা ঘোষণা করেছেন।

ثَائِرَ الرَّأْسِ-এর মহল্লে ই'রাব : উল্লিখিত হাদীসে ثَائِرَ الرَّأْسِ শব্দটি তারকীবে পূর্ববর্তী رَجُلٌ শব্দ হতে حَالٌ হওয়ার কারণের نَصْب-এর حَالَتْ-এ রয়েছে।

وَعَنْ ١٥ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا اَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ الْقَوْمُ اَوْ مَنِ الْوَفْدُ قَالُوْا رَبِيْعَةُ قَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ اَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَانَدَامٰى قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّا لَانَسْتَطِيْعُ اَنْ نَأْتِيَكَ إِلَّا فِى الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هٰذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ فَمُرْنَا بِاَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَ نَا وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ وَسَأَلُوْهُ عَنِ الْاَشْرِبَةِ فَاَمَرَهُمْ بِاَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ اَرْبَعٍ اَمَرَهُمْ بِالْإِيْمَانِ بِاللّٰهِ وَحْدَهُ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا الْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَحْدَهُ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ شَهَادَةُ اَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامُ الصَّلٰوةِ وَإِيْتَاءُ الزَّكٰوةِ وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَاَنْ تُعْطُوْا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ وَنَهَاهُمْ عَنْ اَرْبَعٍ عَنِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُزَفَّتِ وَقَالَ احْفَظُوْهُنَّ وَاَخْبِرُوْا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَفْظُهُ لِلْبُخَارِيِّ

১৫. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দল যখন রাসূল ﷺ-এর নিকট আগমন করল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, এরা কোন সম্প্রদায়ের অথবা এরা কোন প্রতিনিধি দল ? তারা বলল, আমরা রাবীয়া গোত্রের লোক। হুজুর ﷺ বললেন, ঐ সম্প্রদায়ের অথবা ঐ প্রতিনিধি দলের আগমন শুভ হোক, যারা বিনা লাঞ্ছনায় ও বিনা লজ্জায় এসেছে। অতঃপর তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমরা হারাম মাস ব্যতীত অন্য সময় আপনার নিকট আগমন করতে পারি না। কেননা, আমাদের ও আপনার মাঝে এ কাফির মুযার গোত্রটি অন্তরায় হিসেবে বসবাস করে, কাজেই আপনি আমাদেরকে এমন কিছু সুস্পষ্ট বিষয় নির্দেশ প্রদান করুন যেগুলো আমরা আমাদের পিছনের (যারা আসেনি) লোকদের নিকট পৌঁছে দেব এবং সেগুলোর উপর আমল করে আমরা বেহেশতে প্রবেশ করব। অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে [হারাম] পানীয় সম্পর্কে প্রশ্ন করল, উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে চারটি বিষয়ে নির্দেশ দিলেন এবং চারটি বিষয়ে নিষেধ করলেন– (১) তিনি তাদেরকে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের আদেশ প্রদান করলেন। তিনি বললেন, তোমরা কি জান এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের তাৎপর্য কি ? তারা বলল, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই এ ব্যাপারে অধিক জ্ঞাত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো প্রভু নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল, (২) নামাজ প্রতিষ্ঠা করা, (৩) জাকাত প্রদান করা, (৪) রমজানের রোজা রাখা এবং (৫) গনিমতের এক-পঞ্চমাংশ প্রদান করা।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে চারটি বিষয় নিষেধ করলেন। যেমন– (১) মাটির তৈরি সবুজ কলসি, (২) কদুর শুকনা খোল, (৩) খেজুর বৃক্ষমূলের পাত্র এবং (৪) আলকাতরা দ্বারা মালিশকৃত পাত্র [এগুলো ব্যবহার করতে নিষেধ করেন]। এরপর বললেন, তোমরা একথাগুলো সংরক্ষণ করবে এবং তোমাদের সম্প্রদায়ের অবশিষ্ট লোকদের নিকট জানিয়ে দেবে।–[বুখারী ও মুসলিম। হাদীসটির উল্লিখিত ভাষা ইমাম বুখারী কর্তৃক বর্ণিত।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

سَبَبُ إِرْشَادِ الْحَدِيْثِ হাদীসের পটভূমি : বর্ণিত আছে যে, মুনকিয ইবনে হাব্বান নামক আবদুল কায়স গোত্রের জনৈক ব্যক্তি ব্যবসার উদ্দেশ্যে মদীনায় আগমন করেন। একদা হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ তার নিকট দিয়ে গমনের সময় তার ও তার সম্প্রদায়ের সম্মানিত ব্যক্তিদের খোঁজখবর নিলেন। রাসূলের মধুর ব্যবহারে আকৃষ্ট হয়ে লোকটি ইসলাম গ্রহণ করে ফেলল। লোকটি চলে যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সম্প্রদায়ের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌছানোর উদ্দেশ্যে গোত্রপতির নিকট তার মাধ্যমে একটি চিঠি পাঠালেন। সে কিছু দিন পর্যন্ত সে চিঠিটি গোপন করে রাখল। অবশেষে তার স্ত্রীর পিতা গোত্র প্রধান মুনযিরের নিকট ব্যাপারটি খুলে বলল, এতে তার অন্তরে ইসলামের আকর্ষণ সৃষ্টি হলো, অতঃপর সে ব্যক্তি রাসূলের দেওয়া চিঠি নিয়ে তার সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট গমন করেন এবং তাদেরকে পাঠ করে শুনান, ফলে তারা ইসলাম গ্রহণ করল এবং রাসূলের দরবারে উপস্থিত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। অবশেষে তাদের মধ্য হতে ১৪ জন লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হলো। তাদের কথোপকথন ও বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্নের ফলে মহানবী ﷺ উল্লিখিত হাদীসের কথাগুলো বলেন।

مَعْنَى الْوَفْدِ - وَفْدٌ-এর অর্থ : وَفْدٌ শব্দটি وَافِدٌ-এর বহুবচন। শাব্দিক অর্থ হলো– প্রতিনিধি দল, যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ إِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا ; এর পারিভষিক সংজ্ঞা নিম্নরূপ।

১. اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْطُ গ্রন্থকারের মতে– اَلْوَفْدُ جَمَاعَةٌ مُخْتَارَةٌ لِلتَّقَدُّمِ فِىْ لِقَاءِ ذِىْ شَانٍ অর্থাৎ وَفْد বলা হয় এমন একটি নির্বাচিত প্রতিনিধি দলকে যারা কোনো মর্যাদাবান ব্যক্তির সাক্ষাতে আগমন করেন।

২. ইমাম নববী (র.) বলেন– اَلْوَفْدُ هِيَ عِصَابَةٌ أُرْسِلَتْ نِيَابَةً عَنِ الْقَوْمِ

وَقْتُ مَجِيْئَةِ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ আব্দুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দলের আগমনের সময়কাল : আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দল কখন নবী করীম ﷺ-এর নিকট আগমন করেছে এ বিষয়ে কয়েকটি মতামত পাওয়া যায়–

১. কাজী ইয়ায (র.) বলেন, তারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে অষ্টম হিজরিতে আগমন করেছেন।

২. ইবনুল কায়্যেম বলেন, তারা নবম হিজরিতে এসেছেন।

৩. কারো মতে, ষষ্ঠ হিজরিতে এসেছেন।

৪. কিছু সংখ্যকের মতে, ৭ম হিজরিতে এসেছেন।

৫. ঐতিহাসিকদের মতে, তারা মোট দু'বার আগমন করেছেন, প্রথমবার ৬ষ্ঠ হিজরিতে আর দ্বিতীয়বার ৮ম হিজরিতে।

তাদের সংখ্যা : আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধির সংখ্যা কত ছিল এ বিষয়ে কয়েকটি মতামত পাওয়া যায়–

১. ইমাম নববী (র.)-এর মতে, তাদের সংখ্যা ছিল ১৪ জন।

২. অন্য একদলের মতে, তাদের সংখ্যা ছিল ৪০ জন।

- উভয় বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনের লক্ষ্যে আল্লামা শাহ কাশ্মীরী (র.) বলেছেন যে, তাদের মধ্যে ১৪ জন ছিল নেতা আর অবশিষ্টরা ছিল তাদের অনুসারী।
- অথবা, ৬ষ্ঠ হিজরিতে এসেছিল ১৪ জন আর ৮ম হিজরিতে এসেছিল ৪০ জন।

৩. বায়হাকীর এক বর্ণনানুযায়ী ১৩ জনের কথা এসেছে।

أَشْهُرُ الْحُرُمِ وَحُكْمُهَا হারাম মাসসমূহ ও সেগুলোর হুকুম : أَشْهُرُ الْحُرُمِ বা নিষিদ্ধ মাস হলো মোট চারটি, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন–

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ .

মাসগুলো হলো– (১) জিলকাদ, (২) জিলহজ, (৩) মুহররাম এবং (৪) রজব।

حُكْمُهَا : জাহিলিয়া যুগ থেকেই এ মাসগুলোকে সম্মান করা হতো। ইসলামও সেগুলোর প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেছে। এগুলোর হুকুম হলো– ১. এ মাসগুলোতে যুদ্ধবিগ্রহ রক্তপাত একেবারেই নিষিদ্ধ। ২. এগুলোকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা। ৩. স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে এগুলোকে আগে পরে নিয়ে যাওয়া কুফরি।

سَبَبُ مَجِيْئَةِ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ আবদুল কায়স প্রতিনিধি দলের নবী করীম ﷺ-এর দরবারে আগমনের কারণ : মুনকিয ইবনে হাব্বান ব্যবসার উদ্দেশ্যে হিজর হতে মাল নিয়ে মদীনায় আসত। একদিন সে নবী করীম ﷺ-এর সামনে পড়ে গেল। নবী করীম ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তুমি কি মুনকিয ইবনে হাব্বান? তারপর নবী করীম ﷺ তার বংশীয় নেতৃস্থানীয় লোকদের নাম ধরে ধরে তাদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করেন, এতে লোকটি আশ্চর্যান্বিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করল। অতঃপর তিনি সূরায়ে ফাতিহা ও সূরায়ে 'আলাক শিখে নিলেন। পরে তিনি হিজর রওয়ানা করলেন। নবী করীম ﷺ তাঁর নিকট আবদুল কায়স গোত্রের নামে একটি চিঠি দিলেন।

মুনকিয কিছুদিন তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখলেন। তবে তাঁর নামাজ ও কুরআন তিলাওয়াতের কারণে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁর স্ত্রী তাঁর পিতা মুনযির আল-আসাজ্জুর নিকট ব্যাপারটি প্রকাশ করল। মুনযির মুনকিযের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করল, ফলে মুনযিরের অন্তরেও ইসলামের আগ্রহ সৃষ্টি হলো। পরে মুনযির রাসূলের চিঠি নিয়ে নিজ গোত্রের লোকদের নিকট যায় এবং তাদেরকে তা পড়ে শুনায়, ফলে সকলের অন্তরে ইসলাম গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়। এতে তারা দলবদ্ধভাবে রাসূল ﷺ-এর খেদমতে হাজির হয়।

নির্দেশিত বিষয় পাঁচটি হওয়া সত্ত্বেও বর্ণনাকারীর বাণী أَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ-এর যৌক্তিকতা কি? : আলোচ্য হাদীসের নির্দেশিত বিষয় হচ্ছে মোট পাঁচটি, অথচ বর্ণনাকারী বলছেন, أَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ সুতরাং চারটির কথা বলে পাঁচটির উল্লেখ করা হলো কিভাবে? এর জাবাবে হাদীস বিশারদগণ বলেন–

১. আলোচ্য হাদীসের পূর্বাপর বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায়, আগত প্রতিনিধি পূর্ব হতেই মু'মিন ছিল, তাই এখানে شَهَادَتَيْن আসল উদ্দেশ্য নয়; বরং বাকি চারটিই উদ্দেশ্য।
২. ইবনুল বাত্তাল বলেন, ঐ গোত্রের সাথে মুযার গোত্রের যে কোনো সময় যুদ্ধ বাঁধার সম্ভাবনা ছিল, এ জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে 'খুমুস'-এর বিধান জানিয়ে দেন। এটা অতিরিক্ত।
৩. কাজী বায়যাবী (র.) বলেন, এখানে إِيْمَانٌ بِاللّٰهِ একটি জিনিস, আর তার ব্যাখ্যা হলো صَلَاة ، زَكٰوة ও صَوْم ইত্যাদি। মূলত সব মিলে এখানে একটি বর্ণিত হয়েছে। বাকি তিনটি কথা বর্ণনাকারী ভুলবশত কিংবা সংক্ষিপ্তকরণের জন্য উল্লেখ করেননি।
৪. অথবা, "إِعْطَاءُ الْخُمُسِ" জাকাতের বিধানের মধ্যে শামিল। সুতরাং এটা বাদ দিলে চারটিই হয়।
৫. অথবা, পবিত্র কুরআনে صَلَاة ও زَكٰوة-এর কথা অধিকাংশ স্থানে একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, তাই এখানেও উভয়টা মিলে একটা হবে। সুতরাং সব মিলে ৪টি হলো।
৬. আল্লামা কিরমানী (র.) বলেন, صَلَاة ، زَكٰوة ، صَوْم ও إِعْطَاءُ الْخُمُسِ এ চারটিই রাসূলুল্লাহ ﷺ উল্লেখ করেছেন। আর শুধু বরকতের জন্য সাথে إِيْمَان-এর কথা উল্লেখ করেছেন।

وَجْهُ عَدَمِ ذِكْرِ الْحَجِّ হজের কথা উল্লেখ না করার কারণ : হজ ইসলামের অন্যতম রোকন হওয়া সত্ত্বেও উক্ত হাদীসে উল্লেখ না করার কারণ সম্পর্কে مُحَدِّثِيْنِ كِرَام নিম্নোক্ত মতামত পেশ করেন–

১. আলোচ্য হাদীসে ইসলামি শরিয়তের যাবতীয় আহকাম বর্ণনা করা উদ্দেশ্য ছিল না, তাই হজের কথা উল্লেখ করা হয়নি।
২. কাজী ইয়ায (র.) বলেন, হজের বিধান অবতীর্ণ হয় নবম হিজরিতে, আর আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করেছিল অষ্টম হিজরিতে, তাই হজের কথা উল্লেখ করা হয়নি।
৩. হজ যেহেতু বিলম্বে পালন করার অবকাশ থাকে, তাই উল্লেখ করা হয়নি।
৪. হজের কথা তাদের কাছে প্রসিদ্ধ ছিল বলে এর উল্লেখ করা হয়নি।
৫. হজের পথে মুযার গোত্রের প্রতিবন্ধকতা ছিল, তাই হজের কথা উল্লেখ করা হয়নি।
৬. মুসনাদে আহমদে হজের কথা উল্লিখিত হয়েছে, অতএব এখানে উল্লেখ না করাতে কোনো অসুবিধা রইল না।
৭. হজের কথা উল্লেখ হয়েছে ঠিকই কিন্তু বর্ণনাকারী ভুলবশত তা উল্লেখ করেননি।
৮. সংক্ষিপ্তকরণের জন্য হজের কথা উল্লেখ করা হয়নি।

حُكْمُ ظُرُوْفِ الْاَشْرِبَةِ মদ পানের পাত্রের হুকুম : মহানবী ﷺ আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দলকে চার রকম পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। সেগুলো হলো–

১. حَنْتَمٌ [মাটির সবুজ পাত্র বিশেষ।]
২. دُبَّاءٌ [লাউয়ের খোসা দ্বারা প্রস্তুতকৃত পাত্র।]
৩. نَقِيْرٌ [কাঠের তৈরি পাত্র বা খেজুর গাছের গোড়া দ্বারা তৈরি পাত্র।]
৪. مُزَفَّتٌ [আলকাতরা দ্বারা মালিশকৃত পাত্র।] এসব পাত্রে তারা মদ রাখত।

এগুলো ব্যবহার করতে নিষেধ করার কারণ নিম্নরূপ–
(ক) এ পাত্রগুলোর মাঝে মদের প্রভাব ছিল তাই নিষেধ করেছেন।
(খ) যারা অত্যন্ত মদ্যপায়ী ছিল, এগুলো দেখে তাদের অন্তরে মদের কথা জেগে উঠতে পারে বিধায় নিষেধ করেছেন।
(গ) অথবা, যাতে করে তারা মদ পান করার আর কোনো সুযোগ না পায়, এ জন্যই নিষেধ করেছেন।

هَلِ النَّهْىُ بَاقٍ؟ নিষেধাজ্ঞা এখনো অবশিষ্ট কিনা? : উল্লিখিত পাত্রগুলো ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা এখনও বলবৎ আছে কিনা এ বিষয়ে কিছুটা মতভেদ রয়েছে–

১. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) বলেন যে, পাত্রগুলো ব্যবহারের উপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল তা এখনও বহাল আছে।
২. জমহুর ফুকাহায়ে কেরামের মতে, এগুলোর حُرْمَة মানসূখ হয়ে গেছে, তথা এগুলোর নিষেধাজ্ঞা এখন আর বহাল নেই। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوْفِ فَإِنَّ الظَّرْفَ لَايُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
অন্য হাদীসে এসেছে যে– كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْاِتْيَانِ فِى الْاَسْقِيَةِ فَانْتَبِذُوْا فِىْ كُلِّ وِعَاءٍ وَلَا تَشْرَبُوْا مُسْكِرًا

اِسْمُ اَمِيْرِهِمْ তাদের দলপতির নাম : আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দলের নেতার নাম সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনদের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়, যা নিম্নরূপ–

১. ইমাম নববী (র.)-এর মতে, তাদের দলপতির নাম ছিল مُنْذِرُ بْنُ عَائِذٍ
২. কালবীর মতে, مُنْذِرُ بْنُ حَارِثٍ
৩. কারো মতে, مُنْذِرُ بْنُ حِبَّانَ
৪. কিছু সংখ্যক বলেন, عَائِذُ بْنُ مُنْذِرٍ
৫. কেউ কেউ বলেন, عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَوْفٍ
৬. অন্য একদলের মতে, مُنْذِرُ بْنُ اُبَىٍّ
৭. অপর একদল বলেন, مُنْذِرُ بْنُ عَامِرٍ

خَزَايَا এবং نَدَامٰى-এর অর্থ : উল্লিখিত হাদীসে خَزَايَا শব্দটি خِزْيَانٌ-এর বহুবচন অর্থ হলো– অপমান। আর نَدَامٰى শব্দটি نَدْمَانٌ-এর বহুবচন। শাব্দিক অর্থ হলো– লজ্জা বা শরম। অতএব غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامٰى-এর অর্থ হলো, عَبْدُ الْقَيْسِ গোত্রের প্রতিনিধি দলের আগমণ অপমান এবং লজ্জাকর নয়। অথবা তারা লজ্জিত ও অপমানিত হয়ে আসেনি। কেননা, ইসলাম গ্রহণ করার কারণে আমাদের পক্ষ হতে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ও বন্দী করা হতে তারা মুক্ত। তারা বরং নিরাপত্তার মধ্যে থাকা অবস্থায় আমাদের নিকট আগমন করেছে।

تَعْلِيْمُ الْحَدِيْثِ হাদীসের শিক্ষা : হাদীসটি অধ্যয়নে আমরা যে শিক্ষা লাভ করে থাকি তা নিম্নরূপ– ১. এক আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, ২. আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার না করা, ৩. মুহাম্মদ ﷺ-কে আল্লাহর রাসূল হিসেবে মেনে নেওয়া, ৪. নামাজ প্রতিষ্ঠা করা, ৫. জাকাত প্রদান করা, ৬. রমজান মাসের রোজা রাখা, ৭. গনিমতের এক পঞ্চমাংশ দান করা, ৮. শরাব পান হতে বিরত থাকা, ৯. শরিয়তের সকল আদেশ যথাযথভাবে মেনে চলা ও ১০. অপরের নিকট ইসলামের দাওয়াত ও রাসূলের আদেশ-নিষেধ পৌঁছে দেওয়া।

وَعَنْ ١٦ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ اَصْحَابِهٖ بَايِعُوْنِىْ عَلٰى اَنْ لَّاتُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلَاتَسْرِقُوْا وَلَاتَزْنُوْا وَلَاتَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ وَلَا تَاْتُوْا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُوْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَاَرْجُلِكُمْ وَلَاتَعْصُوْا فِىْ مَعْرُوْفٍ فَمَنْ وَفٰى مِنْكُمْ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ بِهٖ فِى الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَهُوَ اِلَى اللّٰهِ اِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَاِنْ شَاءَ عَاقَبَهٗ فَبَايَعْنَاهُ عَلٰى ذٰلِكَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৬. অনুবাদ : হযরত উবাদাহ ইবনে সামিত (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা একদল সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ঘিরে বসেছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা এ বিষয়ে আমার নিকট এ মর্মে বাইয়াত হও যে, তোমরা কোনো কিছুকে আল্লাহর সাথে শরিক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, কারো প্রতি মনগড়া মিথ্যা অপবাদ দেবে না এবং সৎকাজে অবাধ্য হবে না। [অতঃপর জেনে রাখ!] যে কেউ এ ওয়াদা পালন করবে, তার প্রতিদান আল্লাহর ওপর ন্যস্ত। আর যে ব্যক্তি এগুলোর কোনো একটি করে এবং দুনিয়াতে তার শাস্তি পায়, তার জন্য তা কাফ্ফারা হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি এগুলোর কোনো একটি অপরাধ করে এবং তা আল্লাহ তা'আলা প্রকাশ না করে গোপন রাখেন, তাহলে সে ব্যাপরটি আল্লাহর ইচ্ছাধীন। তিনি ইচ্ছা করলে মাফ করবেন আর ইচ্ছা করলে শাস্তি দেবেন। [হযরত উবাদাহ (রা.) বলেন,] তখন আমরা ঐ শর্তে নবীজী ﷺ -এর নিকট বাইয়াত হলাম। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَعْنَى الْبَيْعَةِ বাইয়াতের অর্থ : مَعْنَى الْبَيْعَةِ لُغَةً বাইয়াতের শাব্দিক অর্থ : اَلْبَيْعَةُ শব্দটি বাবে ضَرَبَ -এর মাসদার بَيْعٌ মূলধাতু হতে নির্গত। শাব্দিক অর্থ হচ্ছে– ১. اَلْعَهْدُ প্রতিশ্রুতি, ২. اَلْعَقْدُ অঙ্গীকার, ৩. اَلْحِلْفُ শপথ, ৪. اَلْمُبَايَعَةُ ক্রয়-বিক্রয় করা।

مَعْنَى الْبَيْعَةِ اِصْطِلَاحًا : বাইয়াতের পারিভাষিক সংজ্ঞা–

১. আল্লামা তীবী (র.) বলেন– هُوَالْوَعْدُ بِيَدِ الشَّيْخِ اَوِ الْقَائِدِ لِاَفْعَالٍ مَخْصُوْصَةٍ অর্থাৎ নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে শায়খ বা নেতার হাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়াকে بَيْعَةٌ বলে।

২. কিছু সংখ্যকের মতে– اَلْبَيْعَةُ هِيَ الْحِلْفُ عَلٰى اِمْتِثَالِ الْمَعْرُوْفَاتِ وَتَرْكِ الْمُنْكَرَاتِ

৩. অন্য একদলের মতে– اَلْبَيْعَةُ هِيَ وَضْعُ الْيَدِ عَلَى السَّيِّدِ اَوِ الْمُرْشِدِ عَلٰى اَفْعَالٍ مَخْصُوْصَةٍ

৪. এক কথায়, কারো আনুগত্যের অঙ্গীকার এবং হুকুম যথাযথভাবে পালনে চুক্তিবদ্ধ হওয়াকে بَيْعَةٌ বলা হয়।

مَعْنَى الْبُهْتَانِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْبُهْتَانِ وَالْغِيْبَةِ :

بُهْتَانٌ -এর অর্থ এবং بُهْتَانٌ ও غِيْبَةٌ -এর মধ্যকার পার্থক্য : بُهْتَانٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ– অপবাদ দেওয়া, মিথ্যা রটানো। পরিভাষায়, بُهْتَانٌ ঐ মিথ্যাকে বলা হয়, যা শুনে শ্রোতা আশ্চর্য হয়ে যায়। হাদীসে এরূপ অপবাদ প্রদানের ব্যাপারে কাঠোর হুঁশিয়ারি এসেছে।

بُهْتَانٌ ও غِيْبَةٌ -এর মধ্যকার পার্থক্য : ১. গিবত শব্দের আভিধানিক অর্থ– পরনিন্দা করা; বুহতান শব্দের আভিধানিক অর্থ– মিথ্যা অপবাদ দেওয়া। ২. কারো মধ্যে বিদ্যমান দোষ তার ক্ষতি করার লক্ষ্যে তার পিছনে অন্যের নিকট বলার নাম গিবত। আর যার কোনো দোষ নেই, তার নামে দোষ রটানোর নামই বুহতান। ৩. গিবতের মাধ্যমে মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন

করা উদ্দেশ্য থাকে। অন্যদিকে বুহতান দ্বারা মানুষের মাঝে কলহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিদ্যমান থাকে। ৪. গিবত বা পরনিন্দা একটি জঘন্যতম অপবাদ। আর বুহতান পরনিন্দার চেয়ে মারাত্মক অপরাধ।

بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَاَرْجُلِكُمْ দ্বারা উদ্দেশ্য :

بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَاَرْجُلِكُمْ-এর অর্থ : উক্ত বাক্যের অর্থ– مِنْ نَفْسِكُمْ তথা নিজের পক্ষ হতে। তবে নিজের হাত পা দ্বারা বুঝানোর রহস্য হচ্ছে–

১. নিজের মাধ্যমে যে সকল বিশেষ বিশেষ কাজ সম্পাদিত হয়ে থাকে, তা হাত ও পা দ্বারাই সংঘটিত হয়ে থাকে।

২. অথবা, হাদীসে بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَ اَرْجُلِكُمْ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, কারো সম্মুখে অপবাদ দিও না। এ অপরাধ গুরুতর।

৩. অথবা, তোমাদের হাত ও পায়ের মাঝখানে যে তোমাদের অন্তর রয়েছে তা হতে কোনো অপবাদ কারো উপরে বর্তাবে না। কেননা কথার মূলকেন্দ্র তার অন্তর।

৪. অথবা, بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ দ্বারা বর্তমান আর بَيْنَ اَرْجُلِكُمْ দ্বারা ভবিষ্যৎ বুঝানো হয়েছে, অর্থাৎ বর্তমানে বা ভবিষ্যতে কারো প্রতি অপবাদ দিও না।

৫. অথবা, মহিলাদের থেকে বাইয়াত গ্রহণ করার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ বলেছেন, অর্থাৎ তাদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমরা হাত পায়ের মাঝখানে অবস্থিত লজ্জাস্থান দ্বারা ব্যভিচার করে যে সন্তান প্রসব করেছ তাকে স্বামীর সাথে সম্পৃক্ত করো না।

اَلْمُرَادُ بِقَوْلِهٖ لَاتَعْصُوْا فِىْ مَعْرُوْفٍ 'কল্যাণকর কাজে অবাধ্য হয়ো না' এর অর্থ : মহানবী ﷺ-এর বাণী وَلَاتَعْصُوْا فِىْ مَعْرُوْفٍ-এর মর্মার্থ হাদীস বিশারদগণ নিম্নরূপ ব্যক্ত করেছেন– শরিয়ত কর্তৃক যে সমস্ত কাজকে ভালো এবং যে সমস্ত কাজকে মন্দ নির্দেশ করা হয়েছে তার বিরোধিতা না করা। কাজেই নেককার সৎকর্ম সম্পাদনকারী হবে এবং অসৎকর্ম ও অপকর্ম থেকে বিরত থাকবে। বলা বাহুল্য, ভালো কাজে অবাধ্য না হওয়ার অর্থ এটাই। অথবা এর অর্থ হলো, ভালো কাজে স্বামীর নাফরমানী না করা।

اَلْحُدُوْدُ مُكَفِّرَاتٌ لِلذُّنُوْبِ اَمْ لَا؟ শরয়ী দণ্ড পাপ মোচনকারী কিনা? : কোনো ব্যক্তি কৃত অপরাধের জন্য দুনিয়ায় শাস্তিভোগ করার পর তা পরকালে পাপ মোচনের জন্য যথেষ্ট হওয়া না হওয়া নিয়ে ফুকাহায়ে কেরাম থেকে নিম্নরূপ মতামত পরিলক্ষিত হয়–

■ **مَذْهَبُ الشَّافِعِىِّ (رحـ)** : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, শাস্তি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পাপমুক্ত ও পবিত্র করে দেয়। তাঁর দলিল উপরিউক্ত হাদীস– وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ بِهٖ فِى الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهٗ

■ **مَذْهَبُ الْاَحْنَافِ** : আহনাফের মতে, শরিয়ত প্রদত্ত শাস্তি অপরাধীকে পাপমুক্ত করে না, তবে তওবার কারণে তার পাপ মাফ হতে পারে। যেমন এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী–

١. ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ .

অনুরূপভাবে মিথ্যা অপবাদকারীদের ৮০টি বেত্রাঘাত প্রদানের পরও বলা হয়েছে–

٢. وَلَاتَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ .

অনুরূপভাবে চোরের শাস্তির পর বলা হয়েছে–

٣. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ .... فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ .

■ **بَدَائِعٌ** গ্রন্থকার বলেন– اِنَّ الْحُدُوْدَ لَيْسَتْ بِكَفَّارَةِ الذُّنُوْبِ কিছু সংখ্যক আলিম এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরবতা পালন করেছেন। কেননা, নবী করীম ﷺ-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন– لَا اَدْرِىْ اَلْحُدُوْدُ كَفَّارَاتٌ اَمْ لَا

■ এ বিষয়ে হযরত আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.)-এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, اِقَامَةُ حُدُوْدٍ-এর পর তিনটি অবস্থা হতে পারে– ১. যদি শাস্তির পর খাঁটি তওবা করে, তাহলে তা كَفَّارَةٌ হবে। ২. যদি শস্তির পরোয়া না করে বারবার অপরাধ করতে থাকে, তবে তার প্রদত্ত শাস্তি কাফফারা হবে না। ৩. যদি শাস্তির পর তওবা না করে; বরং পাপ থেকে বিরত থাকে, তাহলে তা কাফ্ফারা হবে।

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الشَّافِعِىِّ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাব : ইমাম শাফেয়ী (র.) ও তাঁর অনুসারীগণ যে হাদীসকে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন তার জবাব হলো–

১. কুরআনের মোকাবেলায় হাদীসের দলিল ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। বাহ্যিক অর্থ গ্রহণযোগ্য নয়।
২. অথবা, উক্ত হাদীসটি قُرْاٰن দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে, ৩. অথবা উক্ত হাদীসে فَهُوَ كَفَّارَةٌ -এর পরে فِى الدُّنْيَا শব্দটি উহ্য রয়েছে।

تَعْذِيْبُ الْعُصَاةِ وَاجِبٌ عَلَى اللّٰهِ اَمْ لَا ؟ পাপীকে শাস্তি প্রদান করা আল্লাহর উপর ওয়াজিব কিনা? : অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া আল্লাহর উপর ওয়াজিব কিনা এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন–

১. মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের মতে, অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া আল্লাহর উপর ওয়াজিব, নতুবা এটা আল্লাহর ন্যায়নীতি ও বিচার বিধানের পরিপন্থি হবে। তারা কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেন।

দলিল : আল্লাহ বলেছেন–
١. وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْاۤ اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا .
٢. اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ .

২. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে, অপরধীকে শাস্তি দেওয়া এবং নেক্কারকে ছওয়াব প্রদান করা আল্লাহর উপর ওয়াজিব নয়।

দলিল : তাঁদের দলিল হলো–
١. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى " وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ " .
٢. قَالَ النَّبِىُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ " اِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَاِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ " .

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ : তাঁদের দলিলসমূহের জবাবে বলা যায় যে, উক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা পাপীদের শাস্তির কথা বলা হয়েছে ; এটা বুঝানো হয়নি যে, এটা করা আল্লাহর উপর ওয়াজিব। কেননা, আল্লাহ তা'আলার উপর কোনো কিছু ওয়াজিব নয় ; বরং তিনি ইচ্ছা করলে পাপীদেরকে ন্যায়পরায়ণ হিসেবে শাস্তি প্রদান করতে পারেন। অথবা অনুগ্রহ করে শাস্তি নাও দিতে পারেন।

وَعَنْ ١٧ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ (رض) قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ اَضْحٰى اَوْ فِطْرٍ اِلَى الْمُصَلّٰى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَاِنِّىْ اُرِيْتُكُنَّ اَكْثَرَ اَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ مَا رَاَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِيْنٍ اَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ اِحْدٰكُنَّ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِيْنِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْاَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلٰى قَالَ فَذٰلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا قَالَ اَلَيْسَ اِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلٰى قَالَ فَذٰلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِيْنِهَا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৭. **অনুবাদ** : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [একবার] রাসূল ﷺ ঈদুল ফিতরে অথবা ঈদুল আযহার দিন ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হন। তিনি মহিলাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তখন মহিলাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে নারী সমাজ! তোমরা বেশি বেশি দান-খয়রাত করো। কেননা, আমাকে দেখানো হয়েছে যে, তোমাদের অধিকাংশই জাহান্নামী। তারা [মহিলারা] বলল, জাহান্নামী কেন ? হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, তোমরা বেশি বেশি লানত দিয়ে থাক এবং স্বামীদের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক। একজন সুচতুর বুদ্ধিমান পুরুষের জ্ঞান হরণের কাজে তোমাদের তথা কোনো নারীর চেয়ে অধিক পারঙ্গম দীন ও জ্ঞানে অপূর্ণ আর কাউকে আমি দেখিনি। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! দীন ও জ্ঞানের ব্যাপারে আমাদের অপূর্ণতা কি ? তিনি বললেন, নারীর সাক্ষ্য কি পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয়? তারা বলল, হ্যাঁ। রাসূল ﷺ বললেন, এটাই জ্ঞানের অপূর্ণতা। রাসূল ﷺ আবার বললেন, এটা কি নয় যে, মহিলাগণ যখন ঋতুবতী হয়, তখন তারা নামাজ পড়ে না এবং রোজাও রাখে না। তারা বলল, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এটাই তাদের দীনের অপূর্ণতা। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

كَيْفَ حَضَرَتِ النِّسَاءُ إِلَى الْمُصَلّٰى মহিলাগণ কিভাবে ঈদগাহে উপস্থিত হলেন : নবী করীম ﷺ-এর যুগে নারীগণ অত্যন্ত সহজ-সরল এবং সাদামাটাভাবে চলতেন। তারা ঈদ ও জুমার জামাতে শরিক হতেন ঠিকই; কিন্তু সর্বাঙ্গ ঢেকে অতি মার্জিতরূপে ঘর হতে বের হতেন এবং জামাতে একেবারে পিছনের কাতারে থাকতেন। বস্তুত তখন মহিলা ও পুরুষ সকলেই ছিলেন ইসলামের একাগ্র অনুসারী। ইসলামের বিধানকে অতি কঠোরভাবে মেনে চলতেন। ফলে মহিলাগণ ঈদ, জুমা এমনকি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জামতেও হাজির হতেন। পরবর্তীতে নারীদের মধ্যে বিলাসিতা ও লজ্জাহীনতা বৃদ্ধি পেল এবং পুরুষদের মাঝেও শিথিলতা দেখা দিল, তখন মহিলাদেরকে মসজিদে এবং ঈদগাহে উপস্থিত হতে নিষেধ করা হয়েছে। আর এটা খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগেই করা হয়েছে।

حُكْمُ خُرُوْجِ النِّسَاءِ إِلَى الْجَمَاعَةِ নারীদের জামাতে যাওয়ার হুকুম : মহিলাদের জামাতে উপস্থিত হওয়া বৈধ কিনা ? এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ (رح) : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, নারীদের জন্য জামাতে উপস্থিত হওয়া বৈধ। তিনি দলিল হিসেবে বলেন যে, عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إِذَا اسْتَأْذَنَتْ اِمْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

مَذْهَبُ الصَّاحِبَيْنِ (رح) : ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, শুধু বৃদ্ধা নারীদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্য উপস্থিত হওয়া বৈধ। কেননা, বৃদ্ধাদের দ্বারা কোনো প্রকার বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

مَذْهَبُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, শুধু বৃদ্ধাদের জন্য ফজর, মাগরিব ও ইশার জামাতে উপস্থিত হওয়া বৈধ। তবে পরবর্তী ওলামায়ে কেরাম বৃদ্ধাদের জন্যও জামাতে উপস্থিত হওয়া নিষিদ্ধ করে দেন।

مَعْنَى اللَّعْنَةِ وَحُكْمُهَا : اَللَّعْنَةُ-এর অর্থ ও তার হুকুম :

مَعْنَى اللَّعْنَةِ لُغَةً : اَللَّعْنَةُ শব্দটি বাবে فَتَحَ-এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ হচ্ছে– ১. اَلْغَضَبُ [অভিসম্পাত দেওয়া] ২. اَلطَّرْدُ [তাড়িয়ে দেওয়া] ৩. اَلْإِبْعَادُ [দূরে সরিয়ে দেওয়া] ৪. اَلشَّتْمُ [গালমন্দ করা] ৫. বদদোয়া করা।

مَعْنَى اللَّعْنَةِ اِصْطِلَاحًا : اَللَّعْنَةُ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা–

১. اَلْإِبْعَادُ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَفَضْلِهِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহ হতে দূরে সরিয়ে দেওয়া। এই মর্মে পবিত্র কুরআনে এসেছে– وَمَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيْرًا

২. কারো মতে, অকল্যাণ বা মন্দ বয়ে আনার জন্য কারো প্রতি বদদোয়া করাকে লানত বলা হয়।

حُكْمُ اللَّعْنَةِ : ১. যে কোনো কাফির-মুশরিক তথা বিধর্মীর উপর লানত করা জায়েজ। যেমন, বলা হয়– اَللّٰهُمَّ الْعَنِ الْكَفَرَةَ وَالْمُبْتَدِعَةَ وَالْمُشْرِكِيْنَ ـ

২. যার মৃত্যু কুফর বা শিরকের উপর হয়েছে তাকেও লানত করা জায়েজ।

৩. কোনো মুসলমান অথবা এমন কোনো ব্যক্তির উপর লানত করলে, যার উপর লানত প্রযোজ্য নয়, তখন লানতকারীর দিকেই উক্ত লানত প্রত্যাবর্তিত হয় এবং সে مُرْتَكِبُ الْكَبِيْرَةِ হিসেবে সাব্যস্ত হয়।

৪. আর সাধারণত কোনো মুসলমানের উপর লানত করা জায়েজ নেই।

اَلْكُفْرُ-এর অর্থ : كُفْر শব্দটি বাবে نَصَرَ-এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ হলো–

১. اَلسَّتْرُ وَ الْكِتْمَانُ গোপন করা বা ঢেকে ফেলা। যেমন, বলা হয়– كَفَرَ دِرْعَهُ بِثَوْبِهِ

২. اَلْغِطٰى [আবৃত করা।]

৩. اَلْجَحْدُ অস্বীকার করা। যেমন– كَفَرَ بِالْخَالِقِ

৪. অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। যথা– كَفَرَ نِعَمَ اللّٰهِ تَعَالٰى

مَعْنَى الْكُفْرِ اِصْطِلَاحًا :

১. জমহুর ওলামা বলেন– اَلْكُفْرُ هُوَ اِنْكَارُ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ ضِدُّ الْإِيْمَانِ অর্থাৎ নবী করীম ﷺ-এর আনীত আদর্শের বিরোধিতা করাকে كُفْر বলা হয়। এটা হলো ঈমানের বিপরীত।

২. তানযীমুল আশতাত গ্রন্থ প্রণেতা বলেন– اَلْكُفْرُ هُوَ تَكْذِيْبُ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ شَيْءٍ مِمَّا جَاءَ بِهٖ

৩. কেউ কেউ বলেন– اَلْكُفْرُ هُوَ عَدَمُ تَصْدِيْقِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَا جَاءَ بِهٖ

৪. আল্লামা বায়যাবী (র.) বলেন– اَلْكُفْرُ اِنْكَارُ مَا عُلِمَ بِالضَّرُوْرَةِ مَجِيْءُ الرَّسُوْلِ بِهٖ

اَلْمُرَادُ بِقَوْلِهٖ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ :

وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ-এর মর্মার্থ : রাসূল ﷺ-এর বাণী تَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ অর্থ–স্ত্রীলোকেরা স্বামীদেরকে অস্বীকার করে। এ বাক্যটিতে اَلْعَشِيْرُ শব্দটির অর্থ হচ্ছে– স্বামী।

এখানে রাসূল ﷺ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ বাক্যটি দ্বারা স্বামীর প্রতি স্ত্রীলোকদের অকৃতজ্ঞতার কথা বুঝিয়েছেন। ইসলামি শরিয়ত কর্তৃক স্বামীর প্রতি অর্পিত দায়িত্ব সে সুষ্ঠুভাবে পালন এবং স্ত্রীর যথাযথ অধিকার আদায় করার পরও যেসব স্ত্রীলোক স্বামীর কৃতজ্ঞতা আদায় করে না; বরং তার নাফরমানীতে লিপ্ত হয়। রাসূল ﷺ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ বলে তাদের সে হীন চরিত্র ও স্বভাবের কথা তুলে ধরে এটাকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার কারণ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

এ দিকেই ইঙ্গিত পাওয়া যায় অন্য হাদীসে যে, وَمَنْ لَّمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللّٰهَ অর্থাৎ যে মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, তাই প্রত্যেক নারীর কর্তব্য এসব হীন ও নীচু কর্ম পরিহার করা।

وَجْهُ تَخْصِيْصِ كُفْرَانِ الْعَشِيْرِ مِنْ بَيْنِ الْخَطَايَا :

অন্যান্য গুনাহ হতে স্বামীর অকৃতজ্ঞতাকে নির্দিষ্ট করার কারণ : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– لَوْ اَمَرْتُ اَحَدًا اَنْ يَّسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْأَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا "যদি আমি কারো প্রতি কাউকেও সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তাহলে নারীদেরকে তাদের স্বামীদের সিজদা করার নির্দেশ দিতাম।" হাদীসটি দ্বারা স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার পূর্ণরূপে সাব্যস্ত হয়েছে। অন্য দিকে হাদীসটিতে স্বামীর অধিকারকে আল্লাহ্ তা'আলার অধিকারের সাথে মিলানো হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, যে স্ত্রী স্বামীর অধিকার আদায় করবে না, সে আল্লাহ তা'আলার অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রেও অমনোযোগী হবে। এ কারণে অন্যান্য গুনাহের মধ্য হতে স্বামীর অকৃতজ্ঞতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

اَلْمُرَادُ بِقَوْلِهٖ وَنَاقِصَاتُ عَقْلٍ وَدِيْنٍ জ্ঞান ও দীনের ক্ষেত্রে অপূর্ণতার মর্মার্থ : নারী জাতি সৃষ্টিগতভাবে দু'দিক থেকে অপূর্ণাঙ্গ– **প্রথমত** জ্ঞানগত ঘাটতি, দ্বিতীয়ত দীনের ব্যাপারে ঘাটতি।

১. **জ্ঞানের ব্যাপারে ঘাটতি :** রমণীগণ পুরুষের চেয়ে অধিকতর কম জ্ঞানের অধিকারী এটা শুধু কুরআন ও হাদীসেরই কথা নয়; বরং নারী পুরুষের শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তির তারতম্যের কথা আধুনিক বিজ্ঞানও মেনে নিয়েছে। আর এটা সর্বজন বিদিত যে, মানুষের পারস্পরিক বুদ্ধির তারতম্য সাধারণত মস্তিষ্কের তারতম্যের উপর নির্ভরশীল। আর নারীর মস্তিষ্কের ওজন ও শক্তি পুরুষের তুলনায় অনেক কম। বিখ্যাত মিশরীয় দার্শনিক ও লেখক ওয়াজেদ আফেন্দীর একটি সমীক্ষায় দেখা যায় যে, সাধারণত পুরুষের মগজের গড়পড়তা ওজন প্রায় ৪৯½ আউন্স, আর নারীর মগজের ওজন ৪৪ আউন্স মাত্র। ২৭৮ জন পুরুষের মগজ ওজন করা হলে বৃহত্তম মগজটির ওজন ৬৫ আউন্স, আর ক্ষুদ্রতম মগজটির ওজন ৩৪ আউন্স বলে প্রমাণিত হয়। অপর দিকে ২৯১ জন নারীর মগজ ওজন করা হলে সবচেয়ে ভারী মগজের ওজন ৫৪ আউন্স এবং সবচেয়ে হালকা মজগটির ওজন ৩১ আউন্স বলে দেখা যায়। এ কারণেই নারীর মানসিক শক্তি অতি দুর্বল। ফলে তারা অল্প শোকে কাতর এবং অধিক শোকে পাথর হয়ে পড়ে এবং কোনো কারণ ছাড়াই হাসতে এবং কাঁদতে পারে।

২. **দীনের ব্যাপারে ঘাটতি :** দীনের হুকুম আহকাম পালনেও তারা পুরুষের তুলনায় অনেক অসম্পূর্ণ। কেননা–

১. নারীরা প্রতি মাসে ঋতুবতী হয়ে নামাজ রোজা থেকে বিমুখ হয়।

২. নেফাসের কারণেও তারা ইবাদত করতে সক্ষম হয় না।

৩. পুরুষের মতো তারা দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে ইবাদত-বন্দেগি করতে পারে না।

৪. হজের মতো কঠিন ইবাদত অনেক মহিলা অপরের সাহায্য ব্যতীত সম্পাদন করতে পারে না।

حَيَاةُ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর জীবনী :

১. **নাম :** তাঁর নাম সা'দ, উপনাম আবূ সাঈদ। এ নামেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। পিতার নাম মালিক ইবনে সিনান। তিনি একজন বিখ্যাত সাহাবী।

২. জন্ম : হিজরতের দশ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।

৩. বাল্যকাল : পিতামাতা উভয়ে হিজরতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করায় বাল্যকাল হতে তিনি ইসলামি পরিবেশে লালিত- পালিত হন।

৪. রাসূল ﷺ -এর সংস্পর্শ : বাল্যকাল থেকে রাসূল ﷺ -এর খিদমতে যেতেন। হিজরতের পর তিনি মসজিদে নববীর কাজেও অংশ নেন। ইসলামের প্রথম যুদ্ধ বদর এবং দ্বিতীয় যুদ্ধ উহুদ যুদ্ধে ছোট হওয়াতে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। তাঁর পিতা উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। তার পরবর্তী সকল যুদ্ধে তিনি রাসূল ﷺ এর সাথে ছিলেন।

৫. স্বভাব-চরিত্র : তিনি স্বাভাবিক জীবন যাপন করতেন। তিনি সম্মান বা প্রশংসা পাওয়ার জন্য বুভুক্ষু ছিলেন না। সকল কাজে সর্বাবস্থায় হুযূর ﷺ এর সুন্নতের অনুসরণ করা তাঁর জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য ছিল।

৬. যুদ্ধে অংশগ্রহণ : উহুদ যুদ্ধের সময় তিনি অত্যন্ত ছোট ছিলেন বলে তাঁকে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়নি, তবে এরপর থেকে তিনি রাসূল ﷺ এর সাথে সর্বমোট ১২ টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

৭. হাদীস বর্ণনা : সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে তিনিও একজন। রাসূল ﷺ থেকে তিনি সর্বমোট এক হাজার একশ' ষাটখানা হাদীস বর্ণনা করেন।

৮. গুণাবলি : তিনি একাধারে একজন হাফেজ, বিজ্ঞ আলিমে দীন ও শরয়িত বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

৯. ইন্তেকাল : তিনি হিজরি ৭৪ সালে ৮৪ বছর বয়সে পবিত্র মদীনা শরীফে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে জান্নাতুল বাকী'তে সমাহিত করা হয়।

وَعَنْ ١٨ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى كَذَّبَنِىْ اِبْنُ اٰدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ ذٰلِكَ وَشَتَمَنِىْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ ذٰلِكَ فَاَمَّا تَكْذِيْبُهٗ اِيَّاىَ فَقَوْلُهٗ لَنْ يُّعِيْدَنِىْ كَمَا بَدَأَنِىْ وَلَيْسَ اَوَّلُ الْخَلْقِ بِاَهْوَنَ عَلَىَّ مِنْ اِعَادَتِهٖ وَاَمَّا شَتْمُهٗ اِيَّاىَ فَقَوْلُهٗ اِتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا وَاَنَا الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ اَلِدْ وَلَمْ اُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِّىْ كُفُوًا اَحَدٌ ـ وَفِىْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَاَمَّا شَتْمُهٗ اِيَّاىَ فَقَوْلُهٗ لِىْ وَلَدٌ وَسُبْحَانِىْ اَنْ اَتَّخِذَ صَاحِبَةً اَوْ وَلَدًا ـ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ ـ

১৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– আল্লাহু তা'আলা বলেছেন, আদম সন্তান আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে অথচ এটা তার জন্য উচিত ছিল না। সে আমাকে গালমন্দ করেছে অথচ এটাও তার পক্ষে শোভা পায় না। আর আমার প্রতি তার মিথ্যা আরোপ করা হলো তার এ কথা বলা যে, আল্লাহ আমাকে যেভাবে প্রথম সৃষ্টি করেছেন সেভাবে পুনরায় কখনো সৃষ্টি করতে পারবেন না। অথচ আমার পক্ষে প্রথমবারের সৃষ্টি দ্বিতীয়বারের চেয়ে কিছুতেই সহজ ছিল না। আর আমাকে গালমন্দ করা হলো তার এই কথা বলা যে, আল্লাহ তা'আলা সন্তান গ্রহণ করেছেন, অথচ আমি এক ও অদ্বিতীয় এবং আমি কারো মুখাপেক্ষী নই। আমি কাউকেও জন্ম দেইনি এবং কারও জাতও নই এবং আমার সমকক্ষও কেউ নেই।

আর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনায় এসেছে যে, আমাকে আদম সন্তানের মন্দ বলা হলো এই যে, তার এই কথা বলা যে, আমার সন্তান রয়েছে, অথচ আমি স্ত্রী-পুত্র গ্রহণ হতে মুক্ত। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : এ হাদীসে ইহুদি, খ্রিস্টান ও পৌত্তলিকদের ভ্রান্ত ধারণা ও মতবাদকে অসার প্রমাণিত করে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষিত হয়েছে। কেননা, ইহুদি সম্প্রদায় বিশ্বাস করত যে, হযরত ওযায়ের (আ.) আল্লাহর পুত্র। খ্রিস্টানগণ দাবি করত যে, হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর পুত্র, মরিয়ম আল্লাহর স্ত্রী। আর পৌত্তলিকগণ ফেরেশতাগণকে আল্লাহর কন্যা এবং অসংখ্য দেব-দেবীকে আল্লাহর সহযোগী মনে করত, অথচ মহান আল্লাহ তা'আলা এসব কিছু হতে পূত-পবিত্র। কারণ, পিতা-পুত্র ও কন্যার মধ্যে রক্তের সম্পর্ক ও সৃষ্টিমূলে অভিন্নতা বিদ্যমান থাকে, আর আল্লাহ এসব হতে মুক্ত ও পবিত্র। তাঁর

যাত ও সিফাতে কেউ তাঁর সমকক্ষ ও শরিক নেই। সুতরাং এসব অসঙ্গত উক্তি ও বিশ্বাস স্থাপন আল্লাহকে গালি দেওয়ার শামিল। আর বনী আদম আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে। আর তা এভাবে যে, তারা বলে আল্লাহ আমাকে পুনঃ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন। অথচ প্রথম সৃষ্টি হতে দ্বিতীয় সৃষ্টি আল্লাহর জন্য অতি সহজ। কেননা, কোনো আদর্শ ও নমুনা ব্যতীত সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীনতা হতে কোনো বস্তুর অস্তিত্ব দান করা সর্বাধিক কঠিন কাজ। আর আল্লাহ যখন এরূপ করতে সক্ষম হয়েছেন তখন ধ্বংসের পর পুনঃ সৃষ্টি করা কোনো ব্যাপারই নয়। অতএব আদম সন্তানের উচিত আল্লাহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা ও গালি দেওয়া থেকে বিরত থাকা।

سَبَبُ كَوْنِ نِسْبَةِ الْوَلَدِ إِلَى اللّٰهِ شَتْمًا আল্লাহর সাথে সন্তানের সম্পর্কিতকরণ গালি হওয়ার কারণ : মহান আল্লাহর সাথে সন্তানের সম্পর্ক স্থাপন গালি হওয়ার কারণ নিম্নরূপ–

১. সন্তান এবং পিতার মধ্যে সামঞ্জস্য হয়ে থাকে। আর সন্তান পরে হওয়ার কারণে সে সৃষ্টি। তাই উভয়ের মধ্যে সামস্য থাকার কারণে পিতারও সৃষ্টি হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে। আর আল্লাহর সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক হওয়া অবশ্যই গালির শামিল।
২. আল্লাহ তা'আলার জন্য সন্তান সাব্যস্ত করা আল্লাহ সন্তানের প্রতি মুখাপেক্ষী বলারই নামান্তর। কেননা, সন্তান জন্ম দেওয়ার প্রতি মুখোপেক্ষী তো হয় সে, যে তার অবশিষ্ট কার্য করার জন্য প্রতিনিধি রেখে যেতে চায়। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার সন্তান আছে বলার অর্থ দাঁড়ায়, আল্লাহ তাঁর বিধান বাস্তবায়নের জন্য প্রতিনিধি তৈরির মুখাপেক্ষী। আর এটা আল্লাহর শানে গালি বৈ কি?
৩. মাওলানা কাসিম নানূতবী (র.) বলেছেন– মানুষ এবং সাপ-বিচ্ছুর মধ্যে সৃষ্ট হওয়া, দেহ বিশিষ্ট হওয়া মরণশীল হওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে সামঞ্জস্য থাকা সত্ত্বেও যদি মানুষ হতে সাপ বিচ্ছু জন্ম নেয়, তবে এটা মানুষের জন্য দুর্নামের ব্যাপার হয়ে থাকে। কাজেই আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য না থাকা অবস্থায় বান্দাকে আল্লাহর সন্তান বলা অবশ্যই আল্লাহর জন্য গালি ও অপবাদ হবে।

اَلْفَرْقُ بَيْنَ الْقُرْاٰنِ وَالْحَدِيْثِ الْقُدْسِيِّ وَالْحَدِيْثِ النَّبَوِيِّ
কুরআন, হাদীসে কুদসী এবং হাদীসে নববীর মধ্যে পার্থক্য :

১. যদি শব্দ ও অর্থ উভয়ই আল্লাহর পক্ষ হতে প্রকাশ্য ওহীর মাধ্যমে আগমন করে, তাহলে তা কুরআন। আর যদি অর্থ আল্লাহর পক্ষ হতে এবং শব্দ নবী করীম ﷺ হতে অপ্রকাশ্য ওহীর মাধ্যমে হয়, তবে তাকে হাদীসে কুদসী বলা হয়। তবে এ ক্ষেত্রে হাদীসটি قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى বলে শুরু করা হয়। এছাড়া শব্দ ও অর্থ উভয়ই যদি নবী করীম ﷺ-এর হয় এবং অপ্রকাশ্য ওহীর মাধ্যমে হয়, তবে তাকে হাদীসে নববী বলে। কিছু সংখ্যক মুহাদ্দিসীনে কেরাম বলেন, নবী করীম ﷺ-এর দু' রকম নূর বা আলো ছিল।
১. একটি হলো সদা সর্বক্ষণ এবং অবিচ্ছিন্ন। এটা হতে যে বক্তব্য বের হতো, তাকে হাদীসে নববী বলা হয়।
২. আর দ্বিতীয়টি হলো আকস্মিক। এটা আবার দু' ধরনের, যেমন– (ক) যদি রাসূল ﷺ-এর আকস্মিক আলোর সময় তার স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং বক্তব্য বের হয়, তবে তাকে কুরআন বলে। (খ) যদি স্বাধীনতা বর্তমান থাকে, তাহলে তাকে হাদীসে কুদসী বলা হয়।

وَعَنْ ١٩ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يُؤْذِيْنِىْ اِبْنُ اٰدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَاَنَا الدَّهْرُ بِيَدِى الْاَمْرُ اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আল্লাহ তা'আলা বলেন, আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়। সে সময় বা কালকে ভর্ৎসনা করে অথচ আমিই কাল [তথা আমি কালকে সৃষ্টি করে তাকে পরিবর্তন করে থাকি।] আমার মুঠায়ই সব কিছু, আমি রাত এবং দিনকে চক্রাকারে ঘুরাই। –[বুখারী-মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে নাস্তিক্যবাদের অমূলক আকীদা বিশ্বাসকে খণ্ডন করা হয়েছে। জাহিলী যুগ হতে আজও কিছু সংখ্যক জড়বাদী যখন কোনো বিপদ-আপদের সম্মুখীন হত তখন এ বিশ্বাস পোষণ করত যে, কালের পরিবর্তনই তাদের ওপর এই বিপদ এসেছে। তাদের এরূপ ধ্যান-ধারণাকে খণ্ডন করে আল্লাহ বলেন যে, পৃথিবীর সব কিছুরই নিয়ন্তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। সব কিছুই তার ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল।

اَلْبَيَانُ وَ التَّعْرِيْفُ فِىْ اَسْبَابِ وُرُوْدِ" سَبَبُ وُرُوْدِ الْحَدِيْثِ **হাদীসটি বর্ণনার পটভূমি** : শায়খ ইবনে হামযার লিখিত "اَلْحَدِيْثِ الشَّرِيْفِ" নামক কিতাবের বর্ণনা মোতাবেক সংশ্লিষ্ট হাদীসের পটভূমি এই যে, জাহিলিয়া যুগে আরবের লোকেরা যখন বিপদগ্রস্ত হত বা তাদের মধ্যে কেউ মরে যেত ; অথবা অসুস্থ হত তখন তারা কালকে গালি দিত এবং তারা মনে করত কালের পরিবর্তনে বা চক্রেই তাদের এই বিপদ এসেছে। নবী করীম ﷺ তাদের এ আকীদার প্রতিবাদে এ হাদীসে উল্লিখিত কথাটি বলেন।

مَعْنَى الْاِيْذَاءِ **কষ্ট দেওয়ার অর্থ** : কার্যত ও উক্তিগত কোনো বিষয়কে অন্যের দিকে ধাবিত করাকে اِيْذَاءٌ বা কষ্ট দেওয়া বলে, চাই তা অন্যের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করুন বা না করুন। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে اِيْذَاءٌ দেওয়ার অর্থ হলো এমন কাজ করা যাতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অসন্তুষ্ট হয়। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهُ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ـ (كَمَا فِى التَّعْلِيْقِ)

مَعْنٰى اَنَا الدَّهْرُ **'আমি কাল' কথার অর্থ** : এ বাক্যটির অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম রাগেব ইস্পাহানী (র.) বলেন, "কালের ভালো-মন্দ, সুখ-দু:খ, যা কিছু প্রকাশ পায় তার মূল আমিই" অতএব কালকে গালমন্দ করার অর্থ আমাকেই মন্দ বলা।

কাজী ইয়ায (র.) বলেন, এখানে اَلدَّهْرُ -এর মধ্যে যে "ال" টি مُضَافٌ -এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। আর এ مُضَافٌ ও বিভিন্নরূপ হতে পারে। যেমন– اَنَا مُصَرِّفُ الدَّهْرِ ـ اَنَا مُقَلِّبُ الدَّهْرِ ـ اَنَا خَالِقُ الدَّهْرِ ইত্যাদি। পবিত্র কুরআনে ও "ال" -এর পরিবর্তে مُضَافٌ উহ্য থাকার দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন– وَاسْئَلِ الْقَرْيَةَ -এর মূল হলো وَاسْئَلْ اَهْلَ الْقَرْيَةِ

অথবা বাক্যটি মুতাশাবিহাত বা অস্পষ্ট হাদীসের অন্তর্গত। এটার অর্থ একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন, অন্য কেউ জানে না।

وَعَنْ ٢٠ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَحَدٌ اَصْبَرَ عَلٰى اَذًى يَسْمَعُهُ مِنَ اللّٰهِ يَدْعُوْنَ لَهُ الْوَلَدَ ثُمَّ يُعَافِيْهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২০. **অনুবাদ** : হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– কষ্টদায়ক কথা শুনার পরও সে ব্যাপারে আল্লাহর চেয়ে বেশি ধৈর্যধারণকারী আর কেউ নেই। মানুষ তার জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে; এরপরও তিনি [এসব কথা শ্রবণ করার পরও ধৈর্য্যধারণ করেন এবং] তাদেরকে নিরাপদে রাখেন এবং রিজিক প্রদান করেন। –[বুখারী-মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : মানুষ আল্লাহর সৃষ্টিজীব হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের কথা-বার্তা ও কাজ-কর্ম দ্বারা মহান আল্লাহ তা'আলাকে কষ্ট দিতে থাকে। মানুষের এরূপ আচরণে যে অসন্তুষ্টি জাগ্রত হয় এতে আল্লাহ তা'আলা তাৎক্ষণিক প্রতিশোধ গ্রহণ করেন না। কেননা, তিনি হলেন পরম ধৈর্যশীল। মানুষের এহেন অপকর্মের ফলেও তাদেরকে সুস্থতা দান করেন। দুনিয়াতে চলার পথকে সহজ করে দেন এবং রিজিক প্রদান করেন। কাজেই মহান আল্লাহ তা'আলার ধৈর্যশীলতার কোনো তুলনাই হয় না।

مَعْنَى الصَّبْرِ وَاَقْسَامُهُ : صَبْر**-এর অর্থ ও তার প্রকারভেদ** : صَبْر শব্দের অর্থ হলো حِلْم বা সংযম অবলম্বন করা ও নফসের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করা। সাধারণত نَفْس যে দিকে আগ্রহী হয় তা হতে বিরত রাখাকে صَبْر বলে। আর এই صَبْر যখন আল্লাহ তা'আলার صِفَة হয় তখন صَبْر -এর অর্থ হবে শাস্তিযোগ্য ব্যক্তি হতে শাস্তিকে বিলম্বিত করা।

اَقْسَامُ الصَّبْرِ **সবরের প্রকারভেদ** : صَبْر তিন প্রকার। যথা–

১. صَبْرٌ عَلَى الطَّاعَةِ তথা নফসকে ইবাদত ও আনুগত্যে বাধ্য করা।

২. صَبْرٌ عَنِ الْمَعْصِيَةِ তথা নফসকে হারাম ও নাজায়েজ কার্যক্রম হতে বিরত রাখা।

৩. صَبْرٌ عَلَى الْمُصِيْبَةِ তথা বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করা।

"يَدْعُونَ لَهُ الْوَلَدَ" -এর বিশ্লেষণ : আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির যাবতীয় বৈশিষ্ট্য হতে মুক্ত ও পবিত্র। তিনি কারো সন্তান নন এবং কারো পিতাও নন। যেমন, কুরআনে এসেছে- اَللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ কিন্তু খ্রিস্টানগণ হযরত ঈসা (আ:)-কে খোদার পুত্র বলে মনে করত। এটা তাদের পক্ষ হতে মহা অন্যায় ছিল। আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যের স্রষ্টা ও মহাধৈর্যের অধিকারী, তাই আল্লাহ তাদের এই অন্যায়ের পরেও তাদেরকে ক্ষমা করতেন। তাদের প্রতি রিজিক ও নেয়ামত দিতেন এবং দিচ্ছেন। দুনিয়াতে প্রতিশোধ না নিয়ে জীবনোপভোগের সুযোগ দিচ্ছেন।

وَعَنْ ٢١ مُعَاذٍ (رضـ) قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ عَلٰى حِمَارٍ لَيْسَ بَيْنِيْ وَ بَيْنَهُ اِلَّا مُؤْخِرَةُ الرَّحْلِ فَقَالَ يَامُعَاذُ هَلْ تَدْرِيْ مَاحَقُّ اللّٰهِ عَلٰى عِبَادِهٖ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ قُلْتُ اَللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّ حَقَّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَّعْبُدُوْهُ وَلَا يُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اَنْ لَّا يُعَذِّبَ مَنْ لَّا يُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلَا اُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ لَا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوْا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২১. অনুবাদ : হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি রাসূল ﷺ -এর [পিছনে] গাধার উপর আরোহণ করলাম। আমার এবং তাঁর মাঝে হাওদার কাঠ ব্যতীত অন্য কোনো ব্যবধান ছিল না। তিনি আমাকে সম্বোধন করে বললেন, হে মু'আয! তোমার কি জানা আছে বান্দাদের উপর আল্লাহর কি অধিকার আছে এবং আল্লাহর উপরই বা বান্দার কি অধিকার আছে? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ এ ব্যাপারে অধিক অবগত। অতঃপর রাসূল ﷺ বললেন, বান্দার উপর আল্লাহর এ অধিকার রয়েছে যে, তারা শুধু আল্লাহর বন্দেগী করবে ও তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবে না। আর আল্লাহ তা'আলার উপর বান্দার অধিকার রয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরিক করবে না, আল্লাহ যেন তাকে কোনো প্রকার শাস্তি না দেন। [হযরত মু'আয (রা.) বলেন] আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি লোকদের এ সংবাদ পৌঁছে দেব না? [অর্থাৎ আমি কি সর্ব সাধারণকে এ সংবাদ জানিয়ে দেব?] রাসূল ﷺ বললেন, না। কারণ, তাহলে লোকেরা [শুধু] এর উপর ভরসা করে বসে থাকবে।-[বুখারী-মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** মহানবী ﷺ আলোচ্য হাদীসে এ কথারই সুস্পষ্ট ঘোষণা প্রদান করেছেন যে, বান্দার উপর আল্লাহর কি অধিকার রয়েছে এবং আল্লাহর উপর বান্দার কি অধিকার রয়েছে। মহান আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করে পৃথিবীতে চলার যাবতীয় উপকরণ প্রদান করেছেন। এসব কিছুই মহান আল্লাহর সীমাহীন অনুগ্রহ। তাঁর এসব করুণার দাবি হলো যে, বান্দা একমাত্র তাঁরই উপাসনা করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার করবে না। আর বান্দা যখন শিরক থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থেকে আল্লাহর দেওয়া বিধি-বিধান মতো চলবে তখন আল্লাহ তাকে জাহান্নামের আজাব হতে মুক্তি প্রদান করবেন।

রাসূলের বাণী حَقُّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ **দ্বারা উদ্দেশ্য :** হাদীসে বর্ণিত حَقُّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ দ্বারা আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার উপর অবশ্য করণীয় দায়িত্ব-কর্তব্য বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদত করা এবং আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করা বান্দার উপর ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য। حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ অর্থাৎ, আল্লাহর উপর বান্দার হক দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে এ প্রসঙ্গে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন-

১. আল্লামা কুরতুবী (র.) বলেন, এ ক্ষেত্রে حَقٌّ শব্দ দ্বারা ওয়াজিব বুঝানো হয়েছে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাগণকে পুরস্কার দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে পুণ্যবান বান্দাদের পুরস্কৃত করা আল্লাহর উপর ওয়াজিব। অন্য কেউ তার উপর দায়িত্ব অর্পণ করেছে তা নয়। হাদীসে উল্লিখিত শব্দ দ্বারা ওয়াজিব অর্থ গ্রহণ করতে কোনো অসুবিধা নেই।

২. আবার কারো মতে, حَقٌّ শব্দের অর্থ হলো مُتَحَقِّقٌ অর্থাৎ নিশ্চিতরূপে প্রাপ্য। কারণ, পুণ্যবানকে পুরস্কৃত করা কিংবা পাপীকে শাস্তি দেওয়া কোনোটাই তাঁর উপর ওয়াজিব নয়। বরং আল্লাহ তা'আলা যেহেতু অত্যাচারী নন ; তাই পাপীর জন্য শাস্তি এবং পুণ্যবানদের অবশ্যই পুরস্কৃত করবেন। কেননা, তিনি কারো আমল বিনষ্টকারী নন।

كَيْفَ رَوَى الْحَدِيْثَ مَعَ مَنْعِ النَّبِيِّ ﷺ নবী করীম ﷺ নিষেধ করা সত্ত্বেও তিনি কিভাবে হাদীসকে বর্ণনা করেছেন? নবী করীম ﷺ হযরত মু'আয (রা.)-কে হাদীসটি বর্ণনা করতে বাধা দেওয়া সত্ত্বেও হযরত মু'আয (রা.) নবী করীম ﷺ-এর ইচ্ছার বিরুদ্ধে হাদীসটি বর্ণনা করলেন কিভাবে ? এর উত্তর নিম্নরূপ : ১. নতুন মুসলমানগণ তখন ইসলামি আহকামে পূর্ণ অভ্যস্ত নয় বিধায় তারা ঈমানের দ্বারা নাজাতের নিশ্চয়তার উপর আমল ছেড়ে দেওয়ার আশঙ্কায় নবী করীম ﷺ হযরত মু'আয (রা.)-কে হাদীসটি বর্ণনা করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু পরে যখন মুসলমানগণ আহকাম পালনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তখন আর সেই আশংকা না থাকায় হযরত মু'আয (রা.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

২. যখন হাদীসটি বর্ণনা করতে নিষেধ করা হয়েছে, তখন এই অপরাধের ভয়ে শেষ জীবনে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৩. হাদীসটি সর্বসাধারণের নিকট বর্ণনা নিষেধ ছিল, বিশেষ লোকের নিকট বর্ণনা নিষেধ ছিল না। তাই হযরত মু'আয (রা.) হাদীসটি বিশেষ লোকদের নিকট বর্ণনা করেছেন। পরে হাদীসটি ব্যাপকতা লাভ করেছে।

حُكْمُ عُصَاةِ الْمُؤْمِنِيْنَ পাপী মু'মিনদের বিধান : হাদীসের প্রকাশ্য অর্থে বুঝা যায়, যারা আল্লাহর সাথে শরিক করেন না, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা শাস্তি দেবেন না, তথা তাদের শাস্তি না দেওয়া যেন আল্লাহর উপর ওয়াজিব। অথচ পাপী ঈমানদারদের শাস্তি দেওয়ার বিধান পবিত্র কুরআনে প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং হাদীসের ভাষ্য اَنْ لَا يُعَذِّبَ-এর অর্থ হবে– لَا يُعَذِّبُ دَائِمًا اَبَدًا অর্থাৎ, তারা চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করবে না। কাফিরগণ চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করবে। অপর দিকে পাপী ঈমানদারগণ তাদের পাপের পরিমাণ মতো শাস্তি ভোগ করার পর বেহেশতে যাবে।

حَيَاةُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.)-এর জীবনী :

১. **নাম ও বংশ পরিচয় :** তাঁর নাম মু'আয, উপনাম আবূ আব্দুল্লাহ অথবা আবূ আব্দুর রহমান। পিতার নাম জাবাল ইবনে আমর। তিনি মদীনার খাযরাজ বংশে জন্মলাভ করেন।

২. **ইসলাম গ্রহণ :** তিনি নবুয়তের দ্বাদশ সালে ১৮ বছর বয়সে মদীনায় ইসলাম প্রচারের সূচনাকালে ইসলাম গ্রহণ করেন।

৩. **গুণাবলি :** তিনি একজন বদরী সাহাবী ছিলেন। দ্বিতীয় বাইয়াতে আক্বাবায় তাঁকে লক্ষ্য করে রাসূল ﷺ বলেছিলেন نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ। মু'আয কতইনা উত্তম পুরুষ।

৪. **রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন :** মক্কা বিজয়ের পর রাসূল ﷺ তাঁকে ইয়ামনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। পরবর্তীতে হযরত ওমর (রা.) তাঁকে আবূ উবায়দাহ ইবনুল জাররাহের পরে শাম দেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন।

৫. **হাদীস বর্ণনা :** হযরত মু'আয (রা.) হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে তৃতীয় স্তরের সাহাবী ছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৭৫। তাঁর থেকে হযরত ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) সহ অনেকে হাদীস বর্ণনা করেন।

৬. **ইন্তেকাল :** এ প্রখ্যাত সাহাবী ১৮ হিজরিতে হযরত ওমরের খিলাফত কালে ৩৮ বছর বয়সে طَاعُوْنُ عَمْوَاس নামক মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন।

২২. وَعَنْ اَنَسٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ وَمُعَاذٌ رَدِيْفُهُ عَلَى الرَّحْلِ قَالَ يَامُعَاذُ! قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ ـ قَالَ يَامُعَاذُ ! قَالَ لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ ـ قَالَ يَا مُعَاذُ! قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ ثَلٰثًا ـ قَالَ مَا مِنْ اَحَدٍ يَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهٖ اِلَّا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ ـ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلَا اُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوْا قَالَ اِذًا يَّتَّكِلُوْا فَاَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهٖ تَأَثُّمًا ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২২. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। একদিন রাসূল ﷺ এবং হযরত মু'আয ইবনে জাবাল একই সওয়ারির উপর উপবিষ্ট ছিলেন। মু'আয ছিলেন রাসূলের পিছনে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে মু'আয ! মু'আয (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি হাজির ও প্রস্তুত। রাসূল ﷺ আবার ডাকলেন, হে মু'আয ! মু'আয (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি হাজির ও প্রস্তুত। রাসূল ﷺ পুনরায় ডাকলেন, হে মু'আয! মু'আয (রা.) উত্তরে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি হাজির আছি ও প্রস্তুত রয়েছি। এভাবে তিনবার ডাকলেন। এরপর রাসূল ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি সত্যিকারভাবে অন্তর দিয়ে এই সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো প্রভু নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দেবেন। অতঃপর হযরত মু'আয (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি মানুষদেরকে এই সুসংবাদ পৌঁছে দেব না, যাতে তারা আনন্দিত হয়। রাসূল ﷺ বললেন, না। তাহলে তারা এর উপর নির্ভর করে বসে থাকবে। হযরত আনাস (রা.) বলেন, [হাদীস গোপনের] পাপ হতে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে শুধু মৃত্যুকালে তিনি লোকদের নিকট এই সংবাদ পৌঁছে যান। -[বুখারী-মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** উক্ত হাদীসটি শরিয়ত সম্পর্কিত বিভিন্ন বিধান তথা ফরজ, ওয়াজিব ও আদেশ-নিষেধ অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেকার।

- হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব (র.) এবং পূর্ববর্তী আলিমদের একটি দল এ মত পোষণ করেছেন যে, এ সময় শুধু কালিমার প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ ছিল।
- ইমাম বুখারী (র.) বলেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বক্ষণে অনুতপ্ত হয়ে ঈমান আনয়ন করল এবং তওবা করল, অতঃপর কোনো প্রকার পাপ কাজে লিপ্ত হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করল ; আলোচ্য হাদীসে তার ব্যাপারে এ কথা বলা হয়েছে।
- হযরত শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান দেওবন্দী (র.) বলেছেন, প্রত্যেক জিনিসের নিজস্ব একটি প্রভাব ও ক্রিয়া আছে। যেমন বিষাক্ত বস্তুর প্রভাব ও ক্রিয়া হলো– অন্য কোনো বস্তুকে ধ্বংস করে দেওয়া, কিন্তু যদি কোনো বস্তু বাধা দৃষ্টি করে অর্থাৎ প্রতিরোধকের ব্যবহার করা হয় তখন বিষের ক্রিয়া অকেজো হয়ে যায়। অনুরূপভাবে কালিমার প্রভাব ও ক্রিয়া হলো দোজখের আগুন হারাম হওয়া, কিন্তু যখন কোনো পাপ কাজে লিপ্ত হয় তখন উক্ত কালিমা তার প্রভাব ও ক্রিয়া বিস্তার করতে পারে না। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, কালিমার সাক্ষ্যদানকারীর জন্য দোজখের আগুণ ততক্ষণ পর্যন্ত হারাম থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রতিরোধক সৃষ্টি না হয়।
- অথবা, কাফের মুশরিকের জন্য যে আগুন হালাল হবে কালিমা ওয়ালা মু'মিনের জন্য সে আগুন হারাম।

هَلْ كُلُّ مِنْ اَهْلِ الشَّهَادَتَيْنِ دَاخِلٌ فِىْ هٰذِهِ الْبِشَارَةِ اَمْ لَا **কালিমায়ে শাহাদাতের স্বীকৃতি দানকারী প্রত্যেকেই এ সুসংবাদের অন্তর্ভুক্ত হবে কি-না ?** উল্লিখিত হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী বুঝা যায় যে, যারা শুধু আন্তরিকভাবে কালিমাকে সত্য জেনে কালিমা স্বীকার করে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা হবে না, অথচ কুরআনে এসেছে–

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সামান্য পরিমাণ পুণ্য করবে, সে তার প্রতিদান পাবে, আর যে ব্যক্তি সামান্যতম পাপ করবে, সেও তার প্রতিদান পাবে।

এর সমাধান নিম্নরূপ :

১. হযরত আনাস (রা.)-এর হাদীসটি ফরজ-ওয়াজিবের আদেশসমূহের পূর্বেকার হাদীস, তাই এটি পরবর্তীতে মানসূখ হয়ে গেছে।

২. হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, বিবাহের সময় স্বামীর পক্ষ হতে শুধু কবুল বললেই যেমন স্ত্রীর সমস্ত প্রকার দায়-দায়িত্ব স্বামীর উপর অর্পিত হয়, তেমনি কোনো ব্যক্তি কালিমায়ে শাহাদাত উচ্চারণের সাথে সাথে ইসলামের যাবতীয় বিধানাবলি তার উপর অর্পিত হয়।

৩. ইমাম বুখারী (র.) বলেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে অনুতপ্ত হয়ে তাওহীদ ও রিসালাতের উপর ঈমান আনে এবং মৃত্যুর পূর্বে কোনো গুনাহে লিপ্ত হয় না, তার বেলায় আলোচ্য হাদীস প্রযোজ্য।

৪. শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান দেওবন্দী (র.) বলেন, প্রত্যেক জিনিসের নিজস্ব একটি প্রভাব ও ক্রিয়া আছে। তেমনি কালিমার প্রভাব ও ক্রিয়া হলো, দোজখের আগুন হারাম হওয়া। কিন্তু কোনো কোনো পাপ তার প্রভাব ও ক্রিয়া নষ্ট করে ফেলে। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে কালিমার সাক্ষ্যদানকারীর জন্য দোজখের আগুন ততক্ষণ পর্যন্ত হারাম থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রতিরোধক কোনো গুনাহ না হয়।

وَجْهُ اِخْبَارِ مُعَاذٍ مَعَ النَّهْىِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ : মহানবী ﷺ-এর নিষেধ সত্ত্বেও হযরত মুআয (রা.) এই হাদীসটি প্রচার করে গেছেন কেন ? এর জবাব নিম্নরূপ–

১. মহানবীর হাদীস بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ اٰيَةً অর্থাৎ, আমার পক্ষ থেকে একটি মাত্র বাক্য হলেও লোকদের মাঝে পৌঁছে দাও। এ দায়িত্ব পালনকল্পেই হযরত মু'আয (রা.) আলোচ্য হাদীসটি জীবনের শেষলগ্নে বর্ণনা করেন।

২. হযরত মু'আয (রা.) জানতেন সে সময়ের মানুষেরা ছিল নতুন মুসলমান, তাই অন্যান্য আহকামের সাথে পরিচিতির পর তিনি আলোচ্য হাদীসটি লোকদের মাঝে প্রকাশ করেন।

৩. অথবা, অন্য হাদীসে দীনের কথা গোপন করার জন্য ভয়ানক শাস্তির কথা উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং হযরত মু'আয (রা.) সে অপরাধ হতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য জীবনের শেষ দিকে তা প্রকাশ করেছেন।

৪. অথবা, মহানবী ﷺ সর্বস্তরের জনসাধারণের সম্মুখে প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন, তাই হযরত মু'আয (রা.) বিশেষ মহলে আলোচ্য হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন।

وَجْهُ دُعَاءِ النَّبِىِّ ﷺ مُعَاذًا ثَلَاثًا **তিনবার হযরত মু'আয (রা.)-কে ডাকার কারণ :** হাদীস বিশারদগণ এর কয়েকটি কারণ বর্ণনা করেছেন। যেমন–

১. যাতে হযরত মু'আয (রা.) নবীজির কথা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করেন।

২. হযরত মু'আয কথাটি গুরুত্ব না দিয়ে শুনলে তাঁর মনে সন্দেহ হতে পারে, তাই তিনবার ডেকেছেন।

৩. মহানবী ﷺ বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার জন্য তিনবার ডেকেছেন।

৪. হযরত মু'আয (রা.) যাতে ভাবতে না পারে যে, মহানবী ﷺ কথাটা অকস্মাৎ বলে ফেলেছেন; বরং মহানবী ﷺ বুঝে-শুনেই বলেছেন এ কথা বুঝানোর জন্য তিনবার ডেকেছেন।

وَعَنْ ٢٣ أَبِي ذَرٍّ (رض) قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ وَهُوَ نَائِمٌ ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدِ اسْتَيْقَظَ فَقَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ ثُمَّ مَاتَ عَلٰى ذٰلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ زَنٰى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنٰى وَإِنْ سَرَقَ قُلْتُ وَإِنْ زَنٰى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنٰى وَإِنْ سَرَقَ قُلْتُ وَإِنْ زَنٰى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنٰى وَإِنْ سَرَقَ عَلٰى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍّ وَكَانَ أَبُوْ ذَرٍّ إِذَا حَدَّثَ بِهٰذَا قَالَ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍّ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৩. অনুবাদ : হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা মহানবী ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। আর তখন তিনি সাদা কাপড়ে আবৃত হয়ে ঘুমিয়েছিলেন। অতঃপর পুনঃ আমি তাঁর নিকট আসলাম, তখন তিনি ঘুম হতে জাগ্রত হয়েছেন। তখন তিনি বলেন, কোনো বান্দা যদি এ কথা বলে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই। এরপর সে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি বললাম সে যদি ব্যভিচার ও চুরি করে ? রাসূল ﷺ বললেন, যদিও সে ব্যভিচার এবং চুরি করে। আমি পুনরায় বললাম যদি সে ব্যভিচার ও চুরি করে? তিনি বললেন [হ্যাঁ] যদিও সে ব্যভিচার এবং চুরি করে। আমি অবারও বললাম [হে আল্লাহর রাসূল!] যদি সে ব্যভিচার এবং চুরিও করে? রাসূল ﷺ বললেন [হ্যাঁ] যদিও সে ব্যভিচার করে এবং চুরি করে। আবূ যরের নাক ধুলায় ধুসরিত হলেও [অর্থাৎ আবূ যরের পছন্দ না হলেও]। (বর্ণনাকারী বলেন) আবূ যর (রা.) যখনই এই হাদীসটি বর্ণনা করতেন তখন রাসূলের মুখ নিঃসৃত বাণী– وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍّ "আবূ যরের নাক ধূলায় ধুসরিত হলেও" এই বাক্যটি বলতেন। –[বুখারী-মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : কোনো ব্যক্তি যদি মহান আল্লাহর উপর একনিষ্ঠভাবে ঈমান আনয়ন করার পর কোনো পাপ কর্ম করার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে নিশ্চিতভাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যদি কোনো পাপ করে থাকে, তবে খাঁটি নিয়তে তওবা করলেও আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিয়ে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। আর যদি তওবা না করে মৃত্যুবরণ করে, তবে পাপ অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় আগুনে জ্বালিয়ে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন।

سَبَبُ وُرُوْدِ الْحَدِيْثِ হাদীস বর্ণনার পটভূমি : শায়খ ইবনে হামযা তাঁর কিতাব اَلْبَيَانُ وَالتَّعْرِيْفُ -এর মধ্যে হাদীসটির পটভূমি এরূপ তুলে ধরেছেন যে, হযরত আবূ যর (রা.) বলেন, একদিন আমি নবী করীম ﷺ-এর সাথে মদীনায় চলতে চলতে উহুদ পাহাড়ের নিকট পৌঁছলাম। তথায় যাওয়ার পর নবী করীম ﷺ আমাকে বললেন, হে আবূ যর ! আমাদের সামনে যে উহুদ পাহাড় আছে তা স্বর্ণে পরিণত হয়ে গেলে এবং আমি তা তিন দিনের মধ্যে ব্যয় করতে পারলেও ঐ এক দিনার পাওয়ার চাইতে অধিক খুশি নই, যা আমি দীনের জন্য সংরক্ষণ করব। এ কথা বলার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, তুমি স্ব-স্থানে অপেক্ষা করো। এ কথা বলে তিনি রাতের অন্ধকারে একটু দূরে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর আমি তার জন্য একটু চিন্তিত হয়ে সামনে এগিয়ে তাকে পেলাম। তিনি আমাকে বললেন, এইমাত্র হযরত জিবরাঈল (আ.) এসেছিলেন এবং সুসংবাদ দিয়ে বললেন যে, যে ব্যক্তি لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ বলবে সে বেহেশতী হবে। এ বিষয়েই উল্লিখিত হাদীসটি বর্ণিত হয়।

حِكْمَةُ ذِكْرِ قَوْلِهِ "وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ" - وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ উল্লেখ করার রহস্য : হযরত আবূ যর (রা.) আলোচ্য হাদীসে وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ [তথা নবী ﷺ-এর দেহ মোবারকের উপর সাদা কাপড় ছিল] এ কথাটি বলার কারণ হলো–

১. ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, বর্ণনাকারী উক্ত উক্তির মাধ্যমে হাদীসটি যে মহানবী ﷺ-এর নিকট হতেই বর্ণনা করেছেন তার অকাট্যতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যাতে শ্রোতাদের হৃদয়ে হাদীসটি মহানবী ﷺ-এর উক্তি হওয়ার ব্যাপারে পরিপূর্ণ বিশ্বাস সৃষ্টি হয়।

২. অথবা, উত্তর এই যে, প্রিয়জনের অবস্থার বর্ণনা মনঃতৃপ্তির কারণ হয়। বর্ণনাকারী হযরত আবূ যর (রা.) মনঃতৃপ্তি অর্জনের উদ্দেশ্যেই প্রিয়জন তথা রাসূলের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন– وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ

وَجْهُ تَخْصِيْصِ الزِّنَا وَ السَّرِقَةِ بِالذِّكْرِ ব্যভিচার ও চুরিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ : যেনা এবং চুরি ছাড়াও কবীরা গুনাহ আরো অনেক রয়েছে, তথাপি উক্ত হাদীসে এ দু'টিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো, গুনাহ দু' রকম হয়ে থাকে। **প্রথমত** حُقُوْقُ اللّٰهِ বা আল্লাহর হক সম্পর্কীয়, আর ব্যভিচার সেই প্রকারের গুনাহ। **দ্বিতীয়ত** حُقُوْقُ الْعِبَادِ বা বান্দার হক সম্পর্কীয়। আর চুরি সেই প্রকারের গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। এখানে দু' প্রকারের দু'টি গুনাহ উল্লেখ করে উভয় প্রকারের গুনাহকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْحَدِيْثَيْنِ দু'টি হাদীসের পারস্পরিক অর্থগত বিরোধ : হযরত আবূ যর (রা.)-এর হাদীস হতে বুঝা যায় যে, ঈমানের পর কবীরা গুনাহ করলেও সে ব্যক্তি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। কেননা, গুনাহের দরুন তার ঈমান নষ্ট বা বরবাদ হয়ে যায়নি। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীস لَايَزْنِى الزَّانِىْ حِيْنَ يَزْنِىْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ الخ অর্থাৎ মু'মিন যিনা, চুরি ইত্যাদিতে লিপ্ত হলে তখন তার ঈমান থাকে না। এ হিসেবে উভয় হাদীসের মধ্যে বাহ্যিক অর্থগত বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। এর জবাবে বলা যায় যে, আবূ যর (রা.)-এর হাদীসের অর্থ হলো, কবীরা গুনাহের দরুন ঈমানের মূল নষ্ট হয় না। অবশ্য ঈমানের গতি হ্রাস পায়, ফলে কেউ গুনাহের কারণে জাহান্নামে গেলেও পরে ঈমানের দরুন মুক্তি পাবে। আর হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীসের অর্থও প্রায় তার কাছাকাছি, অর্থাৎ কবীরা গুনাহ করার সময় পরিপূর্ণ ঈমান থাকে না, ফলে ঈমানের নাম তার নিকট হতে ছিনিয়ে নেওয়া হয় না। অবশ্য তাকে বলা হয় مُؤْمِنٌ عَاصِىْ অর্থাৎ ফাসিক ঈমানদার।

مَعْنٰى رَغِمَ اَنْفُ اَبِىْ ذَرٍّ - رَغِمَ اَنْفُ اَبِىْ ذَرٍّ-এর অর্থ : رَغِمَ শব্দের অর্থ হলো– ধুলায় মলিন হওয়া বা ধুলায় ধুসরিত হওয়া। ফলে, رَغِمَ اَنْفُ اَبِىْ ذَرٍّ -এর অর্থ হলো– আবূ যরের নাক ধূরায় ধুসরিত হোক। এটা একটি আরবি বাগধারা, এটি মূল অর্থে ব্যবহৃত হয়নি; বরং রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ অপছন্দ করা। তখন ব্যক্যটির মূল অর্থ হবে– হযরত আবূ যর (রা.) অপছন্দ করলেও কালিমার স্বীকৃতিদাতা ব্যক্তিটি জান্নাতে প্রবেশ করবে।

وَعَنْ ٢٤ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَهِدَ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ وَاَنَّ عِيْسٰى عَبْدُ اللّٰهِ وَ رَسُوْلُهٗ وَابْنُ اَمَتِهٖ وَكَلِمَتُهٗ اَلْقَاهَا اِلٰى مَرْيَمَ وَ رُوْحٌ مِنْهُ وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَقٌّ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ عَلٰى مَاكَانَ مِنَ الْعَمَلِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২৪. অনুবাদ : হযরত উবাদাহ ইবনে সামিত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– যে ব্যক্তি এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো অংশীদার নেই এবং নিঃসন্দেহে হযরত মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও প্রেরিত রাসূল। অবশ্যই হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর বান্দা ও তাঁরই রাসূল এবং আল্লাহর বাঁদির পুত্র ও তাঁর বাক্য (كُنْ) দ্বারা সৃষ্টি; যা তিনি মারইয়ামের নিকট পৌঁছিয়েছেন। এবং তাঁর পক্ষ হতে [প্রেরিত] একটি রূহ মাত্র। আর যে ব্যক্তি এ সাক্ষ্য দেয় যে, জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, তার আমল যাই হোকনা কেন। –[বুখারী-মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে মহানবী ﷺ ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন করেছেন। ইহুদীরা হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর রাসূল হিসেবে স্বীকারই করতো না এবং তাকে জারজ সন্তান বলতো। আর খ্রিস্টানরা তাঁকে আল্লাহর পুত্র হিসেবে অভিহিত করে আল্লাহ বলেই জানত। নবী করীম ﷺ তাদের এসব অলীক ধারণা খণ্ডন করে বলেন যে, হযরত ঈসা (আ.) তোমাদের ধারণা মতো নয়; বরং তিনি আল্লাহর বান্দা ও নবী। তিনি আল্লাহর সীমাহীন কুদরতে বিনা পিতায় হযরত মারইয়ামের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

اَلْحِكْمَةُ فِىْ ذِكْرِ اَنَّ عِيْسٰى عَبْدُ اللّٰهِ হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর বান্দা বলার রহস্য : عِيْسٰى عَبْدُ اللّٰهِ বলার কারণ হলো, ইহুদিরা হযরত ইসা (আ.)-কে 'জারজ সন্তান' এবং খ্রিস্টানরা তাঁকে 'আল্লাহর পুত্র' হিসেবে আকীদা পোষণ করে, ফলে

উভয় দলই সীমা লঙ্ঘনকারী ও জালিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। অধিকন্তু তারা তাঁর মাতাকে আল্লাহর স্ত্রী [না'উযুবিল্লাহ] বলে যে ধারণা করেছে, এখানে তাঁকে 'আল্লাহর বান্দা বা দাস' বলে প্রকৃত সত্য কথাটিই প্রকাশ করা হয়েছে। আর সাথে সাথে এ দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোনো লোককে মু'মিন হতে হলে হযরত ঈসা (আ.)-কে 'আল্লাহর বান্দা ও রাসূল হওয়া' হিসেবে আকীদা রাখতে হবে, অন্যথায় সে কাফির বলে গণ্য হবে।

وَجْهُ اِطْلَاقِ كَلِمَةِ اللّٰهِ وَ رُوْحٍ مِنْهُ হযরত ঈসা (আ.)-কে كَلِمَةُ اللّٰهِ ও رُوْحٌ مِنْهُ বলার কারণ : كَلِمَةٌ শব্দের অর্থ প্রমাণ বা দলিল। এটাকে হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি এ জন্য ব্যবহার করা হয়েছে যে, তিনি মহান আল্লাহর অসীম কুদরতের জ্বলন্ত প্রমাণ যে, আল্লাহ তা'আলা পিতা ছাড়াও সন্তান সৃষ্টি করতে পারেন। এই হিসেবে كَلِمَةٌ শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে।

- অথবা, মহান আল্লাহ তা'আলা অসংখ্য বস্তুকে كُنْ শব্দ দ্বারা অন্য কোনো সংযোগ ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। এরূপ হযরত ঈসা (আ.)-কেও হযরত মারইয়ামের পেটে كُنْ শব্দ দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।
- অথবা, হযরত ঈসা (আ.)-এর কালাম বা বাণী দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়েছে, তাই তাকে كَلِمَةٌ বলা হয়েছে।
- অথবা, হযরত ঈসা (আ.)-এর মুখ থেকে বাল্য বয়সেই এ কালিমা তথা اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ বের হয়েছিল, তাই তাঁকে كَلِمَةٌ বলা হয়েছে।

رُوْحٌ مِنْهُ বলার কারণ : ১. হযরত ঈসা (আ.)-এর সম্মানার্থে তাঁকে رُوْحٌ مِنْهُ বলা হয়েছে।

২. অথবা, রূহ দ্বারা যেমন মৃত জীবিত হয়ে যায় এরূপই তাঁর ফুঁকের বরকতে মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে যেত, তাই رُوْحٌ বলা হয়েছে?

৩. কিংবা রূহুল আমীন হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা হযরত মারইয়াম (আ.)-এর নিকট প্রেরণ করেছেন এবং তিনি হযরত মারইয়ামের গলায় বা জামার অস্তিনে ফুঁক দিয়েছিলেন, তা হতে তিনি জন্মলাভ করেন। এ জন্যই তাকে রূহ বলা হয়।

৪. অথবা, হযরত ঈসা (আ.)-এর মাধ্যমে হৃদয়সমূহে রূহ আসত, অর্থাৎ তিনি ঈমান ও হিদায়াত দ্বারা মৃত হৃদয়কে জীবিত করতেন। এসব কারণে তাঁকে اَلرُّوْحُ বলা হয়েছে।

وَعَنْ ٢٥ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رض) قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقُلْتُ اُبْسُطْ يَمِيْنَكَ فَلْاُبَايِعْكَ فَبَسَطَ يَمِيْنَهُ فَقَبَضْتُ يَدِىْ فَقَالَ مَالَكَ يَا عَمْرُو قُلْتُ اَرَدْتُّ اَنْ اَشْتَرِطَ قَالَ تَشْتَرِطُ مَاذَا قُلْتُ اَنْ يَّغْفِرَلِىْ قَالَ اَمَا عَلِمْتَ يَا عَمْرُو اَنَّ الْاِسْلَامَ يَهْدِمُ مَاكَانَ قَبْلَهُ وَاَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَاكَانَ قَبْلَهَا وَاَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَاكَانَ قَبْلَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْحَدِيْثَانِ الْمَرْوِيَّانِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا اَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ وَالْاٰخَرُ اَلْكِبْرِيَاءُ رِدَائِىْ سَنَذْكُرُهُمَا فِىْ بَابِ الرِّيَاءِ وَالْكِبْرِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى -

২৫. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে আগমন করলাম। অতঃপর বললাম, [হে আল্লাহর রাসূল ﷺ] আমার দিকে আপনার ডান হাত প্রসারিত করুন, যাতে আমি আপনার হাতে বাইয়াত করতে পারি। [তথা ইসলাম গ্রহণ করতে পারি।] অতঃপর নবী করীম ﷺ তাঁর ডান হাত প্রসারিত করলেন ; কিন্তু আমি আমার হাত গুটিয়ে ফেললাম, ফলে নবী করীম ﷺ বললেন, হে আমর! তোমার কি হলো? আমি বললাম– আমি একটি শর্ত করতে চাই। রাসূল ﷺ বললেন, তুমি কি শর্ত করতে চাও ? অমি বললাম, আমাকে তিনি যেন ক্ষমা করে দেন। নবী করীম ﷺ বললেন, হে আমর ! তোমার এই কথা জানা নেই যে, ইসলাম তার পূর্বেকার সমস্ত গুনাহ ধ্বংস করে দেয়। হিজরত তার পূর্বেকার সমস্ত পাপ নিশ্চিহ্ন করে দেয় এবং হজও তার পূর্বেকার সমস্ত গুনাহ ধ্বংস করে দেয়। –[মুসলিম]

গ্রন্থকার বলেন, এ স্থানে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে দু'টি হাদীস বর্ণিত আছে। একটির সূচনা হলো قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا اَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ আর দ্বিতীয়টির সূচনা হলো اَلْكِبْرِيَاءُ رِدَائِىْ আমি রিয়া ও অহংকার অধ্যায়ে ইনশাআল্লাহ এ দু'টোকে বর্ণনা করব।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْث হাদীসের ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণকালীন সময়ের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তিনি মনে করেছিলেন যে, জাহিলিয়া যুগের কৃত অপরাধসমূহ বহাল থাকা অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করলে কি লাভ হবে ? আল্লাহ তা'আলা কি এগুলো ক্ষমা করবেন ? তাই ইসলাম গ্রহণের পূর্বে এসব পাপের মার্জনার শর্তারোপ করে নেওয়া আবশ্যক তাই তিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে এরূপ শর্ত পেশ করেছেন। অথচ মহানবী ﷺ তার মনের সংশয় নিরসন করে দিয়ে বললেন যে, হে আমর! তোমার কি জানা নেই ? ইসলাম তার পূর্বের সমস্ত পাপ ধ্বংস করে দেয়। ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে পিছনের সব রকমের পাপ আল্লাহ মার্জনা করে দেন। এমনিভাবে খাঁটি নিয়তের হজ ও হিজরতও মানুষের পূর্বের সকল পাপ নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

নিঃশ্চিহ্ন করে দেওয়ার ব্যাপারে বর্ণিত তিনটি বিষয় সমান কিনা ? উক্ত হাদীসের ভাষ্যে বুঝা যাচ্ছে যে, উল্লিখিত বস্তু তিনটির হুকুম সমান, অথচ ব্যাপার তা নয়। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, যদি ইসলাম গ্রহণকারী أَهْلُ حَرْبٍ কাফির দেশের লোক হয়। তবে আল্লাহর হক, বান্দার হক এবং যাবতীয় ছোট-বড় সমস্ত গুনাহ-ই মাফ হয়ে যাবে। কিন্তু যদি সে 'জিম্মি' হয়, তবে শুধুমাত্র আল্লাহর হক মাফ হবে, মানুষের হক ক্ষমা হবে না।

- আর হজ ও হিজরত যদি মাকবুল হয়, তবে কেবলমাত্র আল্লাহর হক মাফ হবে, চাই তা ছোট হোক কিংবা বড় হোক। যেমন, অন্য হাদীসে এসেছে– فَمَنْ حَجَّ وَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ; আবার কারো মতে, পূর্ণ পাপ মোচনকারী বস্তু হলো ইসলাম, আর হজ ও, হিজরত হলো অপূর্ণ ও আংশিক পাপ মোচনকারী। অর্থাৎ কেবলমাত্র আল্লাহর হক সম্পর্কীয় যাবতীয় গুনাহ মাফ হবে, মানুষের হক সম্পর্কীয় কিছুই মাফ হবে না।
- আবার কারো মতে, আল্লাহর হকের শুধুমাত্র পূর্বেকার ছোট গুনাহ মাফ হবে, বড় গুনাহ মাফ হবে না। তবে ইখলাছ ও নিষ্ঠার সাথে তওবা করলে তাও মাফ হয়ে যাবে। মোটকথা, হজ ও হিজরতের ব্যাপারে কবীরা গুনাহের জন্য খালেছ তওবা সংযুক্ত থাকতে হবে; কিন্তু ইসলাম দ্বারা যাবতীয় গুনাহ ধ্বংস হয়ে যায়।

اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْحَدِيْثَيْنِ দু'টি হাদীসের মধ্যে বাহ্যিক অর্থগত বিরোধ : হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, (اَلْإِسْلَامُ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ) ইলাম গ্রহণ করার বদৌলতে তার পূর্ব জীবনের কৃত সকল পাপ সম্পূর্ণরূপে মাফ হয়ে যায়। এর জন্য কোনো শর্ত নেই। অথচ অপর এক হাদীসে এসেছে যে, مَنْ اَحْسَنَ فِى الْاِسْلَامِ لَمْ يُؤْخَذْ بِمَا عَمِلَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ اَسَاءَ فِى الْاِسْلَامِ اَخَذَ بِالْاَوَّلِ وَالْاٰخِرِ অর্থাৎ যে ইসলাম গ্রহণের পর উত্তম কাজ করেছে ও সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মের অনুশাসনগুলো মেনে চলেছে, তাকে পূর্ব জীবনের গুনাহের জন্য শাস্তি দেওয়া হবে না; কিন্তু যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করার পর পাপ কাজে লিপ্ত হয়েছে, তাকে পূর্বাপর সকল গুনাহের জন্য শাস্তি দেওয়া হবে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, পাপ মার্জনার জন্য পূর্বশর্ত রয়েছে।

সমাধান : ইমাম নববী (র.)-এর সমাধানকল্পে বলেন যে, যে ব্যক্তি পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে অকপট অন্তরে ইসলাম গ্রহণ করেছে, ইসলাম গ্রহণের দ্বারা তার পূর্বের সমস্ত পাপ মার্জনা হয়ে যাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি কপটতার সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছে কিন্তু অন্তরে কুফরি গোপন রেখেছে, তাহলে ইসলাম গ্রহণ তার পূর্ব গুনাহ মাফের অবলম্বন হবে না।

কাজেই শেষোক্ত হাদীসে উল্লিখিত اَخَذَ بِالْاَوَّلِ وَالْاٰخِرِ দ্বারা মুনাফিকদের পূর্বাপর গুনাহের শাস্তি দানের কথা বলা হয়েছে। আর وَمَنْ اَحْسَنَ فِى الْاِسْلَامِ দ্বারা অকপটভাবে যে ইসলাম গ্রহণ করেছে তার পূর্বাপর সকল গুনাহ ক্ষমা হবে।

اَقْسَامُ الْهَادِمِ গুনাহ মার্জনাকারী বিষয়ের প্রকারভেদ :

গুনাহ মাফকারী বিষয় দু'টি। যথা–

১. هَادِمٌ كَامِلٌ এটা হলো খাঁটি নিয়তে ইসলাম গ্রহণ করা। এর দ্বারা ছোট বড় সব রকমের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

২. هَادِمٌ نَاقِصٌ এটা এমন যা দ্বারা সগীরা গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যাবে। তবে খাঁটি তওবা পাওয়া গেলে কবীরা গুনাহও ক্ষমা হয়ে যাবে। যেমন– হজ, হিজরত, নামাজ ইত্যাদি। তবে حُقُوْقُ الْعِبَادِ বান্দা মাফ করা ব্যতীত মাফ হবে না। যেমন– কারো ধন-সম্পদ আত্মসাত করা বা কাউকে কষ্ট দেওয়া ইত্যাদি।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٦- وَعَنْ مُعَاذٍ (رض) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَخْبِرْنِىْ بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِى الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِىْ مِنَ النَّارِ قَالَ لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ اَمْرٍ عَظِيْمٍ وَاِنَّهٗ لَيَسِيْرٌ عَلٰى مَنْ يَسَّرَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ تَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِى الزَّكٰوةَ وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ اَلَا اَدُلُّكَ عَلٰى اَبْوَابِ الْخَيْرِ اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ وَصَلٰوةُ الرَّجُلِ فِىْ جَوْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ تَلَا تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ حَتّٰى بَلَغَ يَعْمَلُوْنَ ثُمَّ قَالَ اَلَا اَدُلُّكَ بِرَاْسِ الْاَمْرِ وَعَمُوْدِهٖ وَ ذُرْوَةِ سَنَامِهٖ قُلْتُ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ رَاْسُ الْاَمْرِ اَلْاِسْلَامُ وَعَمُوْدُهُ الصَّلٰوةُ وَ ذُرْوَةُ سَنَامِهٖ اَلْجِهَادُ ثُمَّ قَالَ اَلَا اُخْبِرُكَ بِمِلَاكِ ذٰلِكَ كُلِّهٖ قُلْتُ بَلٰى يَا نَبِىَّ اللّٰهِ فَاَخَذَ بِلِسَانِهٖ فَقَالَ كُفَّ عَلَيْكَ هٰذَا فَقُلْتُ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ وَاِنَّا لَمُؤَاخَذُوْنَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهٖ قَالَ ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ يَا مُعَاذُ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِى النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اَوْ عَلٰى مَنَاخِرِهِمْ اِلَّا حَصَائِدُ اَلْسِنَتِهِمْ - رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ -

২৬. অনুবাদ : হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বললাম, আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলে দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে দেবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি একটি বিরাট ব্যাপারে প্রশ্ন করেছ, তবে আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়টি যার জন্য সহজ করে দিয়েছেন তার জন্য এটা অতি সহজ। তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবে না এবং নামাজ কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, রমজানের রোজা রাখবে এবং আল্লাহর ঘরের হজ সমাধা করবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, [হে মু'আয!] আমি কি তোমাকে কল্যাণের দ্বারসমূহ সম্পর্কে অবহিত করব না? [আর তা হলো,] রোজা হচ্ছে [মন্দ কাজের] ঢাল স্বরূপ, আর সদকা গুনাহকে এমনিভাবে শেষ করে দেয় যেমনিভাবে পানি আগুনকে নির্বাপিত করে দেয় এমনিভাবে কোনো ব্যক্তির মধ্যরাতের নামাজও [পাপকে বিনষ্ট করে দেয়]। অতঃপর মহানবী ﷺ কুরআনের এ আয়াতটি পাঠ করলেন যে, তাদের পার্শ্বদেশ শয্যা হতে বিচ্ছিন্ন থাকে [তথা তারা রাতে শয্যা গ্রহণ করে না] তারা [গজবের] ভয়ে এবং [রহমতের] আশায় তাদের প্রভুকে ডাকতে থাকে এবং আমি তাদেরকে যা কিছু দান করেছি তা হতে তারা ব্যয় করে থাকে। অথচ কেউই অবগত নয় যে, তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ পরকালে তাদের জন্য কি জিনিস গোপন রাখা হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, [হে মু'আয!] আমি কি এ কথা বলে দেব না যে দীনের কাজের প্রকৃত বিষয় ও মূলস্তম্ভ কি এবং তার উচ্চ শিখরই বা কোনটি? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি আমাকে তা বলে দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, দীনের কাজের মূল হচ্ছে ইসলাম, [তথা কালিমা] আর স্তম্ভ হচ্ছে নামাজ, আর এর উচ্চ শিখর হচ্ছে জিহাদ। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, [হে মু'আয!] আমি কি তোমাকে এ সব কাজের গোড়া বা আসল কি তা বলে দেব না ? আমি বললাম– হাঁ, আল্লাহর নবী ﷺ বলে দিন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের জিহবা ধারণ পূর্বক বললেন, তোমার জিহ্বাকে সংযত রাখবে। তারপর আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী ! আমরা এ জিহ্বা দ্বারা যেসব কথাবার্তা বলি কিয়ামতের দিন কি সে ব্যাপারে আমাদেরকে পাকড়াও করা হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে মু'আয ! তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক [অর্থাৎ কি সর্বনাশ]। হে মু'আয! একমাত্র মানুষের মুখের অসংযত কথাবার্তাই কিয়ামতের দিন তাকে মুখের উপর কিংবা নাকের উপর উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। –[আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْث হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে মহানবী ﷺ হযরত মু'আয (রা.)-এর ভালো কর্ম সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো আলোচনা করেছেন, আর তা হলো– (১) জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করা, (২) আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত না করা, (৩) নামাজ প্রতিষ্ঠা করা, (৪) সম্পদের যাকাত প্রদান করা, (৫) রমজান মাসের রোজা রাখা, (৬) দান সদকা করা, (৭) রাতের বেলায় তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করা, (৮) জিহাদ করা এবং (৯) জিহ্বাকে সংযত রাখা। কোনো ব্যক্তি এসব কাজ যথাযথভাবে পালন করতে পারলে তার জন্য দীনের অন্যান্য সকল ইবাদত সহজ হয়ে যায়।

"لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ اَمْرٍ عَظِيْمٍ" বলার : হযরত মু'আয (রা.) নবী করীম ﷺ-এর দরবারে বেহেশতে প্রবেশ করার এবং জাহান্নাম হতে বেঁচে থাকার উপায় সম্পর্কে জানতে চাইলে হযরত নবী করীম ﷺ হযরত মু'আয (রা.)-কে বললেন, لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ اَمْرٍ عَظِيْمٍ [অর্থাৎ তুমি অবশ্যই একটি মহাগুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছ]। এটা দ্বারা নবী কারীম ﷺ বিষয়টির গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করলেন এবং এ জিজ্ঞাসার উত্তরে যে জবাব হুযূর ﷺ দেবেন তার প্রতি হযরত মু'আয (রা.)-কে মনোযোগ দেওয়ার জন্য এ উক্তিটি করেছেন।

وَجْهُ تَسْمِيَةِ الصَّوْمِ وَالصَّدَقَةِ وَصَلٰوةِ اللَّيْلِ بِاَبْوَابِ الْخَيْرِ রোজা, সদকা শেষ রাতের ইবাদতকে কল্যাণের দ্বার বলার কারণ : উল্লিখিত বিষয়াবলিকে কল্যাণের দ্বার বলার কারণ নিম্নরূপ–

পানাহার ও যৌনক্ষুধা পূর্ণ করা হতে বিরত থেকে রোজা রাখা, নিজের কষ্টার্জিত অর্থ অন্যকে দান করা এবং আরামদায়ক নিদ্রা ছেড়ে গভীর রাতে জাগ্রত হয়ে নামাজ আদায় করা অত্যধিক কষ্টকর কাজ। যে ব্যক্তি এ কষ্ট স্বীকার করে তিনটি কাজে অভ্যস্ত হতে পেরেছে, তার পক্ষে অন্যান্য ইবাদত আদায় করা সহজসাধ্য হয়ে যায়। ফলে তার জন্য জাহান্নাম হতে নিষ্কৃতি এবং জান্নাত লাভ করা নিশ্চিত হয়ে পড়ে, এ জন্যই মহানবী ﷺ এ তিনটি ইবাদতকে اَبْوَابُ الْخَيْرِ বা কল্যাণের দ্বার রূপে আখ্যায়িত করেছেন।

مَعْنٰى قَوْلِهٖ "اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ" 'রোজা ঢালস্বরূপ' এর অর্থ : এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, যুদ্ধের ময়দানে যেমন ঢাল ব্যবহার করে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করা হয় এবং তা থেকে আত্মরক্ষা করা যায়, তেমনি রোজা রাখার দ্বারা কাম-রিপুকে দুর্বল করে ইসলামের শত্রু শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আত্মরক্ষা করা যায়। এ জন্য রাসূলে কারীম ﷺ রোজাকে ঢালরূপে আখ্যায়িত করেছেন। মহানবী ﷺ অন্যত্র ইরশাদ করেছেন–

اِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِىْ مِنَ الْاِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ اَلَا فَضَيِّقُوْا مَجَارِيَهٗ بِالْجُوْعِ

অর্থাৎ, শয়তান মানুষের রক্ত প্রবাহের পথ দিয়ে গমনাগমন করে থাকে, সুতরাং তোমরা উপবাস ব্রত পালনের মাধ্যমে তার চলার পথ সংকীর্ণ করে দাও।

بَيَانُ كَوْنِ كَفِّ اللِّسَانِ مِلَاكَ الْكُلِّ জবান সংযত রাখা সকল কিছুর মূল হওয়ার বর্ণনা : مِلَاكٌ অর্থ– নির্ভরস্থল, মৌল বিষয়। মানুষ তার জবান দ্বারাই মিথ্যা, কুৎসা, গিবত, যাবতীয় অন্যায় কথা বলে গুনাহগার হয় এবং তার আমল ধ্বংস করে থাকে। যে ব্যক্তি তার জবানকে এ সকল মিথ্যা, অশ্লীল ও অন্যায় কথা হতে সংযত রাখতে পেরেছে তার জন্য বর্ণিত যাবতীয় গুনাহ হতে বেঁচে থাকা সম্ভব হয়েছে, তথা সে যেন ইসলামের মৌল বিষয় অর্জন করতে পেরেছে। এজন্য নবী করীম ﷺ বলেছেন, জবানকে সংযত রাখাই সব কিছুর মৌল বিষয়।

অপর এক হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার দু' ঠোঁট ও লজ্জাস্থান হেফাজত করেছে, আমি তার জন্য বেহেশতের জিম্মাদার।

ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ-এর অর্থ : ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ অর্থ– তোমার মাতা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক। নবী করীম ﷺ-এর বর্ণনার প্রেক্ষিতে হযরত মু'আয (রা.) যখন বললেন, হুযূর ! আমরা কি আমাদের বাক্যালাপের কারণেও অপরাধী হব? তখন নবী করীম ﷺ বললেন, হে মু'আয ! ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ এ বাক্যটি অর্থগতভাবে বদদোয়া বুঝালেও এখানে হুযূর ﷺ হযরত মু'আয (রা.)-কে বদদোয়ার উদ্দেশ্যে বলেননি; বরং হুজুর ﷺ তাকে আদর করে এ উক্তি করেছেন। অথবা নবী করীম ﷺ এ বাক্যটি বিস্ময় প্রকাশ ও সতর্ক করার উদ্দেশ্যে বলেছেন।

وَعَنْ ٢٧ أَبِىْ أُمَامَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ ـ رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ ـ وَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ مَعَ تَقْدِيْمٍ وَتَاخِيْرٍ وَفِيْهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ اِيْمَانَهُ ـ

২৭. অনুবাদ : হযরত আবূ উমামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন–যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে কাউকে ভালোবাসে এবং একমাত্র আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যেই কারো সাথে শত্রুতা পোষণ করে, আল্লাহর উদ্দেশ্যেই কাউকে কিছু দান করে এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই কাউকে দান করা হতে বিরত থাকে, সে অবশ্যই তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করে নেয়।–[আবূ দাউদ] আর ইমাম তিরমিযী (র.) এ হাদীসটিকে শব্দের পূর্বাপর করে মু'আয ইবনে আনাস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে اِسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانُ -এর স্থলে اِسْتَكْمَلَ اِيْمَانَهٗ উল্লেখ করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** মানব জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য হলো ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি। আর তা অর্জিত হবে একমাত্র আল্লাহকে রাজি ও খুশি করার মাধ্যমে। আলোচ্য হাদীসে এ কথাটিই প্রতিধ্বনিত হয়েছে, আর তাহলো যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই কাউকে ভালোবাসে, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি বিধানের লক্ষ্যেই কারো সাথে শত্রুতা পোষণ করে এবং তাঁরই উদ্দেশ্যে কাউকে দান করবে, দান করা হতে বিরত থাকে, এক কথায় যার সকল কর্মকাণ্ডই একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে হয়, সে পরিপূর্ণ ঈমানদার হিসেবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হয়।

وَجْهُ تَخْصِيْصِ الْاَرْبَعِ الْمَذْكُوْرِ لِتَكْمِيْلِ الْاِيْمَانِ **ঈমান পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য উল্লিখিত চারটি বিষয়কে নির্দিষ্ট করার কারণ :** আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত ৪ টি বিষয় তথা কাউকে ভালোবাসা, কারো প্রতি শত্রুতা পোষণ করা, কাউকে কিছু দান করা এবং তা হতে বিরত থাকা স্বভাবত জাগতিক স্বার্থ চিন্তা ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির মনোবৃত্তি থেকে হয়ে থাকে। নিজ স্বার্থ-চিন্তা ও হীন উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে এসব কর্ম করা একমাত্র আল্লাহ প্রেমিক ও প্রকৃত মু'মিনের পক্ষেই সম্ভব। আর যে এসব কাজ নিঃস্বার্থতার সাথে করতে পারে তার জন্য অপরাপর মহৎ গুণাবলি অর্জন করা অতি সহজ। এ জন্যই মহানবী ﷺ এ চারটি কাজকে ঈমানের পূর্ণতা লাভের উপায় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

مَعْنٰى قَوْلِهٖ اَلْحُبُّ لِلّٰهِ وَالْبُغْضُ لِلّٰهِ **আল্লাহর জন্য বন্ধুতা ও শত্রুতা এর অর্থ :** আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যে কাজে সন্তুষ্ট হন, সে কাজ দুরূহ বা কষ্টসাধ্য হলেও করা বা করার জন্য চেষ্টা করা এটা حُبٌّ فِى اللّٰهِ; কোনো ব্যক্তিকে এ জন্য মহব্বত করা যে, তিনি একজন সৎ এবং দীনদার খোদাভীরু লোক, যদিও তার আপনজনের কেউ নয়। আর কোনো ব্যক্তিকে এজন্য ঘৃণা করা যে, সে অসৎ দুশ্চরিত্র, যদিও সে আপন কেউ হয় এটা بُغْضٌ فِى اللّٰهِ; অনুরূপভাবে কোনো প্রার্থনাকারীকে এ কারণে সাহায্য দেওয়া যে, সে এটা দ্বারা নেক কাজ করবে, যেমন–খাদ্য খেয়ে আল্লাহর ইবাদত করবে, এটা হলো اِعْطَاءٌ فِى اللّٰهِ আর কাউকে এজন্য সাহায্য না দেওয়া যে, সে তা দ্বারা মদ পান করবে বা জুয়া খেলবে, এটা হলো مَنْعٌ لِلّٰهِ; মোটকথা যাবতীয় কাজে পার্থিব স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে একমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভই হলো ঈমানের পরিপূর্ণতার সহায়ক।

تَعْرِيْفُ اَبِىْ اُمَامَةَ **আবূ উমামার পরিচিতি :** হযরত আবূ উমামা বাহেলী (রা.) হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর একজন সম্মানিত সাহাবী ছিলেন, প্রথমদিকে তিনি মিশরে বসবাস করতেন। এরপর তিনি হিমসে স্থানান্তরিত হন এবং সেখানেই ইন্তেকাল করেন। তিনি কম সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারীদের অন্যতম। অনেকে তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হিজরি ৮৬ সালে ৭১ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। সিরিয়ায় মৃত্যুবরণকারী সাহাবীগণের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বশেষ সাহাবী।

وَعَنْ ٢٨ اَبِىْ ذَرٍّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ الْحُبُّ فِى اللّٰهِ وَالْبُغْضُ فِى اللّٰهِ ـ رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ

২৮. **অনুবাদ :** হযরত আবূ যর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– সর্বোৎকৃষ্ট কর্ম হলো আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব করা এবং আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যেই শত্রুতা করা। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** মানব জীবনের সকল কর্মকাণ্ড একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে হওয়া একান্ত আবশ্যক। সাধারণত পার্থিব স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যেই মানুষ একে অপরকে ভালোবাসে এবং অন্যের সাথে শত্রুতা পোষণ করে। এ'জন্য নবী করীম ﷺ এ দু'টি কর্মকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। অথবা উপস্থিত কোনো সাহাবীর মধ্যে এ দু'টি গুণের অভাব দেখেছেন বিধায় মহানবী ﷺ এ কর্মদ্বয়কে উত্তম কর্ম হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অন্য হাদীসে এসেছে যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের ময়দানে তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পর মহব্বতকারীদেরকে আহবান করবেন।

سَبَبُ اَفْضَلِيَّةِ الْحُبِّ فِى اللّٰهِ وَالْبُغْضِ فِى اللّٰهِ **আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ভালোবাসা এবং শত্রুতা পোষণ করা উত্তম হওয়ার কারণ :** সমস্ত আমলসমূহের উপর আল্লাহ তা'আলার জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে শত্রুতা পোষণ করা উত্তম হওয়ার কারণ হলো, সকল নেক আমল আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও মহব্বতের উপর নির্ভরশীল। মন্দ ও অকল্যাণকর কার্য হতে বিরত থাকাও আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা উপর নির্ভরশীল। যার অন্তর আল্লাহর প্রেমে পরিপূর্ণ ; সে উত্তম ও ভালো কার্যের উপর সদাসর্বদা অবস্থান করে। আর যার অন্তরে আল্লাহবিরোধী কাজে শত্রুতা বা ঘৃণা রয়েছে সে সদাসর্বদা খারাপ ও অকল্যাণকর কার্যের প্রতি ঘৃণা করে। এ জন্যই মহানবী ﷺ এ দু'টি কর্মকে উত্তম হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

وَعَنْ ٢٩ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ اَمِنَهُ النَّاسُ عَلٰى دِمَائِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ وَ زَادَ الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ بِرِوَايَةِ فُضَالَةَ وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهٗ فِىْ طَاعَةِ اللّٰهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَ الذُّنُوْبَ ـ

২৯. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– প্রকৃত মুসলমান সে, যার জবান ও হাত হতে অপর মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে, আর প্রকৃত ঈমানদার সে যাকে লোকেরা তাদের জান ও মাল সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করে। – [তিরমিযী ও নাসায়ী]

কিন্তু ইমাম বায়হাকী (র.) "শু'আবুল ঈমান" গ্রন্থে হযরত ফুযালার সূত্রে এ কথাগুলো বৃদ্ধি করেছেন– সে ব্যক্তি প্রকৃত মুজাহিদ, যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যে নিজের প্রবৃত্তির সাথে লড়াই করে। আর যে ব্যক্তি গুনাহ বা পাপের কাজ পরিত্যাগ করে সেই প্রকৃত মুহাজির।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** মুসলিম এবং মু'মিন শব্দের অর্থই হলো নিরাপত্তা ও শান্তি দানকারী। কাজেই যার কাজকর্ম, কথাবার্তা হতে অপর মানুষ নিরাপদ, যাকে মানুষ সকল কাজের সহায়ক মনে করে এবং যাকে আশ্রয়স্থল ও আমানতদার মনে করে, সেই হলো প্রকৃত মুসলিম বা মু'মিন। এ জন্যই মহানবী ﷺ অন্যত্র মু'মিনকে খেজুর গাছের সাথে তুলনা করেছেন। খেজুর গাছের ফল-মূল থেকে শুরু করে সব কিছু যেমন উপকারি তেমনি মুসলমানেরও সকল কাজকর্ম অন্যের জন্য উপকারী হতে হবে। আর প্রকৃত মুজাহিদ সে, যে নিজের কুপ্রবৃত্তির সাথে লড়াই করে সত্যের পথে চলে এবং

নিজের ইচ্ছা শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে চলে। এছাড়া প্রকৃত মুহাজির হলো সে ব্যক্তি, যে সব রকমের পাপ ও অন্যায় কাজকে পরিহার করে চলে, কখনো পাপের কাজে অগ্রসর হয় না।

وَجْهُ اَفْضَلِيَّةِ الْجِهَادِ بِالنَّفْسِ প্রবৃত্তির সাথে জিহাদ উত্তম হওয়ার কারণ : কাফিরদের সাথে জিহাদ করাই সর্বশ্রেষ্ঠ ও একমাত্র জিহাদ নয়; বরং প্রবৃত্তির সাথে যুদ্ধ করে তাকে ইবাদতের জন্য বাধ্য করা একটি উৎকৃষ্ট জিহাদ। কেননা, মানুষের প্রবৃত্তি কাফিরের চেয়ে বড় শত্রু। কেননা, কাফিরের সাথে যুদ্ধ কখনো কখনো হয়ে থাকে এবং কাফির তার থেকে দূরে অবস্থিত। কিন্তু প্রবৃত্তি, যা ইবাদত ও আনুগত্যের বিরোধী তা তার সাথে সার্বক্ষণিকভাবে জড়িত, তাই এই বড় শত্রুর সাথে মানুষের যে সার্বক্ষণিক যুদ্ধ হবে তা আরো গুরুত্বপূর্ণ হবে। তা ছাড়া প্রবৃত্তি এবং শয়তান হলো রাজা, আর কাফির হলো তার সৈন্য দল, তাই সৈন্যদলের সাথে যুদ্ধে অবতরণ করার তুলনায় রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার গুরুত্ব অধিক। তাই মহানবী ﷺ কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হতে ফিরে এসে বলেন رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْاَصْغَرِ اِلَى الْجِهَادِ الْاَكْبَرِ অর্থাৎ, আমরা ছোট লড়াই হতে বড় যুদ্ধের দিকে ফিরে এসেছি।

لِمَ قُدِّمَ اللِّسَانُ عَلَى الْيَدِ فِى الْحَدِيْثِ উক্ত হাদীসে لِسَانٌ-কে يَدٌ-এর উপর অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণ কি : আলোচ্য হাদীসে মহানবী ﷺ لِسَانٌ বা জিহ্বাকে يَدٌ বা হাতের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা يَدٌ-এর তুলনায় لِسَانٌ দ্বারাই মানুষকে বেশি কষ্ট দেওয়া হয়। যেমন, কবি বলেন– جَرَاحَاتُ السِّنَانِ لَهَا الْتِيَامُ + وَلَا يَلْتَامُ مَاجَرَحَ اللِّسَانُ
অথবা, হাত দ্বারা যেসব কষ্ট দেওয়া সম্ভব হয় তা মুখ দ্বারা সম্ভব নয়।
অথবা, মানুষ সর্ব প্রথম মুখ দ্বারাই অন্যকে কষ্ট দিয়ে থাকে।

اَلْمُرَادُ بِقَوْلِهِ "اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ" "প্রকৃত মুজাহিদ সে ব্যক্তি যে তার প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করেছে" বক্তব্যটির তাৎপর্য : যুদ্ধের ময়দানে কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনার উদ্দেশ্যে দীন ও ঈমানকে শত্রুর শত্রুতা থেকে আত্মাকে মুক্ত ও নিরাপদ করা। কেননা, কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রয়োজন সব সময় দেখা দেয় না এবং সকলের পক্ষে এ জিহাদে শরিক হওয়ার সুযোগও হয়ে উঠে না ; কিন্তু মানুষের কুপ্রবৃত্তি তার দীন ও ঈমানের সবচেয়ে বড় শত্রু, যার শত্রুতা বাইরের শত্রুর তুলনায় কোনো অংশে কম নয় এবং এ শত্রুতার মোকাবেলা প্রত্যেককেই সব সময় করতে হয়। সত্যিকার মুমিন ব্যক্তিই এ অভ্যন্তরীণ শত্রুর মোকাবেলা করে নিজের দীন ও ঈমানকে নিরাপদ রাখতে সক্ষম হয়। আর দুর্বল ঈমানদার ব্যক্তি এ অভ্যন্তরীণ শত্রুর হাতে পরাজিত হয়ে দীন ও ঈমানের পক্ষে ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এ জন্যই আপন প্রবৃত্তির সাথে সংঘটিত জিহাদের সফল ব্যক্তিকে প্রকৃত মুজাহিদরূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

---

৩০ وَعَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَلَّمَا خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَّا قَالَ لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهُ وَلَادِيْنَ لِمَنْ لَاعَهْدَ لَهُ . رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ .

৩০. **অনুবাদ** : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খুব কমই আমাদেরকে উপদেশ প্রদান করতেন। আর যখনই দিতেন তখনই এ কথা বলতেন যে, যার মধ্যে আমানতদারী নেই তার ঈমানও নেই। আর যার অঙ্গীকার ঠিক নেই তার দীনও নেই। –[বায়হাকী–শু'আবুল ঈমান]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে মহানবী ﷺ মুসলিম জীবন ব্যবস্থার দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অপর দু'টি কর্মের উপর নির্ভরশীল হিসেবে ঘোষণা করেছেন। প্রথমত আমানতদারী। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যার মধ্যে আমানতদারী নেই, সে যে কোনো কাজ করতে ও কথাবার্তা বলতে দ্বিধা করে না। তার দ্বারা অপরের রক্ষিত সম্পদ ও গোপন কথার খেয়ানত হয়। এ জন্য তার ঈমানের মধ্যে ত্রুটি এসে যায়। অর্থাৎ এরূপ ব্যক্তি পরিপূর্ণ ঈমানদার থাকে না। আর দ্বিতীয়ত যার মধ্যে ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার গুণ না থাকে তার কার্যক্রমে মুনাফিকী ফুটে উঠে ফলে তার দীনের মধ্যে অসম্পূর্ণতা দেখা দেয়।

اَمَانَةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য : উক্ত হাদীসে اَمَانَةٌ দ্বারা কি উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে এ বিষয়ে অনেকগুলো মতামত পাওয়া যায়–

১. اَمَانَةٌ শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো সংরক্ষণ করা বা হেফাজত করা বা গচ্ছিত রাখা– হাদীসে বর্ণিত اَمَانَةٌ -এর অর্থ হলো, যে ব্যক্তি মানুষের ধন-সম্পদের আমানত রক্ষা করে না তথা সংরক্ষণ করে না; বরং খেয়ানত করে এমন ব্যক্তি পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারে না।

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বণিত আছে যে, এখানে আমানত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আনুগত্য করা।

৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অপর এক বর্ণনায় আছে যে, আমানত দ্বারা উদ্দেশ্য ফরজসমূহ? এটি অধিকাংশ ওলামার মত।

৪. হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) বলেন, আমানত দ্বারা স্ত্রীলোকের লজ্জাস্থান সংরক্ষণের কথা বুঝানো হয়েছে।

৫. হযরত কাতাদা (রা.) বলেন, আমানত দ্বারা দীন, ফারায়েয ও হুদূদ উদ্দেশ্য।

৬. হযরত মালিক (র.) হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, আমানত দ্বারা নামাজ, রোজা ও অপবিত্রতার গোসল উদ্দেশ্য।

৭. কারো মতে اَمَانَةٌ দ্বারা অপবিত্রতা হতে গোসল করা উদ্দেশ্য, যেমন হযরত আবু দারদা (রা.) হতে বর্ণিত আছে–
لَمَّا سُئِلُوْا عَنِ الْاَمَانَةِ بِقَوْلِهِمْ مَا اَدَاءُ الْاَمَانَةِ فَقَالَ اَبُو الدَّرْدَاءِ اَلْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ .

৮. কেউ কেউ বলেন, কাউকে জ্ঞান ও বুদ্ধি দান করে তার উপর শরয়ী বিধান পালনের দায়িত্ব অর্পণ করাকে اَمَانَةٌ বলা হয়।

৯. কিছু সংখ্যকের মতে, اَمَانَةٌ দ্বারা শরিয়তের বিধিবিধানসমূহকে বুঝানো হয়েছে, যেমনি আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–
اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ الخ

১০ আর এক দলের মতে, اَمَانَةٌ দ্বারা ঐ অঙ্গীকার উদ্দেশ্য, যার উল্লেখ পবিত্র কুরআনে এসেছে–
وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ الخ

উক্ত হাদীসে عَهْد দ্বারা উদ্দেশ্য : عَهْد শব্দটি একবচন, বহুবচন হলো عُهُوْدٌ শাব্দিক অর্থ হলো– প্রতিশ্রুতি, অঙ্গীকার বা ওয়াদা। হাদীসে বর্ণিত عَهْد সংযুক্ত বাক্যের অর্থ হলো– যে ব্যক্তি অঙ্গীকার রক্ষা করে না সে কখনো পূর্ণ দীনদার হতে পারে না। এ عَهْد-এর উদ্দেশ্য নিয়ে কিছুটা মতান্তর রয়েছে। যেমন–

১. অধিকাংশের মতে, এখানে عَهْد দ্বারা ইহজগতে আল্লাহর শানে মানুষের কৃত অঙ্গীকারের কথা বুঝানো হয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে– اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى

২. অথবা, মহান আল্লাহ হযরত আদম (আ.)-কে পৃথিবীতে পাঠানোর সময় فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ الخ বাণীর মাধ্যমে তার নিকট হতে যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন, আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত عَهْد দ্বারা সেই অঙ্গীকারই উদ্দেশ্য।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

৩১. وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ شَهِدَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ النَّارَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৩১. **অনুবাদ :** হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, [তিনি বলেন,] যে ব্যক্তি এরূপ সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ তা'আলার রাসূল; তার জন্য আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** মহানবী ﷺ অত্র হাদীসে বলেছেন, যে ব্যক্তি এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করে যে, মহান আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ তা'আলা তার উপর জাহান্নামের আগুনকে হারাম করে দেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে স্বীকৃতি দেয় এবং শরিয়তের যাবতীয় বিধিবিধানকে অম্লান বদনে মেনে নিয়ে সে অনুযায়ী জীবন যাপন করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার উপর জাহান্নামের আগুনকে হারাম করে দেবেন। আর যদি সে কোনো পাপও করে থাকে তবে পাপ অনুযায়ী শাস্তি ভোগ করার পরই তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।

৩২. وَعَنْ عُثْمَانَ ابْنِ عَفَّانَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩২. **অনুবাদ :** হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন–যে ব্যক্তি এ বিশ্বাসের উপর মৃত্যুবরণ করেছে যে, আল্লাহ ছাড়া কেনো মাবুদ নেই; সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।–[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** যে ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতে যাবে। অর্থাৎ কালিমার বদৌলতে সে যত পাপই করুক না কেন একদিন অবশ্যই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, তবে পাপের পরিমাণ অনুযায়ী তাকে কিছু দিন জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

حَيَاةُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ **হযরত ওসমান ইবনে আফফান** (রা.)-**এর জীবনী :**

১. **নাম ও পরিচিতি :** তাঁর নাম ওসমান; উপনাম আবূ আবদুল্লাহ, আবূ আমর ও আবূ লায়লা; উপাধি যিন্নুরাইন ও গনী। পিতার নাম আফফান ইবনে আবুল আস, আর মাতার নাম আরওয়া বিনতে কুরাইয। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জামাতা ও তৃতীয় খলীফা এবং কুরাইশ বংশের উমাইয়া শাখার সন্তান।
২. **জন্ম :** অধিকাংশের মতে, তিনি 'আমুল ফীল' তথা হস্তি বাহিনীর ৬ বছর পর ৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কোনো বর্ণনা মতে, তাঁর জন্ম হয় তায়েফে।
৩. **ইসলাম গ্রহণ :** তিনি ইসলামের প্রথম যুগে রাসূলুল্লাহ ﷺ দারুল আরকামে প্রবেশ করার পূর্বে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত ওসমান (রা.) নিজেই বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণকারী চারজনের মধ্যে চতুর্থ।
৪. **খিলাফতের দায়িত্ব লাভ :**হযরত ওমর (রা.)-এর শাহাদাতের পর ২৪ হিজরির ১লা মহররম সোমবার সকালে তিনি খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বারো বছর বারো দিন তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন।
৫. **হাদীসশাস্ত্রে অবদান :**তিনি সর্বমোট ১৪৬ খানা হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম সম্মিলিতভাবে ১৩খানা হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী এককভাবে ৮ খানা আর ইমাম মুসলিম এককভাবে ৫ খানা হাদীস বর্ণনা করেন।
৬. **ইন্তেকাল :** হিজরি ৩৫ সালে ১৪ই যিলহজ 'আল-আসওয়াদুত তুজিবী' নামক ঘাতকের হাতে আসরের নামাজের পর ৮২-৯০ বছরের মাঝামাঝি বয়সে শাহাদাত বরণ করেন।
৭. **কবর :** 'জান্নাতুল বাকী' কবরস্থানের 'হাশশে কাওকাব' নামক অংশে রক্তাক্ত পোশাক সজ্জিত এ মজলুম শহীদকে গোসলবিহীন অবস্থায় দাফন করা হয়। হযরত যুবাইর ইবনে মুতয়িম (রা.) তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন।

وَعَنْ ٣٣ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثِنْتَانِ مُوْجِبَتَانِ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْمُوْجِبَتَانِ قَالَ مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَمَنْ مَاتَ لَايُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৩. **অনুবাদ :** হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– দু'টি এমন বিষয় রয়েছে যা অপর দু'টি বিষয়কে [তথা জান্নাত ও জাহান্নাম] আবশ্যক করে তোলে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ! সে অপরিহার্যকারী বিষয় দু'টি কি কি ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরিক করে মৃত্যুবরণ করেছে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করে মৃত্যুবরণ করেছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীসে মহানবী ﷺ দু'টি বস্তুকে অপর দু'টি বস্তুর অপরিহার্যকারী হিসেবে ঘোষণা করেছেন, আর তা হলো–

১. 'আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা' এ বিশ্বাসের উপর কেউ মৃত্যুবরণ করলে সে নিশ্চিতভাবে জাহান্নামে প্রবেশ করবে ; তা হতে পরিত্রাণের কোনো উপায় নেই। কেননা, মহান আল্লাহ শিরক ছাড়া যাবতীয় পাপ ক্ষমা করে দেবেন।

২. দ্বিতীয় হলো, আল্লাহর সাথে শিরক না করা, এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হবে। অবশ্য পাপ করলেও তার শাস্তি ভোগের পর সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

وَعَنْ ٣٤ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ كُنَّا قُعُوْدًا حَوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَنَا اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فِىْ نَفَرٍ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ اَظْهُرِنَا فَاَبْطَاَ عَلَيْنَا وَخَشِيْنَا اَنْ يُّقْتَطَعَ دُوْنَنَا وَفَزِعْنَا فَقُمْنَا فَكُنْتُ اَوَّلَ مَنْ فَزِعَ فَخَرَجْتُ اَبْتَغِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَتَيْتُ حَائِطًا لِلْاَنْصَارِ لِبَنِى النَّجَّارِ فَدُرْتُ بِهٖ هَلْ اَجِدُ لَهٗ بَابًا فَلَمْ اَجِدْ فَاِذَا رَبِيْعٌ يَدْخُلُ فِىْ جَوْفِ حَائِطٍ مِنْ بِئْرٍ خَارِجَةٍ وَالرَّبِيْعُ الْجَدْوَلُ قَالَ

৩৪. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চতুষ্পার্শ্বে বসা ছিলাম। আমাদের সাথে দলের মধ্যে হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমর (রা.)-ও ছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মধ্য হতে উঠে চলে গেলেন এবং ফিরে আসতে এত বেশি বিলম্ব করলেন যে, আমরা ভীত-কম্পিত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম, না জানি আমাদের অনুপস্থিতিতে কোনো বিপদে পড়লেন কিনা ? এতে আমরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে তাঁর খোঁজে বের হয়ে পড়লাম। আর আমি সর্বপ্রথম অত্যধিক ব্যতিব্যস্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খোঁজে বের হয়ে পড়লাম, অবশেষে তাঁকে খোঁজ করতে করতে বনী নাজ্জার গোত্রের জনৈক আনসারীর এক প্রাচীর বেষ্টিত বাগানের নিকট এসে পৌঁছলাম। অতঃপর এর চতুর্দিকে ঘুরতে লাগলাম যে, ভিতরে প্রবেশ করার কোনো দরজা পাই কিনা? কিন্তু আমি কোনো দরজা পাইনি। হঠাৎ দেখতে পেলাম যে, বাহিরের একটি কূপ হতে একটি ছোট নালা বাগানের ভিতরে প্রবেশ

فَاحْتَفَزْتُ فَدَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : اَبُوْهُرَيْرَةَ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَاشَانُكَ قُلْتُ كُنْتَ بَيْنَ اَظْهُرِنَا فَقُمْتَ فَابْطَاْتَ عَلَيْنَا فَخَشِيْنَا اَنْ تُقْتَطَعَ دُوْنَنَا فَفَزِعْنَا فَكُنْتُ اَوَّلَ مَنْ فَزِعَ فَاَتَيْتُ هٰذَا الْحَائِطَ فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ وَهٰؤُلَاءِ النَّاسُ وَرَائِىْ فَقَالَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ وَاَعْطَانِىْ نَعْلَيْهِ فَقَالَ اِذْهَبْ بِنَعْلَىَّ هَاتَيْنِ فَمَنْ لَقِيَكَ مِنْ وَرَاءِ هٰذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُسْتَيْقِنًابِهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَكَانَ اَوَّلَ مَنْ لَقِيْتُ عُمَرُ فَقَالَ مَاهَاتَانِ النَّعْلَانِ يَا اَبَاهُرَيْرَةَ قُلْتُ هَاتَانِ نَعْلَا رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَنِىْ بِهِمَا مَنْ لَقِيْتُ يَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُسْتَيْقِنًابِهَا قَلْبُهُ بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ فَضَرَبَ عُمَرُ بَيْنَ ثَدْيَىَّ فَخَرَرْتُ لِاسْتِىْ فَقَالَ ارْجِعْ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ فَرَجَعْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَجْهَشْتُ بِالْبُكَاءِ وَرَكِبَنِىْ عُمَرُ وَاِذَا هُوَ عَلٰى اِثْرِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَالَكَ يَا

করেছে। اَلرَّبِيْعُ-এর অর্থ হলো ক্ষুদ্র নালা বা নর্দমা। তিনি বলেন, আমি নিজের দেহকে সংকুচিত করে তার মধ্য দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট প্রবেশ করলাম। তিনি আমাকে দেখে বললেন, আবূ হুরায়রা না কি ? আমি বললাম, জী হুজুর! আমিই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ব্যাপার কি ? তুমি এখানে কিভাবে এলে। আমি বললাম, আপনি আমাদের মাঝেই বসা ছিলেন, এরপর হঠাৎ আপনি উঠে এসে এত বিলম্ব করলেন যে, আমরা ভীত হয়ে পড়লাম। না জানি আপনি আমাদের অনুপস্থিতিতে কোনো বিপদে পড়লেন কি না ? ফলে আমরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লাম। আর আমিই সর্বাগ্রে চিন্তিত হয়ে পড়লাম। ফলে আপনাকে খুঁজতে খুঁজতে এই দেয়ালের নিকট এসে পড়লাম এবং শিয়ালের মতো সংকুচিত হয়ে এখানে প্রবেশ করলাম। আর ঐ সমস্ত লোকেরা আমার পশ্চাতে রয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তাঁর পাদুকাদ্বয় দিয়ে বললেন, হে আবূ হুরায়রা ! এ দু'টি নিয়ে যাও এবং দেয়ালের ওপারে যার সাথে সাক্ষাৎ পাবে ; সে যদি অন্তরের স্থির বিশ্বাসে এটা সাক্ষ্য দেয় যে 'আল্লাহ ব্যতীত কোনো প্রভু নেই' তাকে বেহেশতের সুসংবাদ প্রদান কর। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, সর্বপ্রথম আমার হযরত ওমর (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলো। তখন তিনি বললেন, হে আবূ হুরায়রা ! তুমি এই জুতাদ্বয় কোথায় পেলে? আমি বললাম এ দু'টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাদুকা। এ দু'টিসহ তিনি আমাকে এই বলে পাঠিয়েছেন যে, রাস্তায় যার সাথে সাক্ষাৎ হবে সে যদি মনে-প্রাণে এই সাক্ষ্য দেয় যে, 'আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রভু নেই' তাকে আমি যেন জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করি এটা শুনে হযরত ওমর (রা.) আমার বুকের উপর এমন আঘাত করলেন যে, আমি চিৎ হয়ে পড়ে গেলাম এবং তিনি রাগত স্বরে বললেন, হে আবূ হুরায়রা ! তুমি ফিরে যাও। ফলে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ফিরে গেলাম এবং ক্রন্দনরত অবস্থায় তাঁর নিকট অভিযোগ করলাম এবং দেখলাম যে হযরত ওমর (রা.) আমারই ঘাড়ে সওয়ার হয়ে আছে, অর্থাৎ তিনি আমার পশ্চাতেই সেখানে এসে পৌঁছলেন। অত:পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আবূ হুরায়রা ! তোমার কি হলো? আমি বললাম, প্রথমেই আমি হযরত ওমর

أَبَاهُرَيْرَةَ قُلْتُ لَقِيْتُ عُمَرَ فَاَخْبَرْتُهُ بِالَّذِىْ بَعَثْتَنِىْ بِهِ فَضَرَبَ بَيْنَ ثَدْيَىَّ ضَرْبَةً خَرَرْتُ لِاِسْتِىْ فَقَالَ ارْجِعْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عُمَرُ مَا حَمَلَكَ عَلٰى مَافَعَلْتَ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ اَبَعَثْتَ اَبَا هُرَيْرَةَ بِنَعْلَيْكَ مَنْ لَقِىَ يَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ بَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَلَاتَفْعَلْ فَاِنِّىْ اَخْشٰى اَنْ يَّتَّكِلَ النَّاسُ عَلَيْهَا فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُوْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَخَلِّهِمْ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(রা.)-এর সাক্ষাৎ পেলাম এবং তাকে সে সংবাদই প্রদান করি যা নিয়ে আপনি আমাকে প্রেরণ করেছেন। ফলে তিনি আমার বক্ষের উপর এমন জোরে আঘাত করলেন, তাতে আমি চিৎ হয়ে পড়ে গেলাম। অতঃপর আমাকে বলল, যাও ফিরে যাও। এটা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি এরূপ করলে কেন হে ওমর ? তখন হযরত ওমর (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আপনার উপর আমার পিতামাতা কুরবান হোক! আপনি কি আবূ হুরায়রাকে আপনার পাদুকাদ্বয়সহ এ কথা বলে পাঠিয়েছেন যে, যার সাথে সাক্ষাৎ হবে সে যদি মনে প্রাণে এই সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো প্রভু নেই, তবে তাকে বেহেশতের সুসংবাদ প্রদান করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ। তখন হযরত ওমর (রা.) বললেন, আপনি [অনুগ্রহ পূর্বক] এরূপ করবেন না। কেননা, আমি ভয় করি যে, মানুষ এর উপর নির্ভর করে বসে থাকবে [আমল করবে না]। সুতরাং আপনি মানুষদেরকে আমল করার প্রতি ছেড়ে দিন। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও বললেন, ঠিক আছে তাদেরকে আমল করার সুযোগ দাও। [মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

سَبَبُ اِعْطَاءِ النَّعْلَيْنِ لِاَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-কে পাদুকাদ্বয়সহ প্রেরণের কারণ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) সাহাবীদের নিকট আস্থাভাজন হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জুতাসহ সুসংবাদ দানের উদ্দেশ্যে পাঠানোর কারণ নিম্নরূপ–

১. সাহাবায়ে কেরাম যেন গুরুত্বসহকারে উক্ত বিষয়টি গ্রহণ করেন, এজন্য হাতের নিকট যা পেয়েছেন তা সহকারেই পাঠিয়েছেন।

২. অথবা, পাদুকা দেওয়ার দ্বারা এ কথার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী উম্মতের উপর দীনের ক্ষেত্রে যেসব কঠিন শর্ত আরোপিত হয়েছিল তাকে উঠিয়ে উম্মতে মুহাম্মদীর উপর দীনের ক্ষেত্রে সহজতা দানের লক্ষ্যেই মুহাম্মদ ﷺ-এর আগমন।

৩. অথবা, এটা দ্বারা কালিমার স্বীকৃতিদানের পর স্বীকৃতির উপর অটল থাকার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেমনিভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ

৪. মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, তূর পর্বতে হযরত মূসা (আ.) যেমন আল্লাহ তা'আলার জ্যোতির সম্মুখীন হওয়ার ফলে তিনি আল্লাহর আদেশে নিজের পাদুকাদ্বয় খুলে ফেলেছিলেন, তেমনি রাসূলুল্লাহ ﷺ সে সময় উক্ত দেয়ালের অভ্যন্তরে আল্লাহর নূরের আবেষ্টনীতে ছিলেন। এ জন্যই তিনি নিজের পাদুকা মোবারক খুলে হযরত আবূ হুরায়রার হাতে অর্পণ করেছিলেন। আর সে অবস্থায় তিনি তাঁকে উক্ত সুসংবাদ পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন।

مُعَامَلَةُ عُمَرَ بِاَبِىْ هُرَيْرَةَ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর প্রতি হযরত ওমর (রা.)-এর আচরণ : এখানে প্রশ্ন হতে পারে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হুজুর ﷺ-এর নিদর্শনসহ হাদীসটি প্রকাশ করলেন, তবু হযরত ওমর (রা.) তাঁকে বাধা দিলেন, উপরন্তু তাঁকে আঘাতও করলেন, এটা জায়েজ হলো কিরূপে ? এর উত্তরে বলা হয় যে, হযরত ওমর (রা.)

নিশ্চিতভাবে বুঝতে পেরেছেন যে, উক্ত কথাটি হযরত নবী করীম ﷺ-এরই। তবে এই সময় এ কথাটির প্রচার করাটা ওয়াজিব নয়; বরং হেকমতের খেলাফ। কেননা, এ মুহূর্তে এটা প্রকাশ করলে লাভের চেয়ে ক্ষতির আশঙ্কা বেশি। তাই বলা হয়, স্থান-কাল ও পাত্রভেদে অনেক সময় অনেক সত্যকেও সাময়িকভাবে গোপন রাখতে হয়। হযরত ওমর (রা.) ছিলেন বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি, তাই ক্ষতির বাস্তব দিকটা হুজুর ﷺ-এর সম্মুখে তুলে ধরার পর তিনিও তা সমর্থন করতে কোনো আপত্তি করেননি। অপর দিকে আল্লাহর নবী ছিলেন দয়ার প্রতীক, উম্মতের জন্য সম্পূর্ণ উদার। তাই ক্ষতির দিকটার প্রতি লক্ষ্য না করে বাস্তব সত্য কথাটি প্রচার করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। অথচ হযরত মু'আয (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত পূর্বে উল্লিখিত এক হাদীসে দেখা যায় যে, তিনি নিজেই মু'আযকে এ কথাটি প্রকাশ করতে নিষেধ করেছিলেন। তা ছাড়া উপরিউক্ত হাদীসটি থেকেও এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, যদি হাদীসটি এ মুহূর্তে প্রকাশ ও প্রচার করাটা অপরিহার্য ও ওয়াজিব হতো, তাহলে নবী করীম ﷺ নিজেও হযরত ওমর (রা.)-এর সমর্থন করতেন না এবং হযরত ওমর (রা.)-ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-কে বাধা দিতেন না। আর হযরত ওমর (রা.)-ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-কে যে আঘাত করেছিলেন, তা শত্রুতামূলক ছিল না; বরং তাঁর পরে আর অন্য কোনো লোককে যেন বলতে সাহস না করে এবং সরাসরি মহানবী ﷺ-এর কাছে যেন প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হয়, তাই কিছুটা কঠোরভাবেই বাধা দিয়েছিলেন, ফলে তাঁর উদ্দেশ্য হাসিল হয়েছে।

مِنْ بِئْرٍ خَارِجَةَ-এর মধ্যস্থিত خَارِجَةْ-এর إِعْرَابْ : خَارِجَةْ পদটির তিন প্রকার إِعْرَابْ হতে পারে–

১. خَارِجَةٌ পদটি بِئْرٍ-এর সিফাত হিসেবে মাজরূর। অর্থাৎ مِنْ بِئْرٍ خَارِجَةٍ এ অবস্থায় অর্থ হবে– ঐ নালাটি বাগানের বাইরে একটি কূপ হতে ভিতরে প্রবেশ করেছে।

২. خَارِجَةٌ শব্দটি উহ্য মুবতাদা هِىَ-এর খবর হিসেবে মারফূ'। অর্থাৎ مِنْ بِئْرٍ هِىَ خَارِجَةٌ এ অবস্থায়ও মর্মার্থ পূর্বের ন্যায় হবে।

৩. خَارِجَةْ পদটি بِئْرٍ-এর مُضَافْ اِلَيْهِ হিসেবে مَحَلًّا মাজরূর তবে لَفْظًا গায়রে মুনসারিফ হওয়ার কারণে مَنْصُوْبْ হবে। অর্থাৎ مِنْ بِئْرِ خَارِجَةَ এ অবস্থায় خَارِجَةَ এক ব্যক্তির নাম। তখন মর্মার্থ হবে, নালাটি খারিজা নামক এক ব্যক্তির কূপ হতে প্রবাহিত হয়ে বাগানে প্রবেশ করেছে।

وَعَنْ ٣٥ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رضـ) قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَفَاتِيْحُ الْجَنَّةِ شَهَادَةُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ . رَوَاهُ اَحْمَدُ

৩৫. অনুবাদ : হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, জান্নাতের চাবি হলো এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রভু নেই। –[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْث হাদীসের ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে মহানবী ﷺ شَهَادَةْ-কে জান্নাতের চাবি বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেহেতু মুসলমান হওয়ার একমাত্র মাধ্যম হলো নিশ্চিত বিশ্বাসে কালিমার স্বীকৃতি প্রদান, তাই কালিমাকে মনে-প্রাণে মেনে নিয়ে যদি সে অসংখ্য পাপও করে তবে পাপ অনুযায়ী শাস্তি ভোগের পর একদিন অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। কিন্তু কালিমার স্বীকৃতি না দিয়ে যদি সে অসংখ্য কল্যাণের কাজও করে তবে তা কখনো তার মুক্তির জন্য যথেষ্ট হবে না। كَلِمَةْ ছাড়া তার জন্য জান্নাতের দরজা খোলা হবে না। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ كَلِمَةْ কে জান্নাতের চাবি বলেছেন।

وَعَنْ ٣٦ عُثْمَانَ (رض) قَالَ اِنَّ رِجَالاً مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ تُوُفِّيَ حَزِنُوْا عَلَيْهِ حَتّٰى كَادَ بَعْضُهُمْ يُوَسْوِسُ قَالَ عُثْمَانُ وَكُنْتُ مِنْهُمْ فَبَيْنَا اَنَا جَالِسٌ مَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ وَسَلَّمَ فَلَمْ اَشْعُرْ بِهٖ فَاشْتَكٰى عُمَرُ اِلٰى اَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ثُمَّ اَقْبَلَ حَتّٰى سَلَّمَا عَلَيَّ جَمِيْعًا فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ مَاحَمَلَكَ عَلٰى اَنْ لَا تَرُدَّ عَلٰى اَخِيْكَ عُمَرَ سَلَامَهٗ قُلْتُ مَا فَعَلْتُ فَقَالَ عُمَرُ بَلٰى وَاللّٰهِ لَقَدْ فَعَلْتَ قَالَ قُلْتُ وَاللّٰهِ مَاشَعُرْتُ اَنَّكَ مَرَرْتَ وَلَا سَلَّمْتَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ صَدَقَ عُثْمَانُ قَدْ شَغَلَكَ عَنْ ذٰلِكَ اَمْرٌ فَقُلْتُ اَجَلْ قَالَ مَاهُوَ قُلْتُ تَوَفَّى اللّٰهُ تَعَالٰى نَبِيَّهٗ ﷺ قَبْلَ اَنْ نَسْاَلَهٗ عَنْ نَجَاةِ هٰذَا الْاَمْرِ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ قَدْ سَاَلْتُهٗ عَنْ ذٰلِكَ فَقُمْتُ اِلَيْهِ وَقُلْتُ لَهٗ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ اَنْتَ اَحَقُّ بِهَا قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَانَجَاةُ هٰذَا الْاَمْرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَبِلَ مِنِّى الْكَلِمَةَ الَّتِىْ عَرَضْتُ عَلٰى عَمِّىْ فَرَدَّهَا فَهِىَ لَهٗ نَجَاةٌ - رَوَاهُ اَحْمَدُ -

৩৬. অনুবাদ : হযরত ওসমান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ইন্তেকাল করলেন, তখন বেশ কিছু সাহাবী অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন, এমনকি তাদের অনেকের মনে নানা ধরনের খটকা সৃষ্টি হওয়ার উপক্রম হলো। হযরত ওসমান (রা.) বলেন, আমিও ছিলাম তাদের মধ্যকার একজন। এমতাবস্থায় আমি একদা বসা ছিলাম আর হযরত ওমর (রা.) আমার পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করলেন এবং আমাকে সালাম করলেন; কিন্তু আমি কিছুই অনুভব করতে পারিনি। ফলে হযরত ওমর (রা.) হযরত আবূ বকর (রা.)-এর নিকট [এ বিষয়ে] অভিযোগ করলেন, অতঃপর তাঁরা উভয়ই আমার নিকট আগমন করলেন এবং আমাকে সালাম করলেন, তারপর হযরত আবূ বকর (রা.) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কি হয়েছে যে, আপনি আপনার ভাই ওমরের সালামের জবাব দিলেন না ? আমি বললাম, না আমি তো এরূপ করিনি ! হযরত ওমর (রা.) বললেন, আল্লাহর কসম! আপনি এরূপ করেছেন। হযরত ওসমান (রা.) বলেন, আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আপনি কখন অতিক্রম করলেন এবং কখন সালাম দিলেন আমি তা অনুভবই করতে পারিনি। হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, হযরত ওসমান সত্য কথাই বলেছেন, [তিনি বললেন,] নিশ্চয়ই আপনাকে কোনো দুশ্চিন্তা এদিকে মনোযোগ দেওয়া থেকে বিরত রেখেছে। আমি বললাম জী– হ্যাঁ। তিনি বললেন, সেটা কি ? আমি বললাম, আমার এ বিষয় [মনের খটকা] হতে মুক্তি লাভের উপায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে [দুনিয়া হতে] উঠিয়ে নিয়েছেন। হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, আমি এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছি। অতঃপর আমি তাঁর দিকে উঠে গেলাম এবং বললাম, আপনার প্রতি আমার মাতাপিতা কোরবান হোক, আপনিই এরূপ কাজের যোগ্য ব্যক্তি। হযরত আবূ বকর (রা.) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ! এ বিষয় হতে মুক্তি লাভের উপায় কি? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি সেই কালিমা গ্রহণ করে যা আমি আমার চাচার নিকট পেশ করেছিলাম এবং তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, সেই কালিমাটিই তার জন্য মুক্তি লাভের উপায়। –[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

نَجَاةُ هٰذَا الْاَمْرِ -এর মধ্যস্থিত اَمْر দ্বারা উদ্দেশ্য : আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত نَجَاةُ هٰذَا الْاَمْرِ -এর মধ্যস্থিত اَمْر -এর একাধিক অর্থ হতে পারে–

১. اَلْاَمْرُ দ্বারা আল্লামা তীবী (র.)-এর মতে, اَمْرِ دِيْن বুঝানো হয়েছে, অর্থ– পরকালীন চিরস্থায়ী আজাব হতে মুক্তি জন্য কি দীনের মধ্যে কোনো ব্যবস্থা আছে ?

২. اَلْاَمْرُ দ্বারা শয়তানের কুমন্ত্রণা, ধোঁকা ও কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষ যেভাবে গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তা হতে মুক্তি লাভের উপায় কি?

৩. অথবা, শয়তানের কুমন্ত্রণাকে বুঝানো হয়েছে। কেননা كَادَ بَعْضُهُمْ يُوَسْوِسُ দ্বারা তাই বুঝা যায়।

لِمَا اَجَابَ النَّبِيُّ ﷺ بِعِبَارَتِهِ الطَّوِيْلَةِ وَلَمْ يَقُلْ كَلِمَةَ التَّوْحِيْدِ فَقَطْ মহানবী ﷺ উত্তরে কালিমায়ে তাওহীদ না বলে দীর্ঘ বর্ণনা দিলেন কেন : মহানবী ﷺ শুধু كَلِمَةُ تَوْحِيْد -এর উত্তর না দিয়ে দীর্ঘ বর্ণনার উত্তর দেওয়ার পিছনে রহস্য এই যে, আবূ তালিব আজীবন কুফরির উপর অটল ছিলেন, এক মুহূর্তের জন্যও কালিমার স্বীকৃতি দেননি। যদি এমন ব্যক্তিও একবার সত্য অন্তরে সে কালিমা বলত তাহলে তার নাজাতের ব্যবস্থা হতো এবং তার জাহান্নাম হতে রেহাই পাওয়ার জন্য আমার একটি দলিল হতো।

আর সে মু'মিন যার শিরা-উপশিরায় কালিমা প্রবেশ করেছে, সে মু'মিন যদি কালিমা বলে তাহলে কিভাবে তা নাজাতের অসিলা হবে না? আলোচ্য হাদীসে নবী করীম ﷺ যদি উত্তরে এক শব্দে كَلِمَةٌ বলে দিতেন, তাহলে كَلِمَةٌ -এর এ গুরুত্ব বুঝা যেত না। আর এই নিগূঢ় রহস্যের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তরটি এভাবে প্রদান করেছেন।

وَعَنْ ٣٧ الْمِقْدَادِ (رض) اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا يَبْقٰى عَلٰى ظَهْرِ الْاَرْضِ بَيْتُ مَدَرٍ وَ لَا وَبَرٍ اِلَّا اَدْخَلَهُ اللّٰهُ كَلِمَةَ الْاِسْلَامِ بِعِزِّ عَزِيْزٍ وَذُلِّ ذَلِيْلٍ اِمَّا يُعِزُّهُمُ اللّٰهُ فَيَجْعَلُهُمْ مِنْ اَهْلِهَا اَوْ يُذِلُّهُمْ فَيَدِيْنُوْنَ لَهَا قُلْتُ فَيَكُوْنُ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ ـ رَوَاهُ اَحْمَدُ

৩৭. **অনুবাদ :** হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কে তিনি এ কথা বলতে শুনেছেন যে, ভূপৃষ্টে কোনো মাটির ঘর অথবা পশমের ঘর অবশিষ্ট থাকবে না; যেখানে আল্লাহ তা'আলা ইসলামের বাণী পৌঁছে দিবেন না। সম্মানিত ব্যক্তিদের ঘরে সম্মানের সাথে আর অসম্মানিতদের ঘরে অপমানের সাথে। আল্লাহ যাদেরকে সম্মানিত করবেন তাদেরকে [স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণের সুযোগ করে দিবেন তথা] তার অন্তর্ভুক্ত করে দিবেন। আর যাদেরকে অপমানিত করবেন তাঁরা [জিযিয়া প্রদান পূর্বক] ইসলামের অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হবে। হযরত মিকদাদ (রা.) বলেন, আমি বললাম– তাহলে তখন গোটা দীনই আল্লাহর জন্য হবে, তথা ইসলাম বিজয়ী হবে। –[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَلٰى ظَهْرِ الْاَرْضِ দ্বারা উদ্দেশ্য : এই বিষয়ে কয়েকটি মতামত পাওয়া যায়।

১. ظَهْرِ الْاَرْضِ বা ভূপৃষ্ঠ বলতে সমগ্র পৃথিবী উদ্দেশ্য করা হয়নি; বরং আরব উপদ্বীপ ও পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এই অর্থে উক্ত হাদীসের ঘোষণা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় বাস্তবায়িত হয়েছে। কারণ, মক্কা বিজয়ের পর আরব উপদ্বীপ ও পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে ইসলাম পূর্ণ বিজয় গৌরবে অধিষ্ঠিত হয়েছে, প্রতিটি জনপদ ও গৃহে ইসলামের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে।

২. অথবা ظَهْرِ الْاَرْضِ দ্বারা সমগ্র-বিশ্বই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর এ অর্থে হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী তখনই কার্যকরী হবে, যখন সারা বিশ্বে ইসলাম সার্বিক ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। এটা দ্বারা সম্ভবতঃ ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনের পর সারা দুনিয়ায় ইসলাম বিজয়ী হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

بَيْتُ مَدْرٍ وَلَاوَبَرٍ দ্বারা উদ্দেশ্য :

১. بَيْتُ مَدَرٍ এখানে مَدْرٌ শব্দের মীমের উপর ফাত্‌হ্ বা যবর দিয়ে অর্থ হবে ইট; অতএব بَيْتُ مَدَرٍ অর্থ ইটের ঘর। এখানে নবী করীম ﷺ بَيْتُ مَدْرٍ দ্বারা শহরকে বুঝিয়েছেন। কেননা, শহরের অধিকাংশ বাড়ি-ঘর ইট দ্বারাই তৈরি হয়।

২. بَيْتُ وَبَرٍ -এর মধ্যে وَبَرٌ শব্দের অর্থ হলো উট, দুম্বা, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদির পশম। অতএব بَيْتُ وَبَرٍ -এর অর্থ হলো পশমের ঘর। উক্ত হাদীসে بَيْتُ وَبَرٌ দ্বারা গ্রামকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, আরব দেশে অধিকাংশ গ্রামীণ বাসস্থান তাঁবুর তৈরি হতো। আর তাবু উট, দুম্বা, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদির পশম ও চামড়া দ্বারা তৈরি হতো।

بِعِزِّ عَزِيْزٍ وَ ذِلِّ ذَلِيْلٍ**-এর অর্থ :** আলোচ্য হাদীসাংশের ব্যাখ্যা হলো, মহান আল্লাহ তা'আলা একদিন ইসলামকে বিজয় গৌরবে গৌরবান্বিত করবেন, তখন এমন কোনো জনপদ অবশিষ্ট থাকবে না, যেখানে ইসলাম প্রবেশ করবে না। তখনকার অবস্থা এমন হবে যে, সম্মানিত ব্যক্তি স্ব-সম্মানে ইসলাম কবুল করবে, কোনোরূপ যুদ্ধ বিগ্রহের প্রয়োজন হবে না। আর ইসলাম গ্রহণ করে তারাও ধন্য হবে।

দ্বিতীয়তঃ অসম্মানিত ও অপমানিত ব্যক্তি অপমানকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে ইসলামের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হবে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে, তারা নিহত ও বন্দী হবে। অতঃপর তারা হয়তো ইসলাম গ্রহণ করবে ; নতুবা জিযিয়া -কর প্রদান পূর্বক ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিবে এবং এর বশ্যতা স্বীকার করবে।

"بِعِزِّ عَزِيْزٍ اَوْ ذُلِّ ذَلِيْلٍ" **তারকীবে কি হয়েছে ?** بِعِزِّيزٍ বাক্যাংশটি حَالٌ অর্থাৎ অবস্থা বর্ণনাকারী পদ হয়েছে। এমনিভাবে بِذِلِّ ذَلِيْلٍ ইহাও حَالٌ হয়েছে। তবে এটা প্রথম حَالٌ -এর পর দ্বিতীয় حَالٌ হয়েছে ; তাই একে ব্যাকরণবিদদের পরিভাষায় حَالٌ مُتَرَادِفَةٌ বলা হয়।

وَعَنْ ٣٨ وَهَبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قِيْلَ لَهُ اَلَيْسَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لَيْسَ مِفْتَاحٌ اِلَّا وَلَهُ اَسْنَانٌ فَاِنْ جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ اَسْنَانٌ فُتِحَ لَكَ وَاِلَّا لَمْ يُفْتَحْ لَكَ ـ

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِىْ تَرْجَمَةِ بَابٍ ـ

৩৮. **অনুবাদ :** হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র.) হতে বর্ণিত। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ["আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই"] এটা কি জান্নাতের চাবি নয়? উত্তরে তিনি বললেন, হাঁ [এটা জান্নাতের চাবি] কিন্তু যে কোনো চাবিরই দাঁত থাকে, অতএব, তুমি যদি দাঁত ওয়ালা চাবি নিয়ে আস তবে সে চাবি দ্বারা দরজা খুলবে, নতুবা খুলবে না। –[বুখারী]

ইমাম বুখারী (র.) এ হাদীসটি كِتَابُ الْجَنَائِزِ অধ্যায়ের সূচনাতে শিরোনাম স্বরূপ সনদবিহীনভাবে উল্লেখ করেছেন। এগুলোকে تَعْلِيْقَاتُ الْبُخَارِىْ বলা হয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ**-হাদীসের ব্যাখ্যা :** হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রা.) লোকদের প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন যে, জান্নাতের চাবি হলো কালিমা; তবে যে কোনো চাবিরই দাঁত থাকে, এমনিভাবে বেহেশতের চাবিরও দাঁত থাকতে হবে। আর তা আমল। শুধু شَهَادَةٌ হলেই চলবে না; বরং তার সাথে আমলেরও প্রয়োজন হবে। অতএব ঈমান আনার পর প্রত্যেকেরই উচিত যে, দৈনন্দিন ফরজ ঈবাদতসহ যাবতীয় সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করা।

"فَاِنْ جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ اَسْنَانٌ فُتِحَ لَكَ" **বাক্যটির তাৎপর্য :** আল্লামা তীবী (র.) اَسْنَانٌ শব্দের ব্যাখ্যা করে বলেন যে, চাবির যেমন কতগুলো দাঁত থাকে এবং তার সাহায্যেই তালাবদ্ধ দরজা খোলা সম্ভব হয়। তেমনি যদিও কালিমায়ে শাহাদাতকে জান্নাতের চাবি বলা হয়েছে,, যার দ্বারা এ ধারণা হতে পারে যে, নিছক শাহাদাত বাক্য উচ্চারণ দ্বারাই জান্নাতের দ্বার উন্মুক্ত ও অবারিত হয়ে যাবে। কোনো আমল করার প্রয়োজন হবে না। এ কারণে আলোচ্য হাদীসে দাঁত বিশিষ্ট চাবির উল্লেখ করা হয়েছে এবং নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত ইত্যাদি ফরজ ইবাদতকে দাঁতরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। অর্থাৎ দাঁত বা কাঁটবিহীন চাবি দ্বারা যেমন অনায়াসে দরজা খোলা যায় না, তদ্রূপ এ সকল আমল বর্জিত নিছক শাহাদাত বাক্যের স্বীকারোক্তি দ্বারা অনায়াসে জান্নাতে প্রবেশ করা যাবে না। হ্যাঁ, প্রয়োজনীয় শাস্তি ভোগের পর তা সম্ভব হবে।

وَعَنْ ٣٩ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِمِثْلِهَا حَتّٰى لَقِيَ اللّٰهَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৯. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি উত্তম রূপে ইসলাম গ্রহণ করে, তখন তার প্রতিটি সৎকাজ যা সে করবে, তার জন্য তাকে দশগুণ হতে সাতশতগুণ পর্যন্ত ছওয়াব লিখে দেওয়া হবে। আর তার মন্দ ও অসৎ কাজ যা সে করে, তার পাপ অনুরূপই লেখা হবে, যে পর্যন্ত না সে আল্লাহর সাথে মিলিত হয়। –[বুখারী-মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ-এর ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহশীল। তিনি বান্দার আমলকে কখনো বিনষ্ট করেন না; বরং তার যথার্থ প্রতিদান দিয়ে থাকেন। বান্দার প্রতি তিনি এত অনুগ্রহশীল যে, সৎকর্মের প্রতিটির জন্য ১০ হতে সাতশত গুণ পর্যন্ত ছওয়াব দিয়ে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে দানকে শষ্য উৎপাদনের সাথে তুলনা করে অসংখ্য প্রতিদানের কথা বলেছেন, তবে প্রতিদানের এই বৃদ্ধির হার সাত শত গুণে সীমিত নয় ; বরং তার থেকে বেশিও হতে পারে। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে যে, وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ তথা আল্লাহ যাকে চান তাকে এ থেকেও বেশি করে দিয়ে দিবেন।

وَعَنْ ٤٠ أَبِي أُمَامَةَ (رضـ) أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا الْإِيْمَانُ قَالَ إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَا الْإِثْمُ قَالَ إِذَا حَاكَ فِيْ نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

৪০. **অনুবাদ :** হযরত আবূ উমামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করল যে, [হে আল্লাহর রাসূল!] ঈমানের স্বরূপ কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যখন তোমার সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দিবে এবং অসৎকাজ তোমাকে কষ্ট দিবে তখন মনে করবে যে, তুমি খাঁটি মু'মিন। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল ! গুনাহের কাজ কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যখন কোনো কাজ করতে তোমার বিবেকে বাধবে তখন [মনে করবে যে, তাই পাপের কাজ এবং] তা পরিত্যাগ করবে। –[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ-হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে একজন সাহাবী মহানবী ﷺ-এর নিকট একজন খাঁটি ও বিশুদ্ধ ঈমানদারের নিদর্শন ও পরিচয় জানতে চেয়েছিলেন, জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন যে, যখন নেক ও সৎকাজ তোমার অন্তরে আনন্দ সৃষ্টি করে, উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার করে, আর বদ ও মন্দ কাজ অন্তরে বিষণ্ণতা ও অসন্তুষ্টি সৃষ্টি করে তখন তুমি খাঁটি ঈমানদার হিসেবে গণ্য হবে। এর বিপরীত হলে বুঝতে হবে– তোমার ঈমানে এখনও পূর্ণতা আসেনি এবং খাঁটি ঈমানদার এখনও হতে পারনি।

وَعَنْ ٤١ عَمْرِوبْنِ عَبَسَةَ (رضـ) قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ مَّعَكَ عَلٰى هٰذَا الْاَمْرِ قَالَ حُرٌّ وَعَبْدٌ قُلْتُ مَا الْاِسْلَامُ قَالَ طِيْبُ الْكَلَامِ وَاِطْعَامُ الطَّعَامِ قُلْتُ مَا الْاِيْمَانُ قَالَ الصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ قَالَ قُلْتُ اَىُّ الْاِسْلَامِ اَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ قَالَ قُلْتُ اَىُّ الْاِيْمَانِ اَفْضَلُ قَالَ خُلُقٌ حَسَنٌ قَالَ قُلْتُ اَىُّ الصَّلٰوةِ اَفْضَلُ قَالَ طُوْلُ الْقُنُوْتِ قَالَ قُلْتُ اَىُّ الْهِجْرَةِ اَفْضَلُ قَالَ اَنْ تَهْجُرَ مَاكَرِهَ رَبُّكَ قَالَ فَقُلْتُ فَاَىُّ الْجِهَادِ اَفْضَلُ قَالَ مَنْ عُقِرَ جَوَادُهٗ وَاُهْرِيْقَ دَمُهٗ قَالَ قُلْتُ اَىُّ السَّاعَاتِ اَفْضَلُ قَالَ جَوْفُ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ ـ رَوَاهُ اَحْمَدُ ـ

৪১. **অনুবাদ :** হযরত আমর ইবনে আবাসা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– আমি একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট আগমন করলাম। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! এই বিষয়ে [তথা ইসলাম ধর্ম প্রচারে] আপনার সাথে কে আছে? রাসূল ﷺ বললেন– একজন মুক্ত মানুষ ও একজন গোলাম। আমি বললাম, ইসলাম কি? তিনি বললেন, ইসলাম হলো উত্তম কথা বলা এবং [অভাবীকে] খাবার খাওয়ানো। আমি পুনঃ জিজ্ঞাসা করলাম, ঈমান কি? তিনি বললেন, ধৈর্যধারণ করা এবং দান করা। এরপর বললাম, কোন ব্যক্তির ইসলাম সবচেয়ে উত্তম। তিনি বললেন, যার যবান ও হাত হতে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে তার ইসলামই উত্তম। আমর বলেন– অতঃপর আমি বললাম, কোন ঈমান উত্তম ? তিনি বললেন, সৎ চরিত্র। আমর বলেন– আমি আবারও তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম নামাজের মধ্যে কোন কাজটি সবচেয়ে উত্তম ? তিনি বললেন– দীর্ঘ কিয়াম। সে পুনঃ বললেন– কোন ধরনের হিজরত উত্তম? রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তরে বললেন, তোমার প্রভু যা অপছন্দ করেন ; তা বর্জন করাই উত্তম হিজরত। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম, [হে আল্লাহর নবী !] কোন ধরনের জিহাদ উত্তম? তিনি বললেন যার ঘোড়া [লড়াইয়ের ময়দানে যুদ্ধ করতে করতে] নিহত হয়েছে এবং তার রক্তও প্রবাহিত করা হয়েছে [তথা শাহাদাত বরণ করেছে]। আমি আবারও বললাম, [হে আল্লাহর রাসূল ﷺ] নফল ইবাদতের জন্য] সর্বোত্তম সময় কোনটি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন–শেষ রাতের মধ্য ভাগ। –[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উপরিউক্ত হাদীসে بِهٰذَا الْاَمْرِ দ্বারা উদ্দেশ্য : হযরত আমর ইবনে আবাসা (রা.) রাসূল ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন। তার মধ্যে প্রথম প্রশ্ন مَنْ مَّعَكَ عَلٰى هٰذَا الْاَمْرِ তথা এই ব্যাপারে আপনার সাথে কে আছে? এখানে هٰذَا الْاَمْرُ দ্বারা ইসলামি জীবন ব্যবস্থাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ইসলামের বর্তমান প্রাথমিক অবস্থায় আপনার সাথে কারা রয়েছে।

اَلْمُرَادُ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدِ আজাদ এবং গোলাম দ্বারা উদ্দেশ্য :

১. অধিকাংশের মতে, এখানে "حُرٌّ" দ্বারা হযরত আবূ বকর (রা.)-কে আর "عَبْدٌ" দ্বারা হযরত যায়েদ বিন হারেছা (রা.) তথা রাসূল ﷺ-এর পালক পুত্রকে বুঝানো হয়েছে।

২. অন্য এক দলের মতে, "حُرٌّ" দ্বারা হযরত আবূ বকর (রা.)-কে আর "عَبْدٌ" দ্বারা হযরত বেলাল (রা.)-কে বুঝানো হয়েছে। যেমন– মুসলিম শরীফের এক রেওয়ায়েতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, وَمَعَهٗ يَوْمَئِذٍ اَبُوْبَكْرٍ وَبِلَالٌ উল্লেখ্য যে, হযরত খাদীজা ও হযরত আলী (রা.) প্রাথমিক ইসলাম গ্রহণকারী হওয়া সত্ত্বেও তাদের উল্লেখ না করার কারণ হলো– তখন হযরত আলী (রা.) ছিলেন অপ্রাপ্ত বয়স্ক। আর হযরত খাদীজা (রা.) ছিলেন রাসূলের জীবন সঙ্গিনী এবং পর্দার অন্তরালের মহিলা।

اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْحَدِيْثَيْنِ وَتَطْبِيْقُهُمَا **দু' হাদীসের মধ্যে অর্থগত বিরোধ ও তার নিরসন :** হযরত আমর ইবনে আবাসা (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসে আছে যে, ইসলাম হলো উত্তম বাক্যালাপ ও অভুক্তকে খাদ্য দান, আর ঈমান হলো ধৈর্য এবং দানশীলতার নাম।

অথচ হযরত জিব্রাঈলের হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, ঈমান হলো আল্লাহ ও আসমানী কিতাবসমূহ এবং ফেরেশতাগণ ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, আর ইসলাম হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি সাক্ষী দেওয়া ইত্যাদি। ফলে উভয় হাদীসের বর্ণনায় অর্থগত বিরোধ পরিলক্ষিত হয়।

উভয় হাদীসের অর্থগত বিরোধের সমাধান : হযরত আমর ইবনে আবাসার হাদীসে ঈমান ও ইসলামের শাখা ও লক্ষণের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আর হযরত জিব্রাঈল (আ.)-এর হাদীসে ঈমান ও ইসলামের হাকীকতের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, সুতরাং উভয় হাদীসের বিষয়বস্তু পৃথক হওয়ায় কোনো অর্থাৎ বিরোধ থাকল না।

অথবা, হাদীসে জিব্রাঈলের মধ্যে মূল ঈমান ও ইসলামের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং আমর ইবনে আবাসার বর্ণিত হাদীসের মধ্যে ঈমান ও ইসলামের কোনো অংশের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

অথবা, হাদীসে জিব্রাঈলের মধ্যেই ঈমান ও ইসলামের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, আর আমর ইবনে আবাসার হাদীসে শ্রোতার অবস্থার ভিত্তিতে তার মধ্যে অভাব জনিত বিষয়ের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

وَعَنْ ٤٢ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ لَّقِىَ اللّٰهَ لَايُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا وَيُصَلِّى الْخَمْسَ وَيَصُوْمُ رَمَضَانَ غُفِرَ لَهٗ قُلْتُ اَفَلَا اُبَشِّرُهُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ دَعْهُمْ يَعْمَلُوْا ـ رَوَاهُ اَحْمَدُ ـ

৪২. অনুবাদ : হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করে যে, সে আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করেনি। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে এবং রমজানের রোজা রাখে; তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ! আমি কি লোকদিগকে এ বিষয়ে সুসংবাদ দেব না ? তিনি বললেন; বরং তাদেরকে আমল করতে সুযোগ দাও। –[আহমদ]

وَعَنْ ٤٣ اَنَّهٗ سَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ عَنْ اَفْضَلِ الْاِيْمَانِ قَالَ اَنْ تُحِبَّ لِلّٰهِ وَتُبْغِضَ لِلّٰهِ وَتُعْمِلَ لِسَانَكَ فِىْ ذِكْرِ اللّٰهِ قَالَ وَمَاذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَاَنْ تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتَكْرَهَ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ ـ رَوَاهُ اَحْمَدُ

৪৩. অনুবাদ : হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ঈমানের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। নবী করীম ﷺ জবাবে বলেছেন যে, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই কাউকে ভালবাসবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই কারো সাথে শত্রুতা পোষণ করবে। আর নিজের জিহ্বাকে আল্লাহ তা'আলার জিকিরে মশগুল রাখবে। এরপর হযরত মু'আয (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ! তারপর কি? মহানবী ﷺ বললেন– তুমি নিজের জন্য যা পছন্দ কর; অন্যের জন্যও তা পছন্দ করবে। এমনিভাবে নিজের জন্য যা অপছন্দ কর ; অন্যের জন্যও তা অপছন্দ করবে। –[আহমদ]

بَابُ الْكَبَائِرِ وَعَلَامَاتِ النِّفَاقِ

পরিচ্ছেদ : কবীরা গুনাহ ও মোনাফেকীর নিদর্শনসমূহ

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

وَعَنْ ٤٤ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الذَّنْبِ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ؟ قَالَ اَنْ تَدْعُوَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قَالَ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ اَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ اَنْ يَّطْعَمَ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ اَنْ تَزْنِىَ حَلِيْلَةَ جَارِكَ ـ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَصْدِيْقَهَا "وَالَّذِيْنَ لَايَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ" اَلْاٰيَةَ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

৪৪. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ -কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল ! আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় গুনাহ কোন্‌টি ? তিনি বললেন, কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করা। অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।

অতঃপর লোকটি জিজ্ঞেস করল, এরপর কোন্‌টি? রাসূল ﷺ বললেন, তোমার সন্তানকে হত্যা করা এ ভয়ে যে, সে তোমার সাথে ভক্ষণ করবে। এরপর লোকটি জিজ্ঞেস করল, এরপর কোন্‌টি ? রাসূল ﷺ বললেন, তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। এর সমর্থনে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাজিল করেন– وَالَّذِيْنَ لَايَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَايَزْنُوْنَ ـ অর্থাৎ, যারা আল্লাহর সাথে অপর কোনো ইলাহকে ডাকে না, আর যাকে হত্যা করা আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন, আইনের বিধান ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং তারা ব্যাভিচারেও লিপ্ত হয় না। [সূরা ফুরকান : ৬৮]–[বুখারী -মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَعْرِيْفُ الْكَبِيْرَةِ কাবীরাগুনাহের পরিচিতি :

مَعْنَى الْكَبِيْرَةِ لُغَةً : كَبِيْرَه -এর শাব্দিক অর্থ : كَبِيْرَةٌ শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হলো كَبَائِرُ শাব্দিক অর্থ হলো– বড় বা বৃহৎ। যেমন কুরআনে এসেছে– اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ ـ

تَعْرِيْفُ الْكَبِيْرَةِ اِصْطِلَاحًا : كَبِيْرَه -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে, كُلُّ مَانَهَى اللّٰهُ عَنْهُ فَهِىَ كَبِيْرَةٌ অর্থাৎ, যে সকল কাজ থেকে আল্লাহ নিষেধ করেছেন– তা-ই কবীরাহ।

২. আল্লামা বায়যাভী (র.)-এর মতে,
اَلْكَبِيْرَةُ كُلُّ ذَنْبٍ رَتَّبَ الشَّارِعُ حَدًّا اَوْ صَرَّحَ الْوَعِيْدَ فِيْهِ اَوِ اللَّعْنَةَ عَلَيْهِ اَوِ الْجَهَنَّمَ عَلَيْهِ ـ

৩. ইমাম রাযী (র.)-এর মতে, هِىَ الَّتِىْ مِقْدَارُهَا عَظِيْمٌ অর্থাৎ যে অপরাধের শাস্তির পরিমাণ বেশি, তা-ই কবীরা গুনাহ।

৪. কারো কারো মতে, مَا لَايَغْفِرُ اللّٰهُ لِفَاعِلِهٖ اِلَّا بَعْدَ التَّوْبَةِ অর্থাৎ, যে পাপের অপরাধীকে আল্লাহ তা'আলা তওবা ব্যতীত ক্ষমা করবেন না তাকে কাবীরা গুনাহ বলা হয়।

৫. কারো মতে, اَلْكَبَائِرُ هِيَ الَّتِيْ يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَدُّ

৬. কারো মতে, اَلْكَبَائِرُ مَا يُكَفَّرُ مُسْتَحِلُّهُ

৭. ইমাম গাযালী (র.) বলেন, اِنَّ الْكَبِيْرَةَ كُلُّ ذَنْبٍ يَفْعَلُ الْاِنْسَانُ بِنَظْرِ التَّهَاوُنِ وَالْاِسْتِخْفَافِ

৮. اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْطُ গ্রন্থকারের মতে,

اَلْكَبِيْرَةُ هِيَ الْاِثْمُ الْكَبِيْرُ الْمَنْهِىُّ عَنْهُ مَثَلًا قَوْلُهُ تَعَالٰى اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ ـ

৯. হযরত আলী (রা.) বলেন, اِنَّ كُلَّ ذَنْبٍ خَتَمَهُ اللّٰهُ بِنَارٍ اَوْ غَضَبٍ اَوْ لَعْنَةٍ اَوْ عَذَابٍ فَهِيَ كَبِيْرَةٌ ـ

১০. ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে كُلُّ مَافِيْهِ وَعِيْدٌ شَدِيْدٌ بِنَصٍّ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ـ

১১. কাজি ইয়ায (র.) বলেন, اَلْكَبِيْرَةُ هِيَ كُلُّ مَانَهَى اللّٰهُ عَنْهُ صَرَاحَةً

تَعْدَادُ الْكَبَائِرِ কবীরাগুনাহের সংখ্যা : কবীরাহ গুনাহের সংখ্যা সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মাঝে ব্যাপক মতভেদ পরিলক্ষিত হয়।

১. হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর মতে কবীরা গুনাহ ৭টি। যথা–

(١) اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ (٢) قَتْلُ النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ (٣) قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ (٤) اَلْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ (٥) اَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ (٦) عُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ (٧) اَلْاِلْحَادُ فِي الْحَرَمِ ـ

২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। কবীরা গুনাহের সংখ্যা ৮টি। উপরোক্তগুলোর সাথে আরেকটি হল, رِبٰوا তথা সুদ।

৩. হযরত আলী (রা.)-এর মতে, কবীরা গুনাহের সংখ্যা ১০টি। উপরোক্ত ৮টির সাথে আরো ২টি হলো–

(٩) اَلسَّرِقَةُ (١٠) شُرْبُ الْخَمْرِ ـ

৪. কারো মতে এর সংখ্যা মোট ১৮টি। অবশিষ্ট ৮টি হলো–

(١١) اَلزِّنَا (١٢) اَللِّوَاطَةُ (١٣) اَلسِّحْرُ (١٤) شَهَادَةُ الزُّوْرِ (١٥) اَلْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ (١٦) اَلْغِيْبَةُ (١٧) قَطْعُ الطَّرِيْقِ (١٨) اَلْقِمَارُ ـ

৫. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে, كَبِيْرَةٌ গুনাহের সংখ্যা প্রায় সাতশত।

৬. কিছু সংখ্যক বলেন– প্রত্যেক পাপই তার নিম্নস্তরের হিসেবে كَبِيْرَةٌ এবং উচ্চস্তরের হিসেবে صَغِيْرَةٌ

وَقِيْلَ هُمَا اَمْرَانِ اِضَافِيَّانِ ـ فَكُلُّ ذَنْبٍ بِاِعْتِبَارِ مَا تَحْتَهُ كَبِيْرَةٌ وَبِاِعْتِبَارِ مَافَوْقَهُ صَغِيْرَةٌ ـ

سَبَبُ تَخْصِيْصِ الزِّنَا مَعَ حَلِيْلَةِ الْجَارِ প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করাকে নির্দিষ্ট করার কারণ : যিনা একটি জঘন্যতম অপরাধ। সর্বাবস্থায় উহা হারাম বা বর্জনীয় হওয়া সত্ত্বেও আলোচ্য হাদীসে প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনাকে বিশেষত উল্লেখ করার কারণ সম্পর্কে হাদীস বিশারদগণ থেকে নিম্নোক্ত উত্তর পাওয়া যায়—

যেহেতু প্রতিবেশী একজন অন্যজনের উপর নির্ভরশীল হয় তাই একজন আরেকজনের জন্য বিশ্বস্ত ও আমানতদার থাকা উচিত। সুতরাং এখানে ব্যভিচার করলে সে একদিকে বিশ্বাসঘাতক অন্যদিকে খেয়ানতকারী সাব্যস্ত হবে। তাই এটাকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। মূলত: যে কোনো নারীর সাথে ব্যভিচার করাই মহাপাপ, চাই সে নিজের পড়শির স্ত্রী-কন্যা হোক বা অপর কেউ হোক, বিবাহিতা হোক বা অবিবাহিতা, স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় সবই হারাম, সবই কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত।

اَقْسَامُ الْقَتْلِ وَحُكْمُهُ হত্যার প্রকারভেদ ও তার হুকুম :

قَتْل -এর প্রকারভেদ : قَتْل মোট পাঁচ প্রকার। যেমন–

১. **قَتْل عَمَد [ইচ্ছাকৃত হত্যা] :** কাউকে ধারালো অস্ত্রের মাধ্যমে ইচ্ছাকৃত হত্যা করা।

হুকুম : ক. হত্যার পরিবর্তে হত্যাই শাস্তি। কিন্তু মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ ক্ষমা করতে পারে।

খ. ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন, এ ক্ষেত্রে قِصَاصْ ওয়াজিব হবে; কাফ্ফারা নয়।

গ. ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, কাফ্ফারাও ওয়াজিব হবে।

২. **قَتْل شِبْه عَمَد [ইচ্ছাকৃত হত্যার সদৃশ হত্যা] :** কাউকে এমন বস্তু দ্বারা হত্যা করা, যাতে সাধারণত মানুষের মৃত্যু হয় না।

হুকুম : ক. কাফ্ফারা দিতে হবে, খ, হত্যার পরিবর্তে হত্যার প্রয়োজন নেই।

৩. قَتْلُ خَطَأً [অনিচ্ছাকৃত হত্যা] : যেমন– শিকারী দূর হতে জন্তু লক্ষ্য করে গুলি করল; কিন্তু গুলি লক্ষ্যচ্যুত হয়ে কোনো মানুষ মারা গেল।

হুকুম : ক. হত্যাকারী অপরাধী বলে বিবেচিত হবে। খ. শুধুমাত্র কাফ্ফারা দিতে হবে।

৪. قَتْلُ قَائِمٍ مَقَامَ خَطَأً **[ভুলের স্থলাভিষিক্ত হত্যা] :** যেমন কোনো ঘুমন্ত ব্যক্তি কোনো ছোট শিশুর উপর পতিত হওয়ায় শিশুটির মৃত্যু ঘটল।

হুকুম : ক. হত্যাকারী অপরাধী বলে বিবেচিত হবে না। খ. দিয়াত দিতে হবে।

৫. قَتْلُ سَبَبٍ [কারণিক হত্যা] : অপরের ভূমিতে কূপ খনন করায় তাতে পড়ে যদি কেউ মারা যায়।

হুকুম : ক. কূপখননকারী অপরাধী হিসেবে বিবেচিত হবে এবং কূপ খননকারীকে হত্যার দিয়াত দিতে হবে।

حَيَاةُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর জীবনী :

১. **নাম ও বংশ পরিচয় :** তাঁর নাম আব্দুল্লাহ। পিতার নাম– মাসউদ। কুনিয়াত– আবূ আবদির রহমান। মাতার নাম– উম্মু আবদ্। তাঁর বংশ ধারা:, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ইবনে গাফির ইবনে হাবীব।

২. **ইসলাম গ্রহণ :** তিনি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম। তিনি হলেন ষষ্ঠতম মুসলমান।

৩. **হিজরত :** কুরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি দু'বার আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। অবশ্য পরে স্থায়ীভাবে মদীনায় হিজরত করেন।

৪. **যুদ্ধে অংশগ্রহণ :** তিনি বদর যুদ্ধসহ বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এমনকি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের পর খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলেও তিনি বিভিন্ন যুদ্ধে সক্রিয়া ভূমিকা রাখেন।

৫. **হাদীস বর্ণনা :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) রাসূল ﷺ হতে ৮৪৮ টি হাদীস বর্ণনা করেন।

৬. **অন্যান্য গুণাবলি :** তিনি ছিলেন রাসূল ﷺ-এর একান্ত অনুসারী। রাসূল ﷺ-এর সফরের সাথী ও তাঁর صَاحِبُ السِّوَاكِ وَالنَّعْلِ وَالطُّهُوْرِ فِى السَّفَرِ রাসূল ﷺ তাঁকে বেহেশতের সু-সংবাদ দিয়েছিলেন। তিনি আরো বলেছেন– رَضِيْتُ لِأُمَّتِىْ مَا رَضِىَ لَهَا ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ وَسَخِطْتُ لَهَا مَا سَخِطَ لَهَا ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ (ابْنِ مَسْعُوْدٍ)

৭. **ইন্তেকাল :** তিনি হযরত ওসমান (রা.)-এর খেলাফতকালে মদীনা শরীফে ৩২ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছরেরও অধিক। হযরত ওসমান, যোবায়ের, আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.) তার জানাযার ইমামতি করেন এবং জান্নাতুল বাকীতে ওসমান ইবনে মাযউন (রা.)-এর কবরের পার্শ্বে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

وَعَنْ ٤٥ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْكَبَائِرُ اَلْإِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ . رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ . وَفِىْ رِوَايَةِ اَنَسٍ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ بَدَلَ الْيَمِيْنِ الْغَمُوْسِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৪৫. **অনুবাদ :** হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কবীরা গুনাহ হলো– আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা, পিতা-মাতার নাফরমানী করা, কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা হলফ করা। –[বুখারী] কিন্তু হযরত আনাস (রা.)-এর বর্ণনায় 'মিথ্যা শপথ এর পরিবর্তে, মিথ্যা সাক্ষ্য' শব্দটি রয়েছে। –[বুখারী-মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَعْنَى الشِّرْكِ وَاَقْسَامُهُ শিরকের অর্থ ও প্রকারভেদ :

مَعْنَى الشِّرْكِ لُغَةً : اَلشِّرْكُ শব্দটি বাবে ضَرَبَ-এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ হলো– جَعْلُ الشَّرِيْكِ فِى الْاَمْرِ অর্থাৎ কোনো কাজে অংশীদার সাব্যস্ত করা।

অথবা এর অর্থ হলো, جَعْلُ الْغَيْرِ مُسَاوِيًا لِلّٰهِ অর্থাৎ কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বানানো।

مَعْنَى الشِّرْكِ اِصْطِلَاحًا : শরিয়তের পরিভাষায় شِرْك -এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ :

১. اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْطُ গ্রন্থকারের মতে, اَلشِّرْكُ هُوَ الْاِعْتِقَادُ لِتَعَدُّدِ الْاِلٰهِ অর্থাৎ, অসংখ্য ইলাহের বিশ্বাস স্থাপন করা।

২. একদল ওলামার মতে, هُوَ اِشْرَاكُ شَيْئٍ بِاللّٰهِ اَوْ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ اللّٰهِ اَوْ بِفِعْلٍ مِنْ اَفْعَالِ اللّٰهِ

৩. অন্য একদলের মতে, اَلشِّرْكُ هُوَ الْاِشْرَاكُ بِشَيْئٍ بِاللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِصِفَاتِهٖ وَبِاَفْعَالِهٖ

اَقْسَامُ الشِّرْكِ : **প্রথমত:** তুলনা বা প্রয়োগের ভিত্তিতে শিরক তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা–

১. اَلشِّرْكُ بِالذَّاتِ – সরাসরি আল্লাহর সত্তার সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করা।

২. اَلشِّرْكُ بِالصِّفَاتِ – আল্লাহর গুণের সাথে শিরক করা। যেমন– কাউকে আইনদাতা, রিজিকদাতা ইত্যাদি বলে বিশ্বাস করা।

৩. اَلشِّرْكُ فِى الْعَمَلِ – কর্মের ক্ষেত্রে শিরক করা।

উল্লেখ্য, শিরকের মাঝে স্তরগত পার্থক্য থাকলেও মূলত সব শিরকই সমান, সবগুলোই হারাম। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ

দ্বিতীয়ত: ক্ষমা এবং পরিমাণগত দিক দিয়ে শিরক দু'প্রকার। যথা–

১. شِرْك اَكْبَر বা বড় শিরক ; যা তওবা ছাড়া মাফ হয় না। যেমন– কোনো কিছুকে আল্লাহর জাত বা সিফাতের সাথে শরিক করা।

২. شِرْك اَصْغَر বা ছোট শিরক ; যা তওবা ছাড়াও মাফ পাওয়া যায়। যেমন– আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা। যেমন, নবীজীর ﷺ বাণী– مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَقَدْ اَشْرَكَ ـ

اَقْسَامُ الْيَمِيْنِ وَاَحْكَامُهَا : কসম তিনভাগে বিভক্ত। যথা–

১. يَمِيْن لَغْو [ইয়ামীন লগব], ২. يَمِيْن مُنْعَقِدَة [ইয়ামীনে মুন'আকিদাহ], ৩. يَمِيْن غُمُوْس [ইয়ামীনে গুমূস]।

১. يَمِيْن لَغْو : এর স্বরূপ ও সংজ্ঞায় মত পার্থক্য রয়েছে।

ক. ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, কোনো অতীত বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞাতসারে সঠিক ধারণা করে শপথ করা, অথচ বিষয়টি মিথ্যা।

খ. ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, কোনোরূপ ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য ছাড়াই কথায় কথায় কসম করাই হচ্ছে يَمِيْن لَغْو বা বেহুদা কসম।

হুকুম : সর্বসম্মতিক্রমে এতে গুনাহ ও কাফফারা কিছুই নেই।

২. يَمِيْن مُنْعَقِدَة : ভবিষ্যতে কোনো কাজ করা বা না করার কসম করাকে يَمِيْن مُنْعَقِدَة বলে।

হুকুম : এরূপ শপথের বিপরীত করলে কসমকারীকে কাফফারা দিতে হবে।

৩. يَمِيْن غُمُوْس : কোনো অতীত বিষয়ে স্বেচ্ছায় মিথ্যা কসম করাকে يَمِيْن غُمُوْس বলে। এটা সব চাইতে গুরুতর অপরাধ।

হুকুম : ইমাম শাফেয়ী ও তাঁর অনুসারীদের মতে– গুনাহও হবে এবং কাফফারাও ওয়াজিব হবে।

অন্যান্য ইমামগণের মতে, কাফ্‌ফারা দিতে হবে না ; তবে গুনাহ হবে এবং তওবা করলে মাফ পাওয়া যাবে।

উল্লেখ্য, কোনো ভাল কাজ না করা বা ফরজ-ওয়াজিব না করার কসম করলে তা ভঙ্গ করা ওয়াজিব, কিন্তু পরে কাফফারা দিতে হবে।

يَمِيْن-এর **কাফফারা :** এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

فَكَفَّارَتُهٗ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ـ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ـ

অর্থাৎ শপথ ভঙ্গ করার কাফ্‌ফারা হচ্ছে, ১০ জন মিসকিনকে মধ্যম মানের খাদ্য খাওয়ানো, যা তোমাদের পরিজনকে খাইয়ে থাক ; অথবা তাদেরকে বস্ত্র দান করা কিংবা একটি ক্রীতদাস মুক্ত করে দেওয়া। আর যে ব্যক্তি এ তিনটির কোনো একটিও করার সামর্থ্য রাখে না, সে তিনদিন রোজা রাখবে। বস্তুত এটাই হচ্ছে তোমার কসমের কাফফারা, যখন তোমরা শপথ ভঙ্গ কর। –[মায়িদা-৮৯]

وَعَنْ ٤٦ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ اَلشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَكْلُ الرِّبٰوا وَاَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّىْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৬. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বস্তু হতে বিরত থাকবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! সে বস্তুগুলো কি কি ? রাসূল ﷺ বললেন, ১. আল্লাহর সাথে শিরক করা, ২. জাদু করা, ৩. যাকে হত্যা করা আল্লাহ তা'আলা হারাম ঘোষণা করেছেন ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করা, ৪. সুদ খাওয়া, ৫. এতিমের সম্পদ [অন্যায়ভাবে] ভক্ষণ করা, ৬. জিহাদের ময়দান হতে পলায়ন করা, ৭. ঈমানদার নির্দোষ সতী সাধ্বী নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেওয়া। –[বুখারী-মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَعْنَى السِّحْرِ وَحُكْمُهُ যাদুর অর্থ ও উহার হুকুম : اَلسِّحْرُ শব্দটি مَصْدَرٌ বা اِسْمِ مَصْدَرٍ একবচন। এর বহুবচন হলো سُحُوْرٌ বা اَسْحَارٌ শাব্দিক অর্থ হলো–

১. যাদু, যেমন হাদীসে এসেছে– اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا

২. গোপন করা, যেমন কুরআনে এসেছে– سَحَرُوْآ اَعْيُنَ النَّاسِ

৩. ধাঁ ধাঁ সৃষ্টিকরা,

৪. বিমোহিত করা।

পরিভাষায় এর পরিচয় হলো–

اَلسِّحْرُ هُوَ كُلُّ اَمْرٍ لَا يُدْرَكُ سَبَبُهٗ وَلَا يُعْرَفُ عَلٰى حَقِيْقَتِهٖ بَلْ يُحْمَلُ عَلٰى حَمْلِ الْخِدَاعِ ـ

অর্থাৎ, যাদু সেসব বিষয়কে বলে, যার ভিত্তি বুঝা যায় না এবং এর বাস্তবতা নিরূপণ করা যায় না ; বরং সম্পূর্ণটাই ধোকার উপর প্রতিষ্ঠিত।

২. কারো মতে, ভিত্তিহীন ও অবাস্তব বিষয় পরিবেশন করাকে سِحْر বলা হয়।

৩. ইমাম আবূ বকর জাসসাস (র.) বলেন, اَلسِّحْرُ এমন বিষয়, যার কারণ প্রছন্ন এবং যা অবান্তর, মিথ্যা, কল্পনা, বিভ্রান্ত ও ধোকার উপর প্রতিষ্ঠিত।

حُكْمُ السِّحْرِ যাদুকরের বিধান : যাদু বিদ্যার বৈধতার ব্যাপারে ইমামগণ বিবিধ মত দিয়েছেন। যথা–

১. ইমাম আহমদের মতে, ইহা বৈধ নয়। তিনি যাদুকরকে কাফির বলেন। ২. ইমাম মালিকের মতে, ইহা শিক্ষা দেওয়া ও শিক্ষা করা দু'টোই অবৈধ। ৩. ইমাম গাযালির মতে, প্রয়োজনে ইহা বৈধ ; আবার প্রয়োজনে ওয়াজিব। ৪. ইমাম আযম ও শাফেয়ী (র.)-এর মতে, ইহা হারাম। তবে আত্মরক্ষার্থে জায়েয। ৫. ফতহুল কাদীর গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, যাদু যদি পরীক্ষামূলক হয় এবং এর বৈধ হওয়ার বিশ্বাস না রাখে তবে যাদু কুফরি হবে না।

حُكْمُ السَّاحِرِ বা যাদুকরের বিধান : যাদুকরকে কাফের বলা যাবে কিনা ? এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন–

১. ফতহুল কাদীর গ্রন্থে বলা হয়েছে, যাদুকর যদি পরীক্ষামূলকভাবে তা প্রদর্শন করে এবং বৈধতার ব্যাপারে বিশ্বাস না রাখে, তাহলে তাকে কাফের বলা যাবে না।

২. তাফসীরে মাদারেকে উল্লেখ রয়েছে, যদি যাদুকরের কথা ও কাজে এমন বিষয় পাওয়া যায়, যা ঈমানের শর্তসমূহের বিরোধী, তাহলে তাকে কাফের বলা যাবে।

৩. ইমাম গাযালী (র.) বলেন, যাদু শিক্ষা করা অসত্যের মোকাবিলা করার জন্য বৈধ, আবার যাদু ব্যতীত কুফরি ও অসত্যের মোকাবিলার কোনো উপায় না থাকলে ওয়াজিব। এমতাবস্থায় যাদুকরকে কাফের বলা যাবে না।

৪. اَئِمَّةُ اَرْبَعَة -এর মতে, যাদু শিক্ষা করা নিষিদ্ধ। এ ক্ষেত্রে ইমাম মালেক (র.) বলেন, যাদুকরকে হত্যা করা ওয়াজিব।

اَلْفَرْقُ بَيْنَ الْمُعْجِزَةِ وَالْكَرَامَةِ وَالسِّحْرِ মু'জিযা, কারামত ও যাদুর মধ্যকার পার্থক্য :

মুজিযা, কারামত ও যাদুর পার্থক্য ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো :

اَلْمُعْجِزَةُ [মু'জিযা]	اَلْكَرَامَةُ [কারামত]	اَلسِّحْرُ [যাদু]
১. এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে- অপারগ করা, অক্ষম করা।	১. এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে- সম্মানিত হওয়া, মর্যাদার অধিকারী হওয়া।	১. এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে- ধোঁকা।
২. এর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে, নবী-রাসূলদের থেকে এমন অলৌকিক কার্যাবলি যা সাধারণ মানুষের পক্ষে উপস্থাপন অসম্ভব এবং যা নবুয়ত ও রিসালাতের প্রমাণ স্বরূপ।	২. এর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে- ওলীদের থেকে কোনো কাজ কৃত্রিম অভ্যাস বহির্ভূত প্রকাশ পেলে তাকে কারামত বলে।	২. এর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে- যা গোপনে ক্ষতিসাধন করে এবং অমৌল জিনিস দ্বারা প্রতারণা করে।
৩. এটা নবী-রাসূলদের সাথে সম্পৃক্ত।	৩. এটা আল্লাহর ওলীদের সাথে সম্পৃক্ত।	৩. যাদু যে কোনো লোকের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে।
৪. এটা আল্লাহর কাজ। এতে ব্যক্তির কোনো অধিকার নেই।	৪. এটাও আল্লাহর কাজ। ব্যক্তির কোনো অধিকার থাকে না।	৪. এতে ব্যক্তির পূর্ণ অধিকার থাকে।
৫. এটা কোনো নিয়ম-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।	৫. এটাও কোনো নিয়ম-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।	৫. এটা বিশেষ নিয়ম-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।
৬. এটা কারো নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করা যায় না।	৬. এটাও কারো নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করা যায় না।	৬. এটা কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করা যায়।
৭. এটা যে কোনো সময় প্রদর্শন করা যায় না।	৭. এটাও যে কোনো সময় প্রদর্শন করা যায় না।	৭. এটা যে কোনো সময় প্রদর্শন করা যায়।
৮. এটা নবুয়তের দাবিদার থেকে প্রকাশিত হতে পারে।	৮. কারামত প্রদর্শনকারী নবুয়তের দাবিদার হতে পারবে না।	৮. এটা যে কেউ থেকে প্রকাশ পায়।
৯. এটা সত্য।	৯. এটাও সত্য।	৯. এটা মিথ্যা।
১০. এটা প্রদর্শন বৈধ।	১০. এটাও বৈধ।	১০. এটা অবৈধ।

حُكْمُ التَّوَلِّيْ يَوْمَ الزَّحْفِ যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়ন করার হুকুম : যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়ন করা হারাম এবং কবীরা গুনাহ।.কেননা, এর দ্বারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সাথে গাদ্দারী করা হয়। তবে শরিয়তের পুরোধা ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, নিম্নোক্ত অবস্থায় যুদ্ধের ময়দান পরিত্যাগ করা জায়েয। যেমন–

১. শত্রুকে প্রবঞ্চনায় ফেলার উদ্দেশ্যে সাময়িকভাবে শত্রুর মোকাবিলা ত্যাগ করে তাদের অসতর্কতা ও দুর্বলতার অপেক্ষায় আত্মগোপন করে থাকা এবং সুযোগ বুঝে আক্রমণ করা। এটা বাহ্যিকভাবে পলায়ন মনে হলেও আসলে পলায়ন নয়।

২. যুদ্ধের উপকরণের স্বল্পতার দরুন ময়দান ত্যাগ করে নিজেদের দলের সাথে মিশে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি নিয়ে দ্বিতীয়বার আক্রমণ করা।

৩. শত্রু সংখ্যা মুসলমানদের চেয়ে তিন গুণ বা ততোধিক হলে জান বাঁচানোর জন্য পলায়ন করা জায়েয। কিন্তু আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, এ অবস্থায়ও পলায়ন করা হারাম। কেননা, শত্রু সংখ্যার স্বল্পতা ও আধিক্য যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের কারণ নয়।

৪. শত্রুদল যদি মুজাহিদদের বেষ্টন করে ফেলে এবং সহায়তা আসার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়, তখন পলায়ন করা জায়েয।

مَعْنَى الرِّبٰوا রিবার অর্থ :

■ مَعْنَى الرِّبٰوا لُغَةً : اَلرِّبٰوا শব্দটি مَصْدَرٌ-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে-اَلزِّيَادَةُ বা বৃদ্ধি হওয়া। এ অর্থে কুরআন শরীফে এসেছে- يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقَاتِ .-

■ مَعْنَى الرِّبٰوا شَرْعًا :

১. আল্লামা উবায়দুল্লাহ (র.) বলেন, اَلرِّبٰوا هُوَ زِيَادَةٌ فِى الْمُعَامَلَةِ بِلَا عِوَضٍ فِىْ جِنْسٍ وَاحِدٍ অর্থাৎ, একই জাতীয় জিনিসের মাঝে লেনদেনের ক্ষেত্রে কোনো বিনিময় ব্যতীত বাড়তি কিছু আদান-প্রদান করাকে الربوا বলে।

২. ইবনুল আছীর বলেন, اَلرِّبٰوا شَرْعًا اَلزِّيَادَةُ عَلٰى اَصْلِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ عَقْدِ تَبَايُعٍ

৩. আল্লামা আইনী (র.) বলেন,

اَلرِّبٰوا فَضْلُ مَالٍ بِلَا عِوَضٍ فِىْ مُعَاوَضَةِ مَالٍ بِمَالٍ . كَمَا اِذَا بَاعَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ بِاَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا

৪. আল-জাওহারাতুন নাইয়ারাহ গ্রন্থে এসেছে যে, هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدٍ فَاسِدٍ بِصِيْغَةٍ سَوَاءٌ كَانَ هُنَاكَ زِيَادَةٌ اَوْلَا

৫. اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْطُ গ্রন্থকারের মতে, اَلرِّبٰوا فِى الشَّرْعِ فَضْلٌ خَالٍ عَنْ عِوَضٍ شُرِطَ لِاَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ .

وَعَنْهُ ٤٧ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَزْنِى الزَّانِىْ حِيْنَ يَزْنِىْ وَهُوَمُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَمُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ اِلَيْهِ فِيْهَا اَبْصَارَهُمْ حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَغُلُّ اَحَدُكُمْ حِيْنَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاِيَّاكُمْ اِيَّاكُمْ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَفِىْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَا يَقْتُلُ حِيْنَ يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ عِكْرِمَةُ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ كَيْفَ يُنْزَعُ الْاِيْمَانُ مِنْهُ قَالَ هٰكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ ثُمَّ اَخْرَجَهَا قَالَ فَاِنْ تَابَ عَادَ اِلَيْهِ هٰكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ . وَقَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ لَايَكُوْنُ هٰذَا مُؤْمِنًا تَامًّا وَلَايَكُوْنُ لَهٗ نُوْرُ الْاِيْمَانِ . هٰذَا لَفْظُ الْبُخَارِىِّ .

৪৭. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— ব্যভিচারকারী ঈমান থাকা অবস্থায় ব্যভিচার করতে পারে না, চোর ঈমান থাকা অবস্থায় চুরি করতে পারে না, মদপানকারী ঈমান থাকা অবস্থায় মদ পান করতে পারে না, লুণ্ঠনকারী ঈমান থাকা অবস্থায় এমন লুণ্ঠন করতে পারে না যে, তার লুণ্ঠনের সময় লোকেরা তার দিকে তাকিয়ে থাকে। এমনিভাবে তোমাদের কেউ ঈমান থাকা অবস্থায় আত্মসাৎ করতে পারে না। সাবধান ! তোমরা এ সমস্ত অপকর্ম হতে বেঁচে থাকবে। –[বুখারী, মুসলিম]

আর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, তোমাদের কেউ ঈমানদার অবস্থায় হত্যা করতে পারে না। হযরত ইকরিমা (রা.) বলেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছি যে, কিভাবে তার থেকে ঈমানকে হরণ করা হয়? উত্তরে তিনি তার নিজের এক হাতের আঙ্গুলসমূহ অপর হাতের আঙ্গুলসমূহের মধ্যে প্রবিষ্ট করে, তারপর তা আবার বের করে বললেন যে, এভাবে। যদি সে তওবা করে তবে ঈমান যথাস্থানে এভাবে প্রত্যাবর্তন করবে। [এ বলে] তিনি তার আঙ্গুলসমূহকে পরস্পরের ফাঁকের মধ্যে প্রবেশ করালেন। ইমাম আবূ আবদুল্লাহ বুখারী (র.) বলেছেন যে, ঐ ব্যক্তি পূর্ণ ঈমানদার থাকবে না এবং তার ঈমানের আলো থাকবে না। এটা ইমাম বুখারী কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়াতের ভাষা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حُكْمُ مُرْتَكِبِ الْكَبِيْرَةِ **কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির হুকুম :** কবীরা গুনাহকারী মু'মিন থাকবে কি-না, এ বিষয়ে اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ও مُعْتَزِلَةَ এবং খারেজীদের মাঝে মতভেদ রয়েছে —

مَذْهَبُ الْمُعْتَزِلَةِ : মু'তাযেলাদের মতে কবীরা গুনাহ্ করলে তার ঈমানও থাকে না এবং সে কাফিরও হয় না ; বরং সে مُؤْمِنْ ও كَافِرْ -এর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে। একে তারা مَنْزِلَةٌ بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ বলে থাকে। তারা কুফর এবং ঈমানের মধ্যে একটি অবস্থা মেনে নেয়। তাদের দলিল হল উল্লিখিত হাদীস—

لَا يَزْنِي الزَّانِيْ حِيْنَ يَزْنِيْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ الخ ـ

مَذْهَبُ الْخَوَارِجِ : খারেজীদের মতে, কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি কাফির হয়ে যায়।

مَذْهَبُ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ : আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের মতে, কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি কাফির এবং ঈমান হতে বের হয়ে যায় না ; বরং সে ফাসিক মু'মিন হিসেবে পরিগণিত হয়।

دَلَائِلُهُمْ : তাঁদের দলিল হলো— قَوْلُهُ وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا ـ
উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে মু'মিন হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

اَلْجَوَابُ عَنِ الْمُخَالِفِيْنَ : আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অনুসারী আলিমগণ مُعْتَزِلَةَ সম্প্রদায়ের বর্ণিত হাদীসের কয়েকটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

১. এ জাতীয় হাদীসগুলোতে 'মূল ঈমানের' অস্বীকৃতি উদ্দেশ্য হয় না; বরং পরিপূর্ণতার অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়। যেমন– 'যার মধ্যে আমানতদারী নেই সে ঈমানদার নয়' ইত্যাদি।
২. হযরত হাসান বস্‌রী (র.) বলেন, 'ঈমানদার' হিসেবে যে সম্মানিত উপাধি ছিল, তা বহাল থাকে না; বরং তাকে বদ্‌কার, ব্যভিচারী, চোর, মদ্যপায়ী ইত্যাদি বলা হয়।
৩. ইমাম বুখারী (র.) বলেন, ঈমানের আলো বা জ্যোতি থাকে না। যেমন– 'তেলবিহীন প্রদীপ' অত্যন্ত ক্ষীণভাবে জ্বলে বটে, কিন্তু আলোও হয় না, অন্ধকারও দূর হয় না।
৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, ঈমান বের হয়ে ছায়ার মতো মাথার উপরে থাকে, সে অন্যায় কাজ সমাপ্তির পর পুনরায় ফিরে আসে। সুফিদেরও এই একই মত।
৫. ভবিষ্যতে ঈমান থাকবে না, অর্থাৎ এই পাপ করতে করতে অবশেষে একে হালাল বা বৈধ ধারণা করে বসবে, ফলে বেঈমান হয়ে যাবে।
৬. আল্লামা তীবী (র.) বলেন, এ সকল হাদীসে ঈমান দ্বারা উদ্দেশ্য লজ্জাশীলতা। যেমন– রাসূল ﷺ বলেছেন—
اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْاِيْمَانِ ـ
৭. অথবা, এ শ্রেণীর হাদীস দ্বারা কঠোরতা প্রদর্শন ও তিরস্কার করাই মূল উদ্দেশ্য, ঈমান না থাকা উদ্দেশ্য নয়।
৮. অথবা, এখানে ঈমান শব্দটি তার শাব্দিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ নিরাপত্তা লাভ। এমতাবস্থায় হাদীসটির অর্থ হবে– গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি নিরাপত্তা লাভ করতে পারবে না ; বরং সে শাস্তির উপযুক্ত হবে।
৯. অথবা, কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি তখনই কাফির হবে, যখন গুনাহ-কে বৈধ মনে করবে।
১০. অথবা, ঈমানের ন্যায় কুফরের উচ্চ, মাধ্যম ও নিম্ন তিনটি স্তর রয়েছে। বর্ণিত হাদীসে যে, ঈমান না থাকার কথা বলা হয়েছে, তার দ্বারা উদ্দেশ্য কুফরের মধ্যম বা নিম্নস্তর, যার দ্বারা কবীরাহ গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি ঈমান হতে বের হয়ে যায় না।
১১. অথবা, যে ব্যক্তি গুনাহ করল, সে কাফিরের ন্যায় কাজ করল। এটা দ্বারা কবীরা গুনাহে লিপ্ত কাফির হয়ে যাওয়া উদ্দেশ্য নয়।
১২. ইবনে হাযম বলেছেন, যদিও মূল ঈমান হলো আন্তরিক বিশ্বাসের নাম ; কিন্তু মৌখিক স্বীকৃতি এবং কাজও ঈমানের অঙ্গ। যে ব্যক্তি গুনাহের কাজ করল তার বিশ্বাস ও স্বীকৃতির মধ্যে কোনো ক্রটি হবে না, শুধু কাজের ক্ষেত্রেই ক্রটি হবে। সুতরাং মু'মিন না হওয়ার অর্থ অনুগত না হওয়া।

وَعَنْ ٤٨ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلٰثٌ زَادَ مُسْلِمٌ وَاِنْ صَامَ وَصَلّٰى وَ زَعَمَ اَنَّهُ مُسْلِمٌ ثُمَّ اتَّفَقَا اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ـ

৪৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— মুনাফিকের আলামত তিনটি। কিন্তু ইমাম মুসলিম এই বাক্যটি অতিরিক্ত করেছেন যে, যদিও সে ব্যক্তি নামাজ পড়ে, রোজা রাখে এবং এই দাবি করে যে, সে একজন মুসলমান। এরপর উভয়ে [ইমাম বুখারী ও মুসলিম] এ বর্ণনায় ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, ১. যখন সে কথা বলে তখন সে মিথ্যা বলে, ২. আর যখন সে অঙ্গীকার করে তখন তা ভঙ্গ করে ৩. এবং যখন তার নিকট কিছু গচ্ছিত রাখা হয়, তখন সে খেয়ানত [আত্মসাৎ] করে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : আলোচ্য হাদীসটিতে মহানবী ﷺ মুনফিকদের লক্ষণ ও পরিচয় বর্ণনা করেছেন, সাধারণত যার অন্তরে কুটিলতা রয়েছে তাকে মুনাফিক বলা হয়। আর পরিভাষায় মুনাফিক হলো— اَلَّذِىْ لَايُطَابِقُ ظَاهِرُهُ بَاطِنَهُ তথা যার ভিতরকার অবস্থা বাহ্যিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

অথবা, اَلَّذِىْ يَخْرُجُ عَنْ دَائِرَةِ الْاِيْمَانِ فَهُوَ مُنَافِقٌ, বস্তুত মনের ভাবধারা ও বাহ্যিক কাজকর্ম একরূপ না হওয়াই হলো মুনাফিকী। এরা নিজেদেরকে ঈমানদার হিসেবে পরিচয় দিলেও প্রকৃতপক্ষে তারা ঈমানদার নয়, আলোচ্য হাদীসে তাদের চিহ্নিতকরণের নিদর্শন বলে দেওয়া হয়েছে। তাই মুনাফিক কারা তা নির্ণয় করা কষ্টকর নয়। সুতরাং যাদের মধ্যে এসব স্বভাবগুলো রয়েছে তাদের এসব সম্পূর্ণরূপে পরিহার করাই একান্ত আবশ্যক।

سَبَبُ اِرْشَادِ الْحَدِيْثِ **হাদীসের পটভূমি** : উক্ত হাদীসটির বর্ণনার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আল্লামা সারওয়ারী (র.) বলেন, হাদীসটি একজন নির্দিষ্ট মুনাফিককে লক্ষ্য করে রাসূল ﷺ বর্ণনা করেছেন। মহানবী ﷺ-এর নীতি ছিল যে, তিনি কোনো অন্যায়কারীকে সরাসরি একথা বলতেন না যে, তোমার মধ্যে অমুক দোষ আছে ; বরং তিনি বলতেন যার মধ্যে এ সকল ত্রুটি রয়েছে তার অবস্থা এরূপ হবে। এভাবে তাকে কৌশলে সতর্ক করা হতো। রাসূলে কারীম ﷺ এখানে মুনাফিকদের নিদর্শন বর্ণনা করে সে নির্দিষ্ট মুনাফিককে সতর্ক করে দিয়েছেন।

اَلْمُرَادُ بِالْمُنَافِقِ فِى الْحَدِيْثِ الْمَذْكُوْرِ **আলোচ্য হাদীসে মুনাফিক দ্বারা উদ্দেশ্য** : উক্ত হাদীসে মুনাফিক দ্বারা কাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে এই বিষয়ে ওলামাদের মাঝে মতান্তর রয়েছে। যেমন–

১. ইমাম সুফয়ান সাওরী বলেন, হাদীসটি একজন নির্দিষ্ট মুনাফিককে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে। হযরত ﷺ মুনাফিকদের নিদর্শন বর্ণনা করে সে নির্দিষ্ট মুনাফিককে সতর্ক করে দিলেন।

২. ইমাম খাত্তাবী (র.) বলেন, নির্দিষ্ট কোনো মুনাফিককে বুঝানো হয়নি ; বরং এটি মুসলমানদেরকে নেফাক থেকে বাঁচানোর জন্য সতর্ক করা হয়েছে।

৩. ইমাম নববী (র.) বলেন, হাদীসে রূপক অর্থে মুনাফিক বুঝানো হয়েছে, প্রকৃত অর্থে নয়।

৪. অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে, এখানে مُنَافِقٌ দ্বারা مُنَافِقٌ فِى الْعَمَلِ-কে বুঝানো হয়েছে مُنَافِقٌ فِى الْعَقِيْدَةِ -কে বুঝানো হয়নি।

৫. অথবা, এখানে اِذَا টি সার্বক্ষণিক তার অর্থ দান করবে, তথা উল্লিখিত নিদর্শনসমূহ যার মধ্যে সার্বক্ষণিক পাওয়া যাবে সেই মুনাফিক।

وَعَنْ ٤٩ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا اِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৯. **অনুবাদ :** হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— যার মধ্যে চারটি স্বভাব থাকো সে প্রকৃত মুনাফিক হিসেবে পরিগণিত হয়। আর যার মধ্যে এর একটি স্বভাব থাকে; তার মধ্যে মুনাফিকীর একটি স্বভাব বিদ্যমান, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তা পরিহার করে। [সে চারটি স্বভাব হলো] ১. যখন তার নিকট আমানত রাখা হয় তখন সে তা খেয়ানত করে, ২. যখন সে কথা বলে তখন মিথ্যা বলে, ৩. যখন ওয়াদা করে পরে তা ভঙ্গ করে ৪. এবং যখন কারও সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয় তখন সে মন্দ বলে। −[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

نِفَاقٌ -এর অর্থ : نِفَاقٌ শব্দটি বাবে مُفَاعَلَة -এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ হলো− اِظْهَارُ خِلَافِ مَا يُبْطِنُ অর্থাৎ অন্তরে যা রয়েছে তার বিপরীত প্রকাশ করা।

نفاق -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : مَعْنَى النِّفَاقِ اِصْطِلَاحًا—

১. اَلنِّفَاقُ هُوَ اَنْ يُظْهِرَ الْاِسْلَامَ وَيُبْطِنَ الْكُفْرَ অর্থাৎ নিফাক হচ্ছে− কুফর গোপন রাখা এবং ইসলাম প্রকাশ করা।

২. اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْطُ গ্রন্থকারের মতে— اَلنِّفَاقُ هُوَ اَنْ يَدْخُلَ فِى الْاِسْلَامِ مِنْ وَجْهٍ وَيَخْرُجَ عَنْهُ مِنْ وَجْهٍ اٰخَرَ

৩. কারো মতে— هُوَ اَنْ يُظْهِرَ الْعَدَاوَةَ وَيُظْهِرَ الصَّدَاقَةَ

৪. ইমাম তীবী (র.) বলেন— هُوَ اَنْ تُظْهِرَ لِصَاحِبِكَ خِلَافَ مَا تُضْمِرُهُ .

اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْحَدِيْثَيْنِ দু'টি হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস হতে বুঝা যায় যে, মুনাফিকদের তিনটি লক্ষণ রয়েছে। অর্থাৎ মাল আমানত রাখলে আত্মসাৎ করে, কথা বললে মিথ্যা বলে এবং প্রতিশ্রুতি দিলে ভঙ্গ করে। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, মুনাফিকদের চারটি লক্ষণ রয়েছে। অর্থাৎ যার মধ্যে চারটি স্বভাব পাওয়া যাবে, সে নির্ভেজাল মুনাফিক। (উক্ত তিনটির সাথে চতুর্থ স্বভাব হলো− ঝগড়া বাধলে অশ্লীল বাক্য ব্যবহার করে।) বাহ্যিক দৃষ্টিতে উভয় হাদীসের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। উভয়ের সমাধানের লক্ষ্যে ওলামায়ে কেরাম নিম্নোক্ত মতামত পেশ করেছেন−

১. প্রথম হাদীসে মুনাফিকের আলামত তিনটি এবং দ্বিতীয় হাদীসে চারটি বলা হয়েছে। সুতরাং বেশি সংখ্যা কম সংখ্যার পরিপূরক। অতএব দুই হাদীসের মধ্যে অর্থগত কোনো বিরোধ নেই।

২. অথবা, মুনাফিকের আলামত বর্ণনা দিতে গিয়ে রাসূল ﷺ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম বলেছেন। কাজেই যিনি যে রকম শুনেছেন; তিনি সে রকম বর্ণনা করে দিয়েছেন।

৩. অথবা, সংখ্যা বর্ণনায় কম-বেশির বিভিন্নতা কোনো অসুবিধা জনক নয়। কারণ, কম সংখ্যা বেশি সংখ্যার মাঝেই শামিল রয়েছে।

৪. অথবা, হাদীসে উল্লিখিত সংখ্যা বর্ণনা উদ্দেশ্য নয় ; বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কথা বুঝানো যে, মুনাফিকের আলামত অনেক। তন্মধ্যে উল্লিখিত ৩/৪টি প্রসিদ্ধ।

৫. হয়তো বা বর্ণনাকারীদের শোনার মধ্যে ভুল হয়েছে, তাই দু'রকম বর্ণনা এসেছে।

৬. অথবা, প্রথম হাদীসটি পূর্বের যাতে তিনটির কথা এসেছে। আর দ্বিতীয় হাদীসটি পরের যাতে চারটি কথা এসেছে। সুতরাং কোনো বৈপরীত্য নেই।

৭. অথবা, রাসূল ﷺ ৪টির কথাই বলেছিলেন, তবে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) দূরত্বের কারণে ৩টির কথা শুনতে পেয়েছেন, তাই তিনি তিনটি বর্ণনা করেছেন।

وَعَنْ ٥٠ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَالشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ تَعِيْرُ اِلٰى هٰذِهٖ مَرَّةً وَاِلٰى هٰذِهٖ مَرَّةً ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫০. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন— মুনাফিকের উদাহরণ হলো বানডাকা ছাগীর ন্যায়, যে দু'টি ছাগলের মধ্যে থাকে, একবার একটির দিকে দৌড়ায় এবং আরেকবার অন্যটির দিকে ছুটে যায়। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلشَّاةُ الْعَائِرَةُ -এর অর্থ : উক্ত হাদীসে মহানবী ﷺ মুনাফিকদিগকে اَلشَّاةُ الْعَائِرَةُ -এর সাথে তুলনা করেছেন। اَلشَّاةُ الْعَائِرَةُ বলা হয় এমন ছাগী বা ভেড়াকে, যে যৌন কামাসক্ত হয়ে ডাকাডাকি ও ছুটাছুটি করতে থাকে। এরূপ পশু সাধারণত অস্থিরচিত্ত হয়ে পড়ে। সে একবার এ ছাগলের নিকট, আরেকবার অন্য ছাগলের কাছে ছুটে বেড়ায়। তার মধ্যে কোনোরূপ স্থিরতা লক্ষ্য করা যায় না। ধর্ম বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মুনাফিকগণ অনুরূপ বানডাকা ছাগীর ন্যায়। তারা কখনো নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবে পরিচয় দেয়। আবার কখনো মুশরিকদের দলে ভিড়ে যায়। মহান আল্লাহ কুরআনে হাকীমে তাদের এরূপ স্বভাবের কথা প্রকাশ করে দিয়ে বলেন— وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ মহান আল্লাহ আরো বলেন— مُذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ لَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ وَلَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ অর্থাৎ তারা মধ্যস্থলে রয়েছে। তারা না এ দলে; না ঐ দলে।

এসব মুনাফিকগণ সুযোগ সন্ধানী হিসেবে পরিচিত। দুনিয়াতে কিছুটা লাভবান হলেও পরকালে তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে নিকৃষ্টতম শাস্তি। এই বিষয়ে আল্লাহ বলেন— اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

وَعَنْ ٥١ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ (رضـ) قَالَ قَالَ يَهُوْدِيٌّ لِصَاحِبِهِ اِذْهَبْ بِنَا اِلٰى هٰذَا النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ لَا تَقُلْ نَبِيٌّ اِنَّهُ لَوْ سَمِعَكَ لَكَانَ لَهُ اَرْبَعُ اَعْيُنٍ فَاَتَيَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلَاهُ عَنْ اٰيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّلَا تَسْرِقُوْا وَلَا تَزْنُوْا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَمْشُوْا بِبَرِيْءٍ اِلٰى ذِىْ سُلْطَانٍ لِيَقْتُلَهُ وَلَا تَسْحَرُوْا وَلَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوا وَلَا تَقْذِفُوْا مُحْصَنَةً وَلَا تَوَلَّوْا لِلْفِرَارِ يَوْمَ الزَّحْفِ وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةً اَلْيَهُوْدَ اَنْ لَّا تَعْتَدُوْا فِى السَّبْتِ . قَالَ فَقَبَّلَا يَدَيْهِ وَ رِجْلَيْهِ وَقَالَا نَشْهَدُ اَنَّكَ نَبِيٌّ قَالَ فَمَا يَمْنَعُكُمْ اَنْ تَتَّبِعُوْنِىْ قَالَا اِنَّ دَاؤُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَعَا رَبَّهُ اَنْ لَّا يَزَالَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ نَبِيٌّ وَاِنَّا نَخَافُ اِنْ تَبِعْنَاكَ اَنْ يَقْتُلَنَا الْيَهُوْدُ . رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْدَاؤُدَ وَالنَّسَائِىُّ .

৫১. **অনুবাদ :** হযরত সাফওয়ান ইবনে আস্‌সাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা একজন ইহুদি তার সাথীকে বলল, আমাকে এই নবীর নিকট নিয়ে চলো, তার সাথী তাকে বলল, নবী বলো না। কেননা, সে এরূপ শুনতে পেলে তার চারটি চক্ষু হয়ে যাবে। [অর্থাৎ তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবেন।] অতঃপর তারা উভয়েই রাসূল ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলো এবং তাঁকে [হযরত মূসা (আ.)-এর] সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করল, জবাবে রাসূল ﷺ বললেন, ১. আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করো না, ২. চুরি করো না, ৩. ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ো না, ৪. ন্যায়সঙ্গত কারণ ব্যতীত কাউকে হত্যা করো না; যা আল্লাহ তা'আলা হারাম করে দিয়েছেন, ৫. কোনো নির্দোষ ব্যক্তিকে হত্যার উদ্দেশ্যে কোনো ক্ষমতাশালী লোকের নিকট নিয়ে যেয়ো না, ৬. যাদু করো না, ৭. সুদী লেন-দেন করো না, ৮. কোনো পুণ্যবতী নারীর ব্যাপারে ব্যভিচারের অপবাদ দিও না, ৯. যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়নের উদ্দেশ্যে পশ্চাদপদ হয় না এবং ১০. বিশেষ করে তোমরা ইহুদিরা শনিবারের বিধান লঙ্ঘন করো না।

হযরত সাফওয়ান (রা.) বলেন, অতঃপর তারা উভয়েই মহানবী ﷺ-এর হস্ত ও পদদ্বয় চুম্বন করল এবং বলল, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি– নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর নবী। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাহলে আমাকে অনুসরণের ব্যাপারে তোমাদেরকে কিসে বাধা দিচ্ছে ? তারা বলল, হযরত দাঊদ (আ.) আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছিলেন যে, নবী যেন তাঁর বংশধরগণের মধ্য হতেই মনোনীত হয়। আর আমরা ভয় করি যে, আমরা যদি আপনাকে অনুসরণ করি তবে ইহুদিরা আমাদেরকে হত্যা করবে।

–[তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

بَيَان اٰيَات بَيِّنَات সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহের বর্ণনা : আলোচ্য হাদীসে ইহুদিদ্বয় কর্তৃক জিজ্ঞাসিত اٰيَات بَيِّنَات দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সেসব মুজিযাসমূহ যা হযরত মূসা (আ.)-কে দেওয়া হয়েছিল, পবিত্র কুরআনের সূরা আরাফে উল্লেখ রয়েছে। আর সেই নয়টি মু'জিযা হলো– ১. অলৌকিক লাঠি, ২. হস্তদ্বয় উজ্জ্বল বা শুভ্র হওয়া, ৩. বন্যা-প্লাবন, ৪. পঙ্গপালের উপদ্রব, ৫. ব্যাঙের উপদ্রব, ৬. পানি রক্ত হয়ে যাওয়া, ৭. উকুনের উপদ্রব এবং ৯. শস্যহানি।

سُئِلَ عَنِ الْاٰيَاتِ الْبَيِّنَاتِ وَاُجِيْبَ عَنْ اَحْكَامِهَا فَمَا الْحِكْمَةُ فِيْهِ **প্রশ্ন করা হয়েছে প্রকাশ্য নিদর্শন সম্পর্কে, আর উত্তর দেওয়া হয়েছে আহকাম সম্পর্কে, এর হিকমত কি :** ইহুদিদ্বয় নবী করীম ﷺ-কে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়ে হযরত মূসা (আ.)-কে দেওয়া নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন সম্পর্কে প্রশ্ন করল। কেননা, যদি তিনি সত্য নবী হন তাহলে বলতে পারবেন, অন্যথা বলতে পারবেন না। কিন্তু নবী করীম ﷺ তা বর্ণনা না করে নতুন বিধান বর্ণনা করলেন, ফলে প্রশ্ন ও জবাবের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য থাকল না। এর সমাধান নিম্নে প্রদত্ত হলো—

১. হযরত মূসা (আ.)-এর উক্ত উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত রয়েছে। এই জন্য মহানবী ﷺ তার উল্লেখ করেননি; বরং নতুন বিধান সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।
২. অথবা নবী করীম ﷺ উক্ত নিদর্শন বর্ণনা করার পর নতুন বিধান সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। হাদীস বর্ণনাকারী সংক্ষিপ্তকরণের লক্ষ্যে ঐ নিদর্শনসমূহ বাদ দিয়েছেন।
৩. অথবা, ايات بينات দ্বারা এই নতুন বিধানসমূহ উদ্দেশ্য, যা এখানে উল্লিখিত হয়েছে। আর নবী করীম ﷺ-কে ইহুদিরা এই বিধান সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল।

وَعَنْ ٥٢ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلٰثٌ مِنْ اَصْلِ الْاِيْمَانِ اَلْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَا تُكَفِّرْهُ بِذَنْبٍ وَلَا تُخْرِجْهُ مِنَ الْاِسْلَامِ بِعَمَلٍ وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِىَ اللّٰهُ اِلٰى اَنْ يُقَاتِلَ اٰخِرُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ الدَّجَّالَ لَا يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ وَالْاِيْمَانُ بِالْاَقْدَارِ . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ .

৫২. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, ঈমানের তিনটি বুনিয়াদী বা মূল বিষয় রয়েছে, ১. যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে তার উপর আক্রমণ করা হতে বিরত থাকা। কোনো পাপের কারণে তাকে কাফির বলে গণ্য করো না এবং কোনো কর্মের দরুন ইসলাম হতে খারিজ করে দিও না। ২. মহান আল্লাহ যখন আমাকে নবীরূপে প্রেরণ করেছেন তখন হতে জিহাদ আরম্ভ হয়েছে, আর এ উম্মতের শেষ লোকেরা দাজ্জালের সাথে লড়াই করা পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে। কোনো অত্যাচারী শাসকের অত্যাচার এবং কোনো ন্যায়পরায়ণ শাসকের ন্যায় একে বাতিল করতে পারবে না। ৩. আর তাকদীরের [ভালো মন্দের উপর] বিশ্বাস স্থাপন করা। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْحَدِيْثَيْنِ **দু'টি হাদীসের মধ্যে অর্থগত বিরোধ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, কবীরা গুনাহের কারণে কাউকে কাফির বলা যায় না, অথচ অন্য হাদীসে এসেছে যে, مَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ তথা যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত নামাজ ছেড়ে দেয় সে কুফরি করে। আর নামাজ ছেড়ে দেওয়া কবীরা গুনাহ। অতএব উভয়ের মধ্যে স্পষ্ট অর্থগত পরিলক্ষিত হয়।

সমাধান :

১. ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে, ইচ্ছাকৃত ফরজ বর্জনকারী প্রকৃতই কাফির হয়ে যাবে।
২. কারো মতে, উক্ত হাদীসে ধমক, ভর্ৎসনা এবং কঠোরতার জন্য কুফরির বিধান দেওয়া হয়েছে।

৩. অথবা, সে ব্যক্তি কুফরির সীমায় উপনীত হয়েছে।

৪. অথবা, এর অর্থ হলো সে কাফিরের মতো কর্ম করেছে।

৫. কিংবা এরূপ কাজে কুফরির ভয় আছে।

৬. অথবা, কুফরির আভিধানিক অর্থ– অকৃতজ্ঞা। এখানে এই অর্থই নেওয়া হয়েছে।

৭. অথবা, এরূপ করার পরিণাম কুফরি ; যদিও কোনো বাধার কারণে কাফির বলা হয় না।

৮. অথবা, সে যদি ফরজকে অস্বীকার করে পরিত্যাগ করে, তাহলে কাফির হয়ে যাবে। অতএব উভয়ের মাঝে আর অর্থগত কোনো বিরোধ নেই।

وَعَنْ ٥٣ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا زَنَى الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيْمَانُ فَكَانَ فَوْقَ رَأْسِهِ كَالظُّلَّةِ فَإِذَا خَرَجَ مِنْ ذٰلِكَ الْعَمَلِ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيْمَانُ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

৫৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— যখন কোনো বান্দা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তখন তার মধ্য হতে ঈমান বের হয়ে যায় এবং তা ছায়ার মতো তার মাথার উপর অবস্থান করে। অতঃপর যখন সে এই অপকর্ম হতে বিরত হয়, তখন তার দিকে ঈমান ফিরে আসে। –[তিরমিযী, আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

خَرَجَ مِنْهُ الْإِيْمَانُ -এর মর্মার্থ : আলোচ্য হাদীসটিতে মহানবী ﷺ বলেছেন যে, বান্দা যখন কোনো ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তখন তার মধ্য হতে ঈমান বের হয়ে যায়। এ বাক্যটির কয়েকটি অর্থ হতে পারে–

১. ঈমান বের হওয়া অর্থ ঈমানের আলো বা জ্যোতি বের হয়, মূল ঈমান নয়।

২. অথবা, ঈমানের অন্যতম শাখা তথা লজ্জাশীলতা বের হয়ে যায়।

৩. অথবা, এর দ্বারা ধমক বা ভীতি প্রদর্শন উদ্দেশ্য।

৪. কিংবা এটা দ্বারা যেনাকারীর কঠিন শাস্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৫. অথবা, এর অর্থ হলো, সে যেন ঐ ব্যক্তির ন্যায় হয়ে গেছে; যার ঈমান নেই। কেননা, তার ঈমান তাকে এই বেহায়াপনা কাজ হতে ফিরাতে পারেনি; যেভাবে ঈমানহীন ব্যক্তিকে তা হতে ফিরানো যায় না।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

وَعَنْ ٥٤ مُعَاذٍ (رضـ) قَالَ اَوْصَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ قَالَ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَاِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَاِنْ اَمَرَاكَ اَنْ تَخْرُجَ مِنْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلٰوةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا فَاِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلٰوةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللّٰهِ وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَاِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ وَاِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَاِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللّٰهِ وَاِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَاِنْ هَلَكَ النَّاسُ وَاِذَا اَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَاَنْتَ فِيْهِمْ فَاثْبُتْ وَاَنْفِقْ عَلٰى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ اَدَبًا وَاَخِفْهُمْ فِى اللّٰهِ ـ رَوَاهُ اَحْمَدُ ـ

৫৪. অনুবাদ : হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ আমাকে দশটি বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন– ১. আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করো না, যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় কিংবা আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ২. তোমার পিতামাতার অবাধ্য হয়ো না, যদিও তাঁরা তোমাকে পরিবার-পরিজন এবং ধন-সম্পদ ত্যাগ করে চলে যেতে আদেশ করেন। ৩. ইচ্ছাকৃতভাবে কখনো ফরজ নামাজ ত্যাগ করো না। কেননা, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ফরজ নামাজ ত্যাগ করে, তার থেকে আল্লাহ তা'আলার জিম্মা উঠে যায়। ৪. কখনো মদ পান করো না। কেননা, মদ হলো সকল অশ্লীলতার মূল উৎস। ৫. সাবধান ! সর্বদা পাপ কর্ম হতে দূরে থাক। কেননা, পাপের দরুন আল্লাহ তা'আলার ক্রোধের উদ্রেক হয়। ৬. সাবধান! যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করো না ; যদিও সকল লোক ধ্বংস হয়ে যায়। ৭. তোমার উপস্থিতিতে যখন লোকদের মাঝে মহামারী দেখা দেয়, তখন সেখানে অবস্থান করো। ৮. তোমার সামর্থ্য অনুযায়ী পরিবার- পরিজনের জন্য ব্যয় করো। ৯. শিষ্টাচার শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে তাদের শাসন থেকে বিরত থেকো না। ১০. আর আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে তাদেরকে ভয় দেখাও।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَاَخِفْهُمْ فِى اللّٰهِ-এর অর্থ : মহানবী ﷺ-এর বাণী— وَاَخِفْهُمْ فِى اللّٰهِ অর্থাৎ, তাদেরকে আল্লাহ্ সম্পর্কে ভয় দেখাও। এখানে রাসূল ﷺ হযরত মু'আয (রা.)-কে তাঁর পরিবার-পরিজন এর প্রতি আল্লাহ্ সম্পর্কে ভয় প্রদর্শনের উপদেশ দিয়েছেন। মূলত এ আদেশটি সকলের জন্যই প্রযোজ্য। কেননা, আল-কুরআনের ঘোষণা– قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا অর্থাৎ, তোমরা নিজেরা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকেও বাঁচাও। এ দায়িত্ব পালন করা সকল মু'মিনের উপর ফরজ। হাদীসে এসেছে– كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ এ হিসেবে একজন স্বামীকে তার স্ত্রীসহ পরিবার-পরিজনদের যাবতীয় ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে।

এ পৃথিবী নশ্বর, আর পরকালীন জীবন অনন্ত। তাই অনন্ত জীবনে সফলতা অর্জনের লক্ষ্যে অবশ্যই খোদাভীতি অর্জন করতে হবে। সেই সাথে পরিবার-পরিজনকেও সে ব্যাপারে সতর্ক করতে হবে এবং খোদাভীরু হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

حَيَاةُ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.)-এর জীবনী :

১. **নাম ও বংশ পরিচয় :** তাঁর নাম মু'আয, উপনাম আবূ আবদুল্লাহ অথবা আবূ আব্দুর রহমান। পিতার নাম জাবাল ইবনে আমর। তিনি মদীনার খাযরাজ বংশে জন্মলাভ করেন।

২. **ইসলাম গ্রহণ :** নবুয়তের দ্বাদশ সালে ১৮ বছর বয়সে মদীনায় ইসলাম প্রচারের সূচনাকালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

৩. **গুণাবলি :** তিনি একজন বদরী সাহাবী ছিলেন। বায়আতে আক্বাবায়ে ছানিয়ায় তাঁকে লক্ষ্য করে রাসূল ﷺ বলেছিলেন, نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ অর্থাৎ মু'আয কতই না উত্তম পুরুষ।

৪. **রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন :** মক্কা বিজয়ের পর রাসূল ﷺ তাঁকে ইয়ামানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। পরবর্তীতে হযরত ওমর (রা.) তাঁকে আবূ উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ-এর পরে শাম দেশের শানসকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন।

৫. **রেওয়ায়েতে হাদীস :** হযরত মু'আয (রা.) হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে তৃতীয় স্তরের সাহাবী ছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৭৫। তাঁর থেকে হযরত ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) সহ অনেকে হাদীস বর্ণনা করেন।

৬. **ইন্তেকাল :** এ প্রখ্যাত সাহাবী ১৮ হিজরিতে হযরত ওমরের খিলাফত কালে ৩৮ বছর বয়সে طَاعُوْن عَمْوَاس নামক মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন।

وَعَنْ ٥٥ حُذَيْفَةَ (رض) قَالَ اِنَّمَا النِّفَاقُ كَانَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَّا الْيَوْمَ فَاِنَّمَا هُوَ الْكُفْرُ اَوِ الْاِيْمَانُ ـ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ـ

৫৫. **অনুবাদ :** হযরত হুযায়ফা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিফাক শুধু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জমানায় ছিল। বর্তমানকালে হয় কুফর না হয় ঈমান রয়েছে। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস দ্বারা এ কথা সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, শুধু রাসূলের যুগেই মুনাফিক ছিল। ইসলামি হুকুমতের সুযোগ-সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যেই মহানবী ﷺ-এর মাদানীযুগে কিছু সংখ্যক লোক এরূপ আচরণ করত। তাদের মুখোশ উন্মোচন করে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ ـ

এতে বুঝা যায় যে, সে যুগে মানুষ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল– মু'মিন, কাফির ও মুনাফিক। কিন্তু বর্তমান যুগে আর তিন শ্রেণীতে বিভক্ত নয়; বরং দুই শ্রেণীতে বিভক্ত– হয় মুসলমান না হয় কাফির। এর ব্যতিক্রম হতে পারে না। যারা প্রকৃত মুনাফিক তারা কাফিরদের মধ্যে শামিল।

بَابُ الْوَسْوَسَةِ

পরিচ্ছেদ : মনের খট্‌কা

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

وَعَنْ ٥٦ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ عَنْ اُمَّتِىْ مَا وَسْوَسَتْ بِهٖ صَدْرُهَا مَالَمْ تَعْمَلْ بِهٖ اَوْ تَتَكَلَّمْ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

৫৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— আমার উম্মতের অন্তরের মধ্যে যে খটকা সৃষ্টি হয়, আল্লাহ তা'আলা তা ক্ষমা করে দেন; যে পর্যন্ত না তারা তা কার্যে পরিণত করে অথবা মুখে প্রকাশ করে। –[বুখারী মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْحَدِيْثِ وَالْاٰيَةِ হাদীস ও কুরআনের আয়াতের মধ্যে বাহ্যিক অর্থগত বিরোধ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীসদ্বয় দ্বারা বুঝা যায়, মনের সৃষ্ট কুধারণা ও কুমন্ত্রণার জন্য কোনো গুনাহ হয় না। অথচ পবিত্র কুরআনে এসেছে- وَاِنْ تُبْدُوْا مَافِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ . অর্থাৎ "তোমরা তোমাদের মনের কথা প্রকাশ করো আর নাই করো, আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের নিকট হতে সে সম্পর্কে হিসাব গ্রহণ করবেন।" এতে দেখা যায়, মনের কুধারণার জন্যও পাকড়াও করা হবে। সুতরাং হাদীস ও আয়াতের মধ্যে বাহ্যিক দৃষ্টিতে অর্থগত বিরোধ রয়েছে বলে মনে হয়। এর সমাধানে মুহাদ্দিসগণ বলেন—

১. হাদীসে বর্ণিত কুধারণা দ্বারা ঐ কুধারণা বুঝানো হয়েছে— যা সময় সময় মু'মিনের অন্তরে সৃষ্টি হয়ে থাকে, তবে মু'মিন তা বাস্তবায়নের ইচ্ছা করেনি। আর আয়াতে বর্ণিত কুমন্ত্রণা দ্বারা মনের দৃঢ় ইচ্ছা বুঝানো হয়েছে, যা বাস্তবায়নের জন্য সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সুতরাং দু'টি কুমন্ত্রণা ভিন্ন।

২. আর যদি বলা হয়, আয়াতে বর্ণিত কুমন্ত্রণা দ্বারা মু'মিন-মুনাফিক সবার কুমন্ত্রণা বুঝানো হয়েছে। তখন এর উত্তরে বলা যায়, পরবর্তী সময়ে বর্ণিত আয়াত— لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا দ্বারা এর হুকুম রহিত হয়ে গেছে। কারণ শয়তানের সৃষ্ট কুমন্ত্রণার উপর মানুষের হাত নেই। শেষোক্ত আয়াতে আল্লাহ যে কাউকে এখতিয়ার বহির্ভূত বিষয়ে বাধ্য করেন না, তা স্পষ্ট বলেছেন। অতএব আয়াত ও হাদীসের মধ্যে অর্থগত কোনো বিরোধ রইল না।

وَسْوَسَة -এর অর্থ ও প্রকারভেদ : اَلْوَسْوَسَةُ শব্দটি বাবে فَعْلَلَةٌ -এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ হলো– মনের কুচিন্তা, খটকা বা ধারণা।

وَسْوَسَة -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : মানুষের মনে যদি এমন ধারণার উদ্ভব হয় যা তাকে অশ্লীল ও মন্দ কর্মের দিকে পরিচালিত করে, তাকে وَسْوَسَة বলে। আর এটা যদি ভালো বা পুণ্যের পথে পরিচালিত করে তবে তাকে ইলহাম বলে।

اَقْسَامُ الْوَسْوَسَة : প্রথমত وَسْوَسَة দু'প্রকার। যথা— ১. اِخْتِيَارِىْ [ঐচ্ছিক] এবং ২. غَيْر اِخْتِيَارِىْ [বাধ্যতামূলক]।

اِخْتِيَارِىْ আবার দু'প্রকার। যথা—

১. এমন কুধারণা যা অন্তরে উদয় হয় এবং বর্তমান থাকে এবং বারবার হতে থাকে। কিন্তু যখন পর্যন্ত কাজে পরিণত না হয়; ততক্ষণ পর্যন্ত এর জন্য শাস্তি হবে না। আর এরূপ ইচ্ছা পোষণ করার পর যদি আল্লাহর ভয়ে কাজে পরিণত করা হতে বিরত থাকে এর জন্য ছওয়াব হবে।

২. যখন কু-ধারণা এমন প্রবল হয়ে যায় যে, সুযোগ পেলে বাস্তবে পরিণত করা হবে, তাহলে এর জন্য শাস্তি দেওয়া হবে। তবে এরূপ অবস্থায়ও বাস্তবে না পৌছলে কাজে পরিণত করার শাস্তির তুলনায় শাস্তি কম হবে।

غَيْر اِخْتِيَارِىْ ও আবার দু'প্রকার :
১. যা অনিচ্ছাকৃতভাবে মনে উদয় হওয়া মাত্রই চলে গেছে। এটা সকল উম্মতের জন্য ক্ষমা করা হয়।
২. মনে উদয় হয়ে স্থির আছে ; পরে অবশ্য চলে যায়। এরূপ ধারণাও ক্ষমা করা হয়।

মোল্লা আলী কারী (র.) মনের অবস্থাকে চার ভাগে ভাগ করেছেন। যথা—
১. কোনো ধারণা অন্তরে এসে গেলে এটাকে هَاجِسْ বলে।
২. যে ইচ্ছা অন্তরে ঘুরাফেরা করে তবে বাস্তবে করা না করার কোনো সিদ্ধান্ত হয় না, এটাকে خَاطِرْ বলে।
৩. মনোভাবকে কাজে পরিণত করার ইচ্ছা হয়েছে ; তবে সিদ্ধান্ত হয়নি, এটাকে حَدِيْثُ النَّفْسِ বলে।
৪. আর যদি মনের ভাব কাজে পরিণত হওয়ার কঠোরতা বা প্রবণতা লাভ করে, তবে তাকে هَمْ বলে।

তাফসীরে জামালে وَسْوَسَةٌ -কে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। উল্লিখিত চারটি ও অপরটি হলো, هَمْ
৫. মনোভাবের পর যদি কাজের বাস্তবতার প্রবণতা পায়, তবে তাকে عَزْم বলে।

জনৈক ব্যক্তি পদ্যাকারে বলেছেন—

مَرَاتِبُ الْقَصْدِ خَمْسٌ هَاجِسٌ ذَكَرُوْا ٭ وَخَاطِرٌ فَحَدِيْثُ النَّفْسِ فَاسْتَمِعَا
يَلِيْهِ هَمٌّ فَعَزْمٌ كُلُّهَا رُفِعَتْ ٭ سِوَى الْاَخِيْرِ فَفِيْهِ الْاَخْذُ قَدْ وَقَعَ

عزم ব্যতীত উল্লিখিত সকল প্রকার কল্পনা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কার্যে পরিণত না করলে ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু عزم -এর বেলায় পাকড়াও হবে।

وَعَنْهُ ٥٧ قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَاَلُوْهُ اِنَّا نَجِدُ فِىْ اَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ اَحَدُنَا اَنْ يَّتَكَلَّمَ بِهٖ قَالَ اَوَقَدْ وَجَدْتُّمُوْهُ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ ذَاكَ صَرِيْحُ الْاِيْمَانِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৭. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন সাহাবীদের মধ্য হতে কিছু সংখ্যক লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করলেন, অতঃপর তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আমাদের অন্তরে এমন কিছু কথা আমরা অনুভব করি; যা প্রকাশ করাকে আমাদের কেউ কেউ অত্যন্ত গুরুতর বলে মনে করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন; তোমরা আসলে কি মনে এমন কিছু অনুভব কর? তাঁরা বলল, হ্যাঁ। নবী করীম ﷺ বললেন, এটা হলো তোমাদের প্রাকাশ্য ঈমানের লক্ষণ। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ذَاكَ صَرِيْحُ الْاِيْمَانِ **দ্বারা উদ্দেশ্য :** প্রশ্নকারী সাহাবীগণ রাসূল ﷺ-এর নিকট জানতে চেয়েছেন যে, আমাদের অন্তরে এমন কিছু কুধারণা ও কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হয়, যা মুখে প্রকাশ করা আমাদের নিকট অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ বলে মনে হয়। এতে আমাদের কি অবস্থা হবে ? রাসূল ﷺ বললেন, এটাই হলো প্রকাশ্য ঈমানের লক্ষণ। কেননা, ঈমান আছে বিধায় তো মনের মধ্যে সৃষ্ট খটকা আল্লাহর ভয়ে তোমাদের প্রকম্পিত করে তোলে, আর যদি ঈমান নাই থাকত তবে তোমরা নির্দ্বিধায় সে কাজে লিপ্ত হতে কাউকে পরোয়া করতে না।

وَعَنْهُ ٥٨ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْتِى الشَّيْطَانُ اَحَدَكُمْ فَيَقُوْلُ مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَتّٰى يَقُوْلَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَاِذَا بَلَغَهٗ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ وَلْيَنْتَهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫৮. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— শয়তান তোমাদের কারো নিকট আগমন করে, অতঃপর প্রশ্ন করতে থাকে যে, এটা কে সৃষ্টি করেছে? ওটা কে সৃষ্টি করেছে? এমন কি এটাও প্রশ্ন করে যে, তোমার প্রভুকে কে সৃষ্টি করেছে? শয়তান যখন এ পর্যন্ত পৌছে যায় তখন সে ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে– আল্লাহর নিকট [শয়তানের এরূপ প্রশ্ন হতে] আশ্রয় প্রার্থনা করা এবং [তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া থেকে] বিরত থাকা–[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : শয়তান মানুষের চির শত্রু। যেহেতু মানুষের কারণেই সে আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত হয়ে চির লাঞ্ছনার বেড়ি গলায় পরিধান করেছে, তাই সে মানব জাতিকে বিপথগামী করার জন্য সর্বদা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যায়। বস্তুত শয়তান দু' শ্রেণীতে বিভক্ত। **এক.** জিন শয়তান। **দুই.** মানুষরূপী শয়তান। যেমন– মহান আল্লাহ বলেন, اَلَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ জিন শয়তান সর্বদা মানুষের অন্তরে কু-মন্ত্রণা দিয়ে বিপথগামী করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। তার সাথে বিতর্কে পরাজিত হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। তাই আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে বিতর্ক বন্ধ করে দেওয়াই উত্তম। কেননা, ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র.)-এর মতো বিজ্ঞ ব্যক্তিও মৃত্যুর সময় আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে ১০০টি যুক্তির জবাব দিয়েও পরাস্ত হতে চলেছিলেন। পরে তিনি বিনা যুক্তিতে আল্লাহ্ এক বলে তাকে পরাস্ত করেছেন। কেননা, শয়তানের নিকট যুক্তির অভাব নেই। আর মানবরূপী শয়তানের বেলায়ও অনুরূপ করা উচিত।

وَعَنْهُ (٥٩) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُوْنَ حَتّٰى يُقَالَ هٰذَا خَلَقَ اللّٰهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهَ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– মানুষ একে অপরকে প্রশ্ন করতে থাকে। অবশেষে এটা বলে যে, আল্লাহ তা'আলা তো সকল সৃষ্টি জীবকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহকে সৃষ্টি করেছেন কে ? অতএব তোমাদের অন্তরে যখন এই ধরনের খটকা সঞ্চারিত হয়, তখন সে যেন বলে উঠে আমি আল্লাহ এবং তার রাসূলদের উপর ঈমান আনয়ন করেছি। –[বুখারী-মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : শয়তান মানুষের চির শত্রু। সর্বাবস্থায় মানুষকে সে ধোঁকায় ফেলতে চেষ্টা করে। কিছু মানুষকে সে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান করে তোলে। ফলে তারা পরস্পর এই বিষয়ে আলোচনায় লিপ্ত হয়। মুসলমান মাত্রই এরূপ আলোচনা থেকে দূরে থাকবে এবং মনে কখনো এরূপ ধারণার সৃষ্টি হলে সাথে সাথে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করবে এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর ঈমান আনয়নের ঘোষণা প্রদান করবে।

وَعَنِ (٦٠) ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا وَقَدْ وُكِّلَ بِهٖ قَرِيْنُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَقَرِيْنُهٗ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ قَالُوْا وَاِيَّاكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَاِيَّاىَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَعَانَنِىْ عَلَيْهِ فَاَسْلَمَ فَلَا يَاْمُرُنِىْ اِلَّا بِخَيْرٍ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৬০. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার সাথে জিন এবং ফেরেশতাদের মধ্য হতে কাউকে সঙ্গী নিযুক্ত করে দেওয়া হয়নি। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন– হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ! তাহলে আপনার সাথেও কি ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হ্যাঁ আমার সাথেও। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেছেন। অতএব সে আমার অনুগত হয়ে গেছে [অথবা আমি তার থেকে নিরাপদ থাকি।] ফলে সে কোনো কল্যাণকর কাজ ব্যতীত আমাকে অন্য কিছুর পরামর্শ দেয় না। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : বনী আদমের সাথে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জিন ও ফেরেশতাদের মধ্য হতে দু'জন সাথী সর্বদা অবস্থান করতে থাকে। যে সঙ্গী ফেরেশতাদের মধ্য হতে হয় তাকে 'আলমুলহিম" বলা হয়। সে সর্বদা ভাল ও কল্যাণকর কাজের পরামর্শ প্রদান করে। আর জিনদের মধ্য হতে যে সাথী থাকে তাকে বলে "আহরামান" বা "ওয়াসওয়াসা"। সে সর্বদা মন্দ ও খারাপ কাজের পরামর্শ দেয়। এই দু' শক্তি সর্বদা মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব করতে থাকে। ফলে যে প্রবল হয় সেই বিজয়ী হয়ে মানুষকে সুপথ অথবা কুপথে চালায়।

وَعَنْ ٦١ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِىْ مِنَ الْاِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬১. অনুবাদ : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের দেহে রক্তের ন্যায় চলাচল করে। –[বুখারী-মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَعْنَى مَجْرَى الدَّمِ "রক্ত প্রবাহের ক্ষেত্র" শব্দের অর্থ : আলোচ্য হাদীসে উল্লেখিত مَجْرَى শব্দটি مَصْدَرْ এবং اِسْمِ ظَرْف যে কোনটি ধরা যায়। মাসদার হিসেবে গ্রহণ করলে অর্থ হবে– শয়তান মানবদেহে রক্তের ন্যায় দ্রুত চলাচল করে এবং তাকে নানা কু-মন্ত্রণা দেয়। আর যদি اِسْمُ ظَرْف ধরা হয়, তবে অর্থ হবে শয়তান মানব দেহের রক্ত প্রবাহের ক্ষেত্রসমূহ তথা শিরা উপশিরায় প্রবেশ করে মানুষকে নানা প্রকার কু-মন্ত্রণা দিয়ে থাকে।

وَعَنْ ٦٢ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ مَوْلُوْدٌ اِلَّا مَسَّهُ الشَّيْطَانُ حِيْنَ يُوْلَدُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ غَيْرُ مَرْيَمَ وَابْنِهَا ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬২. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন; এমন কোনো আদম সন্তান ভূমিষ্ট হয়নি, যাকে ভূমিষ্ট হওয়ার সময় শয়তান স্পর্শ করেনি। ফলে সে শয়তানের স্পর্শের কারণে চিৎকার করে উঠে। একমাত্র মারইয়াম ও তাঁর পুত্র ব্যতীত। –[বুখারী-মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

سَبَبُ حِفْظِ مَرْيَمَ وَعِيْسٰى (عـ) عَنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ - হযরত মরিয়ম ও ঈসা (আ.) শয়তানের হাত হতে নিরাপদ থাকার কারণ : হাদীসের বর্ণনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক নবজাতক শিশুকেই শয়তান স্পর্শ করে, যার ফলে শিশু কেঁদে উঠে। তবে হযরত মরিয়ম ও তাঁর পুত্র হযরত ঈসা (আ.) শয়তানের এই স্পর্শ হতে মুক্ত ছিলেন। আল্লামা ইবনে হাজার (র.) এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন– হযরত মরিয়মের মাতা আল্লাহর দরবারে দোয়া করেছিলেন যে, اِنِّىْ اُعِيْذُهَا بِكَ وَ ذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ এর বরকতে আল্লাহ তা'আলা মরিয়ম ও তাঁর সন্তান হযরত ঈসা (আ.)-কে শয়তানের আঘাত হতে নিরাপদ রেখেছেন।

بَيَانُ الْفَضِيْلَةِ لِعِيْسٰى (عـ) بِنِسْبَةِ رَسُوْلِنَا ﷺ নবী করীম ﷺ-এর তুলনায় হযরত ঈসা (আ.)-এর মর্যাদার বর্ণনা : হযরত মরিয়ম ও তাঁর পুত্র হযরত ঈসা (আ.) এক মাত্র শয়তানের আঘাত হতে নিরাপদ থাকার দ্বারা তাদের মর্যাদা নবী করীম ﷺ-এর উপর হওয়ার সন্দেহ হয়। এর উত্তরে হযরত ইবনে হাজার (র.) বলেন– এটা হলো হযরত মরিয়ম ও হযরত ঈসা (আ.)-এর جُزْئِىْ বা আংশিক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু নবী করীম ﷺ-এর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য হলো كُلِّىْ এবং সকল নবী রাসূলদের উপর কুরআন ও হাদীস দ্বারা স্বীকৃত। সুতরাং হযরত মরিয়ম ও তাঁর পুত্র হযরত ঈসা (আ.)-এর মর্যাদা রাসূলে কারীম ﷺ-এর উপর হওয়ার সন্দেহ করা যায় না।

وَعَنْهُ ٦٣ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صِيَاحُ الْمَوْلُوْدِ حِيْنَ يَقَعُ نَزْغَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, ভূমিষ্ট হওয়ার সময় শিশু যে চিৎকার করে তা মূলত শয়তানের খোঁচার কারণেই করে। –বুখারী মুসলিম]

وَعَنْ ٦٤ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اِبْلِيْسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ يُفَتِّنُوْنَ النَّاسَ فَاَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً اَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِيْئُ اَحَدُهُمْ فَيَقُوْلُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُوْلُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيْئُ اَحَدُهُمْ فَيَقُوْلُ مَا تَرَكْتُهُ حَتّٰى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ قَالَ فَيُدْنِيْهِ مِنْهُ وَيَقُوْلُ نَعَمْ اَنْتَ قَالَ الْاَعْمَشُ اُرَاهُ قَالَ فَيَلْتَزِمُهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৬৪. অনুবাদ : হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, ইবলীস শয়তান পানির উপরে তার সিংহাসন স্থাপন করে। অতঃপর মানুষের মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তার সৈন্যদেরকে প্রেরণ করে। আর তার নিকট সেই বেশি মর্যাদার অধিকারী যে বিপর্যয় সৃষ্টির ব্যাপারে বড়। তাদের মধ্য হতে কেউ এসে বলে– আমি এরূপ করেছি, তখন ইবলীস বলে, না তুমি কিছুই করনি। রাসূল ﷺ বলেন, এরপর অপর একজন এসে বলে, আমি মানুষদেরকে এমনিতেই ছেড়ে দিয়ে আসিনি, বরং আমি তাদের স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে দিয়েছি। রাসূলে করীম ﷺ বলেন, অতঃপর ইবলীস তাকে নৈকট্য দান করে এবং বলে– হ্যাঁ, তুমিই উত্তম ব্যক্তি।

বর্ণনাকারী আ'মাশ বলেন, আমি মনে করি জাবির এই কথাও বলেছেন যে, রাসূল ﷺ বলেছেন, অতঃপর ইবলীস তার সাথে আলিঙ্গন করে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

سَبَبُ اَهَمِّيَّةِ التَّفْرِقَةِ عِنْدَ اِبْلِيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ **স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা ইবলীসের নিকট গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণ** : মানব জাতির প্রকাশ্য শত্রু হলো শয়তান। সকল অন্যায় অশ্লীলতার পেছনে শয়তানের ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি। এজন্য কুরআনে এসেছে– اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ শয়তান সমাজে পরস্পরের মধ্যে নানা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে মানব সমাজকে অস্থির করে তোলে। এসব অপকর্মের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির কাজটি সাধারণ মনে হলেও এটি অত্যন্ত গুরুতর। কেননা, এই বিভেদের ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। ফলে উভয়ের মধ্যে যিনার প্রবণতা বেড়ে উঠে এবং এতে সমাজে জারজ সন্তানের আধিক্য সৃষ্টি হয়ে সমাজ ব্যবস্থাকে কলুষিত করে তোলে। এছাড়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদের কারণে অনেক সময় উভয় পরিবারের মাঝে মারামারি- হানাহানির সৃষ্টি হয়। এসব কারণেই রাসূল ﷺ ফেতনাকে কতলের থেকেও গুরুতর হিসেবে ঘোষণা করে বলেন– وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

وَعَنْهُ ٦٥ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ اَئِسَ مِنْ اَنْ يَّعْبُدَهُ الْمُصَلُّوْنَ فِىْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَلٰكِنْ فِى التَّحْرِيْشِ بَيْنَهُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৬৫. অনুবাদ : হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– নিঃসন্দেহে শয়তান এ ব্যাপারে নিরাশ হয়েছে যে, আরব উপদ্বীপে কোনো নামাজি তার ইবাদত করবে না। কিন্তু তাদের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া, বিবাদ বাঁধানোর ব্যাপারে নিরাশ হয়নি। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ اَئِسَ-এর দ্বারা উদ্দেশ্য : মহানবী ﷺ বলেছেন যে, শয়তান আরব উপদ্বীপের ঈমানদারদের উপর এ বিষয়ে নিরাশ হয়ে গেছে যে, এখানকার কেউ আর তার ইবাদত করবে না। উক্ত হাদীসে শয়তান দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, জিনসমূহ। আর مُصَلُّوْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঈমানদারগণ। অর্থাৎ, শয়তান নিশ্চিতভাবে নিরাশ হয়েছে যে, সে আরব উপদ্বীপের নামাজিদেরকে আর কখনো জিনদের উপাসনার দিকে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে না। কেননা, মুসাইলামাতুল কাযযাব যদিও নবুয়তের দাবি করে বিপথগামী হয়েছে; কিন্তু সে জিনদের ইবাদত করেনি। কিছু সংখ্যক মুহাদ্দিসগণের মতে শয়তান ঈমানদারদের উপর নিরাশ হয়ে গেছে যে, তারা দীনের বিনিময়ে শিরককে প্রাধান্য দিবে না।

وَجْهُ تَخْصِيْصِ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ আরব উপদ্বীপকে নির্দিষ্ট করার কারণ : আরব উপদ্বীপকে নির্দিষ্ট করার কারণ হলো, এ স্থানটি ইসলামের মূল এবং ওহীর কেন্দ্রভূমি। এ স্থান হতেই পৃথিবীর চারিদিকে ইসলাম প্রসারিত হয়েছে।

অথবা এটা এ জন্য যে, সে সময়ে ইসলাম আরব উপদ্বীপের বাইরে প্রসারিত ছিল না।

تَعْرِيْفُ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ "জাযীরাতুল আরব" পরিচিতি :

১. ইমাম মালিক (র.)-এর মতে আরব উপদ্বীপ বলতে মক্কা, মদীনা এবং ইয়েমেনকে বুঝায়।

২. اَلْمُنْجِدْ নামক অভিধানে আছে যে, আরব উপদ্বীপ ঐ অংশ, যাকে পশ্চিমে লোহিত সাগর, পূর্বে আরব উপসাগর, উত্তরে ইরাক ও জর্দান এবং দক্ষিণে ইয়েমেন বেষ্টন করে আছে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

وَعَنْ ٦٦ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ اِنِّيْ اُحَدِّثُ نَفْسِيْ بِالشَّيْءِ لَاَنْ اَكُوْنَ حُمَمَةً اَحَبَّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اَتَكَلَّمَ بِهِ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ رَدَّ اَمْرَهُ اِلَى الْوَسْوَسَةِ ـ رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ

৬৬. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর দরবারে এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমার মনে এমন কিছু বিষয় সৃষ্টি হয়, যা মুখে প্রকাশ করা অপেক্ষা আমার পক্ষে জ্বলে অঙ্গার হয়ে যাওয়াই আমি শ্রেয় মনে করি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহর শুকরিয়া, যিনি এ বিষয়টি কল্পনা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রেখে দিয়েছেন। –[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٦٧ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةً بِابْنِ اٰدَمَ وَلِلْمَلَكِ لَمَّةً فَاَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فَاِيْعَادٌ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيْبٌ بِالْحَقِّ وَاَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ فَاِيْعَادٌ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيْقٌ بِالْحَقِّ فَمَنْ وَجَدَ ذٰلِكَ فَلْيَعْلَمْ اَنَّهُ مِنَ اللّٰهِ فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ وَمَنْ وَجَدَ الْاُخْرٰى فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ثُمَّ قَرَاَ اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ ـ

৬৭. অনুবাদ : হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আদম সন্তানের উপর শয়তানের একটি স্পর্শ (বা প্রভাব) রয়েছে এবং ফেরেশতারও একটি স্পর্শ রয়েছে। শয়তানের স্পর্শ হলো, মানুষকে অমঙ্গলের ভয় দেখানো এবং সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। আর ফেরেশতার স্পর্শ হলো, কল্যাণের প্রতিশ্রুতি বা সুসংবাদ প্রদান করা এবং সত্যের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করা। অতএব, যে ব্যক্তি এ অবস্থা উপলব্ধি করে, সে যেন মনে করে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ হতেই হয়েছে। সুতরাং তার উচিত এর জন্য আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করা। আর যে ব্যক্তি অপর অবস্থাটি অনুভব করে, সে যেন অভিশপ্ত শয়তানের প্ররোচনা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এই আয়াতটি পাঠ করেন যে, اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ـ অর্থাৎ, শয়তান তোমাদেরকে অভাব-অনটনের ভয় দেখায়। আর অশ্লীলতার প্রতি আদেশ দেয়। –[তিরমিযী] তিনি একে হাদীসে গরীব বলেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لَمَّةٌ : وَتَوْضِيْحُ قَوْلِهِ ﷺ لَمَّةُ الشَّيْطَانِ وَلَمَّةُ الْمَلَكِ শয়তানের প্রভাব ও ফেরেশেতার প্রভাব কথাটির ব্যাখ্যা : لَمَّةُ الشَّيْطَانِ শব্দের অর্থ শয়তানের স্পর্শ বা প্রভাব, তথা মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শয়তান সঙ্গে থাকে, তার প্রভাবে সে সর্বদা আদম সন্তানকে কুফরি, ফিসক, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা এবং সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য প্রভাব বিস্তার করে।

আর لَمَّةُ الْمَلَكِ অর্থ ফেরেশতার প্রভাব, এই ফেরেশতা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত থাকে। তাকে বলে মুলহিম। সে সর্বদা মানুষকে ভাল ও কল্যাণের দিকে অনুপ্রাণিত করে এবং সত্যকে সত্য বলতে উৎসাহিত করে।

وَعَنْ ٦٨ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَايَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُوْنَ حَتّٰى يُقَالَ هٰذَا خَلَقَ اللّٰهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهَ فَاِذَا قَالُوْا ذٰلِكَ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ثُمَّ لِيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهٖ ثَلٰثًا وَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ . رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ . وَسَنَذْكُرُ حَدِيْثَ عَمْرِو بْنِ الْاَحْوَصِ فِيْ بَابِ خُطْبَةِ يَوْمِ النَّحْرِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى .

৬৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– মানুষ অনবরত একে অপরকে জিজ্ঞাসা করতে থাকে। এমনকি এক পর্যায়ে এই প্রশ্ন করা হয় যে, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টি জীবকে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আল্লাহকে সৃষ্টি করেছেন কে ? যখন লোকেরা এরূপ বলাবলি করবে, তখন তোমরা বলবে যে, আল্লাহ এক অদ্বিতীয়। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তিনিও কারো থেকে জন্ম নেননি। আর তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই। এরপর [শয়তানের প্রতি অবজ্ঞা স্বরূপ] নিজের বাম দিকে তিনবার থু থু ফেলবে এবং বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। –[আবূ দাউদ]

আর আমর ইবনে আহওয়াসের হাদীস আমি "খুতবাতু ইয়াওমিননাহার" অধ্যায়ে উল্লেখ করব। ইনশাআল্লাহু তা'আলা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَجْهُ الْاَمْرِ لِيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهٖ :

বাম দিকে থু থু ফেলার আদেশ দানের কারণ : পূর্বোক্ত হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, মানুষের অন্তরে ফেরেশতা ও শয়তান এই দু' শক্তির প্রভাব বিস্তার হয়। ফেরেশতা ডান দিক হতে প্রভাব বিস্তার করে সৎ কাজের অনুপ্রেরণা দেয়। আর শয়তান বাম দিক হতে প্রভাব বিস্তার করে কু-মন্ত্রণা দেয় এবং অসৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করে। এই শয়তানের প্রতি ঘৃণা প্রকাশের উদ্দেশ্যে তৎক্ষণাৎ তিনবার বাম দিকে থু থু ফেলার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

وَعَنْ ٦٩ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَنْ يَّبْرَحَ النَّاسُ يَتَسَاءَلُوْنَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا هٰذَا اللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَلِمُسْلِمٍ قَالَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اِنَّ اُمَّتَكَ لَايَزَالُوْنَ يَقُوْلُوْنَ مَاكَذَا مَاكَذَا حَتّٰى يَقُوْلُوْا هٰذَا اللّٰهُ خَلَقَ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ .

৬৯. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– মানুষ একে অপরকে প্রশ্ন করতে থাকবে। এমনকি অবশেষে জিজ্ঞাসা করে যে, আল্লাহ তা'আলা তো সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মহান আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে ? –[বুখারী]

আর মুসলিমের বর্ণনানুযায়ী তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, [হে মুহাম্মদ ﷺ] আপনার উম্মত সর্বদা এটা কি? ওটা কি? এরূপ প্রশ্ন করে থাকবে। এরপর এক পর্যায়ে এ প্রশ্নও করে যে, আল্লাহ তা'আলা সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আল্লাহকে কে সৃষ্টি করল ?

وَعَنْ ٧٠ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ (رض) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِى وَبَيْنَ صَلٰوتِى وَبَيْنَ قِرَاءَتِى يُلَبِّسُهَا عَلَىَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خِنْزَبٌ فَاِذَا اَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْهُ وَاتْفُلْ عَلٰى يَسَارِكَ ثَلٰثًا فَفَعَلْتُ ذٰلِكَ فَاَذْهَبَهُ اللّٰهُ عَنِّىْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৭০. অনুবাদ : হযরত উসমান ইবনে আবিল আস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললাম– হে আল্লাহর রাসূল! শয়তান আমার নামাজ ও কেরাতের মধ্যে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় এবং তাতে জটিলতা সৃষ্টি করে। অতঃপর রাসূল ﷺ বললেন, সে একটি শয়তান। তাকে "খিনযাব" বলা হয়। অতএব যখন তুমি তার উপস্থিতি অনুভব করবে তখন তার ব্যাপারে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং তোমার বাম দিকে [শয়তানকে হেনস্তা করার লক্ষ্যে] তিনবার থু থু নিক্ষেপ করবে। হযরত উসমান বলেন, অতঃপর আমি এরূপ করলাম। ফলে আল্লাহ তা'আলা আমার নিকট হতে শয়তানকে দূরে সরিয়ে দিলেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : হাদীসের কথা দ্বারা বুঝা যায় নামাজের মধ্যে শয়তানের মাধ্যমে জটিলতা সৃষ্টি হলে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং বাম দিকে থু থু ফেলবে। অথচ এই উভয় কাজ করলে নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে। তাই এখানে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, নামাজ শুরুর পূর্বে এই রকম ওয়াসওয়াসার সম্ভাবনা থাকলে বাম দিকে থু থু নিক্ষেপ করে اَعُوْذُ بِاللّٰهِ পড়ে নিবে। নামাজের ভিতরে নয়।

وَعَنْ ٧١ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَنَّ رَجُلًا سَاَلَهُ فَقَالَ اِنِّىْ اَهِمُ فِىْ صَلَاتِىْ فَيَكْثُرُ ذٰلِكَ عَلَىَّ فَقَالَ لَهُ اِمْضِ فِىْ صَلَاتِكَ فَاِنَّهُ لَنْ يَذْهَبَ ذٰلِكَ عَنْكَ حَتّٰى تَنْصَرِفَ وَاَنْتَ تَقُوْلُ مَا اَتْمَمْتُ صَلَاتِىْ - رَوَاهُ مَالِكٌ -

৭১. অনুবাদ : হযরত কাসেম ইবনে মুহাম্মদ (র.) হতে বর্ণিত যে, একদা এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, নামাজের মধ্যে আমার ভুলের সন্দেহ হয়। আর তা আমার খুব বেশি হয়। হযরত কাসেম উত্তরে তাকে বললেন, তুমি তোমার নামাজ পড়তে থাকবে। কেননা, এটা (সন্দেহ) তোমার মধ্যে হতে বিদূরীত হবে না; যে পর্যন্ত না তুমি নামাজ শেষ করবে এবং বলবে যে আমি নামাজ পূর্ণ করিনি। –[মালেক]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : নামাজ হতে ফিরিয়ে রাখা হলো শয়তানের অন্যতম কাজ, এতে যদি সে বিফল হয়, তখন নামাজের মধ্যে নানা কথার উদ্রেক করে নামাজিকে বে-খেয়াল করে ফেলে এবং অনেক সময় জটিল ধাঁ ধাঁ-এ ফেলে দেয়। এতে করে নামাজি বলতে পারে না, সে কয় রাকাত পড়েছে। এমতাবস্থায় নিশ্চিত করে কিছু বলতে না পারলে পুনঃ নামাজ পড়বে।

ফিকহবিদদের মতে, কারো অন্তরে যদি এরূপ সন্দেহ প্রথম সৃষ্টি হয়। তাহলে প্রবল ধারণার উপর নির্ভর করে নামাজ শেষ করবে কিংবা পুনরায় পড়বে। আর যদি এরূপ সন্দেহ সর্বদা হয়ে থাকে, তবে এদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ না করে নামাজ পড়তে থাকবে। তাহলে শয়তান নিরাশ হয়ে সন্দেহ সৃষ্টি করা ছেড়ে দিবে।

بَابُ الْاِيْمَانِ بِالْقَدْرِ

পরিচ্ছেদ : তাকদীরের উপর বিশ্বাস স্থাপন

একথা সুস্পষ্ট যে, تَقْدِيْر শব্দটি قَدْر মূলধাতু হতে নির্গত। এর শাব্দিক অর্থ হলো– শক্তি, কুদরত, এক বস্তু অন্যটির সমান হওয়া, কোনো জিনিসের পরিমাণ বা কোনো বিষয় কর্তার ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত হওয়া।

কালাম শাস্ত্রবিদদের মতে এর পারিভাষিক সংজ্ঞা হলো :

১. মহান আল্লাহ কর্তৃক তার সমগ্র সৃষ্টিকে তার সীমা-রেখার সাথে সীমাবদ্ধ করা।

২. আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের জন্য যা কিছু নির্ধারণ করেছেন।

আর তাকদীরের প্রতি ঈমান আনয়ন করার অর্থ হলো– জগতে ভাল-মন্দ যা কিছু ঘটছে সবই আল্লাহ তা'আলা আযল বা অনাদিতেই জানেন এবং এ জানা অনুপাতে লিখে রেখেছেন। সবকিছুই সে অনুযায়ী হয়ে থাকে। সুতরাং একে বিশ্বাস করার নামই হলো তাকদীরের প্রতি ঈমান।

اَلْاِخْتِلَافُ فِىْ خَالِقِ اَفْعَالِ الْعِبَادِ بَيْنَ اَهْلِ الْحَقِّ وَ الْفِرَقِ الْبَاطِلَةِ

বান্দার কর্মের স্রষ্টার ব্যাপারে হক্বপন্থি ও বাতেল পন্থিদের মাঝে মতভেদ রয়েছে :

مَذْهَبُ الْمُعْتَزِلَةِ : যারা 'কদর অস্বীকার করে مُعْتَزِلَةٌ দের মধ্য হতে তাদেরকে বলা হয় কদরিয়া। তাদের অভিমত হলো–মানুষের কাজের স্রষ্টা মানুষ। তার কাজে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন, তাই তাদের মতে ভাল-মন্দের দায়িত্ব তার উপরই বর্তাবে।

مَذْهَبُ الْجَبْرِيَّةِ : জাবরিয়াদের মতে মানুষের কাজের উপর কোনোই হাত নেই। বরং সে আল্লাহর হাতে সম্পূর্ণ যন্ত্রের ন্যায় বাঁধা, নির্জীব কাঠের ন্যায়।

মু'তাযেলাদের দলিল হলো :

১. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ - اِنِّىْ اَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ الخ - আয়াতদ্বয়ে একটিতে خَالِقِيْنَ কে বহুবচন নেওয়া হয়েছে এবং অপর আয়াতে اَخْلُقُ ক্রিয়াকে হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি ইসনাদ করা হয়েছে।

২. مَاشِىْ ও مُرْتَعِشْ -এর হরকতের মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। প্রথমটি নিজ ইচ্ছায়, আর দ্বিতীয়টি অনিচ্ছায় হয়ে থাকে। অতএব حَرْكَةُ الْمَشْىِ -এর স্রষ্টা পথচারী নিজেই।

৩. বান্দা যদি স্বীয় কর্মের خَالِقْ না হয়, তাহলে বান্দাকে تَكْلِيْفٌ بِالشَّرْعِ বৈধ হবে না এবং তার প্রশংসা ও দুর্নাম কোনটাই করা যাবে না।

৪. اَفْعَالُ الْعِبَادِ-এর স্রষ্টা আল্লাহকে বলা হলে তাঁকে شَارِبْ ـ اٰكِلْ ـ قَاعِدْ ـ قَائِمْ ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করতে হয়। অথচ তিনি এরূপ নন।

مَذْهَبُ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ : হক পন্থিদের মতে বান্দা পাথরের মতোও নয়। আর কাজের জন্য বাধ্যও নয়। এবং সে নিজের কাজের স্রষ্টাও নয়। বরং সকল কাজের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা। বান্দা এসব কর্মের كَاسِبْ (অর্জনকারী) মাত্র।

তাদের দলিলসমূহ :

১. আল্লাহ তা'আলার বাণী – وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ এ আয়াতে وَمَا تَعْمَلُوْنَ দ্বারা বান্দার সকল কর্ম উদ্দেশ্য।

২. অন্যত্র বলা হয়েছে – "اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ" এ আয়াতের شَيْءٌ শব্দের মধ্যে বান্দার কর্মও অন্তর্ভুক্ত।

৩. আল্লাহ নিজের জন্য خَالِقِيَّتْ কে সাব্যস্ত করে বলেছেন– اَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَايَخْلُقُ

৪. বান্দা যদি স্বীয় কর্মের স্রষ্টা হতো, তাহলে অবশ্যই সে তার কাজের অবস্থাদি সম্পর্কে পূর্বে অবগত থাকত। কেননা, নিজ ক্ষমতায় কোনো বস্তু সৃষ্টি করতে হলে عِلْمُ تَفْصِيْل থাকা লাযেম। আর এটা বান্দার পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং مَلْزُوْمْ সৃষ্টিও বান্দার পক্ষে দুরূহ ব্যাপার। যেমন حَرَكَاتْ ও سَكَنَاتْ কোনটি ধীরে হয় আর কোনটি দ্রুত হয়, সে সম্পর্কে مَاشِىْ-এর ইলম নেই।

৫. অন্যত্র বলা হয়েছে যে, جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ এতে বুঝা যায় যে, বান্দা স্বীয় কর্মের জন্য পুণ্য এবং শাস্তির অধিকারী হবে। যদি আল্লাহ কর্মের স্রষ্টা হন তাহলে বান্দাকে শাস্তি দেওয়া হবে কেন?

مُعْتَزِلَةْ দের দলিলের জবাব :

১. আয়াতদ্বয়ে خَلْق শব্দটি রূপক অর্থে তথা اَلتَّقْدِيْر বা অনুমান করা ও আকৃতি তৈরি করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ অর্থে বান্দার দিকে خَلْق-এর নিসবত জায়েয।

২. তাদের দ্বিতীয় দলিলটি জাব্‌রিয়াগণের জাবাবে উল্লেখ করা উচিত। যারা বলে যে, "لَاقُدْرَةَ لِلْعَبْدِ اَصْلًا" এটা আমাদের জন্য প্রযোজ্য নয়। কেননা, আমরা বান্দার জন্য كَسْب ও اِخْتِيَارْ সাব্যস্ত করে থাকি। তাই كَسْب حَرْكَةُ الْمَشْى তার মাত্র।

৩. تَكْلِيْفُ بِالشَّرْعِ এবং বান্দার প্রশংসা ও দুর্নাম كَسْب ও اِخْتِيَارْ -এর কারণে হবে, خَلْق -এর কারণে নয়।

৪. আল্লাহকে বান্দার কর্মের خَالِقْ বলা হলে قِيَامْ ، قُعُوْدْ ইত্যাদি গুণে বিশেষিত হওয়া আবশ্যক হয় না। (نَعُوْذُ بِاللّٰهِ) কেননা. صِفَةْ -এর সাথে ঐ ব্যক্তিই مَوْصُوْف হয়ে থাকে. যার দ্বারা صِفَتْ টি প্রতিষ্ঠিত হয়। যে صِفَتْ -এর স্রষ্টা তিনি مَوْصُوْف হন্ না।

৫. অপরদিকে বান্দাকে خَالِقْ বলা হলে شِرْك হয়ে যায়।

৬. এমনিভাবে জাবরিয়াদের মতটিও ভ্রান্ত, কেননা, এতে মানুষের কাজের জন্য মানুষ মোটেই দায়ী থাকে না। সব দোষের জন্য দায়ী হন আল্লাহ তা'আলা।

اَقْسَامُ التَّقْدِيْر তাকদীরের প্রকারভেদ : তাকদীর দু'ভাগে বিভক্ত ১. مُبْرَمْ (মুবরাম) ২. مُعَلَّقْ (মু'আল্লাক)

১. تَقْدِيْرُ مُبْرَم : বা অকাট্য তাকদীর অর্থাৎ (যে তাকদীরে কোনো শর্ত আরোপিত হয়নি। অর্থাৎ যে তাকদীর আজলে লিখা হয়েছে অকাট্যভাবে। তাতে কোনোরূপ পরিবর্তন হবে না। যেমন, সে ওমুক রোগে আরোগ্য লাভ করবে না। তার দু'টি সন্তান হবে ইত্যাদি।

২. تَقْدِيْرُ مُعَلَّقْ : (বা ঝুলন্ত তাকদীর) এটা পরিবর্তন হতে পারে। এটা শর্তযুক্ত তাকদীর। যেমন– সে ওমুক ওষুধ খেলে আরোগ্য লাভ করবে ইত্যাদি।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

وَعَنْ ٧٢ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَتَبَ اللّٰهُ مَقَادِيْرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِخَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ قَالَ وَكَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَاءِ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৭২. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টির তাকদীর আসমান ও জমিন সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে লিখে রেখেছেন। তিনি বলেন, তখন আল্লাহর আরশ পানির উপরে ছিল। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

بَيَانُ كَوْنِ التَّقْدِيْرِ قَبْلَ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ "পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে" হওয়ার বর্ণনা : পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে তো কোনো দিন, মাস, বছর বা যুগ ছিল না। তাহলে এখানে ৫০ হাজার বছর কিভাবে গণনা করা হলো ? এর জবাব নিম্নরূপ :

১. এখানে خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ -এর প্রকৃত অর্থ বুঝানো হয়নি। তথা দিন, রাত, মাস, বছর নয় ; বরং এর দ্বারা দীর্ঘ সময়কে বুঝানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেছেন اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّوْنَ ـ এ আয়াতে এক হাজার বছরের অর্থ নয়। বরং দীর্ঘ সময়ের কথা বুঝানো হয়েছে।

২. অথবা خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ -এর প্রকৃত অর্থ– দুনিয়ার বছরের মতো। কেননা, আল্লাহর জন্য দিন, মাস, বছরের গণনার প্রয়োজন হয় না। যেমন– কিয়ামতের এক দিন পঞ্চাশ হাজার বছরের মতো হবে। কিন্তু সেখানে কোনো দিন, মাস, বছর হবে না।

وَكَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَاءِ -এর অর্থ : আল্লামা বায়যাভী (র.) বলেন– "আরশ পানির উপর ছিল" এর অর্থ হলো, পানি ও আরশের মাঝে অন্য কোনো বস্তু ছিল না। এই অর্থ নয় যে, আরশ পানির সাথে মিলিত ছিল।

وَعَنْ ٧٣ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৭৩. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– প্রত্যেক বস্তুই আল্লাহর কদর (পরিমাপ) অনুযায়ী হয়ে থাকে। এমন কি বুদ্ধির দূর্বলতা এবং সবলতাও। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٧٤ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِحْتَجَّ اٰدَمُ وَمُوْسٰى عِنْدَ رَبِّهِمَا فَحَجَّ اٰدَمُ مُوْسٰى قَالَ مُوْسٰى اَنْتَ اٰدَمُ الَّذِىْ خَلَقَكَ اللّٰهُ بِيَدِهٖ وَنَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُوْحِهٖ وَاَسْجَدَ لَكَ مَلٰئِكَتَهٗ وَاَسْكَنَكَ فِىْ جَنَّتِهٖ ثُمَّ اَهْبَطْتَ النَّاسَ بِخَطِيْئَتِكَ اِلَى الْاَرْضِ قَالَ اٰدَمُ اَنْتَ مُوْسَى الَّذِى اصْطَفَاكَ اللّٰهُ بِرِسَالَتِهٖ وَبِكَلَامِهٖ وَاَعْطَاكَ الْاَلْوَاحَ فِيْهَا تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ وَقَرَّبَكَ نَجِيًّا فَبِكَمْ وَجَدْتَ اللّٰهَ كَتَبَ التَّوْرَاةَ قَبْلَ اَنْ اُخْلَقَ قَالَ مُوْسٰى بِاَرْبَعِيْنَ عَامًا قَالَ اٰدَمُ فَهَلْ وَجَدْتَّ فِيْهَا وَعَصٰى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى قَالَ نَعَمْ قَالَ اَفَتَلُوْمُنِىْ عَلٰى اَنْ عَمِلْتُ عَمَلاً كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَىَّ اَنْ اَعْمَلَهٗ قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَنِىْ بِاَرْبَعِيْنَ سَنَةً قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَحَجَّ اٰدَمُ مُوْسٰى - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৭৪. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– হযরত আদম ও হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর দরবারে পরস্পর তর্ক লিপ্ত হলেন। এতে হযরত আদম (আ.) হযরত মূসা (আ.)-এর উপর বিজয়ী হলেন। হযরত মূসা (আ.) বলেন, আপনি হযরত আদম (আ.) যাকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরতের হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং আপনার মধ্যে তাঁর রূহ সঞ্চার করেছেন। তাঁর ফেরেশতাগণ দ্বারা আপনার প্রতি সম্মান প্রদর্শন [সেজদা] করিয়েছেন এবং আপনাকে বেহেশতে বসবাসের সুযোগ করে দিয়েছেন। এরপর আপনি আপনার ত্রুটির কারণে মানব জাতিকে [জান্নাত হতে] জমিনে নামিয়ে এনেছেন।

জবাবে হযরত আদম (আ.) বলেন, তুমি তো সে হযরত মূসা (আ.) যাকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রিসালাত ও কথোপকথনের জন্য মনোনীত করেছেন। আর তোমাকে তাওরাতের সেই তখতসমূহ দান করেছেন। যাতে সকল বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। এ ছাড়া তিনি তোমাকে গোপন আলোচনার জন্য তাঁর নৈকট্য দান করেছেন। অতএব তুমি কি বলতে পার আমার সৃষ্টির কত সময় পূর্বে আল্লাহ তা'আলা তাওরাত লিপিবদ্ধ করেছেন? হযরত মূসা (আ.) বললেন– চল্লিশ বছর পূর্বে। হযরত আদম (আ.) বললেন, তুমি কি তাতে আল্লাহর এ বাণী পাওনি যে, হযরত আদম (আ.) তাঁর প্রভুর মর্জির বিপরীত করল এবং পথভ্রষ্ট হলো। হযরত মূসা (আ.) বললেন– হ্যাঁ, পেয়েছি। অতঃপর হযরত আদম (আ.) বললেন– তাহলে তুমি আমাকে এমন একটি কাজ করছি বলে কিভাবে তিরস্কার করতে পার? যা আমার সৃষ্টির চল্লিশ বছর পূর্বে আমি করব বলে আল্লাহ তা'আলা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এ বিতর্কে হযরত আদম (আ.) মূসা (আ.)-এর উপর জয়ী হলেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَقْتُ وُقُوْعِ الْمُحَاجَّةِ بَيْنَهُمَا তাদের মধ্যে বিতর্কের সময়কাল : হযরত আদম ও হযরত মূসা (আ.) তখন কোথায় কিভাবে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছেন ? এই বিষয়ে হাদীস বিশারদগণ থেকে তিনটি অভিমত পাওয়া যায়।

১. অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে হাদীসে উল্লেখিত عِنْدَ رَبِّهِمَا দ্বারা বুঝা যায় যে, তাদের মধ্যকার বিতর্ক রূহের জগতে আল্লাহর সম্মুখে হয়েছে।
২. অথবা এই বিতর্ক শারীরিক জগতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এভাবে যে আল্লাহ তা'আলা উভয়কে জীবিত করে দিয়েছেন।
৩. অথবা হযরত আদম (আ.) কে হযরত মূসা (আ.)-এর জীবনকালে জীবিত করেছিলেন। আর উভয়ই আল্লাহর সামনে একত্রিত হলেন, যেমন মিরাজ রজনীতে রাসূল ﷺ অন্যান্য নবীদের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন।

هَلْ يَصِحُّ لِكُلِّ عَاصٍ اَنْ يَحْتَجَّ بِمِثْلِ اٰدَمَ হযরত আদম (আ.)-এর মতো প্রত্যেক পাপীর তর্ক জায়েয কি না? হযরত আদম (আ.) "তাকদীর" দ্বারা নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করেছিলেন। এ থেকে মনে হচ্ছে, যে কোনো মানুষের জন্য তাকদীরের দোহাই দিয়ে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করা জায়েয। এর জবাবে বলা যায়–

১. এ জগত আল্লাহর বিধান পালনের জন্য। এখানে বিধান লঙ্ঘন করাটা অপরাধ। আর হযরত আদম (আ.)-এর লক্ষ্যচ্যুতি ছিল ভিন্ন জগতে। তিনি তাকদীর দ্বারা পরজগতে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করেছেন। সুতরাং এ জগতের মানুষের জন্য এটা জায়েয নয়।
২. এছাড়া হযরত আদম (আ.)-কে তাঁর ভুলের জন্য ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ অতএব তাঁর জন্য তাকদীরের দলিল দেওয়া বৈধ ছিল। আমাদের অপরাধ ক্ষমা হয়েছে কিনা ? তা জানার উপায় নেই।
৩. এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, "আযলে" যা লেখা আছে তা অবশ্যই ঘটবে। তবে নিজের ইচ্ছায় প্রবৃত্তির তাগিদে বা নফসের চাহিদায় অপরাধ করার পর তাকদীরকে টেনে আনার কোনো যুক্তি নেই। কারণ, তাহলে তো পুরস্কার ও তিরস্কার প্রদানের ঘোষণা নিরর্থক হয়ে যাবে। আর শরিয়তের বিধানাবলিও অচল হয়ে পড়বে। অতএব, তাকদীর দ্বারা নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের কোনো অবকাশ নেই।

لَيْسَ هٰذَا مُنَافٍ بِعِصْمَةِ الْاَنْبِيَاءِ এই হাদীস নবীদের নিষ্পাপ হওয়ার পরিপন্থি নয় : নবী-রাসূলগণ হতে গুনাহ প্রকাশ পাওয়া সম্ভব কি না ? এই বিষয়ে ইসলামি দর্শনবিদ ও ফিকহ শাস্ত্রবিদদের বিভিন্ন অভিমত পাওয়া যায়।

১. অধিকাংশ মু'তাযিলদের মতে নবীগণ হতে ইচ্ছাপূর্বক সগীরা গুনাহ প্রকাশ হওয়া সম্ভব।
২. আবার কারো মতে ভুলবশত অনিচ্ছায় গুনাহ প্রকাশ পেতে পারে। তবে এজন্য পরকালে দায়ী বা জবাবদিহি করতে হবে না।
৩. আবার কেউ কেউ বলেন– সগীরা-কবীরা, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় কোনো অবস্থাতে কোনো গুনাহই প্রকাশ পাওয়া জায়েয নয়।
৪. আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতে নবী-রাসূলগণ নিষ্পাপ। নবুয়তী দায়িত্ব লাভ করার পর কোনো নবী হতে যে কোনো প্রকারের গুনাহ প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব। তবে নবুয়ত লাভের পূর্বে শিরক ব্যতীত ইজতেহাদী ভুল-ভ্রান্তি প্রকাশ হওয়াটা অসম্ভব নয়।

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব : হযরত আদম (আ.) হতে যে অপরাধ হয়েছিল, তা প্রকৃতপক্ষে অপরাধ বা গুনাহ কি না ? যদি অপরাধই না হয়, তবে তওবা করলেন কেন ? পক্ষান্তরে عِصْمَتُ الْاَنْبِيَاءِ (নবীগণ নিষ্পাপ) এই সত্যতা বহাল থাকল কোথায় ? এর উত্তরে বলা হয় যে,

১. অপরাধ হোক আর নাই হোক, তা ঘটেছিল নবুয়ত লাভের পূর্বে। সুতরাং তখনকার অপরাধ ধর্তব্য নয়।
২. এটা ভুল বা ইজতেহাদী ত্রুটি ছিল, ইচ্ছাকৃত হয়নি। যেমন– কালামে পাকের উক্তি فَنَسِيَ اٰدَمُ وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا সুতরাং একে গুনাহ বলা যায় না।
৩. নবুয়তের পূর্বে পরজগতে যা ঘটেছে তাকে গুনাহ বলা ঠিক নয়, কেননা, পাপ পুণ্যের সম্পর্ক ইহজগতের সাথে সংশ্লিষ্ট।
৪. অথবা, হযরত আদম মনে করেছিলেন যে, একটি নির্দিষ্ট গাছের ফল খেতে নিষেধ করা হয়েছে। সে জাতীয় অন্য গাছের ফল খাওয়া নিষেধ নয়। এই হিসেবে তিনি ইজতেহাদী ভুল করেছেন। অথবা এটা পাপই নয়; বরং পাপের আকৃতি মাত্র। কেননা, غَوٰى অর্থ পাপ নয় ; বরং চিরকাল জান্নাতে থাকা হতে বঞ্চিত হওয়া বুঝানো হয়েছে। কেননা, এর আভিধানিক অর্থ হলো, অভিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হতে ব্যর্থ হওয়া।

وَعَنْ ٧٥ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ إِنَّ خَلْقَ اَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِىْ بَطْنِ اُمِّهٖ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا نُطْفَةً ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللّٰهُ اِلَيْهِ مَلَكًا بِاَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَكْتُبُ عَمَلَهٗ وَاَجَلَهٗ وَرِزْقَهٗ وَشَقِىٌّ اَوْ سَعِيْدٌ ثُمَّ يَنْفُخُ فِيْهِ الرُّوْحَ فَوَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ غَيْرُهٗ اِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ حَتّٰى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهٗ وَبَيْنَهَا اِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَاِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ حَتّٰى مَايَكُوْنُ بَيْنَهٗ وَبَيْنَهَا اِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৭৫. **অনুবাদ :** হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট ইরশাদ করেছেন [আর তিনি তো ছিলেন পরম সত্যবাদী এবং সত্যবাদী হিসেবে স্বীকৃত।] তোমাদের যে কোনো ব্যক্তির সৃষ্টির অবস্থা এই যে, প্রথম চল্লিশ দিন তার মাতৃগর্ভে শুক্ররূপে একত্রিত হয়। অতঃপর চল্লিশ দিন জমাট রক্তপিণ্ডরূপে। এর পর চল্লিশ দিন মাংসপিণ্ডরূপে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা একজন ফেরেশতাকে চারটি বিষয়সহ তার নিকট প্রেরণ করেন। ফলে সে ফেরেশতা তার কর্ম, মৃত্যুর সময়, তার রিজিক এবং তার ভালো অথবা মন্দ হওয়া প্রভৃতি লেখে দেয়। এরপর তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সেই সত্তার কসম! যিনি ব্যতীত অন্য কোনো প্রভু নেই; তোমাদের মধ্যে কেউ জান্নাতবাসীদের কাজ করতে থাকে। এমনকি তার ও জান্নাতের মাঝে এক হাত বাকি থাকে; এমতাবস্থায় তার প্রতি সেই তাকদীরের লিখন অগ্রগামী হয়ে যায়। ফলে সে জাহান্নামবাসীদের কাজ করতে থাকে এবং পরিণামে সে জাহান্নামে প্রবেশ করে। এমনিভাবে তোমাদের কেউ জাহান্নামবাসীদের কাজ করতে থাকে। এমনকি তার ও জাহান্নামের মধ্যে মাত্র এক হাত দূরত্ব অবশিষ্ট থাকে। এমন সময় তার তাকদীরের লিখন অগ্রবর্তী হয়, তখন সে জান্নাতবাসীদের কাজ করতে আরম্ভ করে। যার ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْمُرَادُ بِقَوْلِهٖ "يُجْمَعُ فِىْ بَطْنِ اُمِّهٖ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا نُطْفَةً" :
চল্লিশ দিন পর্যন্ত মায়ের গর্ভে বীর্য হিসেবে থাকার তাৎপর্য : হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণিত আলোচ্য হাদীসাংশটির তাৎপর্য হলো, পুরুষের বীর্য স্ত্রীর গর্ভে যওয়ার পর মহান আল্লাহ যদি এটা দ্বারা সন্তান সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, তবে সে বীর্যকে স্ত্রীর সারা শরীরে ছড়িয়ে দেন। এমনকি তার চুল ও নখ পর্যন্ত ও ছড়িয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় চল্লিশ দিন অতিক্রম করার পর তা রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়ে তার জরায়ু-গর্ভে প্রত্যাবর্তন করে। এটাই হলো এর ব্যাখ্যা।

মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, যেহেতু রাসূল ﷺ-এর সাহাবীগণ তার সাহচর্যে ধন্য হয়েছেন, তাই তাদের ব্যাখ্যাই গ্রহণযোগ্য।

سِرُّ الْاَرْبَعِيْنَ فِىْ كُلِّ مَرْحَلَةٍ **প্রত্যেক স্তরে চল্লিশ দিন থাকার রহস্য :** পুরুষের বীর্য নারীর গর্ভের বিভিন্ন স্তরে চল্লিশ দিন করে থাকার রহস্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সুফিয়ায়ে কেরাম বলেন, যেহেতু হযরত আদম (আ.)-কে মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আর তাঁর দেহ গঠনের জন্য মাটি দ্বারা যে খামীর তৈরি করা হয়েছিল তা চল্লিশ দিনে সম্পন্ন হয়েছিল, তাই তার সন্তানদের সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরে চল্লিশ দিন সময় অতিবাহিত করা হয়।

اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْحَدِيْثَيْنِ দুই হাদীসের মধ্যকার অর্থগত বিরোধ : আলোচ্য হাদীস হতে বুঝা যায় যে, পুরুষের বীর্য নারীর গর্ভে পৌছার ৪ মাস পর আল্লাহ তা'আলা মাতৃগর্ভের বীর্য হতে সৃষ্ট গোশতের টুকরার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে প্রেরিত ফেরেশতা কর্তৃক মানব আকৃতি প্রদান করেন। অথচ মুসলিম শরীফের এক হাদীসে আছে আল্লাহ তা'আলা পুরুষের বীর্য মাতৃগর্ভে পৌছার ৪২ দিন পর ফেরেশতা পাঠিয়ে মানব আকৃতি প্রদান করান। অতএব উভয় হাদীসের মধ্যে বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিরোধ পরিলক্ষিত হয়।

উক্ত বিরোধের অবসান : মুসলিম শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, ৪২ দিন পর ফেরেশতা পাঠিয়ে মাতৃগর্ভে সন্তানের আকৃতি প্রদান করেন; এর অর্থ হলো, বীর্য মায়ের পেটে পৌছার ৪২ দিন পর আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাকে মাতৃগর্ভে সন্তানের মানব আকৃতি প্রদানের দায়িত্ব প্রদান করেন, আর ফেরেশতা ৪ মাস পর সেই দায়িত্ব পালন করেন। সুতরাং মেশকাত শরীফের হাদীস ও মুসলিম শরীফের হাদীসের মধ্যে কোনো সংঘাত নেই।

فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ দ্বারা উদ্দেশ্য : আলোচ্য উক্তি দ্বারা মহানবী ﷺ এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, কোনো ব্যক্তি শুধু এ কারণেই জাহান্নামী হবে না যে, আল্লাহ তার তাকদীরে লিখে দিয়েছেন ; বরং এর জন্য প্রকাশ্য কিছু আমলের প্রয়োজন, যার দ্বারা সে নিজেও অনুধাবন করতে পারে যে, সে জাহান্নামের কাজ করছে এবং অন্যরাও তা বুঝতে পারে। অতএব এ কথা বলা যাবে না যে, তাকে জাহান্নামে যেতে বাধ্য করা হয়েছে।

فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ -এর মমার্থ : উল্লিখিত উক্তির মধ্যে একথার দিকে সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আমল কেবল নিদর্শন বা চিহ্ন মাত্র। এটা কোনো কিছুকে আবশ্যক করে না, বরং তার তাকদীরে যা লিপিবদ্ধ আছে, আমলের মাধমে সে ক্রমান্বয়ে সে দিকে ধাবিত হয়। সুতরাং তার তাকদীরে যদি লেখা থাকে যে, সে জান্নাতী, তবে তার কার্যকলাপই হবে অনুরূপ। কাজেই কারো স্বীয় আমলের উপর অহংকার করা উচিত নয়। বরং আশা ও ভীতি এ দু'য়ের মধ্যবর্তীতে অবস্থান করা কর্তব্য। কেননা, এটাই হলো প্রকৃত ঈমান।

وَعَنْ ٧٦ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ اَهْلِ النَّارِ وَاِنَّهُ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَيَعْمَلُ عَمَلَ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِنَّهُ مِنْ اَهْلِ النَّارِ وَاِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيْمِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৭৬. অনুবাদ : হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— নিশ্চয়ই কোনো বান্দা জাহান্নামবাসীদের কাজ করতে থাকে, অথচ সে জান্নাতের অধিবাসী। এমনিভাবে কোনো বান্দা জান্নাতবাসীদের কাজ করতে থাকে, অথচ সে জাহান্নামের অধিবাসী। বস্তুত মানুষের আমল তার শেষ কর্মের উপরই নির্ভরশীল। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : মহানবী ﷺ উক্ত হাদীস দ্বারা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, পরকালীন মুক্তি ও শাস্তি উভয়টি ব্যক্তি জীবনের শেষ আমলের উপর নির্ভরশীল। তাই প্রত্যেকেরই উচিত তার আমল সম্পর্কে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং প্রত্যেক আমলকেই জীবনের সর্বশেষ আমল হিসেবে গণ্য করা। এই জন্য অত্যধিক যত্নসহকারে সর্বদা সৎকর্ম করার চেষ্টা করাই আমাদের কর্তব্য। কেননা, মৃত্যু কখন এসে যায় তা কেউ বলতে পারে না।

এমনিভাবে উক্ত হাদীসে এ কথার দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তিরই নিজের পুণ্য আমলের জন্য গর্বিত হওয়া উচিত নয়। কেননা, তার এ কথা জানা নেই যে, তার জীবনের শেষ আমলটি কিরূপ হবে ? কেননা, জীবনের শেষ আমলের দ্বারাই সে জান্নাতী বা জাহান্নামী হিসেবে বিবেচিত হবে।

وَعَنْ ٧٧ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ دُعِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلٰى جَنَازَةِ صَبِيٍّ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ طُوْبٰى لِهٰذَا عُصْفُوْرٌ مِنْ عَصَافِيْرِ الْجَنَّةِ لَمْ يَعْمَلِ السُّوْءَ وَلَمْ يُدْرِكْهُ فَقَالَ اَوَ غَيْرَ ذٰلِكَ يَا عَائِشَةُ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ اَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِىْ اَصْلَابِ اٰبَائِهِمْ وَخَلَقَ لِلنَّارِ اَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِىْ اَصْلَابِ اٰبَائِهِمْ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৭৭. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আনসারদের একটি বালকের জানাযার নামাজ পড়ানোর জন্য দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। এমনি সময়ে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! জান্নাতের চড়ুই পাখিগুলোর মধ্যে এই চড়ুই পাখিটি কতই না সৌভাগ্যশীল। কেননা, সে কোনো পাপকার্য করেনি এবং তার পাপকাজ করার মত বয়সও হয়নি। রাসূল ﷺ এ কথা শুনে বললেন, হে আয়েশা এর বিপরীতও তো হতে পারে। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের জন্য একদল লোককে সৃষ্টি করেছেন। আর যখন তিনি তাদেরকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন তখন তারা তাদের পিতার মেরুদণ্ডে অবস্থান করছিল। এভাবে জাহান্নামের জন্যও একদল লোক সৃষ্টি করে রেখেছেন। যখন তিনি তাদেরকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেন। তখন তারা তাদের পিতার পৃষ্ঠদেশে অবস্থান করছিল। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لِمَ اَنْكَرَ النَّبِيُّ ﷺ قَوْلَ عَائِشَةَ হযরত আশেয়া (রা.)-এর কথাকে নবী ﷺ কেন প্রত্যাখ্যান করলেন :
এক হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, মু'মিনদের সন্তানগণ বেহেশতী হবে; অথচ নবী করীম ﷺ হযরত আয়েশা (রা.)-এর কথা- (طُوْبٰى لِهٰذَا عُصْفُوْرٌ مِنْ عَصَافِيْرِ الْجَنَّةِ) কে প্রত্যাখ্যান কেন করলেন, এর কারণ নিম্নরূপ-

১. ইমাম তূরপুশ্ত (র.) বলেন, রাসূল ﷺ এ কথাটি উক্ত হাদীস তথা اَطْفَالُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الْجَنَّةِ -এর পূর্বে বলে ছিলেন; তাই এটা مَنْسُوْخٌ হয়ে গেছে।
২. অথবা, মু'মিনদের সন্তানগণ তাদের পিতামাতার অনুসারী হবে বটে, কিন্তু পিতামাতার ঈমান সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে না জেনে বলার কারণে রাসূল ﷺ হযরত আয়েশার কথাকে اِنْكَارْ করেছেন।
৩. ইমাম নববী (র.) বলেন- সন্দেহমূলক বিষয়ে নিশ্চিত করে মন্তব্য করার কারণে রাসূল ﷺ তাঁর কথাকে অগ্রাহ্য করেছেন, বেহেশতী হওয়ার ব্যাপারে নয়।

اَوَغَيْرَ ذٰلِكَ -এর বিশ্লেষণ : এ ব্যাপারে তিনটি অভিমত পাওয়া যায়—
১. এখানে هَمْزَةْ টি اِسْتِفْهَامْ এবং وَاوْ টি عَاطِفَةْ হিসেবে এসেছে। তাই মূল বাক্য হবে اَوَقَعَ هٰذَا وَالْحَالُ غَيْرُ ذٰلِكَ وَاقِعٌ
২. অথবা, এখানে وَاوْ-এর উপর জযম দিয়ে পড়া হবে। তখন এটির অর্থ হবে- اَلْوَاقِعُ هٰذَا اَوْ غَيْرُ ذٰلِكَ
৩. অথবা, اَوْ -এর অর্থ হবে بَلْ যেমনি কুরআনে এসেছে— وَ اَرْسَلْنَاهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ

وَعَنْ ٧٨ عَلِيٍّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهٗ مِنَ النَّارِ وَ مَقْعَدُهٗ مِنَ الْجَنَّةِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلَا نَتَّكِلُ عَلٰى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ قَالَ اِعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهٗ اَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ وَاَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ ـ ثُمَّ قَرَأَ فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى اَلْاٰيَةَ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৭৮. **অনুবাদ :** হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করছেন— তোমাদের মধ্যে এমন কোনো লোক নেই, যার অবস্থানস্থল জাহান্নাম অথবা জান্নাতে লিখে রাখা হয়নি। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে আমরা কি আমাদের লিখিত তাকদীরের উপর নির্ভর করে সকল প্রকার আমল ছেড়ে দেব না ? নবী করীম ﷺ বললেন– না ; বরং আমল করতে থাক। কেননা, প্রত্যেক লোকের জন্য তাই সহজ করে দেওয়া হয়, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব যে পুণ্যবান তার জন্য নেক কাজ করা সহজ হয়। আর যে হতভাগা তার জন্য পাপের কাজ করা সহজ হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এ আয়াতটি পাঠ করলেন— فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى অর্থাৎ, যে ব্যক্তি দান কর, পাপের কাজ হতে বিরত থাকে এবং ভালো কর্মের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে, তার জন্য আমি জান্নাতের কাজ সহজতর করে দেই। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, জান্নাতী বা জাহান্নামী হওয়াটা ভাগ্যের লিখন। এমনিভাবে পাপ-পুণ্য করাও তার অদৃষ্টের লিখন, কাজেই সে জান্নাতী হলে তার দ্বারা জান্নাতের কর্মই সংঘটিত হবে। আর সে জাহান্নামী হলে তার দ্বারা পাপ কার্যই সংঘটিত হবে।

وَعَنْ ٧٩ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلٰى اِبْنِ اٰدَمَ حَظَّهٗ مِنَ الزِّنَا اَدْرَكَ ذٰلِكَ لَامُحَالَةَ فَزِنَا الْعَيْنِ اَلنَّظْرُ وَزِنَا اللِّسَانِ اَلْمَنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَمَنّٰى وَتَشْتَهِىْ وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذٰلِكَ وَيُكَذِّبُهٗ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ كُتِبَ عَلٰى اِبْنِ اٰدَمَ نَصِيْبُهٗ مِنَ الزِّنَا مُدْرِكٌ ذٰلِكَ لَا مُحَالَةَ اَلْعَيْنَانِ زِنَا هُمَا النَّظْرُ وَالْاُذُنَانِ زِنَاهُمَا الْاِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطٰى وَالْقَلْبُ يَهْوٰى وَيَتَمَنّٰى وَيُصَدِّقُ ذٰلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهٗ ـ

৭৯. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানের তাকদীরে সে পরিমাণ ব্যভিচার লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন, যে পরিমাণ সে নিশ্চিতভাবে করবে। অতএব চক্ষুর ব্যভিচার হচ্ছে দৃষ্টিপাত করা। জিহবার ব্যভিচার হচ্ছে কথা বলা, আর মন কামনা ও আকাঙ্ক্ষা করে। আর যৌনাঙ্গ তাকে সত্য বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। –[বুখারী ও মুসলিম]

আর মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, আদম সন্তানের জন্য তার ব্যভিচারের অংশ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সে তাতে অবশ্যই লিপ্ত হবে। চক্ষুদ্বয়ের ব্যভিচার হলো দেখা। কর্ণদ্বয়ের যিনা হলো শ্রবণ করা। জিহ্বার ব্যভিচার হলো কথা বলা। হাতের যিনা হলো ধরা। পায়ের ব্যভিচার হলো চলা এবং মন কামনা ও আকাঙ্ক্ষা করে। আর যৌনাঙ্গ তাকে সত্য অথবা মিথ্যা সাব্যস্ত করে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

إِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلٰى ابْنِ اٰدَمَ حَظَّهٗ مِنَ الزِّنَا **দ্বারা উদ্দেশ্য :**

১. কিছু সংখ্যকের মতে এই বাক্যটির মর্মার্থ হলো আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানের মধ্যে এমন এক শক্তি সৃষ্টি করেছেন, যার দ্বারা তারা ব্যভিচারের স্বাদ উপভোগ করতে পারে এবং ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার ক্ষমতা রাখে। অর্থাৎ প্রকৃতিগতভাবে তাদের মধ্যে কামভাব সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছে। এই অর্থ নয় যে তাদেরকে ব্যভিচারের প্রতি বাধ্য করা হয়।

২. আল্লামা তীবী (র.) বলেন, উল্লিখিত বাক্যে كَتَبَ পদটি اَثْبَتَ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তথা আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির আদিতে আদম সন্তানের ভাগ্যলিপিতে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যে তাদের মধ্যে ব্যভিচার চলতে থাকবে। তবে এর মর্ম এই নয় যে, তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করা হবে। বরং এতে লিপ্ত হওয়া না হওয়া তাদের ইচ্ছাধীন ব্যাপার।

وَعَنْ ٨٠ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رض) اَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ مُزَيْنَةَ قَالَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَأَيْتَ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ وَيَكْدَحُوْنَ فِيْهِ اَشَيْءٌ قُضِىَ عَلَيْهِمْ وَمَضٰى فِيْهِمْ مِنْ قَدْرٍ سَبَقَ اَوْ فِيْمَا يَسْتَقْبِلُوْنَ بِهٖ مِمَّا اَتَاهُمْ بِهٖ نَبِيُّهُمْ وَثَبَتَتِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لَا بَلْ شَيْءٌ قُضِىَ عَلَيْهِمْ وَمَضٰى فِيْهِمْ وَتَصْدِيْقُ ذٰلِكَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ : وَنَفْسٍ وَّمَا سَوَّاهَا فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৮০. **অনুবাদ :** হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- একদা মুযাইনা গোত্রের দু'জন লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! মানুষ এখন যা কিছু করেছে এবং যা কিছুর জন্যে কষ্ট স্বীকার করছে তা কি পূর্বেই তাদের তাকদীরে নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ঠিক হয়ে রয়েছে? না কি পরে যখন তাদের নবী তাদের নিকট যা কিছু [শরিয়ত] নিয়ে এসেছেন এবং তাদের নিকট যুক্তি-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন তারা তা করছে? জবাবে রাসূল ﷺ বললেন - না; বরং পূর্বেই তাদের তাকদীরে সবকিছু নির্ধারণ করা হয়েছে এবং সে অনুসারেই সবকিছু ঘটেছে। আর আল্লাহ্র কিতাবে তার সমর্থনও রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, মানুষের জীবনের কসম এবং যে শক্তি তাকে সুডৌলভাবে গঠন করেছেন এবং পূর্বেই তাকে তার ভাল ও মন্দ সম্পর্কে ইলহাম করেছেন। -[মুসলিম]

وَعَنْ ٨١ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ رَجُلٌ شَابٌّ وَاَنَا اَخَافُ عَلٰى نَفْسِىَ الْعَنَتَ وَلَا اَجِدُ مَا اَتَزَوَّجُ بِهِ النِّسَاءَ كَاَنَّهٗ يَسْتَاْذِنُهٗ فِى الْاِخْتِصَاءِ قَالَ فَسَكَتَ عَنِّىْ ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذٰلِكَ فَسَكَتَ عَنِّىْ ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذٰلِكَ فَسَكَتَ عَنِّىْ ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذٰلِكَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَا اَبَاهُرَيْرَةَ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا اَنْتَ لَاقٍ فَاخْتَصِ عَلٰى ذٰلِكَ اَوْ ذَرْ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

৮১. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- আমি একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বললাম- হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমি একজন যুবক। আর আমি ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা করছি। অথচ কোনো মহিলাকে বিবাহ করার মতো আমার কোনো সঙ্গতি নেই। [রাবী বলেন,] এই কথা দ্বারা তিনি যেন খাসি হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ থাকলেন। অতঃপর আমি পুনঃ অনুরূপ বললাম, কিন্তু তিনি কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ থাকলেন। এরপর পুনরায় অনুরূপ বললাম, কিন্তু তখনও তিনি চুপ থাকলেন। অবশেষে চতুর্থবার অনুরূপ প্রশ্ন করলাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন- হে আবূ হুরায়রা! তোমার তাকদীরে যা আছে তা পূর্বেই লেখা হয়েছে। অতএব তুমি এখন খোজা হতে পার ; অথবা তার ইচ্ছা ত্যাগও করতে পার। [বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حُكْمُ الْاِخْتِصَاءِ بِقَوْلِهِ فَاخْتَصِ : খোজা হওয়ার বিধান : আলোচ্য হাদীসে নবী করীম ﷺ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর জিজ্ঞাসার উত্তরে فَاخْتَصِ শব্দ বলেছেন, এটা দ্বারা খোজা হওয়ার অনুমতি প্রতীয়মান হয় না। বরং এটা দ্বারা খোজা হওয়া নিষিদ্ধ বলে সাব্যস্ত হয়। কেননা, হুজুর ﷺ-এর فَاخْتَصِ শব্দটি اَمْر -এর শব্দ। আর اَمْر -এর শব্দ যেমন আদেশ ও অনুমতির জন্য আসে, তদ্রূপ ধমকি, ভর্ৎসনা ও তিরস্কারের জন্যও আসে। এখানে এরূপ কাজ হতে ধমক দেওয়ার জন্য اَمْر -এর শব্দ ব্যবহার হয়েছে। কেননা فَاخْتَصِ শব্দের পূর্বে جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا اَنْتَ لَاقٍ রয়েছে। যা দ্বারা এই কাজ অনর্থক সাব্যস্ত হয়েছে। আর শরিয়ত অনর্থক কাজের অনুমতি দিতে পারে না। আর এরূপ ধমকের জন্য اَمْر -এর শব্দ ব্যবহৃত হওয়ার উদাহরণ হলো فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ -এর মধ্যে تَرَبَّصُوْا শব্দটি।

---

٨٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ قُلُوْبَ بَنِىْ اٰدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ اِصْبَعَيْنِ مِنْ اَصَابِعِ الرَّحْمٰنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يُصَرِّفُهٗ كَيْفَ يَشَاءُ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا اِلٰى طَاعَتِكَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৮২. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– আদম সন্তানের অন্তরসমূহ আল্লাহ তা'আলার দু'টি [কুদরতের] অঙ্গুলির মধ্যে একটি মাত্র অন্তরের ন্যায় অবস্থিত। তিনি যেভাবে ইচ্ছা করেন তাকে ঘুরিয়ে থাকেন। [তথা সব কিছু তারই ইচ্ছায় হয়ে থাকে] অতঃপর রাসূল ﷺ বলেন, হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী! তুমি আমাদের অন্তরসমূহকে তোমার আনুগত্যের দিকে আবর্তিত করে দাও।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে মহানবী ﷺ সকল মানবের অন্তর আল্লাহর দুই অঙ্গুলির মাঝে কথাটি দ্বারা মহান আল্লাহর সীমাহীন ক্ষমতাকে বুঝিয়েছেন। এ হাদীসটি حَدِيْث مُتَشَابِه -এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা, মহান আল্লাহ তা'আলা দেহ-অবয়ব হতে মুক্ত।

---

٨٣ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ اِلَّا يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهٖ اَوْ يُنَصِّرَانِهٖ اَوْ يُمَجِّسَانِهٖ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيْمَةُ بَهِيْمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّوْنَ فِيْهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُوْلُ فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৮৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন— প্রতিটি সন্তানই ফিতরতের উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতামাতা তাকে ইহুদি বা খ্রিস্টান অথবা অগ্নি উপাসকে পরিণত করে। যেমন চতুষ্পদ জন্তু পূর্ণ চতুষ্পদ জন্তুই প্রসব করে থাকে। তোমরা তাতে কানকাটা বা বিকলাঙ্গ দেখতে পাও ? অতঃপর তিনি পাঠ করলেন– فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তার ফিতরাতের উপরই সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই, এটাই হলো মজবুত সুদৃঢ় দীন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَعْنَى الْفِطْرَةِ وَمَوْقَعُهَا فِى الْاِعْرَابِ ফিতরাতের অর্থ ও ই'রাবের মহল :

مَعْنَى الْفِطْرَةِ لُغَةً ঃ **اَلْفِطْرَةُ** শব্দটি **فِعْلَةٌ**-এর ওজনে বাবে **نَصَرَ** বা **ضَرَبَ**-এর মাসদার। এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে–
১. স্বভাব, চরিত্র। ২. স্বাভাবিক যোগ্যতা ও ক্ষমতা। ৩. আল্লামা **خَطَّابِىْ** বলেন– **فِطْرَةٌ** অর্থ– সুন্নত। ৪. **اَلدِّيْنُ** ধর্ম। ৫. **اَلْاِسْلَامُ** ইসলাম। ৬. **اَلْوَعْدُ الْحَقُّ** দৃঢ় প্রতিশ্রুতি যা **اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ**-এর উত্তরে বান্দা বলেছে।

مَعْنَى الْفِطْرَةِ اِصْطِلَاحًا : হাদীস বিশারদগণ **اَلْفِطْرَةُ**-এর বিভিন্ন সংজ্ঞা পেশ করেছেন।

১. আল্লামা আবূ হাবীব বলেন– **اَلْخَلِيْقَةُ الَّتِى يَكُوْنُ عَلَيْهَا كُلُّ مُوَجَّدٍ اَوَّلَ خِلْقَةٍ** "প্রত্যেক সৃষ্টবস্তু অস্তিত্বের প্রারম্ভিকাতে যে স্বভাবে সৃষ্টি হয়েছে, সে স্বভাবকে **فِطْرَةٌ** বলে।"

২. কেউ কেউ বলেন – **اَلطَّبِيْعَةُ السَّلِيْمَةُ لَمْ تَشُبْ بِعَيْبٍ** যেমন আল্লাহর বাণী—
فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ـ الاية ـ

৩. কতিপয় আলিম বলেন, সুষ্ঠু বিবেক-বুদ্ধিকেই **فِطْرَةٌ** বলে, যা নিয়ে প্রত্যেক মানব সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

৪. আল্লামা **طِيْبِىْ** ও **قُرْطُبِىْ** এবং **تُوْرِبُشْتِى** বলেন, সত্য গ্রহণের শক্তিকেই **فِطْرَةٌ** বলা হয়; যা আল্লাহ মানুষকে প্রথম থেকে প্রদান করেছেন।

৫. কেউ কেউ বলেন যে, মানুষ **عَالَمِ اَرْوَاحْ** তে **اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ**-এর উত্তরে যে **بَلٰى** বলে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছে তাই **فِطْرَةٌ**।

اِعْرَابُ الْفِطْرَةِ : আল্লাহ তা'আলার বাণী— **فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا الخ**-এর মধ্যস্থিত **فِطْرَةٌ** শব্দটি উহ্য **فِعْل**-এর **مَفْعُوْل** হিসেবে **مَحَلًّا مَنْصُوْب** হয়েছে মূল ইবারত হলো, **اِلْزَمُوْا فِطْرَةَ اللّٰهِ**

كَمَا تُنْتِجُ الْبَهِيْمَةُ الخ-এর ব্যাখ্যা : রাসূল ﷺ উল্লিখিত বাণী দ্বারা এ কথা বুঝাতে চাচ্ছেন যে, একটি চতুষ্পদ জন্তু যেমনিভাবে তার বাচ্চাকে অত্যন্ত ত্রুটিমুক্তভাবে প্রসব করে থাকে, কিন্তু পরিবেশ বা মানুষের লালন পালনের ত্রুটির কারণে পরবর্তীতে সেটি ত্রুটিযুক্ত হয়ে যায়, তেমনি মানব সন্তানও নিষ্পাপ হিসেবে জন্ম নেয় এবং জন্মগ্রহণের সময় তারা ইসলামি ফিতরতের উপরই জন্ম গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু পরবর্তীতে পিতা-মাতার ধর্মীয় প্রভাবে তারা প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে। পিতা-মাতা অমুসলিম হলে তাকে ইহুদি বা খ্রিস্টান অথবা অগ্নি উপাসকে পরিণত করে। আর খাঁটি মুসলমান হলে তাকে আল্লাহ তা'আলার বান্দারূপে গড়ে তোলে।

كَمَا تُنْتِجُ الْبَهِيْمَةُ-এর মহল্লে ইরাব : মহানবী ﷺ -এর মুখ নিঃসৃত **كَمَا تُنْتِجُ الْبَهِيْمَةُ بَهِيْمَةً جَمْعَاءَ** বাক্যাংশটি **حَالٌ** হিসেবে **مَحَلًّا مَنْصُوْب** হয়েছে।

لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ আয়াত ও হাদীসের মধ্যে অর্থগত বিরোধের সমাধান : মহান আল্লাহর বাণী **لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ** দ্বারা বোঝা যায়, আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো পরিবর্তন হয় না। আল্লাহ যাকে যে ধর্মে সৃষ্টি করেন সে সেই ধর্মেই প্রতিপালিত হয়। অথচ হাদীসের ভাষ্য দ্বারা বোঝা যায়— বান্দার মৌলিক স্বভাব ইসলামের উপর সৃষ্ট। পিতামাতা তাকে সত্য ধর্মচ্যুত করেন। বাহ্যিকভাবে আয়াত ও হাদীসের মধ্যে বাহ্যিক দৃষ্টিতে অর্থগত বিরোধ মনে হয়। আর উক্ত বিরোধের সমাধানে **مُحَدِّثِيْن كِرَامْ** নিম্নরূপ উত্তর প্রদান করেছেন।

১. আয়াতের অর্থ হলো– আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সমগ্র মানুষকে ইসলামের উপরই সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তোমরা সেই স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্তন এনো না।

২. আল্লাহর কালামের অর্থ হলো, কোনো শিশুরই মূলগত স্বভাবের পরিবর্তন হয় না। আর হাদীসে বলা হয়েছে যে, পিতা-মাতা সন্তানের গুণগত পরিবর্তন করে ফেলে।

৩. আল্লাহর সৃষ্টিকুলের শক্তি-স্বভাবের মধ্যে কোনো ব্যতিক্রম বা পরিবর্তন নেই। সকলের স্বভাব একই এবং সকলের মাঝে সমানভাবে যোগ্যতা প্রদান করা হয়, কিন্তু পিতা-মাতা বা পরিবেশ পরিমণ্ডল সেই যোগ্যতাকে বিভিন্নভাবে পরিচালিত করে।

৪. অথবা, فِطْرَةٌ অর্থ ঐ প্রতিশ্রুতি যা اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ -এর উত্তরে বান্দাগণ বলেছিল। আর ঐ প্রতিশ্রুতির উপর বাচ্চারা সৃষ্টি হয়। পিতা-মাতা তাদেরকে পরবর্তীতে অন্য মতাবলম্বী করে দেয়।

৫. অথবা, فِطْرَةٌ অর্থ সুস্থ্যজ্ঞান। অর্থাৎ প্রত্যেক বাচ্চা সুস্থ জ্ঞানের উপর সৃষ্টি হয়। কিন্তু পিতা-মাতা কাফির হওয়ায় সুস্থ জ্ঞানের পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়।

৬. অথবা, فِطْرَةٌ অর্থ– শক্তি-সামর্থ্য। অর্থাৎ, আল্লাহ কাফিরদের বাচ্চাদের ইসলাম গ্রহণের শক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেন। কিন্তু পিতা-মাতা স্বীয় প্রভাবে তাদের শক্তি নষ্ট করে দেয়।

وَعَنْ ٨٤ اَبِيْ مُوْسٰى (رضـ) قَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَايَنَامُ وَلَا يَنْبَغِيْ لَهٗ اَنْ يَّنَامَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهٗ يُرْفَعُ اِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ حِجَابُهُ النُّوْرُ لَوْكَشَفَهٗ لَاَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهٖ مَا انْتَهٰى اِلَيْهِ بَصَرُهٗ مِنْ خَلْقِهٖ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৮৪. **অনুবাদ :** হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট পাঁচটি কথা বলার জন্য দাঁড়ালেন। অতঃপর তিনি বললেন, সেগুলো হচ্ছে–(১) আল্লাহ তা'আলা কখনো ঘুমান না। (২) নিদ্রা যাওয়া তাঁর পক্ষে সাজেও না। (৩) তিনি দাঁড়িপাল্লা উঁচু-নিচু করেন। (৪) রাতের অমল দিনের আমলের পূর্বে এবং দিবসের আমল রাতের আমলের পূর্বে তাঁর নিকট পৌঁছানো হয়। (৫) আর তার পর্দা হলো– নূর বা জ্যোতি। যদি তিনি এটা অপসারণ করে দিতেন; তাহলে তাঁর চেহারার নূর তার সৃষ্টির যে পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টি গিয়ে পৌঁছত তার সমস্তকেই জ্বালিয়ে দিত। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٨٥ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدُ اللّٰهِ مَلْاٰى لَا تَغِيْضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اَرَاَيْتُمْ مَا اَنْفَقَ مُذْ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ فَاِنَّهٗ لَمْ يَغِضْ مَا فِيْ يَدِهٖ وَكَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الْمِيْزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ يَمِيْنُ اللّٰهِ مَلْاٰى قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ مَلْاٰنُ سَحَّاءُ لَايَغِيْضُهَا شَيْءٌ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ -

৮৫. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার হাত [সম্পদে] পরিপূর্ণ; রাত-দিনের অবিরাম দানের স্রোতধারা কখনও তা হ্রাস করতে পারে না। তোমরা অবশ্যই দেখেছ; আসমান ও জামিনের সৃষ্টি হতে তিনি কতই না দান করে আসছেন, অথচ তাঁর হাতে যে সম্পদ ছিল তা হতে হ্রাস পায়নি। [সৃষ্টির পূর্বে] তাঁর আরশ পানির ওপর ছিল। তাঁর হাতেই রয়েছে [রিজিকের] দাঁড়িপাল্লা। তিনি তা উঁচু ও নিচু করেন। [তথা কম-বেশি করেন।] –[বুখারী ও মুসলিম]

আর ইমাম মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় এসেছে যে, আল্লাহর ডান হাত সর্বদা পূর্ণ রয়েছে। ইবনে নুমায়ের [ইমাম মুসলিমের ওস্তাদ] বলেন, আল্লাহর হাত [সম্পদে] পরিপূর্ণ, দিন রাতের দান তা হতে কিছুই কমাতে পারে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْاِخْتِلَافُ فِىْ حُكْمِ ذَرَارِىِّ الْمُشْرِكِيْنَ মুশরিক নাবালেগ সন্তানদের বিধানের ব্যাপারে মতভেদ : ওলামায়ে কেরাম এ কথার উপর সর্বসম্মত যে, মুসলমানদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাচ্চাগণ জান্নাতী হবে। কিন্তু কাফিরদের বাচ্চা যারা অপ্রাপ্ত বয়সে মৃত্যুবরণ করেছে। এদের সম্পর্কে ওলামাদের মাঝে মতভেদ রয়েছে—

১. কিছু সংখ্যকের মতে, তারা পিতামাতার অনুসরণে জাহান্নামে যাবে। কেননা, হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এসেছে— قُلْتُ فَذَرَارِىُّ الْمُشْرِكِيْنَ قَالَ مِنْ اٰبَائِهِمْ
হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে— عَنْ وَلَدَيْنِ مَاتَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ هُمَا فِى النَّارِ

২. অন্য একদলের মতে, তারা জান্নাতীদের খাদেম হয়ে জান্নাতে যাবে।

৩. কেউ কেউ বলেন, তারা জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করবে। তথা তারা শান্তি বা শাস্তি কোনোটাই ভোগ করবে না।

৪. আরেক দলের মতে, আল্লাহই ভাল জানেন যে, তারা জীবিত থাকলে কিরূপ আমল করত, সে অনুযায়ী তাদেরকে জান্নাত বা জাহান্নামে পাঠাবেন। যেমন রাসূল ﷺ বলেছেন— اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ

৫. কেউ কেউ বলেন, মৃত্যুর পর তাদেরকে মাটিতে পরিণত করা হবে।

৬. ইমাম মালিক ও শাফেয়ী (র.)-এর মতে, কাফিরদের বাচ্চার ব্যাপারটি আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।

৭. কারো মতে তারা জান্নাতে যাবে।

৮. ইমাম আবূ হানিফা (র.) ও অধিকাংশ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত তাদের ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করেননি। সুতরাং নিশ্চিতভাবে কোনো কিছু বলা যায় না। আল্লাহই তাদের ব্যাপারে ভালো জানেন।

---

٨٦ - وَعَنْهُ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذَرَارِىِّ الْمُشْرِكِيْنَ قَالَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৮৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মুশরিকদের শিশু সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল? জবাবে রাসূল ﷺ বললেন, [বেঁচে থাকলে] তারা কি আমল করত আল্লাহ তা'আলাই অধিকতর ভালো জানেন।−[বুখারী ও মুসলিম]

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৮৭ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ اُكْتُبْ قَالَ مَا اَكْتُبُ قَالَ اُكْتُبِ الْقَدْرَ فَكَتَبَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ اِلَى الْاَبَدِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ - وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ اِسْنَادًا -

৮৭. অনুবাদ : হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন। [সৃষ্টির পর] তিনি কলমকে বললেন, লিখ। কলম বলল, আমি কি লিখব? আল্লাহ তা'আলা বললেন, তাকদীর সম্পর্কে লিখ। অতঃপর কলম যা [বিদ্যমান] ছিল এবং অনন্তকাল পর্যন্ত যা কিছু হবে তার সব কিছুই লিখল। –[তিরমিযী] আর ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি সনদের দিক থেকে গরীব।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَقْتُ اَخْذِ الْمِيْثَاقِ مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ **বনী আদম হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করার সময়কাল :** আদম সন্তান হতে আল্লাহ তা'আলা কখন ও কোথায় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে কিছুটা মতভেদ রয়েছে—

১. কিছু সংখ্যকের মতে, এই অঙ্গীকার আলমে আরওয়াহ বা রূহ জগতে নেওয়া হয়েছে। আর তা এরূপে যে, হযরত আদম (আ.)-এর পৃষ্ঠদেশ হতে তাদেরকে বের করে তাদের নিকট থেকে আল্লাহ তা'আলা রবুবিয়্যাতের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন।

২. আরেক দলের মতে, হযরত আদম (আ.)-কে পৃথিবীতে পাঠানোর পর তাঁর সন্তানগণ হতে এ অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা আরাফাতের ময়দানে একত্রিত করে হযরত আদম (আ.)-এর সন্তানগণ হতে এই অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন।

مِنْ اَىِّ جُزْءٍ مِنَ الْجِسْمِ اُخْرِجُوْا **শরীরের কোন অংশ হতে তাদেরকে বের করা হয়েছে :** হযরত আদম (আ.)-এর শরীরের কোন অংশ হতে তাঁর সন্তানদেরকে বের করা হয়েছে। এ সম্পর্কে বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে—

১. কারো মতে, আদম (আ.)-এর পৃষ্ঠদেশ বিদীর্ণ করে তাঁর সন্তানদেরকে বের করা হয়েছে।

২. অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে, তাঁর পৃষ্ঠদেশের লোমকূপের ছিদ্র হতে তাদেরকে বের করা হয়েছে।

كَيْفِيَّةُ شَهَادَةِ بَنِىْ اٰدَمَ **বনী আদমের সাক্ষ্য দানের প্রক্রিয়া :** বনী আদম হতে আল্লাহ তা'আলার সাক্ষ্য গ্রহণের প্রক্রিয়া কেমন ছিল এ ব্যাপারে অনেক অভিমত রয়েছে।

১. কেউ কেউ বলেন, মূলত আদম সন্তানের সামনে তাওহীদ ও রাবুবিয়্যাতের প্রমাণাদি এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছিল যে, তাদের প্রত্যেকেই তা উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় এবং তিনিই সকলের প্রতিপালক। আর একেই অপ্রকৃতভাবে সাক্ষ্যদান বলা হয়েছে।

২. কারো কারো মতে, আদম সন্তানগণ সরাসরি মৌখিভাবে আল্লাহ তা'আলার রাবুবিয়্যাতের সাক্ষ্যদান করেছেন।

৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে, আল্লাহ তা'আলা সরাসরি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ তদুত্তরে তারা সমস্বরে বলেছে بَلٰى তথা হাঁ, আপনিই আমাদের প্রভু।

وَعَنْ ٨٨ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ (رحـ) قَالَ سُئِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (رضـ) عَنْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ (اَلْاٰيَةُ) قَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُسْأَلُ عَنْهَا فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هٰؤُلَاءِ لِلْجَنَّةِ وَبِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُوْنَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهٗ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هٰؤُلَاءِ لِلنَّارِ وَبِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُوْنَ فَقَالَ رَجُلٌ فَفِيْمَ الْعَمَلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ اِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ اِسْتَعْمَلَهٗ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ حَتّٰى يَمُوْتَ عَلٰى عَمَلٍ مِنْ اَعْمَالِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُدْخِلُهٗ بِهِ الْجَنَّةَ وَاِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ اِسْتَعْمَلَهٗ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ حَتّٰى يَمُوْتَ عَلٰى عَمَلٍ مِنْ اَعْمَالِ اَهْلِ النَّارِ فَيُدْخِلُهٗ بِهِ النَّارَ ـ رَوَاهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ

৮৮. **অনুবাদ :** হযরত মুসলিম ইবনে ইয়াসার (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-কে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ" অর্থাৎ [হে মুহাম্মদ ﷺ !] যখন আপনার প্রতিপালক আদম সন্তানদেরকে তাদের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের সন্তানদেরকে বের করলেন, [সূরা আরাফ, আয়াত : ১৭২] ওমর (রা.) বলেন, আমি শুনেছি, এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করা হয়। জবাবে রাসূল ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা আদমকে সৃষ্টি করলেন। অতঃপর তাঁর কুদরতের ডান হাত তার পিঠে বুলালেন, তখন তার পিঠ হতে একদল সন্তান বের করলেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা বললেন, এদেরকে আমি জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছি। আর তারা বেহেশতবাসীদের কাজই করবে। এরপর পুনরায় আল্লাহ তা'আলা আদমের পিঠে হাত বুলালেন এবং অপর একদল সন্তান বের করলেন; আর বললেন, এদেরকে জাহান্নামের জন্যই সৃষ্টি করেছি। আর তারা জাহান্নামবাসীদের কাজই করবে। অতঃপর একজন সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! [যদি এরূপই হয়] তাহলে আমলের দরকার কি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো বান্দাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন, তখন তার দ্বারা জান্নাতবাসীদের কাজই করিয়ে নেন। অবশেষে সে জান্নাতবাসীদের কাজ করেই মৃত্যুবরণ করে। ফলে আল্লাহ তা'আলা এ কারণে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। আর যখন আল্লাহ তা'আলা কোনো বান্দাকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেন তখন তার দ্বারা জাহান্নামবাসীদের কাজই করিয়ে নেন। অতঃপর সে জাহান্নামবাসীদের কাজ করেই মৃত্যুবরণ করে। আর এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করান। –[মালেক, তিরমিযী ও আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আয়াতে বলা হয়েছে, আদমের সন্তানদের পিঠ থেকে তাদের সন্তানদের বের করলেন, আর হাদীসে তার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে আদমের পিঠ থেকে তার সন্তান বের করলেন। এর অর্থ এই যে, প্রথমে আদমের নিজ সন্তানদেরকে আদমের পিঠ থেকে, তারপর সন্তানদের সন্তানদেরকে তাদের পিঠ থেকে বের করে ছিলেন। সুতরাং উক্ত আয়াত ও হাদিসের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই।

وَعَنْ ٨٩ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَفِىْ يَدَيْهِ كِتَابَانِ فَقَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا هٰذَانِ الْكِتَابَانِ قُلْنَا لَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِلَّا اَنْ تُخْبِرَنَا فَقَالَ لِلَّذِىْ فِىْ يَدِهِ الْيُمْنٰى هٰذَا كِتَابٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ فِيْهِ اَسْمَاءُ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاَسْمَاءُ اٰبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ ثُمَّ اُجْمِلَ عَلٰى اٰخِرِهِمْ فَلَا يُزَادُ فِيْهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ اَبَدًا ثُمَّ قَالَ لِلَّذِىْ فِىْ شِمَالِهِ هٰذَا كِتَابٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ فِيْهِ اَسْمَاءُ اَهْلِ النَّارِ وَاَسْمَاءُ اٰبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ ثُمَّ اُجْمِلَ عَلٰى اٰخِرِهِمْ فَلَا يُزَادُ فِيْهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ اَبَدًا فَقَالَ اَصْحَابُهُ فَفِيْمَ الْعَمَلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ كَانَ اَمْرٌ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ فَقَالَ سَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا فَاِنَّ صَاحِبَ الْجَنَّةِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِنْ عَمِلَ اَىَّ عَمَلٍ وَاِنَّ صَاحِبَ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ وَاِنْ عَمِلَ اَىَّ عَمَلٍ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدَيْهِ فَنَبَذَهُمَا ثُمَّ قَالَ فَرَغَ رَبُّكُمْ مِنَ الْعِبَادِ فَرِيْقٌ فِى الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِى السَّعِيْرِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

৮৯. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দু'হাতে দু'টি কিতাব নিয়ে বের হয়ে আসলেন এবং বললেন, তোমরা কি বলতে পার এই দু'টি কি কিতাব ? আমরা বললাম– জি-না; তবে যদি আপনি আমাদেরকে অবহিত করে দেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার ডান হাতের কিতাবের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন– এটি মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে একটি কিতাব। এতে সমস্ত জান্নাতবাসীর নাম, তাদের পিতৃপুরুষের নাম এবং বংশ (গোত্র) পরিচয় রয়েছে। এরপর এদের সর্বশেষ ব্যক্তির নামের শেষে সর্বমোট সংখ্যা যোগ করা হয়েছে। সুতরাং এতে কখনো কম বেশি করা হবে না। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার বাম হাতের কিতাবের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, এটা বিশ্ব প্রতিপালকের পক্ষ হতে একটি কিতাব। এতে সকল জাহান্নামবাসীদের নাম, তাদের বাপ-দাদার নাম এবং তাদের বংশ পরিচয় রয়েছে। এই কিতাবের শেষ ব্যক্তির নামের পর সর্বমোট সংখ্যা যোগ করা হয়েছে। সুতরাং এতে কম-বেশি কখনো করা হবে না।

অতঃপর সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ! ব্যাপারটি যদি চূড়ান্তই হয়ে থাকে, তবে আমলের দরকার কি? জবাবে রাসূল ﷺ বললেন, তোমরা সঠিক পথে থাক এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা কর। কেননা, জান্নাতবাসীর অন্তিম কর্ম জান্নাতবাসীর কাজই হবে। পূর্বে সে যে আমলই করুক না কেন। এমনিভাবে জাহান্নামবাসীর অন্তিম কর্ম জাহান্নামবাসীর কাজের মতোই হবে। পূর্বে সে যে রকম কাজই করুক না কেন ? অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ দু' হাতে ইশারা করলেন এবং কিতাব দু'টিকে রেখে দিয়ে বললেন, তোমাদের সৃষ্টিকর্তা তাঁর বান্দাদের কাজ সম্পূর্ণ করে শেষ করেছেন। ফলে একদল জান্নাতে যাবে ; আর এক দল জাহান্নামে যাবে। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

بَيَانُ كَوْنِ الْكِتَابَيْنِ فِىْ يَدَيْهِ ﷺ নবী করীম ﷺ -এর দু' হাতে দু'খানি কিতাব থাকার বর্ণনা : নবী করীম ﷺ -এর দু'হাতে দু'টি কিতাব ছিল, এর ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কেরামের মতভেদ রয়েছে–

১. মুহাদ্দেসীনে কেরামের মতে, নবী করীম ﷺ-এর হাতে মূলতঃ কোনো কিতাব ছিল না। তবে মহানবী ﷺ অদৃশ্য ব্যাপারকে এমন ভঙ্গিতে পেশ করেছেন যে, শ্রোতাদের নিকট মনে হয়েছিল যেন বাস্তবেই মহানবী ﷺ-এর হাতে দু'খানা কিতাব ছিল।

২. সুফিয়ায়ে কেরামের মতে বাস্তবিকই তখন নবী করীম ﷺ-এর হাতে দু'খানা কিতাব ছিল, যা তিনি অদৃশ্য জগত হতে লাভ করেছিলেন এবং অদৃশ্য জগতেই তা প্রেরণ করেছিলেন। নবী করীম ﷺ-এর হাতে বাস্তবেই এমন দু'খানা কিতাব বিচিত্রের কিছুই না। কেননা, তাঁর হাত ছিল মো'জেযার হাত। সহীহ হাদীসে রয়েছে তাঁর হাতে দু'খানা ভাঁজ করা কিতাব ছিল।

---

٩٠ - وَعَنْ أَبِىْ خُزَامَةَ عَنْ أَبِيْهِ (رضـ) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ رُقًى نَسْتَرْقِيْهَا وَدَوَاءً نَتَدَاوٰى بِهٖ وَتُقَاةً نَتَّقِيْهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ شَيْئًا قَالَ هِىَ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ

৯০. **অনুবাদ :** হযরত আবূ খোযামা (রা.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি একদিন বললাম– হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমরা যে মন্ত্র পাঠ করে থাকি, অথবা যে দাওয়া বা ঔষধ গ্রহণ করে থাকি অথবা অন্য কোনো পন্থায় আত্মরক্ষার চেষ্টা করে থাকি, এর মাধ্যমে কি আল্লাহর তাকদীরের কোনো প্রতিরোধ করা সম্ভব? জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের এসব চেষ্টাও আল্লাহর তাকদীরের অন্তর্গত।

–[আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আল্লাহ তা'আলা যেমন রোগ সৃষ্টি করেছেন, তেমন তার নিরাময়ের ঔষধও সৃষ্টি করেছেন। অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ إِلَّا السَّامَ অর্থ– "মৃত্যু ব্যতীত প্রত্যেক রোগেরই ঔষধ আছে"। তবে হাদীসের সারমর্ম হলো– রোগ নিরাময় বা আত্মরক্ষার জন্য বাহ্যিক হাতিয়ার ব্যবহার করাটা অন্যায় বা অপরাধ নয়। কেননা, রোগ যেমন তাক্দীরে লেখা রয়েছে তেমনি সেখানে ঐটাও লেখা আছে যে, সে অমুক ঔষধ সেবন করবে বা আত্মরক্ষার জন্য এই হাতিয়ার ব্যবহার করবে। সুতরাং ঔষধ ব্যবহার করাটা তাক্দীর বিরোধী নয় এবং তার দ্বারা তাক্দীর পরিবর্তন বা প্রতিরোধ করারও প্রশ্ন উঠে না। আর যদি তার দ্বারা নিরাময় না হয়, তখন বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আরোগ্য লাভ তার জন্য নির্ধারিত হয়নি।

حُكْمُ الرُّقْيَةِ **ঝাড়-ফুঁকের হুকুম :** মন্ত্র বা ঝাড়-ফুঁকের হুকুম সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। কোনো কোনো হাদীস দ্বারা এর বৈধতা সাব্যস্ত হয়, যেমন নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন— إِسْتَرْقُوْا لَهَا فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ আবার কোনো কোনো হাদীস দ্বারা তার অবৈধতা সাব্যস্ত হয়। যেমন– মহানবী ﷺ ইরশাদ করেন, اَلَّذِيْنَ لَا يَسْتَرْقُوْنَ وَلَا يَكْتَبُوْنَ অন্য হাদীসে আছে, وَلَا تَوَكَّلَ مَنِ اسْتَرْقٰى

সমাধান : ঝাড়-ফুঁক যদি কুরআন বা দোয়ায়ে মাছুরা ইত্যাদি বৈধ বিষয় দ্বারা হয় তাহলে তা বৈধ। তবে এগুলোকে مُؤَثِّرْ حَقِيْقِىْ মনে করবে না। مُؤَثِّرْ حَقِيْقِىْ একমাত্র আল্লাহ তা'আলা।

আর যে সকল হাদীস দ্বারা ঝাড়-ফুঁক অবৈধ বলে সাব্যস্ত হয়; সেগুলোর উত্তর এই যে, যদি ঝাড়-ফুঁককে مُؤَثِّرْ حَقِيْقِىْ বলে মনে করা হয় বা ঐ সকল দোয়া ইত্যাদিতে ইসলামি শরিয়তের বিরোধী বর্ণনা থাকে।

وَعَنْ ٩١ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِى الْقَدَرِ فَغَضِبَ حَتّٰى احْمَرَّ وَجْهُهٗ كَاَنَّمَا فُقِىَ فِىْ وَجْنَتَيْهِ حَبُّ الرُّمَّانِ فَقَالَ اَبِهٰذَا اُمِرْتُمْ اَمْ بِهٰذَا اُرْسِلْتُ اِلَيْكُمْ اِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِيْنَ تَنَازَعُوْا فِىْ هٰذَا الْاَمْرِ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ اَنْ لَا تَنَازَعُوْا فِيْهِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ - وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ نَحْوَهٗ عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ -

৯১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘর হতে বের হয়ে আমাদের নিকট আসলেন, আর আমরা তখন তাকদীর নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত ছিলাম। এতে তিনি এত বেশি রাগ করলেন যে, রাগে তাঁর চেহারা মুবারক লাল হয়ে গেল, মনে হয় যেন তাঁর উভয় চোয়ালের উপর আনারের দানা নিংড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর তিনি বললেন, (বল) তোমাদেরকে কি এরূপ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে? নাকি আমি এ নিয়ে প্রেরিত হয়েছি ? [জেনে রাখ] তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা শুধু এই বিষয়ে বিতর্ক করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে। আমি তোমাদেরকে কসম দিয়ে বলছি, পুনরায় কসম দিয়ে বলছি, সাবধান! তোমরা কখনো এ বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়ো না। –[তিরমিযী]

ইমাম ইবনে মাজাহও এরূপ একটি হাদীস আমর ইবনে শু'আইব হতে বর্ণনা করেছেন, যা তিনি তার পিতার সূত্রে তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : সাহাবীগণকে তাকদীর সম্পর্কে বিতর্ক করতে দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত রাগন্বিত হন, কেননা, তাকদীরের বিষয়টি অত্যন্ত জটিল, মানবীয় জ্ঞানে এবং নিছক যুক্তি-তর্কে তা অনুধাবণ করা যায় না; বরং এ ক্ষেত্রে যুক্তি-তর্কে লিপ্ত না হওয়াই শ্রেয়। যেহেতু অহেতুক বিতর্কে লিপ্ত হলে গোমরাহ হয়ে পড়ার আশংকা রয়েছে এবং পূর্ববর্তী উম্মতগণ তাকদীরের প্রশ্নে বাড়াবাড়ি করে বিপদগামী হয়েছে, তাই প্রত্যেকেরই উচিত তাকদীরের ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত না হয়ে অম্লান বদনে তা মেনে নেওয়া।

وَعَنْ ٩٢ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ (رض) سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَرْضِ فَجَاءَ بَنُوْ اٰدَمَ عَلٰى قَدْرِ الْاَرْضِ مِنْهُمُ الْاَحْمَرُ وَالْاَبْيَضُ وَالْاَسْوَدُ وَبَيْنَ ذٰلِكَ وَالسَّهْلُ وَالْحَزْنُ وَالْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ - رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْدَاوٗدَ

৯২. অনুবাদ : হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে এক মুষ্টি মাটি দ্বারা সৃজন করেছেন, যা তিনি সমগ্র পৃথিবী হতে গ্রহণ করেছিলেন, ফলে আদম সন্তানও মাটির বিভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে রয়েছে। তাই তাদের মধ্যে রয়েছে কেউ লাল, কেউ সাদা, আবার কেউ কালো এবং কেউ এসবের মাঝামাঝি বর্ণের। কেউ কোমল হৃদয়ের অধিকারী আর কেউ কঠোর হৃদয়ের অধিকারী। কেউ অসৎ ও কেউ সৎ প্রকৃতির। –[আহমদ, তিরমিযী ও আবূ দাঊদ]

وَعَنْ ٩٣ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ خَلْقَهٗ فِىْ ظُلْمَةٍ فَاَلْقٰى عَلَيْهِمْ مِنْ نُوْرِهٖ فَمَنْ اَصَابَهٗ مِنْ ذٰلِكَ النُّوْرِ اِهْتَدٰى وَمَنْ اَخْطَاَهٗ ضَلَّ فَلِذٰلِكَ اَقُوْلُ جَفَّ الْقَلَمُ عَلٰى عِلْمِ اللّٰهِ - رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ

৯৩. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টি জগতকে অন্ধকারের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি নিজ জ্যোতি নিক্ষেপ করেছেন, অতএব যার নিকট তাঁর এই জ্যোতি পৌঁছেছে, সে সৎপথ লাভ করেছে। আর যার প্রতি তা পৌঁছেনি, সে পথভ্রষ্ট হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এ জন্যই আমি বলেছি যে, যা কিছু হওয়ার তা আল্লাহর ইলম অনুসারে হয়ে গেছে।– [আহমদ ও তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْمُرَادُ بِالنُّوْرِ وَالظُّلُمَاتِ 'নূর' ও 'যুলুমাত' দ্বারা উদ্দেশ্য : আলোচ্য হাদীসে 'নূর' ও 'যুলুমাত' দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন মতামত প্রদান করেছেন।

১. নূর বা আলো দ্বারা সৎ কাজের যোগ্যতাকে বুঝানো হয়েছে, আর যুলুমাত বা অন্ধকার দ্বারা লোভ, হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার ইত্যাদি খারাপ স্বভাবকে বুঝানো হয়েছে।
২. নূর দ্বারা জ্ঞান এবং যুলুমাত দ্বারা মূর্খতাকে বুঝানো হয়েছে।
৩. نُوْر দ্বারা সু-প্রবৃত্তি এবং ظُلُمَات দ্বারা কু-প্রবৃত্তিকে বুঝানো হয়েছে।
৪. অথবা ظُلُمَات দ্বারা দিশাহীনতা এবং নূর দ্বারা হিদায়েত ও করুণার জ্যোতি বুঝানো হয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানদেরকে দিশেহারা অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাদের প্রতি হিদায়েতের আলো নিক্ষেপ করেছেন, ফলে তারা হিদায়েত লাভ করেছে।

وَعَنْ ٩٤ اَنَسٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكْثِرُ اَنْ يَقُوْلَ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلٰى دِيْنِكَ فَقُلْتُ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ اٰمَنَّا بِكَ وَبِمَا جِئْتَ بِهٖ فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا قَالَ نَعَمْ اِنَّ الْقُلُوْبَ بَيْنَ اِصْبَعَيْنِ مِنْ اَصَابِعِ اللّٰهِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ -

৯৪. **অনুবাদ :** হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অধিকাংশ সময় এই দোয়া পাঠ করতেন যে, হে অন্তর পরিবর্তনকারী [আল্লাহ]! আমার অন্তরকে তোমার দীনের উপর অবিচল রাখ। অতঃপর একদা আমি বললাম– হে আল্লাহর নবী ! আমরা আপনার উপর এবং আপনি যে জিনিস নিয়ে এসেছেন তার উপর ঈমান আনয়ন করেছি। আপনি কি আমাদের উপর শংকিত? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ; কেননা, সমস্ত অন্তর আল্লাহ তা'আলার দু'টি অঙ্গুলির মধ্যে অবস্থিত। তিনি যেভাবে ইচ্ছা তা পরিবর্তন করে থাকেন। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্]

وَعَنْ ٩٥ اَبِىْ مُوْسٰى (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الْقَلْبِ كَرِيْشَةٍ بِاَرْضٍ فَلَاةٍ يُقَلِّبُهَا الرِّيَاحُ ظَهْرًا لِبَطْنٍ - رَوَاهُ اَحْمَدُ

৯৫. **অনুবাদ :** হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– আল্লাহর হাতে মানুষের অন্তরের দৃষ্টান্ত শূন্য মাঠে পতিত একটি পালকের ন্যায়, যাকে প্রচণ্ড বায়ু উলটপালট করতে থাকে তথা যেদিকে ইচ্ছা ঘুরাতে থাকে। –[আহমদ]

وَعَنْ ٩٦ عَلِيٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّٰى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعٍ يَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ بَعَثَنِيْ بِالْحَقِّ وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَيُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

৯৬. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– এই চারটি বিষয়ে ঈমান না আনা পর্যন্ত কোনো বান্দা-ই ঈমানদার হতে পারে না। (১) এই সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল; সত্য সহকারে তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন। (২) মৃত্যুতে বিশ্বাস স্থাপন করা। (৩) মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে বিশ্বাস করা এবং (৪) তাকদীরের উপর বিশ্বাস করা। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

وَعَنْ ٩٧ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صِنْفَانِ مِنْ اُمَّتِيْ لَيْسَ لَهُمَا فِي الْاِسْلَامِ نَصِيْبٌ اَلْمُرْجِئَةُ وَالْقَدَرِيَّةُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ -

৯৭. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– আমার উম্মতের মধ্যে দু' দল লোক রয়েছে; যাদের জন্য ইসলামে কোনো অংশ নেই। এরা হলো মুরজিয়া ও কাদরিয়া। –[তিরমিযী]

ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, এই হাদীসটি গরীব।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَعْرِيْفُ الْمُرْجِئَةِ মুরজিয়া পরিচিতি : مُرْجِئَةٌ শব্দটি اِرْجَاءٌ বা رَجْءٌ মূলধাতু হতে নির্গত, শাব্দিক অর্থ হলো– বিলম্ব বা দেরী হওয়া। এদের تَقْدِيْر সম্পর্কীয় বিশ্বাস جَبْرِيَّةٌ দের মতোই। তাদের মূল কথা হচ্ছে–

اَلْاَفْعَالُ كُلُّهَا بِتَقْدِيْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَلَيْسَ لِلْعِبَادِ فِيْهَا اِخْتِيَارٌ فَاِنَّهٗ لَا يَضُرُّ مَعَ الْاِيْمَانِ مَعْصِيَةٌ كَمَا لَا يَنْفَعُ مَعَ الْكُفْرِ طَاعَةٌ -

অর্থাৎ, বান্দার সকল কর্ম আল্লাহর ইচ্ছায়-ই হয়ে থাকে, ভালো হোক বা মন্দ হোক, এতে বান্দার কোনো হাত নেই। সুতরাং সে যত গুনাহই করুক না কেন তাতে অপরাধী সাব্যস্ত হবে না। যেমন– কুফরি অবস্থায় ভালো কাজের কোনো মূল্য নেই।

تَعْرِيْفُ الْقَدَرِيَّةِ কদরিয়া পরিচিতি : এই শব্দটি قَدَرٌ হতে নির্গত, যার অর্থ ভাগ্যলিপি, তাদের মূল কথা হলো– اَلْعِبَادُ مُخْتَارٌ فِيْ اَفْعَالِهٖ বান্দা তার কাজে ক্ষমতাপ্রাপ্ত, তথা বান্দা নিজেই নিজের কাজের সৃষ্টিকর্তা, এতে আল্লাহর কোনো হাত নেই। এ জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সম্পর্কে বলেছেন, اَلْقَدَرِيَّةُ مَجُوْسُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ কদরিয়াগণ হলো এ উম্মতের অগ্নিপূজারী।

وَعَنْ ٩٨ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يَكُوْنُ فِيْ اُمَّتِيْ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَذٰلِكَ فِي الْمُكَذِّبِيْنَ بِالْقَدَرِ - رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهٗ

৯৮. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, আমার উম্মতের মধ্যে "খাসফ" তথা ভূমি ধ্বস ও "মাসখ" তথা আকৃতি পরিবর্তনের শাস্তি হবে, আর এটা তাকদীর অস্বীকারকারীদের মধ্যেই ঘটবে। –[আবূ দাউদ] আর ইমাম তিরমিযীও এরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

خَسْف ও مَسْخ -এর ব্যাখ্যা : خَسْف অর্থ– জমিনে ধ্বসিয়ে দেওয়া, মাটির ভিতরে পুঁতে ফেলা। আর مَسْخ অর্থ : আকৃতি পরিবর্তন করে দেওয়া। যেমন হযরত লূত (আ.)-এর আনীত বিধান লঙ্ঘন ও নৈতিক চরিত্র দোষে তাঁর নাফরমান উম্মতদেরকে ভূ-ধ্বংসের মাধ্যমে এবং হযরত দাঊদ (আ.)-এর উম্মতেরা শনিবার দিন শিকার করা নিষিদ্ধ বিধান থাকা সত্ত্বেও তাতে লিপ্ত হওয়ায় তাদের আকৃতি বানরের রূপে বিকৃত করে ধ্বংস করা হয়েছে। ঘটনা দু'টি সবিস্তারে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে।

اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْحَدِيْثَيْنِ -দু'টি হাদীসের মধ্যে অর্থগত বিরোধ : একটি হাদীসে এসেছে যে, ভূমিকে ধ্বসিয়ে দেওয়া এবং আকৃতি পরিবর্তনের গজব হতে উম্মতে মুহাম্মদী ﷺ-কে মুক্ত রাখা হয়েছে। অথচ এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, তাকদীরকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীগণ এহেন গজবে নিপতিত হবে। তা কিভাবে হবে ?

সমাধান : এ প্রশ্নের সমাধান কল্পে হাদীস বিশারদগণ নিম্নোক্ত জবাব দিয়েছেন–

১. হাদীসের অর্থ হলো– ভূমিকে ধ্বসিয়ে দেওয়া ও আকৃতি পরিবর্তনের গজব এ উম্মত হতে যদি রহিত না হতো, তবে এরূপ শাস্তির যোগ্য হতো এ উম্মতের তাকদীরকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীগণ।
২. অথবা ভূমিকে ধ্বসিয়ে দেওয়া ও আকৃতি পরিবর্তন করণের দ্বারা মূল ও গুণগত পরিবতর্নের কথা বুঝানো হয়েছে, রূপগত পরিবর্তন বুঝানো হয়নি।
৩. অথবা, খাসফ ও মাসখের শাস্তি সাধারণভাবে রহিত করা হয়েছে। সমগ্র উম্মতের উপর সাধারণভাবে আপতিত হবে না। কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তা আসবে। তার মধ্যে তাকদীরে অস্বীকারকারীদের প্রতিও এরূপ শাস্তি হবে।
৪. এ কথাও বলা হয় যে, হাদীসটি স্বল্প সংখ্যক লোকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, রহিতকরণের হাদীস বহু সংখ্যকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
৫. কতেক হাদীসশাস্ত্রবিদ এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, খাসফ ও মাসখের ন্যায় ভয়াবহ শাস্তির বর্ণনা করে তাকদীরে অবিশ্বাসীদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে। প্রকারান্তরে বলা হযেছে– তোমাদের তাকদীর অস্বীকৃতির পরিণতি খাসফ ও মাসখ ব্যতীত অন্য কিছুই নয়।
৬. অথবা হাদীসের অর্থ হলো– তাকদীরে অবিশ্বাসীগণ খাসফ ও মাসখের ন্যায় ভয়াবহ শাস্তির যোগ্য হবে।
৭. কেউ কেউ বলেন– শেষ জমানায় এরূপ শাস্তি তাকদীর অস্বীকারকারীদের হবে।
৮. অথবা, উক্ত হাদীস খাসফ ও মাসখের শাস্তি রহিতকরণের ঘোষণার পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

وَعَنْهُ ٩٩ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْقَدَرِيَّةُ مَجُوْسُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اِنْ مَرِضُوْا فَلَا تَعُوْدُوْهُمْ وَاِنْ مَاتُوْا فَلَا تَشْهَدُوْهُمْ - رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْدَاوُدَ

৯৯. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– কদরিয়াগণ হচ্ছে এ উম্মতের অগ্নি উপাসক। অতএব তারা যদি রোগাক্রান্ত হয়, তবে তাদের সেবা বা দেখতে যাবে না। আর যদি মৃত্যুবরণ করে তবে তাদের জানাযায় শরিক হবে না। –[আহমদ ও আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَعْنٰى قَوْلِهِ اَلْقَدَرِيَّةُ مَجُوْسُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ 'কদরিয়াগণ এই উম্মতের অগ্নি উপাসক" এ কথার তাৎপর্য : কদরিয়াগণকে মহানবী ﷺ মাজুসী হিসেবে ঘোষণা করেছেন, কেননা, মাজুসীদের বিশ্বাস হলো– ভালো কাজের সৃষ্টিকর্তা হলো "ইয়াযদান" আর মন্দের সৃষ্টিকর্তা "আহরুমান" তথা তারা ভালো ও মন্দের দু'জন সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী। এমনিভাবে কদরিয়াগণও আল্লাহ তা'আলাকে শুধু ভাল কাজের সৃষ্টিকর্তা আর বান্দাকে মন্দ কাজের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে বিশ্বাস স্থাপন করে, এই বিশ্বাসগত মিল থাকার কারণে তাদেরকে অগ্নিউপাসক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, যদিও বাস্তবে তারা অগ্নি উপাসনা করে না। আর অধিকাংশ ওলামার মতে তারা কাফেরও নয়; বরং ফাসেক ঈমানদার। আর এই স্থানে هٰذِهِ الْاُمَّةِ দ্বারা اُمَّةُ اِجَابَةٍ -কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

وَعَنْ ١٠٠ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُجَالِسُوْا اَهْلَ الْقَدَرِ وَلَا تُفَاتِحُوْهُمْ ـ رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ

১০০. অনুবাদ : হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, তোমরা কদরিয়াদের সাথে উঠা-বসা করো না এবং তাদেরকে কোনো ব্যাপারে সালিশদারও নিযুক্ত করো না।–[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে মহানবী ﷺ কাদরিয়া সম্প্রদায়কে সামাজিকভাবে বয়কট করার আদেশ দিয়েছেন, যাতে করে তারা সামাজিক জীবনে এক ঘরে হয়ে পড়ার কারণে নিজেদের ভ্রান্ত মতবাদ হতে তওবা করে খাটি মু'মিন হয়ে যায়।

لَا تُفَاتِحُوْهُمْ-এর অর্থ : উক্ত হাদীসে لَا تُفَاتِحُوْهُمْ-এর অর্থ হল لَا تَحَاكَمُوْا اِلَيْهِمْ অর্থাৎ তোমরা তাদের নিকট কোনো বিচার ফয়সালা নিয়ে যাবে না এবং সালিশদারও নিযুক্ত করবে না।

وَعَنْ ١٠١ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سِتَّةٌ لَعَنْتُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَكُلُّ نَبِيٍّ يُجَابُ الزَّائِدُ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ وَالْمُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللّٰهِ وَالْمُتَسَلِّطُ بِالْجَبَرُوْتِ لِيُعِزَّ مَنْ اَذَلَّهُ اللّٰهُ وَيُذِلَّ مَنْ اَعَزَّهُ اللّٰهُ وَالْمُسْتَحِلُّ لِحَرَمِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِىْ مَاحَرَّمَ اللّٰهُ وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِىْ ـ رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ فِى الْمَدْخَلِ وَ رَزِيْنٌ فِىْ كِتَابِهٖ

১০১. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— ছয় ব্যক্তি এমন রয়েছে যাদের প্রতি আমি অভিসম্পাত করি এবং আল্লাহ তা'আলাও তাদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করেন। বস্তুত প্রত্যেক নবীর দোয়া কবুল হয়ে থাকে। [সে ছয় ব্যক্তি হচ্ছে] (১) যে আল্লাহর কিতাবে অতিরিক্ত কিছু সংযোগ করে। (২) আল্লাহর তাকদীরকে অস্বীকারকারী। (৩) জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী, সে এই উদ্দেশ্যে ক্ষমতা দখল করে যে, আল্লাহ যাকে অপমানিত করেছেন তাকে যেন সে সম্মান দিতে পারে এবং আল্লাহ যাকে সম্মানিত করেছেন তাকে যেন সে অপমান করতে পারে। (৪) যে ব্যক্তি আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজকে হালাল বা বৈধ মনে করে তথা হারাম শরীফের ভিতর নিষিদ্ধ কাজ করে। (৫) যে আমার বংশধরকে কষ্ট দেওয়া বৈধ মনে করে যা আল্লাহ হারাম করেছেন এবং (৬) আমার সুন্নত পরিত্যাগকারী। –[বায়হাকী ও রাযীন]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে মহানবী ﷺ ছয় প্রকারের লোকের উপর অভিসম্পাত করেছেন, আর আল্লাহও যে তাদের উপর অভিসম্পাত করেন ; তা উল্লেখ করেছেন, তারা হলো–

১. যে ব্যক্তি আল্লাহর কালামে এমন শব্দ নিজের পক্ষ হতে সংযোজন করে, অথবা এমন অর্থ বর্ণনা করে, যা আল্লাহর উদ্দেশ্যের পরিপন্থি।
২. যে ব্যক্তি তাকদীরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তার বিরুদ্ধে বুদ্ধি বা যুক্তি উপস্থাপন করে।
৩. যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানদেরকে মর্যাদা দেয় ; পক্ষান্তরে আল্লাহওয়ালা নিরীহ নেক্কারদেরকে তুচ্ছ ও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে।
৪. মক্কার হেরেমের অভ্যন্তরে যে কাজ করা হারাম সেখানে যে ব্যক্তি এমন কাজ করাকে হালাল মনে করে। যেমন শিকার করা, অন্যকে কষ্ট দেওয়া ইত্যাদি।

৫. আমার বংশধর তথা বনু হাশেমকে সাধারণ লোকের মতো ধারণা করে মর্যাদা দেয় না বা আমার বংশের কোনো লোক 'সায়্যেদ' হয়েও কোনো হারাম কাজকে হালাল মনে করে। এই কথার দ্বারা মহানবী ﷺ নিজের খান্দানের লোকদেরকে সতর্কতা প্রদর্শন করেছেন, যেন তারা যে কোনো ধরনের পাপে লিপ্ত না হয়।

৬. আমার যে কোনো সুন্নতকে সম্পূর্ণভাবে কিংবা কোনো একটি সুন্নতের অংশকে হাসি-ঠাট্টা করে বা কম গুরুত্ব দান করে উড়িয়ে দেয় বা তার প্রতি বিদ্রূপ করে, সে কঠোরভাবে লা'নত প্রাপ্ত হবে।

وَعَنْ ١٠٢ مَطَرِ بْنِ عُكَامِسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا قَضَى اللّٰهُ لِعَبْدٍ أَنْ يَّمُوْتَ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً ـ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ ـ

১০২. অনুবাদ : হযরত মাতার ইবনে উকামেস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো বান্দার মৃত্যু কোনো নির্দিষ্ট স্থানে অবধারিত করে রাখেন তখন সে জায়গায় যাওয়ার ব্যাপারে তাকে কোনো প্রয়োজন সৃষ্টি করে দেন। –[আহমদ ও তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : বান্দার জন্য মৃত্যু যেরকম অবধারিত, তেমনিভাবে মৃত্যুর স্থানও নির্ধারিত সে নির্দিষ্ট স্থানেই মৃত্যুবরণ করে। এর ব্যতিক্রম হয় না। সে জায়গা বহুদূরে হলেও আল্লাহ তার মৃত্যুর পূর্বে সে স্থানে তার জন্য কোনো প্রয়োজন সৃষ্টি করে দেন। এ জন্যই কুরআনে এসেছে, وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তিই জানে না যে, সে কোন জমিনে মৃত্যু বরণ করবে।

وَعَنْ ١٠٣ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ذَرَارِىُّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ مِنْ اٰبَائِهِمْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِلَا عَمَلٍ قَالَ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ قُلْتُ فَذَرَارِىُّ الْمُشْرِكِيْنَ قَالَ مِنْ اٰبَائِهِمْ قُلْتُ بِلَا عَمَلٍ قَالَ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ ـ رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ

১০৩. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ! মু'মিনদের নাবালেগ সন্তানদের কি হবে ? [তথা তারা কি জান্নাতী হবে? নাকি জাহান্নামী?] নবী করীম ﷺ বললেন, তারা তাদের পিতাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। অতঃপর আমি বললাম– হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ! কোনো আমল ব্যতীতই? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তারা বেঁচে থাকলে কি আমল করত ; তা আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন। পুনঃরায় আমি জিজ্ঞেস করলাম যে, মুশরিকদের নাবালেগ সন্তানদের কি হুকুম? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তারাও তাদের পিতাদের অন্তর্গত, আমি বললাম– কোনো [মন্দ] আমল ব্যতীতই? মহানবী ﷺ বললেন, তারা বেঁচে থাকলে কি আমল করত তা আল্লাহ তা'আলাই অধিকতর অবগত রয়েছেন। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসটিতে কাফের মুশরিকদের সন্তানদের ব্যাপারে যে বিধান আলোচিত হয়েছে তা আল্লাহর বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বের হাদীস।

وَعَنْ ١٠٤ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْوَائِدَةُ وَالْمَوْؤُدَةُ فِى النَّارِ . رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ

১০৪. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, জীবন্ত দাফনকারিণী এবং জীবন্ত কবরস্থ উভয়ই জাহান্নামী হবে। -[আবূ দাউদ ও তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

سَبَبُ اِرْشَادِ الْحَدِيْثِ **হাদীস বর্ণনার প্রেক্ষাপট** : বর্ণিত আছে যে, জাহেলী যুগে আরবের লোকেরা কন্যা সন্তান জন্ম নেওয়াকে দারিদ্র ও লজ্জার কারণ বলে মনে করত, তারা দারিদ্র ও লজ্জা হতে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে তাদেরকে জীবন্ত কবর দিত, পবিত্র কুরআনেও এই বিষয়ে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে,

وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّ هُوَ كَظِيْمٌ . يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ . اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ . (النحل .)

এই কু-প্রথা দীর্ঘদিন থেকে চলছিল, উল্লেখিত কু-প্রথা নির্মূল করার লক্ষ্যেই রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

اَلْحِكْمَةُ فِىْ تَعْذِيْبِ الْمَوْؤُدَةِ **জীবন্ত দাফনকৃতাকে শাস্তি দেওয়ার যৌক্তিকতা** : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, জীবন্ত দাফনকারিণী ও জীবন্ত কবরস্থ উভয়ই জাহান্নামে যাবে, এখন প্রশ্ন হলো যে, জীবন্ত দাফনকারিণী তো তার কুকর্মের কারণে জাহান্নামে যাবে। কিন্তু জীবন্ত কবরস্থ কেন জাহান্নামে যাবে ? এর জবাব সম্পর্কে হাদীস বিশারদগণ নিম্নোক্ত মতামত পেশ করেছেন—

১. দাফনকারিণী কুফরি কর্মের কারণে জাহান্নামে যাবে। আর দাফনকৃতা তার পিতা-মাতার অনুগামী হয়ে জাহান্নামে যাবে। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী হাদীসটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুশরিকদের সন্তানরা জাহান্নামে যাবে।
২. অথবা দাফনকারিণী দ্বারা উদ্দেশ্য ধাত্রী আর দাফনকৃতা দ্বারা উদ্দেশ্য اَلْمَوْؤُدَةُ لَهَا -অর্থাৎ, দাফনকৃতার মা। যেহেতু দাফনকার্যে তাঁরা উভয়েই অংশীদার; তাই উভয়েই জাহান্নামে যাবে। কেননা ধাত্রী মায়ের নির্দেশেই সন্তানকে দাফন করেছে।
৩. অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপরোক্ত উক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে, দাফনকৃতা মেয়েটি বালেগা হওয়ার পরে কুফরি অবলম্বন করার কারণে জাহান্নামে যাবে। এ ব্যাখ্যা হিসেবে মেয়েদেরকে বালেগা হওয়ার পর জীবন্ত গোরস্থ করা হতো বলে মেনে নিতে হবে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٠٥ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَغَ اِلٰى كُلِّ عَبْدٍ مِنْ خَلْقِهٖ مِنْ خَمْسٍ مِنْ اَجَلِهٖ وَعَمَلِهٖ وَمَضْجَعِهٖ وَاَثَرِهٖ وَرِزْقِهٖ . رَوَاهُ اَحْمَدُ

১০৫. অনুবাদ : হযরত আবুদ্দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন- আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিকূলের মধ্যে প্রত্যেক বান্দার পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে চূড়ান্তভাবে ফয়সালা করে রেখেছেন। (১) তার মৃত্যু তথা বয়স। (২) তার কর্মকাণ্ড। (৩) তার থাকার স্থান বা মৃত্যুস্থান। (৪) তার চলাফেরা এবং (৫) তার রিজিক।-[আহমদ]

وَعَنْ ١٠٦ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ تَكَلَّمَ فِىْ شَىْءٍ مِّنَ الْقَدَرِ سُئِلَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَمَنْ لَّمْ يَتَكَلَّمْ فِيْهِ لَمْ يُسْئَلْ عَنْهُ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

১০৬. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি তাকদীর সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, কিয়ামতের দিন তাকে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। আর যে ব্যক্তি সে সম্পর্কে নীরব থাকে, তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না। –[ইবনে মাজাহ্]

وَعَنْ ١٠٧ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ (رحـ) قَالَ اَتَيْتُ اُبَىَّ ابْنَ كَعْبٍ (رضـ) فَقُلْتُ لَهُ قَدْ وَقَعَ فِىْ نَفْسِىْ شَىْءٌ مِّنَ الْقَدَرِ فَحَدِّثْنِىْ لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يُّذْهِبَهُ مِنْ قَلْبِىْ فَقَالَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ عَذَّبَ اَهْلَ سَمٰوَاتِهِ وَاَهْلَ اَرْضِهِ عَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَّهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْ اَعْمَالِهِمْ وَلَوْ اَنْفَقْتَ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَاقَبِلَهُ اللّٰهُ مِنْكَ حَتّٰى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ وَتَعْلَمَ اَنَّ مَا اَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَاَنَّ مَا اَخْطَاَكَ لَمْ يَكُنْ لِّيُصِيْبَكَ وَلَوْ مُتَّ عَلٰى غَيْرِ هٰذَا لَدَخَلْتَ النَّارَ قَالَ ثُمَّ اَتَيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ قَالَ ثُمَّ اَتَيْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ فَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ اَتَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَحَدَّثَنِىْ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَ ذٰلِكَ. رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْدَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

১০৭. অনুবাদ : [তাবেয়ী] আবূ আব্দুল্লাহ ফাইরূয ইবনুদ দাইলামী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– আমি একদা উবাই ইবনে কা'ব (রা.) -এর নিকট গিয়ে বললাম, [হে কা'ব] তাকদীর সম্পর্কে আমার মনে একটা খটকা সৃষ্টি হয়েছে, কাজেই এই সম্পর্কে আমাকে কিছু বলুন, আশা করি, এতে আল্লাহ তা'আলা আমার মনের সে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর করে দিবেন, জবাবে তিনি বলেন, যদি আল্লাহ তা'আলা আসমান-জমিনের অধিবাসীদেরকে শাস্তি দিতে চান তবে দিতে পারেন, এতে তিনি জালেম বলে গণ্য হবেন না।

অপরদিকে তিনি যদি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন তাহলে তাঁর এ করুণা হবে তাদের আমল অপেক্ষা অধিকতর উত্তম। কাজেই তুমি যদি উহুদ পরিমাণ স্বর্ণও আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে, তবে তা আল্লাহ তা'আলা কবুল করবেন না; যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তাকদীরের উপর বিশ্বাস স্থাপন না করবে। আর যতক্ষণ না তুমি এ কথাও বিশ্বাস করবে যে, তোমার ব্যাপারে যা কিছু ঘটেছে ; তা কখনও তোমাকে এড়িয়ে যাওয়ার মতো ছিল না। আর যা কিছু ঘটেনি; তা কখনো তোমাকে স্পর্শ করার মতো ছিল না। আর অন্তরে এই বিশ্বাস ব্যতীত যদি তোমার মৃত্যু হয় তবে অবশ্যই তুমি জাহান্নামে প্রবেশ করবে। হযরত ইবনে দাইলামী (র.) বলেন, অতঃপর আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) -এর নিকট আসলাম [এবং তাঁকেও এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম] তিনিও অনুরূপ জবাব দিলেন। এরপর আমি হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা.) -এর নিকট আসলাম এবং তিনিও এরূপ জবাব দিলেন। অবশেষে আমি হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.)-এর নিকট আসলাম, আর তিনিও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হতে শ্রবণ করা এরূপ হাদীসই আমার নিকট বর্ণনা করলেন।–[আহমদ, আবূ দাঊদ ও ইবনে মাজাহ্]

وَعَنْ ١٠٨ نَافِعٍ (رحـ) اَنَّ رَجُلًا اَتَى ابْنَ عُمَرَ (رضـ) فَقَالَ اِنَّ فُلَانًا يَقْرأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ فَقَالَ اِنَّهُ بَلَغَنِىْ اَنَّهُ قَدْ اَحْدَثَ فَاِنْ كَانَ قَدْ اَحْدَثَ فَلَا تُقْرِئْهُ مِنِّى السَّلَامَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يَكُوْنُ فِىْ اُمَّتِىْ اَوْ فِىْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ اَوْ قَذْفٌ فِىْ اَهْلِ الْقَدَرِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْدَاوُد وَابْنُ مَاجَةَ . وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ .

১০৮. অনুবাদ : হযরত নাফে' (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর নিকট এসে বলল, অমুক ব্যক্তি আপনার নিকট সালাম পাঠিয়েছেন, [এ কথা শুনে] হযরত ইবনে ওমর (রা.) বললেন, আমার নিকট এই খবর পৌঁছেছে যে, সে নাকি দীনের মধ্যে নতুন কিছু সৃষ্টি করেছে। যদি সে দীনের মধ্যে নতুন কিছু সৃষ্টি করে থাকে, তবে আমার পক্ষ হতে তার নিকট সালামের জবাব পৌঁছাবে না। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন–আমার উম্মতের অথবা এ উম্মতের মধ্যে তাকদীর অবিশ্বাসকারীদের উপর ভূ-ধ্বস, আকৃতি-পরিবর্তন ও পাথর নিক্ষেপের শাস্তি হবে।

–[তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

আর ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ গরীব।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ-এর ব্যাখ্যা : ইমাম তিরমিযী (র.) আলোচ্য হাদীসটি বর্ণনার পর বলেছেন, هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ এই হাদীসটি হাসান সহীহ গরীব। অথচ উসূল বিদগণের মতে غَرِيْبٌ হলো حَسَنٌ হতে নিম্নস্তরের; আর حَسَنٌ হলো صَحِيْحٌ হতে নিম্ন স্তরের। সুতরাং স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠে যে, বিভিন্ন স্তরের তিনটি বিশেষণ একই হাদীসে একত্রিত হলো কিভাবে?

হাদীস বিশারদগণ উক্ত প্রশ্নের নিম্নোক্ত মতামত পেশ করেছেন–

১. হাদীসটি দু'সনদে বর্ণিত হয়েছে। এক সনদ হিসেবে 'হাসান' আর অন্য সনদ হিসেবে 'সহীহ' তাই বলা হয়েছে–حَسَنٌ صَحِيْحٌ

২. অথবা, 'হাসান' শব্দটি আক্ষরিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, আর সহীহ শব্দটি পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আক্ষরিক অর্থে 'হাসান' বলা হয় ঐ বস্তুকে যার দিকে মন আকৃষ্ট হয় এবং বিবেক তা গ্রহণে অস্বীকার করে না। আর পারিভাষিক অর্থে সহীহ বলা হয় ঐ হাদীসকে যার সনদে ধারাবাহিকতা বিদ্যমান, যা বর্ণনা করেছে ন্যায়পরায়ণ প্রখর স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি এবং যার বর্ণনাকারীর সংখ্যা কোনো স্তরেই একজন না হয়।

৩. হাফিয ইমাদুদ্দীন ইবনে কাছীর (র.) বলেন, কিছু সংখ্যক হাদীস রয়েছে যা সনদের দিক দিয়ে উচ্চ স্তরের; তা হলো সহীহ। আর কিছু সংখ্যক হাদীস রয়েছে যা সনদের দিক দিয়ে নিম্নস্তরের তা হলো হাসান। আর কিছু সংখ্যক হাদীস রয়েছে, যা এক সনদে হাসান ও অন্য সনদে সহীহ।

৪. অথবা, হাদীস বিশারদদের মধ্যে দ্বিধা রয়েছে যে, হাদীসটি 'হাসান' নাকি সহীহ; তাই তিনি حَسَنٌ صَحِيْحٌ বলেছেন। এখানে সন্দেহ সূচক অব্যয় اَوْ টি ছিল, পরবর্তীতে বিলুপ্ত করা হয়েছে।

৫. অথবা حَسَنٌ দ্বারা حَسَنٌ لِذَاتِهِ এবং صَحِيْحٌ দ্বারা صَحِيْحٌ لِغَيْرِهِ উদ্দেশ্য।

৬. অথবা, এর মর্ম এই যে, হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে হাসান। আর সহীহ বলা হয়েছে এ হিসেবে যে, এ অধ্যায়ের মধ্যে এটিই বিশুদ্ধতম হাদীস।

৭. বর্ণনাকারীর মধ্যে বিভিন্ন গুণ থাকে যার একটি অন্যটি অপেক্ষা উচ্চ স্তরের। সুতরাং নিম্নস্তরের গুণ তথা সত্যবাদিতার দিক দিয়ে 'হাসান' বলা হয়েছে। আর উচ্চস্তরের গুণ তথা স্মৃতিশক্তির দিক দিয়ে 'সহীহ' বলা হয়েছে।

৮. অথবা, ইমাম তিরমিযী (র.)-এর গবেষণা অনুযায়ী তা 'হাসান' এবং অন্যদের মতে 'সহীহ'।

৯. অথবা, ইমাম তিরমিযী (র.)-এর গবেষণা অনুযায়ী হাদীসটি 'সহীহ' এবং অন্যদের মতে 'হাসান'।

১০. অথবা, সনদের দিক দিয়ে 'হাসান' এবং হুকুমের দিক দিয়ে 'সহীহ'।

১১. কারো মতে حَسَنٌ ও صَحِيْحٌ উভয়টি হওয়ার কারণে তিনি তৃতীয় একটি প্রকার বের করেছেন যাকে حَسَنٌ صَحِيْحٌ বলা হয়, যেমন- মিষ্টি ও টক মিলিত হয়ে তৃতীয় একটি টক-মিষ্টি বস্তু হয়।

১২. কারো মতে উভয় শব্দ مُرَادِفٌ তাই দ্বিতীয় শব্দ তথা صَحِيْحٌ কে تَاكِيْد -এর জন্য নেওয়া হয়েছে, যেমন বলা হয়, صَحِيْحٌ ثَابِتٌ
حَسَنٌ ও صَحِيْحٌ -এর সাথে غَرِيْبٌ মিলিত হওয়ার কারণ : উল্লেখ্য যে, غَرِيْبٌ দু' প্রকার : (১) غَرِيْبٌ مِنْ جِهَةِ الْمَتَنِ মতনের দিক থেকে গরীব। (২) غَرِيْبٌ مِنْ جِهَةِ السَّنَدِ সনদের দিক থেকে গরীব।
অতএব হাদীসটি মতনের দিক থেকে حَسَنٌ অথবা صَحِيْحٌ এবং সনদের দিক থেকে غَرِيْبٌ সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, এখানে غَرِيْبٌ দ্বারা দ্বিতীয় প্রকার উদ্দেশ্য।

وَعَنْ ١٠٩ عَلِيٍّ (رضـ) قَالَ سَأَلَتْ خَدِيْجَةُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ وَلَدَيْنِ مَاتَا لَهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُمَا فِي النَّارِ قَالَ فَلَمَّا رَاَى الْكَرَاهَةَ فِيْ وَجْهِهَا قَالَ لَوْ رَأَيْتِ مَكَانَهُمَا لَأَبْغَضْتِهِمَا قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَوَلَدِيْ مِنْكَ قَالَ فِي الْجَنَّةِ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ اَوْلَادَهُمْ فِي الْجَنَّةِ وَاِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ وَ اَوْلَادَهُمْ فِي النَّارِ ثُمَّ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ . رَوَاهُ اَحْمَدُ

১০৯. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত খাদীজা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জাহিলিয়া যুগে তার যে দু'টি সন্তান মৃত্যুবরণ করেছিল সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তারা উভয়েই জাহান্নামী। হযরত আলী (রা.) বলেন, [এ কথার পর] রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বিবি খাদীজার মুখমণ্ডলে অসন্তোষের ভাব প্রত্যক্ষ করলেন, তখন বললেন, [হে খাদীজা!] তুমি যদি জাহান্নামে তাদের অবস্থা দেখতে পেতে তাহলে অবশ্যই তাদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করতে। অতঃপর হযরত খাদীজা (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনার ঘরে আমার যে সন্তান জন্ম নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে, তার অবস্থা কি হবে? জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে জান্নাতে রয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, মু'মিন এবং তাদের সন্তানগণ জান্নাতের অধিবাসী, আর মুশরিক ও তাদের সন্তানগণ জাহান্নামের অধিবাসী। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করলেন- وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ اَلْحَقْنَابِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তানগণ তাদের পথ অনুসরণ করেছে, তাদের সাথে তাদের সে সকল সন্তানদেরকে মিলিত করে দেব। -[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حَيَاةُ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ خَدِيْجَةَ الْكُبْرٰى (رضـ) উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা (রা.)-এর জীবনী :

১. **নাম ও পরিচিতি :** নাম খাদীজা, উপনাম উম্মুল হিন্দ, উপাধি তাহিরা। পিতার নাম খুওয়াইলিদ, মাতার নাম ফাতেমা।

২. **জন্ম ও নসবনামা :** তিনি عَامُ الْفِيْلِ-এর ১৫ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বংশ পরিচয় হলো, খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ ইবনে আসাদ ইবনে আবদুল উয্যা ইবনে কুসাই। কুসাই পর্যন্ত পৌছে তাঁর বংশ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বংশের সাথে মিলে যায়।

৩. **মহানবী ﷺ-এর সাথে বিবাহ :** হযরত খাদীজা (রা.) নবী করীম ﷺ-এর ব্যবসা পরিচালনায় সততা ও চারিত্রিক সৌন্দর্য দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিবাহের প্রস্তাব প্রদান করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চাচা আবূ তালিবের পরামর্শে পাঁচশ' স্বর্ণমুদ্রা মোহর ধার্য করে তাকে বিবাহ করেন। তখন নবী করীম ﷺ-এর বয়স ছিল ২৫ বছর আর হযরত খাদীজা (রা.)-এর বয়স ছিল ৪০ বছর। এর পূর্বে হযরত খাদীজা (রা.)-এর আরও দু'টি বিবাহ হয়েছিল।

৪. **ইসলাম গ্রহণ :** রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়তপ্রাপ্তির সাথে সাথে হযরত খাদীজা (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। মহিলাদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন।

৫. **রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঔরষজাত সন্তান :** রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বিবাহ হওয়ার পর তাঁর মোট ৬ জন সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। তাঁরা হলেন, (১) কাসেম (২) আব্দুল্লাহ [ইনিই তাহের ও তৈয়্যব নামে খ্যাত], (৩) যয়নব, (৪) রুকাইয়া, (৫) কুলসুম ও (৬) ফাতেমা।

৬. **ইন্তেকাল :** নবুয়তের দশম সনের ১১ ই রমযান ৬৪ বছর ৬ মাস বয়সে হযরত খাদীজা (রা.) ইহধাম ত্যাগ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বিবাহের পর ২৫ বছর জীবিত ছিলেন।

৭. **দাফন :** মহানবী ﷺ স্বহস্তে তাঁকে 'জুহুন' নামক স্থানে সমাহিত করেন।

وَعَنْ ١١٠ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمَ مَسَحَ ظَهْرَهٗ فَسَقَطَ عَنْ ظَهْرِهٖ كُلُّ نَسَمَةٍ هُوَ خَالِقُهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهٖ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنَىْ كُلِّ اِنْسَانٍ مِنْهُمْ وَبِيْصًا مِّنْ نُوْرٍ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلٰى اٰدَمَ فَقَالَ اَىْ رَبِّ مَنْ هٰؤُلَاءِ قَالَ ذُرِّيَّتُكَ فَرَاٰى رَجُلًا مِّنْهُمْ فَاَعْجَبَهٗ وَبِيْصُ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ قَالَ اَىْ رَبِّ مَنْ هٰذَا قَالَ دَاؤُدُ فَقَالَ اَىْ رَبِّ كَمْ جَعَلْتَ عُمْرَهٗ قَالَ سِتِّيْنَ سَنَةً قَالَ رَبِّ زِدْهُ مِنْ عُمْرِىْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً

১১০. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা যখন আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করে তার পিঠের উপর হাত বুলিয়ে দিলেন, তখন তার পৃষ্ঠদেশ হতে তার সকল সন্তান, যাদেরকে তিনি কিয়ামত পর্যন্ত সৃষ্টি করবেন, বের হয়ে পড়ল। আর তাদের প্রত্যেকের দু'চোখের মধ্যবর্তী স্থানে একটি নূরের শুভ্র জ্যোতি সৃষ্টি করলেন। অতঃপর তাদেরকে আদম (আ.)-এর সম্মুখে পেশ করলেন। আদম (আ.) বললেন, হে প্রভু এরা কারা ? আল্লাহ তা'আলা বললেন, এরা তোমার সন্তান। এমন সময় আদম (আ.) তাঁর সন্তানদের মধ্য হতে একজনকে দেখলেন তথা তার দৃষ্টি একজনের উপর পড়ল। উক্ত ব্যক্তির দু'চোখের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত জ্যোতি দেখে তিনি অভিভূত হন। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে প্রভু! এ লোকটি কে ? আল্লাহ তা'আলা বললেন– সে [তোমারই সন্তান] দাউদ। অতঃপর আদম (আ.) আল্লাহ তা'আলাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি তার বয়স কত নির্ধারণ করেছেন ? মহান আল্লাহ বললেন– ষাট বৎসর। হরযরত আদম (আ.) বললেন, হে রব! আমার

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا انْقَضٰى عُمُرُ اٰدَمَ اِلَّا اَرْبَعِيْنَ جَاءَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ فَقَالَ اٰدَمُ اَوَ لَمْ يَبْقَ مِنْ عُمُرِيْ اَرْبَعُوْنَ سَنَةً قَالَ اَوَ لَمْ تُعْطِهَا اِبْنَكَ دَاوُدَ فَجَحَدَ اٰدَمُ فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ وَنَسِيَ اٰدَمُ فَاَكَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ وَخَطَأَ اٰدَمُ وَخَطَأَتْ ذُرِّيَّتُهُ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

বয়স হতে চল্লিশ বৎসর তাকে দিয়ে তার বয়স বৃদ্ধি করে দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এই চল্লিশ বৎসর ব্যতীত হযরত আদম (আ.)-এর বয়স যখন শেষ হয়ে গেল, তখন তাঁর নিকট মউতের ফেরেশতা এসে উপস্থিত হলো। হযরত আদম (আ.) তাকে দেখে বললেন, আমার বয়সের কি আরও চল্লিশ বৎসর অবশিষ্ট নেই ? ফেরেশতা বলল, আপনি কি আপনার সন্তান দাউদকে তা দান করেননি। [নবী করীম ﷺ বললেন,] আদম (আ.) [ভুলে যাওয়ার কারণে] এটা অস্বীকার করলেন। এ জন্য তার সন্তানগণও অস্বীকার করে। আর আদম (আ.) ভুলে গিয়েছিলেন এবং নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে ফেলেন। ফলে তার সন্তানগণও ভুলে যায়। আর আদমের ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছে। এ কারণে তার সন্তানদেরও ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে থাকে। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

অপরকে বয়স দেওয়া কিভাবে সম্ভব হলো : আলোচ্য হাদীস থেকে বুঝা যায়, হযরত আদম (আ.) হযরত দাউদ (আ.)-কে আয়ু দান করেছেন। এটা কিভাবে সম্ভব হলো তা নিম্নে প্রদত্ত হলো—

১. হযরত আদম (আ.) হযরত দাউদ (আ.)-এর আয়ু বৃদ্ধি করার জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করেছিলেন। আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা কবুল করেছেন।

২. হযরত আদম (আ.) কর্তৃক হযরত দাউদ (আ.)-কে আয়ু দান মূলত তাকদীরে মু'আল্লাকের ভিত্তিতে; যা কবুল হওয়া সম্ভব।

৩. আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি বৈচিত্রময়। তিনি মানুষকে অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তাঁর দ্বারা অন্যকে আয়ু দানও সম্ভব।

كَيْفَ اُخْرِجَ ذُرِّيَّةُ اٰدَمَ وَاَيْنَ কোথায় এবং কিভাবে আদম সন্তানদেরকে বের করা হলো হযরত আদম (আ.) হতে আদম সন্তান বের করার স্থান : আদম সন্তান বের করার ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন–

১. অধিকাংশ হাদীস বিশারদদের মতে, রূহের জগতে বের করা হয়েছিল।

২. কারো কারো মতে, হযরত আদম (আ.)-কে দুনিয়ায় পাঠানোর পর তাঁর সন্তান বের করা হয়েছিল।

৩. কারো কারো মতে, আরাফার না'মান নামক স্থানে বের করা হয়েছিল।

কিভাবে বের করা হয়েছিল :

কিভাবে বের করা হয়েছিল তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যেমন–

১. কারো মতে, পিঠ ফাটিয়ে।

২. কেউ কেউ বলেন, মাথার চুলের গোড়া ছিদ্র করে সেখান থেকে।

৩. আবূ তাহের কাজবীনী বলেন, পিঠের পশমের গোড়া থেকে বের করা হয়েছিল।

اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْحَدِيْثَيْنِ দু'টি হাদীসের অর্থগত বিরোধ :

হযরত আবূ হুরায়রা বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত আদম (আ.) আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁর বয়স হতে চল্লিশ বৎসর প্রদান করার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু বাবুস সালামের এক বর্ণনায় এসেছে, ষাট বৎসর প্রদান করার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন।

সমাধান : উভয় বর্ণনার বিরোধ সমাধানের লক্ষ্যে বলা যায় যে, হযরত আদম (আ.) প্রথমত চল্লিশ বৎসর প্রদান করার জন্য দোয়া করেছিলেন। অতঃপর পুনঃ বিশ বৎসর প্রদান করেছেন, ফলে মোট ষাট বৎসর হলো। পরের বিশ বৎসর স্মরণ ছিল না বিধায় এখানে চল্লিশ বৎসরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

وَعَنْ ١١١ أَبِى الدَّرْدَاءِ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمَ حِيْنَ خَلَقَهُ فَضَرَبَ كَتِفَهُ الْيُمْنٰى فَاَخْرَجَ ذُرِّيَّتَهُ بَيْضَاءَ كَاَنَّهُمُ الذَّرُّ وَضَرَبَ كَتِفَهُ الْيُسْرٰى فَاَخْرَجَ ذُرِّيَّةً سَوْدَاءَ كَاَنَّهُمُ الْحُمَمُ فَقَالَ لِلَّذِىْ فِىْ يَمِيْنِهِ اِلَى الْجَنَّةِ وَلَا اُبَالِىْ وَقَالَ لِلَّذِىْ فِىْ كَتِفِهِ الْيُسْرٰى اِلَى النَّارِ وَلَا اُبَالِىْ ـ رَوَاهُ اَحْمَدُ

১১১. অনুবাদ : হযরত আবুদ দারদা (রা.) মহানবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন– আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করলেন [যখন তিনি সৃষ্টি করলেন তখন তার ডান কাঁধের উপর তাঁর (কুদরতের) হাত দ্বারা] আঘাত করলেন এবং ক্ষুদ্রকায় পিপীলিকার ন্যায় একদল শুভ্রকায় আদম সন্তান বের করলেন। এমনিভাবে তার বাম কাঁধের উপরও আঘাত করলেন এবং কয়লার ন্যায় কালো একদল সন্তান বের করলেন। অতঃপর ডান দিক হতে নির্গত দলের প্রতি নির্দেশ করে বললেন– এরা জান্নাতী। এতে আমি কারও পরোয়া করি না। এরপর বামদিক হতে বেরকৃত দলের প্রতি নির্দেশ করে বললেন–এরা জাহান্নামবাসী। এতে আমি কারও পরোয়া করি না। –[আহমদ]

وَعَنْ ١١٢ أَبِى نَضْرَةَ اَنَّ رَجُلًا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يُقَالُ لَهُ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ دَخَلَ عَلَيْهِ اَصْحَابُهُ يَعُوْدُوْنَهُ وَهُوَ يَبْكِىْ فَقَالُوْا لَهُ مَا يُبْكِيْكَ اَلَمْ يَقُلْ لَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ ثُمَّ اَقِرَّهُ حَتّٰى تَلْقَانِىْ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَبَضَ بِيَمِيْنِهِ قَبْضَةً وَاُخْرٰى بِالْيَدِ الْاُخْرٰى وَقَالَ هٰذِهٖ لِهٰذِهٖ وَهٰذِهٖ لِهٰذِهٖ وَلَا اُبَالِىْ وَلَا اَدْرِىْ فِىْ اَىِّ الْقَبْضَتَيْنِ اَنَا ـ رَوَاهُ اَحْمَدُ

১১২. অনুবাদ : [তাবেয়ী] আবূ নাযরা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী-করীম ﷺ-এর সাহাবীদের মধ্যে একজন ছিল আবূ আবদুল্লাহ। তাঁর মৃত্যু শয্যায় শায়িতাবস্থায় তাঁর কতিপয় সাথী তাকে অন্তিম মুহূর্তে দেখা করতে আগমন করল। আর তখন তিনি ক্রন্দনরত অবস্থায় ছিলেন। তাঁরা তাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কাঁদছেন কেন? আপনাকে কি রাসূল ﷺ এ কথা বলেননি যে, তোমার গোঁফ খাটো করবে। অতঃপর এভাবে খাটো করে রাখবে এবং আমার সাথে জান্নাতে মিলিত হবে। তিনি বললেন হ্যাঁ, তবে আমি রাসূল ﷺ-কে এ কথাও বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর ডান হাতে এক মুষ্টি এবং অপর হাতে আরেক মুষ্টি লোক নিয়ে বলেছেন। এ মুষ্টি এর [জান্নাতের] জন্য এবং এ মুষ্টি এর [জাহান্নামের] জন্য। আর এই বিষয়ে আমি কারও পরোয়া করি না। [আবূ আবদুল্লাহ বলেন] আমি জানি না যে, এ মুষ্টিদ্বয়ের কোন মুষ্টিতে আমি রয়েছি। –[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : সাহাবী আবূ আবদুল্লাহ রাসূল ﷺ-এর মুখ নিঃসৃত বাণী হতে বেহেশতী হওয়া জানতে পেরেছেন। এরপরও তিনি আশংকা করছিলেন। কেননা, মু'মিন আল্লাহর আজাব ও গজব হতে নিশ্চিন্ত হতে পারে না। সকল সাহাবী ও সালফে সালেহীনদের জীবন হতে এটাই প্রতিভাত হয় যে, اَلْاِيْمَانُ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ অর্থাৎ "ঈমান ভয় ও আশার মাঝে" মু'মিন ব্যক্তি কখনো নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারে না।

وَعَنْ ١١٣ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَخَذَ اللّٰهُ الْمِيْثَاقَ مِنْ ظَهْرِ اٰدَمَ بِنَعْمَانَ يَعْنِىْ عَرَفَةَ فَاَخْرَجَ مِنْ صُلْبِهٖ كُلَّ ذُرِّيَّةٍ ذَرَاَهَا فَنَثَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالذَّرِّ ثُمَّ كَلَّمَهُمْ قُبُلًا قَالَ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى شَهِدْنَا اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غَافِلِيْنَ ـ اَوْ تَقُوْلُوْا اِنَّمَا اَشْرَكَ اٰبَاۤءُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ ـ رَوَاهُ اَحْمَدُ

১১৩. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন– আল্লাহ তা'আলা না'মান নামক স্থানে অর্থাৎ আরাফাতের ময়দানে আদমের পিঠ হতে তার সন্তানদের বের করে তাদের নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেন, তিনি আদমের মেরুদণ্ড হতে তাঁর প্রত্যেক সন্তানকে যাকে তিনি সৃষ্টি করবেন, বের করে ক্ষুদ্রকায় পিপীলিকার ন্যায় আদমের সম্মুখে ছড়িয়ে দেন। আর মুখোমুখি হয়ে তাদের সাথে কথাবার্তা বলেন এবং জিজ্ঞাসা করেন যে, আমি কি তোমাদের প্রভু নই ? তারা জবাবে বলল, হাঁ, আমরা এতে সাক্ষী থাকলাম। [আপনিই আমাদের প্রভু। অতঃপর আল্লাহ বলেন, আমি তোমাদের নিকট হতে এ জন্য এই সাক্ষ্য গ্রহণ করলাম যে,] যাতে তোমরা কিয়ামতের দিন এ কথা বলতে না পার যে, আমরা তো এ ব্যাপারে অনবহিত ছিলাম। অথবা তোমরা যেন এ কথা বলতে না পার যে, আমাদের পূর্ব পুরুষগণ তো এর পূর্বেই মুশরিক হয়ে গেছে। আর আমরা তো তাদেরই পরবর্তী সন্তান মাত্র। অতএব আমাদের গোমরাহ পূর্বপুরুষগণ যা কিছু করেছে তার জন্য আপনি কি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন ? –[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী বুঝা যায় যে, আদম সন্তান হতে মহান আল্লাহ তাঁর রবুবিয়্যাতের অঙ্গীকার দু'বার গ্রহণ করেছেন।

প্রথমত: আযলে আদমের সৃষ্টির পর একবার সেখানে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: হযরত আদম (আ.) দুনিয়ায় প্রেরিত হয়ে যখন আরাফার ময়দানে উপস্থিত হন তখন এ অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছিল।

উল্লেখ্য যে, সকলকে আদমের পিঠ থেকে বের করে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার জ্ঞান-বুদ্ধি দান করে তারপর অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন।

وَعَنْ ١١٤ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ (رضـ) فِىْ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ قَالَ جَمَعَهُمْ فَجَعَلَهُمْ اَزْوَاجًا ثُمَّ صَوَّرَهُمْ فَاسْتَنْطَقَهُمْ فَتَكَلَّمُوْا ثُمَّ اَخَذَ عَلَيْهِمُ الْعَهْدَ وَالْمِيْثَاقَ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى قَالَ فَاِنِّىْ اُشْهِدُ عَلَيْكُمُ السَّمٰوٰتِ السَّبْعَ

১১৪. অনুবাদ : হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ তা'আলার এই বাণী "যখন আপনার প্রভু বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের সন্তানদের বের করে আনলেন।"–[সূরা-আরাফা : ১৭২]–এর ব্যাখ্যায় বলেন, তাদের [উপাদানসমূহ] একত্রিত করলেন এবং তাদেরকে বিভিন্ন প্রকৃতিতে গড়ে তুলতে ইচ্ছা পোষণ করলেন। অতঃপর তাদেরকে আকৃতি দান করলেন এবং কথা বলার শক্তি দান করলেন। ফলে তারা কথা বলতে শুরু করল। এরপর তাদের নিকট হতে অঙ্গীকার আদায় করলেন এবং তাদের নিজেদের ব্যাপারে নিজেদেরকে সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি তোমাদের প্রভু নই ? জবাবে তারা বলল, জী হ্যাঁ। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমি তোমাদের এই স্বীকারোক্তির উপর সপ্ত আসমান ও সপ্ত

وَالْاَرَضِيْنَ السَّبْعَ وَاُشْهِدُ عَلَيْكُمْ اَبَاكُمْ اٰدَمَ اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَمْ نَعْلَمْ بِهٰذَا اِعْلَمُوْا اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ غَيْرِىْ وَلَا رَبَّ غَيْرِىْ وَلَا تُشْرِكُوْا بِىْ شَيْئًا اِنِّىْ سَاُرْسِلُ اِلَيْكُمْ رُسُلِىْ يُذَكِّرُوْنَكُمْ عَهْدِىْ وَمِيْثَاقِىْ وَاُنْزِلُ عَلَيْكُمْ كُتُبِىْ قَالُوْا شَهِدْنَا بِاَنَّكَ رَبُّنَا وَاِلٰهُنَا لَا رَبَّ لَنَا غَيْرُكَ وَلَا اِلٰهَ لَنَا غَيْرُكَ فَاَقَرُّوْا بِذٰلِكَ وَرُفِعَ عَلَيْهِمْ اٰدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ فَرَاَى الْغَنِىَّ وَالْفَقِيْرَ وَحَسَنَ الصُّوْرَةِ وَدُوْنَ ذٰلِكَ فَقَالَ رَبِّ لَوْلَا سَوَّيْتَ بَيْنَ عِبَادِكَ قَالَ اِنِّىْ اَحْبَبْتُ اَنْ اُشْكَرَ وَرَاَى الْاَنْبِيَاءَ فِيْهِمْ مِثْلَ السُّرُجِ عَلَيْهِمُ النُّوْرُ خُصُّوْا بِمِيْثَاقٍ اٰخَرَ فِى الرِّسَالَةِ وَالنُّبُوَّةِ وَهُوَ قَوْلُهٗ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّيْنَ مِيْثَاقَهُمْ اِلٰى قَوْلِهٖ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ كَانَ فِىْ تِلْكَ الْاَرْوَاحِ فَاَرْسَلَهٗ اِلٰى مَرْيَمَ عَلَيْهَا السَّلَامُ فَحُدِّثَ عَنْ اُبَىٍّ اَنَّهٗ دَخَلَ مِنْ فِيْهَا ـ رَوَاهُ اَحْمَدُ

জমিনকে সাক্ষী করছি এবং তোমাদের উপর তোমাদের পিতা আদম (আ.)-কেও সাক্ষী করছি, যাতে তোমরা কিয়ামতের দিন এ কথা বলতে না পার যে, আমরা তো আদতেই এটা জানতাম না।

হে আদম সন্তান ! তোমরা জেনে রাখ যে, আমি ব্যতীত আর কোনো প্রভু নেই এবং আমি ব্যতীত তোমাদের আর কোনো প্রতিপালকও নেই। সুতরাং তোমরা আমার সাথে আর কাউকে অংশীদার করো না। আমি তোমাদের নিকট আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করব। তারা তোমাদেরকে আমার সাথে কৃত অঙ্গীকার স্মরণ করিয়ে দেবে এবং আমি তোমাদের জন্য কিতাব অবতীর্ণ করব। অতঃপর তারা বলল, আমরা ঘোষণা করছি যে, নিশ্চয়ই আপনি আমাদের প্রতিপালক এবং প্রভু। আপনি ব্যতীত আমাদের আর কোনো প্রতিপালক নেই, আপনি ব্যতীত আমাদের আর কোনো উপাস্য নেই। [বর্ণনাকারী বলেন,] অতঃপর তারা এটা স্বীকার করল। আর হযরত আদম (আ.)-কে তাদের সামনে তুলে ধরা হলো, ফলে তিনি তাদেরকে দেখতে লাগলেন। তিনি তাদের মধ্যে ধনী, গরিব, সুন্দর ও কুৎসিত সবই দেখতে পেলেন। এরপর হযরত আদম (আ.) বললেন, হে আল্লাহ আপনি যদি এদের সকলকে সমানরূপে সৃষ্টি করতেন, আল্লাহ বললেন [এ ভেদাভেদের কারণেই] তারা আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুক এটাই আমি চাই। এমনিভাবে তিনি নবীদেরকে প্রদীপের ন্যায় উজ্জ্বল দেখতে পেলেন। তাদের উপর আলোকধারা ঝলমল করছে। তারা [উপরিউক্ত অঙ্গীকার ব্যতীত] রিসালাত ও নবুয়তের দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকারে বিশেষিত হয়েছেন। যেমন, মহান আল্লাহর বাণী— وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّيْنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ "আর স্মরণ কর সে সময়ের কথা, যখন আমি নবীদের নিকট হতে তাদের বিশেষ অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম এবং তোমার নিকট হতে এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা এবং ঈসা ইবনে মারইয়ামের নিকট থেকেও"। [সূরা-আহযাব : ৭] [হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) বলেন] সে সব রূহের মধ্যে ঈসা ইবনে মারইয়ামের রূহও ছিল। মহান আল্লাহ তা মারইয়ামের প্রতি প্রেরণ করেছিলেন। হযরত উবাই (রা.) হতে এটাও বর্ণিত আছে যে, সেই রূহ হযরত মারইয়ামের মুখ দিয়ে প্রবেশ করেছিল।-[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

أَحْبَبْتُ أَنْ اُشْكَرَ-এর মর্মার্থ : আলমে আরওয়াহে আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করার পর সাক্ষীস্বরূপ আদি পিতা আদম (আ.)-কে তাদের ঊর্ধ্বে তুলে ধরলেন। তিনি তার সন্তানদের মধ্য হতে ধনী, গরিব, সুদর্শন ও কুৎসিত সকলকেই দেখতে পেলেন। তিনি তাদের মধ্যকার এই তারতম্য লক্ষ্য করে আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আপনার বান্দাদেরকে একইরূপ সৃষ্টি করলেন না কেন ? তদুত্তরে আল্লাহ তা'আলা বললেন, তাদের মধ্যে এই তারতম্য করার কারণ হলো, যাকে বিশেষ নেয়ামত দেওয়া হয়েছে সে যেন এর কারণে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আর যাকে তা হতে বঞ্চিত করা হয়েছে সে যেন ধৈর্যধারণ করতঃ অন্যান্য নেয়ামত অনুযায়ী আল্লাহর শোকরিয়া জ্ঞাপন করে, আর এসব কারণে আমার কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করুক এটাই আমি চাই।

١١٥- وَعَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رض) قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَتَذَاكَرُ مَا يَكُوْنُ اِذْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَمِعْتُمْ بِجَبَلٍ زَالَ عَنْ مَكَانِهٖ فَصَدِّقُوْهُ وَاِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ تَغَيَّرَ عَنْ خُلُقِهٖ فَلَا تُصَدِّقُوْا بِهٖ فَاِنَّهٗ يَصِيْرُ اِلٰى مَا جُبِلَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ اَحْمَدُ

১১৫. **অনুবাদ :** হযরত আবুদ দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন—একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম এবং পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে সে সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। [এটা শুনে] রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যখন তোমরা শুনবে যে, কোনো পাহাড় তার নির্দিষ্ট স্থান হতে অন্যত্র সরে গেছে তবে তাতে বিশ্বাস করতে পার। কিন্তু যখন শুনতে পাবে যে, কোনো ব্যক্তি তার স্বভাব থেকে পরিবর্তিত হয়ে গেছে, তবে তাতে বিশ্বাস করবে না। কেননা, সে সেদিকেই প্রত্যাবর্তন করবে, যার উপর তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। [যেহেতু তাকদীরের কোনো পরিবর্তন হয় না]। –[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসের মাধ্যমে এ কথা সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, মানুষের সৃষ্টিগত চরিত্রের কখনো পরিবর্তন হয় না। যার সৃষ্টিমূলে সচ্চরিত্রের উপাদান রয়েছে, বাস্তব জীবনে তার থেকে তাই প্রকাশ পাবে। আর যার সৃষ্টি মূলে দুশ্চরিত্রের উপাদান রয়েছে, বাস্তব জীবনে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। সে কখনো তার জন্মগত স্বভাব ত্যাগ করতে পারবে না। এ জন্যই বলা হয়ে থাকে যে, কয়লা ধুইলে ময়লা যায় না ; স্বভাব যায় না মরলে।

প্রশ্ন : এখন প্রশ্ন জাগে যে, যদি ব্যক্তির স্বভাবই পরিবর্তন না হয় তাহলে সাধকগণ আধ্যাত্মিক চেষ্টা ও সাধনা দ্বারা কিভাবে কোনো দুশ্চরিত্র ব্যক্তিকে সচ্চরিত্রে আনয়ন করে।

জবাব : উক্ত প্রশ্নের জবাবে বলা যায় যে,

১. তাকদীর দু' প্রকার। ক. মুবরাম (অপরিবর্তনীয়) যার মধ্যে কোনো প্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন ঘটে না। খ. মু'আল্লাক (পরিবর্তনীয়) যার মধ্যে চেষ্টা-সাধনা দ্বারা পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ তার তাকদীরে আছে যে, যদি সে আধ্যাত্মিক চেষ্টা-সাধনা করে তবে তার চরিত্রে পরিবর্তন ঘটবে। সাধকগণ এ প্রকার তাকদীর অনুযায়ী কাজ করেন।

২. অথবা, উত্তর এই যে, প্রকৃতভাবে যে চরিত্র মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয় তাতে কোনো পরিবর্তন ঘটে না, তবে চেষ্টা-সাধনা দ্বারা যে চরিত্রের সৃষ্টি হয় তা এ পর্যায়ের নয়।

৩. অথবা, উত্তর এই যে, সাধকগণ কারও চরিত্রের মধ্যে পরিবর্তন ঘটাতে পারেন না। তবে তারা খারাপের দিক হতে ভালোর দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট করাতে পারেন। আশরাফ আলী থানবী (র.) বিষয়টির ব্যাখ্যা এভাবে দিয়েছেন যে, "বিদূরণ নয় বরং আকর্ষণ।" দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, এক ব্যক্তির মধ্যে বীরত্বের গুণ রয়েছে। এখন তাকে মুসলিম হত্যা করা হতে ফিরিয়ে কাফির হত্যা করার প্রতি আকৃষ্ট করা।

١١٦٠ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضـ) قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَا يَزَالُ يُصِيْبُكَ فِيْ كُلِّ عَامٍ وَجْعٌ مِنَ الشَّاةِ الْمَسْمُوْمَةِ الَّتِيْ اَكَلْتَ قَالَ مَا اَصَابَنِيْ شَيْءٌ مِنْهَا إِلَّا وَهُوَ مَكْتُوْبٌ عَلَيَّ وَاٰدَمُ فِيْ طِيْنَتِهٖ - رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

১১৬. অনুবাদ : হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আপনি যে বিষ মিশ্রিত বকরির গোশত খেয়েছিলেন– প্রতি বৎসরই তো আপনার উপর তার ক্রিয়া [যন্ত্রণা] পরিলক্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সেই বিষ মিশ্রিত বকরীর গোশতের কারণে আমার কেবল অতটুকু অসুবিধাই হয়, যা আমার তকদীরে তখন নির্ধারণ করা হয়েছে, যখন আদম (আ.) মাটির মধ্যেই শামিল ছিলেন। [অর্থাৎ তাকে সৃষ্টির অনেক পূর্বেই এটা আমার তাকদীরে লিপিবদ্ধ হয়েছিল] –[ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

سَبَبُ وُرُوْدِ الْحَدِيْثِ হাদীসের পটভূমি : বর্ণিত আছে যে, খায়বার যুদ্ধ শেষে সালাম ইবনে সেকেনের স্ত্রী যয়নব বিনতুল হারিছ নাম্নী জনৈকা ইহুদি মহিলা নবী করীম ﷺ কে দাওয়াত করে বিষ মিশ্রিত ছাগলের গোশত খেতে দিয়েছিল। তিনি তা মুখে দেওয়ার সাথে সাথে গোশত বিষযুক্ত হওয়ার কথা বলে দিয়েছিল। নবী করীম ﷺ তৎক্ষণাৎ তা ফেলে দেন, তথাপিও কিছু তাঁর পেটে প্রবেশ করে। যার ফলে প্রতি বৎসরই রাসূলের মধ্যে এই বিষের প্রতিক্রিয়া দেখা দিত। এমনকি হুজুর ﷺ ইন্তেকালের পূর্বেও বলেছিলেন যে, খায়বারের বিষাক্ত গোশতের ক্রিয়া আমার মধ্যে এখনও বিদ্যমান। এই প্রসঙ্গে উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা.) নবী করীম ﷺ-কে উক্ত গোশতের ক্রিয়ার কথা জিজ্ঞাসা করলে, রাসূল ﷺ উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন।

بَابُ اِثْبَاتِ عَذَابِ الْقَبْرِ

পরিচ্ছেদ : কবরের আজাবের প্রমাণ

মানুষ পৃথিবীতে আগমন করার পর থেকে শুরু করে তিনটি জগতে অবস্থান করবে। আর সে জগতগুলো হলো—

১. عَالَمِ دُنْيَا বা পার্থিব জগত। ২. عَالَمِ بَرْزَخْ বা অবকাশ জগত। ৩. عَالَمِ اٰخِرَتْ বা পরকাল।

১. **عَالَمِ دُنْيَا বা পার্থিব জগৎ** : এখানে শান্তি ও শাস্তি সরাসরি শরীরের উপরই হয়। আর আত্মা শরীরের অনুগামী মাত্র। এ কারণেই শরয়ী বিধান শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপরই আরোপ করা হয়।

২. **عَالَمِ بَرْزَخْ বা অবকাশ জগৎ** : শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (র.)-এর মতে, কবর দ্বারা عَالَمِ بَرْزَخْ উদ্দেশ্য। আর এই বরযখ হলো মৃত্যু ও পুনরুত্থান দিবসের মধ্যবর্তী জগৎ। যেমন কুরআনে এসেছে— وَمِنْ وَّرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ উল্লেখ যে, بَرْزَخْ দ্বারা মাটির গর্ত উদ্দেশ্য নয় ; বরং মৃত্যু পরবর্তীকালীন জীবন উদ্দেশ্য। চাই আগুনে পুড়ুক বা পানিতে নিমজ্জিত হোক কিংবা কোনো জীব জন্তুর পেটে যাক। আর এই জগতে শান্তি ও শাস্তি আত্মার সাথে সম্পর্কিত, আর শরীর হলো তার অনুগামী।

৩. **عَالَمِ اٰخِرَتْ বা পরকাল** : এই জগৎ পুনরুত্থান দিবস হতে শুরু হবে। এর কোনো শেষ নেই। এই জগতে শান্তি ও শাস্তির সম্পর্ক শরীর ও আত্মা উভয়ের সাথে হবে।

اِثْبَاتُ عَذَابِ الْقَبْرِ : বহু সংখ্যক আয়াত ও হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, কবরের শাস্তি সত্য। এতে কোনো সন্দেহ নেই। সকল ওলামাও এ কথার উপর একমত। যেমন, মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে এসেছে—

وَلَوْ تَرٰى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰئِكَةُ بَاسِطُوْٓا اَيْدِيْهِمْ اَخْرِجُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ـ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ اٰيٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ . (الانعام ٩٨)

অর্থাৎ, হে নবী ! যদি আপনি দেখতেন, যখন জালিমগণ মৃত্যুকষ্টে পতিত হয়, তখন ফেরেশতাগণ হাত প্রসারিত করে বলেন– তোমরা তোমাদের প্রাণ বের করে দাও। তোমরা যে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করতে এবং গর্ব অহংকারে তাঁর আয়াতসমূহকে এড়িয়ে চলতে, তার প্রতিফলস্বরূপ আজ তোমাদেরকে অপমানকর শাস্তি দেওয়া হবে।

উল্লিখিত আয়াতে اَلْيَوْمَ দ্বারা عَالَمِ بَرْزَخْ তথা কবর জগতের শাস্তি উদ্দেশ্য।

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেছেন– وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا

অর্থাৎ, আর ফেরাউন সম্প্রদায়কে কঠিন শাস্তি তথা আগুনের কঠিন শাস্তি তাদেরকে ঘিরে ফেলল। তাতে সকাল-সন্ধ্যা তাদেরকে পেশ করা হয়।–[সূরা-মু'মিন : ৪৫]

এরপর আল্লাহ বলেছেন– يَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ –[সূরা–মুমিন : ৪৬]

এতে সুস্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, কিয়ামতের পরে আরো কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

١١٧ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْمُسْلِمُ اِذَا سُئِلَ فِى الْقَبْرِ يَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ فَذٰلِكَ قَوْلُهٗ تَعَالٰى يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ وَفِىْ رِوَايَةٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ نَزَلَتْ فِىْ عَذَابِ الْقَبْرِ يُقَالُ لَهٗ مَنْ رَّبُّكَ فَيَقُوْلُ رَبِّىَ اللّٰهُ وَنَبِيِّىْ مُحَمَّدٌ ﷺ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১১৭. অনুবাদ : হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ বলেছেন– যখন কোনো মুসলমানকে কবরে প্রশ্ন করা হয়, তখন সে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রভু নেই এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল। কাজেই তার এই সাক্ষ্য আল্লাহর সে আয়াতের প্রমাণ যেখানে তিনি বলেছেন— يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ অর্থাৎ, ঈমানদারদেরকে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার জীবনে সত্যের সাক্ষীর উপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন। আর পরকালেও তার দ্বারা সত্যকে প্রমাণিত করেন। অন্য বর্ণনায় নবী করীম ﷺ হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন– يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদেরকে সত্য কথার উপর দৃঢ় রাখেন। এই আয়াতটি কবরের আজাব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। মৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমার রব কে? উত্তরে সে বলবে, আল্লাহ আমার প্রতিপালক এবং মুহাম্মদ ﷺ আমার নবী। –[বুখারী, মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْاٰيَةِ وَالرِّوَايَةِ **আয়াত ও হাদীসের মধ্যে অর্থগত বিরোধ :** হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, উক্ত আয়াতটি কবরের আজাব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ আয়াতে কবরের আজাব সম্পর্কে কোনো কথার উল্লেখ নেই। এর ফলে উভয়ের মাঝে বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিরোধ পরিলক্ষিত হয়।

حَلُّ التَّعَارُضِ **বিরোধের সমাধান :** উল্লিখিত আয়াতে যদিও প্রকাশ্যভাবে কবরের আজাব সম্পর্কে কোনো আলোচনা করা হয়নি, তবুও কবরের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির কবরে যে অবস্থা হবে, রাসূল ﷺ সে অবস্থাকেই কবরের আজাব হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আর এ স্থানে মু'মিনের পরীক্ষার চেয়ে কাফিরের পরীক্ষাকে কঠিন হিসেবে দেখাতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, মু'মিনের এ পরীক্ষাই এত কষ্ট সাধ্য, অথচ আল্লাহই ভালো জানেন যে, কাফিরের অবস্থা কত কঠিন হবে।

وَقْتُ السُّوَالِ وَ كَيْفِيَةُ السُّوَالِ **প্রশ্ন করার সময় ও ধরন :**

প্রশ্নের সময় : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয় এবং দাফনকারীগণ চলে যায় এবং তাদের পায়ের জুতার শব্দ মৃত ব্যক্তি শুনতে পায়। তখন মুনকার ও নকীর কবরে উপস্থিত হয় এবং মৃত ব্যক্তিকে বসিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করে।

প্রশ্নের ধরন : প্রশ্নের ধরন সম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِيْنُكَ وَمَا تَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الرَّجُلِ ؟ রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃত ব্যক্তি হতে দূরে থাকলেও هٰذَا শব্দের দ্বারা ইঙ্গিত করাতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা, বলা হয়েছে, মৃত ব্যক্তি হতে হুজূরের ﷺ রওজা পাকের মধ্যবর্তী সমস্ত পর্দা বা আড়াল তুলে ফেলা হয় এবং সে হুজূর ﷺ কে সরাসরি দেখতে পায়। অর্থাৎ, হুজূর ﷺ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, যা কাফিরদের জন্য এক কঠিন পরীক্ষা।

وَعَنْ ١١٨ أَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِىْ قَبْرِهٖ وَتَوَلّٰى عَنْهُ أَصْحَابُهٗ إِنَّهٗ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهٖ فَيَقُوْلَانِ مَاكُنْتَ تَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ ﷺ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُوْلُ أَشْهَدُ أَنَّهٗ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهٗ فَيُقَالُ لَهٗ أُنْظُرْ إِلٰى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللّٰهُ بِهٖ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ فَيَرَاهُمَا جَمِيْعًا وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهٗ مَاكُنْتَ تَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الرَّجُلِ فَيَقُوْلُ لَآ أَدْرِىْ كُنْتُ أَقُوْلُ مَايَقُوْلُ النَّاسُ فَيُقَالُ لَهٗ لَادَرَيْتَ وَلَاتَلَيْتَ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيْدٍ ضَرْبَةً فَيَصِيْحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيْهِ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَفْظُهٗ لِلْبُخَارِيِّ .

১১৮. অনুবাদ : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, বান্দাকে যখন কবরে রাখা হয় এবং তার সাথীগণ প্রত্যাবর্তন করতে থাকে। আর তখনও সে তাদের জুতার আওয়াজও শুনতে থাকে। এমতাবস্থায় তার নিকট দু'জন ফেরেশতা এসে উপস্থিত হন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। অতঃপর তাঁরা [রাসূল ﷺ-এর দিকে ইঙ্গিত করে] তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তুমি পৃথিবীতে এই ব্যক্তি তথা মুহাম্মদ ﷺ সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করতে? মু'মিন ব্যক্তি তখন বলে– আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। তখন তাকে বলা হয় ওহে! দেখ, জাহান্নামে তোমার কিরূপ স্থান ছিল। আল্লাহ তা'আলা তোমার সে স্থানকে জান্নাতের স্থান দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছেন। অতঃপর সে ঐ উভয় স্থানই দেখতে পায়। কিন্তু মুনাফিক ও কাফির তাদের প্রত্যেককে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে, দুনিয়াতে এই ব্যক্তি সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করতে? তখন সে বলে, না আমি কিছুই বলতে পারি না। তবে লোকেরা যা বলত, আমিও তাই বলতাম। তখন তাকে এ কথা বলা হয় যে, তুমি বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে তা বুঝতে চেষ্টা করনি এবং আল্লাহর কিতাব পাঠ করেও তা জানতে চেষ্টা করনি। অতঃপর তাকে লোহার হাতুড়ি দ্বারা কঠোরভাবে আঘাত হানা হবে, যার ফলে সে এমন বিকট চিৎকার করতে থাকবে। সেই চিৎকার জিন ও মানুষ জাতি ব্যতীত নিকটস্থ সকলেই শুনতে পাবে।–[বুখারী ও মুসলিম] তবে উল্লিখিত হাদীসের বর্ণনা বুখারী শরীফ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

هَلْ يُسْئَلُ الْكَافِرُ فِى الْقَبْرِ কবরের মধ্যে কাফিরদেরকে প্রশ্ন করা হবে কি না : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, মু'মিন, কাফির ও মুনাফিকদেরকে রাসূল ﷺ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। কিন্তু ইবনে আবদিল বার (রা.) বলেন, কবরে মু'মিন ও মুনাফিককে প্রশ্ন করা হয়, কাফিরকে প্রশ্ন করা হয় না। কেননা প্রশ্ন করার মূল উদ্দেশ্য হলো বাস্তব ক্ষেত্রে এ কথা প্রমাণ করা যে, কে সত্যিকার মু'মিন, আর কে মুনাফিক। আর কাফির ব্যক্তির কুফর যেহেতু সুস্পষ্ট সুতরাং তা প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই।

- আল্লামা ইবনুল কাইয়িম (র.)-এর মতে, শুধুমাত্র মুনাফিকদেরকে প্রশ্ন করা হয়।
- ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) বলেন, যে সমস্ত হাদীসে কাফিরকে প্রশ্ন করা হয় বলা হয়েছে, সেখানে কাফির দ্বারা মুনাফিকই উদ্দেশ্য।
- আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) সহ কতিপয় ওলামার মতে, কাফির ব্যক্তিকেও প্রশ্ন করা হয়। তাঁরা নিজেদের মতের সমর্থনে নিম্নোক্ত দলিলসমূহ পেশ করেন–

১. মহান আল্লাহর বাণী- وَيُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ এর বিপরীতে এসেছেন- وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظَّالِمِيْنَ আর এখানে জালিম দ্বারা কাফির ও মুনাফিক উভয়কেই বুঝানো হয়েছে।
২. ইমাম তাবারানী (র.) হযরত হাসানের সূত্রে এবং ইবনে হিব্বান তার সহীহ গ্রন্থে "مَرْفُوْع" হিসেবে বর্ণনা করেছেন- وَاَمَّا الْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ .... الخ ـ
৩. হাকেম (র.) হযরত বারা ইবনে আযেবের সূত্রে مَرْفُوْع হিসেবে বর্ণনা করেছেন- وَاِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ ...... وَيَاْتِيْهِ
৪. হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত উক্ত হাদীসেই كَافِر -কে প্রশ্ন করার কথা এসেছে।

وَعَنْ ١١٩ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ اِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَمِنْ اَهْلِ النَّارِ فَيُقَالُ هٰذَا مَقْعَدُكَ حَتّٰى يَبْعَثَكَ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১১৯. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— তোমাদের মধ্য হতে যখন কেউ মৃত্যুবরণ করে তখন সকাল-সন্ধ্যায় তার আবাসস্থান তার নিকট উপস্থিত করা হয়। যদি সে ব্যক্তি জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে জান্নাতবাসীদের স্থান আর যদি জাহান্নামবাসীদের অন্তর্গত হয় তবে জাহান্নামবাসীদের স্থান। অতঃপর তাকে বলা হয় এই হলো তোমাদের প্রকৃত স্থান। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তোমাকে ঐ স্থানে পাঠিয়ে দেবেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ١٢٠ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّ يَهُوْدِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ فَقَالَتْ لَهَا اَعَاذَكِ اللّٰهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَاَلَتْ عَائِشَةُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَقَالَ نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعْدُ صَلّٰى صَلٰوةً اِلَّا تَعَوَّذَ بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১২০. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন জনৈকা ইহুদি মহিলা তাঁর নিকট আগমন করল এবং কবরের আজাবের বিষয়ে আলোচনা করে বলল, হে আয়েশা ! আল্লাহ তা'আলা তোমাকে কবরের আজাব হতে মুক্তি দান করুন। অতঃপর হযরত আয়েশা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কবরের আজাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ কবরের আজাব সত্য। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, এরপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কখনও এরূপ দেখিনি যে, তিনি নামাজ পড়েছেন অথচ কবরের আজাব হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেননি। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْحَدِيْثَيْنِ দু' হাদীসের মধ্যে অর্থগত বিরোধ : উল্লিখিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, ইহুদি মহিলা কবরের আজাব সম্পর্কে যে সংবাদ দিয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তা সমর্থন করেছেন। অপর দিকে মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তদুত্তরে বলেছেন যে, উক্ত ইহুদি মহিলা মিথ্যা বলেছে, সুতরাং উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ পরিলক্ষিত হয়।

حَلُّ التَّعَارُضِ বিরোধের সমাধান :

১. ইমাম নববী (র.)-এর মতে, উক্ত মহিলা হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট দু'বার এসেছিল। প্রথমবার সে হযরত আয়েশা (রা.)-কে কবরের আজাব সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তা শোনার পর অস্বীকার করে বলেছেন, ইহুদিনী

মিথ্যা বলেছে। যেহেতু তখন পর্যন্ত তার নিকট এ ব্যাপারে ওহী আসেনি। কিন্তু সে মহিলাটি যখন দ্বিতীয়বার হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট এসে কবরের আজাব সম্পর্কে আলোচনা করে, মহানবী ﷺ তা জানতে পেরে বলেছেন, হ্যাঁ, কবরের আজাব সত্য। কেননা, তখন তাঁর নিকট এ ব্যাপারে ওহী এসেছে।

২. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.)-এর মতে, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমবার যে কবরের আজাব সম্পর্কে অস্বীকার করেছেন, তা ছিল মু'মিনদের উপর কবর আজাব না হওয়া সম্পর্কে অস্বীকৃতি, কাফিরদের কবরের আজাব সম্পর্কে নয়; কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে তিনি যখন ওহীর মাধ্যমে জানতে পারলেন যে, আল্লাহ তা'আলা মু'মিন-কাফির নির্বিশেষে যে কাউকেই কবরের আজাব দিতে পারেন, তখন হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও কবরের আজাব হতে মুক্তির জন্য আল্লাহর নিকট মুনাজাত করতে থাকেন।

وَعَنْ ١٢١ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (رض) قَالَ بَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَائِطٍ لِبَنِى النَّجَّارِ عَلٰى بَغْلَةٍ لَهٗ وَنَحْنُ مَعَهٗ اِذْ حَادَتْ بِهٖ فَكَادَتْ تُلْقِيْهِ وَاِذَا اَقْبُرٌ سِتَّةٌ اَوْ خَمْسَةٌ فَقَالَ مَنْ يَعْرِفُ اَصْحَابَ هٰذِهِ الْاَقْبُرِ قَالَ رَجُلٌ اَنَا قَالَ فَمَتٰى مَاتُوْا قَالَ فِى الشِّرْكِ فَقَالَ اِنَّ هٰذِهِ الْاُمَّةَ تُبْتَلٰى فِىْ قُبُوْرِهَا فَلَوْلَا اَنْ لَا تَدَافَنُوْا لَدَعَوْتُ اللّٰهَ اَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِىْ اَسْمَعُ مِنْهُ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهٖ فَقَالَ تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ قَالُوْا نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ قَالَ تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالُوْا نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَ تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ قَالُوْا نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ قَالَ تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ قَالُوْا نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১২১. **অনুবাদ :** হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর একটি খচ্চরের উপর আরোহণ করে বনী নাজ্জার গোত্রের একটি বাগানের মধ্য দিয়ে গমন করছিলেন এবং আমরাও তাঁর সাথে ছিলাম। কিন্তু এমনি সময় তাঁর খচ্চরটি লাফিয়ে উঠল, এমনকি খচ্চারটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মাটিতে ফেলে দেওয়ার উপক্রম করল। অতঃপর দেখা গেল যে, সেখানে পাঁচ অথবা ছয়টি কবর রয়েছে। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সাথীদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন– এ সব কবরের বাসিন্দাদেরকে চেনে এমন কেউ আছে কি ? এক ব্যক্তি বলল [হে আল্লাহর রাসূল ﷺ !] আমি চিনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন যে, তারা কখন মৃত্যুবরণ করেছে ? উক্ত ব্যক্তি জবাবে বললেন শিরকের জামানায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, [মনে রেখো] এ উম্মতকে তাদের কবরের মধ্যে মহা পরীক্ষায় ফেলা হয়। যেহেতু তোমরা ওদের কারণে মানুষকে দাফন করা পরিত্যাগ করবে ; নতুবা আমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতাম যে, তিনি যেন তোমাদেরকে কবরের আজাব শুনান, যা আমি শুনতে পাচ্ছি। এরপর তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরালেন এবং বললেন, তোমরা জাহান্নামের শাস্তি হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। তারা বলল, আমরা আল্লাহর নিকট জাহান্নামের শাস্তি হতে আশ্রয় চাচ্ছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা কবরের আজাব হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর, তারা বলল, আমরা কবরের আজাব হতেও আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। অতঃপর রাসূলে কারীম ﷺ বললেন, তোমরা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল প্রকারের ফেতনা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। তারা বলল, আমরা প্রকাশ্য ও গোপন সকল প্রকারের ফেতনা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা দাজ্জালের ফেতনা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর, সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমরা দাজ্জালের ফেতনা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।–[মুসলিম]

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১২২ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أُقْبِرَ الْمَيِّتُ أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا الْمُنْكَرُ وَلِلْاٰخَرِ النَّكِيْرُ فَيَقُوْلَانِ مَاكُنْتَ تَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الرَّجُلِ فَيَقُوْلُ هُوَ عَبْدُ اللّٰهِ وَ رَسُوْلُهُ أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ فَيَقُوْلَانِ قَدْكُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُوْلُ هٰذَا ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِىْ قَبْرِهِ سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فِىْ سَبْعِيْنَ ثُمَّ يُنَوَّرُ لَهُ فِيْهِ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ نَمْ فَيَقُوْلُ أَرْجِعُ إِلٰى أَهْلِىْ فَأُخْبِرُهُمْ فَيَقُوْلَانِ نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوْسِ الَّذِىْ لَا يُوْقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ حَتّٰى يَبْعَثَهُ اللّٰهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذٰلِكَ وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ قَوْلًا فَقُلْتُ مِثْلَهُ لَا أَدْرِىْ فَيَقُوْلَانِ قَدْكُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُوْلُ ذٰلِكَ فَيُقَالُ لِلْاَرْضِ الْتَئِمِىْ عَلَيْهِ فَتَلْتَئِمُ عَلَيْهِ فَتَخْتَلِفُ أَضْلَاعُهُ فَلَا يَزَالُ فِيْهَا مُعَذَّبًا حَتّٰى يَبْعَثَهُ اللّٰهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذٰلِكَ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

১২২. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয়, তখন তার নিকট নীল চক্ষু বিশিষ্ট কৃষ্ণকায় দু'জন ফেরেশতা আগমন করে। তাদের একজনকে বলা হয় 'মুনকার' এবং অপরজনকে বলা হয় 'নকীর'। অতঃপর তারা মৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করে যে, এই ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি পৃথিবীতে কি বলতে? মৃত ব্যক্তি যদি মু'মিন হয় তবে সে বলে– তিনি তো আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। এ কথা শোনার পর তারা বলে আমরা পূর্ব হতেই জানতাম যে, তুমি এ কথাই বলবে। অত:পর কবরের মধ্যে তার জন্য দৈর্ঘ্য প্রস্থে সত্তর হাত [৭০ × ৭০] করে প্রশস্ত করে দেওয়া হয়। এরপর তার জন্য তথায় আলোর ব্যবস্থা করা হয় এবং তাকে বলা হয় যে, ঘুমিয়ে থাক। কিন্তু মৃত ব্যক্তি বলে, [না] আমি আমার পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে যাব এবং তাদেরকে এ সংবাদ প্রদান করব। অতঃপর ফেরেশতারা বলবে, [না] বরং তুমি এখানে বাসর ঘরের দুলার মতো ঘুমিয়ে থাক। যাকে তার পরিবারের সর্বাধিক প্রিয়জন ব্যতীত আর কেউ জাগাতে পারবে না। [আর সে এভাবেই ঘুমাতে থাকবে] যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলা তাকে তার এই শয্যা স্থান হতে উঠান। আর যদি মৃত ব্যক্তি মুনাফেক হয়, তবে সে বলবে, আমি শুনতাম, লোকেরা তার সম্পর্কে একটি কথা বলত। সুতরাং আমিও তদনুরূপ কথাই বলতাম। কিন্তু আমি তার সম্বন্ধে কিছুই জানি না, তখন ফেরেশতাদ্বয় বলবেন, আমরা [পূর্ব হতেই] জানতাম যে, তুমি এ ধরনের কথা বলবে। অতঃপর জমিনকে বলা হয়, হে জমিন ! তাকে চেপে ধর। ফলে জমিন তাকে এমন জোরে চেপে ধরে, যাতে তার এক পার্শ্বের হাড় অপর পার্শ্বে চলে যায়। আর এই কবরে সে এভাবেই শাস্তি ভোগ করতে থাকবে ; যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা তাকে তার এ স্থান হতে উঠান। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : 'যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে দাফন করা হয়' এ বাক্যের দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে, কবরে দাফন করলেই শুধু মুনকার নকীরের প্রশ্নের সম্মুখীন হবে; বরং সর্ব প্রকার মৃত্যুই এর দ্বারা উদ্দেশ্য তথা মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হোক কিংবা পুড়িয়ে ফেলা হোক ; অথবা তাকে যে কোনো হিংস্র প্রাণী খেয়ে ফেলুক বা পানিতে ডুবে মরুক, সর্বাবস্থায় সে উল্লিখিত প্রশ্নাবলির সম্মুখীন হবে। আলমে বরযখে তার রূহকে দেহের সাথে সংযুক্ত করত এ সব প্রশ্ন করা হবে।

وَعَنْ ١٢٣ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (رضـ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَاْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُوْلَانِ لَهٗ مَنْ رَّبُّكَ فَيَقُوْلُ رَبِّىَ اللّٰهُ فَيَقُوْلَانِ لَهٗ مَا دِيْنُكَ فَيَقُوْلُ دِيْنِىَ الْاِسْلَامُ فَيَقُوْلَانِ مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِىْ بُعِثَ فِيْكُمْ فَيَقُوْلُ هُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَيَقُوْلَانِ لَهٗ وَمَا يُدْرِيْكَ فَيَقُوْلُ قَرَأْتُ كِتَابَ اللّٰهِ فَاٰمَنْتُ بِهٖ وَصَدَّقْتُ فَذٰلِكَ قَوْلُهٗ يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ الْاٰيَةَ قَالَ فَيُنَادِىْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ اَنْ صَدَقَ عَبْدِىْ فَافْرِشُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَاَلْبِسُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوْا لَهٗ بَابًا اِلَى الْجَنَّةِ فَيُفْتَحُ قَالَ فَيَاْتِيْهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيْبِهَا وَيُفْسَحُ لَهٗ فِيْهَا مَدَّ بَصَرِهٖ وَاَمَّا الْكَافِرُ فَذَكَرَ مَوْتَهٗ قَالَ وَيُعَادُ رُوْحُهٗ فِىْ جَسَدِهٖ وَيَاْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُوْلَانِ مَنْ رَّبُّكَ فَيَقُوْلُ هَاهْ هَاهْ لَا اَدْرِىْ فَيَقُوْلَانِ لَهٗ مَادِيْنُكَ فَيَقُوْلُ هَاهْ هَاهْ لَا اَدْرِىْ فَيَقُوْلَانِ مَا هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِىْ بُعِثَ فِيْكُمْ فَيَقُوْلُ هَاهْ هَاهْ لَا اَدْرِىْ

১২৩. **অনুবাদ :** হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, কবরে মু'মিন ব্যক্তির নিকট দু'জন ফেরেশতা আগমন করেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করেন যে, তোমার রব কে? জবাবে সে বলে, আমার রব আল্লাহ। অতঃপর তাঁরা তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার দীন কি ? সে বলে আমার দীন হলো ইসলাম, এরপর তাকে জিজ্ঞেস করে এই ব্যক্তি কে, যাকে তোমাদের মধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে ? সে জবাব দেয় যে, তিনি আল্লাহর রাসূল। তখন ফেরেশতাদ্বয় তাকে বলেন, তুমি কিভাবে তাকে বুঝতে পেরেছ ? সে বলে আমি আল্লাহর কিতাব পাঠ করেছি। অতঃপর তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁকে সত্যায়ন করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আর এটাই হলো আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর মর্মকথা– يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ অর্থাৎ, যারা ঈমান আনয়ন করেছে তাদেরকে আল্লাহ সুদৃঢ় কালাম [কালিমায়ে শাহাদাত]-এর উপর মজবুত রাখেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, অতঃপর আসমান হতে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করেন যে, আমার বান্দা সঠিক কথা বলেছেন। সুতরাং তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও এবং তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরওয়াজা উন্মুক্ত করে দাও। ফলে তা উন্মুক্ত করা হয়। মহানবী ﷺ বলেন, অতঃপর তার নিকট জান্নাতের বাতাস ও সুঘ্রাণ বইতে থাকে এবং চোখের দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত তার কবরকে প্রশস্ত করা হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ কাফের ব্যক্তির মৃত্যুর প্রসঙ্গটি উত্থাপন করে বলেন, তার রূহ তার মরদেহে প্রত্যাবর্তন করানো হয় এবং দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে উঠিয়ে বসান, আর জিজ্ঞেস করেন যে, তোমার রব কে ? তখন সে জবাবে বলে, হায় ! হায় ! আমি কিছুই জানি না। অতঃপর তারা জিজ্ঞেস করেন, তোমার দীন কি ? সে উত্তরে বলে, হায় ! হায় ! আমি কিছুই জানি না। এরপর ফেরেশতাদ্বয় জিজ্ঞেস করেন, এই ব্যক্তি কে, যাকে তোমাদের মধ্যে প্রেরণ করা হয়েছিল? সে বলবে, হায় ! হায়! আমি কিছুই জানি না। অতঃপর আসমান হতে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করেন যে, সে মিথ্যা কথা

فَيُنَادِى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ اَنْ كَذَبَ فَافْرِشُوْهُ مِنَ النَّارِ وَاَلْبِسُوْهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوْا لَهُ بَابًا اِلَى النَّارِ قَالَ فَيَاْتِيْهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُوْمِهَا قَالَ وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتّٰى تَخْتَلِفَ فِيْهِ اَضْلَاعُهُ ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهُ اَعْمٰى اَصَمُّ مَعَهُ مِرْزَبَّةٌ مِنْ حَدِيْدٍ لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَصَارَ تُرَابًا فَيَضْرِبُهُ بِهَا ضَرْبَةً يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اِلَّا الثَّقَلَيْنِ فَيَصِيْرُ تُرَابًا ثُمَّ يُعَادُ فِيْهِ الرُّوْحُ ۔ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْدَاوُدَ

বলছে। সুতরাং তার জন্য জাহান্নাম হতে একটি বিছানা এনে তা বিছিয়ে দাও এবং জাহান্নামের পোশাক পরিধান করিয়ে দাও। এছাড়া জাহান্নামের দিক থেকে একটি দরওয়াজা খুলে দাও। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, অতঃপর তার নিকট জাহান্নাম হতে উত্তাপ ও উত্তপ্ত হাওয়া আসতে থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এছাড়া তার কবরকে এত সংকীর্ণ করা হয় যে, তার একদিকের পাঁজর অপর দিকের পাজরের মধ্যে ঢুকে যায়। অতঃপর তার জন্য একজন অন্ধ ও বধির ফেরেশতা নিযুক্ত করা হয়। যে একটি লোহার হাতুড়িসহ তার নিকট এসে উপস্থিত হয়। এই হাতুড়ি দ্বারা যদি কোনো পাহাড়কে আঘাত করা হয়, তবে তা অবশ্যই ধূলিময় হয়ে যাবে। আর উক্ত ফেরেশতা এ হাতুড়ি দ্বারা তাকে ভীষণভাবে প্রহার করতে থাকে। এর ফলে সে এমন বিকট চিৎকার করতে থাকবে যে, তাতে মানুষ ও জিন ব্যতীত পূর্ব পশ্চিম পর্যন্ত পৃথিবীর সকল সৃষ্টিই তা শুনতে পায়। এ প্রহারে সে মাটিতে পরিণত হয়ে যায়। অতঃপর তার দেহে আবারও রূহ সঞ্চার করা হয়। –[আহমদ ও আবূ দাঊদ]

وَعَنْ ١٢٤ عُثْمَانَ (رض) اَنَّهُ كَانَ اِذَا وَقَفَ عَلٰى قَبْرٍ بَكٰى حَتّٰى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ فَقِيْلَ لَهُ تَذْكُرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ فَلَا تَبْكِىْ وَتَبْكِىْ مِنْ هٰذَا فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْقَبْرَ اَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْاٰخِرَةِ فَاِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ اَيْسَرُ مِنْهُ وَاِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ اَشَدُّ مِنْهُ قَالَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا رَاَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ اِلَّا وَالْقَبْرُ اَفْظَعُ مِنْهُ ۔ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ ۔

১২৪. **অনুবাদ :** হযরত ওসমান (রা.)হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন কবরের নিকট দাঁড়াতেন তখন ভীষণভাবে কাঁদতেন, ফলে তার দাঁড়ি পর্যন্ত ভিজে যেত। পরে একদিন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, আপনি তো জান্নাত ও জাহান্নামের কথাও স্মরণ করেন, তাতে তো কাঁদেন না; কিন্তু কবর দেখে কাঁদেন কেন? জবাবে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পরকালের মঞ্জিলসমূহের মধ্যে কবর হলো প্রথম মঞ্জিল। এটা হতে কেউ যদি মুক্তি লাভ করতে পারে, তবে পরবর্তী মঞ্জিলসমূহ তার জন্য সহজ হয়ে যায়। আর কেউ যদি তা হতে মুক্তি লাভ করতে না পারে, তবে পরবর্তী মঞ্জিলসমূহ তার জন্য আরো কঠিন হয়ে পড়ে। অতঃপর তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমি কবরের চেয়ে অধিকতর ভয়াবহ দৃশ্য আর দেখিনি। –[তিরমিযী, ইবনে মাজাহ] আর ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, অত্র হাদীসটি গরীব।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَجْهُ بُكَاءِ عُثْمَانَ-হযরত ওসমান (রা.)-এর কাঁদার কারণ : আলোচ্য হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, হযরত ওসমান (রা.) কবরের আজাবের বিষয়ে কান্নাকাটি করতেন, অথচ তিনি হলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্তদের অন্যতম, তিনি কবর দেখে কেন কাঁদতেন। ওলামালাগণ নিম্নোক্তভাবে এর জবাব প্রদান করেছেন—

১. হযরত ওসমান (রা.) কবরের নিকট আসলে তার ভয়াবহতার কথা স্মরণ হওয়া মাত্রই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দেওয়া সুসংবাদ ভুলে যেতেন। তাই তিনি কাঁদতেন।
২. অথবা, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন দশজন সাহাবীর জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন, তখন হযরত উসমান (রা.) অনুপস্থিত ছিলেন।
৩. অথবা, হযরত ওসমান (রা:)-এর নিকট সংবাদটি একক বর্ণনাকারীর মাধ্যমে পৌছে ছিল, ফলে এর দ্বারা তাঁর দৃঢ় জ্ঞান লাভ হয়নি।
৪. কিংবা তিনি এ কথা বুঝানোর জন্য কাঁদতেন যে, তিনি যখন জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও কবরের আজাবকে ভয় করেন, তখন অন্যদের ক্ষেত্রে এই ভয়ের মাত্রা আরো বেশি হওয়া উচিত।
৫. অথবা, তাঁর এই ক্রন্দন ছিল মু'মিনদের প্রতি করুণা প্রদর্শন।
৬. অথবা, তিনি নবী করীম ﷺ ও তাঁর সঙ্গীদের হারানোর শোকে কাঁদতেন।

وَعَنْهُ ١٢٥ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ ثُمَّ سَلُوْا لَهُ بِالتَّثْبِيْتِ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ . رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ

১২৫. অনুবাদ : হযরত ওসমান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর যখন নবী করীম ﷺ অবসর গ্রহণ করতেন, তখন সেখানে দাঁড়াতেন এবং উপস্থিত লোকদেরকে বলতেন, তোমরা তোমাদের ভাইদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং ঈমানের উপর অটল রাখার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া কর। কেননা, এখনই তাকে প্রশ্ন করা হবে। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

سَلُوْا لَهُ بِالتَّثْبِيْتِ দ্বারা উদ্দেশ্য : মহানবী ﷺ-এর বাণী سَلُوْا لَهُ بِالتَّثْبِيْتِ-এর অর্থ হলো তোমরা তাকে ঈমানের উপর অটল রাখার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা কর। এর মর্মার্থ হলো, তোমরা এই দোয়া পাঠ করবে যে, اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ অথবা এই দোয়া পাঠ করবে ثَبَّتَهُ اللّٰهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ

অধিকাংশ শাফেয়ী এবং হানাফীদের কিছু সংখ্যক আলিমের মতে মৃত ব্যক্তিকে দাফনের পর তার শির পার্শ্বে দাঁড়িয়ে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করা মোস্তাহাব।

يَا فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ اُذْكُرِ الْعَهْدَ الَّذِيْ خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيْهَا وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ . قُلْ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُوْلًا وَبِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً وَبِالْقُرْاٰنِ اِمَامًا وَبِالْمُسْلِمِيْنَ اِخْوَانًا رَبِّىَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ *

এ সম্পর্কে আবূ উমামা (রা.)হতে একটি হাদীসও বর্ণিত আছে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) ও তাঁর অনুসারীদের মতে মৃত ব্যক্তিকে দাফনের পর তার কবরের নিকটে কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করা মোস্তাহাব। আর পূর্ণ কুরআন তেলাওয়াত করতে পারলে তা করা উত্তম।

অন্য এক বর্ণনায় সূরা বাক্বারার প্রথম হতে اُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ পর্যন্ত এবং সূরার শেষ ভাগের اٰمَنَ الرَّسُوْلُ হতে শেষ পর্যন্ত পাঠ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন– সুনানে বায়হাকীতে এসেছে—

اِنَّ ابْنَ عُمَرَ (رضـ) اِسْتَحَبَّ اَنْ يَقْرَأَ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ الدَّفْنِ اَوَّلَ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ وَخَاتِمَةَ .

অপর এক বর্ণনায় এসেছে যে, সূরা বাক্বারার প্রথমাংশ মাথার নিকটে পাঠ করবে আর শেষাংশ পায়ের নিকট পাঠ করবে।

وَعَنْ ١٢٦ أَبِىْ سَعِيْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيُسَلَّطُ عَلَى الْكَافِرِ فِىْ قَبْرِهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ تِنِّيْنًا تَنْهَسُهُ وَتَلْدَغُهُ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ لَوْ اَنَّ تِنِّيْنًا مِنْهَا نَفَخَ فِى الْاَرْضِ مَا اَنْبَتَتْ خَضِرًا . رَوَاهُ الدَّارِمِىُّ وَرَوَى التِّرْمِذِىُّ نَحْوَهُ وَقَالَ سَبْعُوْنَ بَدْلَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ .

১২৬. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, অবশ্যই কাফিরের জন্য তাদের কবরে ৯৯টি বিষাক্ত সর্প নিযুক্ত করা হয়। সেগুলো তাকে কিয়ামত হওয়া পর্যন্ত কামড়াতে ও দংশন করতে থাকে। যদি তাদের মধ্য হতে কোনো একটি সর্পও পৃথিবীতে নিঃশ্বাস ফেলত তবে জমিনে কোনো সবুজ তৃণলতা বা উদ্ভিদ জন্ম নিত না। –[দারেমী] আর ইমাম তিরমিযীও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি নিরানব্বইর স্থলে সত্তরের কথা বলেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْحِكْمَةُ فِىْ تَسْلِيْطِ تِسْعَةٍ وَّتِسْعِيْنَ تِنِّيْنًا নিরানব্বইটি সর্প নিযুক্ত করার রহস্য : উল্লিখিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, একটি সর্পের নিঃশ্বাসেই যদি পৃথিবীতে কিছু না জন্মে তবে কাফিরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য ৯৯টির প্রয়োজন নেই, একটিই যথেষ্ট। তবে আল্লাহ তা'আলা নিরানব্বইটি সর্পকে নিযুক্ত করার যৌক্তিকতার বিষয়ে হাদীস বিশারদগণ নিম্নোক্ত মতামত পেশ করেছেন—

১. আল্লামা তীবী (র.) বলেন, হাদীসে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলার একশতগুণ রহমত বা অনুগ্রহ রয়েছে। তার মধ্য হতে শুধু এক ভাগ রহমত বা অনুগ্রহ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, যার ফলশ্রুতিতে মানুষ একে অপরকে ভালোবাসে। আর ৯৯ [নিরানব্বই] ভাগ অনুগ্রহ পরকালের জন্য জমা রেখেছেন। কাফির ব্যক্তি যখন পার্থিব জগতে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ অনুযায়ী কাজ করে না, তখন পরকালের জন্য যে নিরানব্বই ভাগ অনুগ্রহ রয়েছে, তার প্রতি ভাগ অনুগ্রহের পরিবর্তে এক একটি সর্প তাকে দংশন করতে থাকে।

২. অথবা কাফিরদের শাস্তির জন্য এতগুলো সাপের প্রয়োজন না থাকলেও ৯৯টি সর্প প্রেরণের রহস্য হলো– কাফির আল্লাহ তা'আলাকে অস্বীকার করে আল্লাহ তা'আলার ৯৯টি নামেরই অস্বীকার করেছে। তাই তার প্রতিটি নামের সাথে কুফরি করার কারণে একটি করে সর্প নিযুক্ত করা হয়।

৩. অথবা, আলোচ্য হাদীসে ৯৯ টি সর্প প্রেরণের কথা বলে অনেক সর্প প্রেরণের কথা বুঝানো হয়েছে। ঠিক ৯৯ সংখ্যা উদ্দেশ্য নয়।

اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْحَدِيْثَيْنِ দু'টি হাদীসের বিরোধ : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, কাফিরদের জন্য কবরে ৯৯টি সর্প নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তিরমিযীর বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, সর্প হবে ৭০টি। সুতরাং উভয়ের মধ্যে বর্ণনাগত বিরোধ পরিলক্ষিত হয়।

حَلُّ التَّعَارُضِ বিরোধের সমাধান :

১. ইমাম গাযালী (রা.) বলেন, মানুষের মধ্যে অনেক কু-অভ্যাস রয়েছে, যার সংখ্যা ৯৯টি। তবে সামঞ্জস্য বিদ্যমান থাকার কারণে কোনো কোনোটিকে অন্যটির অন্তর্ভুক্ত করলে মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৭০টি। আর এ কারণেই দু' বর্ণনায় দু'টি সংখ্যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

২. অথবা, ৯৯ বা ৭০ দ্বারা নির্দিষ্ট সংখ্যা উদ্দেশ্য নয়; বরং আধিক্য বর্ণনাই উদ্দেশ্য।

৩. অথবা, কাফিরদের অবস্থার বিভিন্নতার দিকে দৃষ্টি রেখে কখনও ৭০ আবার কখনো ৯৯-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. অথবা, কম সংখ্যা বেশি সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত তাই উভয় বর্ণনার মধ্যে বিরোধ থাকে না।

৫. অথবা, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে পূর্ব অবগতি মত ৭০টি এবং পরে ওহীর মাধ্যমে ৯৯টির কথা বলেছেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١٢٧ - عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ حِيْنَ تُوُفِّيَ فَلَمَّا صَلّٰى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَ وُضِعَ فِيْ قَبْرِهٖ وَسُوِّيَ عَلَيْهِ سَبَّحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَبَّحْنَا طَوِيْلًا ثُمَّ كَبَّرَ فَكَبَّرْنَا فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَ سَبَّحْتَ ثُمَّ كَبَّرْتَ قَالَ لَقَدْ تَضَايَقَ عَلٰى هٰذَا الْعَبْدِ الصَّالِحِ قَبْرُهٗ حَتّٰى فَرَّجَهُ اللّٰهُ عَنْهُ ـ رَوَاهُ اَحْمَدُ

১২৭. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত সাদ ইবনে মু'আয (রা.)-এর ইন্তেকালের পর আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তার জানাযায় উপস্থিত হলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাঁর জানাযা শেষ করলেন, তখন তাঁকে কবরে রাখা হলো এবং মাটি সমান করে দেওয়া হলো। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উপর দীর্ঘ সময় তাসবীহ পাঠ করলেন, আর আমরাও দীর্ঘ সময় তাসবীহ পাঠ করলাম। অতঃপর তিনি তাকবীর বললেন, আর আমরাও তাকবীর বললাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনি কেন এরূপ তাসবীহ পাঠ করলেন ? এরপর তাকবীর বললেন? জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এই পুণ্যাত্মা বান্দার কবর সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আমাদের এই তাসবীহ ও তাকবীর পাঠের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কবরকে প্রশস্ত করে দিলেন। –[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** হযরত সাদ ইবনে মু'আয (রা.) বড় নেককার মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কবর সঙ্কুচিত হয়ে গেছে। অথবা সমস্ত মানুষের প্রতি এরূপ করাটা আল্লাহর বিধান রয়েছে। আর এটা হতে এ কথাও বুঝা যাচ্ছে যে, কবরের সঙ্কোচন কোনো বড় নেক ও পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরও হতে পারে। আর হযরত সাদ (রা.) যে একজন পুণ্যবান ব্যক্তি ছিলেন, পরবর্তী হাদীসে তা প্রকাশিত হয়েছে। অপর এক হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেছেন, কবরের সঙ্কোচ হতে যদি কেউ রেহাই পেত তবে হযরত সা'দই রক্ষা পেতেন। অবশেষে হুজুর ﷺ-এর তাস্বীহ ও দোয়ার বরকতেই তাঁর কবর প্রশস্ত হয়েছে।

١٢٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا الَّذِيْ تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ وَفُتِحَتْ لَهٗ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَشَهِدَهٗ سَبْعُوْنَ اَلْفًا مِنَ الْمَلٰئِكَةِ لَقَدْ ضُمَّ ضَمَّةً ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ ـ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

১২৮. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এই ব্যক্তির [সা'দ ইবনে মু'আযের] মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কেঁপেছিল। আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়েছিল এবং তাঁর জানাযায় সত্তর হাজার ফেরেশতা উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর কবরও সংকীর্ণ করা হয়েছিল এরপর প্রশস্ত করে দেওয়া হয়। –[নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ **দ্বারা উদ্দেশ্য :** হযরত সাদ ইবনে মু'আয (রা.)-এর মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছিল, এর দ্বারা কি উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে ? এ বিষয়ে হাদীসবিশারদগণ নিম্নোক্ত মতামত পেশ করেছেন—

১. এখানে تَحَرَّكَ শব্দটি اَلْاِرْتِيَاحُ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর اَلْاِرْتِيَاحُ শব্দের অর্থ হলো আনন্দিত বা খুশি হওয়া। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যে মর্যাদা দান করেছেন, তাতে আরশ নেচে উঠেছে।

২. অথবা, এই ঘটনার গুরুত্ব প্রকাশ করার জন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ কথা বলেছেন, যেমন আমরা বলে থাকি অমুকের মৃত্যুতে দুনিয়া অন্ধকার হয়ে গেছে।

وَعَنْ ١٢٩ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ (رض) قَالَتْ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَطِيْبًا فَذَكَرَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ الَّتِىْ يُفْتَنُ فِيْهَا الْمَرْءُ فَلَمَّا ذَكَرَ ذٰلِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُوْنَ ضَجَّةً . رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ هٰكَذَا وَ زَادَ النَّسَائِىُّ حَالَتْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ اَنْ اَفْهَمَ كَلَامَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا سَكَنَتْ ضَجَّتُهُمْ قُلْتُ لِرَجُلٍ قَرِيْبٍ مِنِّىْ اَىْ بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكَ مَاذَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ اٰخِرِ قَوْلِهٖ قَالَ قَالَ قَدْ اُوْحِىَ اِلَىَّ اَنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِى الْقُبُوْرِ قَرِيْبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ

১২৯. অনুবাদ : হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু বক্তব্য রাখার উদ্দেশ্যে এসে দাঁড়ালেন, অতঃপর তিনি কবরের পরীক্ষা সম্পর্কে বর্ণনা করলেন, যে পরীক্ষায় মানুষ নিপতিত হয়। যখন তিনি তা বর্ণনা করলেন, তখন উপস্থিত মুসলমানগণ খুব জোরে চিৎকার করে উঠলেন। ইমাম বুখারী এই পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম নাসায়ী নিম্নের কথাগুলো বৃদ্ধি করেছেন। হযরত আসমা (রা.) বলেন, তাদের চিৎকারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা বুঝতে আমি বাধাগ্রস্ত হয়েছিলাম। অতঃপর যখন তাদের চিৎকার বন্ধ হয়ে গেল, তখন আমি আমার নিকটস্থ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলাম, ওহে ! আল্লাহ তা'আলা তোমার মঙ্গল করুন! তুমি কি বলতে পার? রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বক্তব্যের শেষাংশে কি কথা বলেছেন? সে বলল, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার উপর এই মর্মে ওহী অবতীর্ণ হয়েছে যে, তোমরা দাজ্জালের ফেতনার ন্যায়ই কবরে ফেতনায় পতিত হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْمُرَادُ بِفِتْنَةِ الْقَبْرِ **কবরের ফিতনা দ্বারা উদ্দেশ্য :** কবরের ফিতনা বলতে মুনকার ও নকীরের প্রশ্নোত্তরের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা, মৃত ব্যক্তিকে কবরে সমাহিত করে আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশী চলে আসার পরপরই মুনকার-নকীর নামক দু'ফেরেশতা মৃত ব্যক্তির কবরে আসে এবং আল্লাহ পাকের নির্দেশে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করে নিম্নের প্রশ্নগুলো করে– ১. مَنْ رَبُّكَ অর্থাৎ তোমার পালনকর্তা কে ? ২. وَمَادِيْنُكَ তোমার দীন বা ধর্ম কি ? ৩. وَمَنْ هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِىْ بُعِثَ فِيْكُمْ ইনি কে, যাঁকে তোমাদের নিকট পাঠানো হয়েছিল ?

অতঃপর মৃত্যু ব্যক্তি সৎকর্মশীল ও ঈমানদার হলে সে প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিবে, বলবে– ১. رَبِّىَ اللّٰهُ অর্থাৎ, আল্লাহ আমার পালনকর্তা। ২. دِيْنِىَ الْاِسْلَامُ ইসলাম আমার দীন বা ধর্ম। ৩. وَهٰذَا نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ইনি আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ।

এরপর উক্ত ঈমনদার ব্যক্তিকে ফেরেশতাগণ জান্নাতের অনুগ্রহরাজি এবং জাহান্নামের শাস্তি প্রত্যক্ষ করাবে। তারপর আল্লাহ পাকের নির্দেশে তাঁর সাথে জান্নাতের সংযোগ স্থাপন করে দেবে। আর সে শান্তির সাথে কিয়ামত পর্যন্ত তথায় অবস্থান করবে।

মৃত ব্যক্তি বেঈমান ও বদ আমলকারী হলে সে ফেরেশতাদের কোনো প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারবে না। সে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে لَا اَدْرِىْ - لَا اَدْرِىْ বলবে। এরপরই ফেরেশতারা তাকে নানাভাবে শাস্তি দিতে থাকবে এবং জাহান্নামের সাথে তার কবরের সংযোগ করে দেওয়া হবে। কিয়ামত পর্যন্ত সে দোজখের শাস্তি ভোগ করবে। فِتْنَةُ الْقَبْرِ বা কবরের ফেতনা বলে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

اَلْمُرَادُ بِفِتْنَةِ الدَّجَّالِ **-দাজ্জালের ফিতনা দ্বারা উদ্দেশ্য :** কিয়ামত পূর্ববর্তী সময়ে দাজ্জালের ফিতনা দেখা দিবে। সে এমন কতগুলো বিস্ময়কর যাদু প্রদর্শন করবে যে, প্রকৃত ঈমানদার ব্যতীত কেউ তার ফেতনা থেকে রেহাই পাবে না। লোকেরা তাকে বিশ্বাস করে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। যাদু বলে সে মানুষকে জান্নাত এবং জাহান্নাম দেখাবে। কিন্তু সে যেটাকে জাহান্নাম হিসেবে দেখাবে আসলে সেটাই জান্নাত এবং যেটাকে জান্নাত হিসেবে দেখাবে সেটা জাহান্নাম। তার সাথে পানি ও আগুন থাকবে। সে যেটা আগুন হিসেবে দেখাবে সেটা প্রকৃতপক্ষে পানি আর যেটা পানি হিসেবে দেখাবে সেটা হবে আগুন। এ ছাড়া তার আদেশে আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষিত হবে, জমিন হতে ফসল উৎপন্ন হবে। তার বিস্ময়কর এ সব ক্ষমতা দেখে মানুষ ফেতনায় পতিত হবে। কিন্তু প্রকৃত ঈমানদারগণ তাকে দেখে চিনতে পারবে। দাজ্জালের কপালে كَافِرْ [কাফির] লেখা থাকবে এবং তার ডান চক্ষু কানা থাকবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ কবর ও দাজ্জালের ফেতনা হতে স্বয়ং আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন এবং মুসলমানদেরকেও তা হতে আশ্রয় প্রার্থনার শিক্ষা দিয়েছেন। অতএব আমাদেরকেও পাপিষ্ঠ দাজ্জালের ফেতনা থেকে বাঁচার জন্য মহান আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করতে হবে।

مَنْ يُسْأَلُ فِى الْقُبُوْرِ **-কবরে কাদেরকে প্রশ্ন করা হবে :** কবরে কাদেরকে প্রশ্ন করা হবে এ সম্পর্কে হাদীসবিশারদদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়–

১. ইমাম ইবনু আবদিল বার-এর মতে, কবরে শুধু মু'মিন ও মুনাফেকদের জিজ্ঞেস করা হবে। কারণ এ প্রশ্নগুলো হলো পাপী ও পুণ্যবানদের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য ; আর কাফিরদের তো কোনো পূণ্যই নেই।

২. ইবনুল কায়্যেমের মতে, শুধু মুনাফিকদের প্রশ্ন করা হবে। যে সকল হাদীসে কাফির এসেছে তা দ্বারা মুনাফিক উদ্দেশ্য। এটা আল্লামা সুয়ূতিরও অভিমত।

৩. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) ও অন্যান্যদের মতে, কাফিরদেরকেও প্রশ্ন করা হবে। কারণ তাদের কথাও কুরআন পাকে এসেছে।

وَعَنْ ١٣٠ جَابِرٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ مُثِّلَتْ لَهُ الشَّمْسُ عِنْدَ غُرُوْبِهَا فَيَجْلِسُ يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ وَيَقُوْلُ دَعُوْنِي أُصَلِّي - رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

১৩০. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, যখন কোনো ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয় তখন তার সম্মুখে সূর্যাস্তের সময়ের মতো একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। অতঃপর সে তার চক্ষুদ্বয় মুছতে মুছতে উঠে বসে, আর [যদি সে মু'মিন হয় তখন] বলে, আমাকে সুযোগ দাও! আমি নামাজ আদায় করব। –[ইবনে মাজাহ]

وَعَنْ ١٣١ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ يَصِيْرُ إِلَى الْقَبْرِ فَيَجْلِسُ الرَّجُلُ فِيْ قَبْرِهِ غَيْرَ فَزِعٍ وَلَا مَشْغُوْبٍ ثُمَّ يُقَالُ فِيْمَا كُنْتَ فَيَقُوْلُ كُنْتُ فِي الْإِسْلَامِ فَيُقَالُ مَا هٰذَا الرَّجُلُ فَيَقُوْلُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ فَصَدَّقْنَاهُ

১৩১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন মৃত ব্যক্তি কবরে গিয়ে পৌঁছে, [যদি সে মু'মিন হয়] তখন সে ভয়-ভীতিহীন ও চিন্তামুক্ত হয়ে উঠে বসে, অতঃপর তাকে প্রশ্ন করা হয় যে, তুমি কোন দীনের অনুসারী ছিলে ? উত্তরে সে বলে আমি ইসলামের মধ্যেই ছিলাম। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয় এই ব্যক্তি কে ? উত্তরে সে বলে, ইনি হযরত মুহাম্মাদ ﷺ যিনি আল্লাহর রাসূল। তিনি আল্লাহর নিকট হতে আমাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছেন, আর আমরা তাঁকে সত্যবাদী বলে, স্বীকার করে নিয়েছি।

فَيُقَالُ لَهُ هَلْ رَاَيْتَ اللّٰهَ فَيَقُوْلُ مَا يَنْبَغِى لِاَحَدٍ اَنْ يَرَى اللّٰهَ فَيُفَرَّجُ لَهُ فُرْجَةً قِبَلَ النَّارِ فَيَنْظُرُ اِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيُقَالُ لَهُ اُنْظُرْ اِلٰى مَا وَقَاكَ اللّٰهُ ثُمَّ يُفَرَّجُ لَهُ فُرْجَةً قِبَلَ الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ اِلٰى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيْهَا فَيُقَالُ لَهُ هٰذَا مَقْعَدُكَ عَلَى الْيَقِيْنِ كُنْتَ وَعَلَيْهِ مُتَّ وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَيَجْلِسُ الرَّجُلُ السُّوْءُ فِىْ قَبْرِهٖ فَزِعًا مَشْغُوْبًا فَيُقَالُ لَهُ فِيْمَ كُنْتَ فَيَقُوْلُ لَا اَدْرِىْ فَيُقَالُ لَهُ مَا هٰذَا الرَّجُلُ فَيَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ قَوْلًا فَقُلْتُهُ فَيُفَرَّجُ لَهُ فُرْجَةً قِبَلَ الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ اِلٰى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيْهَا فَيُقَالُ لَهُ اُنْظُرْ اِلٰى مَا صَرَفَ اللّٰهُ عَنْكَ ثُمَّ يُفَرَّجُ لَهُ فُرْجَةً اِلَى النَّارِ فَيَنْظُرُ اِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيُقَالُ لَهُ هٰذَا مَقْعَدُكَ عَلَى الشَّكِّ كُنْتَ وَعَلَيْهِ مُتَّ وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى - رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

এরপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয় তুমি কি আল্লাহকে দেখেছ? উত্তরে সে বলে পৃথিবীতে আল্লাহকে দেখা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। অতঃপর জাহান্নামের দিকে তার জন্য একটি সুড়ঙ্গ পথ খুলে দেওয়া হয়, তখন সে তার দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখতে পায় যে, আগুনের স্ফুলিঙ্গগুলো পরস্পর মিলিত হয়ে দাউ দাউ করছে ; তখন তাকে বলা হয়, দেখে নাও আল্লাহ তোমাকে যা হতে রক্ষা করেছেন। অতঃপর জান্নাতের দিকে তার জন্য একটি সুড়ঙ্গ পথ খুলে দেওয়া হয়, তখন সে তার মনোরম সৌন্দর্য এবং তার মধ্যে যা কিছু রয়েছে তা দেখতে পায়। অতঃপর তাকে বলা হয় এটাই তোমার অবস্থানের জায়গা। কেননা, তুমি পৃথিবীতে ঈমানের সাথে জীবন যাপন করেছ এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছ। আর আল্লাহর ইচ্ছায় কিয়ামতের দিন তুমি এই ঈমানের সাথেই পুনরুত্থিত হবে।

আর পাপী ব্যক্তি তার কবরের মধ্যে ভয়-বিহবল এবং ভাবনাযুক্ত অবস্থায় ওঠে বসে। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, তুমি কোন দীনের অনুসারী ছিলে ? উত্তরে সে বলে, আমি এ ব্যাপারে কিছুই জানি না। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, এই ব্যক্তি কে ? তখন সে বলে, আমি শুনেছি যে লোকেরা তাঁর সম্পর্কে একটি কথা বলে, আর আমিও তাই বলেছি। এরপর তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি সুড়ঙ্গ পথ খুলে দেওয়া হয়, তখন সে তার মনোরম দৃশ্য এবং তার মধ্যে যা কিছু বিদ্যমান রয়েছে তা দেখতে পায়। এরপর তাকে বলা হয়, দেখ! আল্লাহ তা'আলা তোমার নিকট থেকে তাঁর নিয়ামতসমূহ কিভাবে ছিনিয়ে নিয়েছেন। অতঃপর তার জন্য জাহান্নামের দিকে একটি সুড়ঙ্গ পথ খুলে দেওয়া হয়। ফলে সে তার দিকে দৃষ্টিপাত করে দখেতে পায় যে, আগুনের স্ফুলিঙ্গগুলো পরস্পর মিলিত হয়ে দাউ দাউ করছে। তখন তাকে বলা হয় যে, এটাই হলো তোমার প্রকৃত অবস্থানের জায়গা। তুমি সন্দেহ-সংশয়ের উপর থেকেই মৃত্যুবরণ করেছ। আর আল্লাহর ইচ্ছায় এ সংশয়ের উপরই কিয়ামতের দিন তোমাকে উঠানো হবে। –[ইবনে মাজাহ]

بَابُ الْاِعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

পরিচ্ছেদ : কিতাব ও সুন্নাহকে [দৃঢ়ভাবে] আঁকড়ে ধরা

اَلْاِعْتِصَامْ শব্দটি বাবে اِفْتِعَالْ-এর মাসদার, শাব্দিক অর্থ – দৃঢ়ভাবে ধারণ করা। যেমন, পবিত্র কুরআনে এসেছে— وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর। এখানে اَلْاِعْتِصَامْ অর্থ– শক্তভাবে ধারণ করা। আর حَبْلُ اللّٰهِ দ্বারা উদ্দেশ্য কুরআন ও সুন্নাহ। এখানে কুরআন উদ্দেশ্য তো সুস্পষ্ট। কেননা, হাদীসে এরূপই বর্ণিত আছে। আর সুন্নাহ উদ্দেশ্য এই অর্থে যে, কুরআনকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করাকেই আবশ্যক করে দেয়। কেননা, মহান আল্লাহ বলেন— وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا অর্থাৎ, রাসূল তোমাদের নিকট যা নিয়ে এসেছেন তা ধারণ কর, আর তিনি যা হতে নিষেধ করেছেন তা হতে বিরত থাকো।

উল্লেখ্য যে, এখানে اَلْكِتَابُ দ্বারা উদ্দেশ্য মহাগ্রন্থ আল-কুরআন, আর اَلسُّنَّةُ দ্বারা উদ্দেশ্য রাসূলের যাবতীয় কথা, কাজ ও অনুমোদন।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٣٢ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৩২. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের এই দীনে কোনো নতুন কিছু সৃষ্টি করে যা তার মধ্যে নেই তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য।–[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীসে মহানবী ﷺ দীনের মধ্যে নতুন কোনো কিছু সৃষ্টি করাকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আর উক্ত হাদীসের مَا لَيْسَ مِنْهُ -এর অর্থ হলো, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কুরআন বা হাদীসে নেই, এমনকি ইজমা-কিয়াসেও নেই। উল্লেখ্য যে, ইজমা-কিয়াস দ্বারা যা প্রমাণিত হয় তা পরোক্ষভাবে কিতাব ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমানিত। সুতরাং তাও দীনের অংশ।

وَعَنْ ١٣٣ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرَّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৩৩. **অনুবাদ :** হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ [কোনো এক ভাষণে] বলেন, সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহর বাণী। আর সর্বোত্তম জীবনাদর্শ হচ্ছে রাসূলে কারীম ﷺ-এর জীবনাদর্শ। আর নিকৃষ্টতম বিষয় হচ্ছে দীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি করা। আর প্রত্যেক বিদআত [নতুন সৃষ্টিই ভ্রষ্টতা।–[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَعْرِيْفُ الْبِدْعَةِ **বিদআতের পরিচয় :**

مَعْنَى الْبِدْعَةِ لُغَةً : **বিদ'আতের আভিধানিক সংজ্ঞা :** اَلْبِدْعَةُ শব্দটি বাবে فَتَحَ-এর মাসদার, শাব্দিক অর্থ– ১. كَوْنُ الشَّئِ بِلَا مِثَالٍ قَبْلَهٗ তথা নমুনা ছাড়া কোনো কিছু বানানো। এই দৃষ্টিকোণ হতে আল্লাহ হচ্ছেন بَدِيْعٌ যেমন,

কুরআনে এসেছে- اَللّٰهُ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ। ২. নতুন কিছু উদ্ভাবন করা। ৩. অভিনব কোনো কিছু তৈরি করা। ৪. ধর্মে নতুন বিষয় আবিষ্কার করা।

مَعْنَى الْبِدْعَةِ اِصْطِلَاحًا বিদআত -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন-(مِرْقَاتْ) اَلْبِدْعَةُ فِى الشَّرْعِ اِحْدَاثُ مَالَمْ يَكُنْ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.
অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে যা ছিল না, পরবর্তী সময় এমন কিছু সৃষ্টি করার নাম বিদআত।

২. ইমাম শাফিয়ী (র.) বলেন- . اَلْبِدْعَةُ هِىَ الَّتِىْ تُخَالِفُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَالْاَثَرَ وَالْاِجْمَاعَ

৩. ইমাম নববী (র.) বলেন- (حَاشِيَةُ الْمِشْكٰوة) اَلْبِدْعَةُ كُلُّ شَيْئٍ لَمْ يَكُنْ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

৪. তানবীরুল মিশকাতে বলা হয়েছে- . اَلْبِدْعَةُ هِىَ الْاِحْدَاثُ بَعْدَ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ شَيْئًا

৫. কারো কারো মতে- هُوَ اِحْدَاثُ مَالَمْ يَكُنْ فِىْ عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ

তথা যা হযরত নবী করীম ﷺ-এর যুগে ছিল না তাই বিদআত।

اَقْسَامُ الْبِدْعَةِ বিদআত-এর প্রকারভেদ : হাফিয ইবনুল আছীর নিহায়া গ্রন্থে بِدْعَةٌ -কে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা- (১) بِدْعَةُ هُدى (২) بِدْعَةُ ضَلَالَةٍ

১. بِدْعَةُ الْهُدٰى : যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের বিপরীত নয়, তাকে بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ বলে।

২. بِدْعَةُ الضَّلَالَةِ : যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের বিপরীত, তাকে بِدْعَةٌ سَيِّئَةٌ বলে।

■ শায়খ ইযযুদ্দীন স্বীয় قَوَاعِدْ গ্রন্থে بِدْعَةٌ -কে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা-

১. اَلْبِدْعَةُ الْوَاجِبَةُ : যেমন— কুরআন শিক্ষার জন্য নাহুশাস্ত্র শিক্ষা করা।

২. اَلْبِدْعَةُ الْمُحَرَّمَةُ : যেমন— জাবারিয়া ও কাদরিয়াদের ধর্ম দর্শন।

৩. اَلْبِدْعَةُ الْمَنْدُوْبَةُ : যা রাসূল ﷺ-এর যুগে করা না হলেও কাজগুলো ভালো, যেমন— মাদ্রাসা নিমার্ণ করা।

৪. اَلْبِدْعَةُ الْمَكْرُوْهَةُ : যেমন— মসজিদ সৌন্দর্যমণ্ডিত করা। এটা ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর অভিমত। আমাদের [হানাফী] মতে এটা মুবাহ।

৫. اَلْبِدْعَةُ الْمُبَاحَةُ : যেমন— থাকা-খাওয়ার মধ্যে প্রাচুর্য করা।

■ কিছু সংখ্যকের মতে, বিদআত দু' প্রকার। যথা—

১. بِدْعَةٌ فِى الدِّيْنِ তথা দীনের মধ্যে বিদ'আত। ২. بِدْعَةٌ لِلدِّيْنِ তথা দীনের স্বার্থে বিদ'আত।

وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ -এর মর্মার্থ : মহানবী ﷺ বিদআত প্রসঙ্গে বলেছেন— كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ অর্থাৎ, প্রত্যেক বিদআত পথভ্রষ্টতা। মুহাদ্দিসীনে কেরাম উদ্ধৃত অংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, كُلُّ بِدْعَةٍ سَيِّئَةٍ ضَلَالَةٌ
এ সম্পর্কে মহানবী ﷺ অন্যত্র ইরশাদ করেন- مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ
সুতরাং বলা যায়, যেসব বিদআত দীনের ব্যাপারে মতানৈক্য এবং সন্দেহ সৃষ্টি করে, সেসব বিদআত-ই পথভ্রষ্টতা।

حَيَاةُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.)-এর জীবনী :

১. **নাম ও বংশ পরিচয় :** তাঁর নাম জাবের, উপনাম আবূ আবদিল্লাহ। পিতার নাম আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস। তিনি সুলামী বংশোদ্ভূত একজন প্রখ্যাত আনসারী সাহাবী ছিলেন।

২. **ইসলাম গ্রহণ :** হযরত জাবের (রা.) আকাবায়ে উলাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। কেননা, প্রকাশ্য বর্ণনায় পাওয়া যায়, তিনি প্রথম আকাবায় সাতজনের একজন ছিলেন।

৩. **যুদ্ধে অংশগ্রহণ :** উহুদ যুদ্ধসহ পরবর্তী সকল যুদ্ধেই তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। মেশকাত সংকলকের বর্ণনা মতে, তিনি ১৮ টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

৪. **বসবাস :** তিনি মদীনা মুনাওয়ারা হতে সিরিয়ায় গমন করেন এবং তথা হতে মিশর চলে যান। মিশর এবং সিরিয়াতেই তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করে। তবে শেষ বয়সে তিনি সিরিয়াতে অবস্থান করেন এবং এখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

৫. **ইন্তেকাল :** হযরত জাবের (রা.) শেষ বয়সে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে অন্ধ হয়ে যান এবং ৯৪ বছর বয়সে আবদুল মালেকের খিলাফত আমলে ৭৪ হিজরিতে মদীনায় ইন্তেকাল করেন।

وَعَنْ ١٣٤ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبْغَضُ النَّاسِ اِلَى اللّٰهِ ثَلٰثَةٌ مُلْحِدٌ فِى الْحَرَمِ وَمُبْتَغٍ فِى الْاِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهْرِيْقَ دَمَهُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৩৪. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— আল্লাহর নিকট তিন ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি ঘৃণিত— (১) যে ব্যক্তি হেরেমের অভ্যন্তরে কোনো পাপ কাজে লিপ্ত হয়। (২) যে ব্যক্তি ইসলামে থাকা অবস্থায় অন্ধকার যুগের কোনো রীতিনীতি অনুসরণ করে এবং (৩) যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে শুধু রক্তপাতের মানসে কোনো মুসলমানের রক্তপাত কামনা করে। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, তিন শ্রেণীর লোক আল্লাহর নিকট অত্যন্ত ঘৃণিত। কেননা, ইলহাদ বা খোদাদ্রোহীতা তো এমনিতেই নিন্দনীয়, তদুপরি হেরেম শরীফের ন্যায় পবিত্রতম স্থানে এরূপ কাজে লিপ্ত হওয়া অত্যধিক নিন্দিত কর্ম। এমনিভাবে জাহিলিয়া যুগের কুসংস্কার ও কুপ্রথা এমনিতেই ঘৃণিত। এ ছাড়া ইসলাম গ্রহণের পর ইসলামি শিক্ষা-দীক্ষা ও আলোপ্রাপ্ত হওয়ার পর নিন্দিত কুসংস্কার ও কুপ্রথা অনুসরণ করা খুবই ঘৃণিত কর্ম। তদ্রূপ অন্যায়ভাবে মুসলমানকে হত্যা করাও অধিক নিন্দিত কাজ। এ জন্য এই তিন শ্রেণীর লোকের উপর মহান আল্লাহ অত্যধিক ক্রোধান্বিত। এরা আল্লাহর অভিসম্পাতপ্রাপ্ত।

وَعَنْ ١٣٥ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ اُمَّتِىْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ اَبٰى قِيْلَ وَمَنْ اَبٰى قَالَ مَنْ اَطَاعَنِىْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ اَبٰى - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৩৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন—যে ব্যক্তি আমাকে অস্বীকার করে সে ব্যতীত আমার সকল উম্মতই জান্নাতে গমন করবে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, [হে আল্লাহর রাসূল ﷺ!] কে আপনাকে অস্বীকার করে? তিনি বললেন, যে আমার আনুগত্য স্বীকার করে সে জান্নাতে যাবে ; আর যে আমার অবাধ্যতা করে সেই আমাকে অস্বীকার করে। -[বুখারী]

وَعَنْ ١٣٦ جَابِرٍ (رض) قَالَ جَاءَتْ مَلٰئِكَةٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ نَائِمٌ فَقَالُوْا اِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هٰذَا مَثَلًا فَاضْرِبُوْا لَهُ مَثَلًا قَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّهُ نَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ فَقَالُوْا مَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنٰى دَارًا وَجَعَلَ فِيْهَا مَاْدُبَةً

১৩৬. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন একদল ফেরেশতা নবী করীম ﷺ-এর নিকট আগমন করলেন, তখন নবী করীম ﷺ নিদ্রিত ছিলেন। তখন ফেরেশতাগণ পরস্পর বলাবলি করতে লাগলেন, তোমাদের এই (নিদ্রিত) বন্ধুর একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে। অতএব তাঁর দৃষ্টান্ত বা উদাহরণটি পেশ কর। কিন্তু তাঁদের মধ্য হতে কেউ বললেন, তিনি তো নিদ্রামগ্ন রয়েছেন। তখন তাঁদের কেউ বললেন, তাঁর চক্ষু নিদ্রিত হলেও তাঁর হৃদয় জাগ্রত। অপর একদল বলল, তাঁর উদাহরণ হলো, এমন ব্যক্তির ন্যায় যে একটি ঘর তৈরি করল এবং তাতে খাবার-দাবারের ব্যবস্থাও করে

وَبَعَثَ دَاعِيًا فَمَنْ اَجَابَ الدَّاعِيَ دَخَلَ الدَّارَ وَاَكَلَ مِنَ الْمَادُبَةِ وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَاْكُلْ مِنَ الْمَادُبَةِ فَقَالُوْا اَوِّلُوْهَا لَهُ يَفْقَهْهَا قَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّهُ نَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبُ يَقْظَانُ فَقَالُوْا الدَّارُ اَلْجَنَّةُ وَالدَّاعِيْ مُحَمَّدٌ فَمَنْ اَطَاعَ مُحَمَّدًا فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصٰى مُحَمَّدًا فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

রেখেছেন। অতঃপর লোকদের ডাকার জন্য একজন আহবানকারীও প্রেরণ করল। ফলে যে ব্যক্তি তার ডাকে সাড়া দিল সে ঘরে প্রবেশ করতে পারল এবং খেতেও পারল। আর যে তার ডাকে সাড়া দিল না সে ঘরেও প্রবেশ করতে পারল না এবং দস্তরখান হতে খাবারও খেতে পারল না। অতঃপর তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল যে, এই উদাহরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে দাও যাতে সে তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। তখন তাদের মধ্যে কেউ বললেন, তিনি তো নিদ্রামগ্ন। অপর একদল বলল, তাঁর চক্ষু নিদ্রামগ্ন কিন্তু তাঁর অন্তর জাগ্রত। এরপর তাঁরা বললেন, ঘরটি হলো বেহেশত, আর আহবানকারী হচ্ছেন মুহাম্মদ ﷺ। অতএব যে ব্যক্তি মুহাম্মদ ﷺ-এর আনুগত্য স্বীকার করল সে যেন আল্লাহর আনুগত্য করল, আর যে মুহাম্মদ ﷺ-এর অবাধ্য হলো সে আল্লাহর নাফরমানী করল, আর মুহাম্মদ ﷺ-ই হলেন মানুষের সাথে পার্থক্য নির্ধারণকারী মানদণ্ড স্বরূপ। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبُ يَقْظَانُ-এর মর্মার্থ : মহানবী ﷺ আল্লাহ পাকের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। তাঁর বৈশিষ্ট্য সাধারণ মানুষের বৈশিষ্ট্য হতে আলাদা। বাহ্যিক আচার-আচরণ দ্বারা তাঁকে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। ফেরেশতারা অনেকেই তাঁর মাহাত্ম্য সম্পর্কে অবগত, যদিও তাঁরা তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় পেয়েছেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে গভীর জ্ঞানের অধিকারীরা জানতেন ওহী লাভের জন্য তাঁর হৃদয় সর্বদা জাগ্রত থাকত। পার্থিব চাহিদা মেটানোর জন্য যখন তিনি ঘুমান তখনও তাঁর হৃদয় সচেতন থাকে। এটা তাঁর একটি মু'জিযা। এটাই হলো ফেরেশতাদের اِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبُ يَقْظَانُ উক্তির মর্মার্থ।

اَلْفَائِدَةُ بِتَكْرَارِهَا একই কথা বারবার বলার উপকারিতা : ফেরেশতারা দু'বার বললেন, "তাঁর চক্ষু ঘুমন্ত থাকলেও তাঁর হৃদয় জাগ্রত" -এর কারণ :

১. বাকি ফেরেশতারা এবং অন্যান্য মানুষ যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মহান মু'জিযা সম্পর্কে জানতে পারে। যদিও সাময়িক ক্লান্তি নিরসনের জন্য তিনি স্বাভাবিক নিদ্রা যান, তথাপি তাঁর হৃদয় জাগ্রত থাকে। এ লক্ষ্যেই উক্তিটি পুনর্বার বলা হয়েছে।

২. অথবা, এটা যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য তা বুঝানোর জন্য দ্বিরুক্ত করা হয়েছে।

تَعَارُضْ -এর সমাধান : হুনায়নের যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনকালে হযরত বেলাল (রা.)-কে পাহারায় রেখে ঘুমের তীব্রতার কারণে মহানবী ﷺ সাহাবীদের নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। ফলে মহানবী ﷺ এবং সাহাবীদের সকলের নামাজ কাযা হয়ে যায়। এতে বুঝা যায় যে, মহানবী ﷺ-এর অন্তর ও অন্য যে কোনো মানুষের মত ঘুমের মধ্যে অচেতন হয়, যা আলোচ্য হাদীসের বিপরীত বলে মনে হয়। এ বিরোধের সমাধানকল্পে বলা যায় যে,

১. এটা মূলত মানব প্রকৃতির কারণে হয়েছিল। আল্লাহ পাক তাঁকে মানুষ রূপে পৃথিবীবাসীর কাছে পরিচিত করিয়েছেন এভাবে।

২. হয়তো বা এতে আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে কোনো হেকমত নিহিত ছিল, যার কারণে তাঁর চক্ষু ও হৃদয় তখন নিদ্রিত ছিল।

৩. রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন শরিয়তের বিধানদাতা। তাই আল্লাহ তা'আলা কাযার বিধান চালু করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্তর এবং দেহ উভয়টিকে তখন নিদ্রামগ্ন করে দিয়েছিলেন।

وَعَنْ ١٣٧ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ جَاءَ ثَلٰثَةُ رَهْطٍ اِلٰى اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا اُخْبِرُوْا بِهَا كَاَنَّهُمْ تَقَالُّوْهَا فَقَالُوْا اَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَهٗ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَمَا تَاَخَّرَ فَقَالَ اَحَدُهُمْ اَمَّا اَنَا فَاُصَلِّى اللَّيْلَ اَبَدًا وَقَالَ الْاٰخَرُ اَنَا اَصُوْمُ النَّهَارَ اَبَدًا وَلَا اُفْطِرُ وَقَالَ الْاٰخَرُ اَنَا اَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا اَتَزَوَّجُ اَبَدًا فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ اِلَيْهِمْ فَقَالَ اَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا اَمَا وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَاَتْقَاكُمْ لَهٗ لٰكِنِّىْ اَصُوْمُ وَ اُفْطِرُ وَ اُصَلِّىْ وَ اَرْقُدُ وَ اَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৩৭. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তিন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীগণের নিকট এসেছিল নবী করীম ﷺ-এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য। অতঃপর যখন তাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইবাদত সম্পর্কে বলা হলো, তখন তারা তাকে কম বলে মনে করল। অতঃপর তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোথায় আর আমরা কোথায় [তাঁর সাথে আমাদের তুলনাই হয় না]। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তাঁর পূর্বাপর সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। অতঃপর তাদের একজন বলল, আমি সর্বদা রাতভর নামাজ আদায় করব, অপর একজন বলল, আমি সব সময় দিনের বেলায় রোজা পালন করব। কখনো রোজা ত্যাগ করব না। তৃতীয় ব্যক্তি বলল, আমি সর্বদা মহিলাদের থেকে দূরে থাকব এবং কখনো বিবাহ করব না। ঠিক এমনি সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সম্মুখে এসে হাজির হলেন এবং বললেন, তোমরা কি এরূপ এরূপ কথা বলেছ? আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের অপেক্ষা আল্লাহকে অধিক ভয় করি এবং অধিক খোদাভীরুতা অবলম্ব করি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি কখনো রোজা রাখি, আবার কখনো বিরতি দেই, রাত জাগরণ করি আবার ঘুমিয়েও থাকি, আর আমি বিবাহও করি [তথা স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা করি]। সুতরাং যারা আমার সুন্নত তথা জীবন-পদ্ধতি হতে বিরাগ ভাবাপন্ন হয়, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়। –[বুখারী, মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** ইসলাম হলো একটি সহজ-সরল জীবন ব্যবস্থা। ফলে ইবাদতের ক্ষেত্রে অধিক বাড়াবাড়ি এবং অত্যধিক শৈথিল্য কোনোটাকেই স্বীকৃতি দেয় না। কেননা অধিক ইবাদত করতে গেলে পরিবার-পরিজন, সমাজ ব্যবস্থা, নিজের শরীর সবখানেই ত্রুটি দেখা দিতে পারে। যেমন– বেশি ইবাদত করলে শরীরের দুর্বলতার ফলে ইবাদতে অমনোযোগিতা সৃষ্টি হয়, তখন মূল ইবাদত করাই কষ্টকর হয়ে পড়ে। এ জন্য নবী করীম ﷺ মধ্যপন্থা অবলম্বন করার নীতি পছন্দ করেছেন এবং অপরকেও তা করার নির্দেশ প্রদান করেছেন।

وَعَنْ ١٣٨ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ صَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا فَرَخَّصَ فِيْهِ فَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللّٰهَ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ اَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُوْنَ عَنِ الشَّيْءِ اَصْنَعُهٗ فَوَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَعْلَمُهُمْ بِاللّٰهِ وَاَشَدُّهُمْ لَهٗ خَشْيَةً ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৩৮. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি কাজ করলেন [অর্থাৎ সফর অবস্থায় রোজা ছেড়ে দিলেন] এবং সে জন্য অন্যদেরকেও অনুমতি প্রদান করলেন, এতদসত্ত্বেও কিছু সংখ্যক লোক তা হতে বিরত থাকলেন; কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এই সংবাদ পৌঁছল, ফলে তিনি তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করলেন এবং সর্বপ্রথম আল্লাহর প্রশংসা করলেন। এরপর বললেন, সে সকল লোকদের কি হলো, যে আমি যা করি তা হতে তারা বিরত থাকে। আল্লাহর কসম! আমি তাদের চেয়ে আল্লাহকে অধিক জানি এবং তাদের অপেক্ষা আল্লাহকে অধিক ভয় করি।–[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْث **হাদীসের ব্যাখ্যা :** ইসলামি জীবন ব্যবস্থায় কোনো বাড়াবাড়ি নেই। ক্ষেত্র বিশেষে মানুষকে ইবাদতের মধ্যে ঐচ্ছিকতা প্রদান করা হয়েছে, আর কখনো কঠোরতাও করা হয়েছে। এই হিসেবে শরিয়তের বিধান দু' শ্রেণীতে বিভক্ত– (১) আযীমত ও (২) রুখসাত।

১. عَزِيْمَةٌ : যে বিধান যেভাবে কার্যকরী করার নির্দেশ রয়েছে ঠিক অনুরূপভাবে বহাল রাখার নাম হলো 'আযীমত'। যেমন— রমজান মাসের রোজা ফরজ। সুতরাং তা পালন করা عَزِيْمَة

২. رُخْصَتٌ : আর কোনো কারণে তা শিথিল হওয়াকে বলা হয় 'রুখসত'। যেমন– যদি কেউ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে কিংবা সফরে বের হয়, তখন রোজা না রেখে সুস্থ হওয়ার পর কিংবা সফর শেষে বাড়ি-ঘরে ফিরে আসার পর সেগুলো কাযা করার অনুমতি আছে। আর এর নাম হলো رُخْصَتْ সুতরাং মুসাফির রোজা রাখলে 'আযীমত' পালন করল, আর সফর অবস্থায় রোজা ছেড়ে দিলে সে রুখসতের উপর আমল করল। তবে কোনো কোনো সময় আযীমতের উপর অবিচল থাকাই উত্তম। যেমন–কোনো ব্যক্তিকে কুফরি বাক্য উচ্চারণ করার জন্য বাধ্য করা হলে এবং না করলে তার প্রাণ নাশের হুমকি দেওয়া হলে তখন তার জন্য কুফরি বাক্য কেবল মৌখিকভাবে উচ্চারণ করে প্রাণ রক্ষা করার রুখসত বা অনুমতি আছে, তবে এরূপ অবস্থায়ও কুফরি কালাম উচ্চারণ না করা আযীমত। মোটকথা, যেখানে যা করলে আল্লাহ ও রাসূল সন্তুষ্ট হন সেখানে তা করার নামই ইবাদত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদেশ অমান্য করে عَزِيْمَة-এর উপরও আমল করা ঠিক নয়।

وَعَنْ ١٣٩ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ (رض) قَالَ قَدِمَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يُابِّرُوْنَ النَّخْلَ فَقَالَ مَا تَصْنَعُوْنَ قَالُوْا كُنَّا نَصْنَعُهُ قَالَ لَعَلَّكُمْ لَوْلَمْ تَفْعَلُوْا كَانَ خَيْرًا فَتَرَكُوْهُ فَنَقَصَتْ قَالَ فَذَكَرُوْا ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ اَمْرِ دِيْنِكُمْ فَخُذُوْا بِهِ وَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيِىْ فَاِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৩৯. অনুবাদ : হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর নবী ﷺ যখন হিজরত করে মদীনায় আগমন করলেন, তখন দেখলেন মদীনার লোকেরা খেজুর বৃক্ষে পরাগায়ন করছে। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এরূপ করছ কেন? তারা বলল, পূর্ব থেকে আমরা এরূপ করে আসছি। অতঃপর তিনি বললেন, আমি মনে করি, তোমরা এরূপ না করলেই উত্তম হতো, ফলে তারা তা ত্যাগ করল। কিন্তু এতে সে বছর ফলন কম হলো।

বর্ণনাকারী বলেন, লোকেরা এ ঘটনা তাঁকে [অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে] জানাল। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের ন্যায় একজন মানুষই। অবশ্য আমি যখন দীন সম্পর্কে তোমাদেরকে কোনো কিছুর নির্দেশ দেই, তখন তোমরা তা অনুসরণ করবে। আর আমি যখন পার্থিব বিষয়ে আমার নিজের মতানুসারে তোমাদেরকে কোনো নির্দেশ দেই, তখন তোমরা মনে রাখবে যে, আমিও একজন মানুষ। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَقْتُ قُدُوْمِ النَّبِيِّ الْمَدِيْنَةَ **রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মদীনায় আগমনের সময়কাল :** মহানবী ﷺ মক্কায় ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে স্বগোত্রীয়দের দ্বারা অত্যাচারিত ও নির্যাতিত হয়ে নবুয়তের ত্রয়োদশ বর্ষে ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদীনায় হিজরত করেন।

مَعْنَى التَّابِيْر **-এর অর্থ :**

مَعْنَى التَّابِيْر لُغَةً : اَلتَّابِيْرُ শব্দটি বাবে تَفْعِيْل-এর মাসদার اِبْر মূলধাতু হতে নির্গত, এর শাব্দিক অর্থ নিম্নরূপ– ১. اَلْاِصْلَاحُ (সংশোধন করা,) ২. اَلْاِهْلَاكُ [ধ্বংস করা,] ৩. اَلشَّقُّ [বিদীর্ণ করা,] ৪. اَلتَّفْسِيْر [বিশ্লেষণ করা।]

مَعْنَى التَّابِيْرِ اِصْطِلَاحًا : পরিভাষায় নর গাছের ফুলের কেশর নিয়ে মাদী গাছের মুকুলে সংযুক্ত করাকে تَابِيْر বলা হয়।

ইমাম নববী এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে বলেন—

১. هُوَ اَنْ يَّشُقَّ طَلْعَ النَّخْلَةِ لِبَذَرٍ فِيْهِ شَيْئٌ مِنْ طَلْعِ ذَكَرِ النَّخْلِ অর্থাৎ, গাছে খেজুর বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্ত্রী খেজুর গাছের কাঁধিকে বিদীর্ণ করে তথায় পুরুষ খেজুরের পুষ্প কুঁড়ি প্রবিষ্ট করাকে تَابِيْر বলা হয়।

মেশকাত শরীফের পার্শ্বটীকায় বলা হয়েছে—

২. اَلتَّابِيْرُ هُوَ الْاِصْلَاحُ وَالْمَعْنٰى يُشَقِّقُوْنَ طَلْعَ الْاُنَاثِ وَيُبَذِّرُوْنَ فِيْهِ طَلْعَ الذُّكُوْرِ لِيَجِيْئَ بِثَمَرَةٍ جَيِّدَةٍ
মূলত আধুনিক কৃষি-বিজ্ঞানের পরাগায়ন পদ্ধতিকে تَابِيْر বলা হয়। আরবরা এজন্য মাদী খেজুর গাছের ফুলের কলি ফেড়ে তার মধ্যে পুরুষ গাছের পুষ্পকুঁড়ি লাগিয়ে দিত। এর ফলে খেজুরের উৎপাদন বেশি হতো।

وَجْهُ مَنْعِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ التَّأْبِيْرِ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কর্তৃক পরাগায়ন করতে নিষেধ করার কারণ :

১. বাহ্যত মনে হয় রাসূলুল্লাহ ﷺ تَابِيْر করা হতে মানুষকে নিষেধ করেছেন; কিন্তু মূলত তিনি নিষেধ করেননি। কারণ রাসূলুল্লহ ﷺ-এর ভাষ্য হলো— لَعَلَّكُمْ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوْا كَانَ خَيْرًا অর্থাৎ, যদি তোমরা পরাগায়ন না কর তবে হয়ত তা তোমাদের জন্য উত্তম হবে। এটা পরামর্শমূলক কথা, নিষেধাজ্ঞা নয়।

২. تَابِيْر প্রক্রিয়া আরবে বহুযুগ আগের একটা প্রাচীন প্রক্রিয়া। হয়ত রাসূলুল্লাহ ﷺ ভেবেছিলেন যে, এটা একটি জাহিলিয়া প্রক্রিয়া। তাই তিনি ধারণা করেছিলেন, সম্ভত এটা ইসলামে সমর্থনযোগ্য নয়। এজন্য তিনি তা থেকে লোকদেরকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

৩. تَابِيْر প্রক্রিয়ার মাধ্যমে খেজুর উৎপাদনের ফলে আরবের লোকেরা খেজুর উৎপাদনের ব্যাপারে আল্লাহর পরিবর্তে تَابِيْر-এর উপরই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল, এজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ তা পছন্দ করেননি। তাই তিনি تَابِيْر পরিত্যাগ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

সর্বোপরি কথা হলো, কোনো দুনিয়াবী ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ পরামর্শ দিলে তা যদি বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় তবে তা পালন করা অপরিহার্য নয়। কেননা তিনি এ ব্যাপারে নিজেই বলেছেন-. تَابِيْرُ النَّخْلِ এটা দুনিয়াবী ব্যাপার। বাস্তবতার আলোকে দেখা গেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিষেধাজ্ঞাটা ফলপ্রসূ হয়নি, তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই দুনিয়াবী বিষয়ে তাঁর অভিমত সর্ব ক্ষেত্রে যথাযথ নাও হতে পারে সে কথা জানিয়ে দেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী- اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ-এর মর্মার্থ : মহানবী ﷺ-এর বাণী اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ-এর শাব্দিক অর্থ হলো– নিশ্চয়ই আমি একজন মানুষ বৈ আর কিছুই নই। এ মর্মে মহাগ্রন্থ আল্ কুরআনে বলা হয়েছে— قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰى اِلَيَّ অর্থাৎ, হে নবী ! আপনি মানুষদের বলে দিন, আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ, তবে আমার নিকট মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে ওহী অবতীর্ণ হয়।

নাহুবিদদের মতে, উক্তহাদীসে اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ-এর মধ্যে اِنَّمَا শর্তের جَزَاءٌ রূপে। ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, রাসূল ﷺ বলেন, আমি কোনো কোনো বিষয়ে নিজস্ব অভিমত ও চিন্তাধারার ভিত্তিতে কোনো নির্দেশ প্রদান করলে তা সঠিক বা ভুল হতে পারে। সুতরাং ভুল হলে তোমরা তা বর্জন করবে। মূলত মহানবী ﷺ-এর অভীষ্ট লক্ষ্যবস্তু ছিল, একমাত্র পরকাল এবং হিদায়েতের মাধ্যমে মানুষের মুক্তির পথ উন্মোচন করা, আর সে ব্যাপারে তিনি কখনো ভুল সমাধান দেননি। এ মর্মে কুরআনের বাণী– وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى

اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ-কে পুনর্বার উল্লেখ করার কারণ : নবী করীম ﷺ تَابِيْر نَخْل-এর ব্যাপারে যে নির্দেশ দিয়েছেন মদীনাবাসীগণ সে নির্দেশ অনুযায়ী চাষ করায় ফলন কমে গিয়েছিল। সে কথা জানানোর পর নবী করীম ﷺ তার উত্তরে বলেন, اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ এ কথাটি মহানবী ﷺ বারবার বলে এ বিষয়ের প্রতি জোর দিয়েছেন যে, তিনি ﷺ একজন মানুষ হিসেবে দুনিয়াবী বিষয়ে তাঁর পরামর্শ ও মতামতে ত্রুটি হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

هَلْ صَدَرَ الْخَطَأُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ : নবী করীম ﷺ হতে কোনো ভুল প্রকাশিত হয়েছে কি-না : মহানবী ﷺ থেকে কোনো ভুল-ভ্রান্তি প্রকাশিত হতে পারে কিনা এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতামত নিম্নরূপ।

দীনি ব্যাপারে কোনো ভুল প্রকাশিত হয়নি : হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর থেকে রিসালাত তথা দীনের কোনো বিষয়ে তাঁর ভুল হতে পারে না এবং এরূপ চিন্তা করাটাও অনুচিত। কারণ দীনের ব্যাপারে তিনি ওহীর মাধ্যমেই সমাধান দিতেন।

দলিল : وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى

দুনিয়াবী বিষয়ে খুটিনাটি ভুল-ত্রুটি হতে পারে : রাসূলুল্লাহ ﷺ যেহেতু একজন মানুষ। তাই দুনিয়াবী বিষয়ে কোনো ভুল-ত্রুটি প্রকাশ পাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়।

দলিল : আলোচ্য হাদীস– اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ اَمْرِ دِيْنِكُمْ فَخُذُوْا بِهٖ وَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيِىْ فَاِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ এখানে বলা হয়েছে, " مِنْ رَأْيِىْ "-এর অর্থ– আমার নিজস্ব মতামত। আর শরয়ী দিক নির্দেশনাহীন নিজস্ব মতামত ভুল হতে পারে, তারই প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— فَاِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ আমি অবশ্যই একজন মানুষ।

■ فَيْضُ الْبَارِىْ -এর গ্রন্থকার বলেন– اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ -এর আলেমরা এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, ভুলবশত সগীরা গুনাহসমূহ রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে প্রকাশিত হতে পারে।

وَعَنْ ١٤٠ اَبِىْ مُوْسٰى (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا مَثَلِىْ وَ مَثَلُ مَا بَعَثَنِىَ اللّٰهُ بِهٖ كَمَثَلِ رَجُلٍ اَتٰى قَوْمًا فَقَالَ يَاقَوْمِ اِنِّىْ رَاَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَىَّ وَاِنِّىْ اَنَا النَّذِيْرُ الْعُرْيَانُ فَالنَّجَاءُ النَّجَاءُ فَاَطَاعَهٗ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهٖ فَاَدْلَجُوْا فَانْطَلَقُوْا عَلٰى مَهْلِهِمْ فَنَجَوْا وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَاَصْبَحُوْا مَكَانَهُمْ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَاَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ فَذٰلِكَ مَثَلُ مَنْ اَطَاعَنِىْ فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهٖ وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِىْ وَكَذَّبَ مَا جِئْتُ بِهٖ مِنَ الْحَقِّ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৪০. অনুবাদ : হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— আমার এবং যে বিষয় সহকারে আল্লাহ আমাকে প্রেরণ করেছেন, তার উদাহরণ হলো এমন এক ব্যক্তির মতো, যে তার জাতির নিকট এসে বলল, হে আমার জাতি ! আমি আমার দু'চোখে শত্রুসৈন্য দেখে এসেছি, আর আমি হলাম তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট সতর্ককারী। অতএব শীঘ্র [তোমরা মুক্তির পথ সন্ধান] কর, শীঘ্র [মুক্তির পথ সন্ধান] কর। এ কথা শোনার পর তার কওমের একদল লোক তার কথা মানল এবং রাতারাতিই চলে গেল। ফলে তারা ধীরে-সুস্থে যেতে পারল এবং মুক্তি পেল। আর একদল লোক তার কথাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিল এবং ভোর পর্যন্ত নিজেদের অবস্থানেই রয়ে গেল। অবশেষে ভোরবেলা শত্রুসৈন্য তাদেরকে সমূলে নিশ্চিহ্ন করে ফেলল। সুতরাং এ হলো সে ব্যক্তির উদাহরণ যে ব্যক্তি আমার ও আমি যা নিয়ে এসেছি, তার আনুগত্য করল এবং সে ব্যক্তির উদাহরণ যে আমার অবাধ্য হলো ও আমি যে সত্য তার নিকট নিয়ে এসেছি তাকে সে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল।-[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلنَّذِيْرُ الْعُرْيَانُ **-এর অর্থ :** প্রাচীনকাল হতে আরব দেশে এ ধরনের নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, যদি এলাকায় কোনো বহিঃশত্রু আক্রমণ করতে আসত এবং যখন এটা কেউ দেখত বা অনুমান করত, তখন সে উলঙ্গ হয়ে এলাকায় চিৎকার করে বলত, হে লোক সকল ! তোমরা সতর্কতা অবলম্বন কর। এ প্রক্রিয়ায় সতর্ককারীর সতর্কবাণী তারা নির্দ্বিধায় মেনে নিত এবং শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার উপায় খুঁজত। কেননা, সে সময়কার লোকেরা এর বিকল্প কোনো পন্থায় বিশ্বাসী ছিল না।

এমনিভাবে মহানবী ﷺ ছিলেন বিশ্ববাসীর জন্য বজ্রনির্ঘোষী সতর্ককারী। তিনি ধ্বংসোম্মুখ মানব জাতিকে জাহান্নামের আগুন থেকে আত্মরক্ষা করার পথে আহ্বান করেন। আর তিনি হলেন আল্লাহর আজাব সম্পর্কে সত্য সংবাদবাহক। তাই তিনি সত্যতা প্রমাণের জন্য প্রাচীন আরবের উপমাটি ব্যবহার করে বলেছেন যে, আমিও সেই শত্রুবাহিনী সম্পর্কে ব্যতিক্রমধর্মী পন্থায় সতর্ককারী ব্যক্তির মতো উচ্চ নিনাদে পরকালের আজাব সম্পর্কে সতর্ক করছি।

فَالنَّجَاءُ النَّجَاءُ -এর অর্থ : আরবি ভাষায় فَالنَّجَاءُ النَّجَاءُ একটি দ্বিরুক্তিমূলক বাক্য, যা জোর প্রদান এবং অধিক গুরুত্ব বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন– বাংলায় বলা হয়, "বাঁচাও ! বাঁচাও !" এমনি আরবি ভাষায় নিরাপত্তা ও শত্রু হতে মুক্তিলাভ করার জন্য اَلنَّجَاءُ النَّجَاءُ বলা হয়ে থাকে। এর শাব্দিক অর্থ, "শীঘ্র কর, শীঘ্র কর" সুতরাং আলোচ্য হাদীসে দ্বিতীয় اَلنَّجَاءُ টি গুরুত্ব এবং জোর প্রদানার্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -এর অর্থ : مُتَّفَقٌ শব্দটি بَابُ اِفْتِعَالٌ হতে اِسْمُ مَفْعُوْلٍ -এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ -এর সীগাহ। মাসদার اَلْاِتِّفَاقُ -এর শাব্দিক অর্থ– মিলিত, ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত ইত্যাদি। সুতরাং مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ অর্থ–যার উপর একাধিক মতামত মিলিত হয়েছে, ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. ইলমে হাদীসের পরিভাষায় ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) উভয়ে যে হাদীস বর্ণনা ও সংকলনে ঐকমত্য পোষণ করেছেন, উক্ত হাদীসকে مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ বলা হয়।

২. ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, একই বর্ণনাকারী হতে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র.) যে হাদীস সংকলন করেছেন, তাকে مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ হাদীস বলে।

وَعَنْ ١٤١ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلِىْ كَمَثَلِ رَجُلٍ اِسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا اَضَاءَتْ مَا حَوْلَهَا جَعَلَ الْفَرَاشُ وَ هٰذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِىْ تَقَعُ فِى النَّارِ يَقَعْنَ فِيْهَا وَجَعَلَ يَحْجِزُهُنَّ وَيَغْلِبْنَهُ فَيَتَقَحَّمْنَ فِيْهَا فَاَنَا اٰخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَاَنْتُمْ تَقَحَّمُوْنَ فِيْهَا هٰذِهٖ رِوَايَةُ الْبُخَارِيِّ وَلِمُسْلِمٍ نَحْوُهَا وَقَالَ فِىْ اٰخِرِهَا قَالَ فَذٰلِكَ مَثَلِىْ وَمَثَلُكُمْ اَنَا اٰخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ فَتَغْلِبُوْنِىْ تَقَحَّمُوْنَ فِيْهَا ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৪১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– আমার উদাহরণ হচ্ছে সে ব্যক্তির মতো যে আগুন প্রজ্বলিত করল। অতঃপর সে আগুন যখন চতুর্দিক আলোকিত করল এবং পতঙ্গসমূহ ও অন্য সকল পোকামাকড় যেগুলো আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেগুলো ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল আর সে ব্যক্তি সেগুলোকে প্রতিহত করতে লাগল; কিন্তু সেগুলো তাকে পরাস্ত করে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। অনুরূপ আমিও তোমাদের কোমর ধরে তোমাদেরকে আগুন হতে রক্ষা করার জন্য টেনে ধরছি। আর তোমরা তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ছ। [এটা ইমাম বুখারী (র.)-এর বর্ণনা।] ইমাম মুসলিমও এরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি হাদীসের শেষাংশে এতটুকু বেশি উল্লেখ করেছেন যে, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এটাই হলো আমার ও তোমাদের উদাহরণ। আমি তোমাদেরকে আগুন হতে রক্ষা করার জন্য কোমর ধরে টানছি এবং বলছি আমার দিকে আস এবং আগুন হতে দূরে থাক, আমার দিকে আস এবং আগুন থেকে দূরে থাক। কিন্তু তোমরা আমাকে পরাস্ত করে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ছ। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ١٤٢ أَبِىْ مُوْسٰى (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ مَا بَعَثَنِىَ اللّٰهُ بِهٖ مِنَ الْهُدٰى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيْرِ اَصَابَ اَرْضًا فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ فَاَنْبَتَتِ الْكَلَاَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيْرَ وَكَانَتْ مِنْهَا اَجَادِبُ اَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللّٰهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوْا وَسَقَوْا وَ زَرَعُوْا وَاَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةٌ اُخْرٰى اِنَّمَا هِىَ قِيْعَانٌ لَاتُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَاً فَذٰلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ وَنَفَعَهٗ بِمَا بَعَثَنِىَ اللّٰهُ بِهٖ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذٰلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللّٰهِ الَّذِىْ اُرْسِلْتُ بِهٖ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৪২. অনুবাদ : হযরত আবূ মূসা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে হিদায়েত ও ইলমসহ প্রেরণ করেছেন, তার উদাহরণ মুষলধারার বৃষ্টির ন্যায়, যা কোনো ভূমিতে বর্ষিত হয়েছে, আর সে ভূমির একটি অংশ এমন উর্বর ছিল, যা উক্ত বৃষ্টি গ্রহণ করল। অতঃপর তাতে প্রচুর পরিমাণে ঘাস-পাতা ও তৃণলতা জন্মাল। আর এই জমির অপর এক অংশ ছিল এমন শক্ত যে, তা উক্ত বৃষ্টির পানিকে আটকে রেখেছে। যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মানুষের উপকার সাধন করেছে, লোকেরা তা পান করেছে এবং অন্যদেরকে পান করিয়েছে এবং এটা দ্বারা কৃষিকাজ করে ফসল উৎপাদন করেছে। আর কিছু পরিমাণ বৃষ্টির পানি এমন এক ভূখণ্ডে পড়েছে, যা ছিল অত্যন্ত অনুর্বর। এ অংশটি পানি আটকিয়ে রাখে না এবং ঘাস-পাতাও জন্মায় না। এটা হলো সে ব্যক্তির উদাহরণ যে আল্লাহর দীনকে উপলব্ধি করেছে এবং আল্লাহ যা দিয়ে আমাকে প্রেরণ করেছেন তা তার কল্যাণ সাধন করেছে, সে তা নিজে শিক্ষা করেছে এবং অন্যকে শিক্ষা প্রদান করেছে। আর সে ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে এ দিকে তার মাথা তুলেও দেখেনি এবং আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে হিদায়েতসহ প্রেরণ করেছেন তা কবুলও করেনি।–[বুখারী, মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْبِيْهُ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِالْاَرَاضِى الْمُخْتَلِفَةِ মু'মিনের অন্তরের সাথে বিভিন্ন ধরনের জমিনের সাথে তুলনা : উক্ত হাদীসে প্রথমে জমিনকে দু' ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা—

১. এমন জমিন, যা বৃষ্টির পানি হতে উপকৃত হয়েছে, অর্থাৎ পানিকে নিজের ভিতরে শুষে নিয়েছে, ফলে গাছপালা ও তরুলতা সে জমিনে উৎপন্ন হয়েছে।

২. এমন জমিন, যা পানি হতে উপকৃত হয়নি। আবার উপকৃত জমিন দু' প্রকার : এক. উদ্ভিদ উৎপন্নকারী, দুই. উদ্ভিদ উৎপন্নকারী নয়। এমনিভাবে মানুষও দু' প্রকারের : ১. আল্লাহর বিধান তথা দীন গ্রহণ করে উপকার লাভ করেছে। ২. দীন গ্রহণ করেনি ; সুতরাং লাভবানও হয়নি। প্রথম শ্রেণীর লোক মু'মিন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক কাফির। আবার উপরকার গ্রহণকারী মানুষ দু' প্রকার :

- এক প্রকার, যারা নিজেরা উপকৃত হয়েছে এবং অন্যদেরকেও উপকৃত করেছে। এর অর্থ হলো– আলেম, আবেদ, ফকীহ, শিক্ষক। এ উদাহরণ সে জমিনের যা পানি শোষণ করেছে এবং সবুজ-সতেজ তৃণলতা ও শস্যাদি উৎপন্ন করেছে। নিজেও উপকার লাভ করেছে এবং অন্যকেও উপকৃত করেছে। অথবা উদাহরণ তাদের যারা মুজতাহিদ, ইলম শিক্ষা করে গবেষণার দ্বারা মাসআলা বের করেছেন, নিজেরা আমল করেছেন এবং অন্যকেও আমল করার সুযোগ করে দিয়েছেন।

দ্বিতীয় প্রকারের লোক হলো তারা– যারা অন্যকে তো উপকৃত করেছে ; কিন্তু নিজেরা উপকার গ্রহণ করেনি। এর দ্বারা এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, আলিম ও শিক্ষক যারা আবেদ ছিল না এবং ফরজ ও অন্যান্য দীনের হুকুম ও দায়িত্ব পালন করে না। আর যে জ্ঞান অর্জন করেছে তা দ্বারা দীনের ইলম লাভ না করে বে-আমল হয়েছে। এ উদাহরণ সেই কঠিন ভূখণ্ডের যেখানে পানি আটকে ছিল এবং মানুষ সে পানি হতে উপকৃত হলো ; কিন্তু সেই পানির সাহায্যে জমিন কোনো উদ্ভিদ জন্মাল না। আর যে সেই শিক্ষার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেনি এবং সে শিক্ষা মুতাবেক আমলও করেনি, শিক্ষাও দেয়নি, এমনকি মুসলমানও হয়নি, কাফির রয়ে গেছে, তার উদাহরণ সে জমিনের মতো, যে জমিন পানি গ্রহণ করল না এবং আটকেও রাখল না, কোনো উদ্ভিদ বা ঘাসও জন্মাল না।

উল্লেখ্য যে, উক্ত হাদীসে ইলমকে বৃষ্টির সাথে তুলনা করা হয়েছে, মানুষের অন্তরকে বিভিন্ন প্রকারের জমিনের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

وَعَنْ ١٤٣ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ تَلَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ اٰيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ وَقَرَأَ اِلٰى وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا اُولُو الْاَلْبَابِ . قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا رَاَيْتَ وَعِنْدَ مُسْلِمٍ رَاَيْتُمُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَاُولٰئِكَ الَّذِيْنَ سَمَّا هُمُ اللّٰهُ فَاحْذَرُوْهُمْ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৪৩. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআনের এই আয়াত পাঠ করলেন যে, "তিনিই আপনার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন ; যার কিছু সংখ্যক হলো মুহকাম [সুস্পষ্ট]" এখান থেকে "কিন্তু জ্ঞানী লোকেরা ব্যতীত আর কেউই তা হতে উপদেশ গ্রহণ করে না " পর্যন্ত পাঠ করলেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এরপর যখন তুমি দেখবে, আর ইমাম মুসলিমের বর্ণনা মতে, "তোমরা দেখবে সে সব লোকদেরকে যারা শুধু আল্লাহর কিতাবের 'মুতাশাবেহ' আয়াতগুলোকে অনুসরণ করছে [তখন বুঝবে যে,] তারাই হচ্ছে সেসব লোক [বক্র অন্তর বিশিষ্ট বলে] আল্লাহ তাদের নাম উল্লেখ করেছেন। অতএব তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে।–[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَعْرِيْفُ الْمُحْكَمِ وَالْمُتَشَابَهِ মুহকাম ও মুতাশাহিব-এর সংজ্ঞা : مُحْكَمٌ বাবে اِفْعَالٌ হতে اِسْمِ مَفْعُوْلٌ -এর শব্দ। শাব্দিক অর্থ হলো সুদৃঢ় বা পাকাপোক্ত। পরিভাষায় সে সব আয়াতকে মুহকাম বলে, যেগুলোর ভাষা অত্যন্ত প্রাঞ্জল, অর্থ নির্ধারণ ও গ্রহণে কোনো অসুবিধা হয় না এবং তাতে সন্দেহেরও কোনো অবকাশ নেই। এক কথায় যেগুলোর শব্দ, অর্থ ও ভাব সুস্পষ্ট, তাই হলো মুহকাম। এ সকল আয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তদানুযায়ী আমল করা একান্ত আবশ্যক, এটা অস্বীকারকারীকে কাফের বলা হবে।

مُتَشَابَه শব্দটি شُبْهَةٌ মূলধাতু হতে নির্গত, শাব্দিক অর্থ হলো সন্দেহযুক্ত।

পরিভাষায় যে সব আয়াতে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে তাদেরকে مُتَشَابَهٌ বলা হয়। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে, যে সব আয়াতের সঠিক ও নির্ভুল অর্থ ও উদ্দেশ্য আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না, সেগুলোকে مُتَشَابَهٌ বলা হয়।

اَقْسَامُ الْمُتَشَابَهِ -মুতাশাবেহ দু' প্রকার।

১. حُرُوْفُ مُقَطَّعَاتٌ বা বিচ্ছিন্ন বর্ণ। যা কিছু সংখ্যক সূরার প্রথমে রয়েছে। যাদের অর্থ ও ভাব কোনোটাই জানা যায় না।
২. اٰيَةُ صِفَاتٌ (গুণবাচক আয়াতসমূহ) এগুলোর শাব্দিক অর্থ জানা যায়। কিন্তু ভাব সঠিকভাবে বুঝা যায় না।

এ সব আয়াতের ভাব উদ্ধারে লিপ্ত হওয়া অনুচিত। সরল মনে বিশ্বাস করাই হলো ঈমানদারদের কাজ।

وَعَنْ ١٤٤ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) قَالَ هَجَّرْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا قَالَ فَسَمِعَ اَصْوَاتَ رَجُلَيْنِ اخْتَلَفَا فِىْ اٰيَةٍ فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعْرَفُ فِىْ وَجْهِهِ الْغَضَبُ فَقَالَ اِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ فِى الْكِتَابِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৪৪. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন দুপুর বেলায় আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম। হযরত ইবনে আমর (রা.) বলেন, এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'জন লোকের কথাবার্তা শুনতে পেলেন, যারা কুরআনের একটি আয়াত নিয়ে বিতর্ক করছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সম্মুখে এসে উপস্থিত হলেন, তাঁর চেহারায় তখন ক্রোধের ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের পূর্বে অনেক লোক আল্লাহ তা'আলার কিতাব সম্পর্কে মতানৈক্য করার দরুনই ধ্বংস হয়ে গেছে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِخْتَلَفَا فِىْ اٰيَةٍ-এর ব্যাখ্যা : اِخْتَلَفَا فِىْ اٰيَةٍ-এর সাধারণ অর্থ হলো তারা একটি আয়াত নিয়ে মতভেদ করছিল। এ বাক্যটির দু'টি অর্থ হতে পারে—

১. তারা একটি মুতাশাবিহ আয়াতের মর্ম উদঘাটনের জন্য পরস্পর তর্কবিতর্ক করছিল, ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের উপর রাগান্বিত হলেন। কেননা, مُتَشَابِهْ আয়াতের মর্ম উদঘাটনের চেষ্টা চালানো নিরর্থক।

২. অথবা, তারা একটি আয়াতের পঠনরীতি নিয়ে মতবিরোধ করছিল, এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের উপর রাগান্বিত হওয়ার কারণ হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং তাদের মধ্যে রয়েছেন এমতাবস্থায় বিতর্ক করা অনুচিত।

وَعَنْ ١٤٥ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَعْظَمَ الْمُسْلِمِيْنَ فِى الْمُسْلِمِيْنَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَىْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى النَّاسِ فَحُرِّمَ مِنْ اَجْلِ مَسْأَلَتِهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৪৫. অনুবাদ : হযরত সাদ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে বড় অপরাধী হলো সে ব্যক্তি, যে এমন বিষয়ে প্রশ্ন করেছে, যা মানবজাতির জন্য পূর্বে হারাম বা অবৈধ ছিল না ; কিন্তু উক্ত ব্যক্তির প্রশ্নের কারণেই তা হারাম করা হলো। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ١٤٦ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَكُوْنُ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ يَاْتُوْنَكُمْ مِنَ الْاَحَادِيْثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوْا اَنْتُمْ وَلَا اٰبَاءُكُمْ فَاِيَّاكُمْ وَاِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّوْنَكُمْ وَلَا يَفْتِنُوْنَكُمْ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৪৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, শেষ জমানায় কিছু সংখ্যক মিথ্যাবাদী দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে, তারা তোমাদের নিকট এমন কিছু অলীক কথাবার্তা উপস্থিত করবে, যা না তোমরা শুনেছ, না তোমাদের পিতৃপুরুষগণ কখনো শুনেছে। সাবধান তোমরা তাদের নিকট থেকে দূরে সরে থাকবে, যাতে তারা তোমাদের পথভ্রষ্ট করতে না পারে এবং কোনো প্রকার বিপর্যয় এবং ফিতনায় ফেলতে না পারে। – [মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ -এর ব্যাখ্যা : বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, শেষ যুগে কিছু সংখ্যক মিথ্যাবাদী দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে, তারা তোমাদের নিকট অলীক কথাবার্তা উপস্থিত করবে।

دَجَّالُوْنَ শব্দটি دَجَلٌ ক্রিয়ামূল হতে নির্গত হয়েছে, এর শাব্দিক অর্থ প্রতারণা করা। আর دَجَّالٌ অর্থ– মহাপ্রতারক বা মহাপ্রবঞ্চক।

ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী যথার্থরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পর হতে এই পর্যন্ত অসংখ্য প্রবঞ্চক সরল প্রাণ মুসলমানকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। এদের কেউ নবুয়তও দাবি করেছে, যেমন— মুসায়লামা, আসওয়াদ আনাসী ও তুলায়হা।

আবার কেউ মাসীহ, মাহদী ইত্যাদি দাবি করেছে। যেমন– গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, কেউ কেউ সকল ধর্ম একসাথে করে নতুন ধর্ম প্রবর্তনের চেষ্টা করেছে। যেমন–বাদশাহ আকবরের দীন-ই ইলাহী।

আবার কেউ ইসলামি পোশাক পরে মাথায় টুপি দিয়ে নির্বাচনে জয়ী হয়, তারপর ক্ষমতার মসনদে বসে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানা রকম অপতৎপরতা চালায়। ইসলামের ধারক-বাহকদের নির্যাতন করে কেউ ইসলামের কথা, ন্যায়ের কথা বলতে গেলে তার কণ্ঠরোধ করে বসে। অন্যদিকে মুখে মুখে ইসলামের সেবক হয়ে গালভরা বুলি ছাড়ে। আসলে এ ধরনের লোক এক প্রকার মুনাফিক, কাজেই এধরনের লোকদের ধোঁকা হতে প্রতিটি মুসলিমের বেঁচে থাকা একান্তই প্রয়োজন।

وَعَنْهُ ١٤٧ قَالَ كَانَ اَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَءُوْنَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُوْنَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِاَهْلِ الْاِسْلَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتُصَدِّقُوْا اَهْلَ الْكِتَابِ وَلَاتُكَذِّبُوْهُمْ وَقُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا الْاٰيَةَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৪৭. **অনুবাদ** : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহলে কিতাবগণ হিব্রু ভাষায় তাওরাত পাঠ করত এবং মুসলমানদের জন্য তা আরবি ভাষায় ব্যাখ্যা করত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা আহলে কিতাবদেরকে সত্যবাদী বলে সমর্থন করো না এবং মিথ্যাবাদী হিসেবেও গণ্য করো না; বরং তোমরা তাদেরকে বলে দাও যে, আমরা আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং আমাদের উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার প্রতিও।–[সূরা বাকারা, আয়াত : ১৩৬]; –[বুখারী]

وَعَنْهُ ١٤٨ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَفٰى بِالْمَرْءِ كَذِبًا اَنْ يُّحَدِّثَ بِكُلِّ مَاسَمِعَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৪৮. **অনুবাদ** : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, কোনো ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যা কিছু শুনে তা [যাচাই বাচাই না করেই] বলে বেড়ায়।–[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে মহানবী ﷺ মিথ্যাবাদী ব্যক্তির একটি বড় নিদর্শন বর্ণনা করেছেন, আর তা হলো– অন্যের নিকট হতে কোনো কথা শ্রবণ করে সত্য মিথ্যা যাচাই না করে তা প্রচার করে বেড়ানোই মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য যথেষ্ট। কেননা, কথাটি যার থেকে শুনেছে হয়তো সে মিথ্যা কথা বলে থাকতে পারে, আর তার কথার উপর আস্থা রেখে তা প্রচার করার দ্বারা একটি মিথ্যা কথাই প্রচলিত হবে, তাই মিথ্যা হতে বাঁচার জন্য শোনা কথা যাচাই করা একান্ত আবশ্যক।

وَعَنْ ١٤٩ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللّٰهُ فِىْ أُمَّتِهِ قَبْلِىْ اِلَّا كَانَ لَهُ فِىْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّوْنَ وَاَصْحَابٌ يَأْخُذُوْنَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُوْنَ بِاَمْرِهِ ثُمَّ اِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوْفٌ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ وَيَفْعَلُوْنَ مَا لَا يُؤْمَرُوْنَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذٰلِكَ مِنَ الْاِيْمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৪৯. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– আমার পূর্বে আল্লাহ তা'আলা যে কোনো নবীকেই তাঁর উম্মতের নিকট প্রেরণ করেছেন, তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর কিছু হাওয়ারী বা সঙ্গী ছিল যারা তার সুন্নতকে অনুসরণ করতেন এবং তাঁর নির্দেশ মান্য করে চলতেন। এরপর এমন সব লোক তাদের স্থলাভিষিক্ত হলো, যারা অন্যদেরকে এমন কথা বলত যারা নিজেরা তা করত না এবং এমন সব কাজ করতো যার জন্য তাদেরকে আদেশ করা হয়নি। অতএব এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে লড়াই করে সে মু'মিন। আর যে ব্যক্তি মুখের [প্রতিবাদের] দ্বারা জিহাদ করে সেও মু'মিন, আর যে ব্যক্তি অন্তত অন্তর দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে সেও মু'মিন, আর এরপর [যারা এতটুকু জিহাদ করতে প্রস্তুত নয়] তার মধ্যে সরিষা তুল্য ঈমানও নেই। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

هَلِ الْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ فَرْضٌ اَمْ لَا **সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ফরজ কি-না ?** সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ ফরজ কি-না? এ বিষয়ে শাস্ত্রবিদ আলিমদের মাঝে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয় যা নিম্নরূপ—

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে, اَلْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ হলো ফরজে কিফায়া। কিছু সংখ্যক লোক আদায় করলে সকলের দায়িত্ব আদায় হয়ে যায়; কিন্তু কেউ-ই না করলে সকলেই গুনাহগার হয়। কেননা, আল-কুরআনে এসেছে—

১- وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ـ

২- اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ـ

৩- قَوْلُهٗ ﷺ مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ الخ ـ

যদি মুসলমানদের ঈমান ও আকীদা হরণকারী কোনো সমস্যা দেখা দেয়, তাহলে সকলের উপর نَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ ফরজ। যেমন কাদিয়ানী সমস্যা, ইসলাম বিরোধী প্রচারণা ও বই লেখা ইত্যাদি।

যদি প্রাণ নাশের ভয় থাকে, তাহলে হাতে ও মৌখিকভাবে نَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ ও اَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ ওয়াজিব নয়। সে সময় মনে মনে ঘৃণা করতে হবে। যেমন, রাসূল ﷺ -এর বাণী– فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ

মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের মতে, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ বিবেচনা অনুযায়ী ওয়াজিব হলেও শরিয়তের বিধানে ওয়াজিব নয়।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে– যতদিন আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী না হয়, ততদিন نَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ ও اَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ সকলের উপর فَرْضُ عَيْنٍ

রাফেযীদের মতে, শরিয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব হলেও বিবেকের দিক দিয়ে ওয়াজিব নয়।

حَيَاةُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) **আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর জীবনী :**

১. **নাম ও পরিচিতি :** নাম– আব্দুল্লাহ ; কুনিয়াত আবূ আব্দুর রহমান আল-হুযালী। পিতা– মাসউদ। মাতা– উম্মে আবদ।

২. **ইসলাম গ্রহণ :** ইবনে সা'দের মতে, রাসূল ﷺ যেদিন দারে আরকামের মধ্যে প্রবেশ করেন তার পূর্বেই হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) ইসলাম কবুল করেন। ইবনে মাসউদ (রা.) নিজেই বলতেন, আমি ৬ষ্ঠ মুসলমান হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। তবে ইবনে ইসহাকের মতে, তিনি হচ্ছেন ৩৩তম মুসলমান।

৩. **হিজরত :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ইসলাম কবুলের পর নির্মম নির্যাতনের স্বীকার হন। কুরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি দু'বার আবিসিনিয়ায় এবং পরে মদীনায় হিজরত করেন।

৪. **জিহাদে অংশগ্রহণ :** তিনি প্রায় সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি হযরত ওমর (রা.)-এর খিলাফতকালে ইয়ারমূকের যুদ্ধে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

৫. **তার বর্ণিত হাদীস :** তিনি সর্বমোট ৮৪৮টি হাদীস বর্ণনা করেন। এর মধ্যে ৬৪টি হাদীস বুখারী ও মুসলিম উদ্ধৃত করেছেন। এছাড়া ২১৫টি কেবল বুখারীতে এবং ৩৫টি কেবল মুসলিমে স্থান পেয়েছে।

৬. **মৃত্যু :** হযরত ওসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে ৩২ হি:, মতান্তরে ৩৩ হি: ৮'ই রমজান ৬০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

وَعَنْ ١٥٠ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ دَعَا اِلٰى هُدًى كَانَ لَهٗ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلُ اُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهٗ لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا اِلٰى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ مِثْلُ اٰثَامِ مَنْ تَبِعَهٗ لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اٰثَامِهِمْ شَيْئًا ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৫০. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন– যে ব্যক্তি কাউকে সৎ পথের প্রতি আহবান করে, তার ডাকে সাড়া দানকারীর পুণ্যের পরিমাণ ছওয়াব সেও পায়। এতে সাড়া দানকারীদের ছওয়াব বিন্দুমাত্রও কমানো হয় না। আর যে ব্যক্তি ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করে, তবে তার ও সে পরিমাণ গুনাহ হয়, যা তার ডাকে সাড়াদানকারীদের হয়। এতে তাদের পাপের বিন্দুমাত্রও হ্রাস করা হয় না। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীসে মহানবী ﷺ সৎ কাজে আহবানকারীর দ্বিগুণ ছওয়াব এবং মন্দ কাজে আহ্বানকারীর দ্বিগুণ পাপের অংশীদার হওয়ার কথা বলেছেন।

যে ব্যক্তি নিজে সৎকর্ম সম্পাদন করল এবং অন্যকে সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করল সে ব্যক্তি তার ডাকে সাড়াদানকারীর পুণ্যের পরিমাণ পুণ্য লাভ করবে। এ কারণেই রাসূল ﷺ অন্যত্র বলেছেন– اَلدَّالُ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهٖ

অপরদিকে যদি কোনো ব্যক্তি কাউকে পাপকর্ম করতে উদ্বুদ্ধ করে। সে একইভাবে দ্বিগুণ পাপের ভাগী হবে। এতে পাপকারীর গুনাহ মোটেই কমানো হবে না। এজন্য প্রত্যেকেরই উচিত মানুষদেরকে কল্যাণের দিকে ডাকা এবং অন্যায়ের কাজ হতে বাধা প্রদান করা।

وَعَنْهُ ١٥١ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَدَأَ الْاِسْلَامُ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأَ فَطُوْبٰى لِلْغُرَبَاءِ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৫১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– ইসলাম অপরিচিত [নিঃসঙ্গ] অবস্থায় যাত্রা শুরু করেছে। আর অচিরেই ঠিক সেভাবেই প্রত্যাবর্তন করবে। যেভাবে শুরু হয়েছে। অতএব সে অপরিচিতদের জন্য সুসংবাদ। –[মুসলিম]

وَعَنْهُ ١٥٢ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ الْاِيْمَانَ لَيَارِزُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَارِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَسَنَذْكُرُ حَدِيْثَ أَبِىْ هُرَيْرَةَ ذَرُوْنِىْ مَا تَرَكْتُكُمْ فِىْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ وَحَدِيْثَىْ مُعَاوِيَةَ وَجَابِرٍ لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِىْ وَلَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِىْ فِىْ بَابِ ثَوَابِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى ـ

১৫২. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— নিশ্চয়ই ঈমান [ইসলাম] মদীনার দিকে ঠিক সেভাবে প্রত্যাবর্তন করবে, যেভাবে সাপ তার গর্তের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। [বুখারী, মুসলিম] আর অচিরেই আমি হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস ذَرُوْنِىْ مَا تَرَكْتُكُمْ কিতাবুল মানাসিকে আর হযরত মু'আবিয়া ও জাবির (রা.)-এর হাদীস দুটি لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِىْ এবং لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِىْ "ছওয়াবু হাযিহিল উম্মাহ" অধ্যায়ে উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহু তা'আলা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে ইসলাম বলতে ইসলাম ও মুসলমান উভয়কেই বুঝানো হয়েছে। আরব উপদ্বীপে যখন ইসলামের যাত্রা শুরু হয় তখন এটি ছিল একটি নতুন, অজ্ঞাত ও অপরিচিত। আর মুসলমানদের সংখ্যাও ছিল একেবারে স্বল্প। সে হিসেবে মুসলমানগণও তখন অজ্ঞাত অখ্যাত ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী শেষ জমানায় ইসলাম ও মুসলমানদের অবস্থাও তাই হবে। আর ইসলাম তখন মদীনার দিকেই ফিরে আসবে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٥٣ رَبِيْعَةَ الْجُرَشِىِّ (رض) قَالَ أُتِىَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ فَقِيْلَ لَهُ لِتَنَمْ عَيْنُكَ وَلْتَسْمَعْ أُذُنُكَ وَلْيَعْقِلْ قَلْبُكَ قَالَ فَنَامَتْ عَيْنَىَّ وَسَمِعَتْ أُذُنَاىَ وَعَقَلَ قَلْبِىْ قَالَ فَقِيْلَ لِىْ سَيِّدٌ بَنٰى دَارًا فَصَنَعَ فِيْهَا مَأْدُبَةً وَأَرْسَلَ دَاعِيًا فَمَنْ اَجَابَ الدَّاعِىَ دَخَلَ الدَّارَ وَاَكَلَ مِنَ الْمَأْدُبَةِ وَ رَضِىَ عَنْهُ السَّيِّدُ وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِىَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَأْدُبَةِ وَسَخِطَ عَلَيْهِ السَّيِّدُ قَالَ فَاللّٰهُ السَّيِّدُ وَمُحَمَّدٌ اَلدَّاعِىْ وَالدَّارُ اَلْاِسْلَامُ وَالْمَأْدُبَةُ اَلْجَنَّةُ ـ رَوَاهُ الدَّارِمِىُّ

১৫৩. অনুবাদ : হযরত রাবীয়া জুরাশী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কিছু সংখ্যক ফেরেশতা আগমন করলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন যে, আপনার চক্ষুযুগল ঘুমিয়ে থাকুক। কর্ণযুগল শুনতে থাকুক এবং আপনার অন্তর অনুধাবন করতে থাকুক, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, অতঃপর আমার নয়নযুগল ঘুমাল, কর্ণযুগল শুনল এবং অন্তর অনুধাবন করতে লাগল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, [তখন আমাকে উপমার দ্বারা বলা হলো] একজন সর্দার একটি গৃহ নির্মাণ করলেন এবং তাতে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করলেন, অতঃপর একজন আহ্বানকারী প্রেরণ করলেন। যে ব্যক্তি আহবানকারীর ডাকে সাড়া দিল সে ঐ গৃহে প্রবেশ করল এবং আহার গ্রহণ করল, আর তাতে ঐ ঘরের নেতাও সন্তুষ্ট হলেন। অপরদিকে যে ব্যক্তি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিল না, সে ঘরেও প্রবেশ করতে পারল না এবং আহারও গ্রহণ করতে পারল না। এতে গৃহস্বামীও তার প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন। [এর ব্যাখ্যাস্বরূপ] রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, গৃহস্বামী হলেন আল্লাহ, আহ্বানকারী হলেন মুহাম্মদ ﷺ ঘর হলো ইসলাম, আর নিমন্ত্রণস্থল জান্নাত। -[দারেমী]

وَعَنْ ١٥٤ اَبِىْ رَافِعٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا اُلْفِيَنَّ اَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلٰى اَرِيْكَتِهٖ يَاْتِيْهِ الْاَمْرُ مِنْ اَمْرِىْ مِمَّا اَمَرْتُ بِهٖ اَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُوْلُ لَا اَدْرِىْ مَا وَجَدْنَا فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ اِتَّبَعْنَاهُ ـ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْدَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِىُّ فِىْ دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ ـ

১৫৪. অনুবাদ : হযরত আবূ রাফে' (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— তোমাদের কাউকে এরূপ দেখতে পছন্দ করি না যে, সে তার খাটে হেলান দিয়ে বসে থাকবে, আর তার নিকট আমার কোনো আদেশ পৌঁছবে। তাতে আমি কোনো বিষয়ে আদেশ করেছি। অথবা কোনো বিষয়ে নিষেধ করেছি, তখন সে বলবে– আমি এসব কিছু জানি না। আল্লাহ তা'আলার কিতাবে যা পেয়েছি তাই অনুসরণ করব। –[আহমদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ] আর ইমাম বায়হাকী দালাইলুন নবুওয়াতে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। মুসলমান বলে দাবিদার লোকদের মধ্যে এমন এক শ্রেণীর লোকও রয়েছে, যারা হাদীসকে শরিয়তের দলিল হিসেবে স্বীকার করতে অস্বীকার করে, অথচ হাদীসও ওহীর এক প্রকার। তা অনুসরণের জন্য কুরআনেই নির্দেশ এসেছে যে, مَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا
আর হাদীস যে ওহী তা কুরআন দ্বারাই সাব্যস্ত হয়। যেমন, এরশাদ হয়েছে وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى

وَعَنْ ١٥٥ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا اِنِّىْ اُوْتِيْتُ الْقُرْاٰنَ وَمِثْلَهٗ مَعَهٗ اَلَا يُوْشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلٰى اَرِيْكَتِهٖ يَقُوْلُ عَلَيْكُمْ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ فَمَا وَجَدْتُّمْ فِيْهِ مِنْ حَلَالٍ فَاَحِلُّوْهُ وَمَا وَجَدْتُّمْ فِيْهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوْهُ وَاِنَّ مَاحَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ كَمَا حَرَّمَ اللّٰهُ اَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمُ الْحِمَارُ الْاَهْلِىُّ وَلَا كُلُّ ذِىْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَلَا لُقْطَةُ مُعَاهِدٍ اِلَّا اَنْ يَّسْتَغْنِىَ عَنْهَا صَاحِبُهَا وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ اَنْ يَقْرُوْهُ فَاِنْ لَمْ يَقْرُوْهُ فَلَهٗ اَنْ يُّعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ ـ رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَ رَوَى الدَّارِمِىُّ نَحْوَهٗ وَكَذَا اِبْنُ مَاجَةَ اِلٰى قَوْلِهٖ كَمَا حَرَّمَ اللّٰهُ ـ

১৫৫. অনুবাদ : হযরত মিকদাম ইবনে মা'দীকারাব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— জেনে রাখ! আমাকে কুরআন এবং তার সাথে তার অনুরূপ [সুন্নাহ] ও দেওয়া হয়েছে। জেনে রাখ! এমন এক সময় আসবে, যখন কোনো উদরপূর্ণ বিলাসী লোক তার তখতে বসে বলবে, তোমরা শুধু এই কুরআনকে গ্রহণ করবে। তাতে যা হালাল পাবে তাকে হালাল মনে করবে এবং তাতে যা হারাম পাবে তাকে হারাম জানবে। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ যা হারাম করেছেন তাও তারই অনুরূপ যা আল্লাহ হারাম করেছেন। জেনে রাখ! তোমাদের জন্য গৃহপালিত গাধা হালাল নয় এবং কেনানো ছেদন-দাঁতবিশিষ্ট হিংস্রপশুও তোমাদের জন্য হালাল নয়। এমনিভাবে সন্ধিতে আবদ্ধ [জিম্মি] অমুসলমানদের হারানো বস্তু তোমাদের জন্য হালাল নয়, তবে যদি তার মালিক তার দাবি ছেড়ে দেয়। আর যখন কোনো লোক কোনো সম্প্রদায়ের নিকট আগমন করে তখন তাদের উচিত তার মেহমানদারী করা। যদি তারা তা না করে, তবে তাদেরকে কষ্ট দিয়ে হলেও তার আতিথ্য পরিমাণ জিনিস আদায় করা জায়েয হবে। [এসব বিষয় কুরআনে নেই]–[আবূ দাউদ, দারেমীও এ অর্থে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। এমনিভাবে ইবনে মাজাও كَمَا حَرَّمَ اللّٰهُ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْحَدِيْثَيْنِ দু'টি হাদীসের মধ্যে অর্থগত বিরোধ : আলোচ্য হাদীস হতে বুঝা যায় যে, মেজবান মেহমানের মেহমানদারী না করলে মেহমান তার প্রয়োজনীয় জিনিস আদায় করতে পারবে। অথচ অন্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, কারো সম্পদ তার সন্তুষ্টি ব্যতীত গ্রহণ করা হালাল নয়। সুতরাং উভয় হাদীসে মধ্যে বাহ্যিক দৃষ্টতে অর্থগত বিরোধ দেখা যায়।

সমাধান : এর তিনটি উত্তর হতে পারে—

১. উপরিউক্ত হাদীসের বিধান ইসলামের প্রথম যুগের, পরে তা রহিত হয়ে গেছে।

২. মেহমান মেজবান হতে তার প্রয়োজনীয় খাদ্য তখনই নিতে পারবে যখন খাদ্যের অভাবে তার প্রাণ নাশের সম্ভাবনা থাকে। নতুবা খাদ্যের মালিকের সন্তুষ্টি ব্যতীত তা গ্রহণ করা যাবে না। যেমন– নবী করীম ﷺ বিভিন্ন এলাকায় মুসলিম সৈন্যদেরকে প্রেরণ করতেন। তারা গন্তব্যস্থলে গিয়ে অনেক সময় বিভিন্ন জিনিস বিশেষ করে পানাহার সামগ্রীর অভাবের সম্মুখীন হয়ে পড়তেন, তখন তাদের জন্য এলাকার অধিবাসীদের মেহমান হয়ে প্রয়োজনে এরূপ ব্যবস্থার আশ্রয় নিতে হতো এবং এটি তাদের জন্য জায়েয ছিল যে তারা এলাকাবাসীর নিকট হতে খাদ্য সামগ্রী ছিনিয়ে নেবেন। নতুবা তাদের প্রাণ নাশের সম্ভাবনা দেখা দিত।

৩. অথবা এ নির্দেশ ছিল ঐসব জিম্মিদের প্রতি, যাদের জন্য শর্ত করা হয়েছিল যে, তাদের নিকট থেকে মুসলিম ব্যক্তি বা দল গমন করলে তারা তাদেরকে আতিথেয়তা করবে।

---

١٥٦ - وَعَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ (رضـ) قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَيَحْسَبُ اَحَدُكُمْ مُتَّكِئًا عَلٰى اَرِيْكَتِهٖ يَظُنُّ اَنَّ اللّٰهَ لَمْ يُحَرِّمْ شَيْئًا اِلَّا مَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ اَلَا وَاِنِّىْ وَاللّٰهِ قَدْ اَمَرْتُ وَ وَعَظْتُ وَنَهَيْتُ عَنْ اَشْيَاءَ اِنَّهَا لَمِثْلُ الْقُرْاٰنِ اَوْ اَكْثَرُ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمْ يُحِلَّ لَكُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلَّا بِاِذْنٍ وَلَا ضَرْبُ نِسَائِهِمْ وَلَا اَكْلُ ثِمَارِهِمْ اِذَا اَعْطُوْكُمُ الَّذِىْ عَلَيْهِمْ - رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَفِىْ اِسْنَادِهٖ اَشْعَثُ بْنُ شُعْبَةَ الْمِصِّيْصِيُّ قَدْ تُكُلِّمَ فِيْهِ -

১৫৬. অনুবাদ : হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা ভাষণ দানের জন্য দণ্ডায়মান হন এবং বলেন, তোমাদের মধ্যে কি কেউ খাটে ঠেস লাগিয়ে বসে থেকে এ কথা মনে করে যে, আল্লাহ তা'আলা যা এ কুরআনে হারাম করেছেন তা ব্যতীত তিনি আর কিছুই হারাম করেননি। জেনে রাখ! আমিও আল্লাহর কসম করে বলছি। অবশ্যই আমি [তোমাদেরকে] অনেক বিষয়ে আদেশ দিয়েছি। উপদেশ প্রদান করেছি এবং অনেক বিষয়ে নিষেধও করেছি। আর এটাও কুরআনের অনুরূপ অথবা তার চেয়েও বেশি। জেনে রাখ! আহলে কিতাব জিম্মিদের গৃহে তাদের অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয় ; তাদের স্ত্রীদের প্রহার করা এবং তাদের শস্য ফল খাওয়াও তোমাদের জন্য বৈধ নয়, যদি তারা তাদের উপর নির্ধারিত কর আদায় করে।−[আবূ দাউদ]; কিন্তু তার হাদীসের সনদে একজন রাবী আসআস ইবনে শু'বা মিস্সীসী রয়েছেন, যার সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ সমালোচনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِنَّهَا لَمِثْلُ الْقُرْاٰنِ اَوْ اَكْثَرُ -এর ব্যাখ্যা : মহানবী ﷺ উক্ত হাদীসে বলেছেন− আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি তোমাদের অনেক বিষয়ে আদেশ দিয়েছি, উপদেশ দিয়েছি এবং অনেক বিষয়ে নিষেধও করেছি ; নিশ্চয় তা কুরআনেরই অনুরূপ অথবা তার চেয়ে বেশি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপরোক্ত أو পদটি সন্দেহসূচক হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি; বরং এর অর্থ হলো এই যে, কাশফের জ্ঞান ইলহাম ও কাশফের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকত। সুতরাং একবার ইলহাম করা হয়েছে যে, কুরআন ব্যতীত তাকে যেসব বিধান দান করা হয়েছে তা কুরআনের অনুরূপ। আবার পরক্ষণেই ইলহাম করা হয়েছে যে, এটা কুরআন হতেও বেশি। অতএব বলা যায় যে, أو টি সন্দেহসূচক নয়।

وَعَنْهُ ١٥٧ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهٖ فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ وَ وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَاَنَّ هٰذِهٖ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَاَوْصِنَا فَقَالَ اُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَاِنْ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا فَاِنَّهٗ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِىْ فَسَيَرٰى اِخْتِلَافًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعُضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَاِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْاُمُوْرِ فَاِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ . رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْدَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ اِلَّا اَنَّهُمَا لَمْ يَذْكُرَا الصَّلٰوةَ .

১৫৭. অনুবাদ : হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে নামাজ পড়লেন। অতঃপর আমাদের দিকে মুখ ফিরে বসলেন এবং আমাদেরকে এমন মর্মস্পর্শী নসিহত করলেন, যাতে আমাদের চক্ষুসমূহ অশ্রু সিক্ত হলো এবং অন্তরসমূহ বিগলিত হলো। তখন জনৈক ব্যক্তি উঠে বলল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! মনে হয় এটা বিদায়ী উপদেশ! আমাদেরকে আরো কিছু নসিহত করুন। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে তাকওয়া অবলম্বন তথা আল্লাহকে ভয় করতে উপদেশ দিচ্ছি, নেতার কথা শুনতে এবং তাঁর আনুগত্য করতে বলছি, যদিও তিনি হাবশী গোলাম হন। আমার পর তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে, সে অচিরেই অনেক মতভেদ দেখতে পাবে। তখন তোমরা আমার সুন্নত এবং হিদায়েতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতকে আঁকড়ে ধরবে। অতএব, সাবধান! তোমরা দীনের ব্যাপারে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহর বাইরে নতুন কথা ও মতবাদ হতে বেঁচে থাকবে। কেননা, প্রত্যেক নতুন বিষয় হচ্ছে বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআতই হচ্ছে গোমরাহী তথা পথভ্রষ্টতা।– [আহমদ, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্] কিন্তু ইমাম তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্ নামাজ পড়ার কথা বলেননি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْخُلَفَاءُ الرَّاشِدِيْنَ-এর ব্যাখ্যা : خُلَفَاءُ শব্দটি خَلِيْفَةٌ-এর বহুবচন। অর্থ– খলীফা, প্রতিনিধি। আর رَاشِدُوْنَ শব্দটি رَاشِدٌ-এর বহুবচন। অর্থ– সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি।

পরিভাষায় خُلَفَاء رَاشِدِيْن হলেন—

هُمُ الَّذِيْنَ اسْتُخْلِفُوْا فِىْ مَنْصَبِ الْخِلَافَةِ بَعْدَ وَفَاةِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَكَانَتْ مُدَّةُ خِلَافَتِهِمْ ثَلَاثِيْنَ سَنَةً .

হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর ইন্তেকালের পর যে চারজন সাহাবী খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন তাঁদের খিলাফতের জামানা ছিল ৩০ বছর। নবী করীম ﷺ বলেছেন– اَلْخِلَافَةُ بَعْدِىْ ثَلَاثُوْنَ سَنَةً তাঁদের অনুসরণ করার জন্য মহানবী ﷺ বলেছেন— عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ তাঁদের সংখ্যা ছিল চার জন। যথাক্রমে–১. হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.), ২. হযরত ওমর ফারূক (রা.), ৩. হযরত ওসমান (রা.), ৪. হযরত আলী (রা.)।

উল্লিখিত হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, হিসাব করে দেখা গেল যে, হযরত আবূ বকর (রা.)-এর খিলাফত দু' বছর। হযরত ওমর (রা.)-এর দশ বছর, হযরত ওসমান (রা.)-এর বারো বছর, আর হযরত আলী (রা.)-এর খেলাফত ছয় বছর। –[মুসনাদে আহমদ] এ ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত আলী (রা.) পর্যন্ত খিলাফতে রাশেদার কল্যাণধারা সমাপ্ত হয়।

ঐতিহাসিকগণ হিসাব করে দেখেছেন যে, উপরোক্ত খলীফাগণের সময়কাল ২৯ বছর ৬ মাস ছিল। তাই হযরত ইমাম হাসান (রা.)-এর ৬ মাস সময়কেও খিলাফতে রাশেদার মধ্যে গণনা করা হয়।

আবার কেউ কেউ উমাইয়া খলীফা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র.)-কেও খোলাফায়ে রাশেদার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

"وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا"-এর ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমরা নেতার কথা শুনবে ও তাঁর আনুগত্য করবে ; যদিও তিনি হাবশী গোলাম হন। এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, গোলাম তথা ক্রীতদাস তো নেতা বা রাষ্ট্র-প্রধান হতে পারে না। কারণ, সে তো অন্যের অধীনে। এতদভিন্ন গোলামের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাও কম থাকে। সুতরাং হাদীসে ক্রীতদাসের কথা কেন বলা হলো। উক্ত প্রশ্নের উত্তর এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উপরোক্ত উক্তির মাধ্যমে মূলত নেতা বা রাষ্ট্র-প্রধানের আনুগত্যের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

অথবা, রাসূল ﷺ উক্ত উক্তির মাধ্যমে বুঝাতে চেয়েছেন যে, নীচ পর্যায়ের কোনো ব্যক্তিও যদি তাকওয়া ও ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে নেতা বা রাষ্ট্র-প্রধান নির্বাচিত হয়, তবে তোমরা তার আনুগত্য করতে কুণ্ঠিত হবে না। এর দ্বারাও নেতা বা রাষ্ট্র-প্রধানের আনুগত্যের প্রতি গুরুত্ব প্রদানই উদ্দেশ্য।

بَعْضُ نَظَائِرِ الْبِدْعَةِ الْمُرَوَّجَةِ فِيْ هٰذَا الْعَصْرِ فِى الْعَقَائِدِ وَالْاَعْمَالِ

বর্তমান যুগের আমল ও আকীদার ক্ষেত্রে প্রচলিত কতিপয় বিদআতের দৃষ্টান্ত : এ যুগে প্রচলিত আকীদা 'বিদআত'-এর সংখ্যা অনেক। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে যথাক্রমে— ১. عِصْمَةُ الْاَنْبِيَاءِ সম্পর্কে অসত্য প্রচারণা করা, ২. সাহাবাদের সমালোচনা করা, ৩. উদ্দেশ্য হাসিল হওয়ার বিশ্বাসে কোনো পীরের কাছে যাওয়া, ৪. মাজারে গিয়ে মৃত ওলীদের কাছে কিছু প্রার্থনা করা, ৫. পীর-আউলিয়াদের মাজারে মানত করলে বালা-মসিবত দূর হওয়ার আকীদা পোষণ করা, ৬. তীর নিক্ষেপ করে ভাগ্য পরীক্ষা করা, ৭. কবুতর উড়ানোর মধ্য দিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করা, ৮. মীলাদ মাহফিলে রাসূল ﷺ-এর স্বশরীরে উপস্থিতির ধারণা করা।

اَلْبِدْعَةُ الْمُرَوَّجَةُ فِى الْاَعْمَالِ : এ যুগে প্রচলিত আকীদাগত বিদআতের ন্যায় আমলগত বিদআতের সংখ্যাও ব্যাপক। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে যথাক্রমে–১. কবরকে ফুল দ্বারা সুসজ্জিত করা, ২. উরস করা, ৩. খতনার পর বড় জেয়াফতের আয়োজন করা, ৪. জন্মদিন পালন করা, ৫. নির্দিষ্ট মৃত্যুদিবস পালন করা, ৬. বাধ্যতামূলকভাবে আযানের পূর্বে দরূদ পড়া, ৭. কবরে বাতি জ্বালানো, ৮. কবরে আতর-গোলাপ ছিটানো, ৯. মৃত ব্যক্তির ছবি ঘরে টানিয়ে রাখা, ১০. বিবাহ অনুষ্ঠানে গান-বাজনা ইত্যাদি করা।

---

১৫৮ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ خَطَّ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَطًّا ثُمَّ قَالَ هٰذَا سَبِيْلُ اللّٰهِ ثُمَّ خَطَّ خُطُوْطًا عَنْ يَمِيْنِهٖ وَعَنْ شِمَالِهٖ وَقَالَ هٰذِهٖ سُبُلٌ عَلٰى كُلِّ سَبِيْلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُوْ اِلَيْهِ وَقَرَأَ وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ (الاية) ـ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالنَّسَائِىُّ وَالدَّارِمِىُّ ـ

১৫৮. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ [আমাদেরকে বুঝাবার জন্য] একটি সরল রেখা টানলেন এবং বললেন– এটা হলো আল্লাহর পথ। অতঃপর ঐ সকল রেখার ডান ও বাম দিকে কয়েকটি রেখা টানলেন এবং বললেন এগুলোও পথ, তবে এর প্রত্যেকটির উপরই শয়তান বসে আছে, সে নিজের পথের দিকে আহ্বান করে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রমাণস্বরূপ কুরআনের এই আয়াত পাঠ করেন যে, اِنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ অর্থাৎ, অবশ্যই এটাই আমার সরল সঠিক পথ, তোমরা এরই অনুসরণ কর। [এবং অন্যান্য পথের অনুসরণ করবে না।] যেগুলো তোমাদেরকে তাঁর পথ হতে পৃথক করে দেবে।–[সূরা আনআম, আয়াত : ১৫৩] –[আহমদ, নাসায়ী ও দারেমী]

وَعَنْ ١٥٩ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَاجِئْتُ بِهٖ - رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِيْ اَرْبَعِيْنِهٖ هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ رَوَيْنَاهُ فِيْ كِتَابِ الْحُجَّةِ بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ -

১৫৯. **অনুবাদ :** হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— কোনো ব্যক্তিই পূর্ণ মু'মিন হতে পারে না, যে পর্যন্ত তার আমি যে শরিয়ত নিয়ে এসছি, তার অনুগত না হয়। —[শরহুস সুন্নাহ]

ইমাম নববী তার আরবাঈনে বর্ণনা করেছেন যে, এটি সহীহ হাদীস। একে আমি কিতাবুল হুজ্জায় সহীহ সনদসহ বর্ণনা করেছি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهٖ-এর ব্যাখ্যা : হযরত মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন, কোনো ব্যক্তি মু'মিন হতে পারে না যে পর্যন্ত তার আমি যে শরিয়ত নিয়ে এসেছি তার অনুগত না হয়। উক্ত হাদীসে মু'মিন না হওয়ার দু'টি অর্থ হতে পারে—

প্রথমত প্রকৃতপক্ষেই সে মু'মিন নয়। এ অর্থ তখনই গ্রহণ করা যায়, যখন কোনো ব্যক্তি রাসূল ﷺ আনীত দীনকে স্বীকার করে না।

দ্বিতীয়ত সে ব্যক্তি পরিপূর্ণ মু'মিন নয়। এ অর্থ তখনই হতে পারে যখন কোনো ব্যক্তি দীনকে বাস্তব জীবনে অনুসরণ করে না; কিন্তু অন্তরে তার সত্যতার বিশ্বাস রাখে।

اَقْسَامُ الْاِنْسَانِ মানুষের প্রকারভেদ : বিশ্বাস ও কর্মের দিক দিয়ে সমস্ত মানুষকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—

১. দীনকে সম্পূর্ণ সত্য জেনে সে অনুযায়ী আমল করে, অর্থাৎ বিশ্বাস ও কাজকর্মে কোনোভাবেই প্রবৃত্তির অনুসরণ করে না। এ শ্রেণীর লোক পরিপূর্ণ মু'মিন।
২. দীনকে সম্পূর্ণ সত্য বলে বিশ্বাস করে ; কিন্তু তদনুযায়ী পুরোপুরি আমল করে না ; বরং আমলের ক্ষেত্রে অনেকাংশে প্রবৃত্তির অনুকরণ করে। এ শ্রেণীর লোক মু'মিন বটে, তবে 'ফাসিক মু'মিন'।
৩. দীনকে সত্য বলে বিশ্বাস করে না, সর্বদা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলে। এ শ্রেণীর লোক 'কাফির'।
৪. দীনকে সত্য বলে বিশ্বাস করে না, তবে বাহ্যিকভাবে নিজেকে মু'মিন হিসেবে প্রকাশ করে। এ শ্রেণীর লোক মুনাফিক।

وَعَنْ ١٦٠ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحْيٰى سُنَّةً مِنْ سُنَّتِيْ قَدْ اُمِيْتَتْ بَعْدِيْ فَاِنَّ لَهٗ مِنَ الْاَجْرِمِثْلَ اُجُوْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّنْقُصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةً لَا يَرْضَاهَا اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ مِثْلُ اٰثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْئًا - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ -

১৬০. **অনুবাদ :** হযরত বিলাল ইবনে হারিছ আল-মুযানী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— যে ব্যক্তি আমার পরে কোনো সুন্নতকে জীবিত করে, যা আমার পরে পরিত্যক্ত হয়ে গিয়েছিল, তার জন্য সে পরিমাণ ছওয়াব লেখা হয় যে পরিমাণ লোক সে সুন্নতের উপর আমল করে। আর এতে আমলকারীদের ছওয়াব হতে বিন্দুমাত্রও কমানো হয় না। অন্য দিকে যে ব্যক্তি আমার পরে কোনো বিদআত সৃষ্টি করে যাতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ সন্তুষ্ট নয়, তারও সে সকল লোকের গুনাহের সম পরিমাণ গুনাহ হয়, যারা তার উপর আমল করেছে এবং এতে তাদের পাপের কোনো অংশই হ্রাস করা হয় না।—[তিরমিযী] ইবনে মাজাহ্ হাদীসটি কাছীর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর -এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

وَعَنْ ١٦١ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الدِّيْنَ لَيَارِزُ اِلَى الْحِجَازِ كَمَا تَارِزُ الْحَيَّةُ اِلٰى جُحْرِهَا اَوْ لَيَعْقِلَنَّ الدِّيْنُ مِنَ الْحِجَازِ مَعْقِلَ الْاَرْوِيَّةِ مِنْ رَاْسِ الْجَبَلِ اِنَّ الدِّيْنَ بَدَاَ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَاَ فَطُوْبٰى لِلْغُرَبَاءِ وَهُمُ الَّذِيْنَ يُصْلِحُوْنَ مَا اَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِىْ مِنْ سُنَّتِىْ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

১৬১. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে আউফ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— দীন হিজাযের দিকে এভাবে ফিরে আসবে যেমনিভাবে সর্প [ঘুরে ফিরে অবশেষে] তার গর্তে ফিরে আসে। আর অবশ্যই দীন হিজাযেই আশ্রয় নেবে যেভাবে পার্বত্য মেষ পর্বত শিখরে আশ্রয় নিয়ে থাকে। নিশ্চয়ই দীন নিঃসঙ্গ প্রবাসীর ন্যায় যাত্রা শুরু করেছিল, আর অচিরেই তা সেরূপে ফিরে আসবে যেরূপে যাত্রা শুরু করেছিল। অতএব যারা নিঃসঙ্গ প্রবাসীর ন্যায় সমাজের সাধারণ প্রচলনের ব্যতিক্রম দীনের বিধি বিধানকে আঁকড়ে ধরে রাখে তাদের জন্য সুসংবাদ। তারা হলো সেসব লোক, যারা আমার [ওফাতের] পর লোকেরা যেসব সুন্নতকে বিনষ্ট করে ফেলেছে তারা সেগুলোকে পুনরায় সংশোধন করে নেয়। –[তিরমিযী]

وَعَنْ ١٦٢ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيَاْتِيَنَّ عَلٰى اُمَّتِىْ كَمَا اَتٰى عَلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتّٰى اِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ اَتٰى اُمَّهٗ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِىْ اُمَّتِىْ مَنْ يَّصْنَعُ ذٰلِكَ وَاِنَّ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلٰى ثِنْتَيْنِ وَ سَبْعِيْنَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ اُمَّتِىْ عَلٰى ثَلٰثٍ وَّ سَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِى النَّارِ اِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوْا مَنْ هِىَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَا اَنَا عَلَيْهِ وَ اَصْحَابِىْ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ ـ وَفِىْ رِوَايَةِ اَحْمَدَ وَاَبِىْ دَاوٗدَ عَنْ مُعَاوِيَةَ ثِنْتَانِ وَ سَبْعُوْنَ فِى النَّارِ وَ وَاحِدَةٌ فِى الْجَنَّةِ وَهِىَ الْجَمَاعَةُ وَاِنَّهٗ سَيَخْرُجُ فِىْ اُمَّتِىْ اَقْوَامٌ تَتَجَارٰى بِهِمْ تِلْكَ الْاَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ بِصَاحِبِهٖ لَا يَبْقٰى مِنْهُ عِرْقٌ وَّلَا مَفْصَلٌ اِلَّا دَخَلَهٗ ـ

১৬২. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বর্ণনা করেছেন— বনী ইসরাঈলের যা হয়েছিল আমার উম্মতেরও তা-ই হবে, যেমন এক পায়ের জুতা অন্য পায়ের জুতার সমান হয়। এমনকি যদি তাদের মধ্যে কেউ তার মায়ের সাথে প্রকাশ্যে জেনায় লিপ্ত হয়ে থাকে তবে আমার উম্মতের মধ্যে ও এরূপ কর্ম করার লোক হবে। এ ছাড়া বনী ইসরাঈল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল, আর আমার উম্মত [বিশ্বাসগত দিক দিয়ে] তিহাত্তর দলে বিভক্ত হবে। এ দলগুলোর মধ্যে শুধু একদল ছাড়া অন্য সকলেই জাহান্নামে যাবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, সেটা কোন দল? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যে আদর্শের উপর আমি এবং আমার সাহাবীগণ রয়েছে, তার উপর যারা থাকবে। –[তিরমিযী] আহমদ ও আবূ দাঊদে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) হতে অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, বাহাত্তর দলই জাহান্নামে যাবে, আর একদল জান্নাতে, আর তা হলো আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত। অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে এমন সব লোকের আত্মপ্রকাশ ঘটবে, যাদের মধ্যে [বেদআতের] সেসব কু-প্রবৃত্তি প্রবেশ করবে, যেভাবে জলাতঙ্ক রোগ রোগীর সর্ব শরীরে অনুপ্রবেশ করে। তার শরীরে কোনো শিরা বা গ্রন্থি অবশিষ্ট থাকে না, যাতে এই রোগ সঞ্চারিত হয় না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَعْنٰى حَذْوِ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ এক পায়ের জুতা অন্য পায়ের জুতার মতো হওয়ার অর্থ : এটি একটি আরবি প্রবাদ। যখন দু'টি জিনিস হুবহু একরকম হয়, তখন বলা হয়ে থাকে حَذْوُ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ নবী করীম ﷺ বলেন, আমার উম্মতের অবস্থা হুবহু বনী ইসরাঈলের মতো হবে। এ উভয় উম্মতের উপর অবস্থার ধরন এক রকম হওয়াকে حَذْوُ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ দ্বারা বুঝানো হয়েছে। হুজূর ﷺ বলেন, যে নাজায়েজ কাজ বনী ইসলাঈলদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে আমার উম্মতের দ্বারাও সেরূপ নাজায়েজ কাজ সংঘটিত হবে। এমনকি যদি বনী ইসরাঈলের মধ্যে কোনো ব্যক্তি তার মায়ের সাথে জেনা করে থাকে তাও সংঘটিত হবে। মোটকথা, حَذْوُ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদিয়া ও বনী ইসরাঈলের মধ্যে সমতা দেখানো হয়েছে।

هَلْ اَتٰى اَحَدٌ مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ عَلَانِيَةً عَلٰى اُمِّهٖ : বনী ইসরাঈলের কেউ কি তার মায়ের সাথে জেনা করেছিল? কোনো কোনো হাদীস বিশারদ বলেছেন— 'মা' দ্বারা 'সৎ মা' বুঝানো হয়েছে। কেননা, আপন গর্ভধারিণী মায়ের সাথে জেনা করাটা কোনো অবস্থাতেই সম্ভব নয়। সুতরাং এখানে 'মা' অর্থ مَوْطُوْئَةُ الْاَبِ অথবা আপন মাকেই বুঝানো হয়েছে। তখন একটি রূপক বাক্য হিসেবে অত্যন্ত ঘৃণিত ও নিকৃষ্ট কাজ হওয়ার উপমা দেওয়া হয়েছে। কাজেই এ বাক্যের অর্থ এই নয় যে, বনী ইসরাঈলের কেউ সত্য সত্যই মায়ের সাথে জেনা করেছিল; বরং বাক্যের অর্থ হবে বনী ইসরাঈলের লোকেরা যে সব নিকৃষ্ট কাজে লিপ্ত হয়েছিল, সে সব কাজে আমার উম্মতও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। ফলে অধিকাংশই জাহান্নামী হবে।

تَفْتَرِقُ اُمَّتِىْ عَلٰى ثَلٰثٍ وَّسَبْعِيْنَ -এর ব্যাখ্যা : রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন যে, আমার উম্মত তিহাত্তর দলে বিভক্ত হবে. এ তিহাত্তর দলের বর্ণনা নিম্নরূপ । মূল দল হলো মোট আটটি—

১. **مُعْتَزِلَه মু'তাযেলা :** এদের মতে, বান্দার কর্মের স্রষ্টা বান্দা নিজেই। কবীরা গুনাহকারীকে তারা কাফের ও মুসলমানদের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র স্তরের মনে করে। তারা আরো বলে যে, সৎ কাজের ছওয়াব ও মন্দ কাজের শাস্তি দেওয়া আল্লাহর উপর ওয়াজিব। এ দলের প্রবর্তক হলো واصل بن عطاء যিনি হযরত হাসান বসরী (র.)-এর ছাত্র ছিলেন। এ দলটি ২০টি শাখায় বিভক্ত।

২. **شِيْعَة শীয়া :** তারা প্রথম দুই খলীফার খেলাফতকে অবৈধ মনে করে। হযরত আলী (রা.)-কে সবার উপর প্রাধান্য দান করে। ইমামের গুরুত্ব তাদের নিকট অত্যধিক। এরা ২২টি উপশাখায় বিভক্ত।

৩. **خَارِجِىْ খারিজী :** হযরত আলী (রা.)-এর অনুসারীদের মধ্যে যে দলটি সন্ধির বিরুদ্ধাচারণ করেছিল তারাই খারেজী নামে পরিচিত। কবীরা গুনাহকারীকে তারা মুসলমান মনে করে না। তারাও ২০টি উপশাখায় বিভক্ত।

৪. **مُرْجِيَة মুরজিয়া :** তাদের মতে, বড় পাপও একত্ববাদী মুসলমানকে জান্নাত হতে সরাতে পারে না। তারা ৫টি উপশাখায় বিভক্ত।

৫. **نَجَّارِيَّة নাজ্জারিয়া :** এরা আল্লাহর কোনো গুণকে আলাদাভাবে স্বীকার করে না। এ দলটি ৩টি উপশাখায় বিভক্ত।

৬. **جَبْرِيَّة জাবরিয়া :** তাদের মতে, কর্মে বান্দার কোনো স্বাধীনতা নেই। বান্দা পাথরের ন্যায়। তাদের কোনো উপশাখা নেই।

৭. **مُشَبِّهَه মুশাব্বিহা :** তারা আকার ও অবস্থান গ্রহণের ক্ষেত্রে আল্লাহকে সৃষ্টির অনুরূপ মনে করে। এদেরও কোনো উপশাখা নেই।

৮. **نَاجِيَه নাজিয়া :** এটি হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বা হক পন্থী দল। এরা মুক্তিপ্রাপ্ত।

সর্বমোট = ২০ + ২২ + ২০ + ৫ + ৩ + ১ + ১ + ১ = ৭৩ দল।

'আত-তা'লীকুসসাবীহ' নামক গ্রন্থে ৭৩ টি দলের নিম্নরূপ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে : বাতিলপন্থি লোকগুলো মোট ৬টি দলে বিভক্ত। তারা আবার প্রত্যেকটি কয়েকটি দল আবার শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত। যথা– ১। খারেজী ১৫টি, ২। শীয়া ৩২টি, ৩। মু'তাযেলা ১২ টি, ৪। জাবারিয়া ৩টি, ৫। মুরজিয়া ৫টি, ৬। মুশাববিহা ৫টি। মোট ৭২টি। নাজিয়া বা সত্যপন্থী ১টি, সর্বমোট ৭৩টি।

وَعَنْ ١٦٣ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِيْ أَوْ قَالَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلٰى ضَلَالَةٍ وَيَدُ اللّٰهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ شُذَّ فِى النَّارِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

১৬৩. **অনুবাদ :** হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মত অথবা তিনি বলেছেন উম্মতে মুহাম্মদীকে কখনো ভ্রষ্টতার উপর একত্রিত করবেন না। আল্লাহ তা'আলার সাহায্যের হাত জামাতের উপরই রয়েছে, আর যে ব্যক্তি জামাত হতে বিচ্ছিন্ন হয় সে বিচ্ছিন্ন হয়ে জাহান্নামে যাবে। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

يَدُ اللّٰهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ **-এর অর্থ :** উক্ত হাদীসে "يَدٌ" শব্দটি দয়া, অনুগ্রহ, রহমত, সাহায্য ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর হাত জামাতের উপর রয়েছে, অর্থাৎ মুসলমানগণ যতক্ষণ পর্যন্ত একতাবদ্ধ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রহমত বা সাহায্য তাদের উপর থাকে। এ ঐক্য দীন সংক্রান্ত ব্যাপারে হোক বা সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হোক। দীন কিংবা সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে যখনই কেউ পরশ্রীকাতরতার আবর্তে পড়ে স্বীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেয় তখনই এ ঐক্যে ফাটল দেখা দেয়, ফলে তাদের উপর ধ্বংস নেমে আসে। অতীত ও বর্তমানের ইতিহাস এর বাস্তব দৃষ্টান্ত। অতএব মুসলমানদের জীবনের সর্বক্ষেত্রেই একতাবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করা উচিত। আর এটাই আলোচ্য হাদীসের শিক্ষা। মহান আল্লাহর ভাষায় كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ 'তারা যেন সীসাঢালা প্রাচীর'।

وَعَنْهُ ١٦٤ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِتَّبِعُوا السَّوَادَ الْاَعْظَمَ فَاِنَّهُ مَنْ شَذَّ شُذَّ فِى النَّارِ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ مِنْ حَدِيْثِ اَنَسٍ

১৬৪. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— তোমরা বড় দলের অনুসরণ কর। কেননা, যে জামাত হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সে আলাদা হয়ে [অবশেষে] অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হবে। ইমাম ইবনে মাজাহ্ হাদীসটি হযরত আনাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

وَعَنْ ١٦٥ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَابُنَيَّ اِنْ قَدَرْتَ اَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ وَلَيْسَ فِيْ قَلْبِكَ غِشٌّ لِاَحَدٍ فَافْعَلْ ثُمَّ قَالَ يَابُنَيَّ وَ ذٰلِكَ مِنْ سُنَّتِيْ وَمَنْ اَحَبَّ سُنَّتِيْ فَقَدْ اَحَبَّنِيْ وَمَنْ اَحَبَّنِيْ كَانَ مَعِيْ فِى الْجَنَّةِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

১৬৫. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— হে বৎস ! তুমি যদি এরূপে সকাল-সন্ধ্যায় উপনীত হতে পার যে, তোমার অন্তরে কারো জন্য হিংসা-বিদ্বেষ নেই, তবে তা কর। এরপর বলেন, হে প্রিয় বৎস ! এটা হলো আমার সুন্নত, আর যে আমার সুন্নতকে ভালোবাসে সে আমাকেই ভালোবাসে, আর যে আমাকে ভালোবাসে সে আমার সাথেই জান্নাতে থাকবে। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীসে মহানবী ﷺ তার সুন্নতের অনুসরণের প্রতি উৎসাহিত করেছেন। অবশ্য সুন্নতের যথার্থ অনুসরণ তখনই হবে, যখন সে ব্যক্তি ফরজ, ওয়াজিবসমূহকে যথাযথভাবে পালন করে এবং হারাম, মাকরূহ ও বিদ'আত হতে বেঁচে চলে। অতঃপর সুন্নতের উপর আমল করতে তৎপর হয়।

আর مَعِيْ فِى الْجَنَّةِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ন্যায় জান্নাত লাভের সৌভাগ্য লাভ করবে। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, সুন্নতের অনুসরণ করার কল্যাণে সে জান্নাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সমপর্যায়ের মর্যাদা লাভ করবে।

وَعَنْ ١٦٦ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِيْ عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِيْ فَلَهُ أَجْرُ مِائَةِ شَهِيْدٍ - رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ كِتَابِ الزُّهْدِ لَهُ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ -

১৬৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— যে ব্যক্তি আমার উম্মতের ভ্রষ্টতা ও পদস্খলনের সময় আমার সুন্নতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে রাখে সে একশত শহীদের ছওয়াব পাবে। ইমাম বায়হাকী এ হাদীসটিকে তার কিতাবুয যুহদে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

وَعَنْ ١٦٧ جَابِرٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ اَتَاهُ عُمَرُ فَقَالَ إِنَّا نَسْمَعُ اَحَادِيْثَ مِنْ يَهُوْدَ تُعْجِبُنَا افَتَرٰى اَنْ نَكْتُبَ بَعْضَهَا فَقَالَ اَمُتَهَوِّكُوْنَ اَنْتُمْ كَمَا تَهَوَّكَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً وَلَوْ كَانَ مُوْسٰى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِيْ - رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ

১৬৭. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, একদা হযরত ওমর (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করে বললেন, [হে আল্লাহর রাসূল !] আমরা ইহুদিদের নিকট থেকে কথা উপদেশ শুনে থাকি, তা আমাদের কাছে চমৎকার মনে হয়। তার কিছু লেখে রাখার জন্য আপনি আমাদেরকে অনুমতি দেবেন কি? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা কি [তোমাদের দীন সম্পর্কে] এরূপ দ্বিধাগ্রস্ত রয়েছ, যেভাবে ইহুদি নাসারাগণ দিধাগ্রস্ত রয়েছে? অবশ্যই আমি তোমাদের নিকট সম্পূর্ণ উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ দীন নিয়ে এসেছি। [ইহুদিদের নবী] হযরত মূসা (আ.) যদি জীবিত থাকতেন তবে তাঁর পক্ষেও আমার অনুসরণ ছাড়া উপায় ছিল না।−[আহমদ] বায়হাকীও তাঁর শু'আবুল ঈমান গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شرح الحديث হাদীসের ব্যাখ্যা : বস্তুত মহানবী ﷺ এর আগমনের ফলে পূর্বের সমস্ত ধর্ম রহিত হয়ে গেছে এমনকি তাদের ধর্ম গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তাও নিঃশেষিত হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় মুসলমানদের অন্য কোনো ধর্মের কিছু অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই। কেননা, ইসলামই হলো পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, তাতে সব কিছুর ফয়সালা রয়েছে। যেহেতু অন্য সকল ধর্ম রহিত হয়ে গেছে তাই যদি হযরত মূসা (আ.) ও জীবিত থাকতেন তবে তাঁর উপর আবশ্যক হতো মুহাম্মদ ﷺ-এর অনুসরণ করা।

وَعَنْ ١٦٨ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَكَلَ طَيِّبًا وَعَمِلَ فِيْ سُنَّةٍ وَاَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ هٰذَا الْيَوْمَ لَكَثِيْرٌ فِي النَّاسِ قَالَ وَسَيَكُوْنُ فِيْ قُرُوْنٍ بَعْدِيْ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

১৬৮. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— যে ব্যক্তি পবিত্র ও হালাল বস্তু খেল আর সুন্নতের উপর আমল করল আর যার ক্ষতি হতে মানুষ নিরাপদ থাকল সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অতঃপর এক ব্যক্তি বলে উঠল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! বর্তমানে তো এরূপ লোক অনেক আছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমার পরেও এরূপ লোক থাকবে। −[তিরমিযী]

وَعَنْ ١٦٩ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّكُمْ فِىْ زَمَانٍ مَنْ تَرَكَ مِنْكُمْ عُشْرَ مَا اُمِرَ بِهٖ هَلَكَ ثُمَّ يَاْتِىْ زَمَانٌ مَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِعُشْرِ مَا اُمِرَ بِهٖ نَجَا . رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

১৬৯. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— তোমরা এমন এক যুগে আছ, যদি তোমাদের মধ্যে হতে কেউ আল্লাহ যা নির্দেশ দিয়েছেন তার একদশমাংশ ত্যাগ করে, তবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। এরপর এমন যুগ আসবে যদি কেউ তখন শরিয়তের একদশমাংশের উপর আমল করে তবে সে মুক্তি পেয়ে যাবে। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীসে مَا اُمِرَ بِهٖ তথা নির্দেশিত বিষয় দ্বারা 'শরয়ী বিধানের' সকল বিষয় বুঝানো হয়নি; বরং এখানে اَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ [সৎ কাজের আদেশ] এবং نَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ [অসৎ কাজের নিষেধ] বুঝানো হয়েছে। মোটকথা উল্লিখিত কাজের জন্য সে যুগের পরিবেশ ছিল অনুকূল। কিন্তু পরবর্তী যুগের পরিবেশ সেরূপ অনুকূলে থাকবে না ; হাদীসে তারই ইঙ্গিত রয়েছে। অতএব হাদীসের অর্থ এটা নয় যে, পরবর্তী যুগে 'ফরজ বা ওয়াজিব' কিছু কম আদায় করলেও দূষণীয় হবে না; বরং প্রথম যুগে 'আমর বিল মারূফ' ও 'নাহী আনিল মুনকার' প্রত্যেকের উপর সমানভাবে ফরজ ছিল, কিন্তু পরবর্তী যুগে তা সমস্ত মুসলমানের উপর সমানভাবে ওয়াজিব থাকেনি; বরং যদি কোনো এক ব্যক্তি তার হক আদায় করে দেয় তবে অন্যদের জন্য তা যথেষ্ট হবে। বস্তুত তখন যে ইসলাম প্রচারের অনুকূল পরিবেশ থাকবে না তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী يَاْتِىْ زَمَانٌ দ্বারাই বুঝা যায়।

وَعَنْ ١٧٠ اَبِىْ اُمَامَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوْا عَلَيْهِ اِلَّا اُوْتُوا الْجَدَلَ ثُمَّ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذِهِ الْاٰيَةَ مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ اِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ . رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ

১৭০. **অনুবাদ :** হযরত আবূ উমামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, কোনো জাতি হিদায়েত পেয়ে তার উপর স্থির থাকার পর পথভ্রষ্ট হয়নি। কিন্তু যখন তারা ধর্মীয় ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত হলো [তখন গোমরাহ হয়েছে]। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন— مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ اِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ অর্থাৎ, তারা ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য ছাড়া আপনার নিকট তা উত্থাপন করে না। বস্তুত তারা হচ্ছে ঝগড়াটে লোক। [সূরা যুখরুফ, আয়াত : ৫৮] –[আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

وَعَنْ ١٧١ اَنَسٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ لَا تُشَدِّدُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ فَيُشَدِّدُ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ فَشَدَّدَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ فَتِلْكَ بَقَايَاهُمْ فِى الصَّوَامِعِ وَالدِّيَارِ "رُهْبَانِيَّةً اِبْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَا هَا عَلَيْهِمْ". رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ

১৭১. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন, তোমরা স্বেচ্ছায় নিজেদের উপর কঠোরতা আনয়ন করো না, তাহলে আল্লাহও তোমাদের উপর কঠোর বিধান চাপিয়ে দেবেন। নিশ্চয় অতীতে একটি জাতি তাদের নিজেদের জন্য কঠোরতা গ্রহণ করেছিল, ফলে আল্লাহ তা'আলাও তাদের উপর কঠোর বিধান চাপিয়ে দিয়েছেন। গীর্জা ও পাদ্রীদের উপাসনালয়ে যে লোকগুলো আছে ওরাও তাদের উত্তরাধিকারী। পবিত্র কুরআনে রয়েছে যে, রুহবানিয়াত তারা নিজেরাই নিজেদের জন্য সৃষ্টি করেছে, অথচ আমি [আল্লাহ] তাদের জন্য এ বিধান করিনি। [সূরা হাদীদ, আয়াত : ২৭]–[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْمُرَادُ بِقَوْلِهِ ﷺ لَاتُشَدِّدُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ নিজেদের উপর কঠোরতা করো না-এর ব্যাখ্যা : মহানবী ﷺ বলেছেন যে, তোমরা নিজেদের প্রতি কঠোরতা করো না। এর অর্থ–ইবাদত পালনে শক্তি-সামর্থ্যের বাইরে অতিরিক্ত কোনো কাজ করাকে কঠোরতা বলা হয়। যেমন— صَوْمُ الدَّهْرِ সারা বছর রোজা রাখা, সারা জীবন বিবাহ না করা, এগুলো বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কিছুই নয়। যেমন— বনী ইসরাঈলের লোকেরা গাভী জবাইয়ের ঘটনায় অযথা প্রশ্ন করে নিজেদের উপর কঠোরতা টেনে এনেছে। অথচ একটি গাভী জবাই করলেই চলত।

رُهْبَانِيَّة -এর অর্থ ও তার হুকুম : ইবাদতের জন্য সন্যাসব্রত বা বৈরাগ্যতা পালন করাকে 'রুহবানিয়াত' বলা হয়। যেমন— ঘর-বাড়ি ত্যাগ করে বা মানুষের সংস্রব পরিহার করে বনে-জঙ্গলে গমন করা, বিবাহ-শাদী না করে বৈরাগ্য অবলম্বন করা বা পুরুষাঙ্গ কর্তন করে ফেলা, কাপড় ছেড়ে চট-বস্তা ইত্যাদি পরিধান করা ইত্যাদিকে রুহবানিয়াত বলা হয়। যেমন– অমুসলিম বৈরাগী সন্যাসীরা অবলম্বন করে থাকে। হযরত নবী করীম ﷺ এ সম্পর্কে বলেছেন— لَا رُهْبَانِيَّةَ فِى الْاِسْلَامِ। অর্থ– ইসলামে রুহবানিয়াতের বিধান নেই। সুতরাং ইসলাম ধর্মে এই বৈরাগ্য সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

وَعَنْ ١٧٢ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نُزِّلَ الْقُرْاٰنُ عَلٰى خَمْسَةِ اَوْجُهٍ حَلَالٌ وَحَرَامٌ وَمُحْكَمٌ وَمُتَشَابِهٌ وَاَمْثَالٌ فَاَحِلُّوا الْحَلَالَ وَحَرِّمُوا الْحَرَامَ وَاعْمَلُوْا بِالْمُحْكَمِ وَاٰمِنُوْا بِالْمُتَشَابِهِ وَاعْتَبِرُوْا بِالْاَمْثَالِ هٰذَا لَفْظُ الْمَصَابِيْحِ وَ رَوَى الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ وَلَفْظُهُ فَاعْمَلُوْا بِالْحَلَالِ وَاجْتَنِبُوا الْحَرَامَ وَاتَّبِعُوا الْمُحْكَمَ

১৭২. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— কুরআন [-এর আয়াতসমূহ] পাঁচ রকমে [পাঁচ হুকুমে] অবতীর্ণ হয়েছে— (১) হালাল, (২) হারাম, (৩) মুহকাম, (৪) মুতাশাবিহ এবং (৫) আমছাল [ঘটনা উপমা]। কাজেই তোমরা হালালকে হালাল মনে করবে, হারামকে হারাম মনে করবে, আয়াতে মুতাশাবিহ-এর উপর ঈমান আনয়ন করবে। আর আমছাল তথা [উপমা উদাহরণ] দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করবে।

এটা মাসাবীহে বর্ণিত হাদীসের ভাষা। আর ইমাম বায়হাকী ও শু'আবুল ঈমানে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাতে উল্লিখিত হাদীসটির ভাষা এ রকম, তোমরা হালালের উপর আমল করবে, হারাম পরিত্যাগ করবে এবং মুহকামের অনুসরণ করবে।

وَعَنْ ١٧٣ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْاَمْرُ ثَلٰثَةٌ اَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَاتَّبِعْهُ وَاَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَاجْتَنِبْهُ وَاَمْرٌ اُخْتُلِفَ فِيْهِ فَكِلْهُ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ . رَوَاهُ اَحْمَدُ

১৭৩. **অনুবাদ :** হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— শরিয়তের বিষয় তিন প্রকার : (১) এমন বিষয় যার হিদায়েত সম্পূর্ণ স্পষ্ট, কাজেই তার অনুসরণ করবে। (২) এমন বিষয় যার ভ্রষ্টতা সম্পূর্ণ স্পষ্ট, কাজেই তা পরিহার করবে। (৩) এমন বিষয় যাতে মতভেদ রয়েছে, এ বিষয়টিকে আল্লাহ তা'আলার উপর সোপর্দ করবে। –[আহমদ]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٧٤ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الشَّيْطَانَ ذِئْبُ الْاِنْسَانِ كَذِئْبِ الْغَنَمِ يَاْخُذُ الشَّاذَّةَ وَالْقَاصِيَةَ وَالنَّاحِيَةَ وَاِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ ـ رَوَاهُ اَحْمَدُ

১৭৪. **অনুবাদ :** হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের জন্য নেকড়ে স্বরূপ, মেষপালের নেকড়ের ন্যায়। যে মেষপালের মধ্যে একটি দল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, অথবা খাদ্যের সন্ধানে দূরে চলে যায়, অথবা অলসতাবশত দলের এক প্রান্তে পড়ে থাকে তাকে বাঘে নিয়ে যায়। সাবধান ! সাবধান ! তোমরা কখনো পৃথক হয়ে দল ছেড়ে গিরিপথে যেয়ো না, আর মুসলমান জামাত তথা সাধারণের সাথে থাকবে। –[আহমদ]

وَعَنْ ١٧٥ اَبِىْ ذَرٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ ـ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَ اَبُوْدَاوُدَ

১৭৫. **অনুবাদ :** হযরত আবূ যার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— যে ব্যক্তি জামাত হতে [কিছু সময়ের জন্য হলেও] এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে পড়ে, সে যেন ইসলামের রশি নিজের ঘাড়ের উপর থেকে খুলে ফেলে।–[আহমদ ও আবূ দাঊদ]

وَعَنْ ١٧٦ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ (رض) مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهِ ـ رَوَاهُ فِى الْمُؤَطَّا

১৭৬. **অনুবাদ :** হযরত মালেক ইবনে আনাস (রা.) হতে মুরসাল হাদীসরূপে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সেগুলোকে আঁকড়ে ধরে রাখবে ততক্ষণ তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। তা হলো আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নত। –[মুওয়াত্তা]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

سَبَبُ اِرْشَادِ الْحَدِيْثِ **হাদীসের পটভূমি :** দশম হিজরিতে মহানবী ﷺ হজ পালনের উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কা নগরীতে গমন করেন, এটা ছিল তাঁর জীবনের শেষ হজ। এ হজকে বিদায়ী হজ বলা হয় হজ উপলক্ষ্যে আগত লক্ষাধিক সাহাবীর উদ্দেশ্যে আরাফাতের ময়দানে তিনি এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন, এতে সাহাবীগণ বুঝতে পারলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্তিম সময় ঘনিয়ে আসছে , তাই তাঁরা চিন্তিত হয়ে পড়লেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের পর আমরা কাকে অনুসরণ করব? এবং কোন নীতির উপর চলব ? তারা এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করলে তিনি ﷺ উত্তরে আলোচ্য হাদীসটি ইরশাদ করেন।

وَعَنْ ١٧٧ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ الثُّمَالِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَحْدَثَ قَوْمٌ بِدْعَةً اِلَّا رُفِعَ مِثْلُهَا مِنَ السُّنَّةِ فَتَمَسُّكٌ بِسُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ اِحْدَاثِ بِدْعَةٍ . رَوَاهُ اَحْمَدُ

১৭৭. অনুবাদ : হযরত গোযাইফ ইবনে হারিছ ছুমালী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— যখনই কোনো সম্প্রদায় একটি বিদআত সৃষ্টি করে, তখনই তার অনুরূপ একটি সুন্নত উঠিয়ে নেওয়া হয়। কাজেই একটি সুন্নতকে আঁকড়ে ধরা একটি বিদআত সৃষ্টি হতে উত্তম। [যদিও তা বিদআতে হাসানা হয় না কেন]। –[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** সুন্নত হলো আলো স্বরূপ, আর বিদআত হলো অন্ধকার, কাজেই আলো ও অন্ধকার যেমন এক স্থানে একত্র হতে পারে না, তেমনি সুন্নত ও বিদআতও একই সঙ্গে অবস্থান করতে পারে না; বরং কোথাও যখনই কোনো বিদআত সুন্নতের স্থান দখল করে তখনই সেখান থেকে সুন্নত বিদায় নেয়।

وَعَنْ ١٧٨ حَسَّانٍ (رض) قَالَ مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً فِيْ دِيْنِهِمْ اِلَّا نَزَعَ اللّٰهُ مِنْ سُنَّتِهِمْ مِثْلَهَا ثُمَّ لَا يُعِيْدُهَا اِلَيْهِمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ . رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

১৭৮. অনুবাদ : হযরত হাস্‌সান ইবনে ছাবিত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখনই কোনো জাতি দীন সম্পর্কে কোনো বিদআত সৃষ্টি করে তখনই আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্য হতে সে পরিমাণ সুন্নত উঠিয়ে নেন। অতঃপর আর কিয়ামত পর্যন্ত সেই সুন্নত আর তাদের প্রতি ফিরিয়ে দেন না। –[দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** কিয়ামত পর্যন্ত তাদের নিকট সুন্নত ফিরিয়ে না দেওয়ার অর্থ হলো, সে উক্ত বিদআতকে দীন মনে করেই যথারীতি পালন করে থাকে। তাই তা হতে তওবা করার কোনো সুযোগ আসে না এবং তা পরিত্যাগও করে না। তাই কিয়ামত পর্যন্ত তাদের নিকট সে সুন্নতও ফিরে আসে না। এ জন্য বলা হয়ে থাকে যে, কুফর-শিরক, কবীরা ও সগীরা যত গুনাহ আছে বিদআত তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক।

وَعَنْ ١٧٩ اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ مَيْسَرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ اَعَانَ عَلٰى هَدْمِ الْاِسْلَامِ . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ مُرْسَلًا .

১৭৯. অনুবাদ : [তাবেয়ী] ইবরাহীম ইবনে মাইসারাহ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— যে ব্যক্তি কোনো বিদআতকারীর সম্মান করেছে, সে যেন অবশ্যই ইসলাম ধর্ম ধ্বংস সাধনে সহায়তা করল। [ইমাম বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে মুরসাল হাদীসরূপে এ হিসেবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।]

وَعَنْ ١٨٠ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ مَنْ تَعَلَّمَ كِتَابَ اللّٰهِ ثُمَّ اتَّبَعَ مَا فِيْهِ هَدَاهُ اللّٰهُ مِنَ الضَّلَالَةِ فِي الدُّنْيَا وَ وَقَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سُوْءَ الْحِسَابِ وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ مَنِ اقْتَدٰى بِكِتَابِ اللّٰهِ لَا يَضِلُّ فِي الدُّنْيَا وَلَا يَشْقٰى فِي الْاٰخِرَةِ ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْاٰيَةَ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى ـ رَوَاهُ رَزِيْنٌ

১৮০. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান অর্জন করে, আর যা কিছু আল্লাহর কিতাবে আছে তার অনুসরণ করে। আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়াতে পথভ্রষ্টতা হতে রক্ষা করে হিদায়েতের পথে রাখেন। আর কিয়ামতের দিন তাকে হিসাবের কষ্ট হতে রক্ষা করবেন। অপর বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের অনুসরণ করে সে দুনয়াতে গোমরাহ হবে না এবং পরকালে হতভাগ্য হবে না। অতঃপর তিনি এর প্রমাণে এই আয়াত তিলাওয়াত করেন- فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى অর্থাৎ, যে আমার হোদায়াতের অনুসরণ করে সে [দুনিয়াতে] পথভ্রষ্ট হবে না এবং [আখেরাতে] ভাগ্যাহত হবে না।–[সূরা তাহা, আয়াত : ১২৩]–[রাযীন]

وَعَنْ ١٨١ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا صِرَاطًا مُسْتَقِيْمًا وَعَنْ جَنْبَتَيِ الصِّرَاطِ سُوْرَانِ فِيْهِمَا اَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ وَعَلَى الْاَبْوَابِ سُتُوْرٌ مُرْخَاةٌ وَعِنْدَ رَاْسِ الصِّرَاطِ دَاعٍ يَقُوْلُ اِسْتَقِيْمُوْا عَلَى الصِّرَاطِ وَلَا تَعَوَّجُوْا وَفَوْقَ ذٰلِكَ دَاعٍ يَدْعُوْ كُلَّمَا هَمَّ عَبْدٌ اَنْ يَفْتَحَ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْاَبْوَابِ قَالَ وَيْحَكَ لَا تَفْتَحْهُ فَاِنَّكَ اِنْ تَفْتَحْهُ تَلِجْهُ ثُمَّ فَسَّرَهُ فَاَخْبَرَ اَنَّ الصِّرَاطَ هُوَ الْاِسْلَامُ وَاَنَّ الْاَبْوَابَ الْمُفَتَّحَةَ مَحَارِمُ اللّٰهِ وَاَنَّ السُّتُوْرَ الْمُرْخَاةَ حُدُوْدُ اللّٰهِ وَاَنَّ الدَّاعِيَ

১৮১. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন— রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা একটি উদাহরণ পেশ করেছেন, একটি সরল রাস্তা, আর রাস্তার দু'দিকে রয়েছে দু'টি দেয়াল। আর উক্ত দেয়ালে অনেক দরজা খোলা রয়েছে এবং সে সকল দরজায় পর্দা ঝুলানো রয়েছে। আর রাস্তার মাথায় একজন আহবায়ক দঁড়িয়ে আছে, যে ডেকে বলছে, সোজা রাস্তায় চলে যাও, এদিক সেদিক চলো না। আর এর আরেকটু পূর্বে আরেকজন আহবানকারী লোকদেরকে ডাকছে, যখন কোনো বান্দা এ দরজাগুলোর কোনোটি খোলার ইচ্ছা করে তখন দ্বিতীয় আহবায়ক ডেকে বলে সর্বনাশ। তা খোল না; যদি তা খুলো তবে তাতে ঢুকে পড়বে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যাখ্যা করলেন এবং খবর দিলেন যে, সরল রাস্তা হলো ইসলাম। আর খোলা দরজাসমূহ আল্লাহ কর্তৃক হারাম করা বিষয়সমূহ। আর ঝুলানো পর্দাসমূহ হলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমাসমূহ।

عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ هُوَ الْقُرْآنُ وَأَنَّ الدَّاعِيَ مِنْ فَوْقِهِ هُوَ وَاعِظُ اللّٰهِ فِيْ قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنٍ . رَوَاهُ رَزِيْنٌ وَرَوَاهُ اَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ وَكَذَا التِّرْمِذِيُّ عَنْهُ اِلَّا اَنَّهُ ذَكَرَ اَخْصَرَ مِنْهُ -

আর রাস্তার মাথায় আহবায়ক হচ্ছে– কুরআন। আর তার সম্মুখে আহবায়ক হচ্ছে– আল্লাহর সে উপদেশদাতা যা প্রত্যেক মু'মিনের অন্তরে রয়েছে।সে তাকে কুরআনের উপদেশ শোনার জন্য উপদেশ দেয়] [রাযীন] আহমদ তাঁর মুসনাদে এবং ইমাম বায়হাকী তাঁর শু'আবুল ঈমানে নাওয়াস ইবনে সাম'আন এর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম তিরমিযীও তারই সূত্রে হাদীসটি সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَعْنٰى قَوْلِهِ هُوَ وَاعِظُ اللّٰهِ فِيْ قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنٍ প্রত্যেক মু'মিনের অন্তরস্থ আল্লাহর উপদেশ দাতার অর্থ : হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, প্রত্যেক মানুষের অন্তরে দু'টি প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে। একটি হলো— لَمَّةُ الْمَلَكِ বা ফেরেশতার প্রভাব। আর অপরটি হলো لَمَّةُ الشَّيْطَانِ বা শয়তানের প্রভাব। ফেরেশতার প্রভাব মানুষকে ভাল কর্মে উদ্বুদ্ধ করে এবং পাপ কাজে নিরুৎসাহিত করে। আর শয়তানের প্রভাব মানুষকে পাপ কর্মে উৎসাহিত করে এবং পূণ্য কর্মে নিরুৎসাহিত করে। এখানে هُوَ وَاعِظُ اللّٰهِ فِيْ قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنٍ দ্বারা لَمَّةُ الْمَلَكِ বা ফেরেশতার প্রভাবকে বুঝানো হয়েছে।

وَعَنْ ١٨٢ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ مَنْ كَانَ مُسْتَنًّا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْمَاتَ فَاِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ اُولٰئِكَ اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ كَانُوْا اَفْضَلَ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اَبَرَّهَا قُلُوْبًا وَاَعْمَقُهَا عِلْمًا وَاَقَلَّهَا تَكَلُّفًا اِخْتَارَهُمُ اللّٰهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ وَلِاِقَامَةِ دِيْنِهِ فَاعْرِفُوْا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَاتَّبِعُوْهُمْ عَلٰى اٰثَرِهِمْ وَتَمَسَّكُوْا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ اَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ فَاِنَّهُمْ كَانُوْا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيْمِ . رَوَاهُ رَزِيْنٌ

১৮২. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– যে ব্যক্তি কারো রীতি-নীতি অনুসরণ করতে চায়, সে যেন যারা দুনিয়া হতে চলে গেছেন তাঁদেরই রীতি-নীতি অনুসরণ করে। কেননা, জীবিত ব্যক্তিরা ফেতনা হতে নিরাপদ নয়, এই মৃতরা হলেন হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর সাহাবীগণ। তাঁরা ছিলেন এই উম্মতের সর্বোত্তম ব্যক্তিবর্গ। তাঁরা ছিলেন পবিত্র অন্তরাত্মার অধিকারী, গভীর জ্ঞানী এবং কৃত্রিমতা ও বাহুল্য বর্জনকারী। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আপন নবীর সাহচর্য এবং আপন দীন প্রতিষ্ঠার জন্য মনোনীত করেছেন। অতএব তোমরা তাদের মর্যাদা অনুধাবন কর, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চল এবং সাধ্যমতো তাঁদের স্বভাব চরিত্র আঁকড়ে ধর। কেননা, তারা সরল সঠিক পথে ছিলেন। –[রাযীন]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, নবী করীম ﷺ-এর উম্মতের মধ্যে সাহাবীগণ ছিলেন সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তিত্ব। তাঁদের মর্যাদা সম্পর্কে মহান আল্লাহ পাক বলেন اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ অন্যত্র এসেছে اُولٰئِكَ

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوٰى বা هُمُ الرَّاشِدُونَ ইত্যাদি। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদেরকে তারকা তুল্য বলে তাদের অনুসরণ করার নির্দেশ করেছেন। অতএব কুরআন ও হাদীসের পর সাহাবীদের মতাদর্শই অনুসরণ করা একান্ত আবশ্যক ; অন্য কারো নয়।

وَعَنْ ١٨٣ جَابِرٍ (رض) أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِنُسْخَةٍ مِّنَ التَّوْرَاةِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذِهٖ نُسْخَةٌ مِّنَ التَّوْرَاةِ فَسَكَتَ فَجَعَلَ يَقْرَأُ وَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَتَغَيَّرُ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ ثَكِلَتْكَ الثَّوَاكِلُ مَا تَرٰى مَا بِوَجْهِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَنَظَرَ عُمَرُ إِلٰى وَجْهِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ وَغَضَبِ رَسُوْلِهٖ رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَوْ بَدَا لَكُمْ مُوْسٰى فَاتَّبَعْتُمُوْهُ وَتَرَكْتُمُوْنِيْ لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ وَلَوْ كَانَ مُوْسٰى حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِيْ لَاتَّبَعَنِيْ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

১৮৩. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– একদা হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তাওরাতের একটি কপি এনে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ! এটি একটি তাওরাতের কপি। এতে রাসূল ﷺ চুপ রইলেন, কিন্তু হযরত ওমর (রা.) তাওরাত পাঠ করতে শুরু করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা মোবারক বিবর্ণ হতে লাগল। এটা দেখে হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, ওমর তোমার সর্বনাশ হয়েছে, তুমি কি দেখছ না! রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা মুবারক কী রূপ ধারণ করেছে ? তখন হযরত ওমর (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহরার দিকে তাকালেন এবং [চেহারায় ক্রোধের ভাব দেখে] বললেন— আমি আল্লাহর ক্রোধ এবং তাঁর রাসূলের ক্রোধ হতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাই। আমরা আল্লাহকে প্রতিপালক, ইসলামকে দীন, মুহাম্মদ ﷺ-কে নবী হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট রয়েছি।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সেই সত্তার কসম যার হাতে রয়েছে মুহাম্মদের প্রাণ। এই সময় যদি তোমাদের নিকট [তাওরাত কিতাবের নবী স্বয়ং] হযরত মূসা (রা.)-ও উপস্থিত থাকতেন, আর তোমরা আমাকে পরিত্যাগ করে তাঁর অনুসরণ করতে, তবে তোমরা অবশ্যই সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়ে যেতে। এমন কি যদি তিনি এখনও জীবিত থাকতেন আর আমার নবুয়তের সময়কাল পেতেন, তবে অবশ্যই তিনি আমার অনুসরণ করতেন। –[দারিমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لَاتَّبَعَنِيْ -এর অর্থ : বিশ্বনবী ﷺ নবুয়তপ্রাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে পূর্বেকার সকল ধর্ম মানসূখ বা বাতিল হয়ে গেছে। একদা হযরত ওমর (রা.) যখন তাওরাত পাঠ করছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা মোবারক বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল, অবশেষে তিনি বললেন, "এখন যদি স্বয়ং হযরত মূসা (আ.)-ও জীবিত থাকতেন এবং আমার নবুয়তের সময়কাল পেতেন, তবে তিনি অবশ্যই আমার অনুসরণ করতেন। শুধু হযরত মূসা (আ.) নয়; বরং যে কোনো নবীই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণ করতে বাধ্য হতেন, কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর দীনই বহাল থাকবে।

وَعَنْ ١٨٤ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَلَامِىْ لَا يَنْسَخُ كَلَامَ اللّٰهِ وَكَلَامُ اللّٰهِ يَنْسَخُ كَلَامِىْ وَكَلَامُ اللّٰهِ يَنْسَخُ بَعْضُهٗ بَعْضًا .

১৮৪. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আমার কালাম আল্লাহর কালামকে রহিত করতে পারে না। কিন্তু আল্লাহর কালাম আমার কালামকে রহিত করে। আর আল্লাহর কালাম এক অংশ অপর অংশকে রহিত করে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَعْنَى النَّسْخِ وَ اَقْسَامُهٗ নসখের সংজ্ঞা ও তার প্রকারসমূহ :

▮ **مَعْنَى النَّسْخِ لُغَةً** : اَلنَّسْخُ শব্দটি বাবে فَتَحَ -এর মাসদার। অভিধানে শব্দটি নিম্নোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন– ১. আল্লামা বায়যাবী (র.) বলেন, স্থানচ্যুত করা। ২. কেউ কেউ বলেন, দূরীভূত করা। ৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, পরিবর্তন করা। ৪. কেউ কেউ বলেন, রহিত করা। ৫. আল্লামা মুজাহিদ (র.) বলেন, মিটিয়ে দেওয়া। ৬. আল্লামা সুদ্দী (র.) বলেন, তুলে নেওয়া ইত্যাদি।

▮ **مَعْنَى النَّسْخِ اِصْطِلَاحًا** :

১. ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় نَسْخ বলা হয় هُوَ تَبْدِيْلُ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ اٰخَرَ অর্থাৎ, পূর্বের কোনো শরয়ী বিধানকে পরবর্তী কোনো শরয়ী বিধান দ্বারা পরিবর্তন করে দেওয়াকে نَسْخ বলা হয়।

২. আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, শরয়ী কোনো বিধান পরিবর্তন করাকে نَسْخ বলা হয়।

৩. কেউ কেউ বলেন– اَلنَّسْخُ هُوَ اِزَالَةُ حُكْمٍ بِاِثْبَاتِ حُكْمٍ اٰخَرَ

৪. কারো মতে–

هُوَ اِزَالَةُ الْاٰيَةِ اَوْ حُكْمِ الشَّرِيْعَةِ مِنَ الْاٰيَاتِ الْقُرْاٰنِيَّةِ الَّتِىْ كَانَتْ مَعْمُوْلَةً مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ اٰيَةٌ اُخْرٰى .

▮ **اَقْسَامُ النَّسْخِ নসখের প্রকারভেদ** : نَاسِخْ ও مَنْسُوْخْ -এর হিসেবে نَسْخ সর্বমোট চার প্রকার।

১. **نَسْخُ الْقُرْاٰنِ بِالْقُرْاٰنِ কুরআন দ্বারা কুরআন রহিতকরণ** : যেমন– নিকটাত্মীয়দের জন্য অসিয়ত করার হুকুম মীরাসের আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

নিকটাত্মীয়দের জন্য অসিয়তের আয়াত :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَا ِۨ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ (الاية)

মীরাসের আয়াত :

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ (الاية)

২. **نَسْخُ الْحَدِيْثِ بِالْحَدِيْثِ হাদীস দ্বারা হাদীস রহিতকরণ** : যেমন– ইসলামের প্রাথমিক যুগে কবর যিয়ারত নিষিদ্ধ ছিল; কিন্তু পরে নবীজী ইরশাদ করেন– كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ اَلَا فَزُوْرُوْهَا الْاٰنَ

৩. **نَسْخُ الْحَدِيْثِ بِالْقُرْاٰنِ কুরআন দ্বারা হাদীস রহিতকরণ** : হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামাজ পড়লে আল্লাহ তা'আলা فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ দ্বারা তা রহিত করে দেন।

৪. نَسْخُ الْقُرْاٰنِ بِالْحَدِيْثِ হাদীস দ্বারা কুরআন রহিতকরণ : যেমন– كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ الخ। অসিয়তের এ আয়াতটি لَا وَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ হাদীস দ্বারা মানসূখ করা হয়েছে।

حُكْم ও تِلَاوَة -এর দিক থেকে نَسْخ পুনরায় তিন প্রকার।

১. نَسْخُ التِّلَاوَةِ وَالْحُكْمِ مَعًا [তিলাওয়াত ও হুকুম উভয়টি রহিত]।

২. نَسْخُ الْحُكْمِ دُوْنَ التِّلَاوَةِ [তিলাওয়াত অবশিষ্ট, কিন্তু হুকুম রহিত]।

৩. نَسْخُ التِّلَاوَةِ دُوْنَ الْحُكْمِ [তিলাওয়াত রহিত, কিন্তু হুকুম অবশিষ্ট]।

نَسْخُ الْقُرْاٰنِ بِالْحَدِيْثِ جَائِزٌ اَمْ لَا **হাদীস দ্বারা কুরআন রহিতকরণ বৈধ কিনা ?** হাদীস দ্বারা কুরআন রহিত করা বৈধ কিনা এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামদের মতবিরোধ রয়েছে। যেমন–

১. ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.) বলেন, হাদীস দ্বারা কুরআন রহিত করা বৈধ নয়।

দলিল : তাঁদের দলিল হলো–

١. قَوْلُهُ تَعَالٰى "مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْ مِثْلِهَا

এখানে কুরআনের এক আয়াত দ্বারা অপর আয়াতকে রহিত করার কথা বলা হয়েছে, হাদীস দ্বারা আয়াতকে রহিত করার কথা বলা হয় নি।

٢ . قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ "كَلَامِىْ لَا يَنْسَخُ كَلَامَ اللّٰهِ"

২. ইমাম আযম ও ইমাম মালেক (র.) বলেন, হাদীস দ্বারা কুরআন রহিত করা জায়েজ।

দলিল : নিজেদের মতের পক্ষে তাঁরা নিম্নোক্ত দলিল পেশ করেন–

ক. আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন– "مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى" এ হিসেবে হাদীস দ্বারা কুরআনের আয়াত রহিত হতে পারে।

খ. মাতা-পিতা ও নিকটাত্মীয়দের ব্যাপারে অসিয়ত করার আয়াতটিকে لَا وَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ হাদীস দ্বারা রহিত করা হয়েছে।

গ. বিবাহিত ব্যভিচারীর উপর থেকে বেত্রাঘাত করার হুকুম হাদীস দ্বারা রহিত করা হয়েছে। হাদীস দ্বারা বিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি رَجْم বা পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করার জন্য সাব্যস্ত করা হয়েছে।

كَلَامِىْ لَا يَنْسَخُ كَلَامَ اللّٰهِ **-এর অর্থ :** রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী "كَلَامِىْ لَا يَنْسَخُ كَلَامَ اللّٰهِ" দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কালাম আল্লাহর কালামকে রহিত করতে পারে না। অথচ হানাফী আলেমদের মতে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কালাম দ্বারা আল্লাহর কালাম রহিত করা জায়েজ আছে। সুতরাং যদি তাই হয়, তাহলে উল্লিখিত হাদীসাংশের অর্থ কি ? এর উত্তরে বলা হয়–

১. এখানে "كَلَامِىْ" বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর এমন কালাম নির্দেশ করেছেন, যা ওহী ভিত্তিক নয়। বরং তা তাঁর একান্তই নিজস্ব অভিমত। আর এরূপ অভিমত দ্বারা আল্লাহর কালাম রহিত করা যায় না।

২. অথবা, এ হাদীসটি হযরত ইবনে ওমর (রা.) বর্ণিত হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসটি হচ্ছে– قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَحَادِيْثَنَا يَنْسَخُ بَعْضُهَا بَعْضًا كَنَسْخِ الْقُرْاٰنِ ★

৩. অথবা كَلَامِىْ لَا يَنْسَخُ كَلَامَ اللّٰهِ -এর অর্থ হচ্ছে كَلَامِىْ لَا يَنْسَخُ تِلَاوَةَ كَلَامِ اللّٰهِ অর্থাৎ, আমার কালাম আল্লাহর কালামের তেলাওয়াতকে রহিত করে না।

فَائِدَةُ النَّسْخِ **রহিতকরণের উপকারিতা :** এর বিভিন্ন উপকারিতার কথা হাদীসবিশারদগণ বর্ণনা করেছেন। যেমন–
১. রহিতকরণ দ্বারা শরিয়তের বিধান হালকা করা হয়। ২. রহিতকারী আয়াত বা হাদীসের উপর আমল করলে অধিক ছওয়াব অর্জিত হয়। ৩. নতুন হুকুমের প্রবর্তন হয়। ৪. অনেক সময় সহজ বিধান জারি হয়। ৫. সমস্যার সমাধান হয়। ৬. শরিয়তের ফয়সালা পাওয়া যায়।

وَعَنْ ١٨٥ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَحَادِيْثَنَا يَنْسَخُ بَعْضُهَا بَعْضًا كَنَسْخِ الْقُرْاٰنِ.

১৮৫. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আমার হাদীসের কিছু হাদীস অপর হাদীসকে মানসূখ করে কুরআনের নসখের ন্যায়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

كَنَسْخِ الْقُرْاٰنِ -এর অর্থ : উক্ত হাদীসের বাক্যটির দু'টি অর্থ হতে পারে–

১. كَنَسْخِ بَعْضِ الْقُرْاٰنِ بَعْضًا : অর্থাৎ, যেমন কুরআনের একাংশ অন্য অংশকে রহিত করে, তেমনি এক হাদীস অন্য হাদীসকে রহিত করে। এই অর্থে نَسْخُ الْقُرْاٰنِ -এর মধ্যে মাসদারের ইযাফাত হয়েছে فَاعِلْ -এর দিকে।

২. كَنَسْخِ الْقُرْاٰنِ بِالْحَدِيْثِ : অর্থাৎ, আমার হাদীস যেমন কুরআনকে রহিত করে, তদরূপভাবে আমার হাদীস অন্য হাদীসকে রহিত করে। এই অর্থে نسخ القران -এর মধ্যে মাসদারের ইযাফত হয়েছে مَفْعُوْل-এর দিকে, উল্লেখ্য যে, ইমাম শাফেয়ী (র.) প্রথমোক্ত অর্থ গ্রহণ করেছেন। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করেছেন।

وَعَنْ ١٨٦ اَبِىْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوْهَا وَحَرَّمَ حُرُمَاتٍ فَلَا تَنْتَهِكُوْهَا وَحَدَّ حُدُوْدًا فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَسَكَتَ عَنْ اَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوْا عَنْهَا. رَوَى الْاَحَادِيْثَ الثَّلٰثَةَ الدَّارُ قُطْنِيُّ

১৮৬. অনুবাদ : হযরত আবূ ছালাবা খুশানী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা কতিপয় বিষয় ফরজরূপে নির্ধারণ করেছেন, সেগুলোকে নষ্ট করবে না [তথা ত্যাগ করবে না]। কতক জিনিস হারাম করেছেন, তার নিকটও যাবে না। আর কতক সীমা নির্ধারণ করেছেন, সেগুলোকে লঙ্ঘন করবে না। আর কয়েকটি বিষয়ে তিনি ভুল করে নয়; বরং ইচ্ছা করেই নীরব রয়েছেন। অতএব সে সমস্ত বিষয়ে বিতর্ক করবে না। –[দারাকুতনী উপরোক্ত তিনটি হাদীস বর্ণনা করেছেন]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَرَائِض -এর পরিচয় : فَرَائِض শব্দটি فَرِيْضَةٌ -এর বহুবচন, শাব্দিক অর্থ হলো– নির্ধারিত, অবশ্যকীয় বা অপরিহার্য বিষয়। পরিভাষায় فَرَائِض বলা হয়–

১. مَا اَوْجَبَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى عِبَادِهٖ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা বান্দার উপর যে সব বিষয় আবশ্যকীয় করেছেন তাই হলো ফরজ।

২. কারো মতে, هِىَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلٰى فِعْلِهِ الثَّوَابُ وَعَلٰى تَرْكِهِ الْعِقَابُ مِنَ الْعِبَادَاتِ অর্থাৎ, তা এমন ইবাদত যা করলে ছওয়াব পাওয়া যায়, আর পরিত্যাগ করলে শাস্তিরযোগ্য হতে হয়।

৩. আরেক দলের মতে, هُوَ مَا يُمْدَحُ فَاعِلُهٗ شَرْعًا وَيُذَمُّ تَارِكُهٗ قَصْدًا مُطْلَقًا এমন কাজ যার সম্পাদনকারী সাধারণতঃ শরিয়তের দৃষ্টিতে প্রশংসাযোগ্য হয় এবং ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যাগকারী তিরস্কারের পাত্র হয়।

৪. ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে– ফরজ ও ওয়াজিব শব্দ দু'টি সমার্থবোধক।

৫. ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে– যা قَطْعِىْ বা অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত, তা ফরজ। আর যা ظَنِّىْ দলিল দ্বারা প্রমাণিত তা ওয়াজিব। তবে ওয়াজিবও আমলের ক্ষেত্রে ফরজের তুল্য।

উল্লেখ্য যে আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত فَرَائِض দ্বারা যাবতীয় ফরজ এবং ওয়াজিবকে বুঝানো হয়েছে।

كِتَابُ الْعِلْمِ

ইলম অধ্যায়

عِلْمٌ শব্দটি আরবি। এর শাব্দিক অর্থ– (اَلْيَقِيْنُ وَالْاِدْرَاكُ وَ الْفَهْمُ) অনুধাবন করা, জানা বা বিশ্বাস স্থাপন করা। কোনো কিছুকে যাবতীয় তত্ত্ব ও তথ্যানুসারে জানার নাম ইলম। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে তাওহীদ ভিত্তিক জ্ঞানার্জনকে ইলম বলা হয়। এ অধ্যায়ে ইলমের ফজিলত, ইলম শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দান করা ইত্যাদি বিষয়ে হাদীস সংকলন করা হয়েছে।

ইসলামে ইলমের গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম। আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে বলেন, قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ, যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি এক সমান ? আলেমের গুণ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন– اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন– طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ

আর আলেমের মর্যাদা সম্পর্কে বলেন– فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِىْ عَلٰى اَدْنَاكُمْ

এ ছাড়াও ইলম এবং আলেমের মর্যাদা সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

▌ইলমের উপর সকল আমল নির্ভরশীল বিধায় গ্রন্থকার ইলমের অধ্যায় অন্যান্য আমলের পূর্বে উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য যে, এখানে ইলম দ্বারা ইলমে দীন উদ্দেশ্য।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

١٨٧ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ اٰيَةً وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

১৮৭. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– আমার পক্ষ হতে [দীনের কথা লোকদের নিকট] পৌঁছাতে থাক, যদিও তা একটি মাত্র বাক্য হয়। আর বনী ইসরাঈল হতে শোনা কথা বর্ণনা করতে পার, তাতে কোনো দোষ নেই [অর্থাৎ তাদের ভালো কথা শোনাতে কোনো দোষ নেই।] ; কিন্তু যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত আমার উপর মিথ্যারোপ করে; সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে প্রস্তুত করে নেয়। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : হযরত মুহাম্মদ ﷺ কিয়ামত পর্যন্ত বিশ্বের সকল জাতি ও মানুষের জন্য নবী ও রাসূল হিসেবে তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে পথ দেখানোর জন্য আগমন করেছেন। তার অমীয় বাণী হতে কেউ যেন বঞ্চিত না হয়, এই জন্য তাঁর বাণীসমূহকে প্রচার করার তাকিদ দিয়েছেন। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী। তাঁরপর আর কোনো নবী আগমন করবেন না। তাঁর প্রবর্তিত জীবন ব্যবস্থাই কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। আর এই জীবন ব্যবস্থার অন্যতম উৎস হলো তাঁর অমর বাণীসমূহ। তাই এগুলো একে অপরের নিকট পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নেওয়ার জন্যই রাসূলে করীম ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন।

سَبَبُ وُرُوْدِ الْحَدِيْثِ হাদীসের পটভূমি : শায়খ ইবনে হামযা রচিত اَلْبَيَانُ وَالتَّعْرِيْفُ কিতাবে আলোচ্য হাদীসের পটভূমি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, একদা এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর অনুরূপ পোশাক পরিধান করে মদীনার কোনো এক পরিবারে গিয়ে

বলল, নবী করীম ﷺ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তুমি যে কোনো পরিবারের দায়িত্বশীল হতে পার। তখন উক্ত পরিবারের লোকজন তার জন্য একটি ঘর প্রস্তুত করে দেয়। মহানবী ﷺ এ সংবাদ শোনা মাত্র হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত ওমর (রা.)-কে নির্দেশ দিলেন, তোমরা তাকে জীবিত পেলে হত্যা করবে। আর যদি মৃত অবস্থায় পাও, তবে তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করবে। এ সময় হুজুর ﷺ ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, আমার বিশ্বাস তোমরা তাকে মৃত পাবে। অতঃপর তাঁরা তার নিকট এসে দেখলেন রাতে পেশাব করার জন্য ঘর থেকে বের হওয়ার পর তাকে এক বিষাক্ত সাপ দংশন করে মেরে ফেলেছে। তারা এ সংবাদ রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে জানালেন। তখন নবী করীম ﷺ আলোচ্য বক্তব্য প্রদান করেন।

تَعْرِيْفُ الْعِلْمِ وَاَقْسَامُهٗ ইলমের সংজ্ঞা ও তার প্রকারভেদ :

مَعْنَى الْعِلْمِ لُغَةً : اَلْعِلْمُ শব্দটি বাবে سَمِعَ -এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ– اَلْاِدْرَاكُ অনুধাবন করা (২) اَلْفَهْمُ বুঝা (৩) اَلتَّعَقُّلُ হৃদয়ঙ্গম করা। এই শব্দটির ব্যবহার কুরআনেও রয়েছে যেমন–

قَالُوْا لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ .

مَعْنَى الْعِلْمِ اِصْطِلَاحًا : পরিভাষায় عِلْم এর সংজ্ঞা :

১. দার্শনিকদের মতে اَلْعِلْمُ هُوَ حُصُوْلُ صُوْرَةِ الشَّيْءِ فِى الْعَقْلِ অর্থাৎ, আকলের মধ্যে কোনো জিনিসের আকৃতি অর্জিত হওয়াকে عِلْم বলা হয়।

২. কেউ কেউ বলেন– هُوَ قُوَّةٌ وَمَلَكَةٌ فِى النَّفْسِ يَقْتَدِرُ بِهَا النَّاسُ عَلَى التَّمْيِيْزِ بَيْنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ অর্থাৎ, ইলম হচ্ছে আত্মার এমন এক শক্তি ও যোগ্যতার নাম, যার দ্বারা ব্যক্তি কল্যাণ ও অকল্যাণের মাঝে তফাৎ নিরূপণ করতে পারে।

৩. اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْطُ অভিধানে বলা হয়েছে– اَلْعِلْمُ هُوَ اِدْرَاكُ الشَّيْءِ بِحَقِيْقَتِهٖ

৪. আল্লামা আইনী (র.) বলেন– اِنَّهٗ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ النَّفْسِ تُوْجِبُ تَمْيِيْزًا لَا يَحْتَمِلُ النَّقِيْضَ فِى الْاُمُوْرِ الْمَعْنَوِيَّةِ

৫. কেউ কেউ বলেন– اَلْعِلْمُ صِفَةٌ مُوْدَعَةٌ فِى الْقَلْبِ كَالْقُوَّةِ الْبَاصِرَةِ فِى الْعَيْنِ وَالْقُوَّةِ السَّامِعَةِ لِلْاُذُنِ

اَقْسَامُ الْعِلْمِ : ইল্ম দু'প্রকার। যথা–

১. عِلْمُ الدُّنْيَا বা দুনিয়াবী জ্ঞান। যেমন– বাংলা, ইংরেজি, অংক, রসায়ন, পদার্থ ইত্যাদি। এসব জ্ঞান অর্জন করা জায়েজ।

২. عِلْمُ الدِّيْنِ বা দীনি জ্ঞান। যেমন– কুরআন, হাদীস ইত্যাদি। প্রয়োজনানুসারে দীনি ইলম অর্জন করা ওয়াজিব। এটা আবার দু'প্রকার। যথা–

১. عِلْمُ الْمَبَادِئْ যার উপর ইলমে দীন নির্ভরশীল। যেমন– নাহু, সরফ, লোগাত, বালাগাত ইত্যাদি।

২. عِلْمُ الْمَقَاصِدِ একে عُلُوْم شَرْعِيَّة ও বলা হয়।

রাসূল ﷺ বলেছেন, عِلْمُ الدِّيْنِ তিন প্রকার। যথা–

১. عِلْمُ الْاٰيَاتِ وَالْاَحْكَامِ ২. عِلْمُ السُّنَّةِ الْقَائِمَةِ ৩. عِلْمُ الْفَرِيْضَةِ الْعَادِلَةِ

সূফী সাধকদের মতে عِلْم দু' প্রকার। যথা–

১. عِلْمُ الظَّاهِرِ যেমন– কুরআন ও হাদীস।

২. عِلْمُ الْبَاطِنِ একে تَصَوُّفٌ ও مَعْرِفَتٌ বলা হয়। যেমন– কুরআনে এসেছে وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

দার্শনিকদের মতে عِلْم দু' প্রকার : যথা–

১. عِلْم نَظَرِىْ যা চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে অর্জিত হয়। ২. عِلْم ضَرُوْرِىْ যা স্বাভাবিকভাবে অর্জিত হয়।

আর জমুহুরের মতে عِلْم ضَرُوْرِىْ সাতভাগে বিভক্ত। যথা–

১. اَلْبَدِيْهِيَّاتُ যেমন– اَلْكُلُّ اَعْظَمُ مِنَ الْجُزْءِ

২. اَلْحِسِّيَّاتُ (اَلَّذِىْ يَحْصُلُ بِالْحِسِّ) যথা– اَلنَّارُ حَارَّةٌ

৩. اَلْوِجْدَانِيَّاتُ (اَلَّذِىْ يَحْصُلُ بِالْحَوَاسِّ الْبَاطِنَةِ) যথা- اِنَّ لَنَا فَرَحًا وَغَمًّا

৪. اَلْفِطْرِيَّاتُ যেমন- اَلْاَرْبَعَةُ زَوْجٌ وَالْوَاسِطَةُ اِنْقِسَامُهَا بِمُتَسَاوِيَيْنِ

৫. اَلْمُجَرَّبَاتُ যেমন- اَلسَّنَاءُ مُسَهِّلٌ

৬. اَلْحَدَسِيَّاتُ (اَلَّذِىْ يَحْكُمُ بِهَا الْعَقْلُ بِالْحَدَسِ) যেমন- نُوْرُ الْقَمَرِ مُسْتَفَادٌ مِنْ نُوْرِ الشَّمْسِ

৭. اَلْمُتَوَاتِرَاتُ (اَلَّذِىْ يُجْزَمُ بِهَا لِكَثْرَةِ الْمُخْبِرِيْنَ بِهَا) যেমন- মক্কা শরীফ বিদ্যমান।

■ আর সূফীদের নিকট عِلْم দু' প্রকার যথা- ১. عِلْم كَسْبِىْ [অর্জিত জ্ঞান] ২. عِلْم لَدُنِّىْ [খোদা প্রদত্ত জ্ঞান]

عِلْم لَدُنِّىْ আবার দু' ভাগে বিভক্ত, যথা-

১. عِلْمُ الْمُعَامَلَةِ তথা শরিয়তের ব্যবহারিক জ্ঞান।

২. عِلْمُ الْمُكَاشَفَةِ এটা শরিয়তের বিধান পরিপূর্ণভাবে পালনের পর খোদা প্রদত্ত একটি জ্যোতি। যার দ্বারা বিপদ-মুসিবত সহজ করার ক্ষমতা অর্জিত হয়।

"بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ اٰيَةً" এর তাৎপর্য : রাসূল ﷺ-এর বাণী "بَلِّغُوْا عَنِّىْ" তোমরা আমার পক্ষ থেকে পৌছে দাও, প্রচার কর-এর বিশ্লেষণে হাদীসবিশারদগণ দু'টি ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। যেমন-

১. নবী করীম ﷺ-এর হাদীসমূহ হুবহু সনদসহ প্রচার করা। প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত আদালত ও ছেকাহ-এর ভিত্তিতে অন্যের নিকট পৌছে দেওয়া। এ ব্যাপারে শাব্দিকভাবে কোনো পরিবর্তন করা যায় না।

২. হাদীস যেমনিভাবে অন্যের নিকট হতে শ্রবণ করা হয়েছে, তেমনিভাবেই উদ্দেশ্য অবিকৃত রেখে শব্দে শব্দে আদায় করে প্রচার করা।

■ **وَلَوْ اٰيَةً-এর মর্মার্থ :** তাবলীগে দীনের ন্যূনতম সীমারেখা চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে এখানে وَلَوْ اٰيَةً কথাটি বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের হেফাজত করার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ বলে তার হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন। যুগে যুগে কুরআন বিকৃতকারীদের ধারাবাহিকতা চালু রয়েছে বিধায় রাসূলের হাদীসসমূহ রক্ষণা-বেক্ষণও অতীব জরুরি। তাই রাসূলে কারীম ﷺ-এর নিকট হতে প্রাপ্ত একটি বাক্য হলেও তার রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যদের নিকট প্রচারের তাকিদ করা হয়েছে।

اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْحَدِيْثَيْنِ দু'টি হাদীসের মধ্যে বিরোধ : উক্ত হাদীসে রাসূল ﷺ বনী ইরাঈলীদের থেকে জ্ঞানের কথা বর্ণনা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন, অথচ অপর হাদীসে তাদের থেকে বর্ণনা করতে নিষেধ করেছেন। এতে উভয়ের মধ্যে বিরোধ পরিলক্ষিত হয়।

বিরোধের সমাধান :

১. বনী ইসরাঈলের কথা দ্বারা এখানে উপদেশমূলক গল্প কাহিনী, যা ইসলামি শরিয়তের পরিপন্থি নয়, এমন সব ঘটনা বর্ণনা করার কথা বলা হয়েছে।

২. বনী ইসরাঈলদের থেকে পূর্ববর্তী নবীদের যেসব গল্প-কাহিনী কুরআন ও হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যশীল, এমন সব বর্ণনা গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। আর যা কুরআন ও হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয় তা বর্জন করতে বলা হয়েছে।

৩. অথবা, ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুলমানদের ঈমান দুর্বল থাকায় মহানবী ﷺ বনী ইসরাঈলের বর্ণনার প্রতি কর্ণপাত করতে নিষেধ করেছেন। পরবর্তীতে মুসলমানদের ঈমানের প্রবৃদ্ধি ঘটায় বনী ইসরাঈলের বর্ণনাকৃত কিতাব ইত্যাদি অধ্যায়নের অনুমতি দিয়েছেন।

৪. বনী ইসরাঈলের অনেক পণ্ডিতের নিকট রাসূলের আগমনের সত্যতা এবং তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত সম্বলিত অনেক বিধান রক্ষিত ছিল। এসব বিষয় কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিশ্লেষণের জন্য বনী ইসরাঈলীদের বর্ণনা গ্রহণের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। পক্ষান্তরে তাদের নিকট থেকে তাওরাত তথা অন্যান্য বিষয় বর্ণনা করতে নিষেধ করা হয়েছে।

وَعَنْ ١٨٨ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ وَالْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ (رض) قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَدَّثَ عَنِّىْ بِحَدِيْثٍ يُرٰى اَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ اَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৮৮. অনুবাদ : হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব এবং হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রা.) হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন– যে ব্যক্তি আমার পক্ষ হতে হাদীস বর্ণনা করে অথচ সে মনে করে যে, তা মিথ্যা ; তবে সে মিথ্যাবাদীদের অন্যতম ব্যক্তি। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ-এর অর্থ :

১. আবূ নুআঈম اَلْكَاذِبَيْنِ শব্দটি দ্বিবচনের সীগাহ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। ফলে তিনি এর দ্বারা বর্ণনাকারী ও যার কাছ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে তাকে বুঝিয়েছেন।

২. কারো মতে اَلْكَاذِبَيْنِ দ্বিবচন দ্বারা পড়া হলে তবে তার অর্থ হলো, বর্ণনাকারী দু' মিথ্যাবাদীর একজন। আর তারা হলো নবুয়তের মিথ্যা দাবিদার "মুসাইলামাতুল কাযযাব" এবং "আসওয়াদ আনাসী"।

৩. কেউ কেউ اَلْكَاذِبِيْنَ শব্দটি বহুবচনের সীগা রূপে পড়েন। তখন এর অর্থ হবে, সে বর্ণনাকারী মিথ্যাবাদীদের একজন।

وَعَنْ ١٨٩ مُعَاوِيَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ وَاِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَاللّٰهُ يُعْطِىْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৮৯. অনুবাদ : হযরত মু'আবিয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আল্লাহ তা'আলা যার কল্যাণ কামনা করেন, তিনি তাকে দীন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দান করেন। [রাসূল ﷺ বলেন] নিশ্চয়ই আমি জ্ঞান বণ্টনকারী, আর আল্লাহ তা দান করেন। –[বুখারী, মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَنَا قَاسِمٌ-এর অর্থ : আলোচ্য হাদীসে নবী করীম ﷺ এরশাদ করেন اِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَاللّٰهُ يُعْطِىْ-এর অর্থ হলো যাবতীয় জ্ঞান ও হিকমতের মালিক ও স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। আল্লাহ তা'আলা সে ইলম ও হিকমত ওহীর মাধ্যমে নবী করীম ﷺ কে শিক্ষা দেন। আর নবী করীম ﷺ তা জগতবাসীকে শিক্ষা দেন। হুজুর ﷺ জগতবাসীর জন্য এই ইলম ও হিকমত বিতরণ করাকেই اَنَا قَاسِمٌ দ্বারা বুঝিয়েছেন।

وَعَنْ ١٩٠ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلنَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الْاِسْلَامِ اِذَا فَقِهُوْا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৯০. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– সোনারূপার খনিরাজির ন্যায় মানবজাতিও [নানা গোত্রের] খনিরাজি যারা জাহেলী যুগে উত্তম ছিলেন, তারা ইসলামি যুগেও উত্তম, যখন তারা দীনের জ্ঞান লাভ করেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

سَبَبُ تَشْبِيْهِ النَّاسِ بِالْمَعْدَنِ মানুষকে খনির সাথে তুলনার কারণ : আলোচ্য হাদীসে মহানবী ﷺ মানুষকে খনির সাথে তুলনা করেছেন। এর কারণ বর্ণনায় হাদীসবিশারদগণ নিম্নোক্ত যুক্তি তুলে ধরেছেন। যেমন–

১. খনি যেমন বিভিন্ন জাতের এবং বিভিন্ন মানের হয়ে থাকে, মানুষও তেমনি বংশ, শ্রেষ্ঠত্ব এবং গোত্রীয় মর্যাদায় বিভিন্ন মানের হয়ে থাকে।
২. নৈতিক, চারিত্রিক এবং সামাজিক সম্মান মর্যাদার দৃষ্টিকোণ থেকে রাসূল ﷺ মানব জাতিকে খনির সাথে তুলনা করেছেন।
৩. খনিজ সম্পদগুলো যেমন মাটির গর্ভে লুক্কায়িত থাকে, তদ্রূপ মানুষের উত্তম গুণাবলি এবং সুকুমারবৃত্তিগুলোও মাটির তৈরি দেহের মাঝে লুক্কায়িত থাকে।
৪. খনির মধ্যে যেমন বিভিন্ন জাতের ধাতু পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে মানুষের মধ্যেও বিভিন্ন ধরনের গুণাবলি ও যোগ্যতা পাওয়া যায়।

سَبَبُ تَخْصِيْصِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ স্বর্ণ ও রূপাকে নির্দিষ্ট করার কারণ : উপমা হিসেবে স্বর্ণ ও রূপা নির্বাচিত করার বহুবিধ কারণ রয়েছে। যথা–

১. স্বর্ণ ও রূপাকে যেমন আগুনে পুড়িয়ে পাকা করা হয়, অনুরূপভাবে মানুষকেও কঠিন বিপদে ফেলে পরীক্ষা করা হয়।
২. স্বর্ণ ও রূপা নির্মিত অলংকারাদি যেমন মানুষের অঙ্গশোভা বৃদ্ধি করে, তেমনি সমস্ত সৃষ্টির মাঝে মানুষ অলঙ্কার স্বরূপ।
৩. স্বর্ণ ও রূপা যেমন তার খাঁটিত্ব বিচারে মূল্য নির্ধারিত হয়, তেমনি মানুষের ক্ষেত্রে জ্ঞান ও উত্তম গুণাবলির বিচারে তার সম্মান নির্ধারিত হয়।
৪. স্বর্ণ ও রূপা মূল্যবান ধাতু হওয়ায় এগুলোর ওপর যাকাত নির্ধারিত আছে। তেমনি মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত হওয়ায় তার উপর ইবাদত নির্ধারিত হয়েছে।
৫. স্বর্ণ ও রূপাকে যেমন খনিজ ধাতু হতে প্রক্রিয়াজাত করণের মাধ্যমে মাটি ও ময়লার মিশ্রণ হতে উন্নত পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়, তেমনি মানুষকে অজ্ঞতা-বর্বরতা থেকে সুন্দর পরিবেশ এবং সৎ গুণাবলির সংস্রব দিয়ে সভ্যতায় নিয়ে আসা যায়।
৬. খনিজ পদার্থের মধ্যে স্বর্ণ ও রূপা সবচেয়ে সুন্দর, তেমনি আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে সৃষ্টি করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন– لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْٓ اَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ ۔
উপরোক্ত কারণেই উপমা হিসেবে সোনা ও রূপাকে নির্বাচিত করা হয়েছে।

خِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ -এর ব্যাখ্যা : রাসূল ﷺ-এর বাণী– "خِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الْاِسْلَامِ"-এর অর্থ হচ্ছে– "জাহেলি যুগে যারা সৎ গুণাবলির অধিকারী ও সর্বোত্তম মানুষ ছিল, ইসলামি যুগে এসেও তারাই সৎ গুণাবলির অধিকারী ও সর্বোত্তম"-এর তাৎপর্য সম্পর্কে আলেমগণ নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

১. জাহেলিয়া যুগে বাস করেও যারা সাহসিকতা ও বীরত্বের মত গুণাবলিসম্পন্ন লোক ছিলেন, তারা ইসলামে প্রবেশ করার পরও তেমনি গুণাবলিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসেবে নিজেদেরকে পরিচালিত করেছেন।
২. আবার যারা দানশীল, পরোপকারী, অতিথিপরায়ণ ছিলেন, তারা ইসলাম গ্রহণের পরেও তারা তাদের সে গুণাবলি অটুট রেখেছিলেন।
৩. কোনো কোনো মুহাদ্দিস বলেন– হযরত ওমর, আবূ বকর, উসমান, খালিদ (রা.) প্রমুখ সাহাবী জাহেলিয়াতের তমসাচ্ছন্ন যুগেও যে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসীন ছিলেন, তেমনি ইসলাম গ্রহণের পরও শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাদের প্রতি লক্ষ্য করেই রাসূল ﷺ এ উক্তি করেছেন।

---

১৯১ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا حَسَدَ اِلَّا فِیْ اِثْنَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَسَلَّطَهٗ عَلٰى هَلَكَتِهٖ فِى الْحَقِّ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِیْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৯১. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– দু' ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাউকে ঈর্ষা করা যায় না। প্রথমত এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা অর্থ–সম্পদ দান করেছেন এবং তা সৎকার্যে ব্যয় করার জন্য তাকে [মনোবল] ক্ষমতা দান করেছেন। দ্বিতীয়তঃ এমন এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা [প্রচুর] জ্ঞান দান করেছেন। সে তা দ্বারা সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে এবং লোকদেরকে শিক্ষা দেয়। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حَسَدٌ -এর অর্থ ও তার হুকুম : اَلْحَسَدُ শব্দটি বাবে ضَرَبَ -এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ হলো– হিংসা, বিদ্বেষ, ঈর্ষাপোষণ, পরশ্রীকাতরতা।

حَسَدٌ : مَعْنَى الْحَسَدِ اِصْطِلَاحًا -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা :

পরিভাষায় حسد বলা হয় অপরের সুখ সম্পদ দেখে রোষে জ্বলে মরা এবং ঐ সুখ-সম্পদের ধ্বংস কামনা করা। নিজের জন্য ঐ সুখ আসুক বা না আসুক।

▌কেউ কেউ বলেন, অপরের সম্পদ, যোগ্যতা-বিজ্ঞতা বিনষ্ট হয়ে নিজের নিকট আসার কামনা করাকে حَسَدٌ বলা হয়।

▌ অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনের মতে–

تَمَنِّيْ زَوَالِ نِعْمَةِ اَحَدٍ وَالْمُرَادُ هٰهُنَا الْغِبْطَةُ وَهِيَ تَمَنِّيْ حُصُوْلِ مِثْلِهَا لَهُ، وَاُطْلِقَ الْحَسَدُ عَلَيْهَا مَجَازًا .

অর্থাৎ, অপরের নেয়ামত ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কামনা করা। তবে আলোচ্য হাদীসে حَسَد দ্বারা غِبْطَة উদ্দেশ্যে, আর গিবতা হলো– অপরের নেয়ামতের অনুরূপ নেয়ামত পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা।

حُكْمُ الْحَسَدِ :-এর বিধান : ইসলামি শরিয়তে হাসাদ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। কেননা, হাসাদ বা ঈর্ষা মানুষের নেক আমল নষ্ট করে ফেলে।

হাদীসে এসেছে– "اَلْحَسَدُ تَاْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا يَاْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ"

তবে হাসাদ দ্বারা যদি غِبْطَة উদ্দেশ্য হয়, তবে তা নিষিদ্ধ নয়। আলোচ্য হাদীস তারই প্রমাণ বহন করছে।

مَعْنَى الْحِكْمَةِ- হিকমতের অর্থ :

حِكْمَة -এর শাব্দিক অর্থ হলো : (১) জ্ঞান, (২) রহস্য (৩) নিপুণতা (৪) বিজ্ঞতা (৫) প্রজ্ঞা (৬) বুদ্ধি (৭) বিচার ইত্যাদি। যেমন, কুরআনে এসেছে– وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ

▌পরিভাষায় حِكْمَة শব্দটি বেশ কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

১. হিক্মত হলো– ইলমে ওহী।

২. কোনো বিষয়ের তাত্ত্বিক জ্ঞান ও মীমাংসাকে হিকমত বলা হয়।

৩. মূলত দীনি জ্ঞানই হলো– প্রকৃত হিক্মত। কেননা, কুরআন মজিদের বিভিন্ন স্থানে এ শব্দটি ব্যবহার করে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে দীনি জ্ঞান অর্জনের প্রতি বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেছেন।

৪. প্রতিপক্ষের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য কলা-কৌশল শিক্ষা করাও হিকমত। কুরআন শরীফে এসেছে–

"اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ"

لَا حَسَدَ اِلَّا فِيْ اِثْنَيْنِ-এর মর্মার্থ : আলোচ্য হাদীসে মহানবী ﷺ-এর বাণী لَا حَسَدَ اِلَّا فِيْ اِثْنَيْنِ তথা দু' ব্যক্তি ব্যতীত কারো প্রতি হিংসাপোষণ বৈধ নয়, তাতে দু'শ্রেণীর ব্যক্তির প্রতি হিংসার বৈধতা প্রমাণিত হয়। অথচ ইসলামে তা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তাই হাদীসে বর্ণিত اَلْحَسَدُ শব্দের বিশ্লেষণে নিম্নোক্ত মতামত বর্ণনা করা হয়।

اَلْمُرَادُ هٰهُنَا الْغِبْطَةُ وَهِيَ تَمَنِّيْ حُصُوْلِ مِثْلِهَا لَهُ مِنْ غَيْرِ زَوَالٍ مِنْهُ

অর্থাৎ, এখানে حَسَد দ্বারা غِبْطَة উদ্দেশ্য। غِبْطَة বলা হয় অপরের নেয়ামতের অনুরূপ নেয়ামত পাওয়ার আশা পোষণ করা; তার থেকে রহিত হয়ে যাওয়ার কামনা ব্যতীত।

▌অথবা এর মর্মার্থ হলো– হিংসা করা নাজায়েজ। যদি জায়েজ হতো তবে এ দুই ক্ষেত্রে জায়েজ হতো। যেমন– মিরকাত প্রণেতা বলেন– مَعْنَاهُ لَوْ جَازَ الْحَسَدُ مَا جَازَ اِلَّا فِي الصُّوْرَتَيْنِ الْمَذْكُوْرَتَيْنِ

▌কেউ বলেন যে, যেহেতু উল্লিখিত দু' প্রকারের حَسَد -এর মাধ্যমে কল্যাণ লাভ হয়, তাই তা বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

وَعَنْ ١٩٢ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلٰثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهٖ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهٗ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৯২. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— যখন মানুষ মরে যায় তখন তার আমল [ও ছওয়াবের ধারা] বন্ধ হয়ে যায়; কিন্তু তিন ধরনের আমলের ছওয়াব সর্বদা অব্যাহত থাকে। যথা– ১. সদকায়ে জারিয়া, ২. এমন ইলম বা জ্ঞান, যার দ্বারা মানুষের কল্যাণ সাধিত হয়, ৩. সুসন্তান, যে তার জন্য [তার মৃত্যুর পর] দোয়া করে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَعْنَى الصَّدَقَةِ الْجَارِيَةِ সদকায়ে জারিয়া-এর অর্থ :

مَعْنَى الصَّدَقَةِ الْجَارِيَةِ لُغَةً : صَدَقَة শব্দটি একবচন, বহুবচনে صَدَقَاتٌ শাব্দিক অর্থ– দান। আর جَارِيَة শব্দটি فَاعِلَة-এর ওযনে جَرْيٌ ধাতু থেকে উদ্ভূত। অর্থ– প্রবহমান। সুতরাং اَلصَّدَقَةُ الْجَارِيَةُ দু'টি শব্দের সমন্বিত রূপের অর্থ হচ্ছে– প্রবহমান দান, যে দানের ছওয়াব অব্যাহত থাকে।

مَعْنَى الصَّدَقَةِ اِصْطِلَاحًا : اَلْقَامُوْسُ الْفِقْهِىْ গ্রন্থকার বলেন– مَا يُعْطٰى عَلٰى وَجْهِ الْقُرْبَةِ لِلّٰهِ تَعَالٰى অর্থাৎ, আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের নিমিত্তে যে দান করা হয় তাকে সদকা বলা হয়। ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফেঈ, মালিক ও আহমদ (র.) বলেন— هِىَ الْعَطِيَّةُ الَّتِىْ تُبْتَغٰى بِهَا الْمَثُوْبَةُ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى অর্থাৎ, এটি এমন দান, যার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট থেকে পুণ্য কামনা করা হয়।

أَقْسَامُ الصَّدَقَةِ সদকা দু' প্রকার :

১. **সাধারণ দান :** যে দানের মূল ছওয়াব সংরক্ষিত থাকে বটে, কিন্তু ছওয়াব অব্যাহতভাবে চলতে থাকে না, তাকেই সাধারণ দান বলা হয়। যেমন– অভুক্তকে এক বেলা খাবার দান করা।

২. **জারিয়া :** অর্থাৎ, যে দানের ছওয়াব অব্যাহতভাবে চলতে থাকে তাকে সদকায়ে জারিয়া সদকা বলা হয়। যেমন— রাস্তাঘাট, পুল, মসজিদ, মাদ্রাসা ইত্যাদি জনকল্যাণকর কাজ। এগুলো যতদিন স্থায়ী হবে ততদিন কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তি ছওয়াব পেতে থাকবে।

عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهٖ দ্বারা উদ্দেশ্য : মহানবী ﷺ বলেছেন, মানুষ যখন মরে যায়, তখন তার আমলের প্রতিদানের ধারাসমূহ বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তিনটি আমলের প্রতিদান-ধারা কখনো বন্ধ হয় না। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, "عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهٖ" অর্থাৎ, এমন জ্ঞান, যার দ্বারা উপকার লাভ করা যায় তথা সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধিত হয়। যেমন–

কোনো দীনি কিতাব রচনা করা, যা পাঠ করলে মানুষ হিদায়েত লাভ করে উপকৃত হয়।

অথবা, কোনো দীনি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে সাধারণ মানুষ দীনের ইলম শিখে অজ্ঞতার অন্ধকার হতে মুক্তি লাভ করতে পারে।

অথবা, কেউ তার ছাত্রদের উত্তমভাবে ইলম শিক্ষা দেবে। তারা ইলম অর্জন করে অন্যদেরকে ইলম শিক্ষা দিবে। এমনিভাবে তার মৃত্যুর পরও চলমান থাকবে।

أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوْ لَهٗ-এর দ্বারা উদ্দেশ্য : নেককার সন্তান তার পিতামাতার জন্য দোয়া করে– এ কথা দু'টি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। যথা—

১. সুসন্তান তার পিতামাতার জন্য দোয়া করবে। এ উক্তি এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করে যে, পিতামাতা তাদের সন্তানকে সৎকর্মশীল, খাঁটি দীনদার এবং শরিয়তের অনুসারী করে গড়ে তুলবে, যাতে তারা তাদের পিতামাতার জন্য দোয়া করবে।

২. উক্ত উক্তি এ কথার প্রতিও নির্দেশ করে যে, পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য তাঁদের মৃত্যুর সাথে সাথে শেষ হয়ে যায় না; বরং তাদের মৃত্যুর পর তাদের জন্য দোয়া করবে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا ـ

এ কর্তব্য পালন করে সে নিজেকে সুসন্তানরূপে প্রমাণ করতে পারে।

وَعَنْ ١٩٣ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلٰى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ فِىْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِىْ عَوْنِ اَخِيْهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَّلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ بِهِ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِىْ بَيْتٍ مِّنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلٰئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৯৩. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন— যে ব্যক্তি কোনো মু'মিনের পার্থিব একটি ক্ষুদ্র কষ্ট দূর করে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার একটি বিরাট কষ্ট দূর করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোনো অভাবগ্রস্ত লোকের একটি অভাব [সাহায্যের দ্বারা] সহজ করে দেয়, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার যাবতীয় অভাব সহজ করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবেন। আর বান্দা যে পর্যন্ত তার ভাইয়ের সাহায্য করতে থাকে, সে পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলাও তার সাহায্য করেন। আর যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের জন্য কোনো পথে চলতে থাকে, আল্লাহ তা'আলা তার জান্নাত লাভের পথ সুগম করে দেন এবং যখনই কোনো একটি সম্প্রদায় আল্লাহর ঘরসমূহের কোনো একটি ঘরে সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন করে এবং তার মর্ম উদঘাটনে পরস্পর আলোচনা করে, তখন তাদের উপর স্বস্তি ও প্রশান্তি অবতীর্ণ হতে থাকে। রহমত তাদেরকে বেষ্টন করে রাখে, ফেরেশতাগণ রহমতের চাদর দিয়ে তাদেরকে ঘিরে রাখেন এবং আল্লাহ তা'আলা সে সমস্ত লোকদের প্রসঙ্গে তাঁর দরবারে উপস্থিত ফেরেশতাদের নিকট আলোচনা করেন। আর যার আমল তাকে পিছিয়ে দেয়, তার বংশ মর্যাদা তাকে এগিয়ে দিতে পারে না। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

■ **مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا الخ-এর মর্মার্থ :** রাসূল ﷺ বলেছেন— "مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ" অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি যদি অপর মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। হাদীসবিশারদগণ উল্লিখিত উক্তিটির দু'টি অর্থ নির্ণয় করেছেন। যেমন—

১. سَتَرَ শব্দটির অর্থ হচ্ছে– গোপন করা। সুতরাং উক্তিটির অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ গোপন রাখে, আল্লাহ তার দোষ গোপন রাখবেন। তবে সমাজকে কলুষমুক্ত করার জন্য এবং বিচারের সঠিক রায় আসার জন্য কোনো অবস্থাতেই দোষকে গোপন রাখা যাবে না।

২. অথবা, سَتَرَ শব্দটির অর্থ হচ্ছে– ঢেকে দেওয়া। সুতরাং উক্তিটির অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের শরীর বিবস্ত্র অবস্থায় বস্ত্র দিয়ে ঢেকে দেয়, আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রতিদানস্বরূপ পরকালে বেহেশতী বস্ত্র দিয়ে ঢেকে দেবেন। অর্থাৎ, আল্লাহ তাকে পরকালে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন।

■ **يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا-এর মধ্যস্থিত عِلْم-এর মর্মার্থ :** হাদীসে উল্লিখিত عِلْم [ইলম] দ্বারা সকল দীনী ইলম উদ্দেশ্য।

চাই তা স্বল্প কিংবা অধিক পরিমাণ হোক, যখন তা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করা, নিজে উপকৃত হওয়া এবং অন্যের উপকার সাধন করার উদ্দেশ্যে অর্জিত হয়। যেহেতু এ শব্দটি এখানে نَكِرَة হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে এটা عُمُوْم -এর ফায়দা দিয়েছে। আর এর মাধ্যমে ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে সফর করাও মোস্তাহাব প্রমাণিত হয়েছে। যেমন– হযরত মূসা (আ.) হযরত খিজির (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার পর বলেছিলেন– আমি কি এই উদ্দেশ্যে আপনার সহযাত্রী হতে পারব যে, আপনি আমাকে সে সকল বিষয় শিক্ষা দান করবেন, যা আপনি হিদায়েত প্রসঙ্গে অবগত হয়েছেন? আর যেমন ইবনে মালেক বর্ণনা করেছেন যে, হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) একটি হাদীস সংগ্রহ করার জন্য এক মাসের পথের দূরত্বে আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস (রা.)-এর নিকট সফর করেছেন।

مَا الْعِلْمُ الْمَفْرُوْضُ طَلَبُهُ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ প্রত্যেক মুসলমানের উপর কোন ইলম অর্জন করা ফরজ : দীনের উপর আমল করতে গেলে ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, মোস্তাহাব, মুবাহ, হারাম, মাকরূহ ইত্যাদি আহকাম সম্পর্কে পরিচিতি লাভের জন্য যে পরিমাণ ইলম অত্যাবশ্যকীয়, সে পরিমাণ ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুলমান নর-নারীর উপর ফরজ তথা অপরিহার্য কর্তব্য।

سَكِيْنَة-এর অর্থ : আভিধানে سَكِيْنَة শব্দের অর্থ– আত্মিক প্রশান্তি, সম্মান ও মর্যাদার চাদর ইত্যাদি।

سَكِيْنَة-এর পারিভাষিক অর্থ : ১. سَكِيْنَة-এর পারিভাষিক অর্থ হলো, অন্তরের মধ্যে জাগ্রত এমন এক খোদায়ী নূর বা জ্যোতি, যার ফলে কুরআন অধ্যয়নের দরুন অন্তঃকরণ হতে পাশবিক প্রবৃত্তি দূরীভূত হয়ে সে স্থলে আল্লাহর নূর ও জ্যোতি উদ্ভাসিত হয়ে উঠে।

২. তাফসীরবিদ সুদ্দীর মতে, যে অবস্থায় মানুষের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে, সে অবস্থাকেই سَكِيْنَة বলা হয়।

৩. আল্লামা ত্বীবী (র.) বলেন, অন্তর থেকে পাশবিক প্রবৃত্তি দূরীভূত হয়ে তা আল্লাহর নূরে আলোকিত হওয়াকে سَكِيْنَة বলে।

৪. কিছু সংখ্যকের মতে سَكِيْنَة হলো এক ধরনের ফেরেশতা, যারা মু'মিন লোকের কলবকে শান্তি দান করে এবং তাদেরকে নিরাপদ রাখে।

يَتَدَارَسُوْنَ بَيْنَهُمْ দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লাহর ঘর বলতে মসজিদ, মাদ্রাসা বা এ জাতীয় কোনো দীনি প্রতিষ্ঠান হতে পারে, যেখানে বসে তারা পবিত্র কুরআন সম্পর্কে জ্ঞান চর্চা বা অনুশীলন করে তার নিগূঢ় তত্ত্ব উদঘাটনের জন্য পরস্পর আলাপ-আলোচনা করতে থাকে, তখনই তাদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হতে থাকে। উপরোক্ত বাক্যটি দ্বারা পবিত্র কুরআনের ফজিলত ও মাহাত্ম্য বুঝানো হয়েছে। পবিত্র কুরআন অধ্যয়নে আল্লাহর তরফ থেকে প্রশান্তি ও রহমত অবতীর্ণ হয়।

وَصْفُ الْمَلَائِكَةِ وَذِكْرُ اَعْمَالِهِمْ ফেরেশতাদের বিবরণ ও তাঁদের কার্যাবলি : উক্ত হাদীসে বলা হয়েছে حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ অর্থাৎ, ফেরেশতাগণ তাদেরকে ঘিরে রাখে। এর মধ্যে উল্লিখিত مَلَائِكَة শব্দের দ্বারা مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ তথা রহমত ও বরকতের ফেরেশতাগণ উদ্দেশ্য, যারা আল্লাহ তা'আলার জিকির বা দীনি আলোচনায় লিপ্ত ব্যক্তিগণের চতুষ্পার্শ্বে পরিবেষ্টন করে থাকে, অথবা তাদের নিকট আনাগোনা করে এবং তাদের চতুষ্পার্শ্বে ঘুরাফেরা করে। পৃথিবী হতে আসমান পর্যন্ত রহমতের ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধ হয়ে থাকে। তাদের কুরআন তেলাওয়াত ও কুরআনের বিষয়ের আলোচনা শ্রবণ করে, তাদেরকে বালা-মসিবত হতে হেফাজত করে এবং অদৃশ্যভাবে তাদের সাথে করমর্দন করে এবং তাদের প্রার্থনায় শরিক হয়ে আমীন আমীন বলে।

"তার বংশ মর্যাদা তাকে এগিয়ে দিতে পারে না" এর মর্মার্থ : এই বাক্যের তাৎপর্য হলো, বংশ মর্যাদা দ্বারা কেউই আল্লাহর নৈকট্য ও সান্নিধ্য হাসিল করতে পারে না; বরং একমাত্র নেক আমল দ্বারাই তা হাসিল করা সম্ভব। আল্লাহর ঘোষণা : اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ অর্থ– আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা বেশি সম্মানিত, যে ব্যক্তি অত্যধিক পরহেজগার ও খোদাভীরু। এ ক্ষেত্রে আভিজাত্যের কোনো স্থান নেই। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অধিকাংশ সালফে সালেহীন, বুজুর্গানে দীন ছিলেন সাধারণ পরিবারের লোক। এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁরা ছিলেন সমস্ত উম্মতের নেতা ও সরদার।

وَعَنْهُ ١٩٤ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَوَّلَ النَّاسِ يُقْضٰى عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ رَجُلٌ اُسْتُشْهِدَ فَاُتِىَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ نِعْمَتَهٗ فَعَرَفَهَا فَقَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيْكَ حَتّٰى اُسْتُشْهِدْتُّ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِاَنْ يُّقَالَ جَرِئٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى اُلْقِىَ فِى النَّارِ وَ رَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهٗ وَقَرَأَ الْقُرْاٰنَ فَاُتِىَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ نِعَمَهٗ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهٗ وَقَرَأْتُ فِيْكَ الْقُرْاٰنَ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ اِنَّكَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى اُلْقِىَ فِى النَّارِ وَ رَجُلٌ وَسَّعَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ اَعْطَاهُ مِنْ اَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهٖ فَاُتِىَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ نِعَمَهٗ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيْلٍ تُحِبُّ اَنْ يُّنْفَقَ فِيْهَا اِلَّا اَنْفَقْتُ فِيْهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ ثُمَّ اُلْقِىَ فِى النَّارِ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৯৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে ব্যক্তির বিচার করা হবে সে হবে একজন শহীদ [ধর্ম যুদ্ধে প্রাণদানকারী]। তাকে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে আনয়ন করা হবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে [প্রথমে দুনিয়াতে প্রদত্ত] নিয়ামতসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন; আর সেও তা চিনতে পারবে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি এসব নিয়ামতের বিনিময়ে দুনিয়াতে কি আমল করেছ ? জবাবে সে বলবে, আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য [কাফিরদের সাথে] লড়াই করেছি। এমনকি শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছি। তখন আল্লাহ্ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ; বরং তুমি লড়াই করেছ এজন্য যে, তোমাকে বীর বলা হবে। আর তোমাকে তা বলাও হয়েছে। এরপর তার ব্যাপারে [ফেরিশতাদেরকে] আদেশ করা হবে। অতঃপর তাকে উপুড় করে টানতে টানতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর এমন ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে যে নিজে দীনি ইলম শিক্ষা করেছে এবং অপরকে তা শিক্ষা দিয়েছে এবং কুরআন শরীফ পড়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেবেন, সেও তা স্মরণ করবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জিজ্ঞেস করবেন যে, এসব নিয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপনের জন্য তুমি কি আমল করেছ ? উত্তরে সে বলবে, আমি ইলম শিক্ষা করেছি এবং অপরকেও শিক্ষা দান করেছি। আর তোমার সন্তুষ্টির জন্য কুরআন মাজীদ অধ্যয়ন করেছি। মহান আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমি এ জন্য ইলম অর্জন করেছ যে, যাতে তোমাকে আলিম বলা হয় এবং এজন্য কুরআন অধ্যায়ন করেছ যাতে তোমাকে কারী বলা হয়। আর তা [তোমার ইচ্ছানুযায়ী আলেম বা কারী] তোমাকে বলাও হয়েছে। অতঃপর তার সম্পর্কে [ফেরেশতাদেরকে] আদেশ করা হবে। ফলে তাকে উপুড় করে টানতে টানতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এরপর এমন ব্যক্তির বিচার শুরু হবে যাকে আল্লাহ তা'আলা প্রচুর অর্থ-সম্পদ প্রদান করে বিত্তবান বানিয়েছেন। তাকে আল্লাহ্ তা'আলা বিভিন্ন প্রকারের সম্পদ প্রদান করেছেন। অতঃপর তাকে আনয়ন করা হবে। প্রথমে আল্লাহ্ তাকে তার প্রতি কৃত নিয়ামত স্মরণ করিয়ে দেবেন। সেও তা স্বীকার করে নেবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জিজ্ঞেস করবেন যে, এ সমস্ত নেয়ামতের কৃতজ্ঞতায় তুমি কি আমল করেছ? উত্তরে সে বলবে, যেসব ক্ষেত্রে ধন-সম্পদ ব্যয় করা তুমি পছন্দ কর তার একটি পথও আমি হাতছাড়া করিনি। তোমার সন্তুষ্টির জন্য আমি সবটাতেই ধন-সম্পদ ব্যয় করেছি। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ; বরং তুমি এজন্য দান করেছিলে যে, তোমাকে দানবীর বলা হবে। আর দুনিয়াতে তা বলাও হয়েছে। অতঃপর [তার সম্পর্কে] ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হবে। নির্দেশানুযায়ী তাকে উপুড় করে টানা হবে, অবশেষে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। -[মুসলিম]

وَعَنْ ١٩٥ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لَايَقْبِضُ الْعِلْمَ اِنْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلٰكِنْ يَّقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتّٰى اِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمًا اِتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوْا فَافْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوْا وَاَضَلُّوْا ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৯৫. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— [শেষ জমানায়] আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের অন্তর হতে ইলম টেনে বের করে উঠিয়ে নেবেন না; বরং আলিমদের উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমেই ইলম উঠিয়ে নেবেন। এমনকি যখন দুনিয়ায় আর কোনো আলিম অবশিষ্ট থাকবে না; তখন লোকজন মূর্খলোকদেরকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করবে। অতঃপর তাদের নিকট বিভিন্ন মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হলে তারা ইলম ব্যতীতই ফতোয়া প্রদান করবে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে।–[বুখারী-মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে মহানবী ﷺ কিয়ামতের পূর্বাবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আর এখানে 'ইল্ম' দ্বারা 'ইলমে ওহীকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কুরআন ও সুন্নাহ্ ভিত্তিক জ্ঞান দুনিয়া হতে ক্রমান্বয়ে ধীরে ধীরে তুলে নেবেন। আর তার পদ্ধতি এরূপে হবে যে, তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাগণকে মৃত্যু দেবেন। এভাবে নিতে নিতে দীনি ইল্ম অভিজ্ঞ আলেমশূন্য এক গোম্‌রাহীর যুগ এসে পড়বে, তখন পাপাচারে গোটা পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে। তখন চরিত্রহীন– নির্বোধ লোকেরা সমাজের নেতৃত্ব দেবে। পথভ্রষ্ট তথাকথিত নেতাগণ জনগণকে গোম্‌রাহীর পথে পরিচলিত করবে। ওলামা সমাজ তখন তাদের দৃষ্টিতে পরগাছা বা নিকৃষ্ট জীবে পরিণত হবে। তাদেরকে সমাজের বোঝা মনে করা হবে। সে সমস্ত চরিত্রহীন নেতাগণ পাপে লিপ্ত হওয়াকে বীরত্ব এবং অন্যায়-অবিচার করাকে প্রভুত্ব মনে করবে। লোকেরা তাদের আত্মীক, সামাজিক ও ধর্মীয় মোটকথা সর্ব প্রকারের সমস্যার সমাধান তাদের নিকট হতে চাইতে থাকবে। সুতরাং এর পরিণতি যে কি হবে তা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না। বর্তমান সামাজিক অবস্থাও পরিবেশের প্রতি গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করলে অনুমিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হতে চলেছে।

وَعَنْ ١٩٦ شَقِيْقٍ (رحـ) قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ (رضـ) يُذَكِّرُ النَّاسَ فِىْ كُلِّ خَمِيْسٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَااَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لَوَدِدْتُ اَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا فِىْ كُلِّ يَوْمٍ قَالَ اَمَا اِنَّهُ يَمْنَعُنِىْ مِنْ ذٰلِكَ اَنِّىْ اَكْرَهُ اَنْ اُمِلَّكُمْ وَاِنِّىْ اَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৯৬. অনুবাদ : তাবেয়ী হযরত শাকীক (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) প্রতি বৃহস্পতিবার লোকদেরকে উপদেশ প্রদান করতেন। একদা এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, হে আবূ আব্দুর রহমান, আমি চাই যে, আপনি প্রত্যহ আমাদেরকে এরূপ নসিহত করুন। তখন তিনি বললেন, আমাকে এরূপ করতে এটাই বাধা প্রদান করে যে, আমি তোমাদেরকে বিরক্ত করতে পছন্দ করি না। তাই আমি তোমাদেরকে মাঝে মাঝে নসিহত করে থাকি। যেমনিভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বিরক্তির আশঙ্কায় মাঝে মাঝে ওয়াজ নসিহত করতেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : বক্তা বা শিক্ষকদের কি আদর্শ হওয়া উচিত আলোচ্য হাদীসে তা-ই আলোচিত হয়েছে। শ্রোতাদের মানসিক প্রস্তুতির ব্যাপারে মহানবী ﷺ কতটুকু সতর্ক ছিলেন, এ বিষয়ে তাঁর কি অভ্যাস ছিল, এ হাদীসে তা প্রস্ফুটিত হয়েছে। নবী করীম ﷺ-এর মুখের বাণী প্রাঞ্জল, হৃদয়স্পর্শী ও আকর্ষণীয় ছিল এবং তা শ্রোতাগণ তন্ময় হয়ে শুনতে থাকতেন। তাঁর অমীয়বাণী শ্রোতাদেরকে ইন্দ্রজালের মতো বেষ্টন করত। তারা পার্থিব সবকিছু ভুলে তাঁর ওয়াজ-নসিহত শুনতে থাকতেন। তবু রাসূলুল্লাহ ﷺ মজলিসে আগমনকারীদের মানসিক অবস্থার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন, শ্রোতাদের বিরক্তির উদ্রেক হতে পারে– তাঁর বক্তব্য এমন দীর্ঘায়িত করতেন না। এ আশংকায় যে, শ্রোতাগণ যদি অমনোযোগী হয়ে পড়ে, কিংবা ভক্তিভরে বক্তার কথা শ্রবণ না করে, আর এ কারণে তাঁর একটি কথাও বাদ পড়ে যায়, তাহলে বিশ্ববাসী তাঁর মুখনিঃসৃত একটি অমূল্য রত্ন হতে বঞ্চিত হয়ে যাবে। অনেক মূল্যবান জ্ঞান-গুচ্ছ বিফলে যাবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) রাসূলে কারীম ﷺ-এর আদর্শ অনুযায়ী প্রতিদিন কিংবা একই দিন বারবার জনগণকে উপদেশ প্রদান করতেন না।

---

١٩٧ وَعَنْ أَنَسٍ (رضـ) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ اَعَادَهَا ثَلٰثًا حَتّٰى تُفْهَمَ عَنْهُ وَاِذَا اَتٰى عَلٰى قَوْمٍ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلٰثًا ـ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৯৭. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অভ্যাস ছিল, যখন তিনি কথা বলতেন, তা তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন। যাতে তাঁর কথা [ভালোরূপে] বুঝে নেওয়া যায়। আর যখন কোনো সম্প্রদায়ের নিকট গমন করতেন তখন তাদের প্রতি তিনবার সালাম প্রদান করতেন। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

سَبَبُ إِعَادَةِ الْكَلَامِ ثَلَاثًا কথা তিনবার পুনরাবৃত্তি করার কারণ : এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, মেধা ও স্মরণ শক্তির দিক দিয়ে মানুষ সাধারণত তিন শ্রেণীর হয়ে থাকে। যথা– ذَكِيٌّ [তীক্ষ্ণ মেধা সম্পন্ন], اَوْسَطُ [মধ্যম], غَبِيٌّ [বোকা] অর্থাৎ তীক্ষ্ণ মেধাবী, মধ্যম মেধাবী এবং নির্বোধ। রাসূলে কারীম ﷺ কোনো গুরুত্বপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ব বক্তব্য রাখলে তীক্ষ্ণ মেধা সম্পন্ন লোকেরা প্রথম বারেই বুঝে ফেলতেন। অতঃপর দ্বিতীয়বার বললে মধ্যম মেধা সম্পন্ন লোকেরা বুঝতেন। আর তৃতীয়বার বললে স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা বুঝে নিতেন। সর্ব শ্রেণীর মানুষ যাতে তাঁর বাণীর মর্ম অনুধাবন করতে পারে, এজন্য তিনি তাঁর কথা বা বক্তব্য তিনবার বলতেন।

سَبَبُ تَكْرَارِ السَّلَامِ ثَلَاثًا তিনবার সালামকে পুনরাবৃত্তি করার কারণ : অন্যান্য বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, নবী করীম ﷺ সাধারণত একবারই সালাম প্রদান করতেন, আর কোনো সম্প্রদায় বা সমাবেশে একবার সালাম দেওয়াই যথেষ্ট। অথচ রাসূল ﷺ তিনবার সালাম করতেন। এ তিন বার সালাম করার হেকমতসমূহ নিম্নরূপ—

ক. রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের নিকট যেতেন, প্রথমে সামনের দিকে সালাম দিতেন, দ্বিতীয়বার ডানদিকে এবং তৃতীয়বার বামদিকে সালাম দিতেন। লোকেরা নবী কারীম ﷺ-এর সালামকে খুব বরকতময় ও দোয়া মনে করত। কাজেই তাঁর সালাম শোনা হতে কেউ যেন বঞ্চিত না হয় এবং সকলেই যেন শুনতে পায়, এজন্য তিনি তিনবার সালাম দিতেন।

খ. অথবা, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনও কোনো বাড়িতে গেলে প্রথমত একটি সালাম দিতেন, তাতে কোনো উত্তর না আসলে দ্বিতীয় সালাম দিতেন, তাতেও কোনো উত্তর না আসলে তৃতীয় সালাম দিয়ে ফিরে আসতেন।

গ. অথবা, প্রথম সালাম অনুমতি লাভের জন্য, দ্বিতীয় সালাম মজলিসে প্রবেশের সময় দিতেন এবং তৃতীয় সালাম বিদায়ের প্রাক্কালে দিতেন।

ঘ. অথবা, মজলিস খুব বড় হলে প্রথমে মজলিসে পৌঁছে তিনি সালাম দিতেন, মাঝখানে পৌঁছে আবার সালাম দিতেন, অতঃপর মজলিসের সদর অঙ্গনে পৌঁছে জনতার উদ্দেশ্যে পুনরায় সালাম করতেন। ফলে তিনবার সালাম করা হতো।

৬. তবে ওলামায়ে কেরামের নিকট গ্রহণযোগ্য মত হলো, রাসূলে কারীম ﷺ প্রথমবার সালাম দ্বারা অনুমতি নিতেন, দ্বিতীয় সালাম সাক্ষাতের সময় দিতেন, আর তৃতীয় সালাম বিদায়ের সময় দিতেন। এ পদ্ধতি সকলের জন্যই সুন্নত। কেননা, অনেক বর্ণনায় كان শব্দটি দ্বারা মহানবী ﷺ-এর চিরাচরিত নিয়মকে বুঝানো হয়।

وَعَنْ ١٩٨ أَبِيْ مَسْعُوْدِ الْأَنْصَارِيِّ (رض) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّهُ أُبْدِعَ بِيْ فَاحْمِلْنِيْ فَقَالَ مَا عِنْدِيْ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَنَا أَدُلُّهُ عَلٰى مَنْ يَّحْمِلُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ دَلَّ عَلٰى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৯৮. অনুবাদ : হযরত আবূ মাসঊদ আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর খেদমতে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমার বাহন অচল হয়ে পড়েছে, আমাকে একটি বাহনের ব্যবস্থা করে দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমার নিকট তো কোনো বাহন নেই। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমি তাকে এমন এক ব্যক্তির সন্ধান দিতে পারি, যে তাকে বাহনের ব্যবস্থা করে দেবে। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি কোনো সৎ কর্মের পথ প্রদর্শন করে তার জন্য উক্ত কর্ম সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ ছওয়াব রয়েছে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

سَبَبُ ذِكْرِ الْحَدِيْثِ فِيْ بَابِ الْعِلْمِ **হাদীসটিকে ইলম অধ্যায়ে আনার কারণ :** অন্যকে সৎ পথ প্রদর্শন শিক্ষার অন্তর্গত। কেননা, একজন ওস্তাদ তাঁর শিষ্যদেরকে যেসব কিছু শিক্ষা দান করেন, তা প্রকৃতপক্ষে পথ প্রদর্শনই করে থাকেন। এ কারণে উক্ত হাদীসকে 'ইলম' অধ্যায়ে আনয়ন করা হয়েছে।

وَعَنْ ١٩٩ جَرِيْرٍ (رض) قَالَ كُنَّا فِيْ صَدْرِ النَّهَارِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَهُ قَوْمٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِى النِّمَارِ أَوِ الْعَبَاءِ مُتَقَلِّدِى السُّيُوْفِ عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِمَا رَأٰى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلّٰى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ يَآ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ إِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا . وَالْاٰيَةَ الَّتِىْ فِى الْحَشْرِ اتَّقُوا

১৯৯. অনুবাদ : হযরত জারীর [ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী (রা.)] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা দুপুর বেলায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় গলায় তরবারি ঝুলিয়ে একদল লোক প্রায় নাঙ্গা শরীরে উপস্থিত হলো। একটি মাত্র কালো ডোরা চাদর অথবা আবা দ্বারা কোনো রকমে শরীর পেঁচানো ছিল। তাদের অধিকাংশই ছিল মুদার গোত্রের লোক; বরং তাদের সকলেই মুদার গোত্রের ছিল। তাদের মধ্যে দুর্ভিক্ষের চিহ্ন দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা মলিন হয়ে গেল। অতঃপর তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং বের হয়ে এসে হযরত বেলাল (রা.)-কে আযান দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি আযান ও ইকামত দিলেন। আর রাসূল ﷺ [সবাইকে নিয়ে] নামাজ পড়লেন। অতঃপর এক মর্মস্পর্শী খুতবা দিলেন এবং এ আয়াত পাঠ করলেন যে, يَآ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ الخ অর্থাৎ, হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা হতে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাদের উভয় হতে বহু পুরুষ ও নারী সৃষ্টি করেছেন। আর ভয় কর

اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّاقَدَّمَتْ لِغَدٍ ـ تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِيْنَارِهٖ مِنْ دِرْهَمِهٖ مِنْ ثَوْبِهٖ مِنْ صَاعِ بُرِّهٖ مِنْ صَاعِ تَمْرِهٖ حَتّٰى قَالَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهٗ تَعْجِزُ عَنْهَا بَلْ قَدْ عَجَزَتْ ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتّٰى رَاَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ حَتّٰى رَاَيْتُ وَجْهَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَتَهَلَّلُ كَاَنَّهٗ مُذْهَبَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهٗ اَجْرُهَا وَ اَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهٖ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهٖ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

সে আল্লাহকে; যার দোহাই দিয়ে একে অপরের নিকট অধিকার দাবি করে থাক এবং ভয় করো আত্মীয়তার বন্ধনকে [ছিন্ন করা হতে]। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। –[সূরা নিসা আয়াত : ১] অতঃপর রাসূল ﷺ সূরা হাশরের এই আয়াতটি পাঠ করেন। اِتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ অর্থ–তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর প্রত্যেকের লক্ষ্য করা উচিত যে, আগামী কাল তথা রোজ কিয়ামতের জন্য সে কি প্রেরণ করেছে। [সূরা হাশর, আয়াত : ১৮] কাজেই তোমাদের প্রত্যেকেরই তার দীনার [স্বর্ণমুদ্রা], দিরহাম [রৌপ্যমুদ্রা], কাপড়, গমের ভাণ্ড ও খেজুরের ভাণ্ড হতে দান করা উচিত। অতঃপর তিনি বললেন, যদিও তা খেজুরের এক টুকরাও হয়। বর্ণনাকারী জারীর (রা.) বলেন, এ কথা শুনে আনসারদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি একটি পরিপূর্ণ থলে নিয়ে উপস্থিত হলেন, যা নিয়ে আসতে তার হাত প্রায় অসমর্থ হয়ে পড়েছিল, বরং অসমর্থই হয়ে পড়েছিল। অতঃপর লোকেরা একে অপরের অনুসরণ করতে লাগল। এমনকি কি অবশেষে আমি দেখলাম যে, খাদ্য সামগ্রীও বস্ত্রের দু'টি স্তূপ জমে গেছে। এমনকি দেখতে পেলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখমণ্ডল আনন্দে; যেন তা স্বর্ণমণ্ডিত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো উত্তম পদ্ধতি চালু করবে, তার জন্য তার বিনিময় রয়েছে এবং তার পরে যারা এই কাজ করে তাদের কাজের ছওয়াবও সে পাবে। এতে আমলকারীদের ছওয়াব বিন্দুমাত্রও কমানো হবে না। এমনিভাবে যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো মন্দ প্রথা চালু করে, তাদের পাপের অংশও সে পাবে; এতে তাদের গুনাহের কিছুই হ্রাস করা হবে না।

وَعَنْ ٢٠٠ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا اِلَّا كَانَ عَلٰى اِبْنِ اٰدَمَ الْاَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِاَنَّهٗ اَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ وَسَنَذْكُرُ حَدِيْثَ مُعَاوِيَةَ لَا يَزَالُ مِنْ اُمَّتِىْ فِىْ بَابِ ثَوَابِ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى

২০০. **অনুবাদ :** হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— যে কোনো মানুষকেই অন্যায়ভাবে খুন করা হোক না কেন, তার হত্যার [পাপের] একাংশ হযরত আদম (আ.)-এর প্রথম সন্তানের উপর বর্তাবে [তথা অন্যায়ভাবে খুনের পাপের একটা অংশ কাবিলের আমল নামায় জমা হবে]। কেননা, সেই সর্বপ্রথম অন্যায়ভাবে হত্যা করার রীতি প্রবর্তন করেছে।–[বুখারী ও মুসলিম] হযরত মু'আবিয়া (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত لَا يَزَالُ مِنْ اُمَّتِىْ হাদীসটি আমি ثَوَابُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ অধ্যায়ে উল্লেখ করব, ইনশাআল্লাহ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** এই পৃথিবীর সর্বপ্রথম মানব হলেন হযরত আদম (আ.)। তাঁর অনেক সন্তানের মধ্যে বড় হলো কাবিল আর তার ছোট ছিল হাবিল। বৈবাহিক ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব ঘটে। কাবিল শরিয়তের বিধান অমান্য করে তার সাথে জন্ম নেওয়া কন্যাকে বিয়ে করতে উঠেপড়ে লাগে। অবশেষে কাবিল পথের কাঁটা দূর করতে গিয়ে তার ভ্রাতা হাবিলকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে। আর এটাই হলো পৃথিবীর সর্বপ্রথম হত্যা; যা অন্যায়ভাবে হয়েছিল। কাবিলই সর্বপ্রথম এই অন্যায় হত্যার রীতি প্রবর্তন করে। ফলে কিয়ামত পর্যন্ত অন্যায়ভাবে সংঘটিত সকল হত্যাকাণ্ডের পাপের একাংশ কাবিলের আমল নামায় লিপিবদ্ধ হবে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٠١ كَثِيْرِ بْنِ قَيْسٍ (رض) قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ اَبِى الدَّرْدَاءِ فِىْ مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا اَبَا الدَّرْدَاءِ اِنِّىْ جِئْتُكَ مِنْ مَدِيْنَةِ الرَّسُوْلِ ﷺ لِحَدِيْثٍ بَلَغَنِىْ اَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَاجِئْتُ لِحَاجَةٍ قَالَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَّطْلُبُ فِيْهِ عِلْمًا سَلَكَ اللّٰهُ بِهِ طَرِيْقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَاِنَّ الْمَلٰٓئِكَةَ لَتَضَعُ اَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَاِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ وَالْحِيْتَانُ فِىْ جَوْفِ الْمَاءِ وَاِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلٰى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَاِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ وَاِنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَاِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ اَخَذَهُ اَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ ـ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْدَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِىُّ وَسَمَّاهُ التِّرْمِذِىُّ قَيْسَ بْنَ كَثِيْرٍ ـ

২০১. **অনুবাদ :** তাবেয়ী হযরত কাছীর ইবনে কায়েস (র.) বলেন, আমি একদা দামেস্কের মসজিদে সাহাবী হযরত আবুদ দারদা (রা.)-এর সাথে উপবিষ্ট ছিলাম। এক ব্যক্তি এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবুদ দারদা! আমি সুদূর মদীনাতুর রাসূল ﷺ হতে আপনার নিকট একটি হাদীস শোনার জন্যই এসেছি, এছাড়া আমি আর কোনো উদ্দেশ্যে আসিনি। আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি নাকি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে তা শুনে বর্ণনা করেন। হযরত আবুদ দারদা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করছে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতের পথসমূহ হতে একটি পথের অবলম্বন পৌঁছিয়ে দেন এবং ফেরেশতাগণ ইলম অন্বেষণকারীর সন্তুষ্টির জন্য তাদের পাখাসমূহ বিছিয়ে দেন। আর জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সকলেই আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। এমনকি পানির মধ্যস্থ মৎসকুলও। আর নিশ্চয়ই আলিমের মর্যাদা ইলমবিহীন ইবাদতকারীর উপর এমনি, যেমন পূর্ণ চন্দ্রের ফজিলত অন্যান্য তারকারাজির উপর। নিশ্চয়ই আলিমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী। আর নবীগণ দিনার বা দিরহাম ওয়ারিশ হিসেবে রেখে যাননি; বরং তারা ইলম-ই মিরাস হিসেবে রেখে গেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করল সে অঢেল সম্পদ অর্জন করল। −[আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ্ ও দারিমী। কিন্তু ইমাম তিরমিযী বর্ণনাকারীর নাম কায়েস ইবনে কাছীর বলে উল্লেখ করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : জনৈক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর একটি হাদীস সরাসরি শ্রবণ করার জন্য সুদূর মদীনা হতে দামেস্কে আগমন করেছেন। মদীনা শরীফ হতে দামেস্কের দূরত্ব ছিল ১৩০৩ কি: মি:। প্রায় এক হাজার মাইল। তৎকালে বর্তমান যুগের মতো এরূপ কোনো যানবাহন ছিল না। এতে বুঝা যায় যে, দীনের কথা জানার জন্য তখনকার মানুষ কত কষ্ট স্বীকার করতেন।

مَعْنٰى قَوْلِه ﷺ اِنَّ الْمَلٰئِكَةَ لَتَضَعُ اَجْنِحَتَهَا ফেরেশতাগণ কর্তৃক পাখা বিছিয়ে দেওয়ার অর্থ : ফেরেশতাদের ডানা বিছিয়ে দেওয়ার তিন রকম অর্থ হতে পারে। যেমন–

১. ইলম অন্বেষণকারীদের প্রতি ফেরেশতাদের দয়াপরবশ হওয়া।

২. ফেরেশতাগণ তাদের চলাচল এবং উড্ডয়ন বন্ধ করে দিয়ে আলোচনা শোনা।

৩. অথবা ইলম অন্বেষণকারীদের সম্মানার্থে প্রকৃতই ডানা বিস্তার করে দেওয়া।

اَلْاَنْبِيَاءُ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَّلَا دِرْهَمًا নবীগণ পার্থিব সম্পদের উত্তরাধিকারী বানান না : নবী-রাসূলগণ আল্লাহর প্রথম শ্রেণীর বান্দা। পার্থিব জগতের অন্তঃসারশূন্য সম্পদ তাদের কাম্য হতে পারে না। তাই এ সমস্ত ভোগ-বিলাসের সামগ্রীকে তাঁরা জীবনের লক্ষ্য মনে করেননি। একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও তাঁর একত্ববাদের প্রচারই ছিল তাঁদের মহান ব্রত। আর তা অর্জনের একমাত্র নির্ভরযোগ্য ও উৎকৃষ্ট পথ হচ্ছে– ইলমে ওহী। কাজেই তাঁরা জীবনভর ইলমে ওহীর পৃষ্ঠপোষকতার সাধনা ও অবিরাম সংগ্রাম করে গেছেন। তাই উপরিউক্ত হাদীসে বলা হয়েছে নবীগণ পার্থিব সম্পদ পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে রেখে যাননি ; বরং 'ইলমে ওহী' রেখে গেছেন। সুতরাং যারা তা অর্জন করে তারা উৎকর্ষ সাধন করবে এবং তাঁরাই হবেন সবচেয়ে সৌভাগ্যবান মানুষ।

سَلَكَ اللّٰهُ بِهٖ طَرِيْقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ-এর অর্থ : উপরিউক্ত বাক্যের অর্থ হলো– আল্লাহ এর দ্বারা জান্নাতের একটি পথে পৌছে দেন। এখানে بِهٖ শব্দের "ه" যমীরের প্রত্যাবর্তন স্থলের ভিত্তিতে এর একাধিক অর্থ হতে পারে।

ضَمِيْر بِهٖ-এর প্রত্যাবর্তনস্থল হলো اَلْعِلْم তখন بِهٖ-এর সাথে যুক্ত بَاءٌ হরফে জরটি سَبَبِيَّت-এর অর্থে হবে এবং سَلَكَ ক্রিয়াটি سَهَّلَ অর্থে হবে। তখন مَنْ-এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী ضَمِيْر উহ্য ধরতে হবে। তখন অর্থ হবে; আল্লাহ তা'আলা ইলমের কারণে তার জন্য জান্নাতের পথসমূহ থেকে কোনো একটি পথ সহজ করে দেন।

অথবা بِهٖ-এর যমীর "مَنْ"-এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। তখন "بَاءٌ" হরফে জারটি تَعْدِيَه-এর জন্য হবে। তখন অর্থ হবে আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতের পথের পথিক বানান এবং তাকে জান্নাতের পথে চলার তৌফীক দেন।

وَعَنْ ٢٠٢ اَبِيْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ (رض) قَالَ ذُكِرَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَجُلَانِ اَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالْاٰخَرُ عَالِمٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِيْ عَلٰى اَدْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهٗ وَاَهْلَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ حَتّٰى النَّمْلَةَ فِيْ جُحْرِهَا وَحَتّٰى الْحُوْتَ لَيُصَلُّوْنَ عَلٰى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ . وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ مَكْحُوْلٍ مُرْسَلًا وَلَمْ يَذْكُرْ رَجُلَانِ وَقَالَ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ

২০২. **অনুবাদ :** হযরত আবূ উমামা বাহেলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ-এর কাছে দু'ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। তাদের একজন ইবাদতগুজার আর অন্যজন আলিম। তখন রাসূল ﷺ বললেন, ইবাদতগুজারের উপর আলিমের শ্রেষ্ঠত্ব, এমনই যেমন আমার শ্রেষ্ঠত্ব তোমাদের একজন সাধারণ ব্যক্তির উপর। অতঃপর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তার ফেরেশতাগণ, আকাশ এবং জমিনের বাসিন্দাগণ এমনকি গর্তের পিপিলিকাসমূহ এবং মৎসসমূহ পর্যন্ত মানুষকে কল্যাণের কথা শিক্ষাদানকারীর জন্য দোয়া করতে থাকে। –[তিরমিযী] ইমাম দারেমী মাকহুল থেকে মুরসাল সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সেখানে তিনি رَجُلَانِ শব্দটি উল্লেখ করেননি। [তাতে বলা হয়েছে,] রাসূল ﷺ বলেছেন– فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِيْ عَلٰى اَدْنَاكُمْ অর্থাৎ, আবিদের উপর আলিমের শ্রেষ্ঠত্ব, যেমন

كَفَضْلِىْ عَلٰى اَدْنَاكُمْ ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْاٰيَةَ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ وَسَرَدَ الْحَدِيْثَ اِلٰى اٰخِرِهٖ -

আমার শ্রেষ্ঠত্ব তোমাদের সাধারণ ব্যক্তির উপর। অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন– اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ অর্থাৎ, একমাত্র আলিমগণই আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে। এছাড়া তিনি হাদীসের বাকি অংশ ইমাম তিরমিযীর ন্যায়ই বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

كَفَضْلِىْ عَلٰى اَدْنَاكُمْ-এর মর্মার্থ : আলিমের মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়েই মহানবী ﷺ উল্লিখিত উক্তিটি করেছেন। এর মর্মার্থ নিম্নরূপ—

১. মহানবী ﷺ আলিমদের মর্যাদা তুলে ধরার জন্য তাদেরকে নবীর মর্যাদার সাথে তুলনা করেছেন। কেননা, নবীগণের মর্যাদা হলো অপরিসীম। একজন সাহাবী যেমন মর্যাদার দিক হতে নবীর সমান হতে পারে না, তেমনি শুধুমাত্র একজন ইবাদতগুজার ব্যক্তি একজন আলিমের সমান মর্যাদার অধিকারী হতে পারে না।

২. একজন আলিম ও একজন ইবাদতগুজারের মর্যাদার পার্থক্য অতি সহজে স্পষ্ট করে বোধগম্য করে তোলার জন্য মহানবী ﷺ كَفَضْلِىْ عَلٰى اَدْنَاكُمْ-এর বাস্তব উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন।

৩. মিরকাত প্রণেতা বলেন, ইলম অর্জন ও ইলম শিক্ষা দেওয়ার দিকে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য রাসূল ﷺ আলোচ্য উদাহরণ পেশ করেছেন।

৪. এ উক্তির মাধ্যমে ইলমের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরা হয়েছে।

৫. এখানে আলিমগণের মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন– অন্য হাদীসে রাসূল ﷺ বলেছেন–
نَوْمُ الْعَالِمِ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ الْجَاهِلِ ·

৬. অথবা "মোবালাগাহ"-এর জন্য কথাটি বলা হয়েছে।

لَيُصَلُّوْنَ-এর মধ্যস্থিত صَلٰوة -এর অর্থ : রাসূল ﷺ আলিমের শ্রেষ্ঠত্বের কথা তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, لَيُصَلُّوْنَ عَلٰى مُعَلِّمِ النَّاسِ بِالْخَيْرِ অর্থাৎ, সৃষ্টিকুল মানব জাতির শিক্ষকের জন্য কল্যাণের দোয়া করতে থাকে।

আলোচ্য হাদীসাংশে ليصلون-এর মধ্যস্থিত صلاة শব্দটি পরিভাষায় কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

১. صَلَاة শব্দের নিসবত আল্লাহর দিকে হলে, অর্থ দাঁড়াবে রহমত বর্ষণ করা।

২. صَلَاة শব্দটি রাসূল ﷺ এর দিকে নিসবত হলে এর অর্থ হবে– দোয়া করা।

৩. শব্দটির নিসবত যদি ফেরেশতাদের দিকে হয়, তবে এর অর্থ হবে– ক্ষমা প্রার্থনা করা।

৪. আবার صَلَاة শব্দটির নিসবত যদি উম্মতের দিকে হয়, তবে এর অর্থ হবে– দরূদ পড়া। আলোচ্য হাদীসে لَيُصَلُّوْنَ -এর মধ্যস্থিত صَلَاة শব্দটি রহমত বর্ষণ, ক্ষমা প্রার্থনা ও দোয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, মানুষকে উত্তম বিষয় শিক্ষাদানকারীর উপর আল্লাহ তা'আলা রহমত বর্ষণ করেন, ফেরেশতাগণ ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আর মাখলুকাত তার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করেন।

মিশকাত কিতাবের পার্শ্বটীকায় বলা হয়েছে যে, আলোচ্য হাদীসে لَيُصَلُّوْنَ শব্দটি দোয়া তথা আলিম ব্যক্তির কল্যাণ কামনা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

حَتَّى النَّمْلَةِ وَالْحُوْتِ-এর মহল্লে ইরাব : এখানে اَلنَّمْلَةُ ও اَلْحُوْتُ -এর মধ্যে তিন ধরনের اِعْرَابْ হতে পারে।

১. حَتّٰى কে اِبْتِدَائِيَّة ধরা হলে مَحَلًا مَرْفُوْع হবে।

২. حَتّٰى কে عَاطِفَة ধরা হলে محلا منصوب হবে। যেহেতু مَعْطُوْف عَلَيْه টি مَحَلًا مَنْصُوْب হয়েছে।

৩. حَتّٰى-কে حَرْف جَارّ ধরা হলে مَحَلًا مَجْرُوْر হবে। মিরকাত প্রণেতা বলেন–

بِالنَّصْبِ عَلٰى اَنَّ حَتّٰى عَاطِفَةٌ وَبِالْجَرِّ عَلٰى اَنَّهَا جَارَّةٌ وَبِالرَّفْعِ عَلٰى اَنَّهَا اِبْتِدَائِيَّةٌ وَالْاَوَّلُ اَصَحُّ -

উল্লেখ্য যে, حَتّٰى -এর ই'রাব একটু জটিল, তাইতো প্রখ্যাত নাহুবিদ فراء ও ইন্তেকালের পূর্বে বলে গিয়েছে–
"اَمُوْتُ وَفِىْ قَلْبِىْ مِنْ حَتّٰى لِاَنَّهَا تَرْفَعُ وَتَنْصِبُ وَتَجُرُّ"

উক্ত উক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা বলব "اَلنَّمْلَةُ" ও "اَلْحُوْتُ" -এর মধ্যে তিন ধরনের اِعْرَاب-ই হতে পারে।

وَعَنْ ٢٠٣ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبَعٌ وَإِنَّ رِجَالًا يَأْتُوْنَكُمْ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ يَتَفَقَّهُوْنَ فِى الدِّيْنِ فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوْا بِهِمْ خَيْرًا . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

২০৩. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন। [আমার ইন্তিকালের পর] লোকেরা তোমাদের অনুসারী হবে। বিভিন্ন দিক হতে লোকেরা তোমাদের নিকট দীনী জ্ঞান লাভ করার উদ্দেশ্যে আগমন করবে। অতএব যখন তারা তোমাদের নিকট আসবে তখন তোমরা তাদেরকে সদুপদেশ [দীনের শিক্ষা] দেবে। –[তিরমিযী]

وَعَنْ ٢٠٤ أَبِى هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْحَكِيْمِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ . وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْفَضْلِ الرَّاوِىْ يُضَعَّفُ فِى الْحَدِيْثِ .

২০৪. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, জ্ঞানের কথা জ্ঞানী লোকের হারানো সম্পদ। কাজেই সে যেখানে বা যার নিকট এই জ্ঞান পাবে, সে তার অধিক [উত্তরাধিকারী] অধিকারী। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্] ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, এই হাদীসটি গরীব। এর অপর বর্ণনাকারী ইবরাহীম ইবনুল ফযলকে য'ঈফ বলা হয়ে থাকে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَعْنَى الْكَلِمَةِ الْحِكْمَةِ **"জ্ঞানের কথা"-এর অর্থ :** মহানবী ﷺ এর মুখ নিঃসৃত বাণী "اَلْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ" -এর বিভিন্ন অর্থ হতে পারে। নিম্নে হাদীস বিশারদদের মতামত পেশ করা হচ্ছে।

১. কিছু সংখ্যকের মতে কুরআনের আহকাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করার নাম হিকমত।
২. কেউ কেউ বলেন কুরআনের জ্ঞানকে হিকমত বলে।
৩. কারো মতে কথায় ও কাজে সঠিক অবস্থায় পৌঁছার নাম হিকমত।
৪. আরেক দলের মতে আল্লাহর ভয়কে হিকমত বলে।
৫. কেউ কেউ বলেন, দীনি জ্ঞানার্জনকে হিকমত বলে।
৬. কিছু সংখ্যক বলেন, সত্যের অনুরূপ কথাকে হিকমত বলে।
৭. কারো মতে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উপকারী ইলম যা আমল করা পর্যন্ত পৌঁছায়।

اَلْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْحَكِيْمِ الخ**-এর ব্যাখ্যা :** যে কোনো স্থান থেকেই হোক না কেন জ্ঞানপূর্ণ কথা সংগ্রহ করার উপর রাসূল ﷺ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন, জ্ঞানের কথা জ্ঞানীর হারানো ধন। সুতরাং তা যে যেখানে পাবে সে তা সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যাপারে অধিক হকদার। এর দ্বারা রাসূল ﷺ এ কথা বুঝাতে চাইছেন যে,

১. হারিয়ে যাওয়া বস্তু যেভাবে তার মালিক তালাশ করে এবং তা পাওয়াই মালিকের লক্ষ্য হয়, অনুরূপভাবে জ্ঞানপূর্ণ কথা অনুসন্ধান করা জ্ঞানী ব্যক্তির একমাত্র লক্ষ্য।
২. হারিয়ে যাওয়া জিনিসের প্রাপ্তি ঘটলে মানুষ যেভাবে তার প্রচার করে তেমনি কারো কাছে জ্ঞানের কথা থাকলে তাকেও গোপন করার অধিকার কারো নেই।

وَعَنْ ٢٠٥ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقِيْهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

২০৫. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— একজন ফকীহ [আলিম] শয়তানের বিপক্ষে এক হাজার আবেদ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী [কঠোর]। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : একজন আলেম যে কত বেশি মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী, এখানে তা তুলে ধরা হয়েছে। এক হাজার আবেদকে, তারা দীনি জ্ঞান না রাখার কারণে পথভ্রষ্ট বা গোমরাহ্ করতে শয়তানকে যতটা বেগ পেতে হয়, তার চেয়ে বেশি পরিশ্রম করেও একজন বিজ্ঞ হক্কানী আলেমকে গোম্‌রাহ করতে পারে না। কেননা, আলেম ব্যক্তি তার ইলমের কল্যাণে সর্বদা শয়তানের কারসাজি হতে সতর্ক থাকেন। কোনো কোনো সময় শয়তান হিতাকাঙ্ক্ষী সেজে নামাজির অন্তরে এই প্রশ্ন জাগায় : 'শত চেষ্টা করেও যখন حُضُوْرِ قَلْبٍ সহকারে ইবাদত করা গেল না, তবে এই অন্তঃসার শূন্য ইবাদত করে লাভ কি ? এটা তো প্রাণহীন লাশ ছাড়া কিছুই নয়। সুতরাং এটি ত্যাগ করাই উচিত।' বে-ইল্‌ম আবেদ শয়তানের এ ধরনের চালবাজি সহজে ধরতে পারে না। কিন্তু একজন আলেম মনকে এই বলে প্রবোধ দিবে যে, কিছু না করা অপেক্ষা কিছু করাটা অনেক ভালো। আমার সাধ্য যা আছে তা করছি। কবুল করা না করার কাজতো আল্লাহর। হয়তো বা ধীরে ধীরে একদিন حُضُوْرِقَلْبٍ হাসিল হয়ে যাবে। এ কারণেই শয়তান আলেমকে ভয় করে। অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে نَوْمُ الْعَالِمِ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ الْجَاهِلِ 'বে ইল্‌ম (আবেদ) সাধকের ইবাদত হতে একজন আলেম ব্যক্তির নিদ্রা অধিক উত্তম'। তবে এ কথাও অনস্বীকার্য যে, কেবলমাত্র ইল্‌মই মানুষকে রক্ষা করতে পারে না; বরং এ ব্যাপারে আল্লাহর রহমতও কার্যকর হয়ে থাকে।

وَعَنْ ٢٠٦ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ وَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ اَهْلِهٖ كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيْرِ الْجَوَاهِرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ ـ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ اِلٰى قَوْلِهٖ مُسْلِمٍ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ مَتْنُهٗ مَشْهُوْرٌ وَاِسْنَادُهٗ ضَعِيْفٌ وَقَدْ رُوِىَ مِنْ اَوْجُهٍ كُلُّهَا ضَعِيْفٌ ـ

২০৬. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর অবশ্য কর্তব্য। আর অপাত্রে ইলম স্থাপনকারী যেন শূকরের গলায় জহরত, মুক্তা ও স্বর্ণ স্থাপনকারী। –[ইবনে মাজাহ]

আর ইমাম বায়হাকী তাঁর শু'আবুল ঈমান গ্রন্থে "ইলম তলব করা প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরজ" শুধু এতটুকু বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, আলোচ্য হাদীসের মতন [ভাষ্য] মাশহুর, তবে সনদ দুর্বল। এ হদীসটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু সব কয়টি সূত্রই দুর্বল।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْمُرَادُ بِالْعِلْمِ ইলম দ্বারা উদ্দেশ্য : হাদীসে উল্লেখিত "عِلْمٌ" দ্বারা ইলমে দীন ও ইলমে শরীয়াহ উদ্দেশ্য। দুনিয়াবী ইলম উদ্দেশ্য নয়। আর এখানে كُلُّ مُسْلِمٍ দ্বারা শুধু মুসলিম পুরুষই উদ্দেশ্য নয়। বরং তার অনুগামী হিসেবে নারীও এর অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য নারীর তুলনায় পুরুষের দায়িত্ব অত্যধিক। এ কারণেই শুধু كُلُّ مُسْلِمٍ বলা হয়েছে।

مِقْدَارُ الْفَرْضِ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ যতটুকু ইলম অর্জন করা ফরজ : আলোচ্য হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দীনি ইলম অন্বেষণ ও অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর আবশ্যকীয় কর্তব্য। হাদীসবিশারদগণ এ আবশ্যকীয় ইলমকে দু' শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। ১. ফরজে আইন ২. ফরজে কেফায়া। নিম্নে তার বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপিত হলো—

দৈনন্দিন জীবনে স্বাভাবিকভাবে একজন মানুষের পক্ষে ইবাদত ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যতটুকু দীনি জ্ঞান অর্জন না করলে অসুবিধার সৃষ্টি হয়, ততটুকু ইলম শিক্ষা করাই ফরজে আইন। এর চেয়ে অতিরিক্ত ইল্‌ম হাসিল করা ফরজে কেফায়া। কেননা, তা না হলে দীনি ইলমের গভীরতা হারিয়ে যাবে।

কেউ কেউ বলেন– ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নতে মুওয়াক্কাদাহ, হালাল, হারাম, মুবাহ, আদেশ, নিষেধ ইত্যাদি সম্পর্কে এজমালীভাবে ইল্‌ম হাসিল করা প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ ও নারীর জন্য ফরজে আইন। এগুলো ব্যতীত ইলমে ফিকহ, তাফসীর, ইলমে হাদীস, তাসাউফ ইত্যাদি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লাভ করা ফরজে কেফায়া। সমাজের কিছু সংখ্যক লোক এগুলো অর্জন করলে সকলের পক্ষ থেকে ফরজিয়্যাত আদায় হবে। নতুবা সকলেই গুনাহগার হবে।

وَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ اَهْلِهٖ كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيْرِ الخ-এর মর্মার্থ : মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর বাণী "অপাত্রে ইলম স্থাপনকারী যেন শূকরের গলায় জহরত, মুক্তা ও স্বর্ণ স্থাপনকারী।" এর মর্মার্থ হলো এই যে, অপাত্রে ইলম স্থাপন করলে তার অপব্যবহার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যে ব্যক্তিকে সূক্ষ্ম জ্ঞানের উপযুক্ত নয় তাকে সূক্ষ্ম জ্ঞান দান করা শূকরের গলায় জহরত, মুক্তা ও স্বর্ণ স্থাপনকারীর সমতুল্য। কারণ, এগুলো মানুষের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার উপকরণ। শূকরের গলায় ওগুলো পরালে শূকরের সৌন্দর্য তো বাড়েই না ; বরং প্রকারান্তরে মণি-মুক্তারই অবমাননা করা হয়। তদ্রূপভাবে অপাত্রে ইলম রাখলে তার অমর্যাদাই করা হয়। কারণ, যে ব্যক্তি যে জিনিসের মর্যাদা বুঝে না; তার নিকট সে জিনিস রাখলে তাতে হিতে বিপরীতই হবে। কাজেই ইলম শিক্ষা করার সময় যেমন শিক্ষকের নীতি ও আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে, তেমনি যিনি শিক্ষা দেন তাঁকেও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ইলমে ওহী কার নিকট আমানত রাখছেন।

---

২٠٧ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَصْلَتَانِ لَاتَجْتَمِعَانِ فِىْ مُنَافِقٍ حُسْنُ سِمْتٍ وَلَافِقْهٌ فِى الدِّيْنِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

২০৭. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– দু'টি স্বভাব মুনাফিকের মধ্যে একত্রিত হতে পারে না। নৈতিকতা [উত্তম স্বভাব] ও দীনের সঠিক জ্ঞান।–[তিরমিযী]

---

٢٠٨ - وَعَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ خَرَجَ فِىْ طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَرْجِعَ . رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالدَّارِمِىُّ

২০৮. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন — যে ব্যক্তি ঘর হতে ইলম অর্জনের জন্য বের হয়, যে পর্যন্ত সে প্রত্যাবর্তন না করে, সে পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় থাকে। –[তিরমিযী ও দারেমী]

---

٢٠٩ - وَعَنْ سَخْبَرَةَ الْاَزْدِىِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضٰى . رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالدَّارِمِىُّ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفُ الْاِسْنَادِ وَاَبُوْدَاوُدَ الرَّاوِىْ يُضَعَّفُ .

২০৯. অনুবাদ : হযরত সাখবুরা আযদী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি দীনী ইলম অন্বেষণ করে তা তার জন্য পূর্বকৃত [সগীরাহ] গুনাহসমূহের জন্য কাফ্‌ফারা হয়ে যায়। –[তিরমিযী ও দারেমী] ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, এই হাদীসটির সনদ দুর্বল, কেননা এর বর্ণনাকারী আবূ দাউদ নকী ইবনে হারিসকে দুর্বল বলা হয়ে থাকে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, নেক কাজের কারণে সগীরাহ গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যায়। যেমন–আল্লাহ তা'আলা বলেন, اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ আর ইলমে দীন অর্জন করাও একটি পুণ্য কর্ম। তাই এর দ্বারাও পাপসমূহ মার্জনা হয়ে যায়। যেহেতু ইলমের মাধ্যমেই সে জানতে পারবে যে, কোনটি সগীরা এবং কোনটি কবীরা। ফলে তার অনুশোচনা সৃষ্টি হয় এবং তওবা করে সে কবীরা গুনাহ হতেও ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়।

وَعَنْ ٢١٠ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَنْ يَّشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُهُ حَتّٰى يَكُوْنَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةَ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

২১০. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন— মু'মিন ব্যক্তি কখনও উত্তম কথা [ইলম] শ্রবণে তৃপ্তি লাভ করতে পারে না ; যে পর্যন্ত না তার শেষ পরিণামে জান্নাত হয়। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** মু'মিন ব্যক্তি আল্লাহর দীনকে নিজের প্রাণের চেয়েও অধিক ভালবাসে। আর আল্লাহর দীন বুঝার মাধ্যমই হলো 'দীনি ইল্‌ম'। তাই মু'মিন ব্যক্তি যতই দীনি ইল্‌ম অর্জন করে, ততই তার ইলম শেখার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পেতে থাকে, ক্রমেই সে আল্লাহ প্রেমে মত্ত হতে থাকে। মূলত দীনি ইল্‌ম হলো আল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা স্থাপনের একটা শ্রেষ্ঠতম মাধ্যম। তাই মু'মিন ব্যক্তি তার প্রেমিকের আলোচনা যতই শুনে ততই তার আগ্রহ বাড়তে থাকে। ফলে তার এই আগ্রহ মৃত্যু অবধি শেষ হয় না; বরং সে আমরণ ইল্‌ম তলব করতে থাকে। অবশেষে এটি তাকে বেহেশতে নিয়ে পৌঁছায়। অর্থাৎ মৃত্যুর সাথে সাথেই সে জান্নাতে পৌঁছে যায়। তাই বলা হয়েছে যে, ইলমে ওহীর কথা শ্রবণ করে মু'মিন ব্যক্তির তৃপ্তি মিটে না। জান্নাতেই তার তৃপ্তি মিটবে।

وَعَنْ ٢١١ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ اُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَّارٍ - رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْدَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ اَنَسٍ

২১১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— যে ব্যক্তিকে এমন ইলমের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়, যা সে জানে, অতঃপর সে তা গোপন করে রাখে। কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেওয়া হবে। –[আহমদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী] কিন্তু ইমাম ইবনে মাজাহ্ (রা.) হাদীসটি হযরত আনাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** উল্লিখিত হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝায় যে, একান্ত শরয়ী কারণ ছাড়া ইলম গোপন করা সম্পূর্ণরূপে হারাম। বরং ইলম শিক্ষা করার পর তা অন্যের নিকট পৌঁছে দেওয়াই হলো একান্ত কর্তব্য। কেননা, কোনো বিষয় জানা সত্ত্বেও সে যদি তা অন্যের নিকট পৌঁছে না দিয়ে মৃত্যুবরণ করে তবে অন্যেরা তা হতে বঞ্চিত হবে। যদি এভাবে প্রত্যেক জ্ঞানীই তার ইলম গোপন করতে থাকে তবে একদিন ইলম নিঃশেষ হয়ে যাবে। এ জন্যই রাসূল ﷺ ইলম গোপনকারীর শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন।

وَعَنْ ٢١٢ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِىَ بِهِ الْعُلَمَاءَ اَوْ لِيُمَارِىَ بِهِ السُّفَهَاءَ اَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوْهَ النَّاسِ اِلَيْهِ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ النَّارَ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

২১২. অনুবাদ : হযরত কা'ব ইবনে মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– যে ব্যক্তি আলিমদের সাথে বিতর্কে জয়লাভের জন্য অথবা মুর্খদের সাথে বাক-বিতণ্ডা করার জন্য কিংবা সাধারণ মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য ইলম অন্বেষণ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। –[তিরমিযী] ইমাম ইবনে মাজাহ্ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : ইলম অর্জনের উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং আল্লাহর দীনকে সমুন্নত করা। এই উদ্দেশ্য থাকলেই পরকালে মুক্তি পাওয়া যাবে। অন্যথা ইলম অন্বেষণকননারী ইলমের কোনো ফজিলত তো লাভ করতে পারবেই না ; উপরন্তু তাকে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ জন্য সকলের উচিত নিয়তকে পরিশুদ্ধ করে নেওয়া।

وَعَنْ ٢١٣ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغٰى بِهٖ وَجْهُ اللّٰهِ لَا يَتَعَلَّمُهٗ اِلَّا لِيُصِيْبَ بِهٖ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَعْنِىْ رِيْحَهَا . رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْدَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

২১৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এমন ইলম অর্জন করে, যার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়; কিন্তু সে ব্যক্তি দুনিয়ার কোনো সামগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে তা শিক্ষা করে তবে সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন জান্নাতের গন্ধও পাবে না। –[আহমদ, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ্]

وَعَنْ ٢١٤ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَضَّرَ اللّٰهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِىْ فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَاَدَّاهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيْهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ اِلٰى مَنْ هُوَ اَفْقَهُ مِنْهُ . ثَلَاثٌ لَا يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ اِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلّٰهِ وَالنَّصِيْحَةُ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَلُزُوْمُ جَمَاعَتِهِمْ فَاِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيْطُ مِنْ وَرَائِهِمْ . رَوَاهُ الشَّافِعِىُّ وَالْبَيْهَقِىُّ فِى الْمَدْخَلِ وَرَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْدَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِىُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اِلَّا اَنَّ التِّرْمِذِىَّ وَاَبَادَاوُدَ لَمْ يَذْكُرَا ثَلٰثٌ لَا يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ اِلٰى اٰخِرِهٖ .

২১৪. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন– আল্লাহ তা'আলা সে ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন যে আমার কথা শুনেছে, তারপর তাকে যথাযথভাবে স্মরণ রেখেছে ও রক্ষণাবেক্ষণ করেছে। আবার তা অন্যের নিকট সঠিকভাবে পৌঁছে দিয়েছে। কেননা, অনেক জ্ঞানের বাহক নিজেই জ্ঞানী নয়। [সুতরাং জ্ঞানের বাণী জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট পৌঁছে দেওয়া উচিত] আর এমন অনেক লোক রয়েছে, যারা [নিজেরা জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও] নিজেদের তুলনায় উচ্চতর জ্ঞানীর নিকট জ্ঞানের বার্তা বহন করে নিয়ে যায়। অতঃপর নবী করীম ﷺ বলেন, তিনটি জিনিস এমন রয়েছে যে, সেগুলো সম্পর্কে কোনো মুসলমানের অন্তর বিশ্বাস ঘাতকতা করতে পারে না। যথা–১। একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কাজ করা। ২। মুসলমানের কল্যাণ কামনা করা, ৩। মুসলমানের জামাতকে শক্তভাবে আঁকড়ে থাকা। কেননা, তাদের দোয়া তাদের পরবর্তী মুসলমানদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে।–শাফেঈ বায়হাকী ও তাঁর "মাদখাল" নামক গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইমাম আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ্ ও দারেমী এ হাদীসটি হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তবে ইমাম তিরমিযী ও আবূ দাউদ ثَلَاثٌ لَا يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ الخ। [অর্থাৎ, তিনটি বিষয়ে কোনো মুসলমানের অন্তর বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না।] হতে হাদীসের শেষ পর্যন্ত অংশটি বর্ণনা করেননি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : উপরিউক্ত হাদীসের বর্ণনা বিন্যাস দ্বারা বুঝা যায় যে, হাদীসটির শেষের অংশের ভূমিকা হলো প্রথমাংশ। ফলে এর অর্থ হবে এই তিনটি কথা যে অন্যকে পৌঁছে দেয় তার জন্য হযরত রাসূলে কারীম ﷺ দোয়া করেছেন যে, আল্লাহ তার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করুন। অর্থাৎ, যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা আমল করার নিয়েতে শুনে এবং আমল করে, অতঃপর মুখস্থ করে তা অন্যের নিকট হুবহু পৌঁছে দেয়, তার মুখমণ্ডল আল্লাহ উজ্জ্বল করুন।

رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ الخ -এর মর্মার্থ : রাসূল ﷺ-এর বাণী "رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلٰى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ"-এর কয়েকটি ব্যাখ্যা হতে পারে। যেমন–

১. عِلْمُ دِيْنٍ-এর সকল ধারক-বাহকই ফকীহ নন। যারা কুরআন হাদীস হতে নিজের গবেষণা দ্বারা সরাসরি মাসআলা বের করেন, তারাই প্রকৃতপক্ষে ফকীহ। প্রত্যেকেই যে প্রত্যেক বিষয়ে পারদর্শী হবে এমন কোনো কথা নেই। প্রয়োজনের তাগিদে ছাত্র হতেও অনেক নাজানা বিষয় জেনে নেওয়া যায়। ইমাম বুখারী (রা.)-এর উস্তাদ এ ক্ষেত্রে প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

২. অথবা, এর অর্থ হচ্ছে— কিছু সংখ্যক মুবাল্লিগ এমনও রয়েছেন, যিনি ঐ ব্যক্তি থেকে ফিক্হ শাস্ত্রে অধিক জ্ঞান রাখেন যাঁর কাছে তা পৌঁছানো হয়।

৩. এ হাদীসাংশ দ্বারা এ কথাও বুঝা যায় যে, হাদীস বিশেষজ্ঞদের উচিত তার থেকে নিম্ন মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হতেও জ্ঞানের কথা শ্রবণ করা এবং প্রয়োজনে তা গ্রহণ করা।

اَلْغِلُّ-এর অর্থ : اَلْغِلُّ শব্দটি اَلْغُلُوْلُ মাসদার থেকে উৎকলিত। এর অর্থ সম্পর্কে দু'টি অভিমত রয়েছে। যথা

১. "غِلٌّ" শব্দের غَيْن-এর নিচে যের হলে এর অর্থ হবে– খেয়ানত, বিদ্বেষ, চুরি ইত্যাদি। যেমন হাদীসে এসেছে–

لَا تُقْبَلُ صَدَقَةٌ مِنْ مَالِ الْغُلُوْلِ

২. আর غَلٌّ শব্দের غَيْن-এর উপর যদি যবর হয়, এর অর্থ হবে– বিশ্বাসঘাতকতা করা, খেয়ানত করা।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : পারিভাষিক সংজ্ঞা হলো– هُوَ السَّرِقَةُ أَوِ الْخِيَانَةُ لِلْمَغْنَمِ أَوْ غَيْرِهٖ অর্থাৎ, গনিমত বা অন্য কোনো সম্পদ হতে অন্যায়ভাবে চুরি করা অথবা আত্মসাৎ করাকে "غلول" বলে।

ثَلَاثٌ لَا يُغَلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ-এর মর্মার্থ : রাসূল ﷺ-এর বাণী ثَلَاثٌ لَا يُغَلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ-এর অর্থ হচ্ছে, তিনটি বিষয় এমন রয়েছে, যাতে কোনো মুসলমানের অন্তর বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না। কেননা, প্রকৃত মু'মিন মাত্রই উক্ত তিনটি বিষয়ের আঞ্জাম দিয়ে থাকেন। আর এগুলো তার ঈমানেরই পরিচায়ক। হাদীসে উল্লিখিত বিষয় তিনটি হচ্ছে যথা–

১. إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلّٰهِ প্রতিটি কাজ শুধু মাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা।

২. اَلنَّصِيْحَةُ لِلْمُسْلِمِيْنَ মুসলমানদের জন্য কল্যাণ কামনা করা।

৩. لُزُوْمُ الْجَمَاعَةِ মুসলমানদের দলকে আঁকড়ে ধরা।

إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلّٰهِ দ্বারা উদ্দেশ্য : মহানবী ﷺ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلّٰهِ অর্থাৎ, আমল আল্লাহ তা'আলার জন্য একনিষ্ঠ হওয়ার অর্থ হলো– আল্লাহ তা'আলার ইবাদত এভাবে করবে যে, কাউকেও তার শরিক মনে করবে না। যাবতীয় আদেশ ও নিষেধে তাঁর আনুগত্য করবে। আল্লাহকে মুনিব হিসেবে গ্রহণ করবে এবং নিজেকে তাঁর দাস বা গোলাম হিসেবে জানবে।

কেউ কেউ বলেছেন– আল্লাহর জন্য আমলকে একনিষ্ঠ করার অর্থ হলো– এভাবে ইবাদত করবে যে, তুমি আল্লাহকে দেখছ। যদি এ স্তরে পৌঁছতে সক্ষম না হও, তবে এ বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহ তোমাকে দেখছেন। এটাই হচ্ছে إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلّٰهِ –পবিত্র কুরআনের ঘোষণা–

(١) وَمَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ .

(٢) قُلْ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ .

اَلنَّصِيْحَةُ-এর অর্থ : اَلنَّصِيْحَةُ শব্দটি একবচন, বহুবচন হলো– نَصَائِحُ - এর শাব্দিক অর্থ হলো–

১. اَلْمَوْعِظَةُ [উপদেশ,]

২. تَمَنِّى الْخَيْرِ [কল্যাণ কামনা করা,]

৩. اَلْمُسَاعَدَةُ [সহযোগিতা করা।]

مَعْنَى النَّصِيْحَةِ اِصْطِلَاحًا পরিভাষায় এর পরিচয় হলো–

১. هِيَ تَمَنِّى الْخَيْرِ لِاَخِيْهِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَوِيَّةِ অর্থাৎ, পার্থিব জীবনে অপর ভাইয়ের কল্যাণ কামনাই নসিহত।

২. ইমাম নববীর মতে, هِيَ قَوْلٌ فِيْهِ دُعَاءٌ وَنَهْىٌ عَنْ فَسَادٍ

৩. জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, هُوَ اَدَاءُ الْحَقِّ اِلٰى صَاحِبِهِ অর্থাৎ যার যে হক, তাকে তা দিয়ে দেওয়াই নসিহত।

اَلنَّصِيْحَةُ لِلْمُسْلِمِيْنَ-এর মর্মার্থ : মুসলিম নেতৃবৃন্দের নসিহতের ব্যাখ্যায় আল্লামা খাত্তাবী (র.) বলেন, নেতৃবৃন্দের পেছনে নামাজ পড়া, তাদের আদেশ মান্য করা এবং তাদের সহযোগিতা করা। কেননা, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের পরে মুসলিম নেতৃবৃন্দের আনুগত্য করা ফরজ। যেমন– ইরশাদ হচ্ছে :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

ইমাম নববী বলেছেন– وَهُوَ مُعَاوَنَتُهُمْ عَلَى الْحَقِّ وَطَاعَتُهُمْ فِيْهِ وَاَمْرُهُمْ بِهِ

অর্থাৎ, মুসলমানদের কল্যাণ কামনা মানে সৎপথে তাদের সাহায্য করা, তাদের অনুসরণ করা ও আদেশ-আদর্শ পালন করা।

لُزُوْمُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ-এর ব্যাখ্যা : এর অর্থ হচ্ছে, মুসলমানদের দলকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকা। কারণ, ঐক্যবদ্ধ থাকলে কোনো প্রকার বিভ্রাট-বিশৃংখলা ঈমানকে দুর্বল করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলাও নির্দেশ দিয়েছেন– وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّ لَا تَفَرَّقُوْا ـ কিন্তু দল পরিত্যাগ করলে সমূহ বিপদের আশঙ্কাসহ ইসলাম থেকে ছিটকে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। হাদীসেও বলা হয়েছে–

(١) قَالَ النَّبِىُّ ﷺ "مَنْ تَرَكَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ ـ

(٢) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ "مَنْ شَذَّ شُذَّ فِى النَّارِ"

---

٢١٥ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ نَضَّرَ اللّٰهُ اِمْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ اَوْعٰى لَهُ مِنْ سَامِعٍ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَ رَوَاهُ الدَّارِمِىُّ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ ـ

২১৫. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা সে ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার নিকট থেকে কোনো কথা [হাদীস] শুনেছে এবং যেভাবে শুনেছে তা যথাযথভাবে অপরের নিকট পৌঁছে দিয়েছে। কেননা, অনেক সময় যার নিকট পৌঁছানো হয়, সে ব্যক্তি শ্রোতা অপেক্ষা অধিকতর রক্ষাকারী বা জ্ঞানী হয়। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্] ইমাম দারেমী এ হাদীস হযরত আবুদ দারদা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

---

٢١٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِتَّقُوا الْحَدِيْثَ عَنِّىْ اِلَّا مَا عَلِمْتُمْ فَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَ جَابِرٍ وَلَمْ يَذْكُرْ اِتَّقُوا الْحَدِيْثَ عَنِّىْ اِلَّا مَا عَلِمْتُمْ

২১৬. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– তোমরা আমার পক্ষ হতে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করো। তবে যা সঠিকভাবে আমার কথা বলে জান [শুধু তাই বর্ণনা কর]। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যা কথা আরোপ করে, সে যেন তার আবাসস্থল জাহান্নামে বানিয়ে নেয়। –[তিরমিযী]

ইমাম ইবনে মাজাহ্ এ হাদীসটি হযরত ইবনে মাসউদ ও জাবির (রা.) প্রমুখ-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি اِتَّقُوا الْحَدِيْثَ عَنِّىْ اِلَّا مَا عَلِمْتُمْ অংশটি উল্লেখ করেননি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا -এর মর্মার্থ : মহানবী ﷺ-এর উক্ত বাণী দ্বারা কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা দান অথবা মিথ্যা হাদীস রচনা দু'ই হতে পারে। কেননা, যে ব্যক্তি কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা দান করে; সে যেন রাসূল ﷺ-এর উপর মিথ্যা আরোপ করে। যেহেতু অনেক সময় এই ব্যাখ্যাকে রাসূলের দিকে নিসবত করা হয়।

আর মিথ্যা হাদীস রচনা এটা তো স্পষ্টভাবে রাসূল ﷺ-এর উপর মিথ্যারোপ করা । কেননা, রাসূল ﷺ যা বলেননি মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকননারী ব্যক্তি রাসূলের নামে তা-ই রচনা করে।

وَعَنْ ٢١٧ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ فِى الْقُرْاٰنِ بِرَاْيِهٖ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ وَفِىْ رِوَايَةٍ مَنْ قَالَ فِى الْقُرْاٰنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

২১৭. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কুরআনের ব্যাখ্যায় নিজের মনগড়া কোনো কথা বলে, সে যেন নিজের ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়। অপর বর্ণনায় এসেছে– যে ব্যক্তি কুরআনের মর্ম উদঘাটনের ব্যাপারে নিশ্চিত জ্ঞান ব্যতীত মনগড়া কোনো কথা বলে; সে যেন তার স্থান জাহান্নামে বানিয়ে নেয়। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَفْسِيْر ও تَاوِيْل -এর মধ্যকার পার্থক্য :

১. تَفْسِيْر শব্দের আভিধানিক অর্থ– উন্মুক্ত করা, বর্ণনা করা। اَلْقَوْلُ بِالرَّاْىِ-এর শাব্দিক অর্থ– নিজের ইচ্ছা মাফিক অভিমত প্রকাশ করা।

২. পরিভাষায় تَفْسِيْر বলা হয়–আল্লাহ তা'আলার কালামের মর্মার্থ স্পষ্ট করা ও বর্ণনা করাকে। আলোচ্য হাদীসে اَلْقَوْلُ بِالرَّاْىِ মানে কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা প্রদান করা।

৩. اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ-এর মতে, تَفْسِيْر জায়েজ এবং اَلْقَوْلُ بِالرَّاْىِ বা تَفْسِيْر بِالرَّاْىِ জায়েজ নয়।

৪. تَفْسِيْر হলো সর্বজন গ্রহণীয় কুরআনের ব্যাখ্যা। اَلْقَوْلُ بِالرَّاْىِ হলো শরয়ী কায়দা ভিত্তিক ব্যাখ্যা দান করার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে নিজের আকল বা জ্ঞানের উপর নির্ভর করে ব্যাখ্যা দান করা।

৫. তাফসীরকারক হলেন ইসলামের এমন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি, যার মর্যাদা সাধারণের উর্ধ্বে। اَلْقَوْلُ بِالرَّاْىِ-এর পরিণাম সরাসরি জাহান্নাম।

مَنْ قَالَ فِى الْقُرْاٰنِ بِرَاْيِهٖ -এর ব্যাখ্যা : আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতে, কুরআনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের ব্যাপারে তাফসীরকারের মনগড়া কোনো মতবাদ প্রকাশ করা জায়েজ নয়। তাকে কতিপয় সার্থক পন্থা অবলম্বন করেই কুরআনের ব্যাখ্যা করতে হবে।

প্রথমত: দেখতে হবে এ ব্যাপারে রাসূল ﷺ হতে কিছু বর্ণিত আছে কি-না। কেননা, হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে وَكَانَ خُلُقُهُ الْقُرْاٰنُ

দ্বিতীয়ত: নবী করীম ﷺ হতে কুরআনের কোনো অংশের সঠিক ব্যাখ্যা না পাওয়া গেলে; সাহাবায়ে কেরামের পক্ষ থেকে কোনো বর্ণনা এসেছে কি-না? তার অনুসন্ধান করতে হবে। কেননা, তাঁদের মাতৃভাষা আরবি। নবী করীম ﷺ তাঁদেরকে নিয়েই কুরআনের বিধান বাস্তবায়িত করেছেন।

তৃতীয়ত: সর্বশেষে তাকে তাবেয়ীনের পক্ষ হতে এর কোনো সমাধান আছে কি-না? তা অনুসন্ধান করতে হবে। কেননা, তাদের যুগ পর্যন্ত আরবীয় প্রাচীন ধারা প্রচলিত ছিল। সুতরাং পরবর্তী লোকদের পক্ষে শুধু ভাষার উপর নির্ভর করে কুরআনের মর্ম উদঘাটন করা কঠিন ব্যাপার ছিল।

সর্বোপরি তাকে হতে হবে দীনি ইলমে একজন পণ্ডিত এবং হাদীসের উপর গভীর জ্ঞানের অধিকারী। নতুবা কুরআনের ব্যাখ্যা করতে যাওয়াই হবে তার দোজখে স্থায়ী ঠিকানা হওয়ার কারণ।

وَعَنْ ٢١٨ جُنْدُبٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ فِى الْقُرْاٰنِ بِرَأْيِهِ فَاَصَابَ فَقَدْ اَخْطَأَ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَ اَبُوْدَاوُدَ

২১৮. **অনুবাদ :** হযরত জুনদুব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন –যে ব্যক্তি কুরআনের ব্যাখ্যায় নিজের মনগড়া কথা বলে। আর যদি তাতে সে সত্যেও উপনীত হয়, তবু তার কর্ম পদক্ষেপটি ভুল হয়েছে। –[তিরমিযী ও আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٢١٩ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمِرَاءُ فِى الْقُرْاٰنِ كُفْرٌ ـ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْدَاوُدَ ـ

২১৯. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– পবিত্র কুরআনের কোনো বিষয় নিয়ে তর্ক- বিতর্ক করা কুফরি। –[আহমদ ও আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْمِرَاءُ-এর অর্থ : اَلْمِرَاءُ শব্দটি বাবে مُفَاعَلَةٌ হতে فِعَال ওযনে ব্যবহৃত হয়েছে। এ বাবে উভয় দিক হতে ক্রিয়া পদের অর্থের ব্যবহার হয়। এ হিসেবে اَلْمِرَاءُ -এর অর্থ হবে পরস্পরে তর্ক-বিতর্ক করা, ঝগড়াঝাটি করা ইত্যাদি। এখানে : কুরআনের আয়াতের পারস্পরিক বিরোধ দেখানোর হীন উদ্দেশ্যে তর্ক-বিতর্ক করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

কারো মতে مِرَاءٌ শব্দের অর্থ– মন্দের সন্দেহে কুরআনের হুকুমকে বাতিল করার চেষ্টা করা। এরূপ করা কুফরি। তবে কুরআনের অর্থ প্রকাশের সদুদ্দেশ্যে পারস্পরিক দলিল প্রমাণ পেশ করা জায়েজ আছে।

وَعَنْ ٢٢٠ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ سَمِعَ النَّبِىُّ ﷺ قَوْمًا يَتَدَارَءُوْنَ فِى الْقُرْاٰنِ فَقَالَ اِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهٰذَا ضَرَبُوْا كِتَابَ اللّٰهِ بَعْضَهٗ بِبَعْضٍ وَاِنَّمَا نَزَلَ كِتَابُ اللّٰهِ يُصَدِّقُ بَعْضُهٗ بَعْضًا فَلَا تُكَذِّبُوْا بَعْضَهٗ بِبَعْضٍ فَمَا عَلِمْتُمْ مِنْهُ فَقُوْلُوْا وَمَا جَهِلْتُمْ فَكِلُوْهُ اِلٰى عَالِمِهٖ ـ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ

২২০. **অনুবাদ :** হযরত আমর ইবনে শু'আইব তাঁর পিতা হতে, তাঁর পিতা তার পিতামহ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, একবার নবী করীম ﷺ একদল [মুনাফিক] লোককে কুরআনের বিষয় নিয়ে বাদানুবাদ করতে শুনলেন। তখন তিনি বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এ কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা আল্লাহর কিতাবের একাংশকে অপর অংশের বিরুদ্ধে দাঁড় করাত। অথচ আল্লাহর কিতাবের একাংশ অপরাংশের সমর্থক হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তোমরা তার একাংশ দ্বারা অপর অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন কর না, অতএব তোমরা এর যে অংশ ভালোরূপে অবগত আছ শুধু তাই বলো। আর যা তোমরা অবগত নও, তা যে অবগত আছে তার প্রতি সোপর্দ করো। –[আহমদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : মুনাফিকেরা স্বভাবতই ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করত। সুতরাং বাদানুবাদের মাধ্যমে এর কোনো আয়াতের অর্থ ও তত্ত্বের মধ্যে কোনো প্রকারের সামঞ্জস্যহীনতা প্রকাশ করতে পারলে তাদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ হবে। এ সমস্ত কপট উদ্দেশ্যে অহেতুক কুরআনের মধ্যে বিতর্কের অবতারণা করত। পূর্ববর্তী বহু জাতি ধ্বংস হওয়ার কারণসমূহের মধ্যে এটাও ছিল অন্যতম। তাই মুসলমানদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য ইজতেহাদ দ্বারা পরস্পরের মধ্যে মত বিনিময় করে সত্য ও সঠিক অর্থ উদঘাটনের জন্য তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হওয়া দূষণীয় নয়। কেননা, তাহলে সত্য উদঘাটন হবে।

وَعَنْ ٢٢١ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُنْزِلَ الْقُرْاٰنُ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ لِكُلِّ اٰيَةٍ مِنْهَا ظَهْرٌ وَ بَطْنٌ وَ لِكُلِّ حَدٍّ مُطَّلَعٌ . رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ

২২১. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– পবিত্র কুরআন সাতটি পঠন রীতিতে অবতীর্ণ হয়েছে। তার প্রতিটি আয়াতের একটি বাহ্যিক অর্থ ও একটি তাত্ত্বিক অর্থ রয়েছে। [আর প্রত্যেক অর্থেরই একটি সীমা রয়েছে] এবং প্রত্যেক সীমার একটি অবগতিস্থান রয়েছে।–[ইমাম বাগাবী শরহুস সুন্নায় হাদীসটি বর্ণনা করেছেন]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

سَبَبُ اِرْشَادِ الْحَدِيْثِ হাদীসের পটভূমি : اَلْبَيَانُ وَالتَّعْرِيْفُ নামক কিতাবে আলোচ্য হাদীসের পটভূমি বর্ণনায় বলা হয়েছে, হযরত ওমর (রা.) বলেন, আমি হিশাম বিন হাকিমকে سُوْرَةُ الْفُرْقَانِ আমার পড়ার ব্যতিক্রম পড়তে শুনলাম। তার এরূপ পড়া শুনে আমি তাকে নিয়ে মহানবী ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম এবং হুযূর সমীপে আরজ করলাম, এ ব্যক্তি আপনি আমাকে যেরূপ কুরআন পড়িয়েছেন তার বিপরীত কুরআন পড়ে। এ কথা শুনে নবী করীম ﷺ হিশাম বিন হাকিমকে কুরআন পড়তে বললেন এবং সে পড়ল। নবী করীম ﷺ তার কুরআন পাঠ শুনে বললেন, এরূপ পঠন পদ্ধতিতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর মহানবী ﷺ কুরআন বিভিন্ন পঠন পদ্ধতিতে অবতীর্ণ হওয়ার বর্ণনা দিতে গিয়ে উপরোক্ত বক্তব্য প্রদান করেন।

اَلْمُرَادُ بِسَبْعَةِ اَحْرُفٍ সাত হরফ দ্বারা উদ্দেশ্য : সাত হরফ সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনে কেরামের মতামত নিম্নরূপ :

১. মিরকাত প্রণেতা বলেন–
   كَاَنَّهٗ قَالَ عَلٰى سَبْعِ لُغَةٍ مِنْ لُغَاتِ الْعَرَبِ وَهِىَ قُرَيْش ، طَىْ ، هَوَازِنْ، اَهْلُ يَمَنْ ، ثَقِيْف، هُذَيْل، بَنِىْ تَمِيْم .
   অর্থাৎ, যেন রাসূল ﷺ বলেছেন যে, কুরআনে পাক আরবদের ৭ গোত্রের ৭টি ভাষায় নাজিল হয়েছে। গোত্রগুলো হচ্ছে— কুরাইশ, তাই, হাওয়াযেন, আহলে ইয়ামান, সাকীফ, হুজাইল, বনী তামীম।
২. আল্লামা ইবনে হিব্বানের মতে, سَبْعَةُ اَحْرُفٍ দ্বারা সাত ধরনের বিধান তথা ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, মোস্তাহাব, হালাল, হারাম, মাকরূহ ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে।
৩. কারো কারো মতে, سَبْعَةُ اَحْرُفٍ দ্বারা সাত কারীর নামে প্রচলিত সাত কেরাতকে বুঝানো হয়েছে।
৪. কারো কারো মতে, কুরআনের সাত প্রকার বিষয় বুঝানো হয়েছে। যেমন– আদেশ, নিষেধ, উপমা, উপদেশ, ঘটনাবলি, অঙ্গীকার ও ভীতি প্রদর্শন।
৫. কারো কারো মতে, সাত اَقَالِيْمْ বা মহাদেশ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, কুরআন গোটা বিশ্বের সাতটি মহাদেশের লোকদের জন্য নাজিল হয়েছে।
৬. অথবা, এখানে সাত অর্থ নির্দিষ্ট সংখ্যা নয়। কেননা, তৎকালীন আরবে 'সাত' সংখ্যাকে 'অনেক বেশি' অর্থ বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হতো।
৭. অথবা এর দ্বারা সাতটি قِرَاءَةْ مُتَوَاتِرَةْ উদ্দেশ্য।
৮. অথবা এর দ্বারা কুরআনের সকল শব্দ উদ্দেশ্য নয়; বরং اِخْتِلَافْ যুক্ত শব্দই উদ্দেশ্য। যেমন– وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ -এর اُفّ টি এটি সাত ভাবে পড়া যায়। যথা– اف ـ اف ـ اف ـ اف ـ افا ـ اف ـ اف
৯. অথবা সাতটি বিষয় উদ্দেশ্য, যেগুলো কুরআন শরীফে রয়েছে। যথা– اَمْرٌ ـ نَهْىٌ ـ قِصَصْ ـ اَمْثَالْ ـ وَعْدْ ـ وَعِيْد ـ وَعْظ
১০. কারো মতে অর্থ হলো– عَقَائِدْ ـ اَحْكَامْ ـ اَخْلَاقْ ـ قِصَصْ ـ اَمْثَالْ ـ وَعْدْ ـ وَعِيْدْ

مَعْنٰى قَوْلِهٖ لِكُلِّ اٰيَةٍ ظَهْرٌ وَ بَطْنٌ জাহ্‌র বাত্বনের অর্থ : নবী করীম ﷺ-এর বাণী– لِكُلِّ اٰيَةٍ مِنْهَا ظَهْرٌ وَ بَطْنٌ তথা কুরআন মজীদের প্রতিটি আয়াতের একটি বাহ্যিক দিক ও অপর একটি তাত্ত্বিক দিক রয়েছে। এ বাক্যের রহস্য উন্মোচনে হাদীস বিশারদগণ নিম্নোক্ত মতামতগুলো উপস্থাপন করেছেন :

১. ظَهْر দ্বারা কুরআনে কারীমের সাধারণ অর্থ এবং بَطْن দ্বারা তাফসীরকারদের বর্ণনাকৃত তত্ত্বের কথা বুঝানো হয়েছে।
২. অথবা, বাহ্যিক রূপ হলো তাফসীর এবং তাত্ত্বিক রূপ হলো যা মানুষ গবেষণার মাধ্যমেও উদঘাটন করতে অক্ষম, যার ক্ষেত্রে তাফসীরকারগণ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ বলেছেন।
৩. কতিপয় তাফসীরকারের মতে, ظَهْر এবং بَطْن দ্বারা এর অর্থকে বোঝানো হয়েছে।
৪. সাধারণ তাফসীরের দ্বারা যা উদঘাটন করা হয় তাই বাহ্যিক জ্ঞান, আর গভীর গবেষণার মাধ্যমে যা উদঘাটন করা হয়, তাই তাত্ত্বিক জ্ঞান।
৫. কেউ কেউ বলেন, যাহ্‌র দ্বারা ফিকহ শাস্ত্রীয় পরিভাষায় যে বিধান পাওয়া যায়, তা বুঝানো হয়েছে। আর বাতেন দ্বারা তাসাউফের পরিভাষায় যে তত্ত্ব লাভ করা যায়, তার কথা বুঝানো হয়েছে।

مَعْنٰى قَوْلِهٖ وَلِكُلِّ حَدٍّ مُطَّلَعٌ "প্রত্যেক সীমার জন্য অবগতির উৎস রয়েছে" এর অর্থ : পবিত্র কুরআন মাজীদের প্রতিটি আয়াতের যেরূপ একটি বাহ্যিক ও অন্তর্নিহিত রূপ রয়েছে, অদ্রূপ প্রত্যেক বাহ্যিক ও অন্তর্নিহিত রূপের জন্য একটি সীমা রয়েছে। আর প্রতিটি সীমার জন্য একটি অবগতির স্থল রয়েছে। সুতরাং এখানে বাহ্যিক সীমার অবগতির স্থল বলতে নাহু, সরফ, বালাগাত, শানে নুযূল, নাসেখ-মানসূখ ইত্যাদি সম্পর্কিত জ্ঞান বুঝানো হয়েছে। আর ঐ সকল হাদীসের জ্ঞান বুঝানো হয়েছে যা পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা স্বরূপ।

আর গোপনীয় বা অন্তর্নিহিত সীমার অবগতির স্থল বলতে আত্মিক চর্চা, মুজাহাদা, মুশাহাদা, বাহ্যিক আমল ও পাক-পবিত্র থাকা ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে, যার দ্বারা অন্তর্নিহিত সীমা বুঝা যাবে।

وَعَنْ ٢٢٢ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعِلْمُ ثَلٰثَةٌ اٰيَةٌ مُحْكَمَةٌ اَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ اَوْ فَرِيْضَةٌ عَادِلَةٌ وَمَا كَانَ سِوٰى ذٰلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ ـ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ وَابْنُ مَاجَةَ

২২২. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— ইলম তিন প্রকার- ১. আয়াতে মুহকামার ইলম, ২. সুন্নতে কায়েমা এবং ৩. ফরীযায়ে আদেলা। এর বাইরে যা রয়েছে তা অতিরিক্ত। -[আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ্]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : "আয়াতে মুহকামার ইলম" অর্থ- দ্ব্যর্থতাবিহীন স্পষ্টতর আল্লাহর আয়াতসমূহ, যেগুলো মানসূখ হয়নি এবং অর্থও সুস্পষ্ট। আর সুন্নতে কায়েমা বলতে প্রতিষ্ঠিত সুন্নত, যা রাসূল ﷺ-এর কথাবার্তা, কাজকর্ম ও সমর্থন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর فَرِيْضَةٌ عَادِلَةٌ বলতে যা সকল মুসলমান মিলে বা মুজতাহিদগণ ইজতিহাদের মাধ্যমে সাব্যস্ত করেছেন, তা অর্থাৎ ইজমা ও কিয়াসকে বুঝানো হয়েছে। এ তিনটি প্রকৃত ইলম। এগুলোর বহির্ভূত শাস্ত্রগুলো হলো বাড়তি ইলম।

وَعَنْ ٢٢٣ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْاَشْجَعِيِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَقُصُّ اِلَّا اَمِيْرٌ اَوْ مَاْمُوْرٌ اَوْ مُخْتَالٌ ـ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ ـ وَ رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ وَفِيْ رِوَايَتِهٖ اَوْ مُرَاءٍ بَدَلَ اَوْ مُخْتَالٍ ـ

২২৩. **অনুবাদ :** হযরত আউফ ইবনে মালেক আশজা'ঈ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— আমীর অথবা আমীরের আদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি অথবা অহংকারী ব্যতীত কেউ ওয়াজ-নসিহত করতে পারে না। -[আবূ দাউদ]

আর ইমাম দারেমী এ হাদীসটি আমর ইবনে শু'আইব হতে তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর পিতামহ হতে বর্ণনা করেছেন, অপর এক বর্ণনায় অহংকারীর স্থলে 'রিয়াকার' শব্দ রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْث হাদীসের ব্যাখ্যা : উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানদের আমীর দেশের শাসক হিসেবে জনগণের সম্মুখে বক্তৃতা প্রদান করতে পারেন। জনগণের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেওয়ার অধিকার তারই আছে। তিনি যদি অপারগ হন, তখন প্রতিনিধি প্রেরণ করবেন। এ ক্ষেত্রে প্রতিনিধির ভাষণ আমীরের ভাষণ বলে গণ্য হবে। আমীরের উচিত মানুষের দীন-দুনিয়ার কল্যাণের জন্য সদুপদেশ দেওয়া কিংবা এ জন্য তাঁর প্রতিনিধি প্রেরণ করা। আমীরের অনুমতি ছাড়া যে ব্যক্তি বক্তৃতা করবেন তিনি অহংকারী বা রিয়াকারী বলে গণ্য হবেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে তাওহীদ ও রিসালাতের প্রবর্তিত গুরু-দায়িত্ব সরকারের পক্ষ হতে পালন করা হতো। কিন্তু তাঁদের পরের আমীরগণ সেই যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন না। সুতরাং এই যুগে লোক দেখানোর উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে ইকামতে দীন ও আল্লাহর কালিমা উচ্চ করার জন্য যদি কেউ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে ওয়াজ-নসিহত করেন, তবে তিনি এই নিন্দার অন্তর্ভুক্ত হবেন না ; বরং দীনের খেদমত করেছেন বলে ছওয়াবের অধিকারী হবেন।

وَعَنْ ٢٢٤ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَفْتٰى بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ اِثْمُهٗ عَلٰى مَنْ اَفْتَاهُ وَمَنْ اَشَارَ عَلٰى اَخِيْهِ بِاَمْرٍ يَعْلَمُ اَنَّ الرُّشْدَ فِىْ غَيْرِهٖ فَقَدْ خَانَهٗ - رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ

২২৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— যাকে না জেনে না শুনে ফতোয়া দেওয়া হয়েছে [আর সে তদনুযায়ী আমল করেছে এর ফলে] তার গুনাহ ফতোয়া প্রদানকারীর উপর বর্তাবে এবং যে ব্যক্তি তার ভাইকে অর্থাৎ, অপরকে কাজের এমন পরামর্শ দিয়েছে যে সম্পর্কে সে জানে যে, প্রকৃত কল্যাণ তার অপর দিকেই রয়েছে, তবে সে নিশ্চয়ই তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। -[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْث হাদীসের ব্যাখ্যা : ফতোয়া দান করা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দীনি কাজ। এর সাথে ফতোয়াপ্রার্থী ও অন্যান্য ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট। তাই ফতোয়া দানকারীকে কোনো বিষয়ে নিশ্চিত হয়েই ফতোয়া দিতে হবে; এবং নির্ভুল ও সঠিক ফতোয়া প্রদান করতে হবে। অন্যথা ভুল ফতোয়ার কারণে ফতোয়া দানকারী গুনাহগার হবে। আর কাউকে পরামর্শদানের ক্ষেত্রেও আন্তরিক হতে হবে। যে বিষয়ে তার মঙ্গল নিহিত তাকে তাই পরামর্শ দিতে হবে। জেনে-শুনে কোনো ভুল পরামর্শ দান করা তার প্রতি খেয়ানত করারই নামান্তর।

وَعَنْ ٢٢٥ مُعَاوِيَةَ (رضـ) قَالَ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْاَغْلُوْطَاتِ - رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ

২২৫. অনুবাদ : হযরত মু'আবিয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী কথা বা বিভ্রান্তিকর গুজব ছড়াতে বিষেধ করেছেন। -[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْاَغْلُوْطَاتُ-এর অর্থ : اُغْلُوْطَاتُ শব্দটি বহুবচন; একবচনে اُغْلُوْطَةٌ -এর শাব্দিক অর্থ- বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা। অনেক সময় দেখা যায় যে, মুফতিকে বিভ্রান্তিতে ফেলার জন্য কেউ কেউ আলতু-ফালতু প্রশ্নের অবতারণা করে। একেই اُغْلُوْطَاتُ বলা হয়। এর দ্বারা জিজ্ঞাসিত ব্যক্তিকে বেকায়দায় ফেলে প্রশ্নকারী নিজের প্রাধান্য বিস্তার করার চেষ্টা করে। এগুলো শরিয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

وَعَنْ ٢٢٦ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَالْقُرْاٰنَ وَعَلِّمُوا النَّاسَ فَإِنِّىْ مَقْبُوْضٌ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

২২৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— তোমরা ইলমে ফারায়েয ও কুরআন শিক্ষা করে নাও এবং অপরকে শিক্ষা দিতে থাকো। কেননা [অচিরেই] আমাকে উঠিয়ে নেওয়া হবে। –[তিরমিযী]

وَعَنْ ٢٢٧ أَبِى الدَّرْدَاءِ (رضـ) قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَشَخَصَ بِبَصَرِهٖ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ هٰذَا أَوَانُ يُخْتَلَسُ فِيْهِ الْعِلْمُ مِنَ النَّاسِ حَتّٰى لَا يَقْدِرُوْا مِنْهُ عَلٰى شَيْءٍ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

২২৭. অনুবাদ : হযরত আবুদ দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে দৃষ্টি উঠালেন, তারপর বললেন–এটা এমন একটি সময়, যে সময় ইলমকে মানুষের মধ্য হতে ছোঁ মেরে উঠিয়ে নেওয়া হবে। এমনকি তারা তার কিছুই রাখতে সক্ষম হবে না। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** উপরিউক্ত হাদীসে ইলম দ্বারা ওহীকে বুঝানো হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যার ধারক বাহক ছিলেন। তাঁর মাধ্যমে রিসালাত ও নবুয়তের ক্রমধারা সমাপ্তি লাভ করেছে বিধায় তাঁর ইন্তেকালের পর পৃথিবীতে আর ওহী আগমন করবে না। এই হাদীসে রাসূল ﷺ-এর ইন্তেকাল অত্যাসন্ন হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَعَنْ ٢٢٨ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) رِوَايَةً يُوْشِكُ أَنْ يَضْرِبَ النَّاسُ أَكْبَادَ الْإِبِلِ يَطْلُبُوْنَ الْعِلْمَ فَلَا يَجِدُوْنَ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ الْمَدِيْنَةِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَفِىْ جَامِعِهٖ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ إِنَّهٗ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَمِثْلُهٗ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ إِسْحٰقُ بْنُ مُوْسٰى وَسَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ أَنَّهٗ قَالَ هُوَ الْعُمَرِىُّ الزَّاهِدُ وَاسْمُهٗ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ -

২২৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, এমন এক সময় সমাগত প্রায়, যখন জ্ঞানের অন্বেষণে উটের কলিজা বিদীর্ণ করে ফেলবে। [অর্থাৎ উটের পিঠে বসে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াবে।] কিন্তু কোথাও মদীনার আলিম অপেক্ষা বিজ্ঞ আলিম খুঁজে পাবে না। ইমাম তিরমিযী (র.) তাঁর জামে তিরমিযীতে বর্ণনা করেন [ইমাম মালেকের শিষ্য] সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেছেন— মদীনার সে আলিম হযরত ইমাম মালেক ইবনে আনাস (র.) এরূপ অভিমত প্রসিদ্ধ ইমামুল হাদীস আব্দুর রাযযাক (র.) হতেও বর্ণিত আছে। [তবে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার শিষ্য] ইসহাক ইবনে মূসা বলেছেন, আমি হযরত সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাকে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন, তিনি হলেন উমরী আয-যাহেদ তাঁর প্রকৃত নাম আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ব্যাখ্যা : অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ শেষ জমানার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যখন ইসলাম মদীনার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে, সে যুগে নির্ভরযোগ্য ও অভিজ্ঞ আলিমগণ মদীনাতে অবস্থান করবেন।

وَعَنْهُ ٢٢٩ قَالَ فِيْمَا اَعْلَمُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْعَثُ لِهٰذِهِ الْاُمَّةِ عَلٰى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُّجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا . رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ

২২৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে যা অবগত হয়েছি তা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মহান আল্লাহ এই উম্মতের জন্য প্রত্যেক শতাব্দী শেষে এমন এক ব্যক্তিকে পাঠান, যিনি তাদের দীনকে সংস্কার করেন। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْث হাদীসের ব্যাখ্যা : হাদীসে বর্ণিত عَلٰى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ অর্থাৎ, প্রত্যেক শতাব্দীর মাথায়। এখানে শতাব্দীর অর্থ শতাব্দীর শেষে। আর কারো মতে শতাব্দীর প্রথম উভয়ই হতে পারে; কিন্তু এ থেকে বুঝা যায় না যে, কোনো সময় শতাব্দীর মাথায় মধ্যভাগে কোনো মুজাদ্দিদের আগমন হতে পারে না।

উল্লেখ্য যে, عَجَائِبْ নামক গ্রন্থে ১ম শতাব্দী হতে ১৪তম শতাব্দি পর্যন্ত مُجَدِّدْ-দের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন–

১ম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হলেন– হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.)।

২য় শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হলেন– ইমাম শাফেয়ী (র.)।

৩য় শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হলেন– হযরত আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে শুরাইহ (র.)।

৪র্থ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হলেন– হযরত আবূ বকর খতীব বাকিল্লানী (র.)।

৫ম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হলেন– হুজ্জাতুল ইসলাম আবূ হামেদ গাযালী (র.)।

৬ষ্ঠ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হলেন– হযরত আবূ আব্দুল্লাহ ফখরুদ্দীন রাযী (র.)।

৭ম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হলেন– ইমাম ইবনু দাকীকিলঈদ (র.)।

৮ম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হলেন– ইমাম বুলকিনী ও হাফেয যাইনুদ্দীন (র.)।

৯ম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হলেন– ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.)।

১০ম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হলেন– ইমাম শামসুদ্দীন ইবনে শিহাব (র.)।

১১তম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হলেন– মুজাদ্দিদে আলফেছানী (র.) এবং ইবরাহীম ইবনে হাসান আল কারদী (র.)।

১২তম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হলেন– শায়খ ওলী উল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলভী ও সাইয়েদ মুরতাযা হাসান কারদী (র.)।

১৩তম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হলেন– সাইয়েদ আহমদ শহীদ বেরেলবী ও কাসেম নানূতবী (র.)।

১৪তম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হলেন– শায়খ রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (র.) ও আশরাফ আলী থানবী (র.)।

وَعَنْ ٢٣٠ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْعُذْرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَحْمِلُ هٰذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُوْلُهُ يَنْفُوْنَ عَنْهُ تَحْرِيْفَ الْغَالِيْنَ وَ انْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ وَتَاوِيْلَ الْجَاهِلِيْنَ . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِىْ كِتَابِ الْمَدْخَلِ مُرْسَلًا (مِنْ حَدِيْثِ بَقِيَّةَ بْنِ الْوَلِيْدِ عَنْ مَعَانِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْعُذْرِيِّ) وَسَنَذْكُرُ حَدِيْثَ جَابِرٍ فَاِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ فِىْ بَابِ التَّيَمُّمِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى

২৩০. অনুবাদ : তাবেয়ী হযরত ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান উযরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— প্রত্যেক পরবর্তী দলের ভালো লোকেরাই এই [কুরআন ও সুন্নাহর] ইলম অর্জন করবেন। যারা এটা হতে সীমালজ্ঘনকারীদের রদ-বদল, বাতিল পন্থীদের মিথ্যারোপ এবং মূর্খ লোকদের ভুল ব্যাখ্যাকে বিদূরিত করবেন।

বায়হাকী তাঁর মাদখাল নামক গ্রন্থে মুরসাল হিসেবে বাকিয়্যা ইবনুল ওয়ালীদ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি মুআন ইবনে রিফা'আ হতে, তিনি ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান উযরী হতে বর্ণনা করেছেন। আর হযরত জাবির (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীস "فَاِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ" আমি তায়াম্মুম সম্পর্কিত অধ্যায়ে বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহু তা'আলা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : تَحْرِيْفُ الْغَالِيْنَ 'তাহরীফ' অর্থ– বিকৃত করা, রদবদল করা, আকৃতি পরিবর্তন করা, আর غُلُوٌّ অর্থ– সীমালজ্ঘন করা। এখানে শরিয়তের সীমা হতে বের হয়ে যাওয়া এবং শরিয়তের সীমা লজ্ঘন করা উদ্দেশ্য, যা স্পষ্ট হারাম।

اِنْتِحَالُ الْمُبْطِلِيْنَ 'ইনতেহাল' এর আভিধানিক অর্থ– অন্যের কথা বিশেষত কোনো কবির কবিতার চরণকে নিজের বলে প্রচার করা। এখানে বাতিল পন্থীদের মিথ্যা আরোপ তথা সহীহ জ্ঞানকে হেয় প্রতিপন্ন করে ভ্রান্ত ও বাতিল জ্ঞানকে নিজের দিকে সংযোজন বা নিস্বত করা উদ্দেশ্য। এটাও অবৈধ কাজ।

تَاوِيْلُ الْجَاهِلِيْنَ নির্বোধ মূর্খ ব্যক্তিরা মাঝে মধ্যে কোনো কোনো কথা বলে বেড়ায় এবং এ সব জালিমেরা তা কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ আছে বলে প্রচারও করে থাকে। এখানে কুরআন ও হাদীসের অপ্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করাকে 'তাবীলুল জাহেলীন' বলা হয়েছে। এমনভাবে না জেনে না শুনে মনগড়াভাবে কুরআন হাদীসের অর্থ ও ব্যাখ্যা করা স্পষ্ট ভাবে হারাম এবং তা শক্ত গুনাহের কাজ। এইগুলোকে সংস্কার করার জন্য আল্লাহ যুগে যুগে সংস্কারক প্রেরণ করেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٣١ الْحَسَنِ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيِىَ بِهِ الْاِسْلَامَ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّيْنَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِى الْجَنَّةِ . رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

২৩১. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত হাসান বসরী (র.) মুরসাল সনদে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— যে ব্যক্তির মৃত্যু এসে পৌঁছেছে এমন অবস্থায়, যখন সে ইসলামকে জিন্দা করার উদ্দেশ্যে ইলম অন্বেষণে ব্যস্ত রয়েছে, জান্নাতে তার ও নবীগণের মধ্যে মাত্র একটি স্তরের পার্থক্য থাকবে [অর্থাৎ জান্নাতে সে নবীগণের মর্যাদার কাছাকাছি মর্যাদায় অবস্থান করবে।] –[দারেমী]

وَعَنْهُ ٢٣٢ مُرْسَلًا قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَا فِىْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اَحَدُهُمَا كَانَ عَالِمًا يُصَلِّى الْمَكْتُوْبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَالْاٰخَرُ يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ اَيُّهُمَا اَفْضَلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَضْلُ هٰذَا الْعَالِمِ الَّذِىْ يُصَلِّى الْمَكْتُوْبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ عَلَى الْعَابِدِ الَّذِىْ يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ كَفَضْلِىْ عَلٰى اَدْنَاكُمْ - رَوَاهُ الدَّارِمِىُّ

২৩২. অনুবাদ : [উক্ত] হযরত হাসান বসরী (র.) হতে মুরসাল সনদে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বনী ইসরাঈলের দু'জন লোকের মর্যাদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তাঁদের একজন ছিলেন আলিম, তিনি কেবল ফরজ নামাজ আদায় করতেন, অতঃপর বসে যেতেন এবং লোকদের কণল্যাণের কথা (অর্থাৎ, দীনি ইলম শিক্ষা দিতেন। আর অপর ব্যক্তি ছিলেন [ইবাদতগুজার] যিনি দিনে রোজা রাখতেন এবং রাতে নামাজ পড়ে কাটাতেন– তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠকে? রাসূলুল্লাহ ﷺ জবাবে বললেন– এই আলিম যিনি শুধু ফরজ নামাজ আদায় করেন অতঃপর বসে যান এবং লোকদেরকে কল্যাণের কথা [দীনি ইলম] শিক্ষা দেন, তাঁর মর্যাদা ঐ ইবাদতগুজার ব্যক্তির উপর যিনি দিনভর রোজা রাখেন এবং রাতভর নামাজ পড়েন, তার মর্যাদা ততটুকু যেমন আমার মর্যাদা তোমাদের একজন সাধারণ লোকের উপর। –[দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে মহানবী ﷺ একজন ইলমবিহীন ইবাদতগুজার ব্যক্তির তুলনায় একজন আলিমের মর্যাদা ও কদর কত বেশি তাই বর্ণনা করেছেন। রাসূল ﷺ-এর মর্যাদা একজন সাধারণ মানুষের সাথে কোনোক্রমেই হতে পারে না। উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। এমনিভাবে একজন ইবাদতগুজার ব্যক্তি ও আলিমের মর্যাদার ব্যবধানও অনেক বেশি।

وَعَنْ ٢٣٣ عَلِيٍّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نِعْمَ الرَّجُلُ الْفَقِيْهُ فِى الدِّيْنِ اِنِ احْتِيْجَ اِلَيْهِ نَفَعَ وَاِنِ اسْتُغْنِىَ عَنْهُ اَغْنٰى نَفْسَهٗ - رَوَاهُ رَزِيْنٌ

২৩৩. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, দীন সম্পর্কে প্রাজ্ঞ লোক কতই না উত্তম ব্যক্তি। যদি তার প্রতি কোনো লোক মুখাপেক্ষী হয়। তবে তিনি তাদের উপকার করেন। আর যদি তার প্রতি অমুখাপেক্ষিতা দেখানো হয় তবে তিনি নিজেকে অমুখাপেক্ষী করে রাখেন। –[রাযীন]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে মহানবী ﷺ আলিমের দু'টি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। প্রথমত মানুষের প্রয়োজনে নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা মানুষের উপকার করা। এতে কার্পণ্য না করা। দ্বিতীয়ত কেউ তার দ্বারস্থ না হলে ক্ষোভে ফেটে না পড়া বা কেউ তার পরামর্শ নিল না বলে তার সাথে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ না করা। অথচ আজকাল এর বিপরীতই দেখা যায়। এরূপ করা কখনো উচিত নয় ; বরং হাদীসানুযায়ীই আলেমের চরিত্র হওয়া উচিত।

وَعَنْ ٢٣٤ عِكْرِمَةَ (رحـ) اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ حَدِّثِ النَّاسَ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَاِنْ اَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ فَاِنْ اَكْثَرْتَ فَثَلٰثَ مَرَّاتٍ وَلَا تُمِلَّ النَّاسَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ وَلَا اُلْفِيَنَّكَ تَاْتِي الْقَوْمَ وَهُمْ فِيْ حَدِيْثٍ مِّنْ حَدِيْثِهِمْ فَتَقُصُّ عَلَيْهِمْ فَتَقْطَعُ عَلَيْهِمْ حَدِيْثَهُمْ فَتُمِلُّهُمْ وَلٰكِنْ اَنْصِتْ فَاِذَا اَمَرُوْكَ فَحَدِّثْهُمْ وَهُمْ يَشْتَهُوْنَهُ وَانْظُرِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ فَاِنِّيْ عَهِدْتُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابَهُ وَلَا يَفْعَلُوْنَ ذٰلِكَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২৩৪. **অনুবাদ :** তাবেয়ী হযরত ইকরিমা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) [আমাকে] বললেন, [হে ইকরিমা!] প্রত্যেক জুমাবারে [সপ্তাহে] মাত্র একবার লোকদেরকে [ওয়াজ-নসিহত] হাদীস বর্ণনা করবে। যদি [সপ্তাহে মাত্র একবার নসিহতকে] অপর্যাপ্ত মনে কর তবে দু'বার; আর যদি এর চেয়েও বেশি করতে চাও, তবে তিনবার করবে। এই কুরআনকে তুমি মানুষের নিকট বিরক্তিকর করে তুলবে না। আর আমি যেন তোমাকে এমন অবস্থায় না পাই যে, তুমি কোনো সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছবে; অথচ তারা নিজেদের কোনো আলোচনায় ব্যস্ত থাকবে, আর তাদের আলোচনাকে ভঙ্গ করে দিয়ে তুমি তাদের নিকট ওয়াজ আরম্ভ করে দেবে এবং তাদের মাঝে বিরক্তি উৎপাদন করবে ; বরং এই সময় তুমি চুপ করে থাকবে। আর যখন তারা তোমাকে অনুরোধ করবে তখন ওয়াজ করবে, যতক্ষণ তারা তার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করবে। আর দোয়ায় মন্ত্রোপম বাক্যে দোয়া করা থেকে বিরত থাকার প্রতি সদা সর্তক দৃষ্টি রাখবে এবং তা হতে দূরে থাকবে। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীদের সম্পর্কে জানি, তারা এরূপ করতেন না। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) নসিহতের নিয়ম-নীতি কিরূপ হওয়া উচিত, তা অতি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। এতে মোট পাঁচটি শিক্ষণীয় নিয়ম-নীতি বেরিয়ে আসে, তা হলো—

১. সপ্তাহে মাত্র একবার ওয়াজ করাই উত্তম। প্রয়োজন হলে দু'বার বা তিনবার। রোজ ওয়াজ করা উচিত নয়।
২. কুরআন-হাদীসকে লোকের সম্মুখে এমনভাবে উপস্থাপন করা উচিত নয়; যাতে লোকজন বিরক্তি বোধ করে।
৩. কোনো জনসমাগমে তাদের আলোচনার মধ্যে কিছু বলা ঠিক নয়, তখন ভালো কথা বললেও মানুষ বিরক্তি বোধ করতে পারে।
৪. মানুষের আগ্রহ ও অনুরোধেই ওয়াজ-নসিহত করা উচিত এবং শ্রোতার ধৈর্যচ্যুতির পূর্বেই বক্তৃতা বন্ধ করা উচিত। সুতরাং শ্রোতার মন-মানসিকতার দিকে বক্তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে।
৫. ভাবাবেগে কথা বলা, মন্ত্রের মতো গদ আওড়িয়ে দোয়া করা, একই কথা পুনরুক্তি করা, কথায় কথায় ছড়া কাটা, দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহার করা এবং অতিরিক্ত উপমা অলংকার ব্যবহার করা উচিত নয়। কেননা, এতে বক্তৃতার ভাবমূর্তি ও গাম্ভীর্য নষ্ট হয়ে যায়।

سَبَبُ مَنْعِ الدُّعَاءِ بِالسَّجْعِ **গদ আওড়িয়ে দোয়া করতে নিষেধ করার কারণ :** উপরে উক্ত হাদীসে اَلسَّجْعُ বা গদ দ্বারা উদ্দেশ্য গণক, কবিরাজ, গায়ক, কাওয়াল প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের ন্যায় কৃত্রিম গদ আওড়িয়ে দোয়া করা; এটা ইসলামের দৃষ্টিতে অপছন্দনীয়। কিন্তু কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত অনুপ্রাসময় বাক্য দ্বারা দোয়া করা দূষণীয় নয়।

وَعَنْ ٢٣٥ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ فَاَدْرَكَهُ كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنَ الْاَجْرِ فَاِنْ لَّمْ يُدْرِكْهُ كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِّنَ الْاَجْرِ . رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

২৩৫. **অনুবাদ :** হযরত ওয়াসেলা ইবনে আসকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণ করে তা অর্জন করতে সক্ষম হয়; তার জন্য দ্বিগুণ ছওয়াব রয়েছে। আর যদি তা অর্জন করতে না পারে তবে তার জন্য একগুণ ছওয়াব রয়েছে। –[দারেমী]

وَعَنْ ٢٣٦ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهٖ وَحَسَنَاتِهٖ بَعْدَ مَوْتِهٖ عِلْمًا عَلِمَهٗ وَنَشَرَهٗ وَ وَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهٗ اَوْ مُصْحَفًا وَّرَّثَهٗ اَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ اَوْ بَيْتًا لِاِبْنِ السَّبِيْلِ بَنَاهُ اَوْ نَهْرًا اَجْرَاهُ اَوْ صَدَقَةً اَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهٖ فِىْ صِحَّتِهٖ وَحَيٰوتِهٖ تَلْحَقُهٗ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهٖ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ .

২৩৬. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— মু'মিন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার আমল ও নেক কাজসমূহের মধ্যে যেগুলোর ছওয়াব তার নিকট সর্বদা পৌঁছতে থাকবে সেগুলো হলো– ১. ইলম, যা সে শিক্ষা করেছে এবং বিস্তার করেছে; ২. সৎ সন্তান, যাকে রেখে গেছে; ৩. অথবা কুরআন শরীফ, যা মিরাস স্বরূপ রেখে গেছে; ৪. অথবা মসজিদ, যা সে নির্মাণ করে গেছে; ৫. অথবা সরাইখানা, যা সে পথিক বা মুসাফিরদের জন্য রেখে গেছে, ৬. অথবা খাল-নালা, যা সে [মানুষের পানির কষ্ট লাঘবের জন্য] খনন করে গেছে, ৭. অথবা সদকা, যা সে সুস্থ ও জীবিত থাকাকালে তার ধন-সম্পদ হতে দান করে গেছে। এই সবগুলোর ছওয়াব তার মৃত্যুর পর তার নিকট পৌঁছতে থাকবে।–[ইবনে মাজাহ্; আরও বায়হাকী হাদীসটি শু'আবুল ঈমান গ্রন্থে সংকলন করেছেন।]

وَعَنْ ٢٣٧ عَائِشَةَ (رض) اَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اَوْحٰى اِلَىَّ اَنَّهٗ مَنْ سَلَكَ مَسْلَكًا فِىْ طَلَبِ الْعِلْمِ سَهَّلْتُ لَهٗ طَرِيْقَ الْجَنَّةِ وَمَنْ سَلَبْتُ كَرِيْمَتَيْهِ اَثَبْتُهٗ عَلَيْهِمَا الْجَنَّةَ وَفَضْلٌ فِىْ عِلْمٍ خَيْرٌ مِّنْ فَضْلٍ فِىْ عِبَادَةٍ وَّمِلَاكُ الدِّيْنِ الْوَرَعُ . رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ

২৩৭. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমার নিকট মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ওহী পাঠিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের কোনো পথ অবলম্বন করে আমি তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেই। আর আমি যে ব্যক্তির দু'চক্ষু ছিনিয়ে নেই, তাকে তার বিনিময়ে আমি জান্নাত দান করব। বস্তুত ইবাদত অধিক হওয়ার চেয়ে দীনি ইলম অধিক হওয়া শ্রেয়। আর দীনের মূল হচ্ছে সন্দেহ-সংশয় হতে বেঁচে থাকা। –[বায়হাকী শু'আবুল ঈমান গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْفَرْقُ بَيْنَ الْحَدِيْثِ النَّبَوِىِّ وَالْحَدِيْثِ الْقُدْسِىِّ হাদীসে নববী ও হাদীসে কুদসীর মধ্যে পার্থক্য : হাদীসে কুদ্সী এবং হাদীসে নববীর মধ্যে পার্থক্যের দিকগুলো হচ্ছে যথাক্রমে—

১. وَحْى غَيْر مَتْلُو -এর মাধ্যমে রাসূল ﷺ-এর পবিত্র মুখে তাঁরই নিজস্ব ভাষায় সুস্পষ্ট ভাবে আল্লাহ তা'আল্লার বাণী হিসাবে যা প্রকাশিত হয়েছে, তাকে বলা হয় হাদীসে কুদ্সী।

পক্ষান্তরে যে সকল বাণী وَحْى غَيْر مَتْلُو -এর মাধ্যমে রাসূল ﷺ-এর নিজস্ব ভাষায় রাসূল ﷺ -এর বাণী হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে, তাকে বলা হয় হাদীসে নববী।

২. যে হাদীসের মর্ম আল্লাহর, কিন্তু ভাষা রাসূল ﷺ-এর, তাকে হাদীসে কুদসী বলে। আর যে হাদীসের মর্ম ও ভাষা উভয়ই রাসূল ﷺ-এর, তাকে হাদীসে নববী বলে।

৩. হাদীসে কুদসীর সূচনা হয় قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى বা এ জাতীয় বাক্য দ্বারা। আর হাদীসে নববীর সূচনা হয় قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ বা এ জাতীয় বাক্য দ্বারা।

৪. হাদীসে কুদসী আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বর্ণিত বলে সুস্পষ্ট ঘোষণা থাকে, কিন্তু হাদীসে নববী রাসূল ﷺ-এর বাণী হিসাবে বর্ণিত হয়।

৫. হাদীসে কুদসী-এর সংখ্যা একশত বা তার চেয়ে কিছু বেশি, আর হাদীসে নববীর সংখ্যা অসংখ্য, অগণিত।

فَضْلٌ فِىْ عِلْمٍ خَيْرٌ مِنْ فَضْلٍ فِىْ عِبَادَةٍ দ্বারা উদ্দেশ্য : রাসূলে কারীম ﷺ-এর বাণী– فَضْلٌ فِىْ عِلْمٍ خَيْرٌ مِنْ فَضْلٍ فِىْ عِبَادَةٍ -এর তাৎপর্য বর্ণনায় مُحَدِّثِيْنِ كِرَامْ নিম্নোক্ত আলোচনা প্রদান করেন।

আলোচ্য হাদীসে বলা হয়েছে, ইবাদত অধিক হওয়ার চেয়ে দীনি ইলম অধিক হওয়া শ্রেয়। অর্থাৎ, ইলমের সহকারে অল্প আমল, ইলমবিহীন অধিক ইবাদতের চেয়ে উত্তম। এ সম্পর্কে কুরআনের অমীয় বাণী–

هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ·

অর্থাৎ, যারা দীনি ইলমের জ্ঞান রাখে আর যাদের দীনি ইলম সম্পর্কে জ্ঞান নেই তারা কি উভয়েই সমান ? এ মর্মে মহানবী ﷺ বলেছেন– فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِىْ عَلٰى اَدْنَاكُمْ অর্থাৎ, একজন মূর্খ ইবাদতকারীর উপর একজন আলিমের মর্যাদা সেরূপ, যেমন– একজন সাধারণ মানুষের উপর আমার মর্যাদা।

এছাড়া শরিয়তের বিধি-বিধান জানা থাকলে ইবাদতের মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি হওয়ার সম্ভাবনা কম এবং অধিক ছওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়। তাই মহানবী ﷺ বলেছেন– فَضْلٌ فِىْ عِلْمٍ خَيْرٌ مِنْ فَضْلٍ فِىْ عِبَادَةٍ

مِلَاكُ الدِّيْنِ اَلْوَرْعُ -এর মর্মার্থ : হাদীসে উল্লিখিত বাণী বিশ্লেষণের পূর্বে مِلَاكٌ ও اَلْوَرْعُ শব্দের অর্থ আলোচনা করা হলো—

■ **مِلَاكٌ-এর অর্থ : مِلَاكٌ** -এর মীম যের, যবর উভয় হরকত সহকারে পড়া যায়। এর অর্থ হলো—

১. স্থায়িত্বের অবলম্বন, মৌল উৎস।

২. মিরকাত প্রণেতার মতে, এর অর্থ এমন বিষয়, যার উপর কোনো কিছু স্থাপিত হয়।

৩. ইমাম তীবী (র.)-এর মতে, যার দ্বারা আহকামের দৃঢ়তা অবলম্বিত হয়, তা-ই مِلَاكٌ

■ **اَلْوَرْعُ-এর অর্থ : اَلْوَرْعُ** শব্দের অর্থ– আল্লাহভীতি, পরহেজগারি অথবা এর অর্থ– হারাম বা সন্দেহযুক্ত বস্তু থেকে বেঁচে থাকা। সুতরাং এর পুরো অর্থ দাঁড়াবে, "ইসলামের মৌল উৎস হলো– আল্লাহ ভীতি"।

উদ্ধৃত বাণীটির তাৎপর্য হলো, গুনাহ তো দূরের কথা, যে কাজে সামান্যতম গুনাহের সন্দেহ আছে, তা হতেও আমাদের বেঁচে থাকতে হবে।

মূলত সন্দেহজনক কোনো কাজই কোনো ব্যক্তির জীবনে কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। তাই শরিয়তের বিধান হচ্ছে, সন্দেহজনক কাজ বর্জন করা। তাই নবী করীম ﷺ বলেছেন— সন্দেহ হতে মুক্ত থাকাই দীনের মূল কথা। অন্যত্র রাসূল ﷺ বলেছেন– دَعْ مَا يُرِيْبُكَ اِلٰى مَا لَا يُرِيْبُكَ

অথবা, وَمِلَاكُ الدِّيْنِ الْوَرْعُ-এর অর্থ সত্যিকারের তাকওয়া বা খোদাভীতিই দীনের মূল বিষয়। যার মধ্যে তাকওয়া নেই, তার মধ্যে দীনের মূল বিষয় নেই। এজন্য আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করতে হলে ব্যক্তিকে শিরক ও পাপমুক্ত হয়ে তাকওয়া অর্জন করতে হবে। তাই কুরআন মজীদে তাকওয়া অর্জনকারীকে মর্যাদাবান ও সফলকাম বলা হয়েছে। যেমন– এক আয়াতে বলা হয়েছে, اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ অপর এক স্থানে বলা হয়েছে– اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا

وَعَنْ ٢٣٨ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِّنْ اِحْيَائِهَا ـ رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

২৩৮. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাতে কিছু সময় [দীনি] ইলম সম্পর্কে আলোচনা করা সারা রাত জেগে ও ইবাদত বন্দেগী করা হতে উত্তম। –[দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

سَبَبُ اَهَمِّيَّةِ الْعِلْمِ عَلَى الْعِبَادَةِ **ইবাদতের উপর ইলমের গুরুত্বের কারণ** : ইলমে দীন শিক্ষা করার ফজিলত ইবাদতের তুলনায় অধিক ও গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার বিভিন্ন কারণ রয়েছে। যেমন–

১. ইবাদতের উপকারিতা একান্ত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট, আর ইলমের উপকারিতা সার্বজনীন।
২. আমলের জন্য ইলম পূর্বশর্ত, তাই স্বাভাবিকভাবে ইলম আমলের উপর অগ্রগণ্য। কেননা, ইলম ব্যতীত আমল বিশুদ্ধ হতে পারে না।
৩. ইলমের প্রভাব ও কার্যকারিতা দীর্ঘস্থায়ী, পক্ষান্তরে আমলের প্রভাব ক্ষণস্থায়ী।
৪. ইলম ব্যতীত শয়তানের কু-মন্ত্রণা হতে বেঁচে থাকা কঠিন। ইলমবিহীন আবেদ সহজেই শয়তানের খপ্পরে পড়ে যেতে পারে।

وَعَنْ ٢٣٩ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِمَجْلِسَيْنِ فِىْ مَسْجِدِهٖ فَقَالَ كِلَاهُمَا عَلٰى خَيْرٍ وَ اَحَدُهُمَا اَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهٖ اَمَّا هٰؤُلَاءِ فَيَدْعُوْنَ اللّٰهَ وَيَرْغَبُوْنَ اِلَيْهِ فَاِنْ شَاءَ اَعْطَاهُمْ وَاِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ وَاَمَّا هٰؤُلَاءِ فَيَتَعَلَّمُوْنَ الْفِقْهَ اَوِ الْعِلْمَ وَيُعَلِّمُوْنَ الْجَاهِلَ فَهُمْ اَفْضَلُ وَاِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا ثُمَّ جَلَسَ فِيْهِمْ ـ رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

২৩৯. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ একবার মসজিদে নববীর দু'টি মজলিসের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তখন তিনি বললেন, উভয় মজলিসই ভালো কাজে নিয়োজিত আছে। তবে একটি অপরটি অপেক্ষা উত্তম। এ মজলিসের লোকগুলো আল্লাহ তা'আলাকে ডাকছে এবং তাঁর নিকট ঐকান্তিক আগ্রহ প্রকাশ করছে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে দানও করতে পারেন, আর ইচ্ছা করলে বঞ্চিতও করতে পারেন। আর এ মজলিসের লোকগুলো ফিক্‌হ ও ইলম শিক্ষা করছে এবং মূর্খদেরকে ইলম শিক্ষা দিচ্ছে। এরাই হচ্ছে সর্বোত্তম। আমিও একজন শিক্ষক হিসেবেই প্রেরিত হয়েছি। এ বলে তিনি এ দলের মধ্যেই বসে পড়লেন। –[দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا **-এর অর্থ** : দীনী ইল্‌ম শিক্ষা করা সর্বোত্তম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ। এ কাজে আত্মোৎসর্গিত ছিলেন স্বয়ং নবী-রাসূলগণ। রাসূল ﷺ বলেছেন– اِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا অর্থাৎ, আমি একজন শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছি।

মূলত নবী করীম ﷺ বিশ্ববাসীর জন্য শিক্ষকরূপেই যাবতীয় অনাচার, ব্যভিচার, পাপাচার, অশ্লীলতা ও অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে সকলের মাঝে দীনী অনুভূতি সৃষ্টি করাই ছিল তাঁর আগমনের মূল উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ

হযরত ﷺ অন্ধকার যুগের মানুষদেরকে সত্য সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন। রাসূল ﷺ-এর শিক্ষক হওয়া শুধু তাঁর যুগের জন্য নয়; বরং কেয়ামত পর্যন্ত তিনি শিক্ষকরূপেই চির স্মরণীয় থাকবেন। তাই তিনি বলেছেন– اِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا

وَعَنْ ٢٤٠ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رضـ) قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاحَدُّ الْعِلْمِ الَّذِىْ اِذَا بَلَغَهُ الرَّجُلُ كَانَ فَقِيْهًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَفِظَ عَلٰى اُمَّتِىْ اَرْبَعِيْنَ حَدِيْثًا فِىْ اَمْرِ دِيْنِهَا بَعَثَهُ اللّٰهُ فَقِيْهًا وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ شَافِعًا وَشَهِيْدًا رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ وَقَالَ قَالَ الْاِمَامُ اَحْمَدُ هٰذَا مَتْنٌ مَشْهُوْرٌ فِيْمَا بَيْنَ النَّاسِ وَلَيْسَ لَهُ اِسْنَادٌ صَحِيْحٌ ـ

২৪০. অনুবাদ : হযরত আবুদ দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ! ইলমের কোন সীমায় পৌঁছলে কোনো ব্যক্তি ফকীহ [বিজ্ঞ আলিম] হিসেবে পরিগণিত হবে? জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি আমার উম্মতের উপকারার্থে তাদের দীনের ব্যাপারে চল্লিশটি হাদীস ধারণ বা সংরক্ষণ করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে ফকীহরূপে উঠাবেন এবং কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশকারী ও সাক্ষী হব। [ইমাম বায়হাকী তার শুআবুল ঈমান গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করছেন এবং তিনি বলেছেন যে, ইমাম আহমদ এ হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, এ হাদীসটির বক্তব্য মানুষের কাছে প্রসিদ্ধ, কিন্তু এর কোনো সহীহ সনদ নেই।] [উল্লেখ্য যে, ইমাম নববী বলেন, হাদীসটি যঈফ বটে, তবে তার বিভিন্ন সনদ থাকায় অনেকটা শক্তি অর্জন করেছে।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَعْنَى الْحِفْظ মুখস্থ করার অর্থ : উক্ত হাদীসে মহানবী ﷺ مَنْ حَفِظَ "যে ব্যক্তি ধারণ করে শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এটা দ্বারা স্মরণ রাখা বা মুখস্থ করা বুঝানো হয়নি, বরং এর অর্থ হলো উম্মতের উপকার পৌঁছানোর জন্য চল্লিশটি হাদীসকে সংরক্ষণ করে, উম্মতের নিকট তা পৌঁছে দেয়। উক্ত হাদীসসমূহ মুখস্থ থাকুক বা লেখা থাকুক বা ছাপানো থাকুক।

وَعَنْ ٢٤١ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ تَدْرُوْنَ مَنْ اَجْوَدُ جُوْدًا قَالُوْا اَللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ اَللّٰهُ تَعَالٰى اَجْوَدُ جُوْدًا ثُمَّ اَنَا اَجْوَدُ بَنِىْ اٰدَمَ وَ اَجْوَدُهُمْ مِنْ بَعْدِىْ رَجُلٌ عَلِمَ عِلْمًا فَنَشَرَهُ يَاْتِىْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَمِيْرًا وَحْدَهُ اَوْ قَالَ اُمَّةً وَاحِدَةً ـ

২৪১. অনুবাদ : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– তোমরা কি বলতে পার দানের দিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা বড় দাতা কে ? সাহাবীগণ জবাব দিলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, দানের দিক দিয়ে আল্লাহই সব চেয়ে বড় দাতা। এরপর আদম সন্তানদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে বড় দাতা। আর আমার পরে বড় দাতা সেই ব্যক্তি, যে ইলম শিক্ষা করে এবং তা বিস্তার করে। কিয়ামতের দিন সে একাই একজন আমীর হিসাবে উত্থিত হবে। অথবা রাবী এরূপ বলেছেন যে, সে একাই একটি উম্মত হয়ে [অতি মর্যাদার সাথে] উঠবে। –[বায়হাকী, শুআবুল ঈমান]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَللّٰهُ اَجْوَدُ جُوْدًا -এর মর্মার্থ : আল্লাহ তা'আলা সবচেয়ে বড় দাতা। তাঁর দান অসীম। তিনি মহা অনুগ্রহে আমাদেরকে মানবরূপে সৃষ্টি করে সৃষ্টির সেরা জাতিতে অধিষ্ঠিত করেছেন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আলো-বাতাস, খাবার-পানীয় সব কিছুর ব্যবস্থা তিনি করেন। তাঁর সীমাহীন দয়ায়ই আমরা বেঁচে আছি। তাঁর দানের কথা কেউই লেখে বা বলে শেষ করতে পারবে না।

ثُمَّ اَنَا اَجْوَدُ بَنِىْ اٰدَمَ -এর মর্মার্থ : আলোচ্য হাদীসে মহানবী ﷺ নিজেকে আল্লাহ তা'আলার পর সবচেয়ে বড় দাতা হিসেবে পরিচয় প্রদান করেছেন। এটা তাঁর অহংকার নয়; বরং বাস্তবতা এবং বিশ্ববাসীর জন্য গৌরবের ব্যাপার। কেননা, যাকে সৃষ্টি করা না হলে আসমান-জমিন কিছুই সৃষ্টি করা হতো না। তাঁকে কেন্দ্র করেই দুনিয়ার সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই সৃষ্টির সূচনাতেই যাঁর অপার অনুগ্রহ রয়েছে তিনিই বনী আদমের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দানশীল ব্যক্তি।

وَعَنْهُ ٢٤٢ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْهُوْمَانِ لَا يَشْبَعَانِ مَنْهُوْمٌ فِي الْعِلْمِ لَا يَشْبَعُ مِنْهُ وَمَنْهُوْمٌ فِي الدُّنْيَا لَا يَشْبَعُ مِنْهَا ـ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْاَحَادِيْثَ الثَّلٰثَةَ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ وَقَالَ قَالَ الْاِمَامُ اَحْمَدُ فِيْ حَدِيْثِ اَبِي الدَّرْدَاءِ هٰذَا مَتْنٌ مَشْهُوْرٌ فِيْمَا بَيْنَ النَّاسِ وَلَيْسَ لَهُ اِسْنَادٌ صَحِيْحٌ ـ

২৪২. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন— দুই লোভী [পিপাসু] ব্যক্তি কখনো পরিতৃপ্তি লাভ করে না। ইলমের পিপাসু কখনো ইলম থেকে সে পরিতৃপ্তি লাভ করে না। দুনিয়া লোভী, দুনিয়াদারীতে তার কখনো পেট ভরে না [তৃপ্ত হয় না]। –[বায়হাকী–শুআবুল ঈমান]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَنْهُوْمٌ فِي الْعِلْمِ -এর মর্মার্থ : জ্ঞান পিপাসা উত্তম চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ। জ্ঞান সমুদ্রের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। জ্ঞান যতই লাভ করা হয় ততই জ্ঞান লাভের ইচ্ছা বৃদ্ধি পেতে থাকে। পার্থিব জগতে সংকীর্ণ হায়াতে বিশ্ব প্রকৃতি ও আল্লাহ সম্পর্কে এত অল্প সময়ে কিছুই জানা যায় না। ফলে জ্ঞানের সাধক অতৃপ্ত থেকে পৃথিবী হতে বিদায় নেয়। এ কারণেই ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন— كُلَّمَا زَادَنِيْ عِلْمًا زَادَنِيْ جَهْلًا বস্তুত ইলমের কোনো সীমারেখা নেই। এ জন্যই বলা হয়— فَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ

وَعَنْ ٢٤٣ عَوْنٍ (رحـ) قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ (رضـ) مَنْهُوْمَانِ لَا يَشْبَعَانِ صَاحِبُ الْعِلْمِ وَصَاحِبُ الدُّنْيَا وَلَا يَسْتَوِيَانِ اَمَّا صَاحِبُ الْعِلْمِ فَيَزْدَادُ رِضًى لِلرَّحْمٰنِ وَاَمَّا صَاحِبُ الدُّنْيَا فَيَتَمَادٰى فِي الطُّغْيَانِ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللّٰهِ كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى قَالَ وَقَالَ لِلْاٰخَرِ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ـ رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

২৪৩. **অনুবাদ :** তাবেয়ী হযরত আওন (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ইরশাদ করেন— দুই লোভী ব্যক্তি কখনো পরিতৃপ্ত হয় না। ইলমের সাধক ও দুনিয়াদার। কিন্তু তারা উভয়ই সমান নয়। ইলমের সাধক আল্লাহর সন্তুষ্টিকে [উত্তরোত্তর] বৃদ্ধি করেন, আর দুনিয়াদার [উত্তরোত্তর] আল্লাহর অবাধ্যতার পথে অগ্রসর হতে থাকে। এরপর আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [এ আয়াত] পাঠ করলেন যে, "كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى" অর্থাৎ, কস্মিনকালেও না। মানুষ নিজেকে [ধনে-জনে] নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ দেখে বলে অবাধ্যতা করতে থাকে। [সূরা আলাক, আয়াত : ৬] রাবী হযরত আওন বলেন, হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) অপর ব্যক্তি সম্পর্কে এ আয়াত পাঠ করলেন, اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে আলিমরাই আল্লাহকে ভয় করেন। –[সূরা ফাতির, আয়াত : ২৮] –[দারেমী]

وَعَنْ ٢٤٤ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ أُنَاسًا مِنْ أُمَّتِيْ سَيَتَفَقَّهُوْنَ فِي الدِّيْنِ وَيَقْرَءُوْنَ الْقُرْاٰنَ يَقُوْلُوْنَ نَأْتِي الْأُمَرَاءَ فَنُصِيْبُ مِنْ دُنْيَاهُمْ وَنَعْتَزِلُهُمْ بِدِيْنِنَا وَلَا يَكُوْنُ ذٰلِكَ كَمَا لَا يُجْتَنٰى مِنَ الْقَتَادِ إِلَّا الشَّوْكُ كَذٰلِكَ لَا يُجْتَنٰى مِنْ قُرْبِهِمْ إِلَّا .... قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ كَأَنَّهُ يَعْنِي الْخَطَايَا . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

২৪৪. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক দীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে এবং কুরআন পাঠ করবে, আর বলবে আমরা শাসকদের নিকট যাব এবং তাদের দুনিয়াদারী হতে নিজের অংশ গ্রহণ করব এবং আমাদের দীনদারী নিয়ে সরে পড়ব। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হওয়ার নয়। যেমন– কাঁটাযুক্ত গাছ হতে কাঁটা ছাড়া অন্য কোনো ফল লাভ করা যায় না, তেমনিভাবে তাদের নিকট থেকেও কোনো ফল লাভ করা যায় না; কিন্তু ......।

[অধঃস্তন রাবী] মুহাম্মদ ইবনে সাব্বাহ (র.) বলেন, মনে হয় রাসূলুল্লাহ ﷺ 'কিন্তু' শব্দ দ্বারা গুনাহের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। [অর্থাৎ আমীরদের নৈকট্য হতে পাপ ব্যতীত কিছুই পাওয়া যাবে না।] –[ইবনে মাজাহ্]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলিমগণের দীনি ইলম অর্জন করে দুনিয়াদার আমীর-ওমারার নিকট গমন করা অনুচিত। কেননা, তারা ঘোর দুনিয়াদার। তাদের কাছে যাওয়ার পর নিজের দীনকে সহীহ সালামতে নিয়ে আসার কল্পনা করা তেমন বাতুলতা, যেমন কামারের ঘরে বসে ধোঁয়ার আঁচ না লাগার কল্পনা করা। উপরন্তু তাদের নিকট হতে দুনিয়ার পার্থিব স্বার্থ হাসিল করার উদ্দেশ্যে গমন করলে নিজের দীনদারীতে অবশ্যই বিঘ্ন ঘটবে। অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, সে আলিম মন্দ, যে শাসকের কাছে গমন করে, পক্ষান্তরে সে শাসক উত্তম, যে আলেমের কাছে আসে। দুনিয়াদার আমির উমারাকে মহা নবী ﷺ 'কাতাদ' নামক কণ্টকময় গাছের সাথে তুলনা করেছেন।

وَعَنْ ٢٤٥ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوا الْعِلْمَ وَوَضَعُوْهُ عِنْدَ أَهْلِهِ لَسَادُوْا بِهِ أَهْلَ زَمَانِهِمْ وَلٰكِنَّهُمْ بَذَلُوْهُ لِأَهْلِ الدُّنْيَا لِيَنَالُوْا بِهِ مِنْ دُنْيَاهُمْ فَهَانُوْا عَلَيْهِمْ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ جَعَلَ الْهُمُوْمَ هَمًّا وَاحِدًا هَمَّ اٰخِرَتِهِ كَفَاهُ اللّٰهُ هَمَّ

২৪৫. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– যদি [ইহুদি] আলিমগণ ইলমের হেফাজত করত এবং উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিকট তা সমর্পণ করত তবে নিশ্চয়ই তারা ইলমের বদৌলতে নিজেদের জমানায় লোকদের নেতৃত্ব দান করত। কিন্তু তারা তো দুনিয়াদারদেরকে এই ইলম বিলিয়েছে, যাতে তারা তাদের কাছ থেকে দুনিয়ার কিছু ধন-দৌলত লাভ করতে পারে, ফলে তারা দুনিয়াদারদের নিকট মর্যাদাহীন হয়ে পড়েছে। আমি তোমাদের নবীকে বলতে শুনেছি– যে ব্যক্তি তার সকল উদ্দেশ্যকে একটি মাত্র উদ্দেশ্যে পরিণত করে তথা পরকালকেই একমাত্র উদ্দেশ্য বানায়, আল্লাহ তা'আলা তার দুনিয়ার যাবতীয় উদ্দেশ্যের [চিন্তার] জন্য

دُنْيَاهُ وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُوْمُ اَحْوَالُ الدُّنْيَا لَمْ يُبَالِ اللّٰهُ فِيْ اَيِّ اَوْدِيَتِهَا هَلَكَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ مَنْ جَعَلَ الْهُمُوْمَ اِلٰى اٰخِرِهٖ.

যথেষ্ট হন। আর যাকে দুনিয়ার বিভিন্ন [চিন্তা] উদ্দেশ্য তাকে নানা দিকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখে, তার জন্য আল্লাহ তা'আলার কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই যে, সে দুনিয়ার কোন ময়দানে ধ্বংস গেল। –[ইবনে মাজাহ]

ইমাম বায়হাকী হাদীসটি তাঁর শু'আবুল ঈমানে হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। তবে ইবনে মাসউদের কথাটি বাদ দিয়ে কেবল শেষের দিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথাটি "مَنْ جَعَلَ الْهُمُوْمَ" হতে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

سَبَبُ فُقْدَانِ السِّيَادَةِ عَنِ الْعُلَمَاءِ নেতৃত্ব আলিমদের হাত ছাড়া হওয়ার কারণ : আলোচ্য হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, ইহুদিদের আলিম সমাজ কর্তৃক ইলমের হেফাজত না করার কারণেই তাদের হাত হতে নেতৃত্ব চলে গেছে। তারা যদি উপযুক্ত স্থানে ইলম স্থাপন করত এবং নিঃস্বার্থভাবে ইলম বিতরণ করত, তবে তারাই নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের অধিকারী হতো। বর্তমানেও ঠিক এমন অবস্থা যে, আলিম সমাজের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব দূরে থাক, সমাজে তাদের সামান্য মর্যাদাও নেই। বস্তুত আলিম সমাজ রাসূল ﷺ-এর আদর্শ বিচ্যুত হয়ে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যাওয়ার কারণেই এ অবস্থায় পতিত হয়েছে। তাদেরকে নতুনভাবে জাগ্রত হয়ে অতীতকে সামনে রেখে অগ্রসর হতে হবে। সকল প্রতিবন্ধকতা ছিন্ন করে এক আল্লাহর উপর ভরসা করে রাসূলের আদর্শ আঁকড়ে ধরতে হবে, তবেই বিজয় তাদের পদচুম্বন করবে।

وَعَنْ ٢٤٦ الْاَعْمَشِ (رحـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اٰفَةُ الْعِلْمِ النِّسْيَانُ وَاِضَاعَتُهٗ اَنْ تُحَدِّثَ بِهٖ غَيْرَ اَهْلِهٖ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ مُرْسَلًا

২৪৬. অনুবাদ : তাবেয়ী হযরত আমাশ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— ভুলে যাওয়া ইলমের জন্য আপদ স্বরূপ। আর অনুপযুক্ত লোকের ইলমের কথা বলা তা নষ্ট করার নামান্তর। –[দারেমী মুরসাল হিসেবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : ইলম মানুষের জন্য এক অমূল্য সম্পদ। একে যথাযথভাবে হেফাজত করতে হয়, নতুবা মানুষ তা ভুলে যায়। নিজে শিখে অন্যকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। তাহলে পারস্পরিক আলোচনার কারণে তা আর বিস্মৃত হয় না। অন্যদিকে ইলমের শিক্ষার্থী পাপকাজে লিপ্ত হলেও স্মরণ শক্তি দুর্বল হয়ে ইলম ভুলে যায়। সুতরাং পাপকার্য যথাযথভাবে এড়িয়ে চলতে হবে। সুতরাং প্রসঙ্গে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর প্রসিদ্ধ বাণী প্রণিধানযোগ্য।

شَكَوْتُ اِلٰى وَكِيْعٍ سُوْءَ حِفْظِيْ * فَاَوْصَانِيْ اِلٰى تَرْكِ الْمَعَاصِيْ

فَاِنَّ الْعِلْمَ نُوْرٌ مِنْ اِلٰهِيْ * وَنُوْرُ اللّٰهِ لَا يُعْطٰى لِعَاصِيْ

অর্থাৎ আমি [আমার ওস্তাদ] ইমাম ওয়াকী' (র.)-এর নিকট স্মৃতির দুর্বলতার অভিযোগ করলাম। তিনি আমাকে পাপকর্ম ছেড়ে দেওয়ার উপদেশ দিলেন। কেননা, দীনি ইলম হচ্ছে– আল্লাহর নূর। আর আল্লাহর নূর পাপীকে প্রদান করা হয় না।

وَعَنْ ٢٤٧ سُفْيَانَ (رحـ) اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ (رضـ) قَالَ لِكَعْبٍ مَنْ اَرْبَابُ الْعِلْمِ قَالَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ بِمَا يَعْلَمُوْنَ قَالَ فَمَا اَخْرَجَ الْعِلْمَ مِنْ قُلُوْبِ الْعُلَمَاءِ قَالَ الطَّمَعُ ـ رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

২৪৭. অনুবাদ : হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব [তাবেয়ী] হযরত কা'বুল আহবারকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তোমার মতে ইলমের পৃষ্ঠপোষক কারা ? তিনি জবাব দিলেন তারাই ইলমের পৃষ্ঠপোষক, যারা ইলম অনুযায়ী আমল করেন। হযরত ওমর (রা.) পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, আলিমদের অন্তর থেকে ইলমকে বের করে দেয় কিসে? জবাবে তিনি বললেন, [সম্পদ ও প্রতিপত্তির] লালসা। –[দারিমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : ইলম পবিত্র বস্তু। পবিত্র বস্তু রাখার জন্য পবিত্র পাত্রের প্রয়োজন। আর তা হলো মানুষের অন্তর। এটি একটি পাত্র। আর অর্থ-সম্পদের লালসা একটি অপবিত্র বিষয়। তাই এর লালসা যখন অন্তরে স্থাপিত হয় তখন ইলম তা হতে বেরিয়ে যায়।

উল্লেখ্য যে, হযরত ওমর (রা.) যে বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন তা যে তিনি জানতেন না, তা নয়; বরং জনগণকে বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করার জন্যই এই কথাটি তিনি হযরত কা'বের মুখ দিয়ে শুনালেন। কা'ব ছিলেন তাওরাত কিতাবের একজন বড় আলিম। হযরত ওমর (রা.)-এর যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি কা'বুল আহবার নামে পরিচিত।

وَعَنْ ٢٤٨ الْاَحْوَصِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَأَلَ رَجُلُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الشَّرِّ فَقَالَ لَا تَسْئَلُوْنِىْ عَنِ الشَّرِّ وَسَلُوْنِىْ عَنِ الْخَيْرِ يَقُوْلُهَا ثَلٰثًا ثُمَّ قَالَ اَلَا اِنَّ شَرَّ الشَّرِّ شِرَارُ الْعُلَمَاءِ وَاِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ خِيَارُ الْعُلَمَاءِ ـ رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

২৪৮. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত আহওয়াস ইবনে হাকীম (র.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তাঁর পিতা বলেছেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে [সর্বাপেক্ষা] খারাপ বা মন্দ লোক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন– আমাকে খারাপ লোক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো না; বরং ভালো লোক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। এ কথাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনবার বললেন। অতঃপর বললেন, জেনে রাখ, আলিমদের মধ্যে যারা মন্দ, তারা সবচেয়ে খারাপ মানুষ। আর আলেমদের মধ্যে যারা ভালো, তারা সবচেয়ে ভালো মানুষ। –[দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মন্দ লোক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হতে নিষেধ করার কারণ : এ কথা সর্বস্বীকৃত যে, মন্দ লোকের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখে একবার তার কথা ঘোষিত হয়ে গেলে তা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে, অথচ আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমাও করে দিতে পারেন। এ জন্য রাসূল ﷺ মন্দলোক ও তার পরিণতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে নিষেধ করেছেন। মহান আল্লাহও অযথা প্রশ্ন করা হতে নিষেধ করে বলেন—

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَاِنْ تَسْئَلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ ـ

اِنَّ شَرَّ الشَّرِّ شِرَارُ الْعُلَمَاءِ-এর ব্যাখ্যা : সাধারণ মানুষ আলিমদের অনুকরণ ও অনুসরণ করে থাকে, চাই তারা ভালো করুক আর মন্দ করুক ; উভয়টিকে মানুষ আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে এবং তাকে দলিল হিসেবে পেশ করে। অতএব একজন সাধারণ লোকের খারাপ কাজের তুলনায় একজন আলিমের খারাপ কাজ সমাজে দ্রুত বিস্তার করে, খারাবি আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। একজন আলিম কাজটি করেছেন বিধায় সমাজে তার প্রভাবও কম বিস্তার করে না। এ সমস্ত কারণে বলা হয় زَلَّةُ

زَلَّةُ الْعَالِمِ زَلَّةُ الْعَالَمِ অর্থাৎ 'একজন আলিমের পদস্খলন মূলত গোটা সমাজ তথা দেশের পদস্খলনের সমতুল্য।' কাজেই একজন দীনি আলিমকে খুব সতর্কতা ও সাবধানতার সাথে বলতে হবে। এ কারণেই অন্য আরেক হাদীসে বলা হয়েছে, جُبُّ الْحُزْنِ 'জুব্‌বুল হুয্‌ন' নামক জাহান্নাম হবে পরকালে মন্দ আলিমের বাসস্থান।

وَعَنْ ٢٤٩ أَبِي الدَّرْدَاءِ (رضـ) قَالَ إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللّٰهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَالِمٌ لَا يَنْتَفِعُ بِعِلْمِهِ . رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

২৪৯. অনুবাদ : হযরত আবুদ দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার নিকট সেই আলিমই কিয়ামতের দিন সবচেয়ে মন্দ বদলে বিবেচিত হবে, যে নিজ ইলম দ্বারা উপকৃত হয়নি। –[দারেমী]

وَعَنْ ٢٥٠ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ قَالَ قَالَ لِي عُمَرُ هَلْ تَعْرِفُ مَا يَهْدِمُ الْإِسْلَامَ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ يَهْدِمُهُ زَلَّةُ الْعَالِمِ وَجِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتَابِ وَحُكْمُ الْأَئِمَّةِ الْمُضِلِّيْنَ . رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

২৫০. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত যিয়াদ ইবনে হুদাইর (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত ওমর (রা.) আমাকে বললেন, তুমি কি জান, ইসলামকে কিসে ধ্বংস করে ? আমি বললাম জি-না। তিনি বললেন, আলিমদের পদস্খলন, আল্লাহর কিতাব নিয়ে মুনাফিকদের ঝগড়া এবং পথভ্রষ্ট শাসকদের শাসন ইসলামকে ধ্বংস করে। –[দারেমী]

وَعَنْ ٢٥١ الْحَسَنِ قَالَ الْعِلْمُ عِلْمَانِ فَعِلْمٌ فِي الْقَلْبِ فَذَاكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ وَعِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ فَذَاكَ حُجَّةُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى ابْنِ اٰدَمَ . رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

২৫১. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত হাসান বসরী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইলম দুই প্রকার– এক প্রকার ইলম হচ্ছে অন্তরে ; এটা হলো উপকারী ইলম। আর দ্বিতীয় প্রকার ইলম হচ্ছে– মুখে। এটা বনী আদমের বিরুদ্ধে আল্লাহর পক্ষে দলিল। –[দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীসে ইলমে দীনকে ব্যবহারিক দিক থেকে দু' শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যথা– অন্তরের ইলম এবং মৌখিক ইলম। অন্তরের ইলমকে ইলমে বাতিন ; আর মৌখিক ইলমকে ইলমে জাহির বলা হয়। এ দু'টি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। একটি অপরটির পরিপূরক। ইলমে জাহিরের মাধ্যমেই ইলমে বাতিন লাভ করা যায়। পরিশুদ্ধ ইলমে জাহির ব্যতীত ইলমে বাতিন লাভ করা যায় না। এমনিভাবে ইলমে জাহিরও পরিশুদ্ধ عِلْمِ بَاطِنْ ব্যতীত পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। এ জন্যই ইমাম মালিক (র.) বলেছেন—

مَنْ تَفَقَّهَ وَلَمْ يَتَصَوَّفْ فَقَدْ تَفَسَّقَ وَمَنْ تَصَوَّفَ وَلَمْ يَتَفَقَّهْ فَقَدْ تَزَنْدَقَ وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقَ .

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি শরিয়তের জ্ঞান অর্জন করল, অথচ তাসাওউফ অর্জন করল না, সে যেন ফাসেকী করল। আর যে ব্যক্তি তাসাওউফ শিখল, কিন্তু শরিয়তের ইলম শিখল না, সে যেন কুফরি করল। আর যে ব্যক্তি উভয় ধরনের ইলম অর্জন করল সেই সঠিক কাজ করল।

فَذٰلِكَ حُجَّةُ اللّٰهِ عَلٰى ابْنِ اٰدَمَ-**এর ব্যাখ্যা :** ইলমে দীনের দ্বিতীয় প্রকার, যা মানুষ শিক্ষা করেছে, কিন্তু সে অনুযায়ী নিজের জীবন, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করেনি, পরকালে এ ইল্‌ম তার বিরুদ্ধে আল্লাহর পক্ষে দলিল হয়ে দাঁড়াবে। সে যে বিপুল জ্ঞান ভাণ্ডারের অধিকারী হয়েছিল, তা মানুষকে দান করলেও নিজ জীবনে তার বাস্তব প্রতিফলন বিন্দুমাত্র ঘটেনি। সে ইলম তার স্বপক্ষে না গিয়ে বিপক্ষেই যাবে। তাই আল্লাহ তা'আলা হুঁশিয়ারী বাণী উচ্চারণ করে ইরশাদ করেন— لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ অর্থাৎ, তোমরা যা কর না ; তা কেন বল?

وَعَنْ ٢٥٢ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وِعَائَيْنِ فَاَمَّا اَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ فِيْكُمْ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هٰذَا الْبُلْعُوْمُ يَعْنِىْ مَجْرَى الطَّعَامِ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

২৫২. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট হতে দুই পাত্র [তথা দুই রকম] ইলম আয়ত্ত করেছি। তন্মধ্যে এক পাত্র ইলম তোমাদের মধ্যে প্রচার করেছি। আর অপর পাত্রের ইলম যদি প্রচার করি তবে এই কণ্ঠনালী, অর্থাৎ প্রচার কাটা যাবে। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَعْنَى الْوِعَائَيْنِ দু'টি পাত্রের অর্থ : وِعَائَيْنِ শব্দটি وِعَاءٌ -এর দ্বিবচন, শাব্দিক অর্থ– পেয়ালা, পাত্র বা ভাণ্ড ইত্যাদি। আলোচ্য হাদীসে দুই পাত্র দ্বারা দু' ধরনের ইলমের কথা বুঝানো হয়েছে।

এক প্রকারের ইলম বাহ্যিক, এটা সাধারণ মানুষের নিকট তিনি নির্ভয়ে প্রচার করেছেন। আর দ্বিতীয় প্রকার হলো, আধ্যাত্মিক এটা সুফীগণের জন্য নির্দিষ্ট। এটা সাধারণের মধ্যে প্রকাশ করেননি। কেননা, তাতে দীনের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

আবার কেউ বলেন, দ্বিতীয় পাত্র ইল্‌ম দ্বারা ভবিষ্যতের ফেতনা-ফ্যাসাদ ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। প্রকাশ করলে তা আরো বিরাট আকারের ফেতনায় পরিণত হতে পারে, এই আশঙ্কায় তিনি গোপন করেছেন। তবে এ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ অভিমত এই যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) মহানবী ﷺ হতে অবগত হয়েছিলেন যে, পরবর্তীকালে কুরাইশ গোত্র হতে এক ভয়াবহ ফেতনার সৃষ্টি হবে। তারা অনেক বিদআত প্রবর্তন করবে, এমন কি নবুয়তের শিক্ষা-দীক্ষাকে পরিবর্তন করে ফেলবে। মহানবী ﷺ তাদের নাম ঠিকানাও প্রকাশ করেছিলেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) তা ভালোভাবে জানতেন ; কিন্তু নিজের জীবনের ভয়ে তা প্রকাশ করেননি। তাই অধিকাংশ সময় এ দোয়া পড়তেন– اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ رَأْسِ السِّتِّيْنَ وَ اِمَارَةِ الصِّبْيَانِ অর্থাৎ আমি আল্লাহর নিকট ষাট সনের সমাপ্তি ও অল্প বয়স্ক লোকের শাসন হতে আশ্রয় চাই। এটা দ্বারা তিনি সম্ভবত ইয়াজিদের শাসনামলের প্রতি ইঙ্গিত করতেন কেননা, ইয়াজিদের শাসন ক্ষমতা ষাটসনের দিকে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এটা প্রকাশ করলে লোকেরা ক্রোধান্বিত হয়ে তাকে হত্যা করত, এ জন্য তিনি এটা প্রকাশ করতেন না।

وَعَنْ ٢٥٣ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) قَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِهٖ وَمَنْ لَّمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ فَاِنَّ مِنَ الْعِلْمِ اَنْ تَقُوْلَ لِمَا لَا تَعْلَمُ اَللّٰهُ اَعْلَمُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِنَبِيِّهٖ قُلْ مَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৫৩. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি [জনগণকে সম্বোধন করে] বলেন, হে লোক সকল! [তোমাদের মধ্যে] যে কোনো কিছু জানে সে যেন তা-ই বলে। আর যে জানে না সে যেন বলে আমি এ সম্পর্কে জানিনা, এ বিষয়ে আল্লাহই ভালো জানেন। কেননা, যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে "আল্লাহই সর্বাধিক জানেন।" এ কথা বলাই তোমার জন্য এক প্রকার ইলম। আল্লাহ তা'আলা [পবিত্র কুরআনে] তাঁর নবীকে বলেছেন– 'হে নবী আপনি বলুন, আমি দীন প্রচারের বিনিময়ে তোমাদের নিকট কোনো পারিশ্রমিক চাই না। আর যারা [বানিয়ে] অনুমান করে কথা বলে, আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।'–[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٢٥٤ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ إِنَّ هٰذَا الْعِلْمَ دِيْنٌ فَانْظُرُوْا عَمَّنْ تَأْخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৫৪. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– নিশ্চয়ই এ [কিতাব ও সুন্নতের] ইলম হচ্ছে দীন। সুতরাং তোমরা লক্ষ্য কর যে, তোমাদের এ দীন কার নিকট থেকে গ্রহণ করে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَمَّنْ تَأْخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ বলার কারণ : মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (র.)-এর এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, হাদীস বর্ণনাকারীর অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ আমানত, দিয়ানত, তাকওয়া, সাধুতা, সত্যবাদিতা ও স্মরণশক্তি ইত্যাদি নির্ভরযোগ্য কি না, তা সঠিকভাবে না জেনে হাদীস গ্রহণ করা ঠিক নয়। পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণ রাবীদের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 'আসমাউর রিজাল' নামে স্বতন্ত্র একটি শাস্ত্রই সৃষ্টি করেছেন। এতে হাজার হাজার রাবীর চরিত্র বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এরূপ নজির দুনিয়ার আর কোনো জাতির কাছে নেই।

হাদীস বিশারদগণ সাহাবী ব্যাতিরেকে সর্বমোট [৮০,৫০০] আশি হাজার পাঁচশতজন বর্ণনাকারী খুঁজে পেয়েছেন। তন্মধ্যে ৪ হাজার ৪ শত ৪ জনকে নির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। ইমাম বুখারী এর মধ্য হতেও ৬২০ জনকে বাদ দিয়েছেন। পৃথিবীর অন্য কোনো জাতি তাদের নবী তো দূরের কথা, স্বয়ং আল্লাহর কথার সনদ সম্পর্কেও এরূপ সাবধানতা ও কঠোরতা অবলম্বন করেনি।

وَعَنْ ٢٥٥ حُذَيْفَةَ (رض) قَالَ يَا مَعْشَرَ الْقُرَّاءِ اِسْتَقِيْمُوْا فَقَدْ سَبَقْتُمْ سَبْقًا بَعِيْدًا وَاِنْ اَخَذْتُمْ يَمِيْنًا وَشِمَالاً لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالاً بَعِيْدًا - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২৫৫. অনুবাদ : হযরত হুযাইফা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি [তার সমকালীন শিক্ষিতজনদের উদ্দেশ্যে] বলেন যে, হে আলিমগণ ! তোমরা সোজা পথে চল। কেননা, [প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে পরবর্তীদের তুলনায়] তোমরা অনেক পথ অগ্রসর হয়ে গিয়েছ। আর যদি তোমরা ডান বা বামের পথ অবলম্বন কর তবে পথ-ভ্রষ্টতায় অনেক দূর অগ্রসর হয়ে যাবে। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

يَا مَعْشَرَ الْقُرَّاءِ দ্বারা সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ : আল্লামা তীবী (র.) বলেন, يَا مَعْشَرَ الْقُرَّاءِ দ্বারা কুরআন মুখস্থকারীদেরকে বুঝানো হয়েছে।

- আল্লামা আবহারী তার শায়খের অভিমত উল্লেখ করেন যে, এর দ্বারা কুরআন ও হাদীসে পারদর্শী বিজ্ঞদেরকে বুঝানো হয়েছে।
- অথবা তদানীন্তন সময়ের কারীগণকে বুঝানো হয়েছে যারা অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।
- ইবনে হাজার আসকালানী (র.)-এর মতে, এর দ্বারা শুধু কুরআনের হাফেজগণকে বুঝানো হয়েছে।

وَجْهُ كَوْنِ الصَّحَابَةِ سَابِقِيْنَ فِي الْعِلْمِ সাহাবীগণ ইলমে অগ্রগামী হওয়ার কারণ : সাহাবীগণ (مُؤْمِنِيْنَ سَابِقِيْنَ اَوَّلِيْنَ) প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করার দরুন এবং অধিকন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্য লাভের কারণে, পরবর্তীদের তুলনায় জ্ঞান-মর্যাদায় অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গিয়েছেন। তাঁদের যুগকে خَيْرُ الْقُرُوْنِ বা উত্তম যুগ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এ সকল কারণে তাঁরা জ্ঞান ও মর্যাদায় অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গিয়েছেন।

তাদের গোমরাহী ও অগ্রগামী হওয়ার কারণ : পরবর্তী যুগের লোকেরা কিয়ামত পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ ও তাবেয়ীগণের তরীকা অনুসরণ করবে, পরবর্তী যুগের লোকদের এটাই হবে দিক নির্দেশিকা ও দলিল। অতএব সাহাবীদের বা তাবেয়ীদের পথভ্রষ্টতা শরিয়তের উপরে মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করবে। তাঁরা ভুল পথে চললে তাঁদের অনুসরণ করে শতাব্দীর পর শতাব্দী মানুষ ভুল পথে চালিত হবে। এ জন্যই তাঁরা গোমরাহীতেও অনেক দূর অগ্রসর হবে বলে বলা হয়েছে। কারণ পরবর্তী লোকদের গোমরাহীর পাপও তাঁদের দিকে বর্তিবে।

وَعَنْ ٢٥٦ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ جُبِّ الْحُزْنِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا جُبُّ الْحُزْنِ قَالَ وَادٍ فِىْ جَهَنَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلَّ يَوْمٍ اَرْبَعَ مِائَةِ مَرَّةٍ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَنْ يَّدْخُلُهَا قَالَ اَلْقُرَّاءُ الْمُرَاؤُوْنَ بِاَعْمَالِهِمْ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَكَذَا ابْنُ مَاجَةَ وَزَادَ فِيْهِ وَاِنَّ مِنْ اَبْغَضِ الْقُرَّاءِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى الَّذِيْنَ يَزُوْرُوْنَ الْاُمَرَاءَ قَالَ الْمُحَارِبِىُّ يَعْنِى الْجَوَرَةَ -

২৫৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– তোমরা 'জুব্বুল হুযন' হতে বাঁচার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা কর। সাহাবীগণ বললেন– হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! জুব্বুল হুয্ন কি জিনিস? তিনি বললেন, এটা জাহান্নামের একটি কূপ বা গর্ত, যা হতে বাঁচার জন্য স্বয়ং জাহান্নামও রোজ চারশতবার আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। পুনরায় রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলো–হে আল্লাহর রাসূল! তাতে কারা প্রবেশ করবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'সে সকল কুরআন অধ্যয়নকারীগণ যারা অপরকে দেখানোর জন্য আমল করে থাকে। –[তিরমিযী]

ইবনে মাজাহ্ও এরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন,তবে তিনি আরো কিছু বর্ধিত অংশ উল্লেখা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কুরআন অধ্যায়নকারীদের মধ্যে তারাই আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বাধিক ঘৃণিত যারা [এর বিনিময়ে দুনিয়া অর্জনের জন্য] আমীর-উমারার সাথে সাক্ষাত করে। পরবর্তী বর্ণনাকারী মুহারেবী [(র.) মৃত ১৯৫ হি:] বলেন, আমীর-উমারা বলতে অত্যাচারী ও অবিচারী শাসকদেরকে বুঝানো হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, কুরআন শিক্ষা করার একমাত্র উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। অন্য কোনো উদ্দেশ্যে হলে তার জন্য ভয়াবহ পরিণতি অপেক্ষা করছে। লোক দেখানো ইবাদত এবং আমীর-উমারাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ও তাদের থেকে কিছু অর্জনের নিমিত্ত আলেমদের তাদের দরবারে গমন করা অত্যন্ত ঘৃণিত। এরূপ ব্যক্তিগণ 'জুব্বুল হুযন' নামক জাহান্নামে জ্বলবে।

وَعَنْ ٢٥٧ عَلِيٍّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْشِكُ اَنْ يَّاْتِىَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقٰى مِنَ الْاِسْلَامِ اِلَّا اِسْمُهٗ وَلَا يَبْقٰى مِنَ الْقُرْاٰنِ اِلَّا رَسْمُهٗ مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِىَ خَرَابٌ مِنَ الْهُدٰى عُلَمَاءُهُمْ شَرُّ مَنْ تَحْتَ اَدِيْمِ السَّمَاءِ مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَفِيْهِمْ تَعُوْدُ - رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ -

২৫৭. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– অচিরেই মানুষের নিকট এমন যুগ আসবে যখন নাম ব্যতীত ইসলামের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। আর অক্ষর ব্যতীত কুরআনের আর কিছুই বাকি থাকবে না। তাদের মসজিদসমূহ [বাহ্যিক দিক দিয়ে] জাঁকজমকপূর্ণ হবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হিদায়েতশূন্য হবে। তাদের আলিমগণ আসমানের নিচে [যাবতীয় সৃষ্টির মধ্যে] সবচেয়ে খারাপ। আর তাদের তরফ থেকেই [দীন সংক্রান্ত] ফিতনা প্রকাশ পাবে; অতঃপর তাদের দিকেই তা প্রত্যাবর্তন করবে। –[বায়হাকী তার শু'আবুল ঈমান গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لَا يَبْقَى مِنَ الْاِسْلَامِ اِلَّا اِسْمُهُ-এর ব্যাখ্যা : ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। যুগ যুগ ধরে এটি স্বকীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে গৌরবের সাথে তার মৌলিকত্ব নিয়ে দেদীপ্যমান ছিল। কিন্তু কালের বিবর্তনে রাসূল ﷺ-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তা শুধু আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে। নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠান ঠিকই থাকবে ; কিন্তু তা লোক দেখানো হয়ে যাবে। ইসলামের মূল প্রেরণা তাতে থাকবে না। বর্তমানে যুগেও মনে হয় রাসূলের ভবিষ্যদ্বাণী ধীরে ধীরে কার্যকর হতে চলছে।

لَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْاٰنِ اِلَّا رَسْمُهُ-এর ব্যাখ্যা : পবিত্র কুরআন হলো মানুষের জীবন বিধান। তাতে সব ধরনের জ্ঞানের সমাহার রয়েছে। কুরআনী জীবনই মানুষকে সকল অশান্তি ও অস্থিরতা হতে মুক্তি দিতে পারে। রাসূল ﷺ এবং সাহাবীগণের সমাজ তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁরা যেমন কুরআনকে বাহ্যত তিলাওয়াত করতেন তেমনি তার মর্ম ও তাৎপর্য অনুধাবন করে নিজেদের জীবন আল্লাহর পথে পরিচালনা করতেন। কুরআনী শিক্ষা থেকে দূরে থাকলে পদস্খলন অবশ্যম্ভাবী। তাই রাসূল ﷺ এমন এক যুগের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, যে যুগে কুরআনের অক্ষর ছাড়া আর কিছুই বাকি থাকবে না। অর্থাৎ তার অর্থ, মর্ম, তাৎপর্য মানুষ বুঝতে চেষ্টা করবে না এবং তা নিয়ে আদৌ চিন্তা-গবেষণা করবে না। শুধু মানুষের অক্ষর জ্ঞান অবশিষ্ট থাকবে। সে যুগেই মনে হয় আমরা পদার্পণ করেছি। কেননা, কুরআনের শিক্ষা আমাদের সমাজে তো নেই ; বরং তা নিয়ে গবেষণারও তেমন প্রচেষ্টা ও অনুরাগ দেখা যাচ্ছে না। উল্টো কুরআন শিক্ষার্থীদেরকে মৌলবাদী, ফতোয়াবাজ ইত্যাদি বলে কটাক্ষ করা হচ্ছে।

مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ-এর ব্যাখ্যা : বাহ্যিক কারুকার্য এবং সুউচ্চ ইমারতে মসজিদসমূহ জাঁকজমকপূর্ণ থাকবে; কিন্তু মসজিদসমূহ প্রকৃত ঈমানদারদের অভাবে রূহশূন্য হবে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে, মসজিদ ভাঙ্গা হলেও তাতে প্রকৃত ঈমানদারদের উপস্থিতি ও তাঁদের আমল দ্বারা আবাদ থাকত। বর্তমানে রাসূলের ভবিষ্যদ্বাণীই প্রতিপালিত হচ্ছে।

وَعَنْ ٢٥٨ زِيَادِ بْنِ لَبِيْدٍ (رضـ) قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا فَقَالَ ذَاكَ عِنْدَ اَوَانِ ذِهَابِ الْعِلْمِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَنُقْرِئُهُ اَبْنَائَنَا وَيُقْرِئُهُ اَبْنَائُنَا اَبْنَائَهُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَقَالَ ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ زِيَادُ اِنْ كُنْتُ لَاُرَاكَ مِنْ اَفْقَهِ رَجُلٍ بِالْمَدِيْنَةِ اَوَ لَيْسَ هٰذِهِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى يَقْرَؤُوْنَ التَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِيْلَ لَا يَعْمَلُوْنَ بِشَىْءٍ مِمَّا فِيْهِمَا ـ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَ ابْنُ مَاجَةَ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ وَكَذَا الدَّارِمِيُّ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ ـ

২৫৮. **অনুবাদ :** হযরত যিয়াদ ইবনে লাবীদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ [ফেত্না-ফ্যাসাদ সম্পর্কে] একটা বিষয় উল্লেখ করলেন এবং বললেন, এটা তখনই ঘটবে যখন ইলম উঠে যেতে থাকবে। এটা শুনে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! ইলম কেমন করে উঠে যাবে! অথচ আমরা কুরআন শিক্ষা করছি এবং আমাদের সন্তানদেরকে শিক্ষা দিচ্ছি। আর আমাদের সন্তানগণ কিয়ামত পর্যন্ত [পুরুষানুক্রমে] তাদের সন্তানদেরকে [এভাবে] শিক্ষা দিতে থাকবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যিয়াদ! তোমার মা তোমাকে হারাক। এতদিন তো আমি তোমাকে মদীনার মধ্যে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বলেই মনে করতাম। [দেখ] এ সমস্ত ইহুদি-নাসারাগণ কি তাওরাত ও ইঞ্জীল পাঠ করছে না? কিন্তু তারা তাতে যা আছে তার কোনো একটি জিনিসের উপরও আমল করছে না। -[ইবনে মাজাহ ও আহমদ]

ইমাম তিরমিযীও এরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু দারেমী এ হাদীস আবূ উমামা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْث হাদীসের ব্যাখ্যা : পবিত্র কুরআন শুধু তিলাওয়াতের জন্যই অবতীর্ণ হয়নি। বরং তার নীতিমালা বাস্তবায়ন করার জন্যই নাজিল হয়েছে। মুসলমানরাও যদি ইহুদি ও নাসারাদের মতো শুধু কুরআন পাক পাঠ করে যায়, তার উপর আমল না করে তবে এটা কুরআনের চলে যাওয়ারই নামান্তর। বর্তমান যুগে এরূপ অবস্থাই যেন ক্রমাগত আসছে।

وَعَنْ ٢٥٩ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوْهُ النَّاسَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوْهَا النَّاسَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوْهَا النَّاسَ تَعَلَّمُوا الْقُرْاٰنَ وَعَلِّمُوْهُ النَّاسَ فَاِنِّىْ امْرُءٌ مَقْبُوْضٌ وَالْعِلْمُ سَيُقْبَضُ وَيَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتّٰى يَخْتَلِفَ اِثْنَانِ فِىْ فَرِيْضَةٍ لَا يَجِدَانِ اَحَدًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا . رَوَاهُ الدَّارِمِىُّ وَالدَّارُ قُطْنِىْ

২৫৯. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, তোমরা ইলম শিক্ষা কর এবং লোকদেরকে শিক্ষা দান করো। তোমরা ফারায়েজ শিক্ষা করো এবং জনগণকে তা শিক্ষা দান করো। আর কুরআন শিক্ষা করো এবং লোকদেরকেও তা শিক্ষা দান করো। কেননা আমি এমন এক ব্যক্তি যাকে তুলে নেওয়া হবে। ইলমকেও শ্রীঘ্রই উঠিয়ে নেওয়া হবে। আর ফেতনা দেখা দিবে। এমনকি একটি ফরজ নিয়ে দু' ব্যক্তি মতভেদ করবে। অথচ এমন কোনো ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে ব্যক্তি উভয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দিতে পারে।–[দারেমী ও দারে কুতনী]

وَعَنْ ٢٦٠ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ عِلْمٍ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ كَمَثَلِ كَنْزٍ لَا يُنْفَقُ مِنْهُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ . رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالدَّارِمِىُّ

২৬০. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ইলম দ্বারা কোনোরূপ উপকার সাধিত হয় না , তা ঐ ধন ভাণ্ডারের ন্যায়, যা হতে আল্লাহর রাস্তায় কিছুই খরচ করা হয়নি।–[আহমদ ও দারেমী]

كِتَابُ الطَّهَارَةِ
পবিত্রতা পর্ব

ইবাদত মহান আল্লাহর নিকট গৃহীত হওয়ার পূর্বশর্ত হলো পবিত্রতা অর্জন করা। এ পবিত্রতা প্রথমত দু' প্রকার। যথা–

১. **শারীরিক পবিত্রতা :** এটা হলো মলমূত্র, শুক্র-রক্ত, পুঁজ, বমি ইত্যাদি তথা نَجَاسَةٌ عَيْنِيٌّ হতে পবিত্র হওয়া।নামাজি

২. **আত্মিক পবিত্রতা :** অর্থাৎ আন্তরিক চিন্তা, চেতনা তথা কুফর, নেফাক, হিংসা– বিদ্বেষ ইত্যাদি হতে নিষ্কলুষ হওয়া। এ উভয় প্রকার পবিত্রতার সমন্বয়ে যে ইবাদত করা হয় কেবল মাত্র তা-ই আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় হয়।

শারীরিক অপবিত্রতা আবার দু' রকম। যেমন–

১. **حَدَثٌ اَكْبَرُ বা বড় নাপাক :** এটা শরীর থেকে বীর্য, হায়েয বা নেফাসের রক্ত বের হওয়ার দরুন সৃষ্টি হয়। এই ধরনের নাপাকী হতে পবিত্রতা অর্জনের জন্য গোসল অপরিহার্য।

২. **حَدَثٌ اَصْغَرُ বা ছোট নাপাক :** এটা শরীর হতে রক্ত, পুঁজ, পানি, পেশাব-পায়খানা ইত্যাদি নাপাকী হতে পবিত্রতা অর্জনের জন্য শুধুমাত্র অজুর প্রয়োজন। বস্তুত এই উভয় ধরনের নাপাকী হতে পবিত্রতা অর্জনের নামই হলো তাহারাত।

اِيْمَانٌ ও عِلْم-এর পরে طَهَارَةٌ-কে আনয়নের কারণ : মিশকাত প্রণেতা মিশকাত শরীফের বিষয়সূচিকে বিন্যাস করতে গিয়ে প্রথমে اِيْمَان এরপর عِلْم এরপরে طَهَارَةٌ -কে স্থান দিয়েছেন। এরূপ করার কারণ নিম্নরূপ :

১. আল্লামা আইনী (র.) বলেন, ইলম এবং আমলের জন্য ছওয়াব প্রাপ্তির পূর্বশর্ত হলো اِيْمَانٌ আর এ জন্যই كِتَابُ الْاِيْمَانِ কে সর্বপ্রথমে স্থান দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে ইবনু আবেদীন বলেন– ঈমান গ্রহণের পর ঈমানী জীবনের পরিধি আদব, ইবাদত, মু'আমালাত প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এগুলোর জন্য عِلْم বা জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সেজন্য অন্যান্য مُعَامَلَاتٌ -এর উপর মর্যাদা ও প্রাধান্য দেওয়ার লক্ষ্যে كِتَابُ الْعِلْمِ-কে كِتَابُ الْاِيْمَانِ-এর পরপরই উল্লেখ করা হয়েছে। মর্যাদা ও গুরুত্বের বিবেচনায় ঈমানের পর অন্যান্য ইবাদতের মধ্যে নামাজের স্থান। যেমন– কুরআনে এসেছে– اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ কিন্তু অন্য হাদীসে যেহেতু طَهَارَةٌ-কে مِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ বলা হয়েছে, আর নামাজের জন্য طَهَارَةٌ একান্ত আবশ্যক, তাই كِتَابُ الصَّلٰوةِ -এর পূর্বে كِتَابُ الطَّهَارَةِ-কে উপস্থাপন করা হয়েছে। –[আইনী]

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

২৬১ عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ الْاَشْعَرِيِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَأُ الْمِيْزَانَ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَأٰنِ اَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرْضِ وَالصَّلٰوةُ نُوْرٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْاٰنُ حُجَّةٌ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُوْ فَبَائِعٌ نَفْسَهٗ فَمُعْتِقُهَا اَوْ مُوْبِقُهَا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৬১. **অনুবাদ :** হযরত আবূ মালিক আশআরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— পবিত্রতা ঈমানের অর্ধাংশ, আলহামদুলিল্লাহ মানুষের আমলের পাল্লাকে পূর্ণ করে দেয়। সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি বাক্য দু'টি বা উভয় বাক্যের সমষ্টি [অর্থাৎ, তার ছওয়াব] আসমান ও জমিনের মধ্যে যা কিছু আছে তাকে পূর্ণ করে দেয়। নামাজ আলোকস্বরূপ, দান হলো [দাতার পক্ষে] দলিল। ধৈর্য হলো জ্যোতি। আর কুরআন হলো তোমার পক্ষে বা বিপক্ষে প্রমাণ। প্রত্যেক মানুষ সকালে উঠে আপন আত্মাকে ক্রয়-বিক্রয় করে। হয় তাকে মুক্ত করে না হয় ধ্বংস করে। –[মুসলিম]

وَفِىْ رِوَايَةٍ لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰـهُ وَاللّٰـهُ اَكْبَرُ تَمْلَأَنِ مَا بَيْـنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ . لَمْ اَجِدْ هٰذِهِ الرِّوَايَةَ فِى الصَّحِيْحَيْنِ وَلَا فِىْ كِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ وَلَا فِى الْجَامِعِ وَلٰكِنْ ذَكَرَهَا الدَّارِمِىُّ بَدَلَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ .

অপর এক বর্ণনায় [সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি -এর স্থলে] রয়েছে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আসমান জমিনের মধ্যে যা কিছু আছে তা পূর্ণ করে দেয়। এ বর্ণনাটি আমি বুখারী-মুসলিম, হুমাইদীর কিতাব, এমনকি জামেউল উসূলেও পাইনি। কিন্তু দারেমী একে সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহ-এর স্থলে বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلطُّهُوْرُ -এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ :

مَعْنَى الطُّهُوْرِ لُغَةً : طُهُوْر ও طَهَارَة উভয়টিই বাবে نَصَرَ -এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ– اَلنَّظَافَةُ তথা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া, পবিত্রতা অর্জন করা।

উল্লেখ্য যে, الطُّهُوْر ও طَهَارَة শব্দের ط অক্ষরে বিভিন্ন হরকতের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন অর্থ হয়ে থাকে। যেমন—

১. بِضَمِّ الطَّاءِ : اَلطُّهُوْر (اَلطُّهَارَة)-এর অর্থ হচ্ছে– اَلنَّظَافَة বা পবিত্রতা অর্জন করা। যেমন– অজু, গোসল ইত্যাদি। তখন এটি মাসদার হবে।

২. بِكَسْرِ الطَّاءِ : اَلطِّهُوْرُ (اَلطِّهَارَةُ)-এর অর্থ হচ্ছে– اٰلَةُ النَّظَافَةِ বা পবিত্রতা অর্জন করার যন্ত্র। যেমন– বদনা, মগ ইত্যাদি।

৩. بِفَتْحِ الطَّاءِ: اَلطَّهُوْرُ (اَلطَّهَارَة)-এর অর্থ হচ্ছে— مَابِهِ الطَّهَارَةُ বা যে উপকরণ দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা হয়। যেমন– মাটি, পানি ইত্যাদি।

مَعْنَى الطَّهَارَةِ اِصْطِلَاحًا : শরিয়তের পরিভাষায় طَهَارَة -এর সংজ্ঞা—

১. ذَخِيْرَةٌ নামক গ্রন্থে এসেছে— هُوَ النَّظَافَةُ عَنِ النَّجَاسَةِ الْحَقِيْقِيَّةِ وَالْحُكْمِيَّةِ অর্থাৎ حَقِيْقِىْ এবং حُكْمِىْ অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জন করাকে طَهَارَة বলা হয়।

২. আল্লামা ইবনে কুদামার মতে—

اَلطَّهَارَةُ هُوَ رَفْعُ مَا يَمْنَعُ الصَّلٰوةَ وَمَا فِىْ مَعْنَاهَا مِنْ حَدَثٍ اَوْ نَجَاسَةٍ بِالْمَاءِ اَوْ رَفْعِ حُكْمِهِ كَالتُّرَابِ .

৩. ফতহুল মুলহিম গ্রন্থে বলা হয়েছে— هُوَ نَظَافَةُ الْبَدَنِ وَالثَّوْبِ وَالْمَكَانِ مِنَ الْحَدَثِ وَالْخُبْثِ

৪. মু'জামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন— اَلطُّهْرُ فِى الشَّرْعِ نَقِىٌّ مِنَ النَّجَاسَةِ وَالدَّنَسِ وَبَرِئٌ مِنْ كُلِّ مَا يَشِيْنُ

৫. কেউ কেউ বলেন— هُوَ رَفْعُ الْحَدَثِ بِطَرِيْقَةٍ بَيَّنَتْهَا الشَّرِيْعَةُ

طَهَارَة -এর প্রকারভেদ : طَهَارَة-এর প্রকারভেদ সম্পর্কে শাস্ত্রবিদগণ থেকে নিম্নোক্ত মতামত পাওয়া যায়—

আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র.)-এর মতে, তাহারাত দু'প্রকার। যেমন—

১. طَهَارَةٌ ظَاهِرَةٌ : অর্থাৎ বাহ্যিক পবিত্রতা, যেমন— মলমূত্র ইত্যাদি নাপাকী থেকে শরীর, পরিধেয় বস্ত্র, স্থানকে অজু, গোসল বা ধৌত করার মাধ্যমে পবিত্রতা করা।

২. طَهَارَةٌ بَاطِنِيَّةٌ : অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা, যেমন— শরিয়ত বিরোধী আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনা থেকে আত্মাকে পবিত্র ও মুক্ত রাখা।

শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলোবী (র.) বলেন— তাহারাত তিন প্রকার। যথা—

১. اَلطَّهَارَةُ مِنَ النَّجَاسَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْبَدَنِ اَوِ الثَّوْبِ اَوِ الْمَكَانِ

২. اَلطَّهَارَةُ مِنَ الْاَوْسَاخِ النَّابِتَةِ مِنَ الْبَدَنِ كَشَعْرِ الْعَانَةِ

৩. اَلطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ كَبِيْرَةً كَانَتْ اَوْ صَغِيْرَةً

ইমাম গাযালী (র.) طَهَارَةٌ-কে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা—

১. طَهَارَةٌ مِنَ النَّجَاسَةِ وَالْوَسَخِ – অপবিত্রতা ও ময়লা থেকে পবিত্রতা অর্জন করা।

২. طَهَارَةُ الْاَعْضَاءِ عَنِ الْعِصْيَانِ – অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নাফরমানী থেকে দূরে রাখা।

৩. طَهَارَةُ الْقَلْبِ عَنْ سُوْءِ الْفِكْرِ – কুচিন্তা হতে অন্তরকে পবিত্র রাখা।

৪. طَهَارَةُ الْقَلْبِ عَنِ الشِّرْكِ – শিরক হতে অন্তরকে পবিত্র রাখা।

قَامُوْسُ الْفِقْهِ গ্রন্থকারের মতে, ১. طَهَارَةٌ مِنَ الْحَدَثِ ২. طَهَارَةٌ مِنَ النَّجِسِ

ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মতে, ১. طَهَارَةٌ عَيْنِيٌّ ২. طَهَارَةٌ حُكْمِيٌّ

ইমাম মালিক (র.)-এর মতে, ১. طَهَارَةٌ صُغْرٰى ২. طَهَارَةٌ كُبْرٰى

সَبَبُ قَوْلِهِ اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ বলার কারণ : রাসূল ﷺ-এর বাণী– اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ -এর মর্ম হচ্ছে– পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ, অথচ ইসলামি বিধান এরূপ নয়। কেননা, পবিত্রতা ছাড়াও ঈমান অর্জিত হতে পারে। এ বক্তব্যের ব্যাখ্যায় বিশেষজ্ঞগণ নিম্নোক্ত বক্তব্য দিয়েছেন—

১. ইমাম নববী (র.) বলেন—

مَعْنَاهُ اَنَّ الْاِيْمَانَ يُكَفِّرُ مَا قَبْلَهُ مِنَ الْخَطَايَا وَ كَذٰلِكَ الْوُضُوْءُ لِاَنَّ الْوُضُوْءَ لَا يَصِحُّ اِلَّا مَعَ الْاِيْمَانِ فَصَارَ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى الْاِيْمَانِ فِىْ مَعْنَى الشَّطْرِ .

২. اَلنِّهَايَةُ প্রণেতার ভাষায়— اِنَّ الْاِيْمَانَ يُطَهِّرُ الْبَاطِنَ وَالطُّهُوْرَ يُطَهِّرُ الظَّاهِرَ لِذٰلِكَ قَالَ اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ

অর্থাৎ, ঈমান অন্তরকে এবং পবিত্রতা বাহ্যিক শরীরকে পবিত্র করে, তাই রাসূল ﷺ اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ বলেছেন।

৩. طَهَارَةٌ -কে ঈমানের অর্ধাংশ বলা হয়েছে مُبَالَغَةٌ হিসেবে। কেননা, সকল مَقْصُوْدٌ بِالذَّاتِ ইবাদত طَهَارَةٌ-এর উপর নির্ভরশীল। এ জন্যই পবিত্রতা ঈমানের অর্ধাংশের ন্যায়।

৪. কোনো আলিম হাদীসে বর্ণিত ঈমানকে সালাতের অর্থে ব্যবহার করেছেন, অর্থাৎ পবিত্রতা সালাতের অর্ধাংশ। যেমন, কুরআনে এসেছে– وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ اَىْ صَلَاتَكُمْ

উল্লেখ্য, ইমাম নববী (র.) চতুর্থ মতবাদটিকেই বিশুদ্ধ মতবাদ বলেছেন।

৫. আল্লামা তূরপুশতী (র.)-এর মতে, হাদীসে পবিত্রতাকে ঈমানের অর্ধাংশ বলার কারণ হচ্ছে–

اَلْاِيْمَانُ طَهَارَةٌ عَنِ الشِّرْكِ كَمَا اَنَّ الطُّهُوْرَ طَهَارَةٌ مِنَ الْاَحْدَاثِ .

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَاُ الْمِيْزَانَ-এর অর্থ : রাসূল ﷺ-এর বাণী দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ দ্বারা পুণ্যের পাল্লা ভারী হয়ে যায়, অথচ মানুষের আমল কায়াহীন। তাই এরূপ বক্তব্যের মর্মার্থ সম্পর্কে হাদীসবেত্তাগণ নিম্নোক্ত বক্তব্য দিয়েছেন—

১. বর্তমান বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগে এর সমাধান অতি সহজ। কেননা, বায়ু, আর্দ্রতা, উষ্ণতা ইত্যাদি মাপার জন্য বর্তমানে 'ব্যারোমিটার', 'হাইড্রোমিটার' যন্ত্রসমূহ ব্যবহৃত হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে মানব কর্মকাণ্ড ভালো-মন্দ ইত্যাদি মাপা আল্লাহর পক্ষে কত যে সহজসাধ্য ব্যাপার হবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

২. আমল যদিও কায়াহীন ও বিমূর্ত, তথাপি আল্লাহ পাক তার নিজ কুদরতে এটাকে দৃশ্যমান ও পরিমাপযোগ্য বস্তুতে পরিণত করতে পারেন।

৩. অথবা, এর দ্বারা আমলনামার কথা বুঝানো হয়েছে, অর্থাৎ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বললে এত বেশি ছওয়াব হয় যে, তা আমলনামায় লেখা হলে এবং পাল্লায় রাখা হলে পাল্লা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।

৪. অথবা, নবী করীম ﷺ 'পাল্লা পরিপূর্ণ করে' কথাটির মূল বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করে বলেছেন, অর্থাৎ আমলের ছওয়াব দ্বারা পাল্লা পরিপূর্ণ হয়। আর যদি আমলকে স্থুল বিষয় ধরা হয় তবে তার অর্থ হবে, আলহামদুলিল্লাহ বলায় এত বিপুল পরিমাণে ছওয়াব হয় যে, তাতে আমল পরিমাণ যন্ত্র ভরে যায়।

اَلْمُرَادُ بِقَوْلِهِ ﷺ اَلصَّلٰوةُ نُوْرٌ বা নামাজ নূর বা জ্যোতি বলার তাৎপর্য : রাসূলের বাণী– اَلصَّلٰوةُ نُوْرٌ নামাজ আলোস্বরূপ। এর মর্ম সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মতামত নিম্নরূপ—

১. প্রকৃতই নামাজ দ্বারা অন্ধকার কবর আলোকিত হয়, কেয়ামতের ঘোর অন্ধকার দূরীভূত হয়।

২. এছাড়া কুরআনের বাণী– اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ অর্থাৎ, নামাজ ব্যক্তিকে অন্যায় ও অশ্লীল কাজ হতে দূরে রাখে ও বাধা প্রদান করে এবং সৎ কাজের দিকে পথ দেখায়, যেমনি আলো দ্বারা ব্যক্তি পথের দিশা পায়।

৩. এমনিভাবে নামাজ মানুষকে হিদায়েতের পথ নির্দেশনায় কল্যাণকামী ভূমিকা পালন করে।

৪. তা ছাড়া হাশরের ময়দানে নামাজি ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অজু ও সিজদার কারণে ঝলমল করবে, ফলে তাদেরকে খুব সহজেই চেনা যাবে। যেমন, কুরআনে বলা হয়েছে– سِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ

৫. অথবা, কিয়ামতের ময়দানে মানুষ যখন চতুর্দিকে অন্ধকারে পথ খুঁজতে থাকবে, তখন মু'মিনের নামাজ তাকে আলোর সন্ধান দেবে। যেমন, কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গেই ইরশাদ করেছেন— يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ بِاَيْمَانِهِمْ "মু'মিনগণের নূর তাদের সম্মুখে ও ডানে আন্দোলিত হতে থাকবে", তৎপ্রতি ইঙ্গিত করে নামাজকে নূর বলা হয়েছে।

৬. অথবা, জাগতিক ক্ষেত্রে যেমন অন্ধকারে পথ হলোর বাহক আলো, আলো সঙ্গে থাকাবস্থায় অন্ধকার রাস্তায় পথহারা হওয়ার আশঙ্কা থাকে না, তেমনি নামাজের দ্বারাও মানুষের আধ্যাত্মিক পথ হলোর ক্ষেত্রে বিপথগামী হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। অন্যায়-অনাচার ও পাপাচার হতে বেঁচে থাকা তার পক্ষে সহজসাধ্য হয়। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ "নিশ্চয়ই নামাজ অশ্লীলতা ও পাপাচার হতে বিরত রাখে।" এ জন্যই নামাজকে রূপকার্থে আলোর সাথে তুলনা করা হয়েছে।

اَلصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ দ্বারা উদ্দেশ্য : সদকাকে দলিলরূপে আখ্যায়িত করার তাৎপর্য এই যে– ১. ব্যক্তি তার কষ্টার্জিত সম্পদ আল্লাহর রাহে খরচ করার দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সে একজন মু'মিন ব্যক্তি। যদি তার ঈমান না থাকত, তবে সে আল্লাহর রাহে সম্পদ ব্যয় করত না ; বরং সম্পদের মায়া-মোহে কৃপণতা প্রদর্শন করত। সুতরাং সদকা তার ঈমানের পক্ষে দলিল বা প্রমাণ স্বরূপ। এ জন্যই সাদকাকে দলিল বলা হয়েছে। ২. কিংবা এর অর্থ সদকা দান করা আল্লাহ তা'আলার প্রতি তার ভালোবাসার দলিল। কারণ যদি তার অন্তরে আল্লাহর প্রেম-ভালোবাসা না থাকত, তবে সে স্বীয় কষ্টার্জিত সম্পদ তাঁর আদেশে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্ত ব্যয় করত না। ৩. অথবা এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, বান্দা কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর প্রশ্নের উত্তরে তার সম্পদ সে যে সৎপথে ব্যয় করেছে, এ দাবির সমর্থনে সদকাকে পেশ করবে এবং বলবে আমি আমার সম্পদকে সৎপথে ব্যয় করেছি, সদকা করেছি। অর্থাৎ সদকাকারী সদকাকে তার সম্পদ সৎপথে ব্যয়িত হওয়ার পক্ষে দলিলরূপে পেশ করবে। সে হিসেবে সদকাকে দলিল বলা হয়েছে।

اَلْقُرْاٰنُ حُجَّةٌ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ-এর ব্যাখ্যা : মহানবী ﷺ-এর বাণী— اَلْقُرْاٰنُ حُجَّةٌ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ-এর অর্থ– কুরআন তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে দলিল বা প্রমাণ। আলোচ্য হাদীসাংশের ব্যাখ্যায় মেশকাতের হাশিয়ায় বলা হয়েছে— حُجَّةٌ শব্দের صِلَةٌ - لِ হলে তা দ্বারা পক্ষের এবং عَلٰى হলে তা দ্বারা বিপক্ষের অর্থ বুঝায়। সে হিসেবে اَلْقُرْاٰنُ حُجَّةٌ لَكَ-এর অর্থ হবে, যদি তুমি তোমার ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে কুরআনের অনুশাসন মেনে হলো, তবে তা তোমার পরকালীন নাজাতের পক্ষে দলিল হবে। আর اَلْقُرْاٰنُ حُجَّةٌ عَلَيْكَ-এর অর্থ হবে, যদি কুরআনের বিধান অনুযায়ী না হলো, তবে তা তোমার বিপক্ষে আজাবের দলিল হবে, অর্থাৎ কুরআন তোমার জাহান্নামী হওয়ার কারণ হবে।

মোটকথা, পবিত্র কুরআন বিশ্ব মানবতার বিশেষত মু'মিনদের জন্য হিদায়েত ও করুণার আধার। এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে– وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ এ কুরআনের বিধান অনুযায়ী হলোলেই তা অনুকূলে এবং নাফরমানি করলে তা প্রতিকূলের অবস্থান নেবে।

نُوْرٌ ও ضِيَاءٌ-এর মধ্যকার পার্থক্য :

১. অনেক ইমামের মতে, نُوْرٌ এবং ضِيَاءٌ উভয়ই مُرَادِفٌ শব্দ। এদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

২. ইমাম তীবী (র.)-এর মতে, نُوْرٌ হলো عَامٌ যা সব রকম আলোকে শামিল করে। আর ضِيَاءٌ হলো খাস যা প্রখর ও শক্তিশালী আলোকে বুঝায়।

এখন প্রশ্ন হলো যে, সকল ইবাদতের মূল নামাজের ব্যাপারে نُوْرٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, আর صَبْر -এর জন্য نُوْر হতে তেজ আলোর শব্দ ضِيَاءٌ ব্যবহার হলো কি করে? এর জবাবে বলা যায় যে, এখানে صَبْر শব্দটির অর্থ হলো, ইসলামি শরিয়তের যাবতীয় বিধি-বিধান পালনের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করা। আর তারই একটি মাত্র অঙ্গ হলো নামাজ। এ জন্য সকল বিধি-বিধানের জন্য ব্যাপক صَبْر-এর প্রয়োজন তাই এর বেলায় ضِيَاءٌ শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে এবং তারই অংশ নামাজের জন্য نُوْرٌ ব্যবহার করা হয়েছে।

অথবা, এখানে صَبْر -এর অর্থ– রোজা। রোজার মধ্যেও নামাজের তুলনায় সময়ও বেশি এবং কষ্টও বেশি। তাই তুলনামূলক অধিক সময় ও কষ্টের কাজের ব্যাপারে অধিক প্রখর ضِيَاءٌ ব্যবহার করা হয়েছে।

كُلُّ النَّاسِ يَغْدُوْ فَبَائِعٌ نَفْسَهُ-এর ব্যাখ্যা : মহানবী ﷺ-এর এ বাণীর মর্মার্থ হলো, প্রত্যেক ভোরে মানুষ যখন ঘুম হতে উঠে, তখন সে নতুন জীবন লাভ করে এবং সে নিজেকে মুক্ত করে বা ধ্বংস করে। মহানবী ﷺ অন্য হাদীসে বর্ণনা করেছেন, 'যদি বান্দা ভোরে ঘুম হতে উঠে মসজিদের দিকে যায়, তখন সে সারাদিন আল্লাহর রহমতের বেষ্টনিতে থাকে। কিন্তু যদি সে বাজারের দিকে যায়, তখন সে শয়তানের পতাকা তলে আশ্রয় নেয়'। এরই প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে 'আত্মাকে ক্রয়-বিক্রয় করে'। বস্তুত যদি তার দুনিয়ার যাবতীয় কাজকে আখেরাতমুখী করে তাহলে আত্মাকে জাহান্নাম হতে মুক্তি দিল। আর যদি তা আখেরাত লাভের পরিপন্থি হয়, তবে সে নিজেকে জাহান্নামে ঠেলে দিল। এটাই হলো মুক্ত করা কিংবা ধ্বংস করা। তাই প্রত্যেকেরই নিজ সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত যে, সে নিজেকে কোন দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

لَمْ اَجِدْ هٰذِهِ الرِّوَايَةَ -এর উক্তির তাৎপর্য : لَمْ اَجِدْ هٰذِهِ الرِّوَايَةَ এ বাক্যটি দ্বারা মিশকাতের সংকলক মাসাবীহ গ্রন্থ প্রণেতা আল্লামা বাগাবী (র.)-এর উপর একটি অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। অভিযোগটি হলো হযরত আবূ মালেক আশ'আরী হতে বর্ণিত এ হাদীসটি বুখারী, মুসলিম এমনকি হাদীসের বিখ্যাত ৬ টি গ্রন্থের কোনোটির মধ্যেই নেই, বরং এ রিওয়ায়াতটি দারিমীর মধ্যে রয়েছে। এতদসত্ত্বেও আল্লামা বাগাবী (র.) কি করে উক্ত হাদীসটিকে প্রথম পরিচ্ছেদে স্থান দিয়েছেন? এর উত্তরে কোনো কোনো হাদীস বিশারদ বলেন, সহীহাইনের মধ্যে হাদীসটির পূর্ণ অংশের উল্লেখ না থাকলেও কিছু কিছু অংশের উল্লেখ রয়েছে। এর উপর ভিত্তি করেই ইমাম বাগাবী (র.) উক্ত হাদীসটিকে প্রথম পরিচ্ছেদে স্থান দিয়েছেন।

---

২৬২ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَا يَمْحُو اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطٰى اِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ وَفِىْ حَدِيْثِ مَالِكِ ابْنِ اَنَسٍ فَذَالِكُمُ الرِّبَاطُ فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ مَرَّتَيْنِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِىْ رِوَايَةِ التِّرْمِذِىِّ ثَلٰثًا .

২৬২. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— আমি কি তোমাদেরকে সে বিষয় সম্পর্কে অবহিত করব না, যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা অপরাধসমূহ মিটিয়ে দেন এবং পদমর্যাদা উন্নত করেন। উপস্থিত সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! রাসূল ﷺ বললেন, কষ্ট সত্ত্বেও ভালোভাবে অজু করা, মসজিদের পানে অধিক গমন করা এবং এক নামাজের পর অপর নামাজের জন্য অপেক্ষা করা। এটাই হলো তোমাদের জন্য 'রিবাত' বা প্রস্তুতি। তবে হযরত মালেক ইবনে আনাস (রা.)-এর বর্ণনায় فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ কথাটি দু'বার উল্লেখ করা হয়েছে। –[মুসলিম] তবে তিরমিযীর বর্ণনায় তিনবার উল্লেখ রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

هٰذِهِ الْاَعْمَالُ مُكَفِّرَاتٌ لِلذُّنُوْبِ اَمْ لَا এ সকল আমল দ্বারা পাপসমূহ মাফ হয়ে যায় কি-না? উত্তমরূপে অজু করা, মসজিদে অধিক গমনাগমন এবং এক নামাজের পর অন্য নামাজের জন্য প্রতীক্ষায় থাকার দ্বারা সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায় কি-না? এই বিষয়ে আলিমদের মতামত–

مَذْهَبُ الْجُمْهُوْرِ : জমহুর ওলামার মতে, এ সকল আমল দ্বারা শুধুমাত্র সগীরা গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যায়। হাফেয ইবনে আব্দুল বার বলেন, এ বিষয়ে উম্মতের ইজমা সংঘটিত হয়েছে। তাঁদের দলিল—

١. قَوْلُهُ تَعَالٰى : "اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ" .

٢. قَوْلُهُ ﷺ : "اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ وَ رَمَضَانُ اِلٰى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ.

অপর একদল ইমাম বলেন, অজু দ্বারা সগীরা গুনাহের সাথে কবীরা গুনাহও মাফ হয়। তাঁরা দলিল হিসেবে প্রশ্নে উল্লিখিত হাদীস পেশ করেন—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ "اَلَا اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَا يَمْحُو اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ" .

তবে গ্রহণযোগ্য মত প্রথমটিই। দ্বিতীয় পক্ষের দলিলের জবাবে বলা যায় যে, আলোচ্য হাদীস ও এরূপ অন্যান্য عَامْ রিওয়ায়াতকে مَا اجْتُنِبَ الْكَبَائِرُ এবং مَالَمْ يُؤْتَ كَبِيْرَةً সংযুক্ত রিওয়ায়াত দ্বারা খাস করা হয়েছে, অর্থাৎ কবীরা গুনাহ হতে বিরত থাকলে তার দ্বারা সগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

اِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ-এর মর্মার্থ : আলোচ্য হাদীসে নবী করীম ﷺ-এর বাণী– اِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ অর্থাৎ, "কষ্ট সত্ত্বেও পূর্ণভাবে অজু করা" অজুর উপর গুরুত্ব দেওয়ার জন্য মহানবী এ কথাটি বলেছেন।

এখানে اِسْبَاغٌ শব্দটি বাবে اِفْعَالٌ-এর মাসদার। এর শাব্দিক অর্থ– পরিপূর্ণ করা, যথাযথভাবে পালন করা। এর মর্মার্থ নিম্নরূপ–

১. اِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ হচ্ছে অজুর সমস্ত ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, মোস্তাহাব কাজগুলোকে যথাযথভাবে আদায় করা। অর্থাৎ অজুর সময় প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিপূর্ণ ও সুন্দরভাবে তিন তিনবার ধৌত করা।

২. আবার কোনো কোনো মুহাদ্দিস বলেন, যে পরিমাণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত না করলে নামাজ আদায় হবে না তাই– اِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ আর اَلْمَكَارِهِ শব্দটি বহুবচন, এর একবচন مُكْرَهٌ ; মূলবর্ণ হচ্ছে (ك . ر . ه), শাব্দিক অর্থ– اَلْمَشَقَّةُ বা কষ্ট অথবা اَلْاَلَمُ বা ব্যথা, যন্ত্রণা। এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিশিষ্ট হাদীসবিশারদ আল্লামা তীবী (র.) বলেন, পানি খুব সহজে পাওয়া যাচ্ছে না বা পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু চড়াদামে, এ অবস্থায় তায়াম্মুম না করে অজু করা হলো– مَكَارِهٌ

কারো কারো মতে, পানি যদি খুব ঠাণ্ডা হয় এবং তা ব্যবহার খুব কষ্টসাধ্য হয় আবার এটা যদি শীতের মৌসুমে হয় বা পানি ব্যবহার করলে শরীর অসুস্থ হতে পারে, এ অবস্থায় পানি ব্যবহার করাকে مَكَارِهٌ বলে।

মোটকথা, উল্লিখিত সকল অবস্থায় কষ্ট স্বীকার করে ভালোভাবে অজু করাকে اِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ বলা হয়।

كَثْرَةُ الْخُطٰى اِلَى الْمَسَاجِدِ দ্বারা উদ্দেশ্য : হাদীস বিশারদগণ كَثْرَةُ الْخُطٰى اِلَى الْمَسَاجِدِ -এর নিম্নোক্ত অর্থ পেশ করেছেন। যেমন—

১. নামাজ কিংবা অন্য কোনো ইবাদতের জন্য বেশি বেশি মসজিদে গমন করা।
২. পুনঃ পুনঃ মসজিদে যাওয়া।
৩. মসজিদ ঘরের নিকটে হলে ধীরপদে মসজিদে যাওয়া। কারণ, এতে প্রতি কদম হিসেবে ছওয়াব লাভ করা যায়।
৪. মসজিদের নিকট সংশ্লিষ্ট কাজে আত্মনিয়োগ করা।
৫. দূর থেকে মসজিদে আসা। কারণ এতে কদম বেশি পড়ে।

এ ব্যাপারে মিরকাত প্রণেতা বলেন—

كَثْرَةُ الْخُطٰى اِلَى الْمَسَاجِدِ اِمَّا لِبُعْدِ الدَّارِ اَوْ عَلٰى سَبِيْلِ التَّكْرَارِ وَلَا دَلَالَةَ فِى الْحَدِيْثِ عَلٰى فَضْلِ الدَّارِ الْبَعِيْدَةِ عَنِ الْقَرِيْبَةِ مِنْهُ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ فَاِنَّهُ لَا فَضِيْلَةَ لِلْبُعْدِ فِىْ ذَاتِهِ بَلْ فِىْ تَحَمُّلِ الْمَشَقَّةِ .

অর্থাৎ, দূর হতে মসজিদের দিকে গমন করা অথবা পুনঃ পুনঃ মসজিদে যাওয়া। তবে ঘর-বাড়ি মসজিদ হতে দূরে হলেই যে ছওয়াব বেশি পাওয়া যাবে এমনটি নয়। ইবনে হাজার আসকালানীও এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। মূলত ঘর হতে মসজিদের পথ দূরের কারণে অধিক পথ অতিক্রম করলে যেরূপ অধিক ছওয়াব হবে, তদ্রূপ ঘর-বাড়ি মসজিদের কাছে হলেও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করার লক্ষ্যে ধীরে মন্থরগতিতে পথ অতিক্রম করলে অনুরূপ ছওয়াব পাওয়া যাবে।

اَلْمُرَادُ بِقَوْلِهٖ ﷺ اِنْتِظَارُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ এক নামাজ শেষে অপর নামাজের অপেক্ষায় থাকার দ্বারা উদ্দেশ্য : রাসূলে করীম ﷺ-এর উক্তি اِنْتِظَارُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ তথা এক নামাজের পর পরবর্তী নামাজের প্রতীক্ষায় থাকা। এর অর্থ এই নয় যে, মসজিদে বসে বসে নামাজের অপেক্ষা করতে হব ; বরং এর অর্থ হলো, আল্লাহর ফরজ আদায় করার জন্য সর্বদা তৎপর থাকতে হবে, যেন কোনো অবস্থায় নামাজ ছুটে যেতে না পারে, নামাজ শেষে মসজিদের বাইরেও দুনিয়ার কাজ-কর্মে লিপ্ত হলেও মন সর্বদা মসজিদের দিকে তথা আযান ও নামাজের দিকে লেগে থাকতে হবে। اِنْتِظَارُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ বলতে এটাকেই বুঝানো হয়েছে।

اَلرِّبَاطُ-এর অর্থ ও তার দ্বারা উদ্দেশ্যে : শব্দটি فِعَالٌ ওযনে اِسْمُ مَصْدَرٍ আভিধানিক অর্থ–বাঁধা। যেমন বলা হয়, رَبَطَ الشَّئَ সুদৃঢ় করা, মজবুত করা। যেমন, আল্লাহর বাণী– لَوْلَا اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا

কোনো জিনিসের উপর অটল থাকা। যেমন বলা হয়– رَابَطَ عَلَى الشَّئِ اَىْ وَاظَبَ

اَلرِّبَاطُ-এর পারিভাষিক অর্থ : مَعْنَى الرِّبَاطِ اِصْطِلَاحًا

جَمْهُوْرُ مُحَدِّثِيْنَ-এর মতে— اَلْوُقُوْفُ فِى الْحُصُوْنِ وَمَوْضِعِ الْمَخَافَةِ بِالْاَسْلِحَةِ وَالْاَمْتِعَةِ مُقَابَلَةَ الْاَعْدَاءِ

অর্থাৎ অস্ত্র-শস্ত্রসহ শত্রুর মোকাবেলায় ঘাঁটিতে ভয়ের জলায়গায় দৃঢ়ভাবে অবস্থান করাকে رِبَاطٌ বলে। যেমন, আল্লাহ বলেন– يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَ رَابِطُوْا .

اَلْمُرَادُ بِالرِّبَاطِ هٰهُنَا আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত اَلرِّبَاطُ-এর মর্মার্থ : আলোচ্য হাদীসে رِبَاطٌ বলে মানুষের প্রধান শত্রু শয়তান এবং نَفْس اَمَّارَةٌ-কে দমনের জন্য সদা প্রস্তুত থাকার কথা বলা হয়েছে।

অথবা, কষ্টের সময় পূর্ণভাবে অজু করা, মসজিদের দিকে বেশি যাওয়া এবং এক নামাজের পর অপর নামাজের প্রতীক্ষায় থাকা, এ তিনটি কাজ করার ক্ষেত্রে শয়তান ও কুপ্রবৃত্তির প্ররোচনার বিরুদ্ধে জিহাদ করার অর্থকেই رِبَاطٌ বলা হয়েছে।

অথবা, শুধুমাত্র নামাজের প্রতীক্ষায় থাকাকে বুঝানো হয়েছে।

অথবা, তিনটিকেই বুঝানো হয়েছে, যার উপর ভিত্তি করেই فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ-এর اِسْمُ اِشَارَةٍ আনয়ন করা হয়েছে।

وَعَنْ ٢٦٣ عُثْمَانَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهٖ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِهٖ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৬৩. অনুবাদ : হযরত ওসমান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি অজু করে, আর সে অজু উত্তমরূপে করে, তার পাপসমূহ তার শরীর হতে বের [দূরীভূত] হয়ে যায়। এমনকি তার নখের নিচ হতেও পাপ দূর হয়ে যায়। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

هَلِ الْاٰثَامُ ذُوْ اَجْسَادٍ اَمْ لَا গুনাহ দেহ বিশিষ্ট কি-না? আলোচ্য হাদীসে خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهٖ বাক্যাংশ দ্বারা বুঝা যায় যে, গুনাহেরও শরীর আছে। কেননা, বের হওয়ার জন্য শরীর আবশ্যক। এ বিষয়ে ইমামদের মতভেদ নিম্নরূপ—

১. ইবনুল আরাবী (র.)-এর মতে, এখানে রূপকার্থে গুনাহ বের হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এটা দ্বারা গুনাহ মাফের কথা বুঝানো হয়েছে। কেননা, প্রকৃতপক্ষে গুনাহের কোনো শরীর নেই।

২. ইমাম সুয়ূতী (র.) এটাকে প্রকৃত অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে গুনাহেরও অঙ্গিক রূপ আছে। আর তা হলো গুনাহের ফলে অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। এটা হাদীস দ্বারা সাবেত আছে। তা ছাড়া হজরে আসওয়াদ মূলত সাদা ছিল বান্দার পাপরাশি টেনে নেওয়ার কারণে তা কালো হয়ে গেছে।

ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (রা.) অন্তর চক্ষু দ্বারা অজু গোসলে ব্যবহৃত পানিতে গুনাহ দেখতে পেতেন। এ জন্য তারা ব্যবহৃত পানিকে নাপাক বলেছেন।

وَعَنْ ٢٦٤ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ اَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهٖ كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَظَرَ اِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ اَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَاِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ اَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَاِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَ كُلُّ خَطِيْئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ اَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتّٰى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوْبِ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৬৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— যখন কোনো মুসলমান কিংবা মু'মিন বান্দা অজু করে এবং মুখমণ্ডল ধৌত করে, তখন অজুর পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার মুখমণ্ডল হতে ঐ সকল পাপ দূর হয়ে যায়, যেগুলোর প্রতি সে দু'চোখ দিয়ে তাকিয়েছিল। আর যখন সে হাত ধৌত করে, তখন অজুর পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার হাত হতে ঐ সকল পাপ মুছে যায়, যেগুলো সে দু'হাতে করেছিল। আর যখন সে পা দু'টো ধৌত করে, তখন অজুর পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে ঐ সকল পাপ দূর হয়ে যায়, যেগুলোর দিকে সে হেঁটেছিল। এমনকি শেষ পর্যন্ত সে পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فرائض الوضوء **অজুর ফরজসমূহ :** অজুর ৪টি ফরজ। যথা- ১. মুখমণ্ডল ধৌত করা, ২. দু'হাতের কনুই পর্যন্ত ধৌত করা, ৩. মাথা মাসাহ করা, ৪. দু'পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ধৌত করা।

অজুর ফরজসমূহের দলিল : অজুর ফরজের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন— يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ـ অর্থাৎ, হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন সালাতের আদায়ের ইচ্ছা করবে, তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও দু'হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করো, আর মাথা মাসাহ করো এবং দু'পা গোড়ালি পর্যন্ত ধৌত করো।

وَعَنْ ٢٦٥ عُثْمَانَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ اِمْرِءٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلٰوةٌ مَكْتُوْبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهَا وَخُشُوْعَهَا وَ رُكُوْعَهَا اِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوْبِ مَا لَمْ يُؤْتَ كَبِيْرَةً وَ ذٰلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৬৫. অনুবাদ : হযরত ওসমান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন— যখন কোনো মুসলমানের নিকট ফরজ নামাজের সময় উপস্থিত হয়, আর সে উত্তমরূপে তার অজু, তার বিনয় ও তার রুকু সিজদা করে, তখন সে নামাজ তার পূর্বেকার সমস্ত গুনাহের জন্য কাফফারা হয়ে যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত সে কবীরা গুনাহ না করে। আর এটা সর্বদাই [সর্বযুগে] হয়ে থাকে। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْاِخْتِلَافُ فِىْ كَوْنِ الْحَسَنَاتِ كَفَّارَةً لِلذُّنُوْبِ **নেক কাজে গুনাহের কাফফারা হওয়া সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ :** বান্দার নেক আমল তার কৃত অপরাধের কাফ্ফারা হওয়া না হওয়া নিয়ে ইমামগণের মতামত:

আল্লামা নববী (র.) বলেন, মানুষের নেক আমল দ্বারা শুধুমাত্র তার সগীরা গুনাহ মাফ হয়, কবীরা গুনাহ নয়। আর তার সগীরা গুনাহ না থাকলে কবীরা গুনাহের শাস্তিতে কিছুটা লঘু হওয়ার আশা করা যায়। যদি তার কবীরা গুনাহ না থাকে, তবে তার মর্যাদা বুলন্দ হয়।

মু'তাযিলীগণ বলেন, কবীরা গুনাহ তওবা ব্যতীত মাফ করা হয় না। তবে নেক আমলের কারণে ব্যক্তির সগীরা গুনাহ আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই মাফ করে দেন। তবে শর্ত হচ্ছে, কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকতে হবে।

দলিল : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– إِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ

আশআরীদের মতে, নেক আমল দ্বারা অবশ্যই সগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যায়, যদিও সে তওবা না করে কিংবা কবীরা গুনাহ হতে বেঁচে না থাকে।

দলিল : তাঁদের দলিল হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার বাণী– إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতে, নেক আমল দ্বারা সগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যায়। আর কবীরা গুনাহ মাফ হওয়ার জন্য তওবা শর্ত। তবে তা আল্লাহর উপর বাধ্যতামূলক নয়।

দলিল : তাঁদের দলিল হচ্ছে আল্লাহর তা'আলার বাণী—

١. وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا .

٢. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ .

٣. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ .

٤. هُوَ الَّذِيْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ الخ .

এখানে উল্লেখ্য যে, শিরক ব্যতীত গুনাহসমূহ মাফ হওয়া, তা কবীরাই হোক বা সগীরাই হোক, আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। যদি আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করেন তবে কবীরা গুনাহও তওবা ব্যতীত মাফ করতে পারেন এবং সগীরা গুনাহের জন্যও শাস্তি দিতে পারেন।

وَعَنْهُ ٢٦٦ اَنَّهُ تَوَضَّأَ فَاَفْرَغَ عَلٰى يَدَيْهِ ثَلٰثًا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلٰثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنٰى اِلَى الْمِرْفَقِ ثَلٰثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرٰى اِلَى الْمِرْفَقِ ثَلٰثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهٖ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى ثَلٰثًا ثُمَّ الْيُسْرٰى ثَلٰثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِىْ هٰذَا ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ وُضُوْئِىْ هٰذَا ثُمَّ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيْهِمَا بِشَىْءٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَفْظُهُ لِلْبُخَارِيِّ .

২৬৬. **অনুবাদ** : হযরত ওসমান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি একবার অজু করলেন তখন তিনি দুই হাতের কব্জির উপর পর্যন্ত তিনবার পানি ঢাললেন। অতঃপর কুলি করলেন এবং নাকের ভিতর পানি দিলেন। এরপর নিজের মুখমণ্ডল তিনবার ধুইলেন। পরে ডান হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করলেন এবং বাম হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করলেন, অতঃপর নিজের মাথা মাসাহ করলেন। এরপর ডান পা তিনবার ধুইলেন এবং বাম পাও তিনবার ধুইলেন। এরপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আমার এ অজুর মতো অজু করতে দেখেছি এবং আরও বললেন– যে ব্যক্তি আমার এ অজুর মতো অজু করে অতঃপর দু' রাকাত নামাজ পড়ে যাতে সে আপন মনে এ দু' রাকাতের ধ্যান ছাড়া অন্য কোনো বিষয় না ভাবে, তাহলে তার বিগত জীবনের সগীরাহ গুনাহসমূহ মার্জনা করে দেওয়া হয়। –[বুখারী ও মুসলিম] তবে উল্লিখিত ভাষ্য বুখারী শরীফের।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْمُرَادُ بِقَوْلِهٖ ثُمَّ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ **দুই রাকাত দ্বারা উদ্দেশ্য :** অজু করার পর যে দু' রাকাত নামাজ পড়ার কথা বলা হয়েছে তা হলো তাহিয়্যাতুল অজু। এ দু' রাকাত নামাজ যে কোনো অজুর পরই পড়া যায়। এর জন্য নির্দিষ্ট কোনো ওয়াক্ত নেই। কেউ কেউ একে জুমার নামাজের অন্তর্ভুক্ত করেন। এটি একেবারেই ভুল ধারণা। যে কোনো সময় অজুর পরে দু' রাকাত তাহিয়্যাতুল অজু এবং যে কোনো সময় মসজিদে প্রবেশ করে দু' রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামাজ মোস্তাহাব হিসেবে পড়া যায়। এর জন্য অসংখ্য ছওয়াব রয়েছে।

لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهٗ فِيْهِمَا بِشَيْءٍ **-এর ব্যাখ্যা :** মানুষ নামাজে দণ্ডায়মান হলে শয়তান অসংখ্য কুমন্ত্রণা নামাজির মনে সৃষ্টি করে। এটা প্রায় মানুষেরই হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি এটা পরিহার করে একাগ্রচিত্তে নামাজ পড়তে পারে তার নামাজ দ্বারাই বিগত জীবনের সগীরা গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যায়।

এখানে بِشَيْءٍ দ্বারা কি উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে, এ বিষয়ে হাদীস বিশারদগণ বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন, যা নিম্নরূপ—

১. আল্লামা তীবী (র.) বলেন, بِشَيْءٍ দ্বারা এমন পার্থিব কাজ বা চিন্তাকে বুঝানো হয়েছে, যা নামাজের সাথে সম্পৃক্ত নয়। তিনি আরও বলেন, অবশ্য এ ধরনের চিন্তা জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথে তা পরিহার করত পুনরায় মনকে নামাজের দিকে নিয়ে যাওয়া উচিত, তবেই তার জন্য হাদীসে বর্ণিত ফজিলত লাভ হবে। কেননা, এ ধরনের কল্পনার জন্য আল্লাহ কোনো শাস্তি দেবেন না।

২. আবার কেউ কেউ বলেন, بِشَيْءٍ দ্বারা এমন জল্পনা-কল্পনা বুঝানো হয়েছে, নামাজের সাথে যার কোনো সম্পর্ক নেই, যদিও তা আখিরাত বা পরকাল সম্পর্কিত হোক না কেন।

৩. কেউ কেউ বলেন, হাদীসাংশের মর্মার্থ হলো, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে একাগ্রচিত্তে নামাজ আদায় করা, লোক দেখানো, লোক শুনানো বা আত্মম্ভরিতা সৃষ্টি এ রকম যেন না হয়।

وَعَنْ ٢٦٧ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهٗ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلًا عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهٖ وَ وَجْهِهٖ اِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৬৭. অনুবাদ : হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— যে মুসলমান অজু করে আর তার অজু সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করে। অতঃপর উঠে দুই রাকাত নামাজ পড়ে নিজের অন্তর ও বাহিরকে সম্পূর্ণরূপে [আল্লাহর দিকে] নিবদ্ধ রাখে, তার জন্য জান্নাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٢٦٨ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ اَوْ فَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ وَفِىْ رِوَايَةٍ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا

২৬৮. অনুবাদ : হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— তোমাদের মধ্যে যে কেউ অজু করে এবং অজুকে [সকল নিয়ম-কানুনসহ] পরিপূর্ণভাবে সুসম্পন্ন করে, অতঃপর বলে– اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ [অর্থাৎ, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই, আর মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল] অপর বর্ণনায় আছে যে, اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ [অর্থাৎ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বূদ

عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اِلَّا فُتِحَتْ لَهٗ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ اَيِّهَا شَاءَ هٰكَذَا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِىْ صَحِيْحِهٖ وَالْحُمَيْدِىُّ فِىْ اِفْرَادِ مُسْلِمٍ وَكَذَا اِبْنُ الْاَثِيْرِ فِىْ جَامِعِ الْاُصُوْلِ وَذَكَرَ الشَّيْخُ مُحْىُ الدِّيْنِ النَّوَوِىُّ فِىْ اٰخِرِ حَدِيْثِ مُسْلِمٍ عَلٰى مَا رَوَيْنَاهُ وَزَادَ التِّرْمِذِىُّ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ وَالْحَدِيْثُ الَّذِىْ رَوَاهُ مُحْىُ السُّنَّةِ فِى الصِّحَاحِ مَنْ تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ اِلٰى اٰخِرِهٖ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ فِىْ جَامِعِهٖ بِعَيْنِهٖ اِلَّا كَلِمَةَ اَشْهَدُ قَبْلَ اَنَّ مُحَمَّدًا .

নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল।] তার জন্য আটটি বেহেশতের দরজা খুলে দেওয়া হবে। সে ওগুলোর যে কোনো এক দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করবে। ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে এরূপই বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম হুমাইদী এককভাবে ইমাম মুসলিম বর্ণিত রেওয়ায়াতসমূহের মধ্যে এবং ইবনুল আছীর জামে'উল উসূলেও এরূপই বর্ণনা করেছেন, শায়খ মুহিউদ্দীন নববী (র.) মুসলিম শরীফের হাদীসটি [তাঁর রিয়াযুল সালেহীন গ্রন্থে]– আমরা যেরূপ বর্ণনা করেছি ঠিক সেরূপই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু শেষে একথাটুকু উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম তিরমিযী (র.) এ অংশটুকু বেশি উল্লেখ করেছেন– اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ। [অর্থাৎ হে আল্লাহ আমাকে তওবা কবুলকারীদের অন্তর্ভুক্ত করো এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের দলভুক্ত করুন।] আর মহিউস সুন্নাহ কর্তৃক সহীহ হাদীসসমূহের মধ্যে বর্ণিত হাদীসটির বর্ণনা ছিল নিম্নরূপ– যে অজু করে এবং উত্তমরূপে অজু করে ....। শেষ পর্যন্ত। ইমাম তিরমিযী তাঁর জামে গ্রন্থে সেই হাদীসটি অবিকল নকল করেছেন। তবে তিনি اَنَّ مُحَمَّدًا শব্দের পূর্বে اَشْهَدُ শব্দটির উল্লেখ করেননি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ثُمَّ يَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الخ-এর ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীস থেকে জানা যায় যে, যে ব্যক্তি পরিপূর্ণভাবে অজু করে তারপর اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ পাঠ করে, তার জন্য জান্নাতের ৮টি দরজা খুলে দেওয়া হবে।

১. ইমাম নববী (র.) বলেন, ইমামদের সর্বসম্মত মত হলো অজু করার পর শাহাদাতাইন পাঠ করা মোস্তাহাব।

২. আল্লামা তীবী (র.) বলেন, অজু সমাপনান্তে শাহাদাতাইন পাঠ করার দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অজুর মাধ্যমে শারীরিক অপবিত্রতা দূরীভূত করার পর একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে ইবাদত করার পরিশুদ্ধ মানসিকতা সৃষ্টি এবং অন্তর হতে সব ধরনের শিরক ও হিংসা বিদূরীত করে দেওয়ার মন-মানসিকতা তৈরি করা। অর্থাৎ শাহাদাতাইন পাঠের দ্বারা অন্তরের পবিত্রতা অর্জন হয়।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ-এর ব্যাখ্যা : সর্বদাই মানুষের পিছনে শয়তান লাগা রয়েছে। তাই পাপাচারে লিপ্ত হওয়াই তার সহজাত প্রবৃত্তি। ফলে সর্বদা পাপ হতে মুক্তির জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা প্রত্যেকেরই উচিত। এ জন্যই আলোচ্য হাদীসে অজু সমাপনান্তে আল্লাহর নিকট তওবা করার জন্য বলা হয়েছে। অন্য হাদীসেও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করে বলা হয়েছে— كُلُّكُمْ خَطَّاءُوْنَ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ এদের সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদেরকে ভালোবাসেন।

وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ-এর ব্যাখ্যা : অজুর মাধ্যমে তো মানুষের শারীরিক পবিত্রতা অর্জিত হয়। এতদসত্ত্বেও অজুর শেষে উপরোক্ত দোয়া পাঠ করার কারণ কি ? হাদীসবিশারদগণ এর কয়েকটি জওয়াব দিয়েছেন—

১. বান্দা অজু করে অর্থাৎ পবিত্র হয়ে আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা জানাবে যে, আমি গুনাহে লিপ্ত হয়ে অতীতে যে নাপাক হয়েছিলাম, এখন অজু করে তা থেকে পবিত্র হয়েছি। সুতরাং ভবিষ্যতে যেন অনুরূপভাবে পবিত্র থাকতে পারি, সে ফরিয়াদ তোমার কাছে রইল।

২. অথবা, অজুর দ্বারা বাহ্যিক বা দৈহিক পবিত্রতা অবলম্বন করেছি বটে, তবে আমাকে চারিত্রিক ও নৈতিক অবক্ষয় হতে পবিত্র করে চরিত্রবান লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে দাও।

৩. অথবা, বাহ্যিক ও দৈহিক পবিত্রতা অবলম্বন করাটা আমার সাধ্যের মধ্যে ছিল, তা আমি অবলম্বন করেছি। কিন্তু আত্মিক পবিত্রতা হাসিল করাটা তোমার কুদরত ও অনুগ্রহের অধীনে। সুতরাং তুমি তোমার বিশেষ মেহেরবানীতে আমার অন্তরকেও পবিত্র করে দাও।

৪. অথবা, এটা দ্বারা অজুকারী আল্লাহর শাহী দরবারে এই প্রার্থনা করে যে, হে আল্লাহ! আমি অজু দ্বারা যে পবিত্রতা অর্জন করেছি সেই পবিত্রতার উপর যেন মৃত্যু পর্যন্ত থাকতে পারি।

فُتِحَتْ لَهُ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ-এর ব্যাখ্যা : মহানবী ﷺ উক্ত হাদীসে فُتِحَتْ لَهُ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ বলে বেহেশতের দরজাসমূহ খোলা থাকার যে কথা উল্লেখ করেছেন, প্রকৃতপক্ষে তা দ্বারা জান্নাত অবধারিত হওয়ার কথা বুঝিয়েছেন। যেহেতু তার জন্য জান্নাত অবধারিত, তাই সে যে কোনো দরজা দিয়ে প্রবেশ করার ইচ্ছা করতে পারবে। সব কয়টি দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে এমন কোনো কথা নয় এবং হাদীসের অর্থও তা নয়।

اَسْمَاءُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ আটটি জান্নাতের নাম : মহান স্রষ্টা তার অনুগত বান্দাদের পুরস্কৃত করার জন্য যে আটটি চির শান্তির স্থান তৈরি করেছেন সেগুলোর নামসমূহ নিম্নে উপস্থাপিত হলো—

১. دَارُ السَّلَامِ [দারুস সালাম], ২. دَارُ الْقَرَارِ [দারুল কারার], ৩. دَارُ الْمَقَامِ [দারুল মাকাম], ৪. جَنَّةُ النَّعِيْمِ [জান্নাতুন নাঈম], ৫. جَنَّةُ الْخُلْدِ [জান্নাতুল খুলদ], ৬. جَنَّةُ الْمَاوٰى [জান্নাতুল মাওয়া], ৭. جَنَّةُ عَدْنٍ [জান্নাতু আদ্ন], ৮. جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ [জান্নাতুল ফিরদাউস]।

وَعَنْ ٢٦٩ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اُمَّتِىْ يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ غُرًّا مُّحَجَّلِيْنَ مِنْ اٰثَارِ الْوُضُوْءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يُّطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৬৯. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— আমার উম্মতকে কিয়ামতের দিন জান্নাতের দিকে উজ্জ্বল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট অবস্থায় ডাকা হবে তাদের অজুর চিহ্নের কারণে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার উজ্জ্বলতা দীর্ঘ করতে চায়, সে যেন তা করে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

غُرًّا مُّحَجَّلِيْنَ مِنْ اٰثَارِ الْوُضُوْءِ-এর অর্থ : দু' হাত, দু' পা ও কপাল শুভ্র বা সাদা বর্ণ হওয়াকে 'গোর্‌রে মুহাজ্জাল' বলে। বিশেষ করে যে ঘোড়া এ ধরনের হয় তাকে غُرٌّ مُّحَجَّلٌ বলা হতো। একদা মহানবী ﷺ বললেন, কিয়ামতের দিন আমি আমার উম্মতকে হাশরের মাঠে চিনে ফেলব। তখন সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, এত লোকের মধ্যে আপনি তাদেরকে কিরূপে চিনতে পারবেন? এর জবাবে তিনি বললেন, অজুর চিহ্নের কারণে তারা 'গোর্‌রে মহাজ্জাল' হবে, তা দেখে আমি তাদেরকে চিনতে পারব। মোটকথা, অজুর কারণে তাদের কপাল এবং অন্যান্য অঙ্গ যা অজুর মধ্যে ধোয়া হয়েছে তা ঝলমলে শুভ্র বর্ণের হবে। এটা হবে এ উম্মতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ফলে তা হবে সনাক্তের প্রতীক। অথবা তাদেরকে উক্ত غُرٌّ مُّحَجَّلٌ নামেই আহ্বান করা হবে এবং বলা হবে যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য এদিকে ছুটে আস।

فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يُّطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ-এর ব্যাখ্যা : মহানবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এই নিদর্শনকে বৃদ্ধি করার ক্ষমতা রাখে সে যেন তা করে। এ বাক্যটির কয়েকটি ব্যাখ্যা হতে পারে—

১. মানে ও পরিমাণে বর্ধিত করবে, এভাবে যে অজু করার সময় অজুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ ফরজের সীমা হতে যৎকিঞ্চিৎ অধিক ধৌত করবে, যাতে ফরজের পূর্ণতায় বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ না থাকে। তবে খুব বেশি স্থান ধৌত করা মাকরূহ।

২. অথবা, তার সংখ্যা বেশি করা। যেমন– প্রত্যেক ফরজ ও নফল নামাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন অজু করা এবং অজুর অঙ্গগুলোকে ভালোভাবে ধৌত করা, যাতে অজুর অঙ্গসমূহ শুভ্রতা ও উজ্জ্বলতায় ঝলমলে হয়ে উঠে। যেমনি অন্য হাদীসে এসেছে যে, অজুর উপর অজু করলে তার আমলনামায় দশ নেকী লেখা হয়। নেকী যখন বাড়ে তখন শুভ্রতা বাড়বে। তবে সে অজুর পরে ইবাদত না করলে পুনঃ অজু করা ঠিক নয়।

وَعَنْهُ ٢٧٠ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوْءُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৭০. অনুবাদ : উক্ত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন–মু'মিনের অলঙ্কার [তথা অজুর চিহ্ন] সে পর্যন্ত পৌছবে, যে পর্যন্ত তার অজুর পানি পৌছবে। [মুসলিম]

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٧١ ثَوْبَانَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْتَقِيْمُوْا وَلَنْ تُحْصُوْا وَاعْلَمُوْا اَنَّ خَيْرَ اَعْمَالِكُمُ الصَّلٰوةُ وَلَايُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوْءِ اِلَّا مُؤْمِنٌ . رَوَاهُ مَالِكٌ وَاَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ

২৭১. অনুবাদ : হযরত ছাওবান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন— [হে ঈমানদারগণ !] তোমরা নিজ নিজ কর্মে অটল থাকবে। অবশ্য তোমরা [সকল কর্মে] অটল থাকতে পারবে না। তবে জেনে রাখ যে, তোমাদের সকল কর্মের মধ্যে নামাজই সর্বোত্তম। কিন্তু ঈমানদার ব্যতীত আর কেউই অজুর [যাবতীয় নিয়মের] প্রতি যত্নবান হয় না। –[মালিক, আহমদ, ইবনে মাজাহ্ ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِسْتَقِيْمُوْا-এর ব্যাখ্যা : اِسْتَقِيْمُوْا শব্দটি اِسْتِقَامَةٌ থেকে নির্গত। এর শাব্দিক অর্থ– প্রতিষ্ঠিত থাকা বা স্থির থাকা। পারিভাষিক সংজ্ঞা দিতে গিয়ে কাজি ইয়ায (র.) বলেন–

اَلْاِسْتِقَامَةُ هِيَ اِتِّبَاعُ الْحَقِّ وَالْقِيَامُ بِالْعَدْلِ وَ مُلَازَمَةُ الْمَنْهَجِ الْمُسْتَقِيْمِ

অর্থাৎ, সত্যের অনুসরণ, ন্যায়পরায়ণতার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং সঠিকপথ অবলম্বন করা। রাসূল ﷺ উক্ত হাদীসের মাধ্যমে ন্যায়ের উপর অটুট থাকার নির্দেশ প্রদান করেছেন। আল্লাহ তা'আলাও রাসূল ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন যে, وَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ তবে রাসূল ﷺ এটাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, এটার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা তোমাদের জন্য সহজসাধ্য নয়। তবে সর্বদা চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে সত্য ও ন্যায়ের উপর অবিচল থাকার জন্য। অবশ্য এর দ্বারা রাসূল ﷺ নিজ কর্তব্য পালনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন।

وَلَنْ تُحْصُوْا-এর ব্যাখ্যা : রাসূল ﷺ-এর আলোচ্য বাণীটির ব্যাখ্যা হলো, ন্যায়-পরায়ণতা অবলম্বন করা এবং আমল আখ্‌লাকে ইন্‌সাফের মানদণ্ডের উপর বহাল থাকা খুব একটা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। অবশ্য যদি আল্লাহ তা'আলা কারো প্রতি অনুগ্রহ করেন, তবে তা স্বতন্ত্র কথা। আর সমস্ত আমলের মধ্যে নামাজকে উত্তম আমল বলা হয়েছে, অথচ তাতে অবিচল, অটুট থাকাও সবচেয়ে বেশি কষ্টসাধ্য। আল্লাহ্‌র কালামের ঘোষণা وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِيْنَ অর্থ– খোদাভীরু বিনয়ীরা ব্যতীত অবশ্য এ নামাজ অন্যদের পক্ষে একটা বিরাট মসিবতস্বরূপ। [সূরা বাকারা, আয়াত : ৪৫] মোটকথা, এ হাদীসের সারকথা এই যে, এতে আত্মিক ও দৈহিক উভয় পবিত্রতার উপর অবিচল থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কেউ কেউ لَنْ تُحْصُوْا-এর অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন– তোমরা যথাযথভাবে নিজ কর্তব্য পালনে সক্ষম হবে না বটে, তবে তোমরা আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে চেষ্টা-সাধনায় সামান্যতম ত্রুটি করবে না; বরং শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী তোমাদের চেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

لَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوْءِ اِلَّا مُؤْمِنٌ-এর ব্যাখ্যা : অজু হলো পবিত্রতার অন্যতম মাধ্যম। এটা অতি সহজ বিষয় হলেও সব সময় এই অবস্থায় থাকা সহজসাধ্য কাজ নয়। এমনকি অজুর সকল নিয়ম-কানুন, সুন্নত– মোস্তাহাব সবগুলোসহ অজু করা সবার জন্য সহজ নয়। তবে একমাত্র মু'মিন ব্যক্তিই অজুর সকল নিয়ম-কানুন মেনে অজু করতে পারবে এবং সর্বদা অজুর উপর থাকতে সক্ষম হবে। বস্তুত আল্লাহর ভয় যাদের অন্তরে রয়েছে তারাই সর্বদা অজুর উপর থাকতে পারে।

وَعَنْ ٢٧٢ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ عَلٰى طُهْرٍ كُتِبَ لَهٗ عَشْرُ حَسَنَاتٍ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

২৭২. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— যে ব্যক্তি এক অজু থাকতে উপর পুনঃ অজু করে তার জন্য দশটি নেকী লেখা হয়। −[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : এক অজু থাকা অবস্থায় আরেক অজু করা, তথা সর্বদা অজুর সাথে থাকা অত্যন্ত ছওয়াবের কাজ। তবে একবার অজু করে তা দ্বারা যদি নামাজ পড়া, কুরআন তিলাওয়াত করা বা এ জাতীয় কোনো ইবাদত না করা হয় তব দ্বিতীয়বার অজু করা ঠিক নয়। কেউ কেউ একে মাকরূহ বলেছেন। আর এরূপ ইবাদত করার পর অজু থাকা অবস্থায় যদি দ্বিতীয়বার অজু করে তব উল্লিখিত ১০টি নেকী লাভ করবে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٧٣ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلٰوةُ مِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ الطُّهُوْرُ . رَوَاهُ اَحْمَدُ

২৭৩. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— জান্নাতের চাবি কাঠি নামাজ আর নামাজের চাবিকাঠি পবিত্রতা। −[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : তালাবদ্ধ কোনো গৃহে প্রবেশ করতে হলে সে গৃহের চাবি হস্তগত একান্ত আবশ্যক, অন্যথা সে গৃহে প্রবেশ করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তেমনিভাবে জান্নাতে প্রবেশ করতে হলে ও চাবির দরকার হবে। আর বেহেশতের চাবি হচ্ছে নামাজ। এটা ছাড়া কেউ বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। কেননা নামাজ এমন এক ইবাদত যার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট বান্দার দীনতা ও হীনতা প্রকাশ পায়। আনুগত্যের সর্বোত্তম নিদর্শন এর মধ্যেই পাওয়া যায়। আবার এ নামাজের চাবি হলো পবিত্রতা তথা অজু-গোসল। পবিত্রতা ছাড়া নামাজ হবেই না। কাজেই বুঝা গেল যে, পবিত্রতা নামাজের চাবি। আর নামাজ বেহেশতের চাবি অর্থাৎ এগুলো একটি আরেকটির উপর নির্ভরশীল।

وَعَنْ ٢٧٤ شَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ رَوْحٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى صَلٰوةَ الصُّبْحِ فَقَرَأَ الرُّوْمَ فَالْتَبَسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلّٰى قَالَ مَا بَالُ اَقْوَامٍ يُصَلُّوْنَ مَعَنَا لَا يُحْسِنُوْنَ الطُّهُوْرَ وَاِنَّمَا يُلَبِّسُ عَلَيْنَا الْقُرْاٰنَ اُولٰئِكَ . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

২৭৪. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত শাবীব ইবনে আবূ রাওহ (র.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণের মধ্য হতে এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের নামাজ পড়লেন এবং [নামাজ] সূরায়ে রূম পড়লেন, কিন্তু পড়ায় কিছুটা এলোমেলো হয়ে গেল। অতঃপর তিনি নামাজ শেষ করে বললেন, এ লোকগুলোর কি হয়েছে যে, তারা আমাদের সাথে নামাজ পড়ে, অথচ ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন করে না। এরাই আমাদের কুরআন পাঠে বিঘ্ন [এলোমেলো] সৃষ্টি করে। −[নাসাঈ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِنَّمَا يُلَبِّسُ عَلَيْنَا الْقُرْاٰنَ اُولٰئِكَ-এর ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, মুকতাদির প্রভাব ইমামের উপর প্রতিফলিত হয়। কেননা, দেখা গেল যে, মুকতাদির অজু ঠিকমত না হওয়ায় রাসূল ﷺ-এর কেরাত এলোমেলো হয়ে

গেল, ফলে তিনি নামাজ শেষে এর কারণ ব্যাখ্যা করেন। আর এ কারণে রাসূলে করীম ﷺ বহু হাদীসে উত্তমরূপে অজু করার তাকিদ প্রদান করেছেন। আর ভালোভাবে অজু করার অর্থ হলো– অজুর সকল ফরজ, সুন্নত, মোস্তাহাব ও দোয়া দরূদ যথাযথভাবে পালন করা।

وَعَنْ ٢٧٥ رَجُلٍ مِنْ بَنِى سُلَيْمٍ قَالَ عَدَّهُنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ يَدِىْ اَوْ فِىْ يَدِهٖ قَالَ اَلتَّسْبِيْحُ نِصْفُ الْمِيْزَانِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ يَمْلَاُهٗ وَالتَّكْبِيْرُ يَمْلَاُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَالصَّوْمُ نِصْفُ الصَّبْرِ وَالطُّهُوْرُ نِصْفُ الْاِيْمَانِ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ

২৭৫. **অনুবাদ :** বনী সুলাইম গোত্রের জনৈক [সাহাবী] ব্যক্তি হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার অথবা তাঁর নিজের হাতে [পরবর্তী বর্ণনাকারীর সন্দেহ] গুণে গুণে [পাঁচটি কথা] বললেন যে, 'সুবহানাল্লাহ' বলা পাল্লার অর্ধেক, 'আলহামদুলিল্লাহ' তাকে পূর্ণ করে দেয় এবং 'আল্লাহু আকবার' আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থান পূর্ণ করে দেয়। রোজা ধৈর্যের অর্ধাংশ। আর পবিত্রতা ঈমানের [নামাজের] অর্ধাংশ। –[তিরমিযী এবং তিনি বলেন এ হাদীসটি হাসান।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلتَّكْبِيْرُ يَمْلَاُ مَابَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ-এর ব্যাখ্যা : রাসূল ﷺ বলেন, 'আল্লাহু আকবার' পাঠ করলে আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থান পূর্ণ করে দেওয়া হয়। এর মর্মার্থ হলো– 'আল্লাহু আকবার' বললে যে ছওয়াব হয় তা আসমান ও জমিনের মাঝখানের স্থানকে পরিপূর্ণ করে দেয়।

▮ আল্লামা তীবী (র.) বলেন, 'আল্লাহু আকবার' পাঠের মাধ্যমে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম্য ও অসীম মর্যাদা ঘোষণা করা হয়। অতএব যখন আল্লাহকে শ্রেষ্ঠ মনে করে তাকবীর পাঠ করা হয় তখন আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে এত ছওয়াব প্রদান করেন যে, তা দ্বারা আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থান পূর্ণ হয়ে যায়।

اَلصَّوْمُ نِصْفُ الصَّبْرِ-এর অর্থ : ধৈর্য একটি মানবীয় মহৎগুণ। আল্লাহর কালামে ধৈর্য ও সবরের প্রতি বিশেষ তাকিদ দেওয়া হয়েছে। পূর্বের এক হাদীসে ধৈর্যকে জ্যোতি বলা হয়েছে। আর রোজার মাধ্যমেই ধৈর্যের বাস্তব প্রতিফলন ঘটে। কেননা, রিপুর মুখে রোযার দ্বারাই লাগাম লাগানো হয়। গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, একজন রোজাদারই নফসের বিরুদ্ধে সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত থাকে। ফলে সে ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে বিজয়ী হয়।

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.) এটার ব্যাখ্যায় বলেন, ধৈর্য (صَبْر) সাধারণত দু'প্রকার– ১. অভ্যন্তরীণ ধৈর্য এবং ২. বাহ্যিক ধৈর্য। এ দু'য়ের সমন্বয়ে পরিপূর্ণ ধৈর্যধারণ হয়ে থাকে। রোজার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ধৈর্যের বাস্তব প্রতিফলন ঘটে থাকে। এ জন্যই রোজাকে ধৈর্যের অর্ধেক বলা হয়েছে।

وَعَنْ ٢٧٦ عَبْدِ اللّٰهِ الصُّنَابِحِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَوَضَّاَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَمَضْمَضَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيْهِ وَاِذَا اسْتَنْثَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ اَنْفِهٖ وَاِذَا غَسَلَ وَجْهَهٗ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهٖ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَشْفَارِ عَيْنَيْهِ فَاِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ

২৭৬. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ সুনাবিহী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— যখন কোনো ঈমানদার বান্দা অজু করতে আরম্ভ করে কুলি করে, তখন তার মুখ হতে যাবতীয় পাপ বের হয়ে যায় এবং যখন মুখমণ্ডল ধৌত করে, তখন মুখমণ্ডল হতে যাবতীয় গুনাহ দূর হয়ে যায়— এমনকি চক্ষুদ্বয়ের পাতার নিচ হতেও গুনাহসমূহ বের হয়ে যায়। আর যখন সে তার হস্তদ্বয় ধৌত করে, তখন তার হস্তদ্বয় হতে গুনাহসমূহ বের হয়ে

اَلْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِ يَدَيْهِ فَاِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهٖ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهٖ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ اُذُنَيْهِ فَاِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ اَظْفَارِ رِجْلَيْهِ ثُمَّ كَانَ مَشْيُهٗ اِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلٰوتُهٗ نَافِلَةً . رَوَاهُ مَالِكٌ وَ النَّسَائِىُّ

যায়– এমনকি তার হস্তদ্বয়ের নখের নিচ হতেও। যখন সে মাথা মাসাহ করে, তখন তার মাথা হতে যাবতীয় গুনাহ দূর হয়ে যায়– এমনকি তার কর্ণদ্বয় হতেও। আর যখন তার পদদ্বয় ধৌত করে, তখন তার পদদ্বয় হতে গুনাহসমূহ দূরীভূত হয়ে যায়– এমনকি তার পদদ্বয়ের নখসমূহ হতেও। অতঃপর তার মসজিদের প্রতি গমন এবং নামাজ পড়া তার জন্য অতিরিক্ত কাজ তথা অধিক ছওয়াবের কাজ। –[মালিক ও নাসাঈ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْاِخْتِلَافُ فِىْ مَسْحِ الْاُذُنِ কান মাসাহ সম্পর্কে মতভেদ : কান মাসাহ করার জন্য নতুন করে পানি নেওয়ার প্রয়োজন আছে কি না ? এ বিষয়ে ইমামদের মতভেদ নিম্নরূপ—

مَذْهَبُ الْاَحْنَافِ (رحـ) : ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর অনুসারীদের মতে কান মাসাহ করার জন্য নতুন পানির আবশ্যকতা নেই। সাহাবীগণ ও তাবেয়ীনে কেরাম এ রকমই অভিমত দিয়েছেন। তাঁরা দলিল হিসেবে বলেন—

১. কান মাথারই অংশ বিশেষ, পৃথক কোনো অঙ্গ নয়। সুতরাং মাথা মাসহের পানি দ্বারাই কান মাসাহ করা যাবে।

২. এ ছাড়া উপরে উপস্থাপিত হাদীস দ্বারাও বুঝা যায় যে, কান মাথারই অংশ, যেমন–

خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَاْسِهٖ حَتّٰى تَخْرُجَ خَطَايَا مِنْ اُذُنَيْهِ .

৩. এমনিভাবে অন্য হাদীসে এসেছে— اَلْاُذُنَانِ مِنَ الرَّاْسِ

مَذْهَبُ اَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ : ইমাম শাফেয়ী, মালিক ও আহমদ (র.)-এর মতে, কান মাসাহ করার জন্য নতুন করে পানি নেওয়া আবশ্যক। মাথা মাসাহের পানি দ্বারা কান মাসাহ বিশুদ্ধ হবে না। কেননা, কান একটি স্বতন্ত্র ও পৃথক অঙ্গ তা মাসাহ করার জন্যও পৃথকভাবে নতুন পানি নেওয়া আবশ্যক, অন্যথা কান মাসাহ শুদ্ধ হবে না।

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ : হানাফীদের পক্ষ হতে তাঁদের দলিলের জবাব হলো—

১. যেখানে হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, কান মাথারই অংশ, সেখানে কিয়াস করে কানকে পৃথক অঙ্গ সাব্যস্ত করা ঠিক নয়।

২. আর তারা যে মাথা মাসাহের সময় নেওয়া পানিকে مَاءٌ مُسْتَعْمَلٌ বলেছেন তাও ঠিক নয়। কেননা, হানাফী মাযহাব মতে কান মাসাহের জন্য দু'টি আঙ্গুলকে পৃথক রাখার বিধান রয়েছে। সুতরাং مَاءٌ مُسْتَعْمَلٌ দ্বারা কান মাসাহ করা হয়নি। এ ছাড়া একটি অঙ্গ পরিপূর্ণ মাসাহের পরই পানি مُسْتَعْمَلٌ তথা ব্যবহৃত হবে। আর কানতো মাথারই অংশ হিসেবে তা মাসাহ করার পূর্বে পানিকে মুসতা'মাল বলা ঠিক নয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, সৃষ্টিগতভাবে কান মাথার অংশ এটা বুঝানো উদ্দেশ্য নয় ; বরং রাসূল ﷺ শরিয়তের বিধান বর্ণনা করার জন্য উম্মতের সহজতার জন্য কানকে মাসাহের ব্যাপারে মাথার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

وَصَلٰوتُهٗ نَافِلَةً -এর অর্থ : হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, অজুর দ্বারা গুনাহ মাফ হয়ে যায়। এমনকি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করার সাথে সাথে পাপও ঝরে যায়। এরপর মসজিদে যাওয়া ও নামাজ পড়া অতিরিক্ত। বাহ্যত এর দ্বারা বুঝা যায় যে, নামাজের কোনো গুরুত্বই নেই। মূলত ব্যাপারটি এমন নয় ; বরং অজুর দ্বারা পাপসমূহ মোচন হয়ে যাওয়ার পর নামাজ হবে এমন ইবাদত, যার দ্বারা পাপ মোচনের দরকারই নেই। এটা নামাজিকে উঁচু মর্যাদায় আসীন করবে।

আল্লামা তীবী (র.) বলেন, অজুর অঙ্গসমূহ হতে যে সমস্ত গুনাহ হয়েছিল, তা অজু দ্বারাই কাফ্ফারা হয়ে যায়। তবে পরে যদি অন্য কোনো গুনাহে সগীরা প্রকাশ পায়, মসজিদে গমন এবং নামাজ পড়া দ্বারা তা অতিরিক্ত কাফ্ফারা হয়ে যাবে। আর যদি কোনো সগীরা গুনাহই না থাকে, তবে কবীরার মধ্যে কিছুটা হ্রাস পাবে। অতঃপর তার মর্যাদা বর্ধিত হবে। তবে এই ভ্রান্ত ধারণায় পড়লে হবে না যে, পরে আর নামাজই পড়ার প্রয়োজন নেই। কেননা, তাতো অতিরিক্ত জিনিস সাব্যস্ত হলো। প্রকৃতপক্ষে নামাজ তো গুনাহের কাফ্ফারার জন্য পড়া হয় না; বরং সেটা হলো স্বতন্ত্র বিধান যা সমস্ত মানুষের উপর সমানভাবে প্রয়োগ হচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আম্বিয়ায়ে কেরামগণ। তাঁদের তো কোনো গুনাহ নেই, তবু তাঁরা নামাজ হতে অব্যাহতি পাননি।

وَعَنْ ٢٧٧ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتَى الْمَقْبَرَةَ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ وَدِدْتُّ اَنَا قَدْ رَأَيْنَا اِخْوَانَنَا قَالُوْا اَوَ لَسْنَا اِخْوَانَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَنْتُمْ اَصْحَابِىْ وَاِخْوَانُنَا الَّذِيْنَ لَمْ يَأْتُوْا بَعْدُ فَقَالُوْا كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ اُمَّتِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَرَأَيْتَ لَوْ اَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَىْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ اَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَاِنَّهُمْ يَاْتُوْنَ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنَ الْوُضُوْءِ وَاَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৭৭. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা [জান্নাতুল বাকী' নামক] কবরস্থানে উপস্থিত হলেন এবং কবরবাসীদেরকে (লক্ষ্য করে) বললেন, "তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, হে মু'মিন সম্প্রদায়ের আসল নিবাসের অধিবাসীগণ! ইনশাআল্লাহ আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হব।" আমার আকাঙ্ক্ষা আমরা যেন আমাদের ভাইদেরকে দেখতে পাই। সাহাবীরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমরা কি আপনার ভাই নই? রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তরে বললেন, তোমরা আমার সাহাবী বা সহচর। আমার ভাইগণ হলো তারাই, যারা এখনও এ পৃথিবীতে আগমন করেনি। তখন সাহাবীরা প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আপনি আপনার সে উম্মতদের কিভাবে চিনবেন, যারা এখনও পৃথিবীতে আসেনি? রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তরে বললেন, যদি কোনো ব্যক্তির নিছক কালো একরঙা ঘোড়ার পালের মধ্যে একদল ধবধবে সাদা ললাট ও সাদা পা বিশিষ্ট ঘোড়া থাকে, তবে সে কি তার ঘোড়াসমূহ চিনতে পারে না? তারা বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিশ্চয়ই চিনতে পারে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমার উম্মতও অজুর কারণে ধবধবে সাদা কপাল ও সাদা হস্তপদ হবে এবং আমি [তখন তাদের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য] হাওযে কাওছারের নিকট উপস্থিত থাকব। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

كَيْفَ سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِمْ وَهُمْ مَيِّتُوْنَ কিভাবে নবী করীম ﷺ মৃতদেরকে সালাম করলেন : উপরোক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, নবী করীম ﷺ কবরস্থানে এসে মৃতদেরকে সালাম দিয়েছেন। অথচ তারা মৃত এবং কিছুই শুনতে পায় না। কুরআন মজীদেও বলা হয়েছে যে, فَاِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى অত্রএব হাদীস ও কুরআনের মধ্যে বিরোধ দেখা যাচ্ছে। এর সমাধানকল্পে হাদীসবিশারদগণ নিম্নোক্ত মতামত পেশ করেছেন—

১. কুরআন মাজীদের ভাষাটি কাফিরদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ কাফিরগণকে আপনি দীনের কথা শুনাতে পারবেন না। কারণ, তারা মৃতদের ন্যায়।
২. অথবা, আয়াতের মর্ম হলো– আপনি সে মৃতদেরকে কথা শুনাতে পারবেন না। যখন তারা মৃত হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ পাক নবীর কথা শুনার জন্য তাদের জীবিত করেছেন।
৩. অপর এক হাদীসে পাওয়া যায়, সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! তারা (মৃতগণ) কি শুনতে পায়? হুজুর ﷺ বললেন, তোমাদের ন্যায় তারাও শুনতে পায়, কিন্তু জবাব দিতে পারে না।
৪. অথবা, আয়াতে মৃত বলে জীবিত কাফিরগণকে বুঝানো হয়েছে। তাদের চেতনা ও অনুভূতি ঠিকই রয়েছে ; কিন্তু উপকার গ্রহণ না করার এবং কল্যাণের পথ অনুসরণ না করার জন্য তাদেরকে মৃত ও কবরের লোকের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

৫. অথবা, আলোচ্য হাদীসটি নবী করীম ﷺ -এর জন্য খাস।

৬. আল্লামা কাশ্মীরী (র.) বলেছেন– فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى -এর অর্থ হলো– তারা আপনার কথা দ্বারা উপকৃত হবে না। কেননা, মৃতদের শ্রবণ করার বিষয়টি বিপুল সংখ্যক হাদীস দ্বারা সাবেত হয়েছে।

সর্বোপরি কথা হলো, মৃতেরা জীবিতদের কথা শুনতে পায় এবং তাদের আমল দেখতে পায় তবে জীবিতদের কথায় তারা আমল করতে পারে না। সুতরাং আলোচ্য হাদীস ও পবিত্র কুরআনের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই এবং রাসূল ﷺ-এর মৃতদের সালাম দেওয়া অসঙ্গত নয়।

اَلْمَوْتُ حَقٌّ مُتَيَقَّنٌ فَكَيْفَ قَالَ اِنْشَاءَ اللّٰهُ মৃত্যু অনিবার্য তথাপি মহানবী ﷺ ইনশাআল্লাহ বললেন কেন? : প্রত্যেক প্রাণী যা আল্লাহ তা'আলা এ জগতে সৃষ্টি করেছেন সবই মরণশীল। মানুষ এবং সকল প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে এবং এটা সর্বজন স্বীকৃত। আল্লাহ তা'আলাও বলেছেন– كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ; এ সত্ত্বেও নবী করীম ﷺ ইনশাআল্লাহ কেন বললেন ? এর উত্তরে বলা যায়—

১. মৃত্যু নিশ্চিত হলেও কেউ জানে না তা কখন হবে ? সুতরাং যখনই আল্লাহ ইচ্ছা করবেন তখনই তোমাদের সাথে মিলিত হব, তাই ইনশাআল্লাহ বলেছেন।

২. সন্দেহের জন্য রাসূল ﷺ ইনশাআল্লাহ বলেননি ; বরং বরকত লাভের জন্য বলেছেন। অতএব এতে কোনো সন্দেহ প্রকাশ উদ্দেশ্য নয়।

৩. অথবা, প্রত্যেক কাজে 'ইনশাআল্লাহ' বলার মধ্যে বরকত ও আল্লাহর অনুগ্রহ নিহিত থাকে এ জন্য বলেছেন।

৪. অথবা, ইনশাআল্লাহ বলার পর بِكُمْ শব্দটি বলে হুযূর ﷺ তাদের অর্থাৎ মৃত প্রাণী ও মৃত অন্যান্যদের সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

تَوْضِيْحُ قَوْلِهٖ ﷺ وَدِدْتُ اَنَّا قَدْ رَاَيْنَا اِخْوَانَنَا 'আমরা যেন আমাদের ভাইদেরকে দেখতে পাই'-এর ব্যাখ্যা : মহানবী ﷺ-এর উক্ত বাণীর অর্থ হলো– وَدِدْتُ اَنَّا قَدْ رَاَيْنَا اِخْوَانَنَا "আমরা যেন আমাদের ভাইদেরকে দেখতে পাই।" রাসূল ﷺ যখন একবার জান্নাতুল বাকী'তে গিয়েছিলেন এ বাক্যটি তখন বলেছেন। তথায় গিয়ে কবরবাসীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, আস্সালামু আলাইকুম, হে মু'মিন সম্প্রদায়ের আসল নিবাসের অদিবাসীগণ! ইনশাআল্লাহ আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হব। আর যারা ভবিষ্যতে ঈমান আনবে বা আনার পর্যায়ে আছে তাদের সম্পর্কে বলেছিলেন– وَدِدْتُ اَنَّا قَدْ رَاَيْنَا اِخْوَانَنَا তখন উপস্থিত সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ! কোন ভাইগণ, আমরা কি আপনার ভাই নই? তখন রাসূল ﷺ বলেছিলেন, তোমরা আমার সাহাবী। আমার ভাইয়েরা এখনো পৃথিবীতে আসেনি। এর দ্বারা আসলে তিনি সাহাবীদের ভ্রাতৃত্ব অস্বীকার করেননি।

এ সম্পর্কে ফাতহুল মুলহিম গ্রন্থে বলা হয়েছে, এর দ্বারা সাহাবীদের ভ্রাতৃত্ব অস্বীকার করা হয়নি। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন– اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ বরং সাহাবীদের জন্য অতিরিক্ত আরো একটি মর্যাদা যে রয়েছে তা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। ইমাম নববী ও কাজি ইয়ায (র.)-এর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে বলেন, সাহাবীদের জন্য ভ্রাতৃত্ব এবং সুহবত এ দু'টি গুণ রয়েছে। আর পরবর্তী ঈমানদারদের জন্য শুধু ভ্রাতৃত্ব গুণটি থাকবে।

اَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ -এর অর্থ : فَرَطٌ (ফারতুন) অর্থ– অগ্রগামী, যিনি দলের অগ্রে থেকে তাদের সম্পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করেন। তদ্রূপ মহানবী ﷺ হাশরের ময়দানে উম্মতকে হাউজে কাউছারের পানি পান করানোর জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করবেন। আর সেদিন কাউছারের মালিকও হবেন তিনি। এ মর্মে পবিত্র কুরআনের বাণী–

اِنَّا اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ٠

সেদিন মহানবী ﷺ উম্মতের জন্য হাউযে কাউছারের তীরে অবস্থান করবেন, আর মু'মিনগণ পিপাসায় কাতর হয়ে মহানবী ﷺ-কে খুঁজতে থাকবে। তখন নবী করীম ﷺ আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে তাঁর উম্মতদেরকে হাউজে কাউছারের পানি পান করাবেন।

অথবা, এ কথাটির মর্মার্থ হলো, আমি দুনিয়া হতে অগ্রে বিদায় গ্রহণ করে হাশরের দিকে হাওযে কাওছারের নিকট উপস্থিত থাকব।

وَعَنْ ٢٧٨ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا اَوَّلُ مَنْ يُؤْذَنُ لَهُ بِالسُّجُوْدِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَاَنَا اَوَّلُ مَنْ يُؤْذَنُ لَهُ اَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَانْظُرُ اِلٰى مَا بَيْنَ يَدَىَّ فَاَعْرِفُ اُمَّتِىْ مِنْ بَيْنِ الْاُمَمِ وَمِنْ خَلْفِىْ مِثْلُ ذٰلِكَ وَعَنْ يَمِيْنِىْ مِثْلُ ذٰلِكَ وَعَنْ شِمَالِىْ مِثْلُ ذٰلِكَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَعْرِفُ اُمَّتَكَ مِنْ بَيْنِ الْاُمَمِ فِيْمَا بَيْنَ نُوْحٍ اِلٰى اُمَّتِكَ قَالَ هُمْ غُرٌّ مُّحَجَّلُوْنَ مِنْ اَثَرِ الْوُضُوْءِ لَيْسَ اَحَدٌ كَذٰلِكَ غَيْرُهُمْ وَ اَعْرِفُهُمْ اَنَّهُمْ يُؤْتَوْنَ كُتُبَهُمْ بِاَيْمَانِهِمْ وَ اَعْرِفُهُمْ تَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ ـ رَوَاهُ اَحْمَدُ

২৭৮. অনুবাদ : হযরত আবুদ দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী ﷺ বলেছেন– আমিই প্রথম ব্যক্তি যাকে কিয়ামতের দিন [আল্লাহর দরবারে] সিজদা করার অনুমতি দেওয়া হবে এবং আমিই প্রথম ব্যক্তি যাকে সিজদা হতে মাথা উঠাবার জন্য অনুমতি দেওয়া হবে। অতঃপর আমি আমার সম্মুখে দৃষ্টি প্রসারিত করব এবং সমস্ত নবীর উম্মতের মধ্য হতে আমার উম্মতকে চিনে নেব। অতঃপর আমার পিছন দিকে, ডান দিকে ও বাম দিকে এরূপ দৃষ্টি প্রসারিত করব এবং আমার উম্মতকে চিনে নেব। এ উক্তি শুনে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল,– ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আপনি কিভাবে হযরত নূহ (আ.) হতে আপনার উম্মত পর্যন্ত এত উম্মতের মধ্য হতে আপনার উম্মতকে চিনে নিবেন? উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তারা অজুর কারণে ধবঅজু চকচকে ললাট ও সাদা হাত-পা বিশিষ্ট হবে, অন্যরা কেউ এরূপ হবে না। এতদ্ব্যতীত আমি তাদেরকে এরূপে চিনব যে, তাদের আমলনামা তাদের ডান হাতে প্রদান করা হবে এবং এভাবেও তাদেরকে চিনব যে, তাদের সন্তানগণ তাদের সম্মুখে দৌড়াদৌড়ি করবে। –[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلشَّفَاعَةُ-এর অর্থ ও তার প্রকারভেদ :

شَفَاعَةٌ শব্দটি বাবে فَتَحَ -এর মাসদার। আভিধানিক অর্থ–

১. اَلضَّمُّ তথা মিলানো।

২. جَعْلُ الشَّئِ زَوْجًا তথা কোনো বস্তুকে জোড় করা। যেমন, বলা হয়– شَفَعْتُ الرَّكْعَةَ اَىْ جَعَلْتُهَا رَكْعَتَيْنِ

৩. اَلْمَعُوْنَةُ তথা সাহায্য করা।

৪. اَلتَّوَسُّلُ بِوَسِيْلَةٍ তথা সুপারিশ করা। যেমন– مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيْبٌ مِنْهَا

◗ مَعْنَى الشَّفَاعَةِ عُرْفًا : শরিয়তের পরিভাষায় শাফায়াত হচ্ছে–

১. هِىَ السُّؤَالُ فِى التَّجَاوُزِ عَنِ الذُّنُوْبِ مِنَ الَّذِىْ وَقَعَ الْجِنَايَةُ فِىْ حَقِّهٖ অর্থাৎ, যার অপরাধ হয়েছে তার অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য, কারো নিকট অথবা পদস্থ লোকদের নিকট অনুরোধ করাকে شَفَاعَةٌ বলা হয়।

২. কেউ কেউ বলেন– هِىَ سُؤَالُ الْخَيْرِ لِلْغَيْرِ

৩. কারো কারো মতে– هِىَ دَفْعُ الْعُقُوْبَةِ وَطَلَبُ التَّجَاوُزِ عَنِ الذُّنُوْبِ

শরিয়তের পরিভাষায় শাফায়াত হচ্ছে– هُوَ اَنْ يَطْلُبَ الْاَنْبِيَاءُ وَالصَّالِحُوْنَ وَالشُّهَدَاءُ تَخْلِيْصَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْعَاصِيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ . অর্থাৎ, নবীগণ, পুণ্যবান লোকগণ ও শহীদগণ কর্তৃক গুনাহগার মু'মিনদের জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তির জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করাকে شَفَاعَةٌ বলা হয়।

◗ اَقْسَامُ الشَّفَاعَةِ : ইমাম নববী (র.) বলেছেন যে, شَفَاعَةٌ মোট পাঁচ প্রকার। যেমন–

১. اَلشَّفَاعَةُ الْكُبْرٰى لِتَعْجِيْلِ الْحِسَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : এ শাফায়াত হাশরের ভীতিজনক অবস্থা ও হিসাব-নিকাশ তাড়াতাড়ি হওয়ার জন্য। এটা আমাদের নবীর জন্য খাস।

২. اَلشَّفَاعَةُ لِإِدْخَالِ قَوْمٍ فِى الْجَنَّةِ بِغَيْرِ حِسَابٍ : এক সম্প্রদায়কে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য সুপারিশ করা। এটাও আমাদের নবী ﷺ-এর জন্য খাস।

৩. اَلشَّفَاعَةُ لِقَوْمٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِمْ جَهَنَّمُ : এমন লোকদের জন্য সুপারিশ করা, যাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে গেছে। এটাও হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর জন্য খাস।

৪. اَلشَّفَاعَةُ لِإِخْرَاجِ الْمُوَحِّدِيْنَ مِنَ النَّارِ : ঐ সকল অপরাধী মু'মিনদের জন্য দোজখ থেকে নিষ্কৃতির সুপারিশ করা, যারা জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। এ ধরনের শাফায়াত সকল নবী, ফেরেশতা ও পুণ্যবান লোকেরা করতে পারবেন।

৫. اَلشَّفَاعَةُ لِزِيَادَةِ الدَّرَجَةِ فِى الْجَنَّةِ : বেহেশতীদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ।

মূলকথা হলো, বিভিন্ন দফায় বিভিন্ন রকমে সুপারিশের অধিকার মহানবী ﷺ লাভ করবেন। আর এই সব সুপারিশই কবুল করা হবে। আর যখন সুপারিশকারীদের সুপারিশ শেষ হয়ে যাবে, তখন দয়াময় আল্লাহ তা'আলা সামান্যতম উপলক্ষ্য দ্বারাও অনেক মানুষকে নিজের রহমতের দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। যেমন, একদল সম্পর্কে বলা হবে– هٰؤُلَاءِ عُتَقَاءُ الرَّحْمٰنِ اَدْخَلَهُمُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ অর্থাৎ, এ সকল লোক আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ক্ষমাপ্রাপ্ত। তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা কোনো আমল ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন।

اَلْاِخْتِلَافُ فِىْ جَوَازِ الشَّفَاعَةِ لِاَهْلِ الْكَبَائِرِ কবীরা গুনাহকারীর জন্য সুপারিশের ব্যাপারে মতভেদ :
আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতে কবীরা গুনাহে লিপ্ত মু'মিনদের জন্য নবী-রাসূলগণ আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবেন।

তাঁদের দলিল :

١ـ قَوْلُهُ تَعَالٰى يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِىَ لَهُ قَوْلًا .

٢ـ وَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَيْضًا "وَلَا يَشْفَعُوْنَ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى" .

٣ـ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلٰثَةٌ : اَلْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الشُّهَدَاءُ .

٤ـ عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ شَفَاعَتِىْ لِاَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ اُمَّتِىْ .

মু'তাযিলা ও খারেজীদের মতে, কিয়ামতের দিনে এরূপ মু'মিনদের শাফায়াত স্বীকৃত নয়। কেননা তারা চির জাহান্নামী হবে।

তাঁদের দলিল :

١ـ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِيْنَ .

٢ـ مَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَلَا شَفِيْعٍ يُطَاعُ .

٣ـ وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ .

জবাব : আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত খারেজী ও মু'তাযিলাদের উপরোক্ত বক্তব্য ও দলিলের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন, তাঁদের উপস্থাপিত উপরোক্ত আয়াতগুলো মূলত কাফিরদের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে, مُؤْمِنْ عَاصِىْ-এর শানে নাজিল হয়নি। সুতরাং তাঁদের এ দলিল এ মাসআলার ব্যাপারে সঠিক নয়।

وَاَعْرِفُهُمْ اَنَّهُمْ يُؤْتَوْنَ كُتُبَهُمْ الخ-এর ব্যাখ্যা : অধিকাংশ আলিমদের মতে কাফির-মুশরিক ব্যতীত সকল মুসলমান তথা সমস্ত নবীর উম্মতের মধ্যে ঈমানদারদেরকে ডান হাতে এমনকি ফাসিক মু'মিনদেরকেও ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে। সুতরাং এ নিদর্শন দ্বারা উম্মতে মুহাম্মাদীকে চেনার উপায় কিরূপে হবে ? এর উত্তরে বলা হয় যে, সম্ভবত উম্মতে মুহাম্মাদীকে সমস্ত উম্মতের পূর্বে ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে, ফলে এটা দ্বারা নবী করীম ﷺ সর্বাগ্রে তাঁদেরকে চিনে ফেলবেন। অথবা প্রথম নিদর্শন হবে غُرٌّ مُحَجَّلٌ এবং দ্বিতীয় নিদর্শন হবে ডান হাতে আমলনামা দেওয়া।

مَعْنٰى قَوْلِهِ تَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ এর অর্থ : আল্লামা ইবনে হাজার (র.) বলেন, মুখমণ্ডল শুভ্র ও চকচকে হওয়া যেমন এ উম্মতের একটি বৈশিষ্ট্য, আমলনামা ডান হাতে প্রদান করা এবং তাদের শিশু-সন্তানগণ তাদের সম্মুখে দৌড়াদৌড়ি করাটাও তাদের অন্যতম দু'টি নির্দশন। হাদীসের ভাষ্যে এটাই প্রতীয়মান হয়। এ বাক্য হতে এ কথাও প্রতিভাত হয় যে, মু'মিনদের শিশুগণ জান্নাতী হবে।

তবে আল্লামা তীবী (র.) বলেন, কেবলমাত্র غُرٌّ مُحَجَّلٌ ই একমাত্র একটি পৃথকীকরণ চিহ্ন। আর শেষোক্ত দু'টি পৃথকীকরণ চিহ্ন নয় ; বরং এ উম্মতের প্রশংসা করা ও আনন্দ দানের জন্য বলা হয়েছে।

بَابُ مَا يُوْجِبُ الْوُضُوْءَ

পরিচ্ছেদ : যেসব কারণে অজু করা আবশ্যক হয়

যেসব কারণে অজু করতে হয় তাকে "مُوْجِبَاتْ وُضُوْء" বলে। আর যে সব কারণে অজু ভঙ্গ হয় সেগুলোকে "نَوَاقِضْ وُضُوْء" বলা হয়। মূলত উভয়টি এক। শরিয়তের বিধানানুযায়ী অজু ওয়াজিব হওয়ার জন্য তিনটি স্তরের বস্তু রয়েছে। যথা–

প্রথমতঃ শরীর হতে এমন বস্তু বের হওয়া, যার ফলে সকল ওলামার মতে অজু ওয়াজিব হয়। যেমন– পেশাব, পায়খানা, বায়ু ইত্যাদি বের হওয়া।

দ্বিতীয়তঃ এমন কর্ম যার ফলে অজু ভঙ্গ হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে ফুকাহাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যেমন– পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করা।

তৃতীয়তঃ এমন কাজ, যার কারণে অজু ভঙ্গ হওয়ার ব্যাপারে হাদীসের শব্দ দ্বারা কিছুটা সংশয়ের সৃষ্টি হয় ; কিন্তু ফুকাহাদের সর্বসম্মতিক্রমে তা পরিত্যাজ্য। যেমন– আগুনে পাকানো কোনো বস্তু ভক্ষণ করা।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٧٩ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُقْبَلُ صَلٰوةُ مَنْ اَحْدَثَ حَتّٰى يَتَوَضَّأَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৭৯. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– যার অজু ভঙ্গ হয়েছে, তার নামাজ কবুল হয় না ; যতক্ষণ পর্যন্ত না সে অজু করে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَعْرِيْفُ الْحَدَثِ **হদসের সংজ্ঞা :** সাধারণত যেসব কারণে অজু ও গোসল ওয়াজিব হয় তাকে حَدَثٌ বলা হয়। জনৈক ব্যক্তি হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, 'হদস' কি? তিনি উত্তরে বলেন, মলদ্বার দিয়ে সশব্দে বা বিনা শব্দে কোনো কিছু [বায়ু] বের হওয়াকে হদস বলে। এখানে শুধু একটি বিষয়কে حَدَثٌ বলা হলেও যেসব কারণে অজু গোসল আবশ্যক তাকেই حَدَثٌ বলা হয়।

আর এ حَدَثٌ দু' প্রকার।

১. حَدَثْ اَصْغَرْ : যার ফলে শুধু অজু ওয়াজিব হয়। যেমন– মল, মূত্র, বায়ু, মযী ইত্যাদি বের হওয়া।

২. حَدَثْ اَكْبَرْ : যার ফলে গোসল ওয়াজিব হয়। যেমন– হায়েয ও নেফাসের রক্ত এবং বীর্য বের হওয়া।

٢٨٠ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُقْبَلُ صَلٰوةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُوْلٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৮০. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– পবিত্রতা ব্যতীত নামাজ আর হারাম মালের সদকা কবুল হয় না। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لَا تُقْبَلُ صَلٰوةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ**-এর ব্যাখ্যা :** উক্ত হাদীসের এ অংশ দ্বারা বুঝা যায় যে, পবিত্রতা ব্যতীত নামাজ কবুল হয় না। অথচ সকল ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, পবিত্রতা ব্যতীত নামাজ শুদ্ধই হয় না। যখন নামাজ বিশুদ্ধই হয় না, তখন তা কবুল হওয়ার তো প্রশ্নই উঠতে পারে না। সুতরা এখানে পবিত্রতা ব্যতীত নামাজ কবুল হয় না বলার কি কারণ?

এর জবাবে বলা যায় যে, قَبُوْل দু' রকম। যথা–

১. قَبُوْل إِصَابَتْ : এটা হলো– اَدَاءُ الْحُكْمِ مَعَ الشَّرَائِطِ وَالْاَرْكَانِ এ এ কবুলকে قَبُوْل صِحَّةْ ও বলা হয়। আর উক্ত হাদীসে لَا تُقْبَلُ দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, لَا تَصِحُّ صَلٰوةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ

২. قَبُوْل إِجَابَتْ : যার উপর ছওয়াব নির্ভর করে। এটাকে قَبُوْل إِثَابَتْ ও বলা হয়। এটা না হলে নামাজ হয়ে যাবে তবে ছওয়াব পাওয়া যাবে না। যেমন অন্যান্য হাদীসে এসেছে–

(১) لَا تُقْبَلُ صَلٰوةُ الْاٰبِقِ حَتّٰى يَرْجِعَ ۔ (২) مَنْ اَتٰى عَرَّافًا لَا تُقْبَلُ صَلٰوتُهُ اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا ۔

উক্ত হাদীসদ্বয়ে قَبُوْل দ্বারা ছওয়াব না পাওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে।

مَسْئَلَةُ فَاقِدِ الطَّهُوْرَيْنِ যে ব্যক্তি পানি বা মাটি কিছুই পায় না তার মাসআলা : যদি কেউ অজু বা তায়াম্মুম করার জন্য পানি বা মাটি কিছুই না পায়, [যেমন– কেউ চাঁদে গেল] তখন সে কিভাবে নামাজ পড়বে এই বিষয়ে ইমামদের মতভেদ রয়েছে।

- ইমাম নববী (র.) বলেন, এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী হতে চারটি অভিমত পাওয়া যায়, যথা–

১. يَجِبُ عَلَيْهِ اَنْ يُّصَلِّىَ عَلٰى حَالِهِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ اَنْ يُعِيْدَ لِاَنَّهُ عُذْرٌ نَادِرٌ فَلَمْ تَسْقُطِ الْاِعَادَةُ ۔ অর্থাৎ, তখন নামাজ পড়া তার উপর আবশ্যক তবে পুনরায় আদায় করতে হবে।

২. لَا يُصَلِّىْ بَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ اَنْ يُصَلِّىَ وَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ۔ অর্থাৎ, সে অবস্থায় নামাজ পড়া তার জন্য হারাম, তার উপর কাযা করা ওয়াজিব।

৩. يُسْتَحَبُّ اَنْ يُّصَلِّىَ وَ يَجِبُ الْقَضَاءُ অর্থাৎ, তখন নামাজ পড়া মোস্তাহাব, তবে পরে কাযা করা ওয়াজিব।

৪. يَجِبُ اَنْ يُصَلِّىَ وَلَا يَجِبُ الْقَضَاءُ অর্থাৎ, সে অবস্থায় নামাজ পড়া ওয়াজিব এবং কাযা পড়া আবশ্যক নয়।

এটা ইমাম আহমদের মাশহুর বর্ণনা। তবে শাফেয়ীদের বিশুদ্ধ قَوْل হলো প্রথমটি।

- ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, তখন সে নামাজ পড়বে না ; বরং সে পরে قَضَاءْ করবে لَا يُصَلِّىْ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ। এটা ইমাম মালিকেরও প্রসিদ্ধ অভিমত কথা।
- ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, তখন সে يَتَشَبَّهُ بِالْمُصَلِّىْ তথা নামাজের মতো করবে, যেমন রমজানে حَيْض হতে পবিত্র হয়ে বাকি সময় রোজাদারের মতো উপবাস থাকতে হয়, তেমনি এরূপ ব্যক্তি নামাজির মতো রুকূ-সিজদা করবে, তবে নামাজের নিয়ত করবে না এবং পড়ে কাযা করে নেবে। এ মতের উপরই ফতোয়া। ইমাম আবূ হানীফা (র.) পরে এ অভিমত গ্রহণ করেছেন বলে জানা যায়।

مَعْنَى الْغُلُوْلِ : اَلْغُلُوْلُ শব্দের غَيْن-এর উপর পেশ দিয়ে পড়া হয়। এর শাব্দিক অর্থ হলো– اَلْخِيَانَةُ فِىْ مَالِ الْغَنِيْمَةِ অর্থাৎ, গনিমতের মাল আত্মসাৎ করা। যেমন কুরআনে এসেছে– وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَغُلَّ তবে এখানে غُلُوْل দ্বারা উদ্দেশ্য হলো– اَلْمَالُ الَّذِىْ حَصَلَ بِسَبَبٍ حَرَامٍ তথা হারাম পন্থায় অর্জিত সম্পদ।

'দুররে মুখতার' কিতাবে লেখা আছে– مَنْ تَصَدَّقَ مِنْ مَالٍ حَرَامٍ وَنَوَى الْقُرْبَةَ يَخْشٰى اَنْ يَكْفُرَ অর্থাৎ, 'পুণ্য লাভের ইচ্ছায় যে ব্যক্তি অবৈধ মাল সাদ্‌কা করল। আশঙ্কা আছে যে, সে কাফির হয়ে যাবে'। 'হিদায়া' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে লেখা আছে, যদি কারো কাছে অবৈধ মাল সঞ্চিত হয়, অথচ তার মালিকের পরিচয় জানা না যায়, তাহলে সে মাল অন্য কোনো দুস্থকে দিয়ে দেবে, এতে ছওয়াবের আশা করবে না। যদিও এ দানে ছওয়াব পাওয়া যাবে না। তবে শরিয়তের এ নির্দেশ পালনের ছওয়াব অবশ্যই পাবে। আল্লামা ইবনে কায়্যেম তাঁর 'বাদায়েউল ফাওয়ায়েদ'-এ বলেছেন– যার নিকট অবৈধ মাল সঞ্চিত হয়, যদি সে তা সদকা করে দেয়, তবে সে ছওয়াব পাবে। এ ছওয়াব সদকার কারণে নয়; বরং শরিয়তের নির্দেশ পালনের কারণে।

وَعَنْ ٢٨١ عَلِيٍّ (رضـ) قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَكُنْتُ اَسْتَحْيِ اَنْ اَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ لِمَكَانِ اِبْنَتِهِ فَاَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৮১. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার অত্যধিক মযী নির্গত হতো, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কন্যা [বিবি ফাতেমা] আমার পত্নীরূপে থাকার কারণে নবী করীম ﷺ-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করতাম, তাই আমি [এ সম্পর্কে শরিয়তের বিধান কি? তা জেনে নিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞেস করার জন্য] মিকদাদকে বললাম, তখন সে রাসূলল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল, উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে ব্যক্তি প্রথমে পুরুষাঙ্গ ধুয়ে ফেলবে, অতঃপর অজু করবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْفَرْقُ بَيْنَ الْمَنِيِّ وَالْمَذِيِّ وَالْوَدِيِّ মনী, মযী ও ওদীর মধ্যকার পার্থক্য : এ তিনটি বস্তুর পার্থক্য নিম্নরূপ– যৌন উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থায় পুরুষাঙ্গ হতে যে গাড় বা তরল পদার্থ নির্গত হয় এবং যা দ্বারা স্ত্রীর গর্ভের সন্তান জন্ম লাভ করে, তাকে "مَنِيّ" বা বীর্য বলা হয়। স্ত্রী সঙ্গম, স্বপ্নদোষ, কল্পনা প্রসূত কামোত্তেজনা যে কোনো কারণেই এটা নির্গত হোক না কেন, তার জন্য গোসল করা ওয়াজিব হবে। [মনী বের হওয়ার পর কিছুটা দুর্বলতা অনুভূত হয়।]

- সাধারণ কামভাব উদ্রেক হওয়ার ফলে চরম কামোত্তেজনা ব্যতীত খানিকটা আঠা জাতীয় যে তরল পদার্থ বের হয় তাকে مَذِيٌ বলে। এটা বের হওয়ার পর শরীরে দুর্বলতা আসে না; কামস্পৃহা বৃদ্ধি পায়।
- আর فَتْحُ الْمُلْهِم রয়েছে যে, স্বামী-স্ত্রীর জড়া জড়ি, সঙ্গমের স্মরণ বা ইচ্ছার সময় যা বের হয় তাই (مَذِيٌ) মযী।
- ইবনে হাজার একে مَاءٌ اَصْفَرُ বলেছেন।
- এটা বের হলে পুরুষাঙ্গ এবং কাপড়ে বা শরীরের অন্যকোনো স্থানে লাগলে তা ধৌত করে নিলেই তা পবিত্র হয়ে যায়।
- আর কোনোরূপ উত্তেজনা ছাড়াই পেশাবের আগে বা পরে কিংবা কোথ দিলে বা বোঝা বহন করলে অথবা রোগের কারণে যে সাদা ও গাঢ় পদার্থ বিনা বেগে বের হয় তাকে وَدِيٌّ [ওদী] বলে। এটা বের হওয়ার ফলেও গোসল ওয়াজিব হয় না, শুধুমাত্র অজু ভঙ্গ হয়। পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ ধৌত করে অজু করে নিলেই পবিত্রতা অর্জিত হয়।

وَعَنْ ٢٨٢ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ تَوَضَّؤُوْا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ قَالَ الشَّيْخُ الْاِمَامُ الْاَجَلُّ مُحْيِ السُّنَّةِ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ : هٰذَا مَنْسُوْخٌ بِحَدِيْثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৮২. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আগুনে পাকানো খাদ্য গ্রহণের পর তোমরা অজু করে। –[মুসলিম]

শায়খ মুহীউস সুন্নাহ আল্লামা বাগাবী (র.) বলেন, এ হাদীসের নির্দেশ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) -এর হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বকরির উরুর গোশত খেলেন, অতঃপর নামাজ পড়লেন অথচ অজু করেননি। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْاِخْتِلَافُ فِى الْوُضُوْءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ আগুনে পাকানো খাদ্য গ্রহণের পর অজু করা নিয়ে মতভেদ : আগুনে পাকানো খাবার খেলে অজু করতে হবে কি-না, এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মতবিরোধ ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে তা দূরীভূত হয়ে যায়। তাই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, আবূ হুরায়রা, যায়েদ ইবনে সাবিত প্রমুখ মনে করতেন যে, আগুনে পাকানো খাবার খাওয়ার পর অজু করা ওয়াজিব।

তাঁদের দলিল ছিল– ١. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ تَوَضَّؤُوْا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ .

٢. عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ الْوُضُوْءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ .

পক্ষান্তরে উপরিউক্ত কয়েকজন সাবাহাবায়ে কেরাম ব্যতীত অন্যান্য সাহাবীগণ এবং ইমাম আবূ হানীফা, মালেক, শাফেয়ী, আহমদ ও ইবনুল মুবারক (র.)-এর মতে, আগুনে পাকানো খাদ্য খাওয়ার পর অজু করা ওয়াজিব নয়। তাঁদের দলিল–

١. حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

٢. عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ اَكَلْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ وَمَعَ اَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ خُبْزًا وَلَحْمًا فَصَلَّوْا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

٣. وَعَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ كَانَ اٰخِرُ الْاَمْرَيْنِ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ تَرْكُ الْوُضُوْءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ .

প্রথম পক্ষে উল্লিখিত হাদীসসমূহের জবাব :

১. যে সকল হাদীসে অজু না করার কথা বর্ণিত হয়েছে ঐ সকল হাদীস দ্বারা অজু ওয়াজিব হওয়ার হুকুম রহিত হয়ে গেছে।

২. অথবা, অজু করার আদেশ সম্বলিত হাদীসমূহে অজু দ্বারা وُضُوْء شَرْعِىْ উদ্দেশ্য নয় ; বরং তা দ্বারা وُضُوْء لُغْوِىْ অর্থাৎ হাতমুখ ধৌত করা উদ্দেশ্য।

৩. অথবা, তা দ্বারা পানিভেজা হাতে অজুর স্থানসমূহ মাসাহ করে নেওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে।

৪. শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলোবী (র.) বলেন, এখানে বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য অজু করা মোস্তাহাব, সবার জন্য নয়।

وَعَنْ ٢٨٣ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (رض) اَنَّ رَجُلًا سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوْمِ الْغَنَمِ؟ قَالَ اِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَاِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأْ قَالَ اَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوْمِ الْاِبِلِ؟ قَالَ نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُوْمِ الْاِبِلِ قَالَ اُصَلِّىْ فِىْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ اُصَلِّىْ فِىْ مَبَارِكِ الْاِبِلِ؟ قَالَ لَا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৮৩. অনুবাদ : হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করল যে, আমরা কি বকরির গোশত খেয়ে অজু করব? রাসূলুল্লাহ ﷺ জবাবে বললেন, তোমার ইচ্ছা হলে করতে পার। আর যদি ইচ্ছা হয় তবে নাও করতে পার। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, আমরা কি উটের গোশত খেয়ে অজু করব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ উটের গোশত খেয়ে অজু কর। সে পুনঃ বলল, আমরা কি ছাগল ভেড়ার খোয়ারে নামাজ পড়তে পারব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ পড়তে পার। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কি উটের আস্তাবলে নামাজ পড়তে পারি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, না। [কেননা, উট আক্রমণ করতে পারে কিংবা উটের পেশাবের ছিটা পড়তে পারে।] –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِى الْوُضُوْءِ بَعْدَ اَكْلِ لُحُوْمِ الْاِبِلِ উটের গোশত খাওয়ার পর অজু করা সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ : উটের গোশত খাওয়ার পর অজু করা আবশ্যক কি না? এ বিষয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যা নিম্নরূপ—

- ইমাম আহমদ, ইসহাক, আবূ বকর, ইবনে খুযাইমাসহ কিছু সংখ্যকের মতে উটের গোশত খাওয়ার পর অজু ভেঙ্গে যায়, তাই অজু করা আবশ্যক।

তাঁদের দলিল হলো : (١) عَنْ جَابِرٍ (رض) اَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِىِّ ﷺ اَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوْمِ الْاِبِلِ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُوْمِ الْاِبِلِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(٢) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (رض) قَالَ سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الْوُضُوْءِ مِنْ لُحُوْمِ الْاِبِلِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَوَضَّؤُوْا مِنْهَا . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

- ইমাম আবূ হানীফা, শাফেয়ী, মালেক (র.) সহ জমহুর ওলামার মতে, উটের গোশত খাওয়ার ফলে অজু ভঙ্গ হয় না, তাই অজু করা ওয়াজিব নয়। তাঁদের দলিল—

১. কেননা, উটের গোশত مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ -এর অন্তর্ভুক্ত। আর তাতে যখন অজু বিনষ্ট হয় না, তখন উটের গোশত খাওয়ার ফলেও অজু বিনষ্ট হবে না।

২. হযরত শায়খুল আদব (র.) বলেন, কোনো হারাম বস্তু খেলেও অজু বিনষ্ট হয় না, তবে সে গুনাহগার হয়, আর উটের গোশত তো হলাল। কাজেই এখানে তো অজু ওয়াজিব হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ তাঁদের দলিলসমূহের জবাব :

১. شَاهْ وَلِيُّ اللّٰهِ (رحـ) বলেন, উটের গোশত বনী ইসরাঈলদের জন্য হারাম ছিল, আর اُمَّتْ مُحَمَّدِيَّةٌ -এর জন্য তা যখন হালাল হলো তখন شُكْرِيَّةٌ স্বরূপ অজু করতে বলা হয়েছে نَاقِضْ وَضُوْء হিসেবে নয়।

২. অথবা, এখানে وُضُوْء দ্বারা وَضُوْء لَغْوِى তথা হাত মুখ ধোয়া উদ্দেশ্য।

اَلْاِخْتِلَافُ فِى الصَّلٰوةِ فِىْ مَبَارِكِ الْاِبِلِ উটের আস্তাবলে নামাজ আদায়ের ব্যাপারে মতানৈক্য :

উটের আস্তাবলে নামাজ পড়া জায়েজ কি না? এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়—

مَذْهَبُ اَحْمَدَ بْنُ حَنْبَلٍ (رحـ) : ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক এবং আহলে যাহেরের মতে, উটের আস্তাবলে নামাজ পড়া সম্পূর্ণরূপে হারাম, কোনো অবস্থাতেই সেখানে নামাজ পড়া বৈধ নয়। কেউ যদি পড়ে ফেলে তবে তা পুনরায় আদায় করতে হবে। তাঁরা দলিল হিসেবে নিম্নোক্ত হাদীসমূহ উপস্থাপন করেন–

١. عَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ اُصَلِّىْ فِىْ مَبَارِكِ الْاِبِلِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ لَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

٢- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (رضـ) سُئِلَ النَّبِىُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الصَّلٰوةِ فِىْ مَبَارِكِ الْاِبِلِ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ لَاتُصَلُّوْا فِىْ مَبَارِكِ الْاِبِلِ - رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ

مَذْهَبُ اَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ : ইমাম আবূ হানীফা, শাফিয়ী এবং মালিক (র.)-এর মতে, উটের আস্তাবলে নাপাকী থাকাবস্থায় নামাজ পড়া হারাম; কিন্তু নাপাকী না থাকলে মাকরূহে তানযীহীর সাথে নামাজ আদায় হয়ে যাবে। তাঁদের দলিল হলো নিম্নোক্ত হাদীসমূহ–

١- عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رضـ) اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ جُعِلَتِ الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا - رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ

٢- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رضـ) اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ الْاَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ اِلَّا الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةُ

٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُصَلِّىْ اِلٰى بَعِيْرِهٖ -

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ তাঁদের দলিলসমূহের জবাব :

১. তাহাবী শরীফে বর্ণিত আছে যে, কোনো ইমামের মতেই উট এবং বকরির পেশাবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, হুকুমের ব্যাপারে উভয়ই সমান। যেসব হাদীসে উটের আস্তাবলে নামাজ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে, সেসব বর্ণনায় আবার বকরি বা ভেড়ার খোয়াড়ে নামাজের বৈধতার কথা উল্লিখিত হয়েছে। সুতরাং উটের আস্তাবলে নামাজ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ নাপাকী নয় ; বরং প্রকৃত কারণ সম্পর্কে শুরাইক ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, উটের মালিকদের অভ্যাস ছিল উটের আস্তাবলের আশপাশে পেশাব পায়খানা করত ; ফলে তা সর্বদা নাপাক থাকত। আর এ জন্যই উটের আস্তাবলে নামাজ পড়া নিষিদ্ধ হয়েছে, উটের পেশাব পায়খানার জন্য নয়। অপর দিকে বকরির মালিকদের এরূপ অভ্যাস ছিল না বিধায় বকরি ও ভেড়ার খোয়ারে নামাজ আদায়কে বৈধ বলা হয়েছে।

২. অথবা, বলা যেতে পারে যে, উটের আস্তাবলে নামাজ পড়লে নামাজি তার দ্বারা আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, এতে নামাজের একাগ্রতা বিনষ্ট হয় এই কারণে নিষিদ্ধ হয়েছে।

৩. অথবা, উট দাঁড়িয়ে লেজ উঁচু করে পেশাব করে এতে নামাজির নাপাক হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই উটের খোয়ারে নামাজ পড়তে নিষেধ করা হয়েছে।

وَعَنْ ٢٨٤ أَبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِى بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتّٰى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৮৪. **অনুবাদ** : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন— যখন তোমাদের কেউ নিজের পেটের মধ্যে কিছু [বায়ু] উপলব্ধি করে আর সন্দেহ করে যে, তার পেট হতে কিছু বের হলো কি না ? এতে সে যেন মসজিদ হতে [অজু ভঙ্গ হয়েছে সন্দেহে] বের হয়ে না যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে কোনো শব্দ শুনে বা গন্ধ পায়। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حَتّٰى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا -**এর অর্থ** : হাদীসের উক্ত অংশ দ্বারা বুঝা যায় যে, অজু ভঙ্গ হতে হলে আওয়াজ শুনতে হবে কিংবা দুর্গন্ধ পেতে হবে ; অথচ শুধু বায়ু বের হলেই অজু ভঙ্গ হয়ে যায়, এতে বা দুর্গন্ধ অনুভব হোক বা না হোক। বায়ু বের হওয়া নিশ্চিত হওয়াই যথেষ্ট। অবশ্য শুধু সন্দেহের উপর নির্ভর করা ঠিক নয়। এ কারণেই হানাফীগণ বলেন— إِنَّ مَا ثَبَتَ بِالْيَقِيْنِ لَا يَزُوْلُ بِالشَّكِّ অর্থাৎ যা নিশ্চিতভাবে সাব্যস্ত হয়, তা সন্দেহের দ্বারা দূরীভূত হয় না। সুতরাং উক্ত হাদীসের উদ্দেশ্য এই যে, অজু ভঙ্গ হওয়ার জন্য বায়ু নির্গত হওয়ার সন্দেহ যথেষ্ট নয়, বরং বায়ু নির্গত হওয়া নিশ্চিত হতে হবে।

وَعَنْ ٢٨٥ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ وَقَالَ إِنَّ لَهُ دَسَمًا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৮৫. **অনুবাদ** : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ দুধ পান করলেন, অতঃপর কুলি করলেন এবং বললেন, এতে চর্বি রয়েছে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : উক্ত হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, চর্বি জাতীয় কোনো বস্তু খেলে অজু ভঙ্গ হয় না, তাই শুধু কুলি করে নিলেই যথেষ্ট আর এ কুলির দ্বারা মুখ পরিষ্কার হয়ে যায় এবং মুখ দুর্গন্ধ হওয়া থেকে মুক্ত হয়।

وَعَنْ ٢٨٦ بُرَيْدَةَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوْءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ فَقَالَ عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৮৬. **অনুবাদ** : হযরত বুরাইদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন একই অজু দ্বারা কয়েক ওয়াক্ত নামাজ পড়েছিলেন এবং [পা ধোয়ার পরিবর্তে] নিজের মোজাদ্বয়ের উপর মাসাহ করেছিলেন। এতে হযরত ওমর (রা.) বললেন, [হে আল্লাহর রাসূল ﷺ] আপনি আজ এমন কিছু কাজ করেছেন, যা ইতঃপূর্বে আর কখনও করেননি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে ওমর! এরূপ আমি ইচ্ছা করেই করেছি। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

هَلْ تَجُوْزُ الصَّلَوَاتُ الْمُتَعَدِّدَةُ بِوُضُوْءٍ وَاحِدٍ **একই অজু দ্বারা কয়েক ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা বৈধ কি না** : একই অজু দ্বারা পর পর কয়েক ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা বৈধ কি না? এ ব্যাপারে কিছুটা মতান্তর রয়েছে—

مَذْهَبُ الظَّوَاهِرِ وَالشِّيْعَةِ : জাহেরী ও শীয়াদের মতে, প্রতি ওয়াক্ত নামাজের পূর্বে মুকীমের জন্য অজু করা ওয়াজিব— মুসাফিরের জন্য নয়। ইমাম তাহাবী (র.) বলেন, কিছু সংখ্যক আলিমের মতে পবিত্র অবস্থায়ও প্রতি ওয়াক্ত নামাজের জন্য নতুন অজু করা ওয়াজিব।

١ . قَوْلُهُ تَعَالٰى إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ . (الاية) তাঁদের দলিল–

٢. عَنْ أَنَسٍ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ طَاهِرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ .

٣ . وَعَنْ بُرَيْدَةَ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ . أَبُوْ دَاوُدَ

এতে বুঝা যায় যে, অজু থাকলেও প্রতিটি নামাজির জন্য নামাজ আদায় করার পূর্বে অজু করা ওয়াজিব।

مَذْهَبُ الْجَمْهُوْرِ : জমহুর ফুকাহা ও আলিমদের মতে, একই অজু দ্বারা যত ওয়াক্ত সম্ভব, নামাজ আদায় করা জায়েজ আছে। অপবিত্র হওয়া ব্যতীত নতুন অজু করা ওয়াজিব নয়। সে মুকীম হোক বা মুসাফির হোক। তাঁদের দলিল–

١ . عَنْ أَنَسٍ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ وَكَانَ أَحَدُنَا يَكْفِيْهِ الْوُضُوْءُ مَالَمْ يُحْدِثْ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

٢ . عَنْ سُوَيْدِ بْنِ نُعْمَانَ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ أَكَلَ سَوِيْقًا ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

٣ . وَعَنْ بُرَيْدَةَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوْءٍ وَاحِدٍ الخ .

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ তাঁদের দলিলের জবাব নিম্নরূপ : যাঁরা দলিল হিসেবে আয়াত পেশ করেছেন তাঁদের জবাব এই যে–

১. উক্ত আয়াতটির মর্মার্থ হবে—إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ وَأَنْتُمْ مُحْدِثُوْنَ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ অর্থাৎ, যখন তোমরা অপবিত্র অবস্থায় নামজ পড়ার ইচ্ছা করবে তখনই তোমরা মুখমণ্ডল ধৌত করবে।

২. হযরত আনওয়ার শাহ্ (র.) বলেন, আয়াতের মধ্যে مُحْدِثُوْنَ শব্দ উহ্য মানার কোনো প্রয়োজন নেই; বরং فَاغْسِلُوْا এ নির্দেশ যখন কোনো অপবিত্র ব্যক্তির জন্য হয়, তখন তার জন্য অজু করা ওয়াজিব। আর এ নির্দেশ যদি পবিত্র ব্যক্তির প্রতি হয় তবে তা হবে মোস্তাহাব।

৩. অথবা, বলা যেতে পারে যে, আয়াতের হুকুম সর্বাবস্থার জন্যই প্রযোজ্য, তবে তা মোস্তাহাব হিসেবে।

৪. অথবা, বলা যেতে পারে– إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ الاية এই আয়াতের হুকুম সর্বাবস্থার জন্যই ওয়াজিব ছিল; কিন্তু এটা রহিতো হয়ে গিয়েছে।

হাদীসের জবাব :

১. ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, সর্বাবস্থায় অজু করা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অভ্যাস ছিল, এটা দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয় না।

২. ইমাম তাহাবী (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতি ওয়াক্ত নামাজের পূর্বে মুস্তাহাব হিসাবে অজু করতেন। ওয়াজিব হিসেবে নয়।

৩. অথবা, এটা বলা যায় যে, প্রতি ওয়াক্ত নামাজের পূর্বে ইসলামের প্রথম দিকে অজু করা ওয়াজিব ছিল, পরবর্তীতে তা মানসূখ হয়ে যায়।

৪. হযরত বুরাইদা (রা.)-সহ অনেক সাহাবী হতে বর্ণিত হাদীসে দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একই অজু দ্বারা কয়েক ওয়াক্ত নামাজ আদায় করেছেন।

وَعَنْ ٢٨٧ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ (رض) أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ حَتّٰى إِذَا كَانُوْا بِالصَّهْبَاءِ وَهِيَ مِنْ أَدْنٰى خَيْبَرَ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَعَا بِالْأَزْوَادِ فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوِيْقِ فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّيَ فَأَكَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَأَكَلْنَا ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا ثُمَّ صَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২৮৭. অনুবাদ : হযরত সুয়াইদ ইবনে নু'মান (রা.) হতে বর্ণিত। [তিনি বলেন,] তিনি খায়বর যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যুদ্ধে বের হয়েছিলেন। যখন তাঁরা 'সাহবা' নামক স্থানে পৌঁছলেন, আর 'সাহবা' হলো খায়বরের অতি কাছাকাছি স্থান, তখন তিনি আসরের নামাজ আদায় করলেন। অতঃপর খাবার উপস্থিত করতে বললেন, তখন শুধু ছাতুই আনা হলো। অতঃপর তিনি হুকুম করলে ছাতু পানিতে গোলা হলো, তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ [তা হতে] খেলেন, আর আমরাও খেলাম। এরপর তিনি মাগরিবের নামাজের জন্য দাঁড়ালেন এবং কুলি করলেন, আর আমরাও কুলি করলাম। অতঃপর তিনি [সকলকে নিয়ে] নামাজ আদায় করলেন, অথচ [নতুন করে] অজু করলেন না। –[বুখারী]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

২৮৮ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا وَضُوْءَ اِلَّا مِنْ صَوْتٍ اَوْ رِيْحٍ . رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ

২৮৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— [পশ্চাৎ বায়ুর] শব্দ অথবা গন্ধ ব্যতীত [পুনঃ] অজু করার প্রয়োজন নেই।–[আহমদ ও তিরমিযী] উল্লেখ্য যে, উপরিউক্ত হাদীসের ব্যাখ্যার জন্য ২৮৪নং হাদীসের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৮৯ وَعَنْ عَلِيٍّ (رض) قَالَ سَاَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمَذِيِّ فَقَالَ مِنَ الْمَذِيِّ الْوُضُوْءُ وَمِنَ الْمَنِيِّ الْغُسْلُ . رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

২৮৯. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মযী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি জবাবে বলেছেন, মযীর কারণে অজু আর মনীর কারণে গোসল করতে হবে। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

دَفْعُ التَّعَارُضِ بَيْنَ الْحَدِيْثَيْنِ দু'টি হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব : উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, মযী সম্পর্কে সরাসরি হযরত আলী (রা.) জিজ্ঞেস করেছেন, অথচ ইতঃপূর্বে হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, হযরত আলী (রা.)-এর নির্দেশে হযরত মিকদাদ (রা.) এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন। এতে দু'টি হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা যায়। এর সমাধান নিম্নরূপ—

১. হযরত আলী (রা.) প্রথমে হযরত মিকদাদ (রা.)-কে প্রশ্ন করতে বলেন, পরে তিনি নিজেই গিয়ে প্রশ্ন করলেন।
২. অথবা, উক্ত ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট মূল ব্যক্তি যেহেতু হযরত আলী (রা.) তাই এখানে প্রশ্ন তাঁর দিকেই ফিরানো হয়েছে।

২৯০ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ الطُّهُوْرُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ . رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَالدَّارِمِىُّ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْهُ وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ .

২৯০. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— নামাজের চাবি হলো পবিত্রতা। আর তাহরীম [সব কিছু নিষিদ্ধকারী] হলো প্রথমে আল্লাহু আকবার বলা এবং তার তাহলীল [পার্থিব কাজকর্ম বৈধকারী] হলো সালাম করা। –[আবূ দাউদ, তিরমিযী ও দারেমী] ইবনে মাজাহ্ হাদীসটি হযরত আলী (রা.) এবং হযরত আবূ সাঈদ (রা.) উভয় থেকে বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْاِخْتِلَافُ فِى اَلْفَاظِ التَّكْبِيْرِ তাকবীরের শব্দ নিয়ে ওলামাদের মতান্তর : তাকবীরে তাহরীমা দ্বারা নামাজ শুরু করা ফরজ, এ বিষয়ে সকল ফিকহবিদগণ একমত। কিন্তু তার ভাষা সম্পর্কে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে–

ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ, ইমাম ইসহাক ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর এক রিওয়ায়েতে আছে যে, 'আল্লাহু আকবার' ব্যতীত অন্য শব্দ দ্বারা 'তাকবীরে তাহরীমা' বলা জায়েজ নয়। তাঁরা বলেন, اَلتَّكْبِيْرُ ও اَلتَّسْلِيْمُ-এর اَلِفْ لَامْ [আলিফ-লাম] حَصْر [অর্থাৎ সীমিত বা সংকুচিত] অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং এ সূত্রে বিধান অনুযায়ী اَللّٰهُ اَكْبَرُ বা اَللّٰهُ الْاَكْبَرُ ব্যতীত অন্য কোনো শব্দে তাহ্রীমার তাক্বীর ব্যবহার করা জায়েজ নয়।

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যে সমস্ত শব্দ দ্বারা আল্লাহর মহত্ত্ব ও গুণ-গরিমা প্রকাশ পায়, এমন কোনো শব্দ 'তাকবীরে তাহরীমার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা জায়েজ আছে। যেমন– اَللّٰهُ اَعْظَمُ ـ اَلرَّحْمٰنُ اَكْبَرُ ـ اَللّٰهُ الْاَكْبَرُ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ اَللّٰهُ كَبِيْرٌ ـ اَللّٰهُ اَجَلُّ ইত্যাদি।

ইমাম আওযায়ী (র.) বলেন, যে শব্দ দ্বারা আল্লাহর স্মরণ ও যিক্র বুঝায়, তাকবীরে তাহরীমায় তা ব্যবহার করা জায়েজ আছে। তাঁদের দলিল— وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا (١) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى

ইমাম ইবনে হুমাম (র.) বলেন, উপরোক্ত হাদীস থেকে اَللّٰهُ اَكْبَرُ শব্দ দ্বারা তাকবীরে তাহরীমা করা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়।

اَلْاِخْتِلَافُ فِيْ حُكْمِ التَّكْبِيْرِ তাকবীরে তাহরীমার হুকুম সম্পর্কে মতভেদ : তাকবীরে তাহরীমা ফরজ হওয়ার ব্যাপারে ইমামদের কোনো মতভেদ নেই। শুধু ইমাম যুহরী (র.) তাকে ফরজ বলেন না। তাঁর মতে তাকবীরে তাহরীমা না বলে শুধু নিয়ত করলেই নামাজ বিশুদ্ধ হয়ে যাবে।

ইমামগণের মাঝে এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে যে, তাকবীরে তাহরীমা নামাজের রুকন না কি শর্ত।

مَذْهَبُ الْاَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ : ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে, তাকবীরে তাহরীমা নামাজের রুকন।

مَذْهَبُ الْاَحْنَافِ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও তাঁর অনুসারীদের মতে তাকবীর শর্ত। কেননা, কুরআনে পাকে এসেছে— وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى এ বাক্যটি দ্বারা তাকবীর বুঝানো হয়েছে, আর فَصَلّٰى -এর فَاءْ টি তা'কীবিয়াহ। আর তা'কীবিয়ার কাজ হলো পূর্ববর্তী বাক্যাংশ হতে পরবর্তী বাক্যাংশে ব্যতিক্রম সৃষ্টি করা। সুতরাং تَكْبِيْر ও صَلٰوة -এর মধ্যখানে তা'কীবিয়াহ আসাতেই বুঝা যায় যে, তা নামাজের রুকন নয়; বরং শর্তের অন্তর্ভুক্ত।

هَلِ التَّسْلِيْمُ فَرْضٌ اَمْ وَاجِبٌ : নামাজে সালাম ফিরানো ফরজ না ওয়াজিব—

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، مَالِكٍ وَ اَحْمَدَ (رح) : ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে নামাজ হতে বের হওয়ার জন্য সালাম ফিরানো ফরজ, এমনকি যদি তা পরিত্যাগ করা হয় তবে নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে।

ইমামত্রয়ের দলিলসমূহ—

١ ـ عَنْ عَلِيٍّ (رض) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ .

এখানে اَلِفْ لَامْ টি حَصَرْ -এর জন্য এসেছে, এ জন্য سَلَامْ শব্দটিই خَاصْ হয়ে গেছে।

٢ ـ اِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

٣ ـ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَلُّوْا كَمَا رَاَيْتُمُوْنِيْ اُصَلِّيْ .

مَذْهَبُ الْاَحْنَافِ : ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম তাহাবী (র.)-এর মতে, سَلَامْ ফিরানো فَرْض নয় ; বরং ওয়াজিব। তাঁদের দলিল–

١ ـ رَوَاهُ اَحْمَدُ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) حِيْنَ عَلَّمَهُ النَّبِيُّ ﷺ التَّشَهُّدَ اِذَا قُلْتَ هٰذَا اَوْ فَعَلْتَ هٰذَا فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ اِنْ شِئْتَ اَنْ تَقُوْمَ فَقُمْ وَاِنْ شِئْتَ اَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ .

এখানে "مَا" টি مَوْصُوْلَةْ যা تَشَهُّدْ -এর পরে সকল জিম্মাদারী পুরা করে দিয়েছে ; এ জন্য سَلَامْ ফরজ নয়।

٢ ـ وَفِيْ رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ اِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلٰوتُكَ ـ

এখানে তাশাহহুদ পড়ার পর নামাজকে পরিপূর্ণ ঘোষণা করা হয়েছে।

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ তাঁদের দলিলের জবাব হলো–

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস تَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ -এর মধ্যে حَصْر উদ্দেশ্য নয়; বরং এখানে فَرْد كَامِلْ -এর গুরুত্ব উদ্দেশ্য।

২. অথবা ঐ সব হাদীসে 'سَلَامْ' ব্যতীত تَحْلِيْل হবে না, এরূপ বলা হয়নি; বরং সেখানে 'سَلَامْ -কে وَاجِبْ হিসেবে খাস করা হয়েছে।

৩. আর বেদুইনের হাদীসে সালাম শিক্ষা দেওয়ার কথা নেই। যদি সালাম ফরজ হতো তবে তাও শিক্ষা দেওয়া হতো।

وَعَنْ ٢٩١ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِيْ أَعْجَازِهِنَّ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ أَبُوْدَاوُدَ

২৯১. অনুবাদ : হযরত আলী ইবনে তালাক্ব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— যখন তোমাদের কেউ বায়ু ত্যাগ করে তখন সে যেন অজু করে নেয়। আর তোমরা স্ত্রীগণের সাথে তাদের পশ্চাৎ দ্বার [গুহ্যদ্বার] দিয়ে সঙ্গম করবে না। –[তিরমিযী ও আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَوْضِيْحُ قَوْلِهِ ﷺ وَلَاتَأْتُوا النِّسَاءَ فِيْ أَعْجَازِهِنَّ **তোমরা স্ত্রীগণের পশ্চাৎদিকে সঙ্গম করবে না-এর ব্যাখ্যা :** স্ত্রীদের নির্ধারিত স্থানে সহবাস করা কর্তব্য ; এটা শরিয়ত সহতো, এটা ব্যতীত গুহ্যদ্বার দিয়ে সঙ্গম করা সম্পূর্ণ হারাম। অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি কোনো গণকের কাছে গমন করল এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করল, অথবা যে ব্যক্তি স্ত্রীর পশ্চাৎদ্বার দিয়ে সহবাস করল, সে যেন মহানবী মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে (অর্থাৎ ইসলাম) তা থেকে বিচ্যুত হয়ে গেল। মূলত এটা দ্বারা বীর্য নষ্ট হয়ে যায় ; বরং তাকে যথাস্থানে প্রয়োগ করতে হবে। বাহ্যত এটি সন্তান হত্যোরই নামান্তর, কাজেই এটা করা হারাম। এতে নেহায়েত নোংরামি ছাড়াও অনেক রোগের সৃষ্টি এবং স্ত্রীর অতৃপ্তি থাকে। যার ফলে সাংসারিকসমূহ অকল্যাণ দেখা দিতে পারে।

وَعَنْ ٢٩٢ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِيْ سُفْيَانَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّمَا الْعَيْنَانِ وِكَاءُ السَّهِ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ - رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

২৯২. অনুবাদ : হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবূ সুফিয়ান (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন— চক্ষুদ্বয় হলো গুহ্যদ্বারের বাঁধন। সুতরাং চক্ষু যখন ঘুমায় তখন বাঁধন খুলে যায়। –[দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** وِكَاءٌ শব্দের অর্থ হলো– মশক ইত্যাদির মুখ বাঁধবার রশি। আর اَلسَّهُ অর্থ– গুহ্যদ্বার। অতএব وِكَاءُ السَّهِ অর্থ– গুহ্যদ্বারের বাঁধন। যতক্ষণ পর্যন্ত চক্ষু জাগ্রত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত পেট হতে বায়ু নিঃসরিত হলে টের পাওয়া যায়। আর চোখে ঘুম এসে গেলে শরীরের বন্ধন শিথিল হয়ে যায়, ফলে পেট হতে বায়ু বের হলে অনুভব করা যায় না। তাই ঘুমালে গুহ্যদ্বারের বাঁধন খুলে যায় অজু বিনষ্ট হয়ে যায়।

اِخْتِلَافُ الْأَئِمَّةِ فِيْ نَقْضِ الْوُضُوْءِ بِالنَّوْمِ **নিদ্রায় অজু ভঙ্গ হওয়ার ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ :** ঘুম অজু বিনষ্টকারী, তবে কোন অবস্থায় ঘুম অজুকে বিনষ্ট করে এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে তা পেশ করা হচ্ছে—

ইমাম মালিক (র.) বলেন, চীৎ হয়ে কিংবা সিজদা অবস্থায় ঘুমালে তার অজু ভঙ্গ হয়ে যায়, তখন নতুনভাবে অজু করতে হবে। চাই ঘুম কম হোক কিংবা বেশি হোক। সুতরাং বসা অবস্থায় অধিক ঘুমে বিভোর হলেও অজু ওয়াজিব হবে না। তবে নিদ্রা যদি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত স্থায়ী হয়, তবে অজু ওয়াজিব হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, বসা অবস্থায় যদি নিতম্ব মাটির সাথে লাগা থাকে, যদিও ঘুম বেশি হয় তবু অজু ভাঙবে না। এটা ব্যতীত যেভাবেই শয়ন করুক না কেন, নিদ্রায় অজু ভেঙ্গে যাবে।

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) বলেন, চীৎ হয়ে নিদ্রা যাওয়া ব্যতীত অন্য কোনোভাবে নিদ্রা গেলে অজু ওয়াজিব হবে না।

ফিক্হের কিতাবসমূহে বর্ণিত আছে, চীৎ হয়ে ঘুমালে, ঠেস লাগিয়ে ঘুমালে, অথবা এমন বস্তুর সাথে হেলোান দিয়ে ঘুমালে যা সরালে ঘুমন্ত ব্যক্তি পড়ে যাবে তবে এমন ঘুমে অজু ভেঙ্গে যায়। আর যদি নামাজের মধ্যে এমনভাবে ঘুমায় যে, নামাজের কোনো সুন্নত তরক হয় না ; বরং যথাযথভাবে পালিত হয় তাতে নামাজ কিংবা অজু কিছুই নষ্ট হবে না। কাজেই দাঁড়ানো অবস্থায় হোক বা বসা অবস্থায় হোক, কোনো কিছুর সাথে হেলোান দেওয়া ব্যতীত ঘুমালে অথবা রুকু-সিজদাগুলো যথা নিয়মে পালন করা অবস্থায় ঘুমালেও অজু নষ্ট হবে না, যদিও ঘুম দীর্ঘ সময় পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

হানাফীদের দলিল : নবী করীম ﷺ বলেছেন–

لَا يَجِبُ الْوُضُوْءُ عَلٰى مَنْ نَامَ جَالِسًا اَوْ قَائِمًا اَوْ قَاعِدًا حَتّٰى يَضَعَ جَنْبَهٗ، فَاِنَّهٗ اِذَا اضْطَجَعَ اِسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهٗ وَفِىْ رِوَايَةٍ اِنَّمَا الْوُضُوْءُ عَلٰى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا (الحديث) .

যে ব্যক্তি দাঁড়ানো বা বসাবস্থায় কিংবা রুকু ও সিজদা অবস্থায় ঘুমাল তার অজু বাধ্যতামূলক নয় ; বরং অজু বাধ্যতামূলক ঐ ব্যক্তির জন্য যে চিৎ হয়ে শুয়ে ঘুমাল।

এমনিভাবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হযরত আলী ও হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর হাদীস দ্বারাও তা পরিষ্কার বুঝা যায়।

وَعَنْ ٢٩٣ عَلِيٍّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وِكَاءُ السَّهِ الْعَيْنَانِ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ الشَّيْخُ الْاِمَامُ مُحْيِى السُّنَّةِ رَحِمَهُ اللّٰهُ هٰذَا فِىْ غَيْرِ الْقَاعِدِ لِمَا صَحَّ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَنْتَظِرُوْنَ الْعِشَاءَ حَتّٰى تَخْفِقَ رُؤُوْسُهُمْ ثُمَّ يُصَلُّوْنَ وَلَا يَتَوَضَّؤُوْنَ . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ اِلَّا اَنَّهٗ ذَكَرَ فِيْهِ يَنَامُوْنَ بَدْلَ يَنْتَظِرُوْنَ الْعِشَاءَ حَتّٰى تَخْفِقَ رُؤُوْسُهُمْ .

২৯৩. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— গুহ্যদ্বারের বাঁধন হলো চক্ষুদ্বয়; অতএব যে ব্যক্তি ঘুমায় সে যেন অজু করে নেয়। —[আবূ দাঊদ]

শায়খ ইমাম মহীউস সুন্নাহ বাগাবী (র.) বলেন, যারা বসে ঘুমায় তারা ব্যতীত অন্যদের জন্য এ আদেশ প্রযোজ্য হবে। কেননা, হযরত আনাস (রা.) হতে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ ইশার নামাজের জন্য অপেক্ষা করতেন, অথচ (নিদ্রায়) তাদের মাথা ঝুঁকে পড়ত। অতঃপর তারা নামাজ পড়তেন; কিন্তু [নতুন করে] অজু করতেন না। –[আবূ দাঊদ ও তিরমিযী]

কিন্তু তিরমিযী 'তারা ইশার নামাজের জন্য অপেক্ষায় থাকতেন, এমনকি তাঁদের মাথা ঝুঁকে পড়ত' এর স্থলে 'তাঁরা ঘুমিয়ে পড়তেন' কথাটি উল্লেখ করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** উক্ত হাদীস দ্বারা এটা বুঝা যায় যে, চিৎ, কাত বা কোনো কিছুতে হেলোান দিয়ে না ঘুমালে, নিছক বসে বসে ঝিমানোর কারণে অজু ভঙ্গ হবে না। কেননা বসা অবস্থা ব্যতীত অন্যান্য অবস্থায় নিদ্রার কারণে শরীর অহেতোন হয়ে গুহ্যদ্বার ঢিলা হয়ে যায়, ফলে গুহ্যদ্বার দিয়ে বায়ু বের হলে টেরও পাওয়া যায় না, তবে কেউ বসে বসে হেলোান দিয়ে ঘুমালেও তার অজু বিনষ্ট হয়ে যাবে। সাহাবীগণ মসজিদে কোনো কিছুর সাথে হেলোান না দিয়ে বসে ঝিমাতেন, ঘুমাতেন না, তাই তাদের অজু বিনষ্ট হতো না।

وَعَنْ ٢٩٤ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْوُضُوْءَ عَلٰى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا فَاِنَّهٗ اِذَا اضْطَجَعَ اِسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهٗ . رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَ اَبُوْدَاوُدَ

২৯৪. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— যে ব্যক্তি শুয়ে ঘুমায়, তার জন্য অজু করা আবশ্যক। কেননা, সে যখন শুয়ে ঘুমায় তখন তার শরীরের বন্ধনসমূহ ঢিলা হয়ে যায়। –[তিরমিযী ও আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٢٩٥ بُسْرَةَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا مَسَّ اَحَدُكُمْ ذَكَرَهٗ فَلْيَتَوَضَّأْ . رَوَاهُ مَالِكٌ وَاَحْمَدُ وَ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ

২৯৫. **অনুবাদ** : হযরত বুসরা [বিনতে সাফওয়ান] (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— যখন তোমাদের কেউ নিজের পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করে তখন সে যেন অজু করে নেয়। –[মালিক, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্ ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْاِخْتِلَافُ فِىْ نَقْضِ الْوُضُوْءِ بِمَسِّ الذَّكَرِ পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করায় অজু ভঙ্গ হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ :

১. **مَذْهَبُ الْاَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ** ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র.)-এর এক মতে, কোনো আবরণ ছাড়া পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ হয়ে যাবে। তাঁদের দলিল—

١ ـ عَنْ بُسْرَةَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا مَسَّ اَحَدُكُمْ ذَكَرَهٗ فَلْيَتَوَضَّأْ .

٢ ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا اَفْضٰى اَحَدُكُمْ بِيَدِهٖ اِلٰى ذَكَرِهٖ لَيْسَ بَيْنَهٗ وَبَيْنَهَا شَىْءٌ فَلْيَتَوَضَّأْ .

২. **ইমাম আহমদ (র.)-এর অভিমত :** ইমাম আহমদ ও ইমাম মালিক (র.)-এর এক মতে, যদি কামভাবের সাথে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করা হয়, তবে অজু নষ্ট হয়ে যায়।

৩. **مَذْهَبُ الْاَحْنَافِ** : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, কোনো অবস্থাতেই পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে অজু বিনষ্ট হবে না। তাঁর দলিল–

١ ـ عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ (رضـ) قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهٗ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ قَالَ وَهَلْ هُوَ اِلَّا بَضْعَةٌ مِنْهُ .

٢ ـ عَنْ عَلِيٍّ (رضـ) قَالَ مَا اُبَالِىْ اَنْفِىْ مَسَسْتُ اَوْ اُذُنِىْ اَوْ ذَكَرِىْ ....

٣ ـ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ مَا اُبَالِىْ ذَكَرِىْ مَسَسْتُ فِى الصَّلٰوةِ اَوْ اُذُنِىْ اَوْ اَنْفِىْ .

اَلْجَوَابُ عَنْ اَدِلَّةِ الْمُخَالِفِيْنَ বিরুদ্ধবাদীদের দলিলের জবাব :

১. সাহাবীদের বিভিন্ন বর্ণনা হযরত তালাক (রা.)-এর হাদীসের সমর্থন করে। যেমন– হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত আছে, আমি আমার নাক স্পর্শ করি অথবা কান স্পর্শ করি কিংবা পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করি তাতে ক্ষতির কিছু নেই।
২. ইমাম তাহাবী (র.) বলেন, হযরত তালাক (রা.)-এর হাদীস বুসরার হাদীস হতে অধিকতর নির্ভরযোগ্য।
৩. প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন (র.) বলেছেন, তিনটি হাদীস বিশুদ্ধ নয়, প্রথমত সকল নেশাকারক বস্তুই মদ; দ্বিতীয়ত যে নিজ পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করে তাকে অজু করত হবে; তৃতীয়ত অভিভাবকের আদেশ ব্যতীত বিবাহ শুদ্ধ হবে না। –[তাহাবী]
৪. হযরত বুসরা (রা.)-এর হাদীসে একজন বর্ণনাকারীর নাম মারওয়ান, যিনি হযরত বুসরা (রা.) ও হযরত ওরওয়াহ (রা.)-এর মধ্যে যোগসূত্র। উপরোক্ত মারওয়ান হাদীসবিদগণের নিকট নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি নন। অতএব হযরত বুসরা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসটি দুর্বল।
৫. হযরত বুসরা (রা.)-এর হাদীস মুরসাল, আর হযরত তালাক (রা.)-এর হাদীস মারফূ'। ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর মাযহাবের অনুসারীদের মতে মুরসাল হাদীস মাযহাব সাব্যস্ত করার ব্যাপারে দলিল হতে পারে না। এ কারণে হাদীসটি মারফূ' হাদীসের মোকাবেলায় গৌণ।
৬. হযরত বুসরা (রা.)–এর হাদীস সাধারণ জ্ঞানের বহির্ভূত। কেননা, এ হাদীসটির বর্ণনা মুতাবিক শরীরের অন্য কোনো অংশ স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ হয় না, শুধু পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলেই অজু নষ্ট হয়ে যায়, অথচ পুরুষাঙ্গও শরীরের অন্যান্য অংশের ন্যায় গোশতের অংশ।
৭. আর হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীসও হযরত তালাক (রা.) ও অন্যান্য সাহাবীদের হাদীস দ্বারা রহিতো হয়ে গেছে।
৮. অথবা, তাঁদের বর্ণিত হাদীসে অজু দ্বারা মোস্তাহাব অজু উদ্দেশ্য, ওয়াজিব নয়।
৯. সাধারণ জ্ঞানেও এটা অনুমিত হয় পুরুষাঙ্গ শরীরের অন্যান্য অংশর ন্যায় একটি অংশ মাত্র, তা স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ হওয়ার কোনো কারণ নেই।
১০. ফুকাহায়ে কেরাম অজু ভঙ্গের ৮টি কারণ লিখেছেন, তন্মধ্যে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ হবে এমন কোনো কারণের উল্লেখ নেই।

وَعَنْ ٢٩٦ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ (رضـ) قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ قَالَ وَهَلْ هُوَ اِلَّا بَضْعَةٌ مِنْهُ ـ رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ نَحْوَهُ ـ وَقَالَ الشَّيْخُ الْاِمَامُ مُحْيِ السُّنَّةِ رَحِمَهُ اللّٰهُ هٰذَا مَنْسُوْخٌ لِاَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ اَسْلَمَ بَعْدَ قُدُوْمِ طَلْقٍ وَقَدْ رَوٰى اَبُوْهُرَيْرَةَ (رضـ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا اَفْضٰى اَحَدُكُمْ بِيَدِهٖ اِلٰى ذَكَرِهٖ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا شَيْءٌ فَلْيَتَوَضَّأْ ـ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ بُسْرَةَ اِلَّا اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا شَيْءٌ ـ

২৯৬. অনুবাদ : হযরত তালাক ইবনে আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোনো ব্যক্তি তার পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে কি হুকুম হবে এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করা হলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জবাবে বললেন, এটা তো শরীরের একটা অঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নয়। –[আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসায়ী; ইবনে মাজাহ্ও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন]

শায়খুল ইমাম মহীউস সুন্নাহ বাগাবী (র.) বলেন, হযরত তালাক (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসটি রহিতো হয়ে গেছে। কেননা, হযরত তালাক (রা.)-এর মদীনায় আগমনের পরই হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আর আবূ হুরায়রা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— তোমাদের কারো হাত যদি পুরুষাঙ্গ পর্যন্ত পৌঁছে যায় আর হাত ও পুরুষাঙ্গের মধ্যখানে কোনো আড়াল না থাকে, তবে সে যেন অজু করে নেয়। —[শাফেয়ী ও দারাকুতনী]

এ হাদীসটি নাসায়ী হযরত বুসরা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি "হাত ও পুরুষাঙ্গের মাঝখানে কোনো বস্তুর অন্তরাল না থাকে" কথাটি উল্লেখ করেননি।

وَعَنْ ٢٩٧ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَبِّلُ بَعْضَ اَزْوَاجِهٖ ثُمَّ يُصَلِّيْ وَلَا يَتَوَضَّأُ ـ وَرَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ لَا يَصِحُّ عِنْدَ اَصْحَابِنَا بِحَالٍ اِسْنَادُ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَاَيْضًا اِسْنَادُ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْهَا وَقَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا مُرْسَلٌ وَاِبْرَاهِيْمُ التَّيْمِيُّ لَمْ يَسْمَعْ عَنْ عَائِشَةَ ـ

২৯৭. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ কখনো তাঁর কোনো স্ত্রীকে চুম্বন করতেন, অতঃপর নামাজ আদায় করতেন; কিন্তু অজু করতেন না। –[আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ]

ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, আমাদের হাদীস শাস্ত্র বিশারদদের মতে হযরত আয়েশা (রা.) হতে ওরওয়ার অথবা ইবরাহীম তাইমীর বর্ণনা কোনো অবস্থাতেই বিশুদ্ধ হতে পারে না। আর ইমাম আবূ দাঊদ (র.) বলেছেন, এটা মুরসাল হাদীস, আর হযরত ইবরাহীম তাইমী হযরত আয়েশা (রা.) হতে শুনেননি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْاِخْتِلَافُ فِيْ مَسِّ الْمَرْأَةِ وَتَقْبِيْلِهَا فِيْ وُجُوْبِ الْوُضُوْءِ স্ত্রীকে স্পর্শ বা চুম্বনের ফলে ওযূ আবশ্যক হবে কিনা : স্ত্রীকে চুম্বন বা স্পর্শ করা অজু বিনষ্টের কারণ কিনা ? এ বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। যেমন—

১. ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম সুফিয়ান ছাওরী (র.)-এর মতে, নারীকে স্পর্শ করা অজু নষ্টের কারণ নয়। তাঁদের দলিল– وَعَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَبِّلُ بَعْضَ اَزْوَاجِهِ ثُمَّ يُصَلِّيْ وَلَا يَتَوَضَّأُ
২. ইমাম শাফেয়ী (র.) ও তাঁর অনুসারীদের মতে, নারীকে চুম্বন কিংবা স্পর্শ করা অজু বিনষ্টের কারণ। তাঁদের দলিল–

١ ـ اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمْ مِنَ الْغَائِطِ اَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ الخ ·

٢ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) كَانَ يَقُوْلُ مَنْ قَبَّلَ اِمْرَأَتَهُ اَوْ مَسَّهَا بِيَدِهٖ فَعَلَيْهِ الْوُضُوْءُ ·

৩. ইমাম মালিক (র.)-এর মতে, চুম্বনে যৌন উত্তেজনা থাকলে তার মাধ্যমে অজু নষ্ট হবে, নতুবা নয়।
৪. ইমাম আহমদ (র.) বলেন, বেগানা বা পর মহিলা হলে এবং আবরণ ব্যতিরেকে স্পর্শ করা হলে এর মাধ্যমে অজু নষ্ট হয়ে যাবে।

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ তাঁদের দলিলের জবাব :

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, কুরআনে "لَمْسٌ" শব্দটির অর্থ হবে সহবাস।
২. আর ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসে চুম্বন ও স্পর্শ দ্বারা যেহেতু মযী বের হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, তাই সতর্কতা অবলম্বনের জন্য অজু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
৩. এ ছাড়া মুসনাদে ইমাম আবূ হানীফা নামক গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, চুম্বনের পরে অজু নেই।

মূলকথা হলো স্পর্শ বা চুম্বনের পরে যদি মযী বের হয় তবে অজু আবশ্যক, আর মনী বের হলে গোসল ফরজ, আর কিছুই বের না হলে অজু, গোসল কোনোটাই আবশ্যক নয়।

---

২٩٨ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ اَكَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَتِفًا ثُمَّ مَسَحَ يَدَهٗ بِمِسْحٍ كَانَ تَحْتَهٗ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى ـ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ وَابْنُ مَاجَةَ

২৯৮. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কদা একটি ছাগলের কাঁধের গোশ্‌ত খেলেন, অতঃপর তিনি তাঁর হাত তাঁর পায়ের নিচের চটের সাথে মুছে নিলেন। এরপর নামাজের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়লেন। –[আবূ দাঊদ ও ইবনে মাজাহ্]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, আগুনে পাকানো কোনো কিছু খেলে অজু বিনষ্ট হয় না, বরং তৈলাক্ত জাতীয় কিছু খেলে হাত মুখ মুছে নেওয়াই যথেষ্ট, যাতে হাতে মুখে কিছু লেগে না থাকে।

---

٢٩٩ وَعَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رض) اَنَّهَا قَالَتْ قَرَّبْتُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ جَنْبًا مَشْوِيًّا فَاَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ـ رَوَاهُ اَحْمَدُ

২৯৯. অনুবাদ : হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা নবী করীম ﷺ-এর নিকট ভুনা পাঁজর [ভাজি করা পাঁজরের গোশত] উপস্থিত করলাম, তখন তিনি তা হতে খেলেন, অতঃপর নামাজের জন্য দাঁড়ালেন, অথচ অজু করেননি। –[আহমদ]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় পরিচ্ছেদ

عَنْ ٣٠٠ اَبِىْ رَافِعٍ (رضـ) قَالَ اَشْهَدُ لَقَدْ كُنْتُ اَشْوِىْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَطْنَ الشَّاةِ ثُمَّ صَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩০০. **অনুবাদ** : হযরত আবূ রাফে' (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য বকরির [পেটের অংশ তথা কলিজা] ভুনে দিতাম [তিনি তা খেতেন] অতঃপর নামাজ পড়তেন, কিন্তু অজু করতেন না।-[মুসলিম]

وَعَنْهُ ٣٠١ قَالَ اُهْدِيَتْ لَهُ شَاةٌ فَجَعَلَهَا فِى الْقِدْرِ فَدَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَا هٰذَا يَا اَبَا رَافِعٍ فَقَالَ شَاةٌ اُهْدِيَتْ لَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَطَبَخْتُهَا فِى الْقِدْرِ قَالَ نَاوِلْنِىْ الذِّرَاعَ يَا اَبَا رَافِعٍ فَنَاوَلْتُهُ الذِّرَاعَ ثُمَّ قَالَ نَاوِلْنِى الذِّرَاعَ الْاٰخَرَ فَنَاوَلْتُهُ الذِّرَاعَ الْاٰخَرَ ثُمَّ قَالَ نَاوِلْنِىْ الذِّرَاعَ الْاٰخَرَ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَا لِلشَّاةِ ذِرَاعَانِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَا اِنَّكَ لَوْسَكَتَّ لَنَاوَلْتَنِىْ ذِرَاعًا فَذِرَاعًا مَا سَكَتَّ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ فَاهُ وَغَسَلَ اَطْرَافَ اَصَابِعِهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى ثُمَّ عَادَ اِلَيْهِمْ فَوَجَدَ عِنْدَهُمْ لَحْمًا بَارِدًا فَاَكَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلّٰى وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً - رَوَاهُ اَحْمَدُ وَ رَوَاهُ الدَّارِمِىُّ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدٍ اِلَّا اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ اِلٰى اٰخِرِهِ -

৩০১. **অনুবাদ** : উক্ত হযরত আবূ রাফে' (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তাঁকে অর্থাৎ আবূ রাফে'কে বকরির গোশত হাদিয়া দেওয়া হলো। তিনি তা হাঁড়িতে [রান্না করে] রাখলেন, এমন সময় রাসূল ﷺ তাঁর গৃহে প্রবেশ করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন– 'হে আবূ রাফে'! এটা কি? তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে বকরির গোশত হাদিয়া দেওয়া হয়েছে। তাই এখন তা হাঁড়িতে রান্না করেছি। রাসূল ﷺ বললেন, হে আবূ রাফে'! আমাকে একটি বাহু দাও। অতঃপর আমি তাঁকে একটি বাহু দিলাম। অতঃপর রাসূল ﷺ বললেন, আমাকে আরও একটি বাহু দাও। [আবূ রাফে' বলেন,] আমি তাঁকে আরেকটি বাহু দিলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমাকে আরেকটি বাহু দাও। আবূ রাফে' বলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! বকরির বাহু তো দু'টি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, যদি তুমি চুপ থাকতে তবে তুমি আমাকে একটার পর একটা বাহু দিতে পারতে, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি নীরব থাকতে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ পানি চাইলেন এবং কুলি করে মুখ পরিষ্কার করলেন এবং আঙ্গুলসমূহের মাথা ধুয়ে ফেললেন। এরপর নামাজের জন্য দাঁড়িয়ে নামাজ পড়লেন। [নতুন করে অজু করলেন না।] অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের নিকট পুনরায় ফিরে এসে তাদের নিকট ঠাণ্ডা গোশত পেলেন এবং তা ভক্ষণ করলেন, তারপর মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং নামাজ পড়লেন অথচ পানি স্পর্শ করলেন না। –[আহমদ] ইমাম দারেমী হাদিসটি আবূ উবাইদ (রা.) -এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ পানি চাইলেন হতে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেননি।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْمُرَادُ بِقَوْلِهِ اَمَا اَنَّكَ لَوْ سَكَتَّ 'যদি তুমি চুপ থাকতে' কথাটির তাৎপর্য : আলোচ্য বাক্যাংশে মহানবী ﷺ-এর একটি মু'জিযার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর তা হলো একটি বকরির দু'টি বাহুই থাকে। রাসূল ﷺ-এরও তা অজানা ছিল না। এতদসত্ত্বেও তিনি আবূ রাফে' (রা.)-এর নিকট ততোধিক বাহু চাওয়ার মধ্যে হিকমত নিহিতো ছিল। এ ক্ষেত্রে যদি আবূ রাফে' নীরবতা পালন করে বাহু দিতে থাকতেন তবে বাহু শেষ হতো না। কিন্তু আবূ রাফে' তা তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারেননি, যার কারণে মু'জিযা প্রকাশ পেতে পারল না। এরূপ বহু মু'জিযা রাসূল ﷺ হতে অসংখ্যবার প্রকাশিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটত না।

وَعَنْ ٣٠٢ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ كُنْتُ اَنَا وَاُبَىٌّ وَاَبُو طَلْحَةَ جُلُوْسًا فَاَكَلْنَا لَحْمًا وَخُبْزًا ثُمَّ دَعَوْتُ بِوَضُوْءٍ فَقَالَا لِمَ تَتَوَضَّأُ فَقُلْتُ لِهٰذَا الطَّعَامِ الَّذِىْ اَكَلْنَا فَقَالَا اَتَتَوَضَّأُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ . رَوَاهُ اَحْمَدُ

৩০২. **অনুবাদ :** হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– একদা আমি, উবাই ইবনে কা'ব ও আবূ তালহা একস্থানে বসা ছিলাম, সেখানে আমরা গোশত ও রুটি খেলাম। অতঃপর আমি অজুর জন্য পানি চাইলাম তখন তারা [উবাই ও আবূ তালহা] উভয়ে আমাকে বললেন, তুমি কেন অজু করবে? আমি বললাম, এ খাবারের কারণে, যা আমরা এখন খেলাম। তখন তাঁরা বললেন, তুমি কি পবিত্র জিনিস খাওয়ার কারণে অজু করবে ? অথচ তোমার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি [অর্থাৎ নবী করীম ﷺ] এরূপ খাদ্য খেয়ে অজু করেননি। –[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

نَبْذًا مِنْ حَيَاةِ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ হযরত উবাই ইবনে কা'বের সংক্ষিপ্ত জীবনী :

১. **নাম ও পরিচিতি :** তাঁর নাম উবাই। পিতার নাম কা'ব, মাতার নাম সুহায়লা বিনতুল আসওয়াদ। উপনাম আবুল মুনযির, অথবা আবূ তোফায়েল। উপাধি সাইয়িদুল কুররা ও সাইয়িদুল আনসার।

২. **ইসলাম গ্রহণ :** হযরত উবাই (রা.) দ্বিতীয় আকাবায় ৭০ জন আনসারের সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন।

৩. **ওহী লেখক :** তিনি ইহুদিদের ধর্মযাজক ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর রাসূল ﷺ-এর সর্বশেষ কাতেবে ওহী হিসেবে নিযুক্ত হন।

৪. **জিহাদে যোগদান :** তিনি বদর থেকে শুরু করে তায়েফ পর্যন্ত সকল যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন।

৫. **মুফতি ও ক্বারী :** রাসূল ﷺ-এর যুগে পবিত্র কুরআনের যে কয়জন হাফেজ ছিলেন উবাই ইবনে কা'ব ছিলেন তাদের অন্যতম। রাসূল ﷺ-এর যুগে যাদের উপর ফতোয়া দানের দায়িত্ব ছিল তিনি তাঁদেরও অন্যতম। হযরত ওসমান (রা.)-এর যুগে তিনি কুরআন পাক শিক্ষা দাতাদের প্রধান ছিলেন।

৬. **রিওয়ায়েত :** তিনি সর্বমোট ১৬৪টি হাদীস বর্ণনা করেন।

৭. **ইন্তেকাল :** তিনি ৩০ অথবা, ৩২ হিজরিতে হযরত ওসমান (রা.)-এর খেলাফত কালে ইন্তেকাল করেন।

وَعَنْ ٣٠٣ ابْنِ عُمَرَ (رض) كَانَ يَقُوْلُ قُبْلَةُ الرَّجُلِ اِمْرَأَتَهُ وَجَسُّهَا بِيَدِهِ مِنَ الْمُلَامَسَةِ وَمَنْ قَبَّلَ اِمْرَأَتَهُ وَجَسَّهَا بِيَدِهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوْءُ . رَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ

৩০৩. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলতেন– কোনো ব্যক্তির নিজ স্ত্রীকে চুম্বন করা বা নিজ হাত দ্বারা স্পর্শ করা "লামস"-এর অন্তর্গত। সুতরাং যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে চুম্বন করল অথবা হাত দ্বারা স্পর্শ করল তার জন্য অজু করা আবশ্যক। –[মালিক ও শাফেঈ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

دَفْعُ التَّعَارُضِ بَيْنَ الْحَدِيْثَيْنِ দু'টি হাদীসের মধ্যকার দ্বন্দ্বের সমাধান : হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, রাসূল ﷺ তার স্ত্রীকে চুম্বন করার পর অজু না করে নামাজ আদায় করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, চুম্বন করার কারণে অজু ভঙ্গ হয় না। আর হযরত ইবনে উমর (রা.)-এর হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, স্ত্রীকে স্পর্শ বা চুম্বন করার দ্বারা অজু ভঙ্গ হয়ে যায়। এতে উভয়ের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয় তার সমাধান নিম্নরূপ :

১. অথবা স্ত্রী স্পর্শকরণ বা চুম্বন দান তখনই অজু ভঙ্গকারী হবে যখন তাদ্বারা অজু ভঙ্গকারী مَذِيْ [মযী] লিঙ্গ দ্বার দিয়ে বের হবে।
২. অথবা হযরত ইবনে উমর (রা.)-এর হাদীসে فَعَلَيْهِ الْوُضُوْءُ দ্বারা অজু করা মোস্তাহাব, এটাই বুঝানো হয়েছে। ওয়াজিব হওয়া বুঝানো হয়নি।
৩. অথবা হযরত ইবনে উমর (রা.)-এর হাদীসটি مَوْقُوْف যা مَرْفُوْع -এর مُقَابِلْ হতে পারে না।
৪. অথবা হযরত ইবনে উমর (রা.)-এর হাদীসটি মানসূখ হয়ে গেছে।

وَعَنْ ٣٠٤ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ كَانَ يَقُوْلُ مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ اِمْرَأَتَهُ الْوُضُوْءُ . رَوَاهُ مَالِكٌ

৩০৪. **অনুবাদ :** হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলতেন– কোনো ব্যক্তির নিজ স্ত্রীকে চুম্বন করলে সে কারণে অজু করতে হয়। –[মালেক]

وَعَنْ ٣٠٥ ابْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ (رض) قَالَ اِنَّ الْقُبْلَةَ مِنَ اللَّمْسِ فَتَوَضَّأُوْا مِنْهَا .

৩০৫. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেছেন– চুম্বন করা 'লামস'-এর অন্তর্গত। কাজেই চুম্বনের কারণে তোমরা অজু করবে। [দারাকুতনী]

وَعَنْ ٣٠٦ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ (رح) عَنْ تَمِيْمِ نِ الدَّارِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْوُضُوْءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ . رَوَاهُمَا الدَّارَ قُطْنِيْ . وَقَالَ : عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ تَمِيْمِ الدَّارِيْ وَلَا رَاٰهُ وَيَزِيْدُ بْنُ خَالِدٍ وَيَزِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ مَجْهُوْلَانِ

৩০৬. **অনুবাদ :** হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র.) হযরত তামীমে দারেমী (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন– রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– প্রত্যেক প্রবহমান রক্তের কারণেই অজু করতে হয়। উপরোক্ত হাদীস দু'টি ইমাম দারাকুতনী বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) হাদীসের অন্যতম বর্ণনাকারী তামীমে দারী হতে হাদীসটি শুনেননি এবং তাকে দেখেনওনি। আর ইয়াযীদ ইবনে খালেদ এবং ইয়াযিদ ইবনে মুহাম্মদ [বর্ণনাকারীদ্বয়] মাজহুল [অর্থাৎ, তাদের পরিচয় অজ্ঞাত]।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِىْ نَقْضِ الْوُضُوْءِ بِخُرُوْجِ الدَّمِ রক্ত বের হওয়ার কারণে অজু ভঙ্গ হওয়া সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ : শরীর হতে রক্ত নির্গত হলে অজু ভঙ্গ হবে কিনা ? এই বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ ঃ

مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِىِّ : ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আওযায়ী, মাকহুল প্রমুখ ইমামের মতে, রক্ত বের হলে অজু ভঙ্গ হয় না। তাঁদের দলিল :

১. ذَاتُ الرِّقَاعِ নামক লড়াইয়ের সময় হুজুর ﷺ একজন আনসার ও একজন মুহাজিরকে রাতে পাহারা দেওয়ার জন্য পাহাড়ী পথের মুখে নিযুক্ত করেন। আনসারী সাহাবী পাহারারত অবস্থায় নামাজ পড়তে লাগলেন, আর মুহাজির সাহাবী ঘুমিয়ে পড়লেন। ইত্যবসরে একজন মুশরিক এসে তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করল ; কিন্তু তিনি নামাজ ছাড়লেন না। উল্লেখ্য যে, এ সময়তীরের আঘাতে তাঁর শরীর থেকে রক্ত বের হয়ে শরীর ও কাপড় রক্তাক্ত হয়ে যায়। নামাজ শেষ করে মুহাজির ভাইকে জাগ্রত করেন।

২. وَفِى الدَّارِ قُطْنِىْ عَنْ اَنَسٍ (رض) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِحْتَجَمَ فَصَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

৩. وَفِىْ مُوَطَّاْ مَالِكٍ عَنِ الْمِسْوَرِ اَنَّهُ دَخَلَ عَلٰى عُمَرَ (رض) فِى اللَّيْلَةِ الَّتِىْ طُعِنَ فِيْهَا فَصَلّٰى عُمَرُ وَ جُرْحُهُ يَنْشَعِبُ دَمًا .

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَ اَحْمَدَ وَالصَّاحِبَيْنِ : ইমাম আবূ হানীফা, আহমদ ও সাহেবাইন (র.) প্রমুখ ওলামার মতে প্রবাহিত রক্তের দ্বারা অজু ভঙ্গ হয়ে যায়। তাঁদের দলিল–

১. مَا رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ عَنْ عَائِشَةَ (رض) جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِىْ حُبَيْشٍ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَتْ اِنِّىْ اِمْرَأَةٌ اُسْتَحَاضُ فَلَا اَطْهُرُ اَفَاَدَعُ الصَّلٰوةَ قَالَ ﷺ لَا اِنَّمَا ذٰلِكَ دَمُ عِرْقٍ ثُمَّ تَوَضَّئِىْ لِكُلِّ صَلٰوةٍ .

এখানে রক্ত প্রবাহের কারণে অজুর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাতে বুঝা যায় যে, রক্ত অজু ভঙ্গকারী।

২. وَفِى ابْنِ مَاجَةَ عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ اَصَابَهُ قَىْءٌ اَوْ رُعَافٌ اَوْ مَذِىٌّ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ .

৩. وَفِى الدَّارِ قُطْنِىْ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ (رض) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ مَنْ رَعُفَ فِى الصَّلٰوةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيَبْنِ عَلٰى صَلٰوتِهِ .

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِهِمْ : তাঁদের দলিলের জবাব নিম্নরূপ–

১. তাঁদের اَنْصَار ও مُهَاجِر-এর ঘটনা সম্পর্কীয় দলিলের জবাব হলো– উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারী عَقِيْل একজন মাজহুল রাবী। আর مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ হলেন مُخْتَلَفٌ فِيْهِ রাবী। কাজেই এটা দ্বারা দলিল দেওয়া যায় না।

২. অথবা একজন মাত্র সাহাবীর কর্ম দলিল হিসেবে পেশ করা যায় না।

৩. অথবা ঐ সাহাবীর এ ব্যাপারে জানা ছিল না।

৪. আর তাদের দ্বিতীয় হাদীসের বর্ণনাকারী সালেহ ইবনে মুকাতিল শক্তিশালী রাবী নয়। আর সুলায়মান ইবনে দাউদ ও মাজহুল রাবী।

৫. আর তাদের তৃতীয় দলিল হযরত ওমর (রা.) সংক্রান্ত। এটি দলিল হিসেবে পেশ করা একেবারে অযৌক্তিক। কেননা, তিনি ছিলেন مَعْذُوْر, আর মাজুর ব্যক্তির রক্ত প্রবাহের ফলে অজু যায় না, যেমন– سَلَسُلُ الْبَوْلِ যার প্রশ্রাব ঝরার রোগ আছে, সে অজু করার পর প্রশ্রাব ঝরার কারণে তার অজু ভঙ্গ হয় না।

بَابُ اٰدَابِ الْخَلَاءِ

পরিচ্ছেদ : মলমূত্র ত্যাগের শিষ্টাচার

اَلْخَلَاءُ শব্দটির "خَ" বর্ণে যবর যোগে। শব্দটির অর্থ– নির্জনস্থান বা খালিস্থান। বিশেষ অর্থে পায়খানা-প্রস্রাবের জায়গা। আর একে اَلْخَلَاءُ করে নামকরণের কারণ হলো– لِخَلَائِهِ فِىْ غَيْرِ اَوْقَاتِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ এই স্থানটি অধিকাংশ সময় জন মানুষ থেকে খালি থাকে বিধায় একে خَلَاءُ নামে নামকরণ করা হয়।

হযরত শাহ ওয়ালি উল্লাহ (র.) বলেন, 'আদাবুল খালা' তথা মলমূত্র ত্যাগের শিষ্টাচার রক্ষার্থে বেশ কিছু বিষয়ের উপর বিশেষ নজর রাখা বাঞ্ছনীয়।

প্রথমতঃ পায়খানা-পেশাবের প্রয়োজন মেটানোর সময় কিবলার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে তাকে পেছনে বা সামনে না রাখা। যেমন– রাসূল ﷺ বলেছেন, إِذَا اَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوْهَا

দ্বিতীয়তঃ পবিত্রতা ও পরিষ্কার -রিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষ নজর রাখা। অর্থাৎ, ভালোভাবে পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা। এজন্য রাসূল ﷺ বলেছেন– لِاَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْاِسْتِنْجَاءِ بِاَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ اَحْجَارٍ لِاَنَّهَا تُنَقِّىْ غَائِطَهَا

তৃতীয়তঃ এমন স্থানে পেশাব-পায়খানা না করা, যেখানে মানুষের কষ্ট হয়। যেমন– মানুষের চলাচলের পথে, বদ্ধ পানিতে অথবা নিজের ক্ষতি হয় এমন স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করা।

চতুর্থত ঃ পেশাব-পায়খানার সময় ভালো অভ্যাসে অভ্যস্ত হওয়া। যেমন ডান হাতে শৌচকর্ম না করা।

পঞ্চমতঃ এমন দূরে পেশাব-পায়খানা করা, যাতে মানুষ বায়ু নির্গত হওয়ার শব্দ শুনতে না পায় এবং লজ্জাস্থানও দেখতে না পায়।

ষষ্ঠতঃ শরীর বা কাপড়ে যেন মলমূত্র বা ময়লা না লাগে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা। যেমন রাসূল ﷺ বলেছেন– إِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يَبُوْلَ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ .

সপ্তমতঃ اِزَالَةُ الْوَسْوَسَةِ তথা মনের খটকা দূর করা। অর্থাৎ, এমন স্থানে পেশাব না করা যেখান থেকে শরীর বা জামা কাপড় অপবিত্র হওয়ার সন্দেহ হয়। যেমন গোসলখানায় পেশাব করা।

كَمَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَا يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِىْ مُسْتَحَمِّهٖ فَاِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ . (حُجَّةُ اللّٰهِ الْبَالِغَةُ)

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٠٧ - عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَاتَسْتَدْبِرُوْهَا وَلٰكِنْ شَرِّقُوْا اَوْ غَرِّبُوْا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ مُحْىِ السُّنَّةِ رَحِمَهُ اللّٰهُ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِىْ

৩০৭. অনুবাদ : হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন– রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন তোমরা [মলমূত্র ত্যাগের জন্য] শৌচাগারে গমন করবে; তখন কিবলাকে সামনে বা পেছনে রেখে বসবে না ; বরং পূর্ব বা পশ্চিম দিকে ফিরে বসবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

শায়খ ইমাম মুহীউস সুন্নাহ (র.) বলেন, এ হাদীসটি খোলা মাঠের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে

الصَّحْرَاءِ وَأَمَّا فِى الْبُنْيَانِ فَلَا بَأْسَ لِمَا رُوِىَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ ارْتَقَيْتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِى فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْضِىْ حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হলে এরূপ করাতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন– আমি কোনো এক প্রয়োজনে হযরত হাফসা (রা.)-এর ঘরের ছাদে আরোহণ করেছিলাম, তখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখতে পেলাম, তিনি কিবলা পেছনে রেখে সিরিয়ার দিকে ফিরে মলমূত্র ত্যাগ করছেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَذَاهِبُ الْاَئِمَّةِ فِىْ اِسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارِهَا কেবলা সম্মুখে বা পিছনে করে মলমূত্র ত্যাগ করার ব্যাপারে ইমামদের মতামত : পায়খানা-প্রস্রাবের সময় কিবলাকে সামনে বা পশ্চাতে রাখার বিধান নিয়ে ফিকাহবিদ ইমামগণের নিম্নরূপ মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

১. مَذْهَبُ اَهْلِ الظَّوَاهِرِ : আহলে জাওয়াহেরের মতে, اِسْتِقْبَال ও اِسْتِدْبَار উভয়টিই সর্বাবস্থায় জায়েজ। তাদের দলিল–
عَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ نَهَانَا النَّبِىُّ ﷺ اَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَنَسْتَدْبِرَهَا بِبَوْلٍ ثُمَّ رَأَيْتُهُ قَبْلَ اَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا -

২. مَذْهَبُ الْاِمَامِ الشَّافِعِىْ وَمَالِكٍ : ইমাম শাফেঈ ও মালিক এবং আহমদ (র.)-এর এক বর্ণনা মতে, খোলা ময়দানে উভয়টি অর্থাৎ, اِسْتِقْبَال ও اِسْتِدْبَارْ হারাম। প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে উভয়টি জায়েজ।
তাদের দলিল :
عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ لَقَدْ ارْتَقَيْتُ عَلٰى ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقْضِىْ حَاجَتَهُ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ لِحَاجَتِهِ -

৩. رَأْىُ الْاِمَامِ اَحْمَدَ : ইমাম আহমদের প্রসিদ্ধ মতে সর্বস্থানে اِسْتِقْبَال হারাম। তবে اِسْتِدْبَار জায়েজ। তার দলিল عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّهُ رَأَى النَّبِىَّ ﷺ عَلٰى ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ لِحَاجَتِهِ مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةِ -

৪. رَأْىُ الْاِمَامِ اَبِىْ يُوْسُفَ : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, اِسْتِقْبَالْ সর্বাবস্থায় হারাম, আর اِسْتِدْبَارْ খোলা ময়দানে হারাম। তবে প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে জায়েজ।

৫. قَوْلُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে اِسْتِقْبَالْ কোনো স্থানেই জায়েজ নেই। তবে اِسْتِدْبَارْ উভয় স্থানে জায়েজ। তাঁর দলিল হলো– عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّهُ رَاَى النَّبِىَّ ﷺ عَلٰى ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ مُسْتَقْبِلَ الخ

৬. مَذْهَبُ اِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِىْ وَابْنِ سِيْرِيْنَ : ইব্রাহীম নখয়ী ও ইবনে সীরীনের মতে, اِسْتِدْبَار ও اِسْتِقْبَال মতলকভাবে হারাম ; এমনকি বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকেও এরূপ হুকুম। তাদের দলিল হলো–
عَنْ مَعْقَلِ الْاَسَدِىْ (رضـ) نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِبَوْلٍ اَوْ بِغَائِطٍ -

৭. مَذْهَبُ اَبِىْ عَوَانَةَ : ইমাম আবূ আওয়ানার মতে, اِسْتِدْبَار ও اِسْتِقْبَال এই নিষিদ্ধ শুধু মদীনাবাসী ও তার আশপাশের লোকদের জন্য; অন্যদের জন্য নয়। তাঁর দলিলল– قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلٰكِنْ شَرِّقُوْا اَوْ غَرِّبُوْا
উক্ত হাদীসে শুধু মদীনাবাসীদের خِطَابْ করা হয়েছে।

مَذْهَبُ الْاَحْنَافِ : ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ছাওর, মুজাহিদ এবং ইমাম আহমদেরও এক বর্ণনা মতে, সর্বাবস্থায় মলমূত্র ত্যাগ করার সময় اِسْتِدْبَار ও اِسْتِقْبَال করে বসা হারাম।

তাদের দলিল–

١. عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ (رضـ) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ اِذَا اَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوْهَا .

٢. عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ لَقَدْ نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ اَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ اَوْ بَوْلٍ .

٣. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ اِنَّمَا اَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ اُعَلِّمُكُمْ فَاِذَا اَتٰى اَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا .

اَلْجَوَابُ عَنْ اَدِلَّتِهِمْ তাদের দলিলসমূহের জবাব :

১. আহলে যাওয়াহের কর্তৃক বর্ণিত হযরত জাবের (রা.) -এর হাদীসের রাবী مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقْ গ্রহণযোগ্য রাবী নয়।

২. সুলায়মান তাইসী তাকে كَذَّابْ ইমাম মুহাম্মদ তাকে مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ বলেছেন।

৩. আর ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র.)-এর হাদীসের জবাবে বলা যায় যে,

ক. সম্ভবতঃ হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস নিষেধাজ্ঞা প্রদানের পূর্বেকার। সুতরাং হযরত আবূ আইয়ূব (রা.)-এর হাদীস কর্তৃক হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস রহিত হয়ে গিয়েছে।

খ. অথবা কোনো অসুবিধার কারণে নবী করীম ﷺ কিবলা পেছনে রেখে ইস্তিঞ্জা করেছেন।

গ. অথবা নবী করীম ﷺ কোনো বিশেষ ব্যাপারে ধ্যানমগ্ন ছিলেন। এরূপ অন্যমনস্ক অবস্থায় কিবলার দিকে পিঠ করে ইস্তিঞ্জা করাতে কোনো দোষ নেই।

ঘ. অথবা এটাও হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিঞ্চিৎ কিবলার দিকে ফিরে বসেছিলেন। হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর ক্ষণিকের দৃষ্টিতে কিবলার দিক বলে ভুল বর্ণনা করেছেন। শিষ্টাচারের বরখেলাফ বলে তিনি দ্বিতীয়বার দৃষ্টিপাত করেননি।

دَفْعُ التَّعَارُضِ بَيْنَ الْحَدِيْثَيْنِ দু'টি হাদীসের দ্বন্দ্বের সমাধান : হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.)-এর হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, রাসূল ﷺ কেবলাকে সামনে বা পিছনে রেখে মলমূত্র ত্যাগ করতে নিষেধ করেছেন। আর হযরত ইবনে ওমরের হাদীস দ্বারা বুঝা যায় রাসূল ﷺ কেবলাকে পিছনে রেখে উক্ত কাজ করেছেন, বাহ্যিকভাবে উভয়ের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয় তার সমাধান নিম্নরূপ ঃ

১. হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসখানি নিষেধাজ্ঞা প্রদানের পূর্বেকার। সুতরাং হযরত আবূ আইয়ূব আনসারীর হাদীস দ্বারা তা রহিত হয়ে গেছে।

২. হয়তো বা কোনো অসুবিধার কারণে রাসূল ﷺ কিবলা পেছনে রেখে মলমূত্র ত্যাগ করেছেন। সুতরাং এটা দলিল হতে পারে না।

৩. অথবা, রাসূল ﷺ কোনো বিশেষ ব্যাপারে ধ্যানমগ্ন ছিলেন বলে অন্যমনস্ক অবস্থায় কিবলা পেছনে রেখে মলমূত্র ত্যাগ করেছেন। সুতরাং এটাও দলিল হতে পারে না।

৪. আলোচ্য বিষয়ে হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.) বর্ণিত হাদীসটি অতিশয় বিশুদ্ধ। যেমন– ইমাম তিরমিযী (র.) হতে তার স্বীকৃতি পাওয়া যায়। সুতরাং অতি বিশুদ্ধ হাদীস প্রাধান্য পাওয়াই যুক্তির কথা। অতএব, এ ক্ষেত্রে হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.)-এর হাদীসটি অনুসরণীয় হবে।

৫. হযরত আবূ আইয়ূব (রা.)-এর হাদীসে নিষেধাজ্ঞার কার্যকারণটি সুস্পষ্ট। অর্থাৎ, বায়তুল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। পক্ষান্তরে হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসে কার্যকারণ উল্লেখ নেই। অতএব, কার্যকারণ সুস্পষ্ট ও অস্পষ্টের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট সম্বলিত হাদীসই প্রাধান্য পায়।

৬. হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.)-এর হাদীসটি قَوْلِىْ আর হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসটি হচ্ছে فِعْلِىْ সুতরাং দ্বন্দ্বকালে قَوْلِىْ হাদীস প্রাধান্য পাবে।

৭. হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.)-এর হাদীসটি হারাম হওয়ার দলিল। অপর পক্ষে হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসটি হালাল হওয়ার দলিল। সুতরাং দ্বন্দ্বকালে হারাম হওয়ার দলিলই প্রাধান্য লাভ করে।

৮. অথবা, উম্মতের জন্য মলমূত্র ত্যাগকালে কিবলার اِسْتِقْبَالْ এবং اِسْتِدْبَارْ উভয়ই হারাম। কিন্তু রাসূল ﷺ-এর জন্য এ হুকুম নয়।

৯. অথবা, রাসূল ﷺ কা'বা ঘর হতে উত্তম, তাই তাঁর জন্য কা'বার সম্মান জরুরি নয়। সুতরাং إِسْتِدْبَار ও إِسْتِقْبَال তাঁর জন্য বিশেষভাবে জায়েজ ছিল। এ হুকুম উম্মতের জন্য প্রযোজ্য নয়।

১০. হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসে বিষয়টির আংশিক বিবরণ বিদ্যমান। আর আবূ আইয়ূব (রা.)-এর হাদীসে একটি মৌলনীতি বর্তমান। অতএব, আসল ও ফরা'তে [মূলনীতি ও প্র-মৌলনীতিতে] দ্বন্দ্ব হলে শাস্ত্রমতে আসলই প্রাধান্য পায়। এ ক্ষেত্রেও তাই কার্যকরী হবে।

১১. এমনও হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিঞ্চিৎ মোড় ঘুরিয়েই বসেছিলেন। হযরত ইবনে ওমর (রা.) আকস্মিক দৃষ্টিতে তা সঠিক উপলব্ধি করতে পারেননি এবং লজ্জাশীলতার পরিপন্থি হিসেবে তিনি পুনরায় তাকিয়ে নিশ্চিত হননি।

وَلٰكِنْ شَرِّقُوْا اَوْ غَرِّبُوْا-এর مُخَاطَبْ কারা : মলমূত্র ত্যাগের সময় কোন দিকে ফিরে বসতে হবে-এর সমাধানে রাসূল ﷺ বলেছেন– "وَلٰكِنْ شَرِّقُوْا اَوْ غَرِّبُوْا" অর্থাৎ, তোমরা পূর্ব বা পশ্চিম দিকে ফিরে বসবে। প্রশ্ন হলো, রাসূল ﷺ এ কথা বলে কাদেরকে সম্বোধন করেছেন? এর জবাবে হাদীস বিশারদগণ বলেন–

১. এ কথা বলে রাসূল ﷺ মদীনাবাসীদেরকে সম্বোধন করেছেন। কেননা, কা'বা ঘর তাদের থেকে দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। তাই তাদেরকে দক্ষিণ দিকে إِسْتِقْبَال ও إِسْتِدْبَار করতে নিষেধ করে পূর্ব বা পশ্চিম দিকে إِسْتِقْبَال ও إِسْتِدْبَار-এর নির্দেশ দিয়েছেন। এ মর্মে তিনি বলেছেন– لَاتَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوْهَا وَلٰكِنْ شَرِّقُوْا اَوْ غَرِّبُوْا

২. অথবা, যাদের কিবলা পূর্ব বা পশ্চিম দিকে নয়, "وَلٰكِنْ شَرِّقُوْا اَوْ غَرِّبُوْا" দ্বারা রাসূল ﷺ তাদের সবাইকে সম্বোধন করেছেন।

عِلَّةُ الْمَنْعِ عَنْ اِسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارِهَا কিবলাকে সামনে বা পেছনে করার নিষেধের কারণ : মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি। আর তাকে জীবন যাপন করতে দুনিয়াবী খাবার খেতে হয়; তাই তাকে মলমূত্র ত্যাগ করতে হয়। এটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ঘৃণিত কাজ হলেও তা ত্যাগ করতে মানুষ বাধ্য। অপর দিকে কিবলা তথা বায়তুল্লাহ শরীফ মানুষের জন্য অতিশয় সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ স্থান। এরই দিকে মুখ করে তারা মহান আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে সিজদায় অবনত হয়, নামাজ আদায় করে। তাই সে কিবলাকে তারা সম্মান প্রদর্শন করে, তার প্রতি মুখ করে এমন কোনো কাজ করা শোভনীয় হতে পারে না, যা তজ্জন্য অবমাননাকর হয়। এ জন্যই কিবলার প্রতি সম্মান, মর্যাদা প্রদর্শন ও তাকে অবমাননা করা হতে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যেই কিবলাকে সামনে বা পিছনে রেখে মলমূত্র ত্যাগ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

٣٠٨- وَعَنْ سَلْمَانَ (رضـ) قَالَ نَهَانَا يَعْنِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ اَوْ بَوْلٍ اَوْ نَسْتَنْجِىَ بِالْيَمِيْنِ اَوْ اَنْ نَسْتَنْجِىَ بِاَقَلَّ مِنْ ثَلٰثَةِ اَحْجَارٍ اَوْ اَنْ نَسْتَنْجِىَ بِرَجِيْعٍ اَوْ بِعَظْمٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩০৮. **অনুবাদ :** হযরত সালমান ফারসী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিষেধ করেছেন, কেবলামুখী হয়ে পেশাব-পায়খানা করতে। ডান হাতে ইস্তিঞ্জা করতে, ইস্তিঞ্জায় তিন ঢিলার কমে ব্যবহার করতে এবং শুষ্ক গোবর অথবা হাড়-দ্বারা ঢিলা নিতে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِىْ عَدَدِ الْاَحْجَارِ ঢিলার সংখ্যা সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : শৌচ ইস্তিঞ্জা করার সময় কয়টি ঢিলা নিতে হবে এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

১. **مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَاَحْمَدَ :** ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক ও আবূ ছাওরের মতে তিনটি ঢিলা নেওয়া ওয়াজিব। তাদের দলিল–

١. عَنْ سَلْمَانَ قَالَ نَهَانَا النَّبِىُّ ﷺ اَنْ نَسْتَنْجِىَ بِاَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ اَحْجَارٍ -

٢. عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَ اِذَا ذَهَبَ اَحَدُكُمْ حَاجَتَهُ فَلْيَسْتَطِبْ بِثَلَاثَةِ اَحْجَارٍ -

٣. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ -

২. مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمَالِكٍ وَالصَّاحِبَيْنِ : ইমাম আবূ হানীফা, মালেক ও সাহেবাইনের মতে, বেজোড় বা তিনটি ঢিলা নেওয়া কোনটিই ওয়াজিব নয়। বরং কম বেশি, যা দ্বারা স্থান পরিষ্কার হয় তাই ব্যবহার করা আবশ্যক। তাঁদের দলিল–

১. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ وَ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ اَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ ـ

৩. আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (র.) বলেন, ইস্তেঞ্জার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে– تصفية المحل بازالة النجاسة অর্থাৎ, ময়লা দূর করে স্থানটি পরিষ্কার করা। তাই পরিষ্কার করতে যত ঢিলা দরকার ততটি নিতে হবে। তিনটি নেওয়া শর্ত নয়।

তাদের দলিলের জবাব :

১. যে সকল হাদীসে তিনটি ঢিলা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে তা مَحْمُوْلٌ عَلَى الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ তথা সর্ব সাধারণের নিয়মের উপর ব্যবহার হয়েছে। আর সাধারণত মানুষ তিনটি ঢিলা ব্যবহার করে থাকে। ফলে উক্ত হাদীসটি তিনটি ঢিলা ব্যবহার করাকে ওয়াজিব প্রমাণিত করে না।

২. অথবা বলা যায় যে, তিনটি নেওয়া মোস্তাহাব।

৩. অথবা তিনটি ঢিলার কথা اِحْتِيَاطًا বা সতর্কতার জন্য বলা হয়েছে।

وَجْهُ النَّهْيِ عَنِ الْاِسْتِنْجَاءِ بِرَجِيْعٍ اَوْ بِعَظْمٍ **গোবর ও হাড় ব্যবহার দ্বারা ইস্তেঞ্জা করা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ :** রাসূল ﷺ গোবর ও হাড় দ্বারা اِسْتِنْجَاء করতে নিষেধ করেছেন। এর কারণসমূহ নিম্নরূপ–

১. গোবর তো নিজেই অপবিত্র। তাই তা দ্বারা নাপাকী তো দূর হবে না; বরং আরো নাপাকী বৃদ্ধি পাবে।

২. হাঁড় হচ্ছে শক্ত পদার্থ। তা দ্বারা ইস্তিঞ্জা করলে আঘাত লাগতে পারে।

৩. অথবা [গোবর ও] হাড় হলো জিনদের খাদ্য, যেমন হযরত ইবনে মাসউদে (রা.)-এর হাদীসে এসেছে–

فَاِنَّهَا زَادُ اِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ

কাজেই তাতে জিনদের খাদ্যের দুস্প্রাপ্যতা দেখা দেবে। এ জন্যই রাসূল ﷺ গোবর ও হাড় ইস্তিঞ্জার কাজে ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

وَعَنْ ٣٠٩ اَنَسٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩০৯. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পায়খানা প্রবেশ করার সময় বলতেন, اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ অর্থাৎ, হে আল্লাহ ! আমি তোমার নিকট জিন-পরীদের অনিষ্ট সাধন হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।–[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** হাদীসে উল্লেখিত দোয়াটি পায়খানা-প্রস্রাবের পূর্বে পড়া সুন্নত। এই দোয়া দ্বারা শয়তানের প্রভাব প্রতিক্রিয়া হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়। কেননা, অন্য হাদীসে এসেছে যে, শয়তান মানুষের লজ্জাস্থান নিয়ে খেলা করে। আর পায়খানা, প্রস্রাবকালে লজ্জাস্থান যেহেতু অনাবৃত থাকে তাই শয়তান খেলা করার বিশেষ সুযোগ পায়। এ জন্য উল্লেখিত দোয়া পাঠ করার বিধান করা হয়েছে, যাতে শয়তানের প্রভাব হতে মুক্ত থাকা যায়।

اَلْخُبُثُ وَالْخَبَائِثُ **-এর অর্থ :** اَلْخُبُثُ শব্দটির بَاء হরফটি পেশযোগে اَلْخَبِيْثُ -এর বহুবচন। শয়তান ও জিনদের মধ্যে যারা মানুষদেরকে কষ্ট দেয় তাদেরকে اَلْخَبِيْثُ বলা হয়।

আর اَلْخَبَائِثُ শব্দটি اَلْخَبِيْثَةُ -এর বহুবচন, শয়তানের মধ্যে নারী জাতিকে اَلْخَبِيْثَةُ বলা হয়।

কারো মতে اَلْخُبْثُ শব্দটি ب সাকিন যোগে হবে। আর এর সাধারণ অর্থ হলো– কুফর, খারাবী, নাফরমানী, অপছন্দনীয় ইত্যাদি। আর اَلْخَبَائِثُ অর্থ হলো– গর্হিত, ঘৃনার্হ অভ্যাস, ভ্রান্ত ধারণা, মন্দ স্বভাব ইত্যাদি।

وَعَنْ ٣١٠ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ ﷺ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ اِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَكَانَ يَمْشِىْ بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ اَخَذَ جَرِيْدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ فِىْ كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَ صَنَعْتَ هٰذَا فَقَالَ لَعَلَّهُ اَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيْبَسَا ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩১০. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ দু'টি কবরের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় বললেন, এদের উভয়কে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে ; কিন্তু কোনো বড় পাপের জন্য শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না। এদের একজন প্রস্রাবের সময় আড়াল করত না।

আর মুসলিম শরীফের বর্ণনায় রয়েছে যে, সে প্রস্রাব হতে উত্তমরূপে পবিত্রতা লাভ করত না।

আর অপর ব্যক্তি একজনের কথা অপরজনের নিকট বলে বেড়াত। এরপর রাসূল ﷺ একটি তাজা খেজুরের ডাল নিয়ে তাকে দু'ভাগে ভাগ করলেন– এবং প্রত্যেক কবরে একটি করে গেঁড়ে দিলেন। সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এরূপ কেন করলেন ? জবাবে রাসূল ﷺ বললেন, যে পর্যন্ত ডাল দু'টি না শুকায়, সে পর্যন্ত তাদের শাস্তি হালকা বা লঘু করা হবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَمَا وَجْهُ قَوْلِهِ ﷺ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ وَالْحَالُ كِلَاهُمَا ذَنْبَانِ كَبِيْرَانِ উভয়টি কবীরাহ হওয়া সত্ত্বেও রাসূল ﷺ يُعَذَّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ বলার কারণ : প্রস্রাব থেকে পবিত্রতা অর্জন না করা এবং পরনিন্দা তথা চোগলখুরী কবীরা গুনাহ হওয়া সত্ত্বেও মহানবী وَمَا يُعَذَّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ তথা তাদেরকে কবীরা গুনাহের কারণে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না বলার যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে مُحَدِّثِيْنِ كِرَامْ নিম্নোক্ত মতামত পেশ করেন—

১. এগুলো তোমাদের কাছে কবীরা গুনাহ নয়; কিন্তু আল্লাহর কাছে কবীরা গুনাহ।
২. এগুলো سَبْعُ مُهْلِكَاتُ -এর নয় ; বিধায় وَمَا يُعَذَّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ বলা হয়েছে।
৩. এগুলো থেকে বেঁচে থাকা তেমন কঠিন ব্যাপার নয়, তাই এগুলোকে وَمَا يُعَذَّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ বলা হয়েছে।
৪. এগুলো فِىْ نَفْسِهٖ কবীরা মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয় কিন্তু বারংবার করার ফলে এগুলো কবীরা গুনাহে পরিণত হয়।
৫. এগুলো যে কবীরা গুনাহ তা রাসূল ﷺ-এর পূর্বে জানা ছিল না। তাই وَمَا يُعَذَّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ বলেছেন। পরে وَحْى দ্বারা জেনেছেন যে, ইহা কবীরা গুনাহ। তাই পূর্ব কথাকে প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন যে, بَلٰى اِنَّهُمَا لَكَبِيْرٌ যা বুখারী শরীফে বলা হয়েছে।
৬. অথবা, কাবীরা অর্থ সর্বোচ্চ মানের কবীরা। অর্থাৎ বড় ধরনের কাবীরা গুনাহের জন্য তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়নি।
৭. রাসূল ﷺ-এর কথার অর্থ হলো, বাহ্যিকভাবে এটা কাবীরা বলে মনে হয় না। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকেই মহানবী ﷺ এরশাদ করেছেন– "مَا يُعَذَّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ"
৮. اَلنَّمِيْمَةُ এবং عَدَمُ الْاِسْتِتَارِ عَنِ الْبَوْلِ কবীরা গুনাহ হওয়ার মধ্যে সন্দেহ নেই, তবে তা থেকে পরিত্রাণ লাভ করা কঠিন ছিল না, বিধায় মহানবী ﷺ এখানে مَا يُعَذَّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ বলেছেন।

اَلْاِسْتِتَارُ مِنَ الْبَوْلِ -এর অর্থ :

আভিধানিক অর্থ : اَلْاِسْتِتَارُ শব্দটি বাবে اِسْتِفْعَالْ -এর মাসদার। যা اَلسَّتْرُ শব্দমূল থেকে উৎকলিত। অর্থ– আড়াল করা, পর্দা করা, আবরণ বা আচ্ছাদন দেওয়া ইত্যাদি। আর بَوْلٌ শব্দের অর্থ হলো– প্রস্রাব।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : পরিভাষায় প্রস্রাব হতে উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করাকে اَلْاِسْتِتَارُ مِنَ الْبَوْلِ বলে।
উল্লেখ্য, আলোচ্য হাদীসে اَلْاِسْتِتَارُ শব্দটি বর্জন ও দূরে থাকা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রস্রাব দ্বারা উদ্দেশ্য : হাদীসে প্রস্রাব-এর কথা উল্লেখ করা হলেও মানুষের না পশুর প্রস্রাব এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। তাই স্বভাবতই এর মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্ট হয়। যেমন–

প্রথমত : কারও মতে, এখানে উদ্দেশ্য মানুষের প্রস্রাব। اَلْاِسْتِتَارُ বলার দ্বারা নিজের প্রস্রাব-এর কথাই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, ঐ ব্যক্তি নিজের প্রস্রাব হতে পবিত্রতা অর্জন করত না।

দ্বিতীয়ত : আবার কারও মতে পশুর প্রস্রাব। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে যে, মহানবী ﷺ উভয় সাহাবীর একজনের জীবদ্দশার অবস্থার কথা তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলে তাঁর স্ত্রী পশুর প্রশ্রাবের বেলায় তিনি অসতর্ক থাকতেন বলে উত্তর দেন। এতে প্রমাণিত হয় যে مِنَ الْبَوْلِ -এর بَوْلِ দ্বারা পশুর প্রস্রাবই উদ্দেশ্য।

তৃতীয়ত: কোনো কোনো আলিম এ মতও প্রকাশ করেছেন যে, এখানে উভয় প্রকার প্রস্রাবের কথাই বলা হয়েছে।

اَلْحِكْمَةُ فِىْ غَرْزِ الْجَرِيْدَةِ **ডাল পুঁতে রাখার হিকমত :** কবরের উপর কাঁচা ডাল পুঁতে রাখার পেছনে নিম্নোক্ত রহস্য থাকতে পারে।

১. ইমাম খাত্তাবী (র.) বলেছেন যে, সজীব বৃক্ষ ও ডাল আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ পাঠ করে। যেমন ইরশাদ হয়েছে, وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ। হুজুর ﷺ চিন্তা করলেন যে, যতক্ষণ ডাল আল্লাহর জিকির করবে, ততক্ষণ আযাব কিছুটা হালকা হবে।

২. ইমাম নববী (র.) বলেছেন যে, কবরবাসীদ্বয়ের দুঃখ দেখে রাসূল ﷺ আজাব হতে মুক্তির সুপারিশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা এ মর্মে দোয়া কবুল করেছেন যে, তাদের কবরের উপর দু'টি ডাল পুঁতে দিন। তা শুকানো পর্যন্ত আপনার দোয়া কবুল হলো। সে জন্য তিনি ডাল পুঁতে দিয়েছেন।

৩. কারো কারো মতে, কবর দু'টিকে চিহ্নিত করার জন্য খেজুর ডাল পুঁতে দিয়েছেন।

৪. আল্লামা কিরমানী (র.) বলেছেন, ডাল পুঁতে রাখা বাহ্যিক নিদর্শন মাত্র। মূলতঃ রাসূলের হাতের বরকতে তাদের শাস্তি কিছু লাঘব হয়েছে।

حُكْمُ غَرْزِ الْجَرِيْدَةِ فِى الْحَالِ وَالْقَاءِ الرَّيَاحِيْنَ **বর্তমান যুগে ডাল ও ফুল দেওয়ার হুকুম :** এ হাদীসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করে এ ফতোয়া দেওয়া যাবে কি-না যে, "কবরে ডাল রোপণ করা ও পুষ্পমাল্য অর্পণ জায়েজ। এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মতামত পেশ করা হলো–

১. اَهْلِ بِدْعَتْ বলেন যে, উভয়টি জায়েজ ; বরং মোস্তাহাব।

২. ইমাম খাত্তাবী, ইবনে বাত্তাল ও আল্লামা মাযেরী (র.) প্রমুখের মতে কবরে ডাল রোপণ ও পুষ্প অর্পণ কোনোটাই জায়েজ নেই। কেননা, এটা خُصُوْصِيَّتِ النَّبِىِّ ﷺ তথা রাসূল ﷺ এর বিশেষত্ব। অপরদিকে তাঁর নিকট এ মর্মে ওহী এসেছে। আর আজাব হালকা রাসূলের হাতের বরকতের কারণেই হয়েছে।

৩. ইবনে হাজার ও ইমাম নববীর মতে কবরে ডাল পুঁতে রাখা জায়েজ।

৪. **চূড়ান্ত কথা :** مَعَارِفُ الْقُرْاٰنِ -এর লেখক মাওলানা মুফতি শফী (র.) বলেছেন, যেহেতু রাসূল ﷺ এরূপ করেছেন তাই সময় সময়ে গাছের ডাল পুঁতে রাখা জায়েজ। তবে এটা سُنَّة مُسْتَقِلَّة ও عَادَت جَارِيَة -এর বিষয় নয়। ফুল দেওয়া, আতর, লোবান, গোলাপ জল ছিটানো ও বাতি দেওয়া এগুলো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

هَلْ اَهْلُ الْقَبْرِ كَانَا مُسْلِمَيْنِ اَمْ كَافِرَيْنِ **কবরবাসীদ্বয় মুসলমান না কাফির ছিল ?** কবরবাসী দু'জন মুসলিম না কাফির ছিল, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন–

১. ইবনে হাজার আস্‌কালানী ও ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, কবরবাসী দু'জন মুসলমান ছিল। তাঁদের দলিল–

١. عَنْ اَبِىْ نَمَامَةَ "اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَرَّ بِالْبَقِيْعِ . فَقَالَ مَنْ دَفَنْتُمُ الْيَوْمَ هٰهُنَا" . هٰذَا يَدُلُّ عَلٰى اَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ . لِاَنَّ الْبَقِيْعَ كَانَتْ مَقْبَرَةَ الْمُسْلِمِيْنَ .

٢. جَاءَ فِىْ سُنَنِ ابْنِ مَاجَةَ "اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ جَدِيْدَيْنِ" وَهٰذَا يَدُلُّ عَلٰى اَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ .

٣. اَلشَّفَاعَةُ تَكُوْنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ فَقَطْ .

২. আবূ মূসা মাদানীসহ কেউ কেউ বলেন, কবরবাসী দু'জন কাফের ছিল। তাঁদের দলিল–

١. عَنْ جَابِرٍ "مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى قَبْرَيْنِ مِنْ بَنِىْ نَجَّارٍ هَلَكَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ. فَسَمِعَهُمَا يُعَذَّبَانِ فِى الْبَوْلِ وَالنَّمِيْمَةِ هٰذَا يَدُلُّ عَلٰى اَنَّهُمَا كَانَا كَافِرَيْنِ.

لَوْكَانَ كَافِرَيْنِ كَيْفَ اِسْتَغْفَرَ لَهُمَا যদি কবরবাসী উভয়ই কাফের হয়, তবে কিভাবে তাদের জন্য প্রার্থনা করলেন : কবরবাসী দু'জন যদি সত্যই কাফের হয়ে থাকে, তবে কিভাবে রাসূল ﷺ তাদের জন্য اِسْتِغْفَارْ করলেন, অথচ আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের জন্য اِسْتِغْفَار করতে নিষেধ করেছেন। এর জবাবে হাদীস বিশারদগণ বলেন–

১. কাফের-মুশরিকদের জন্য شَفَاعَتْ এবং اِسْتِغْفَار সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হওয়ার পূর্বে তিনি এরূপ اِسْتِغْفَارْ করেছিলেন।
২. যে আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের জন্য اِسْتِغْفَارْ করতে নিষেধ করেছেন, সেখানে বিষয়টি عَذَابُ الْقَبْرِ সংক্রান্ত নয়।
৩. অথবা, কিছু সময়ের জন্য রাসূল ﷺ তাদের জন্য اِسْتِغْفَارْ করেছিলেন।
৪. অথবা, اِسْتِغْفَارْ করেননি ; বরং একটু تَخْفِيْف-এর জন্য খেজুরের তাজা ডাল গেঁড়ে দিয়েছিলেন।
৫. অথবা, কবর দু'টি কাফেরের ছিল, এ কথা তাঁর জানা ছিল না বিধায় তিনি اِسْتِغْفَارْ করেছিলেন।
৬. অথবা, আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ অনুমতি পেয়ে তিনি তাদের জন্য اِسْتِغْفَارْ করেছিলেন।

وَعَنْ ٣١١ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِتَّقُوا اللَّاعِنَيْنِ قَالُوْا وَمَا اللَّاعِنَانِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الَّذِىْ يَتَخَلّٰى فِىْ طَرِيْقِ النَّاسِ اَوْ فِىْ ظِلِّهِمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩১১. **অনুবাদ** : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা দু'টি অভিসম্পাতের কারণ হতে বেঁচে থাক। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন– হে আল্লাহর রাসূল! অভিসম্পাতের কারণ দু'টি কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ১. যে ব্যক্তি মানুষের রাস্তায় পায়খানা করে, অথবা, ২. যে ব্যক্তি মানুষের ছায়ার জায়গায় পায়খানা করে। [তাদের এই কার্যদ্বয়েই হলো– অভিসম্পাতের কারণ।] –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : মানুষ চলাচলের পথে কিংবা মানুষ যে বৃক্ষ বা প্রাচীরের ছায়ায় বসে বিশ্রাম গ্রহণ করে এরূপ স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করার কারণে পথিক এবং পরিশ্রান্ত ব্যক্তির কষ্ট হয়, বিধায় এই দু'টিই অভিসম্পাতের কারণ। তাই রাসূল ﷺ এসব স্থানে পেশাব-পায়খানা করতে নিষেধ করেছেন।

অভিসম্পাতের জন্য স্থান দু'টি নির্দিষ্ট নেই। বরং এমন সব জায়গা যেখানে মল-মূত্র ত্যাগ করলে মানুষের কষ্টের কারণ হতে পারে, যেমন– শীতের মওসুমে মানুষ যেখানে বসে রৌদ্র ভোগ করে বা আগুনের কাছে বসে তাপ গ্রহণ করে তার বিধান বৃক্ষের তলায় বসে ছায়া গ্রহণের মতোই। যেমন– শীত প্রধান দেশের লোকেরা এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে থাকে। আবার স্বাভাবিকভাবে মানুষের চলাচলের পথে পায়খানা করলে যেমন লোকের কষ্ট হয়, তদরূপভাবে পুকুরের ঘাটলা, জীব-জন্তুকে পানি পান করানোর স্থান ইত্যাদির বিধানও চলাচলের রাস্তার মতো।

وَعَنْ ٣١٢ اَبِىْ قَتَادَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا شَرِبَ اَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِى الْاِنَاءِ وَاِذَا اَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهٗ بِيَمِيْنِهٖ وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِيْنِهٖ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩১২. **অনুবাদ** : হযরত আবূ কাতাদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কেউ পানি পান করে সে যেন পানির পেয়ালায় নিঃশ্বাস না ফেলে। আর যখন পায়খানায় যায় তখন যেন ডান হাতে পুরুষাঙ্গ না ধরে না এবং ডান হাতে ইস্তিঞ্জা না করে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَلَا يَتَنَفَّسْ فِى الْاِنَاءِ -এর ব্যাখ্যা : পানি পান করার সময় পাত্রে নিঃশ্বাস ফেলতে রাসূল ﷺ নিষেধ করেছেন। এই নিষেধাজ্ঞার কয়েকটি কারণ রয়েছে–

প্রথমতঃ মানুষের নিঃশ্বাস ত্যাগের সময় দূষিত বায়ু নির্গত হয়ে তা পানির সাথে মিশে গিয়ে পানিকে দূষিত করে ফেলে। এটা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এ জন্য রাসূল ﷺ পান-পাত্রে নিঃশ্বাস ফেলতে নিষেধ করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ এটা অন্যের জন্য ঘৃণার উদ্রেক করতে পারে বিধায় রাসূল ﷺ নিষেধ করেছেন।

তৃতীয়তঃ অনেক সময় নিঃশ্বাসের কারণে পানির স্বাদে পরিবর্তন দেখা দিতে পারে, তাই নিষেধ করেছেন।

চতুর্থতঃ নিঃশ্বাসের সাথে অনেক সময় নাকের ময়লাও পানিতে গিয়ে পড়তে পারে, তাই নিষেধ করেছেন।

وَعَنْ ٣١٣ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩১৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি অজু করে সে যেন নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করে। আর যে কেউ ঢিলা [দ্বারা ইস্তিঞ্জা] করে সে যেন বেজোড় সংখ্যক ঢিলা ব্যবহার করে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** সাধারণত মানুষের নাক সর্বদা খোলা থাকে ; আর মানুষ প্রতি মুহূর্তে নিঃশ্বাস নেয়, ফলে ধূলা-বালির সাথে নানা প্রকার রোগ-জীবাণু নাকের ভেতরে প্রবেশ করে। এছাড়া নিঃশ্বাসের সাথে কার্বনডাই অক্সাইড গ্যাস বের হওয়ার সময় নাকের মধ্যস্থিত লোমে এক প্রকার দূষিত লালা জমা হয়। তাই অজুর সময় নাকে পানি দিয়ে পরিষ্কার করলে এগুলো হতে মুক্ত হওয়া যায়। আর চিকিৎসা বিজ্ঞানেও দৈনিক কয়েকবার পানি দ্বারা নাক পরিষ্কার করতে বলা হয়েছে। এভাবে হাত, পা ও চুলের অগ্রভাগ ধৌত করতেও বলা হয়েছে। মুসলমানরা নিয়মিত অজু করলে এই কাজগুলো অনায়াসে হয়ে যায়।

وَعَنْ ٣١٤ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ فَاَحْمِلُ اَنَا وَغُلَامٌ اِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً يَسْتَنْجِىْ بِالْمَاءِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩১৪. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী করীম ﷺ পায়খানায় প্রবেশ করতেন তখন আমি ও একটি বালক পানির পাত্র এবং মাথায় বর্শাধারী একটি লাঠি বহন করে নিয়ে যেতাম। তিনি সে পানি দ্বারা শৌচকার্য করতেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** উক্ত হাদীসে غُلَامٌ দ্বারা কাকে বুঝানো হয়েছে, এ বিষয়ে তিনটি অভিমত রয়েছে। যথা–

১. ইমাম বুখারী (র.)-এর মতে তিনি ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)।

২. কারো মতে, তিনি হলেন হযরত বেলাল (রা.)।

৩. আরেক দলের মতে, তিনি হলেন হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)।

عَنَزَةً -এর অর্থ عَنَزَة বলা হয় একধরনের লাঠি বা ছড়ি, যার অগ্রভাগে বর্শা লাগানো থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করতেন। খোলাস্থানে নামাজ পড়লে তা গেঁড়ে নামাজ পড়তেন। আর ইস্তিঞ্জার জন্য ডেলার প্রয়োজন হলে তা দ্বারা মাটি খুঁড়ে ডেলা নিতেন।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৩১৫ عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ نَزَعَ خَاتَمَهُ ـ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ وَقَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا حَدِيْثٌ مُنْكَرٌ وَفِيْ رِوَايَتِهٖ وَضَعَ بَدَلَ نَزَعَ ـ

৩১৫. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন পায়খানায় প্রবেশ করতেন, তখন তিনি নিজের আংটিটি খুলে রাখতেন। –[আবূ দাঊদ, নাসায়ী ও তিরমিযী]

ইমাম তিরযমী (র.) বলেন, এই হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। ইমাম আবূ দাঊদ (র.) বলেন,এটা মুনকার হাদীস। তাঁর বর্ণনায় نَزَعَ শব্দের পরিবর্তে وَضَعَ রয়েছে। অর্থাৎ 'খুলে রাখতেন স্থলে' এর 'রেখে দিতেন' রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : মহানবী ﷺ-এর আংটিতে مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ খোদাই করানো ছিল। আল্লাহর নামের পবিত্রতা ও সম্মানার্থে উহাকে অপবিত্র স্থানে নিয়ে যেতেন না। এটা হতে বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ ও রাসূলের নাম সম্বলিত কোনো বস্তু অথবা পবিত্র কুরআনের অংশ বিশেষ নিয়ে কোনো নাপাক স্থানে প্রবেশ করা অনুচিত এবং কোনো অপবিত্র স্থানে যাতে এরূপ কোনো কিছু লেখা কাগজের টুকরা বা এরূপ কিছু লেখা বস্তু না পড়তে পারে সেদিকে আমাদের বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। এমন কি স্ত্রী সহবাসের সময় তা সাথে রাখা ঠিক নয়।

১. আল্লামা তীবী (র.) বলেন, এর দ্বারা বুঝা যায় যে, পায়খানা প্রস্রাবকালীন সময় শরীর হতে আল্লাহ বা রাসূলের নাম অঙ্কিত কোনো বস্তু অথবা পবিত্র কুরআনের আয়াত থাকলে তা পৃথক করে রাখা ওয়াজিব।
২. ইবনে হাজার (র.) বলেন, এমতাবস্থায় শরীর হতে বিচ্ছিন্ন রাখা মোস্তাহাব। এর বিপরীত করা মাকরূহ। এটিই অধিক গ্রহণযোগ্য অভিমত।

৩১৬ وَعَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَرَادَ الْبَرَازَ اِنْطَلَقَ حَتّٰى لَا يَرَاهُ اَحَدٌ ـ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ

৩১৬. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– নবী করীম ﷺ যখন পায়খানার উদ্দেশ্যে বের হতেন, তখন দূরে চলে যেতেন যাতে কেউ তাঁকে দেখতে না পায়। –[আবূ দাঊদ]

৩১৭ وَعَنْ اَبِيْ مُوْسٰى (رض) قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَاَرَادَ اَنْ يَبُوْلَ فَاَتٰى دَمِثًا فِيْ اَصْلِ جِدَارٍ فَبَالَ ثُمَّ قَالَ اِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يَبُوْلَ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهٖ ـ رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ

৩১৭. অনুবাদ : হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী করীম ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তিনি প্রস্রাব করার ইচ্ছা করলেন, তখন তিনি একটা দেয়ালের পাদদেশে নরম মাটিতে গেলেন এবং প্রস্রাব করলেন। অতঃপর বললেন, যদি তোমাদের মধ্যে কেউ প্রস্রাব করতে ইচ্ছা করে, তবে সে যেন এরূপ স্থান তালাশ করে নেয়। [যাতে প্রস্রাবের ছিটা [ফিরে] গায়ে না আসে]। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حُكْمُ الْبَوْلِ فِىْ اَصْلِ جِدَارِ الْغَيْرِ **অন্যের দেয়ালের গোড়ায় পেশাব করার বিধান :** অন্যের দেয়ালের গোড়ায় পেশাব করাটা উচিত নয়। কেননা, এতে দেয়ালের ক্ষতি হয়। আর মহানবী ﷺ হতে এ ধরনের কাজ প্রকাশ পাওয়া তাঁর উত্তম চরিত্রের পরিপন্থি। এর উত্তরে বলা যায় যে, সম্ভবতঃত তা ছিল বিরান এলাকার ধ্বংসাবশেষ, যেখানে কোনো বসতি ছিল না বা তার কোনো মালিকই ছিল না। অথবা দেয়ালের গোড়ায় অর্থ দেয়ালের নিকটে। আর প্রস্রাব সে পর্যন্ত গড়ায়নি। এতে দেয়ালের ক্ষতি হওয়ার কোনো আশঙ্কা ছিল না।

وَعَنْ ٣١٨ اَنَسٍ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتّٰى يَدْنُوَ مِنَ الْاَرْضِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ

৩১৮. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন প্রস্রাব বা পায়খানার ইচ্ছা করতেন তখন তিনি মাটির নিকটবর্তী না হওয়া পর্যন্ত কাপড় উঠাতেন না।

وَعَنْ ٣١٩ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا اَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهٖ اُعَلِّمُكُمْ اِذَا اَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوْهَا وَاَمَرَ بِثَلَاثَةِ اَحْجَارٍ وَنَهٰى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ وَنَهٰى اَنْ يَّسْتَطِيْبَ الرَّجُلُ بِيَمِيْنِهٖ - رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ

৩১৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— পিতা যেমন পুত্রের জন্য আমিও তোমাদের জন্য তদ্রূপ। আমি তোমাদেরকে সকল বিষয়ে শিক্ষাদান করে থাকি। অতএব যখন তোমরা পায়খানায় গমন করে তখন কেবলাকে সম্মুখে কিংবা পশ্চাতে রাখো না। আর ইস্তিঞ্জার জন্য তিনটি ঢিলা ব্যবহার করতে আদেশ করেছেন এবং গোবর ও হাড় ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। আর কোনো ব্যক্তিকে তার ডান হাত দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করতে নিষেধ করেছেন। −[ইবনে মাজাহ্ ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ ﷺ اَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهٖ**-এর ব্যাখ্যা :** এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, পিতা সদা-সর্বদা সন্তানের সার্বিক কল্যাণ ও মঙ্গল কামনা করেন। সন্তানের সার্বিক সাফল্য, মর্যাদা, সুস্বাস্থ্য ইত্যাদি সব ধরনের উন্নতির জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকেন, এটা সন্তানের প্রতি পিতার অগাধ স্নেহ-মমতা ও ভালোবাসার কারণেই হয়ে থাকে। আল্লাহর রাসূল ﷺ নিজেকে মু'মিনের জন্য পিতার সমতুল্য ঘোষণা দিয়েছেন। পিতা তার সন্তানের প্রতি যতটুকু স্নেহশীল থাকেন। রাসূল ﷺ তার চেয়ে শত শতগুণ বেশি স্নেহপরায়ণ ছিলেন মু'মিনদের উপর। তাই মহানবী ﷺ দয়াপরবশ হয়ে মু'মিনদের জীবন চলার প্রতিটি পদক্ষেপের দিক-নির্দেশনা প্রদান করে গেছেন। মানব জীবনের এমন কোনো দিক নেই, যার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা রাসূল ﷺ দেননি। এটা মু'মিনদের প্রতি তাঁর স্নেহ-মমতারই বহিঃপ্রকাশ। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে যে, اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ অর্থাৎ, নবী হলেন মু'মিনদের নিকট তাদের জীবনের চেয়ে অধিক প্রিয়।

وَعَنْ ٣٢٠ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَتْ يَدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْيُمْنٰى لِطُهُوْرِهٖ وَطَعَامِهٖ وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرٰى لِخَلَائِهٖ وَمَا كَانَ مِنْ اَذًى - رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ

৩২০. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ডান হাত তাঁর পবিত্রতা ও খাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হতো এবং বাম হাত তাঁর পায়খানা-প্রস্রাব ও অন্যান্য নাপাক কাজের জন্য ব্যবহৃত হতো। −[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : উভয় হাতই আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি। আর উভয় হাতের ব্যবহারের ক্ষেত্রও নির্দিষ্ট করা। আর তা শিষ্টাচারেরও অন্তর্গত। কেননা, যে হাতে ময়লা-আবর্জনা স্পর্শ করা হয় তাকে খাদ্যের জন্য ব্যবহার করা স্বভাবত ঘৃণার উদ্রেক ছাড়াও স্বাস্থ্য বিধিমতে ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। কেননা, ময়লার মধ্যে বিভিন্ন রোগের অতি ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম জীবাণু থাকে, যা হাতের চামড়ার মধ্যে লেগে থাকে, খালি চোখে তা দেখা যায় না। সুতরাং খাওয়া-দাওয়ার সময় সে হাত ব্যবহার করলে মারাত্মক রোগের সৃষ্টি করতে পারে। এজন্য নবী করীম ﷺ কোন হাত কোন্ কাজে ব্যবহার করতে হবে তা নিজে আমল করে উম্মতকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন।

وَعَنْهَا ٣٢١ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا ذَهَبَ اَحَدُكُمْ اِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ اَحْجَارٍ يَسْتَطِيْبُ بِهِنَّ فَاِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ . رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

৩২১. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— যখন তোমাদের কেউ পায়খানায় গমন করে তখন সে যেন তিনটি পাথর [ঢিলা] সঙ্গে নিয়ে যায়, যেগুলো দ্বারা সে পবিত্রতা হাসিল করবে। কেননা, এগুলো [ব্যবহারই] তার [পবিত্রতার] জন্য যথেষ্ট হবে। [তার আর পানির দরকার হবে না।] –[আহমদ, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও দারিমী]

وَعَنِ ٣٢٢ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَسْتَنْجُوْا بِالرَّوْثِ وَلَا بِالْعِظَامِ فَاِنَّهَا زَادُ اِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ اِلَّا اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ زَادُ اِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ .

৩২২. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— তোমরা গোবর ও হাড্ডি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করো না। কেননা, তা তোমাদের ভ্রাতৃপ্রতিম জিনদের খাদ্য। –[তিরমিযী ও নাসায়ী]

কিন্তু ইমাম নাসায়ী "তা তোমাদের ভ্রাতৃপ্রতিম জিনদের খাদ্য" কথাটি উল্লেখ করেননি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

"فَاِنَّهَا"-এর যমীরের প্রত্যাবর্তনস্থল : কোনো কোনো বর্ণনায় فَاِنَّهَا-এর স্থলে فَاِنَّهُ রয়েছে তখন عِظَامٌ ও رَوْثٌ উভয়ের দিকে বাহ্যিকভাবে প্রত্যাবর্তিত হবে। আর যদি فَاِنَّهَا হয় তবে عِظَامٌ-এর দিকে ফিরবে, আর رَوْثٌ তার অধীনে পরিগণিত হবে। তবে فَاِنَّهَا টাই অধিক বিশুদ্ধ।

فَاِنَّهَا زَادُ اِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ-এর ব্যাখ্যা : হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, হাড়ের টুকরা এবং গোবর জিনদের খাদ্য, এখন প্রশ্ন হলো গোবর অপবিত্র বস্তু কিভাবে জিনদের খাবার হতে পারে। এর জবাব হলো–

১. মূলত হাড়ই হলো জিনদের খাদ্য ; আর গোবর জিনদের জানোয়ারের খাদ্য।

২. অথবা, গোবর হলো জিনদের খাদ্য উৎপাদনের সারস্বরূপ, তাই একে রূপকভাবে জিনদের খাবার বলা হয়েছে।

وَعَنْ ٣٢٣ رُوَيْفَعِ بْنِ ثَابِتٍ (رض) قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا رُوَيْفَعُ لَعَلَّ الْحَيٰوةَ سَتَطُوْلُ بِكَ بَعْدِيْ فَاَخْبِرِ النَّاسَ اَنَّ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ اَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا اَوِ اسْتَنْجٰى بِرَجِيْعِ دَابَّةٍ اَوْ عَظْمٍ فَاِنَّ مُحَمَّدًا مِنْهُ بَرِئٌ ـ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ

৩২৩. **অনুবাদ :** হযরত রুওয়াইফে' ইবনে ছাবেত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন– হে রুওয়াইফে' ! হয়ত তুমি আমার পরেও দীর্ঘদিন বেঁচে থাকবে, তখন মানুষদেরকে এই সংবাদ প্রদান করবে, যে ব্যক্তি নিজের দাড়িতে জট বাঁধে অথবা [বদ নজরের ভয়ে কুসংস্কার বশত] ঘোড়ার গলায় কবচ বা ধনুকের ছিলা বাঁধে কিংবা পশুর শুকনো গোবর বা হাড্ডি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করে, মুহাম্মদ ﷺ তার থেকে মুক্ত অর্থাৎ তার প্রতি মুহাম্মদ অসন্তুষ্ট। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

سَبَبُ وُرُوْدِ الْحَدِيْثِ **হাদীসের পটভূমিকা :** বর্ণিত আছে যে, জাহিলিয়া যুগের কুসংস্কারের মধ্যে একটি ছিল এই যে, তারা যুদ্ধকালে বীরত্ব দেখানোর জন্য ঔষধ দ্বারা বা কৃত্তিম উপায়ে দাড়িতে জট বাঁধত। আর বদ নজর হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঘোড়ার গলা কবচ বা ধনুকের ছিলা বাঁধত, এ সকল কুসংস্কার দূর করার জন্য নবী করীম ﷺ উক্ত হাদীস বর্ণনা করে দুনিয়াবাসীকে জানিয়ে দেন যে, যে ব্যক্তি এই কুসংস্কারে লিপ্ত হয়, নবী করীম ﷺ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। কাজেই এই সকল কুসংস্কার পরিহার করে চলা উচিত।

مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ **-এর ব্যাখ্যা :** রাসূলুল্লাহ ﷺ দাড়িতে জট পাকাতে নিষেধ করেছেন। তদানীন্তন আরবগণ এরূপ করত। রাসূল ﷺ-এর নিষেধাজ্ঞার কারণসমূহ নিম্নরূপ—

১. অধিকাংশ ওলামার মতে, তদানীন্তন আরবগণ দাড়িতে আঠা জাতীয় ঔষধ লাগিয়ে জট পাকাত। এটা ছিল সুন্নতের পরিপন্থি। তাই রাসূল ﷺ এরূপ করতে নিষেধ করেছেন।
২. কেউ কেউ বলেন, জাহিলিয়া যুগের লোকেরা দাঁড়িতে গিরা লাগিয়ে যুদ্ধের ময়দানে গমন করত। এতে মহিলাদের সাদৃশ্য হত বিধায় রাসূল ﷺ তা করতে নিষেধ করেছেন।
৩. কারো মতে, এটা ভণ্ডদের অভ্যাস ছিল বিধায় নিষেধ করেছেন।
৪. কিছু সংখ্যক বলেন, তদানীন্তন আরববাসীদের মধ্যে যার একজন স্ত্রী ছিল সে দাড়িতে একটি গিরা লাগাত এবং যার দু' জন স্ত্রী ছিল সে দু'টি গিরা লাগাত। এটা অহেতুক কাজ বিধায় রাসূল ﷺ তা করতে নিষেধ করেছেন।

তَقَلَّدَ وَتَرًا**-এর ব্যাখ্যা :** জাহিলিয়া যুগের আরেকটি বদ রেওয়াজ এটাও ছিল যে, তারা 'বদ নজর' হতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ঘোড়ার গলায় ধনুকের ছিলা বেঁধে দিত। যেমন– বর্তমানে আমাদের সমাজে এক শ্রেণীর ওজা-বৈদ্য বদনজর ও অন্যান্য রোগ-ব্যাধি হতে মুক্তির উদ্দেশ্যে এই ধরনের কবচ মানুষ ও পশুর গলায় এমনকি গাছের মধ্যেও বেঁধে দেয়। মূলত এটাও জাহিলিয়া যুগের কুসংস্কার। এসব কুসংস্কার হতে আমাদের যথা সম্ভব বেঁচে থাকা আবশ্যক। নতুবা হযরত রাসূল ﷺ -এর অসন্তুষ্টিতে পতিত হওয়ার ভয় রয়েছে।

وَعَنْ ٣٢٤ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوْتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ اَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ اَحْسَنَ

৩২৪. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— তোমাদের মধ্যে যে কেউ সুরমা লাগায়, সে যেন তিনবার লাগায়। যে এরূপ করল সে ভালো করল। আর না করলে কোনো অসুবিধা নেই। যে ডেলা নেয় সে যেন বেজোড় [তিনটি] নেয় , যে এরূপ করল সে উত্তম কাজ করল।

وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ وَمَنْ اَكَلَ فَمَا تَخَلَّلَ فَلْيَلْفِظْ وَمَا لَاكَ بِلِسَانِهٖ فَلْيَبْتَلِعْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ اَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ وَمَنْ اَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ فَاِنْ لَّمْ يَجِدْ اِلَّا اَنْ يَّجْمَعَ كَثِيْبًا مِنْ رَمْلٍ فَلْيَسْتَدْبِرْهُ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِىْ اٰدَمَ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ اَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ - رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِىُّ

আর না করলে কোনো অসুবিধা নেই। যে খাবার খেল, আর দাঁতের ফাক হতে খিলাল দিয়ে কিছু বের করল সে যেন তা ফেলে দেয়। আর যা জিহ্বার সাহায্যে বের করল তা যেন সে গিলে ফেলে। যে এরূপ করল সে উত্তম কাজ করল। আর না করলে তাতে কেনানো আপত্তি নেই। আর যে ব্যক্তি পায়খানায় গমন করল সে যেন নিজেকে আড়াল করে নেয়। যদি সে আড়াল করার মতো বালুর স্তূপ ছাড়া কিছু না পায় তবে সে স্তূপকে যেন পিছনে রেখে বসে [এবং নিজের কাপড় দ্বারা সম্মুখ দিক আড়াল করে বসে।] কেননা, শয়তান আদম সন্তানের নিতম্ব নিয়ে খেলা করে। যে এরূপ করল সে উত্তম কাজ করল। আর না করলে তাতে তাতে কোনো আপত্তি নেই –[আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ্ ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ -এর অর্থ : চোখে সুরমা ব্যবহার করা একটি উত্তম কাজ। এটা ব্যবহারের ফলে চোখের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় এবং বিভিন্ন রোগ হতে মুক্ত হওয়া যায়। অপরদিকে এটা রাসূলের সুন্নত হওয়ার কারণে ব্যবহার করলে ছওয়াবও হয়। আর এটা পুরুষের জন্য রাতে এবং মেয়েদের জন্য যে কোনো সময় ব্যবহার করা যায়। সুরমা বেজোড় সংখ্যক ব্যবহার করা উত্তম। অবশ্য কিতাবে এর কয়েকটি ব্যবহার-বিধি পাওয়া যায়। যেমন– প্রত্যেক চোখে তিনবার করে অথবা ডান চোখে তিনবার আর বাম চোখে দু'বার মোট পাঁচবার। অবশ্য প্রত্যেক চোখে তিন তিন বার ব্যবহার করা রাসূল ﷺ-এর আমল হতে প্রমাণিত হয়। শামায়েলে তিরমিযীতে রাতের বেলায় রাসূল ﷺ তিন তিন বার করে সুরমা লাগাতেন বলে বর্ণিত হয়েছে।

فَمَا تَخَلَّلَ فَلْيَلْفِظْ -এর ব্যাখ্যা : মহানবী ﷺ-এর প্রত্যেক কাজ এবং সকল আদেশ-নিষেধ ছিল যথার্থ ও বিজ্ঞান সম্মত। খাদ্য ভক্ষণের পর খিলাল করে দাঁত হতে যে খাদ্যের অংশ-বিশেষ বের হয় তা না গিলে রাসূল ﷺ ফেলে দিতে বলেছেন। কেননা তাতে রক্তের সংমিশ্রণ থাকার সম্ভাবনা প্রবল। আর রক্ত মিশ্রিত খাবার খাওয়া ঠিক নয়। এটা স্বাস্থ্যের জন্যও ক্ষতিকর। এছাড়া এটা স্বভাবত ঘৃণাকর বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য রাসূল ﷺ তা ফেলে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। তবে জিহ্বার সাহায্যে মুখের এদিক ওদিক থেকে খাবারের অংশ বের করে আনলে তা গিলে ফেলতে বলেছেন। কেননা, তাতে রক্ত মিশ্রণের সম্ভাবনা থাকে না। যদি রক্তের মিশ্রণ থাকে তবে তা খাওয়াও মাকরূহ।

فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِىْ اٰدَمَ-এর ব্যাখ্যা : শয়তান মানুষের চিরশত্রু। সে মানুষকে অন্যের নিকট হেয় প্রতিপন্ন করে। রাসূলের বাণী– "শয়তান আদম সন্তানের নিতম্ব নিয়ে খেলা করে"-এর অর্থ হলো– শয়তান নানা রকম কৌশলে অন্য মানুষকে ঐ ব্যক্তির লজ্জাস্থান খুলে দেখাতে চেষ্টা করে এবং এ ব্যাপারে সে খুব তৎপর হয়ে উঠে। এখানে 'কোনো ক্ষতি নেই' অর্থ হলো– যদি অন্য কোনো লোক তার লজ্জাস্থান না দেখে তবে কোনো ক্ষতি নেই ; কিন্তু যদি প্রয়োজনবশত সে সতর খোলে আর অন্য কেউ সে দিকে তাকায় তবে যে লোক তাকাবে সে-ই গুনাহগার হবে।

وَعَنْ ٣٢٥ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِىْ مُسْتَحَمِّهٖ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ اَوْ يَتَوَضَّأُ فِيْهِ فَاِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ اِلَّا اَنَّهُمَا لَمْ يَذْكُرَا ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ اَوْ يَتَوَضَّأُ فِيْهِ.

৩২৫. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— তোমাদের কেউ যেন নিজ গোসলখানায় অবশ্যই পেশাব না করে। তারপর তাতে আবার গোসল বা অজু করে। কেননা, অধিকাংশ সন্দেহ বা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তা হতেই সৃষ্টি হয়। –[আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসায়ী] কিন্তু ইমাম তিরমিযী ও নাসায়ী "অতঃপর তাতে গোসল বা অজু করে" কথাগুলো উল্লেখ করেননি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** রাসূল ﷺ গোসলখানায় প্রসাব করতে নিষেধ করেছেন। এর অর্থ হলো, গোসলের জন্য নির্ধারিত স্থানে প্রস্রাব করবে না। কেননা এটা দ্বারা অপবিত্র তথা পেশাবের ছিটা শরীরে পড়ার আশঙ্কা থাকবে এবং তাতে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। তবে গোসলখানার অভ্যন্তরে পেশাব-পায়খানার জন্য নির্দিষ্ট স্থান থাকলে তাতে পেশাব-পায়খানা করতে নিষেধ করা এই হাদীসের উদ্দেশ্য নয় ; বরং হুবহু গোসলের স্থানে প্রস্রাব করে তারপর সেখানে দাঁড়িয়ে গোসল বা অজু করা নিষেধ করাই উদ্দেশ্য। এতে গোসলের পানিতে পেশাব ধুয়ে চলে গেলেও সন্দেহ সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। তাই রাসূল ﷺ গোসলখানায় প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন।

وَعَنْ ٣٢٦ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِىْ جُحْرٍ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ

৩২৬. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সারজাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— তোমাদের কেউ যেন কখনো গর্তের মধ্যে প্রস্রাব না করে। –[আবূ দাঊদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** রাসূলে কারীম ﷺ গর্তের ভিতর পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। কেননা, গর্তে কোনো বিষাক্ত প্রাণী থাকতে পারে, আর উত্তপ্ত প্রস্রাব তাকে বিরক্ত করতে পারে। ফলে সে প্রাণী বা কীট তাকে অতর্কিত দংশন করতে পারে কিংবা বিষাক্ত গ্যাস-বাষ্প নিক্ষেপ করতে পারে। অথবা এতে সেসব গর্তের নিরীহ প্রাণীদের কষ্ট হতে পারে। তাই রাসূল ﷺ গর্তে প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন।

وَعَنْ ٣٢٧ مُعَاذٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَةَ اَلْبَرَازَ فِى الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيْقِ وَالظِّلِّ. رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

৩২৭. অনুবাদ : হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— তোমরা তিনটি অভিসম্পাতের ক্ষেত্র হতে বেঁচে থাকবে, [আর তা হলো—] পানির ঘাটে, চলাচলের রাস্তার উপরে এবং গাছের ছায়ায় প্রস্রাব পায়খানা করা। –[আবূ দাঊদ ও ইবনে মাজাহ্]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** মানুষের জন্য ক্ষতিকর এবং কষ্টদায়ক সব কাজই ইসলাম ধর্মের দৃষ্টিতে হারাম এবং গর্হিত কাজ। হাদীসে উল্লিখিত তিনটি স্থান অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এতে মানুষ দৈনন্দিন জীবনের কর্যাবলি সম্পাদন করে। তাই এ সব স্থানে প্রস্রাব-পায়খানা করলে মানুষ কষ্ট পেয়ে তার উপর অভিসম্পাত করবে। এ জন্য রাসূলে কারীম ﷺ এসব স্থানে পায়খানা করে মানুষকে কষ্ট দিতে নিষেধ করেছেন।

وَعَنْ ٣٢٨ أَبِىْ سَعِيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَخْرُجُ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ فَاِنَّ اللّٰهَ يَمْقُتُ عَلٰى ذٰلِكَ . رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْدَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

৩২৮. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন— দু'জন ব্যক্তি যেন একত্রে নিজেদের লজ্জাস্থান উন্মুক্ত করে একে অপরের সাথে কথা বলতে বলতে পায়খানা না করে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা এই ধরনের কর্মে রাগন্বিত হন। –[আহমদ, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ্]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : পায়খানা-প্রস্রাবের সময় কথাবার্তা বলা কিংবা কিছু খাওয়া-দাওয়া করা অসভ্যতার পরিচায়ক। আর خَلَاء শব্দের অর্থই হলো– নিঃসঙ্গ, একাকী হওয়া। জাহিলিয়া যুগে একে কোনো দোষ তো মনে করা হতোই না; বরং নারী-পুরুষও একত্রে পায়খানা করত এবং পরস্পর কথাবার্তাও বলত। উত্তম আদর্শের মূর্ত প্রতীক হযরত মুহাম্মদ ﷺ এ অভ্যাস পরিহার করার জন্য মুসলমানদেরকে উপদেশ দিয়েছেন। কেননা, এর দ্বারা লজ্জাহীনতা হয়। আর লজ্জহীনতা অত্যধিক বেহায়পনা, ফলে এতে আল্লাহর ক্রোধের সৃষ্টি হয়।

يَضْرِبَانِ-এর অর্থ : আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত يَضْرِبَانِ-এর অর্থ হলো يَفْعَلَانِ মূলত এর অর্থ يَمْشِيَانِ কিন্তু এখানে سَبَبْ (সবব] বলে مُسَبَّبْ [মুসাব্বাব] উদ্দেশ্য হয়েছে। অর্থাৎ পায়খানায় হেঁটে যায়– এর অর্থ নেওয়া হয়েছে, পায়খানা করে।" যেমন বলা হয়– ضَرَبْتُ الْاَرْضَ অর্থাৎ اَتَيْتُ الْخَلَاءَ আল্লামা আবহারী বলেন اَلضَّرْبُ فِى الْاَرْضِ-এর অর্থ হলো– اَلذَّهَابُ فِيْهَا অর্থাৎ, জমিনে গমনাগমন করা। 'মুখতাসারুন নিহায়া' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটাতে যাওয়া হয় সে অবস্থাকে বুঝার জন্য يضرب الغائط বলা হয়।

وَعَنْ ٣٢٩ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ هٰذِهِ الْحُشُوْشَ مُحْتَضَرَةٌ فَاِذَا اَتٰى اَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

৩২৯. অনুবাদ : হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— এই পায়খানার জায়গাসমূহ জিনদের উপস্থিতির স্থান। সুতরাং তোমাদের কেউ পায়খানায় গমন করলে সে বলবে اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ — হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট নারী জিন ও শয়তানের প্রভাব হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। –[আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ্]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : শয়তান ও দুষ্টনারী জিনসমূহ অপবিত্র ও ময়লাযুক্ত স্থানেই বেশি থাকে। মলমূত্র ত্যাগের সময় তারা মানুষের লজ্জাস্থান নিয়ে খেলা করে এবং সুযোগ বুঝে ক্ষতি সাধন করে। তাই রাসূল ﷺ পায়খানা -প্রস্রাবখানায় গমন করার সময় উক্ত দোয়া পড়তে নির্দেশ প্রদান করেছেন।

وَعَنْ ٣٣٠ عَلِيٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَتْرُ مَا بَيْنَ اَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِىْ اٰدَمَ اِذَا دَخَلَ اَحَدُهُمُ الْخَلَاءَ اَنْ يَقُوْلَ بِسْمِ اللّٰهِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَاِسْنَادُهٗ لَيْسَ بِقَوِيٍّ

৩৩০. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— যখন তোমাদের কেউ পায়খানায় গমন করে, তখন জিনদের চক্ষু এবং আদম সন্তানের লজ্জাস্থানের মধ্যকার অন্তরাল হলো [মনে মনে] 'বিসমিল্লাহ' বলা । –[ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন হাদীসটি গারীব এবং এর বর্ণনা সূত্র সবল নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** পূর্বোল্লেখিত হাদীসে দোয়া পড়তে বলা হয়েছে ; আর এ হাদীসে বিসমিল্লাহ কে অন্তরাল বলা হয়েছে। উভয়ের মধ্যে সমন্বয় হতে পারে এভাবে যে, উক্ত দোয়া পড়ার পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়ে নিবে।

وَعَنْ ٣٣١ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ غُفْرَانَكَ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِىُّ

৩৩১. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন পায়খানা হতে বের হতেন তখন বলতেন "غُفْرَانَكَ" হে আল্লাহ তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করছি। –[তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্ ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَجْهُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ "غُفْرَانَكَ" بَعْدَ الْخُرُوْجِ مِنَ الْخَلَاءِ **পায়খানা হতে বের হওয়ার পর غُفْرَانَكَ বলার কারণ :** পায়খানা করা তো কোনো গুনাহের কাজ নয়, তবু غُفْرَانَكَ বলার কারণ কি? হাদীস বিশারদগণ এর কয়েকটি উত্তর প্রদান করেছেন—

১. আল্লামা তূরপুশতী (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা আল্লাহর জিকিরে মাশগুল থাকতেন, কিন্তু প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটানোর সময় জিহবা জিকির হতে বিরত থাকত বিধায় রাসূল ﷺ غُفْرَانَكَ বলে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।
২. আনওয়ারুল উসূল গ্রন্থে আছে যে, আল্লাহ তা'আলা অতি আদরের সাথে হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করে ফেরেশতাদের দ্বারা সিজদা করিয়ে অতি সম্মানের সাথে বেহেশতে থাকতে দেন, কিন্তু শয়তানের কুমন্ত্রণায় নিষিদ্ধ ফল খেয়ে বেহেশত হতে বিতাড়িত হন এবং প্রস্রাব-পায়খানার প্রয়োজন দেখা দেয়। হযরত আদম (আ.)-এর এই অবস্থা স্মরণ করে রাসূল ﷺ غُفْرَانَكَ বলে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।
৩. 'শরহুল মাসাবীহ' গ্রন্থে রয়েছে যে, মানুষ খাদ্য ভক্ষণ করার পর অতি সহজে আল্লাহ তা হজম করে দেন, তাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে পায়খানা করার শেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ اِسْتِغْفَارْ করতেন।
৪. হযরত আনওয়ার শাহ (র.) সিবওয়াই হতে বর্ণনা করেন যে, غُفْرَانَكَ -এর অর্থ হলো لَا كُفْرَانَكَ অর্থাৎ, কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে غُفْرَانَكَ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এখানেও রাসূল ﷺ উক্ত বাক্য দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।
৫. হাফেয ইবনে কাইয়েম (র.) বলেন, পায়খানা-প্রস্রাব পেটে জমা হলে মানুষের শরীরে যেমন ভারীত্ব ও অশ্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করে, তেমনি গুনাহের কারণে মানুষের হৃদয়েও এক ধরনের ভারিত্বের সৃষ্টি হয়। অতএব পায়খানা-প্রস্রাব করার পর শরীরের ভারিত্ব যেমন দূরীভূত হয়, তদ্রূপ রাসূল ﷺ হৃদয়ের ভারিত্ব দূরীভূত করার জন্য তার শেষে ইসতিগফার করতেন।
৬. অথবা, বলা যেতে পারে যে, পায়খানা-প্রস্রাব যেহেতু নাফরমানির ফলশ্রুতি, অর্থাৎ আদমের নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের কারণে যেহেতু এর সূচনা, সেহেতু রাসূল ﷺ সেদিকে লক্ষ্য করে পায়খানা-প্রস্রাবের শেষে ইসতিগফার করতেন।

وَعَنْ ٣٣٢ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ إِذَا أَتَى الْخَلَاءَ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِىْ تَوْرٍ أَوْ رَكْوَةٍ فَاسْتَنْجٰى ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِإِنَاءٍ اٰخَرَ فَتَوَضَّأَ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَ رَوَى الدَّارِمِىُّ وَالنَّسَائِىُّ مَعْنَاهُ

৩৩২. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন পায়খানায় যেতেন, তখন আমি তার জন্য পাথরের বাটিতে করে অথবা কখনো চামড়ার ছোট পাত্রে করে তাঁর জন্য পানি নিয়ে যেতাম। তিনি [তা দ্বারা] শৌচকার্য করতেন। অতঃপর তিনি তাঁর হাত মাটির উপর ঘষতেন। এরপর আমি আরেক বাটি পানি আনতাম, তিনি তা দ্বারা অজু করতেন। –[আবূ দাউদ, দারেমী ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূল ﷺ কেবল ঢিলা দ্বারা পবিত্রতা অর্জনে যথেষ্ট মনে করতেন না; বরং ঢিলার পর পানিও ব্যবহার করতেন। পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করার পর মানবতার মহান শিক্ষক হযরত রাসূল ﷺ হাতকে মাটিতে ঘষে দুর্গন্ধ ও জীবাণু মুক্ত করতেন। কেননা, পানি দ্বারা শৌচকার্য করার পরও অসংখ্য সূক্ষ্ম জীবাণু হাতের মধ্যে লেগে থাকে, এগুলো পরে শরীরের ভিতর প্রবেশ করে ক্ষতিকর রোগের সৃষ্টি করে। শুধু পানি দ্বারা ধৌত করে ছেড়ে দিলে জীবানু পুরোপুরি বিদূষিত হয় না। মাটিতে এমন প্রতিষেধক শক্তি রয়েছে যার স্পর্শে সে জীবাণুগুলো নষ্ট হয়ে যায়। ফলে তা আর রোগ জীবাণু ছড়াতে সক্ষম হয় না। তাই আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত পানি দ্বারা শৌচকার্য করার পর মাটি দ্বারা হাতকে ঘষে ধৌত করা।

وَعَنْ ٣٣٣ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ (رضـ) قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ إِذَا بَالَ تَوَضَّأَ وَنَضَحَ فَرْجَهُ - رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ

৩৩৩. অনুবাদ : হযরত হাকাম ইবনে সুফইয়ান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন পেশাব করতেন তখন অজু করতেন এবং পুরুষাঙ্গের উপর পানি ছিটাতেন।–[আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** نَضْحٌ শব্দটির অর্থ হল– পানি ছিটানো, এটি দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে—

১. رَشُّ الْمَاءِ পানি ছিটানো তথা প্রস্রাবের পর সন্দেহ হতে বাঁচার জন্য লুঙ্গি অথবা পায়জামার উপর পানি ছিটানো।

২. ইমাম খাত্তাবীর মতে, اَلنَّضْحُ -এর অর্থ হল اَلْغَسْلُ بِالْمَاءِ পানি দ্বারা ধৌত করা।

পানি ছিটানোর কারণ : আল্লামা ইবনুল মালিক (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রস্রাব করার শেষে পুরুষঙ্গের উপর যে পানি ছিটাতেন এর পেছনে দু'টি কারণ থাকতে পারে—

১. প্রথমত পেশাবের শেষে পুরুষঙ্গে পানি ছিটালে তা সংকোচিত হয়ে যায় এবং প্রস্রাবের ফোটা থাকলে তা বের হয়ে যায়। পরে প্রস্রাবের ফোটা বের হয়ে অপবিত্র হবার সম্ভাবনা থাকে না।

২. দ্বিতীয়ত কারণ ছিল, শরীর বা কাপড়ে প্রস্রাবের ফোটা লেগে যাবার সংশয় ও সন্দেহ হতে পরিত্রাণের লক্ষ্যে রাসূল ﷺ পানি ছিটাতেন।

وَعَنْ ٣٣٤ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَدَحٌ عَنْ عِيْدَانٍ تَحْتَ سَرِيْرِهٖ يَبُوْلُ فِيْهِ بِاللَّيْلِ - رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

৩৩৪. অনুবাদ : হযরত উমাইমা বিনতে রুকাইকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর খাটের নিচে একটি কাঠের গামলা ছিল, যাতে তিনি [প্রয়োজনবশত] রাতে পেশাব করতেন। –[আবূ দাঊদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْحَدِيْثَيْنِ হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব : নবী করীম ﷺ রাতের বেলায় ঘরের ভিতরে কাঠের গামলায় পেশাব করার কারণ কি ? অথচ অপর হাদীসে এসেছে যে, لَا يَنْقَعُ بَوْلٌ فِىْ طَسْتٍ فِى الْبَيْتِ فَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ بَوْلٌ مُنْتَقَعٌ অর্থাৎ, যে ঘরে কোনো পাত্রে প্রস্রাব রক্ষিত থাকে সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। এর জবাব নিম্নরূপ—

১. রাতের বেলায় মহানবী ﷺ-এর বাইরে বের হতে কষ্ট হতো বিধায় রাতে বের না হয়ে উক্ত পাত্রে পেশাব করতেন।

২. অথবা, তিনি অসুস্থতাজনিত কারণে রাতের বেলায় তাতে পেশাব করতেন।

৩. কিংবা সাবধানতার স্বার্থে প্রস্রাবের প্রয়োজন দেখা দিলে উক্ত পাত্রে প্রস্রাব করতেন।

৪. অথবা, দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ঘরের ভিতর প্রস্রাব রাখলে তাতে দুর্গন্ধ হয়ে যায়, সে অবস্থায় ঘরের ভিতর ফেরেশতা প্রবেশ করে না। রাসূল ﷺ এরূপ করতেন না। কাজেই উভয়ের মধ্যে আর কোনো দ্বন্দ্ব নেই।

عِيْدَانٌ শব্দের বিশ্লেষণ : আল্লামা মীরাক বলেন, মাসাবীহ এবং মিশকাত গ্রন্থে عِيْدَانٌ শব্দটির عَيْن হরফটি যের যোগে পঠিত হয়। তখন শব্দটি হবে عَوْدٌ-এর বহুবচন, অর্থ– কাঠ। আল্লামা তীবী (র.) বলেন, বিশেষজ্ঞদের অভিমত হলো عِيْدَان-এর عَيْن হরফে যবর হওয়াই অধিক সঠিক। শায়খ মাজদুদ্দীন ফিরোযাবাদী 'কামূস' গ্রন্থে লিখেন اَلْعَيْدَانُ-এর عَيْن হরফটি যবর বিশিষ্ট হয়। অর্থ হলো– طِوَالُ النَّخْلِ অর্থাৎ, খেজুর গাছের লম্বা কাঠ বা তার চোংগা। তার একবচন হলো عِيْدَانَةٌ 'তাকরীরুল মাসাবীহ' প্রণেতাও একে সঠিক বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

وَعَنْ ٣٣٥ عُمَرَ (رضـ) قَالَ رَاٰنِى النَّبِيُّ ﷺ وَاَنَا اَبُوْلُ قَائِمًا فَقَالَ يَا عُمَرُ لَاتَبُلْ قَائِمًا فَمَا بُلْتُ قَائِمًا بَعْدُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ قَالَ الشَّيْخُ الْاِمَامُ مُحْيِى السُّنَّةِ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَدْ صَحَّ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ اَتَى النَّبِيُّ ﷺ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ - قِيْلَ كَانَ ذٰلِكَ لِعُذْرٍ -

৩৩৫. অনুবাদ : হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা আমাকে দেখলেন যে, আমি [জাহিলিয়া যুগের অভ্যাস মতো] দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করছিলাম। তখন রাসূল ﷺ বললেন, হে ওমর! দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করো না। অতঃপর আমি আর কখনো দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করিনি। [তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

শায়খ ইমাম মহীউস সুন্নাহ বাগাবী (র.) বলেন, সহী সনদে অন্যত্র হযরত হুযাইফা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, একদা নবী করীম ﷺ কোনো এক গোত্রের ময়লা ফেলার স্থানে গমন করলেন এবং সেখানে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করলেন– [বুখারী ও মুসলিম]

[উপরিউক্ত দুই বর্ণনার বিরোধ নিরসনের জন্য] বলা হয় যে, নবী করীম ﷺ কোনো ওজরের কারণেই দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করছিলেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ فِى الْبَوْلِ قَائِمًا দাঁড়িয়ে পেশাব করার ব্যাপারে ইমামগণের মতামত : দাঁড়িয়ে পেশাব করার ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়, যা নিম্নরূপ—

হযররত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব, উরওয়া ও ইমাম আহমদ (র.) বলেন, দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা সাধারণত জায়েজ। ইমাম মালিক (র.) বলেন, কোনো ওজরের দরুন দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করলে কোনো দোষ হয় না। বিনা ওজরে মাকরূহ। হানাফী ইমামগণ এবং অধিকাংশ উলামার মতে শরয়ী কোনো ওজর ব্যতীত দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা মাক্‌রূহে 'তানযীহ' ; 'তাহরীমী' নয়। যাঁরা জায়েজ বলেন, হযরত হুযাইফার হাদীস তাঁদের দলিল। আর যাঁরা নিষেধ করেন তাঁরা হযরত ওমর (রা.) ও পরবর্তী হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসকে দলিল হিসেবে পেশ করেন। তারা হযরত হুযাইফার হাদীসের নিম্নোক্ত জবাব দেন—

১. সম্ভবত নবী কারীম ﷺ কোনো শরিয়তগ্রাহ্য অসুবিধার কারণে দাঁড়িয়ে পেশাব করেছিলেন। যেমন– নিচে ময়লা ছিল, বসে পেশাব করলে কাপড় অপবিত্র হওয়ার আশঙ্কা ছিল।
২. সম্ভবত স্থান এত সংকীর্ণ ছিল যে, বসে পেশাব করা সম্ভবপর ছিল না।
৩. অথবা, বাতাসের ঝাপটায় কাপড়ে প্রস্রাবের ছিঁটা পড়ার সম্ভাবনা ছিল।
৪. অথবা, 'সম্মুখের স্থান উঁচু ছিল, বসলে প্রস্রাব গায়ে আসার বেশি সম্ভাবনা ছিল।
৫. অথবা, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাটুতে এমন কোনো অসুবিধা ছিল, যার কারণে তিনি বসতে অসমর্থ ছিলেন।
৬. অথবা, আরবদের চিরাচরিত প্রথা অনুসারে রাসূলুল্লাহ ﷺ কোমরের বেদনার কারণে দাঁড়িয়ে পেশাব করেছিলেন এবং এ প্রক্রিয়ায় বেদনার উপশম কামনা করেছিলেন।
৭. অথবা, এটাও হতে পারে যে, দাঁড়িয়ে পেশাব করা মাকরূহ হলেও জায়েজ– এ কথা প্রকাশ করার জন্য, একবার দাঁড়িয়ে পেশাব করেছিলেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣٣٦ - عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكُمْ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَبُوْلُ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوْهُ مَا كَانَ يَبُوْلُ اِلَّا قَاعِدًا . رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ .

৩৩৬. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের নিকট যে বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে পেশাব করতেন, তোমরা তার কথা বিশ্বাস করো না। তিনি সর্বদা বসেই প্রস্রাব করতেন।

–[আহমদ, তিরমিযী ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْحَدِيْثَيْنِ দু'টি হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব : হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূল ﷺ কখনো দাঁড়িয়ে পেশাব করেননি। আর হযরত হুযায়ফার হাদীসে এসেছে যে, রাসূল ﷺ দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন, উভয়ের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয় তার সমাধান নিম্নরূপ—

১. হযরত আয়েশার হাদীসে مَا كَانَ يَبُوْلُ اِلَّا قَاعِدًا বাক্যে اِسْتِمْرَارْ অর্থাৎ সদা-সর্বদার অভ্যাসের কথা বলা হয়েছে। মোটকথা, হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন— হুযূরের সাধারণ অভ্যাস ছিল বসেই প্রস্রাব করা। সুতরাং যদি কোনো ওজর অুসবিধার দরুণ কদাচিৎ দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেন, তবে তা তাঁর সাধারণ অভ্যাসের ব্যতিক্রম। কাজেই তিনি সাধারণ অভ্যাসের বিপরীতকে দৃঢ়তার সাথে অস্বীকার করেছেন।
২. হযরত আয়েশা (রা.) নিজের চাক্ষুস বাড়ি-ঘরে দেখা হুজূরের অভ্যাসের কথা বলেছেন, কিন্তু বাইরে তিনি কি করেছেন, আয়েশা (রা.) হয়তো সে অবগত ছিলেন না, তাই তিনি তা অস্বীকার করেছেন। আর হযরত হুযাইফা (রা.) বাহিরের দেখা বর্ণনা করেছেন।
৩. অথবা, প্রয়োজন বোধে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা যে জায়েজ আছে, তা তিনি উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য করেছিলেন, হযরত আয়েশা (রা.) এই বিষয়ে অবগত ছিলেন না।

وَعَنْ ٣٣٧ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ جِبْرَئِيْلَ اَتَاهُ فِيْ اَوَّلِ مَا اُوْحِيَ اِلَيْهِ فَعَلَّمَهُ الْوُضُوْءَ وَالصَّلٰوةَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْوُضُوْءِ اَخَذَ غُرْفَةً مِّنَ الْمَاءِ فَنَضَحَ بِهَا فَرْجَهُ . رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالدَّارُ قُطْنِيْ

৩৩৭. অনুবাদ : হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, হযরত জিব্রাঈল (আ.) সর্বপ্রথম যখন প্রত্যাদেশ নিয়ে তার নিকট আগমন করেন তখন [একদিন] হযরত জিব্রাঈল (আ.) তাকে অজু করা এবং নামাজ পড়া শিক্ষা দিলেন। অতঃপর যখন রাসূল ﷺ অজু করা শেষ করলেন তখন তিনি এক কোষ পানি নিয়ে তা লজ্জাস্থানে ছিটিয়ে দিলেন। –[আহমদ ও দারে কুতনী]

وَعَنْ ٣٣٨ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَاءَنِيْ جِبْرَئِيْلُ فَقَالَ يَامُحَمَّدُ اِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَضِحْ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَعْنِي الْبُخَارِيَّ يَقُوْلُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْهَاشِمِيُّ الرَّاوِيْ مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ .

৩৩৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— একদা হযরত জিব্রাঈল (আ.) আমার নিকট আগমন করলেন এবং বললেন, হে মুহাম্মদ! আপনি যখন অজু করেন তখন কিছু পানি [লজ্জাস্থান বরাবর কাপড়ের] উপরে ছিটিয়ে দিন। –ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এই হাদীসটি গারীব। আমি মুহাম্মদ অর্থাৎ ইমাম বুখারীকে বলতে শুনেছি যে, হাসান ইবনে আলী হাশেমী নামক বর্ণনাকারী হাদীসের ক্ষেত্রে মুনকার।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : হাদীসে উল্লিখিত লজ্জাস্থানে পানি ছিটিয়ে দেওয়ার অর্থ হলো, লজ্জাস্থানের উপরে পরিধেয় বস্ত্রে পানি ছিটিয়ে দাও। আর এটি এই জন্য যেন এই ধারণা না হয় যে, কাপড়ে দৃষ্ট ফোটা পেশাবের ফোটা, বরং তা যে অজুর পানির ছিটানো ফোটা সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহে থাকা যায়, অথবা হাদীসের মধ্যে পানি ছিটানোর আদেশ অজুর পরে নয়; বরং অজুর পূর্বে।

مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ -এর সংজ্ঞা ও হুকুম :

مَعْنَى الْمُنْكَرِ لُغَةً : مُنْكَرٌ শব্দটি বাবে اِفْعَالٌ থেকে اِسْمِ مَفْعُوْلٌ-এর সীগাহ, একবচন। মাসদার হচ্ছে اِنْكَارٌ মূলবর্ণ (ن ـ ك ـ ر) জিনসে صَحِيْح আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– ১. অপরিচিত, ২. অসৎ কাজ। এ অর্থে কুরআন শরীফে এসেছে– تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ৩. অস্বীকৃত।

مَعْنَى الْمُنْكَرِ اِصْطِلَاحًا :

১. উসূলে হাদীসের পরিভাষায়– هُوَ الْحَدِيْثُ الَّذِيْ رَوَاهُ الضَّعِيْفُ مُخَالِفًا لِمَا رَوَاهُ الثِّقَةُ অর্থাৎ, কোনো দুর্বল বর্ণনাকারী যদি নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বিপরীত হাদীস বর্ণনা করেন, তবে তার বর্ণিত হাদীসকে হাদীসে مُنْكَرٌ এবং সেই দুর্বল বর্ণনাকারীকে مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ বলা হয়।

২. মুফ্তী আমীমুল ইহ্সান (র.) বলেন–

اِنْ كَانَ مَعَ ضُعْفِهِ مُخَالِفًا لِمَا رَوَى الْمَقْبُوْلُ اَوْ كَانَ غَافِلًا اَوْ نَاسِيًا كَثِيْرَ الْوَهْمِ فَالْحَدِيْثُ مُنْكَرٌ .

৩. হাফেজ ইবনে কাছীর (র.) বলেন– اِنْ خَالَفَ رِوَايَةَ الثِّقَاتِ فَمُنْكَرٌ

৪. ডঃ আদীব সালেহ বলেন– هُوَ الْحَدِيْثُ الَّذِيْ تَفَرَّدَ بِرِوَايَتِهِ ضَعِيْفٌ خَالَفَ فِيْهِ الثِّقَاتَ

حُكْمُهُ : এরূপ হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়; অবশ্য বর্ণনাকনারীর দুর্বলতা প্রকট না হলে এবং হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হলে ফাযায়েলের ক্ষেত্রে তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

وَعَنْ ٣٣٩ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ بَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ عُمَرُ خَلْفَهُ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فَقَالَ مَا هٰذَا يَا عُمَرُ فَقَالَ مَاءٌ تَتَوَضَّأُ بِهِ قَالَ مَا أُمِرْتُ كُلَّمَا بُلْتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ وَلَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتْ سُنَّةً . رَوَاهُ أَبُوْدَاوُد وَابْنُ مَاجَةَ

৩৩৯. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রস্রাব করলেন, আর হযরত উমর (রা.) তার পিছনে পানির একটি পাত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন–হে ওমর! এটা কি? তিনি বললেন, এটা আপনার অজু করার পানি। তখন রাসূল ﷺ বললেন– আমি এই জন্য আদশেপ্রাপ্ত হইনি যে, যখন প্রস্রাব করব তখনই অজু করব। যদি আমি তা করি তবে তা সুন্নতে পরিণত হয়ে যাবে।–[আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ্]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لو فعلت لكانت سنة -এর ব্যাখ্যা : একদা রাসূলে করীম ﷺ-এর ইস্তিঞ্জার সময় হযরত ওমর (রা.) অজুর পানি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু রাসূল ﷺ তখন অজু না করে বললেন, আমি যদি এরূপ করি তবে তা সুন্নতে পরিণত হয়ে যাবে। কেননা, রাসূলের নিয়মিত কাজগুলো সুন্নতে দায়েমী হিসেবে পরিণত। রাসূল ﷺ এমন কোনো কাজ করেননি, যা তার উম্মতের জন্য কষ্টকর হয়ে পড়ে। তাই তিনি প্রতিবার হদছের পর অজু করতেন না। তবে প্রতিবার হদছের পর অজু করা মোস্তাহাব।

وَعَنْ ٣٤٠ أَبِىْ أَيُّوْبَ وَجَابِرٍ وَأَنَسٍ (رض) أَنَّ هٰذِهِ الْأٰيَةَ لَمَّا نَزَلَتْ فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ أَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ إِنَّ اللّٰهَ قَدْ أَثْنٰى عَلَيْكُمْ فِى الطُّهُوْرِ فَمَا طُهُوْرُكُمْ قَالُوْا نَتَوَضَّأُ لِلصَّلٰوةِ وَنَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَنَسْتَنْجِىْ بِالْمَاءِ قَالَ فَهُوَ ذَاكَ فَعَلَيْكُمُوْهُ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

৩৪০. **অনুবাদ :** হযরত আবূ আইয়ুব (রা.), জাবির ও আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, [কুবাবাসীদের সম্পর্কে] যখন এই আয়াত নাজিল হয় যে, فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ أَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ অর্থাৎ, তথায় [কুবা মসজিদে] এরূপ লোকেরা রয়েছে যারা পবিত্রতা পছন্দ করেন। আর আল্লাহ তা'আলা পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালোবাসেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আনসার দল, এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পবিত্রতার প্রশংসা করেছেন। তোমাদের সেই পবিত্রতা কি? তাঁরা বললেন– আমরা নামাজের জন্য অজু করি। নাপাকী হতে পাক হওয়ার জন্য গোসল করি এবং ইস্তিঞ্জায় পানি দ্বারা শৌচকার্য করি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন– এ জন্যই তো প্রশংসিত হয়েছ। তোমরা এর উপর সর্বদা স্থির থাকবে। –[ইবনে মাজাহ্]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حُكْمُ الْإِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ পানি দ্বারা শৌচকার্য করার হুকুম : ইমাম খাত্তাবী (র.) বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব (র.) বলেন, পানি দ্বারা শৌচকার্য করা নিষিদ্ধ। কেননা, তা হলো পানীয় দ্রব্য, তাকে নাপাকীর সাথে মিশ্রণ না করাই উচিত।

مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ : চার ইমাম ও পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল প্রসিদ্ধ ইমামের মতে পায়খানা-প্রস্রাব হতে পবিত্রতা অর্জনের

জন্য পানি এবং ডেলার সমন্বয়ে ইস্তিঞ্জা করাই উত্তম। আর্থাৎ প্রথমে ডেলা এবং তারপর পানি ব্যহার করতে হবে। কেউ যদি তার একটি ব্যবহার করতে চায় তবে তাঁর জন্য পানি ব্যবহার করাই উত্তম। কেননা, পানি দ্বারা মূল নাপাকী এবং তার চিহ্ন পর্যন্ত দূরীভূত হয়ে যায়। কিন্তু ঢিলা দ্বারা মূল নাপাকী বিদূরিত হলেও তার চিহ্ন মুছে যায় না। পানি দ্বারা যে শৌচকার্য করা উত্তম এর সপক্ষে ইমাম তাহাবী (র.) কিছু দলিল উপস্থাপন করেছেন–

١. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ .

٢ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّهٗ دَخَلَ الْخَلَاءَ فَوَضَعْتُ لَهٗ وَضُوْءً الخ

٣ . اِنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَضٰى حَاجَتَهٗ فَاَتَاهُ جَرِيْرٌ بِاِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ فَاسْتَنْجٰى بِهٖ . رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِىْ صَحِيْحِهٖ .

٤ . عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ مُرْنَ اَزْوَاجُكُنَّ اَنْ يَغْتَسِلُوْا اَثَرَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ . (اَلتِّرْمِذِىُّ)

٥ . رَوَى ابْنُ حَبَّانٍ (رضـ) مَارَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ قَطُّ اِلَّا مَسَّ مَاءً .

وَعَنْ ٣٤١ سَلْمَانَ (رضـ) قَالَ قَالَ بَعْضُ الْمُشْرِكِيْنَ وَهُوَ يَسْتَهْزِئُ اِنِّىْ لَاَرٰى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ حَتَّى الْخِرَاءَةَ قُلْتُ اَجَلْ اَمَرَنَا اَنْ لَا نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَلَا نَسْتَنْجِىَ بِاَيْمَانِنَا وَلَا نَكْتَفِىَ بِدُوْنِ ثَلٰثَةِ اَحْجَارٍ لَيْسَ فِيْهَا رَجِيْعٌ وَلَا عَظْمٌ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَاَحْمَدُ وَاللَّفْظُ لَهٗ

৩৪১. অনুবাদ : হযরত সালমান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মুশরিকদের এক ব্যক্তি আমাকে বিদ্রূপ করে বলল যে, তোমাদের বন্ধু [অর্থাৎ, নবী করীম ﷺ] তোমাদেরকে সব কিছু শিক্ষা দিচ্ছেন, এমনকি পায়খানায় বসার নিয়ম-কানুন পর্যন্ত, আমি বললাম– হ্যাঁ! অবশ্যই তিনি আমাদেরকে আদেশ করেছেন, আমরা যেন [পায়খানায়] কিবলার দিকে মুখ করে না বসি। ডান হাতে ইস্তিঞ্জা না করি এবং ইস্তিঞ্জার সময় তিনটি ঢেলার কম ব্যবহার না করি, আর তাতে যেন শুকনা গোবর ও হাড্ডি না থাকে। –[মুসলিম ও আহমদ; তবে হাদীসের উল্লিখিত ভাষা ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : মুশরিক লোকটি যে কাজটিকে বিদ্রূপের উপলক্ষরূপে চিহ্নিত করেছে, হযরত সালমান (রা.) সে কাজটিকে মহৎরূপে তুলে ধরেছেন। তিনি তার ঠাট্টার জবাবে বুঝাতে চেয়েছেন যে, মহানবী ﷺ আমাদেরকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ শিক্ষা দিতে আবির্ভূত হয়েছেন, তাই তিনি আমাদের জীবনের প্রতিটি অধ্যায়েরই শিক্ষাদেন। এমনকি পেশাব-পায়খানা করার নিয়ম পদ্ধতিও শিক্ষাদেন। যাকে তোমরা তুচ্ছ মনে কর। এর উপর নির্ভর করে মানুষের পাক-পবিত্রতা যা ইবাদত কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত।

اَلْخَرَاءَةُ-এর অর্থ : اَلْخَرَاءَةُ শব্দটির উচ্চারণে কেউ কেউ বলেন– خ এবং ر উভয়টির উপরে যবর এবং পরে আলিফ মাক্‌সূরা। আবার কেউ বলেন, মদ্দ সংযুক্ত। আবার কেউ বলেন মদ্দসহ خ-এর নিচে জের। আল্লামা নববী বলেন এর خ -এর উপর যবর এবং ر এর উপর জযম। অর্থ– পায়খানায় বসার পদ্ধতি। তবে ة কে বাদ দিলে এবং خ -এর নিচে জের বা উপরে যবর দিলে اَلْخَرَاءُ অর্থ মল বা পায়খানা।

وَعَنْ ٣٤٢ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَسَنَةَ (رض) قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَفِىْ يَدِهِ الدَّرَقَةُ فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَلَسَ فَبَالَ اِلَيْهَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ اُنْظُرُوْا اِلَيْهِ يَبُوْلُ كَمَا تَبُوْلُ الْمَرْأَةُ فَسَمِعَهُ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ وَيْحَكَ اَمَا عَلِمْتَ مَا اَصَابَ صَاحِبَ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ كَانُوْا اِذَا اَصَابَهُمُ الْبَوْلُ قَرَضُوْهُ بِالْمَقَارِيْضِ فَنَهَاهُمْ فَعُذِّبَ فِىْ قَبْرِهِ . رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَرَوَاهُ النَّسَائِىُّ عَنْهُ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى

৩৪২. অনুবাদ : হযরত আব্দুর রহমান ইবনে হাসানা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘর হতে বের হয়ে আমাদের নিকট আসলেন। তখন তাঁর হাতে একটি চামড়ার ঢাল ছিল। তিনি ঢালটিকে মাটিতে রাখলেন [অন্তরাল হিসেবে], অতঃপর বসলেন এবং ওটার দিকে মুখ করে প্রস্রাব করলেন। তখন [মুশরিকদের] কোনো এক লোক বলল– দেখ লোকটির দিকে, সে কিরূপ মেয়েলোকদের মতো অন্তরাল করে প্রস্রাব করছে। নবী করীম ﷺ এ কথা শুনে বললেন– তোমার ধ্বংস হোক। তুমি কি জান না, বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির কি ঘটনা ঘটেছিল। বনী ইসরাঈলের লোকদের কাপড়ে যখন পেশাব লাগত তখন তারা তা কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলত। তখন সে ব্যক্তি তা করতে নিষেধ করল। ফলে তাকে কবরে শাস্তি দেওয়া হলো।

আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ্; আর ইমাম নাসায়ী এ হাদীসটি আব্দুর রহমান ইবনে হাসানা'র মাধ্যমে হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اُنْظُرُوْا اِلَيْهِ الخ এ উক্তিটি কার? বাহ্যিকভাবে দেখা যায় যে, উপস্থিত সাহাবীদের কেউ এই কথা বলেছেন, অথচ তাদের পক্ষে এরূপ কথা বলা অসম্ভব ; তবু এ বিষয়ে কয়েকটি মত রয়েছে।

১. সাহাবীগণের মধ্য হতেই কেউ এই উক্তি করেছেন, তবে তাঁর এই উক্তি বিদ্রূপাত্মক ছিল না ; বরং আরবের চিরাচরিত অভ্যাসের বিপরীত প্রস্রাব করতে দেখে তিনি বিস্ময়ের সাথে এই উক্তি করেছেন।

২. অথবা, রাসূল ﷺ-কে এরূপ প্রস্রাব করতে দেখে এর কারণ জানার উদ্দেশ্য অন্য সঙ্গীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই উক্তি করেছেন, বিদ্রূপের লক্ষ্যে নয়।

৩. কিংবা ঘটনাস্থলে উপস্থিত কোনো কাফির বা মুনাফিক এই উক্তিটি করেছিল এবং তা মুসলমানদেরকে হেয় করার জন্য বলেছিল। অধিকাংশ ওলামা এই মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

يَبُوْلُ كَمَا تَبُوْلُ الْمَرْأَةُ কথাটির ব্যাখ্যা : মহানবী ﷺ সর্বদা আড়াল করে বসে পেশাব করতেন। একদা কোনো মুশরিক রাসূল ﷺ-কে এরূপ করতে দেখে বলল যে, এই লোকটি মহিলাদের মতো আড়াল করে বসে প্রস্রাব করে। মেয়েলোকের সাথে তুলনা করার কয়েকটি কারণ রয়েছে–

১. তৎকালের আরবের পুরুষ লোকেরা দাঁড়িয়ে, আর মহিলারা বসে প্রস্রাব করত। রাসূল ﷺ-কে এভাবে বসে প্রস্রাব করতে দেখে মহিলাদের সাথে তুলনা করে উক্ত কথাটি বলা হয়েছে।

২. মহিলারা সাধারণত অন্তরাল করে প্রস্রাব করে; কোনো ব্যক্তি রাসূল ﷺ-কে ঢাল দিয়ে অন্তরাল করে প্রস্রাব করতে দেখে মহিলাদের মতো পেশাব করে বলে বর্ণনা করেছে।

قَرَضُوْهُ بِالْمَقَارِيْضِ -এর ব্যাখ্যা : বনী ইসরাঈলীগণকে যেমন আল্লাহ তা'আলা আসমানী খাবার দিয়েছিলেন, তেমনি কিছু বিধানও অত্যাধিক কঠিন করে দিয়েছেন। বিশেষ করে প্রস্রাবের বিধানটি। কাপড়ে যদি প্রস্রাবের ফোটা লাগত তবে কাঁচি দিয়ে তা কেটে ফেলার নির্দেশ ছিল।

وَعَنْ ٣٤٣ مَرْوَانَ الْاَصْفَرِ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ جَلَسَ يَبُوْلُ اِلَيْهَا فَقُلْتُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هٰذَا قَالَ بَلْ اِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذٰلِكَ فِي الْفَضَاءِ فَاِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلَا بَأْسَ - رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ

৩৪৩. **অনুবাদ :** তাবেঈ হযরত মারওয়ান আসফার (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখলাম যে, হযরত ইবনে ওমর (রা.) তাঁর বাহনের উটটি কিবলার দিকে বসালেন এবং তার দিকে মুখ করে বসে প্রস্রাব করলেন। তখন আমি বললাম, হে আবূ আব্দুর রহমান! এরূপ করতে কি নিষেধ করা হয়নি? তিনি বললেন, না ; বরং খোলা ময়দানে এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু যদি তোমার ও কিবলার মধ্যে কোনো বস্তু অন্তরাল থাকে তবে কোনো দোষ নেই। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** হযরত ইবনে ওমর-এর অভিমত হলো খোলা ময়দানে পায়খানা প্রস্রাবের সময় কিবলাকে সামনে বা পিছনে রাখা জায়েজ নেই। কিন্তু আড়াল অবস্থায় জায়েজ। অধিকাংশ ওলামা-এর বিপরীত মত পোষণ করেন।

وَعَنْ ٣٤٤ اَنَسٍ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنِّي الْاَذٰى وَعَافَانِيْ - رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

৩৪৪. **অনুবাদ :** হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন– নবী করীম ﷺ যখন পায়খানা হতে বের হতেন তখন বলতেন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنِّي الْاَذٰى وَعَافَانِيْ অর্থ– সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য, যিনি আমার শরীর হতে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করলেন এবং আমাকে মুক্ত করলেন। –[ইবনে মাজাহ্]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** পায়খানা-প্রস্রাব শেষে রাসূল ﷺ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দোয়া পড়েছেন। তন্মধ্যে উক্ত হাদীসে উল্লেখিত দোয়াটি প্রসিদ্ধ। তাই পায়খানা-প্রস্রাব হতে অবসর হওয়ার পর উক্ত দোয়াটি পড়া বাঞ্ছনীয়।

وَعَنْ ٣٤٥ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ لَمَّا قَدِمَ وَفْدُ الْجِنِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْهَ اُمَّتَكَ اَنْ يَسْتَنْجُوْا بِعَظْمٍ اَوْ رَوْثَةٍ اَوْ حُمَمَةٍ فَاِنَّ اللّٰهَ جَعَلَ لَنَا فِيْهَا رِزْقًا فَنَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ - رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ

৩৪৫. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন জিনদের পক্ষ হতে একদল প্রতিনিধি নবী করীম ﷺ-এর নিকট আগমন করলেন, তখন তারা বললেন– হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আপনার উম্মতকে নিষেধ করে দিন যে, তারা যেন হাড়, গোবর এবং কয়লা দ্বারা ইস্তিঞ্জা না করে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা এগুলোর মধ্যে আমাদের রিজিক রেখেছেন। সেমতে রাসূল ﷺ আমাদেরকে এসব বস্তু ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

بَابُ السِّوَاكِ

পরিচ্ছেদ : মিসওয়াকের বর্ণনা

আল্লামা ইবনুল মালিক (র.) বলেন, اَلسِّوَاكُ শব্দটি سِيْنٌ হরফে যের যোগে পঠিত। এটি দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথমত মিসওয়াক করা, দ্বিতীয়ত يُطْلَقُ عَلَى الْعُوْدِ الَّذِىْ يُسْتَاكُ بِهٖ অর্থাৎ এমন কাঠিকে বুঝায়, যা দিয়ে মিসওয়াক করা হয়।

আল্লামা নববী (র.) বলেন– সর্বাবস্থায় মিসওয়াক করা মোস্তাহাব, তবে পাঁচটি সময়ে মিসওয়াক করা বিশেষ মোস্তাহাব। সেগুলো হলো– ১. নামাজের সময়, তখন পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করুক বা মাটি দ্বারা, ২. কুরআন তেলাওয়াতের সময়, ৩. অজু করার সময়, ৪. নিদ্রা হতে জাগ্রত হওয়ার পর এবং ৫. মুখে দুর্গন্ধ দেখা দিলে, তা খাবার খাওয়ার কারণে হোক বা অন্য কোনো কারণে হোক।

শায়খ ইবনে হুমাম ও ইবনে আবেদীন (র.) বলেন, পাঁচ অবস্থায় মেসওয়াক করা মোস্তাহাব– ১. দাঁত হলুদ বর্ণ হয়ে গেলে, ২. মুখ দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে গেলে, ৩. ঘুম হতে জাগ্রত হওয়ার পর, ৪. নামাজে দণ্ডায়মান হওয়ার সময় এবং ৫. অজুর সময়। তবে এই সব অবস্থায় মেসওয়াক করা মোস্তাহাব। যেমনিভাবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেছেন–

اِنَّ السِّوَاكَ مِنْ سُنَنِ الدِّيْنِ فَتَسْتَوِىْ فِيْهِ الْاَحْوَالُ كُلُّهَا.

মেসওয়াকের গুরুত্ব : মেসওয়াক করার ব্যাপারে মহানবী ﷺ জোর তাকিদ দিয়েছেন, ডাক্তারী মতেও এর অনেক উপকারিতা রয়েছে। দাঁতের সাথে খাদ্য কনা জমে যে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয় তা দূর করার জন্যই মিসওয়াক করা একান্ত প্রয়োজন। তিক্ত গাছের ডাল দ্বারা মেসওয়াক করাই উত্তম। কেননা, এতে যেমন দাঁত পরিষ্কার হয়, তেমনি অনেক জীবাণুও ধ্বংস হয়ে যায়। মেসওয়াকের পরিমাণ এক বিঘত পরিমাণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর এর ব্যবহারের নিয়ম হলো– ডান হাত দিয়ে মুখের ডান দিক থেকে আড়া আড়িভাবে ঘষবে। দাঁত দৈর্ঘ্যে ঘষবে না। মেসওয়াক শেষে কাঠিটিকে ভালোভাবে ধৌত করে দাঁড় করিয়ে রাখবে। যাতে পানি শুকিয়ে গিয়ে দুর্গন্ধ মুক্ত থাকে। আর মেসওয়াক না পাওয়া গেলে অঙ্গুল দ্বারা পরিষ্কার করলেও সুন্নত আদায় হয়ে যাবে।

মেসওয়াকের ফজিলত ঃ মেসওয়াকের ফলে মুখের দুর্গন্ধ দূরীভূত হয়ে যায় এবং মৃত্যু কালে কালেমা নসীব হয় এবং যে অজুর পূর্বে মেসওয়াক করা হয় সে অজু দিয়ে নামাজ পড়লে প্রতি রাকাতে সত্তর রাকাতের ছওয়াব পাওয়া যায়। এ ছাড়াও অসংখ্য ছওয়াব রয়েছে অধিকন্তু রাসূলের সুন্নতের প্রতি মহব্বত করলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা উভয় জগতে নসীব হয়।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٤٦ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَاَمَرْتُهُمْ بِتَاخِيْرِ الْعِشَاءِ وَبِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৪৬. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যদি আমি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম তবে আমি অবশ্যই ইশার নামাজকে রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরী করে পড়তে এবং প্রত্যেক নামাজের [অজুর] সময় মেসওয়াক করতে তাদেরকে নির্দেশ দিতাম। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لَاَمَرْتُهُمْ الخ **-এর ব্যাখ্যা :** আলিমগণ এ কথার উপর একমত যে, ইশার নামাজ বিলম্বে পড়া মোস্তাহাব। আর মিসওয়াক করা সুন্নত। অথচ আলোচ্য হাদীসে لَاَمَرْتُهُمْ দ্বারা ওয়াজিব হওয়ার আদেশ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ রাসূল ﷺ বলেছেন, যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর না হতো, তবে আমি তাদের জন্য ইশার নামাজ দেরী করে পড়া এবং মেসওয়াক করা আবশ্যক

করে দিতাম। কিন্তু উম্মতের কষ্টের আশংকায় ইশার নামাজ দেরীতে পড়া আবশ্যক করা হয়নি, এতে বুঝা যায় যে, ইশার নামাজ দেরীতে পড়া এবং মেসওয়াক করা রাসূল ﷺ-এর খুবই মনোঃপুত কাজ। সুতরাং তা ওয়াজিব ঘোষিত না হলেও অন্যান্য মোস্তাহাব ও সুন্নত কাজগুলোর তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত উম্মতের কষ্ট না হলে রাসূল ﷺ এ দু'টি কাজকে ওয়াজিব করে দিতেন।

إِخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِيْ أَنَّ السِّوَاكَ مِنْ سُنَنِ الصَّلٰوةِ أَمْ مِنْ سُنَنِ الْوُضُوْءِ মেসওয়াক করা নামাজের সুন্নত না-কি অজুর সুন্নত, এই বিষয়ে আলিমদের মতামত :

জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, মেসওয়াক করা সুন্নতে মুওয়াক্কাদা। কিন্তু আসহাবে যাওয়াহেরের মতে মেসওয়াক করা ওয়াজিব। তবে মেসওয়াক করা অজুর সুন্নত ; না নামাজের সুন্নত এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

ইমাম শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, মেসওয়াক করা নামাজের সুন্নত। এ জন্য প্রত্যেক নামাজের আগে মেসওয়াক করতে হবে। যদিও তার পূর্বের অজু বহাল থাকে।

দলিল :

١ - عَنْ جَابِرٍ (رضـ) كَانَ السِّوَاكُ مِنْ أُذُنِ النَّبِيِّ ﷺ مَوْضَعَ الْقَلَمِ مِنَ الْكُتَّابِ - رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

٢ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلٰى أُمَّتِيْ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

٣ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ أَسْوِكَتُهُمْ فِيْ أَذَانِهِمْ يَسْتَنُّوْنَ بِهَا لِكُلِّ صَلٰوةٍ - رَوَاهُ الْخَطِيْبُ

২. **ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত :** ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও তাঁর অনুসারীদের মতে, মেসওয়াক করা অজুর সুন্নত। সুতরাং কেউ মেসওয়াক করে অজু করার পর ঐ অজু দিয়ে কয়েক ওয়াক্ত নামাজ পড়লেও মেসওয়াকের সুন্নত আদায়ের ছওয়াব পাবে।

দলিল :

١ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلٰى أُمَّتِيْ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوْءٍ - رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ

٢ - عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلٰى أُمَّتِيْ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُضُوْءِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ - رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانٍ

٣ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلٰى أُمَّتِيْ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوْءٍ - رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ

اَلْجَوَابُ عَنْ أَدِلَّةِ الْمُخَالِفِيْنَ : ইমাম শাফেয়ী (র.) যে বক্তব্য দিয়েছেন, তার উত্তরে বলা যায়–

১. প্রথম হাদীসের ব্যাপারে ইমাম বায়যাবী (র.) বলেন– এটা দুর্বল হাদীস। হাদীসে আছে রাসূল ﷺ-এর কাছে মেসওয়াক থাকত। তিনি ঠিক নামাজের পূর্বে মেসওয়াক করতেন, একথা উল্লেখ নেই।

২. দ্বিতীয় হাদীসে عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ-এর মধ্যে عِنْدَ শব্দটির পর وُضُوْءٍ শব্দ উহ্য আছে। তাই মূল ইবারত হবে–
عِنْدَ وُضُوْءِ كُلِّ صَلَاةٍ .

৩. আর কানের উপর মেসওয়াক রাখার হাদীসটি ইমাম বায়হাকী দুর্বল হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। আর এতে শুধু কানের উপর রাখার কথা আছে। নামাজের সময় মেসওয়াক করার কথা নেই।

তা ছাড়া প্রতিপক্ষের উপস্থাপিত হাদীসগগুলোর ভিত্তিতে হানাফীগণ নামাজের সময় মেসওয়াক করাকে মোস্তাহাব হিসেবে সাব্যস্ত করেন। সুতরা এসব হাদীস হানাফীদের অভিমতের খেলাফ নয়।

فَوَائِدُ السِّوَاكِ মেসওয়াকের উপকারিতা : মেসওয়াকের উপকারিতাসমূহ নিম্নরূপ ঃ ১. মৃত্যুকালে কালেমায়ে শাহাদাত নসীব হয়। ২. ইমাম আহমদ (র.) বলেন– মিসওয়াক করে নামাজ আদায় করলে সত্তর গুণ বেশি ছওয়াব হয়। ৩. দুররুল মুখতার গ্রন্থকার বলেন– মেসওয়াক দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করে। ৪. দাঁত ও মুখের পরিচ্ছন্নতা লাভ হয়। ৫. হযমী শক্তি অটুট থাকে। ৬. মিসওয়াক মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের নিরাময়কারী। ৭. যারা নামাজের প্রত্যেক অজুতে মেসওয়াক করে মৃত্যু যন্ত্রণা তাদের কম হয়। ৮. সহজে রূহ কবজ করা হয়। ৯. মেসওয়াক করলে স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়।

وَعَنْ ٣٤٧ شُرَيْحِ ابْنِ هَانِي قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ بِاَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ قَالَتْ بِالسِّوَاكِ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৪৭. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত শুরাইহ ইবনে হানী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– আমি হযরত আয়েশা (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ঘরে প্রবেশ করতেন তখন প্রথমে কোন্ কাজ করতেন? জবাবে হযরত আয়েশা (রা.) বললেন– মেসওয়াক করতেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূল ﷺ মেসওয়াকের প্রতি অত্যধিক গুরুত্বারোপ করতেন। অজু করার সময় ছাড়াও কোনোরূপ দুর্গন্ধের আশংকা করলে সাথে সাথে মেসওয়াক করতেন। ঘরে ফিরেই সর্বপ্রথম মেসওয়াক করতেন। কেননা, বাইরের লোকজনের সাথে কথাবার্তার ফলে মুখে লালা জমে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। তাই মেসওয়াক করে মুখ পরিষ্কার করে নিতেন।

وَعَنْ ٣٤٨ حُذَيْفَةَ (رضـ) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৪৮. অনুবাদ : হযরত হুযাইফা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– নবী করীম ﷺ যখন তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ার জন্য উঠতেন তখন মিসওয়াক করে নিজের মুখ পরিষ্কার করে নিতেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষের মুখে লালা জন্মে, যার ফলে তা মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে। তাই রাসূল ﷺ তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে ঘুম হতে উঠার পর মেসওয়াক করে মুখ পরিষ্কার করে নিতেন ; তারপর অজু করে পবিত্র মুখে নামাজে দণ্ডায়মান হতেন।

وَعَنْ ٣٤٩ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَاِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْاَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْاِبِطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِى الْاِسْتِنْجَاءَ قَالَ الرَّاوِىْ وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ الْمَضْمَضَةَ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِىْ رِوَايَةٍ اَلْخِتَانُ بَدَلَ اِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ لَمْ اَجِدْ هٰذِهٖ

৩৪৯. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, দশটি বিষয় হলো সনাতন স্বভাবের অন্তর্গত। সেগুলো হলো– ১. গোঁফ খাটো করা। ২. দাঁড়ি লম্বা করা। ৩. মেসওয়াক করা। ৪. পানি দ্বারা নাক পরিষ্কার করা। ৫. নখ কাটা। ৬. আঙ্গুলের গিরাসমূহ ধৌত করা। ৭. বগলের পশম উপড়ে ফেলা। ৮. নাভির নীচের পশম মুড়ানো। ৯. পানি দ্বারা শৌচকার্য করা। হাদীস বর্ণনাকারী বলেন, দশমটি আমি ভুলে গেছি, তবে সম্ভবতঃ সেটি হচ্ছে, ১০. কুলি করা। –[মুসলিম]

অপর এক বর্ণনায় দাঁড়ি লম্বা করার স্থলে খতনা করার কথা রয়েছে। কিন্তু গ্রন্থকার বলেন, আমি হাদীসটি বুখারী,

মুসলিম ও হুমাইদীর কিতাবে খুঁজে পাইনি। অবশ্য জামেউল উসূলের গ্রন্থকার হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। এমনিভাবে খাত্তাবীও মা'আলিমুস সুনানে আবূ দাঊদ হতে সাহাবী হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার (রা.)-এর সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

الرِّوَايَةَ فِي الصَّحِيْحَيْنِ وَلَا فِي كِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ وَلٰكِنْ ذَكَرَهَا صَاحِبُ الْجَامِعِ وَكَذَا الْخَطَّابِيُّ فِيْ مَعَالِمِ السُّنَنِ عَنْ أَبِيْ دَاوُدَ بِرِوَايَةِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ـ

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْفِطْرَةُ-এর আভিধানিক অর্থ : আভিধান বিদদের মতে اَلْفِطْرَةُ শব্দটি فِعْلَةٌ-এর ওযনে إِسْم مَصْدَر যার শাব্দিক অর্থ– নিম্নরূপ– ১. خِلْقَة [সৃজন,] ২. طَبِيْعَة [স্বভাব প্রকৃতি,] ৩. اَلدِّيْنُ [জীবন ব্যবস্থা,] ৪. اَلسُّنَّةُ [তরীকা, পদ্ধতি ইত্যাদি।]

اَلْفِطْرَةُ-এর শরয়ী সজ্ঞা : اَلْفِطْرَةُ-এর শরয়ী সংজ্ঞা সম্পর্কে আলিমদের মতামত :

১. আল্লামা তীবী (র.) বলেন, اَلْفِطْرَةُ هِيَ مَلَكَةٌ بَاطِنَةٌ فِي النَّاسِ يَقْتَدِرُ بِهَا عَلَى التَّمْيِيْزِ بَيْنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ অর্থাৎ, ব্যক্তির এমন এক গোপনীয় যোগ্যতা, যা দ্বারা সে ভালো ও মন্দের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে।

২. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (র.) বলেন– هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ جِبِلَّةٍ مُهَيَّئَةٍ لِقَبُوْلِ الْاِسْلَامِ ـ অর্থাৎ, ইসলাম গ্রহণ করার যোগ্যতাকে ফিতরাত বলে।

৩. কারো কারো মতে, اَلْفِطْرَةُ هِيَ الْعَقْلُ السَّلِيْمُ وَالْفَهْمُ الْمُسْتَقِيْمُ অর্থাৎ, শুভবুদ্ধি ও সঠিক বুঝকে فِطْرَة বলে। ইমাম খাত্তাবী ও ইমাম নববী (র.) বলেন, আলোচ্য হাদীসে فِطْرَة দ্বারা সুন্নত ও রীতি বোঝানো হয়েছে।

اَلْمَسْئَلَةُ الْمُتَعَلِّقَةُ সংশ্লিষ্ট মাসালা :

১. **حُكْمُ قَصِّ الشَّارِبِ :** উক্ত হাদীসের ভিত্তিতে আলিমগণ গোঁফ ছোট রাখাকে সুন্নত বলেছেন।
কিছু সংখ্যক বলেন– গোঁফ কামিয়ে ফেলা মাকরূহ, কিন্তু নাসায়ীর বর্ণনা মতে কামানো এবং ছোট করে রাখা উভয়টাই আছে, এ কারণে ছোট করে রাখা ও মুড়িয়ে ফেলা উভয়ই জায়েজ আছে।
ইমাম নববী (র.) বলেন– গোঁফ এতটুকু ছোট করা সুন্নত, যাতে ওষ্ঠ পরিষ্কারভাবে দেখা যায়, তবে যোদ্ধাদের জন্য শত্রুদের মাঝে ভীতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গোঁফ বড় রাখা জায়েজ আছে।

২. **حُكْمُ إِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ :** দাড়ি কাটা হারাম হওয়ার ব্যাপারে সকল আলিম একমত। দাড়ি মুড়ানো ব্যক্তি ফাসিক। তবে দাড়ি রাখার পদ্ধতি নিয়ে মতভেদ আছে। যথা–

১. কারো করো মতে দাঁড়ি খাটো করা যাবে না, লম্বা করাই উত্তম।

২. আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতে, দাড়ি একমুষ্টি পরিমাণ রাখা ওয়াজিব। এর বেশি হলে ছেটে রাখা দুরস্ত আছে। এক মুষ্টির কম রাখা হারাম। এই বক্তব্যের দলিল হচ্ছে–

ক. দাঁড়ি রাখা সংক্রান্ত অনেক হাদীসে إِعْفَاء শব্দ এসেছে, যার অর্থ হচ্ছে– লম্বা করা।

খ. দাড়ি কাটলে অমুসলিমদের সাথে সাদৃশ্য হয়। আর রাসূল ﷺ এমনটি হতে নিষেধ করেছেন। কেননা, তিনি বলেছেন– مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

গ. এটি ইসলামের ইউনিফর্ম। যেমন আল্লাহ বলেন– وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ উল্লেখ্য যে, মেয়েদের দাঁড়ি গজালে তা ফেলে দেওয়া মোস্তাহাব।

৩. **حُكْمُ السِّوَاكِ :** মেসওয়াক করা সুন্নতে মুওয়াক্কাদা। তবে এ ব্যাপারে তিনটি মত রয়েছে।
(ক) কিন্তু দাউদে জাহেরীর মতে এটা ওয়াজিব। (খ) হানাফীদের মতে মেসওয়াক অজুর সুন্নত, আর নামাজের জন্য মোস্তাহাব। (গ) শাফেয়ীদের মতে মেসওয়াক নামাজের সুন্নত।

৪. حُكْمُ اِسْتِنْشَاقِ الْمَاءِ : (ক) হানাফীদের মতে নাকে পানি দেওয়া অজুর সুন্নত এবং গোসলের ফরজ। (খ) শাফেয়ী ও মালেকী মাযহাব মতে উভয়টিতেই ওয়াজিব।

৫. حُكْمُ قَصِّ الْاَظْفَارِ : হাত পায়ের নখ কাটা সুন্নত। আর কাটা নখগুলো দাফন করা মোস্তাহাব। আর নখ কাটার নিয়ম হলো, ডান হাতের শাহাদত আঙ্গুল হতে শুরু করে কনিষ্ঠা আঙ্গুল পর্যন্ত নখ কাটবে। এর পর বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ কাটবে। আর বাম হাতের বৃদ্ধা আঙ্গুল হতে শুরু করে কনিষ্ঠা পর্যন্ত নখ কাটা উত্তম। পায়ের নখ কাটতে ডান পায়ের কনিষ্ঠা হতে আরম্ভ করে বাম পায়ের কনিষ্ঠায় শেষ করা উত্তম। প্রত্যেক শুক্রবারে নখ কাটা মোস্তাহাব।

৬. حُكْمُ نَتْفِ الْاِبْطِ : বগলের লোম উপড়ে ফেলা সুন্নত, তবে মুড়িয়ে ফেলাতে কোনো দোষ নেই।

৭. حُكْمُ حَلْقِ الْعَانَةِ : নাভির নিচের লোম মুড়িয়ে ফেলা সুন্নত। আর লোমনাশক ঔষধ দ্বারা নষ্ট করা সুন্নতের খেলাফ। মেয়েদের জন্য নাভির নিচের লোম উপড়ে ফেলা উত্তম। মুড়িয়ে ফেলা মাকরূহ।

৮. حُكْمُ الْخِتَانِ : খতনার বিধান সম্পর্কে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য বিদ্যমান। যথা ঃ

مَذْهَبُ الْاِمَامِ الشَّافِعِيِّ : ইমাম শাফেঈ ও একদল ওলামার মতে, খাতনা করা পুরুষ মহিলা উভয়ের জন্য ওয়াজিব। কেননা, এটা شِعَارُ الدِّيْنِ আর شِعَارُ الدِّيْنِ কে সম্মান করা সকল মু'মিনের উপর ওয়াজিব। যেমন ইরশাদ হয়েছে–

وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ .
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (رضـ) مَنْ لَمْ يَخْتَتِنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَلَا اُضْحِيَّتُهُ .

مَذْهَبُ الْقَوْمِ الْاٰخَرِ : একদল ওলামার মতে খাতনা করা ফরজ। তাদের ভাষায়–

اَلْخِتَانُ فَرْضٌ لِاَنَّهُ شِعَارُ الدِّيْنِ وَبِهٖ يُمَيَّزُ الْمُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ .

مَذْهَبُ الْاِمَامِ مَالِكٍ وَاَبِىْ حَنِيْفَةَ : ইমাম আবূ হানীফা ও মালিক (র.) -এর মতে পুরুষের জন্য খতনা করা সুন্নত এবং নারীদের জন্য উত্তম। কেননা, হাদীসে আছে– اَلْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ وَمَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ

৯. حُكْمُ الْمَضْمَضَةِ : কুলি করা অজুর সুন্নত; আর গোসলের ফরজ। ইমাম আহমদের মতে এই বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে।

১০. اِنْتِقَاصُ الْمَاءِ : পায়খানা-প্রস্রাবের পর শৌচকার্য করা ফরজ। ময়লা যদি স্থান অতিক্রম না করে তবে ঢিলা ব্যবহারের দ্বারা যথেষ্ট হবে। আর স্থান অতিক্রম করলে পানিও ব্যবহার করতে হবে।

১১. غَسْلُ الْبَرَاجِمِ : গিরাসমূহ ভালো মতো মথিত করে ধৌত করা অজুর সুন্নত।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣٥٠. عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلسِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ . رَوَاهُ الشَّافِعِىُّ وَاَحْمَدُ وَالدَّارِمِىُّ وَالنَّسَائِىُّ وَرَوَى الْبُخَارِىُّ فِىْ صَحِيْحِهٖ بِلَا اِسْنَادٍ .

৩৫০. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– মেসওয়াক হলো মুখ পরিষ্কারকারী এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উপায়। [শাফেয়ী, আহমদ, দারেমী ও নাসায়ী। আর ইমাম বুখারী হাদীসটি নিজ সহীহ গ্রন্থে সনদ ছাড়াই উল্লেখ করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে মহানবী ﷺ মেসওয়াক করার দু'টি উপকারিতার কথা উল্লেখ করেছেন। একটি বাহ্যিক তথা এতে মুখ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হয়। আর অপরটি অপ্রকাশ্য অর্থাৎ এতে মহান আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ হয়।

وَعَنْ ٣٥١ أَبِىْ اَيُّوْبَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعٌ مِّنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ اَلْحَيَاءُ وَيُرْوَى الْخِتَانُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৩৫১. অনুবাদ : হযরত আবূ আইয়ূব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, চারটি জিনিস রাসূলদের সুন্নত– ১. লজ্জা করা, অপর বর্ণনায় এসেছে, খাতনা করা। ২. সুগন্ধি লাগানো। ৩. মেসওয়াক করা এবং ৪. বিবাহ করা। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ব্যাখ্যা : এই চারটি বিষয়কে রাসূল ﷺ অত্যধিক গুরুত্বারোপ করতেন বিধায় এগুলোকে سُنَنُ الْمُرْسَلِيْنَ বলা হয়েছে। সাধারণত এই সব বিষয় মানুষ নবী-রাসূলগণ হতেই শিখেছে।

وَعَنْ ٣٥٢ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَرْقُدُ مِنْ لَيْلٍ وَ لَا نَهَارٍ فَيَسْتَيْقِظُ اِلَّا يَتَسَوَّكُ قَبْلَ اَنْ يَّتَوَضَّأَ . رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْدَاوُدَ

৩৫২. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ রাতে কিংবা দিনে যখনই ঘুম হতে জাগ্রত হতেন তখনই অজু করার পূর্বে মিসওয়াক করতেন। –[আহমদ ও আবূ দাউদ]

وَعَنْهَا ٣٥٣ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَاكُ فَيُعْطِيْنِى السِّوَاكَ لِاَغْسِلَهُ فَابْدَأُ بِهٖ فَاسْتَاكُ ثُمَّ اَغْسِلُهُ وَاَدْفَعُهُ اِلَيْهِ . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ

৩৫৩. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ মেসওয়াক করতেন, অতঃপর আমাকে ধৌত করতে দিতেন, তখন আমি [ধোয়ার পূর্বে] প্রথমে তা দ্বারা নিজে মেসওয়াক করতাম। অতঃপর ধৌত করতাম এবং তাকে দিতাম।–[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, মেসওয়াক করার পূর্বে ও পরে মেসওয়াককে ধৌত করে নেওয়া সুন্নত। আর এটাও বুঝা যায় যে, স্বামী-স্ত্রী পরস্পর একে অপরের মেসওয়াক ব্যবহার করা দূষণীয় নয়; বরং এটা প্রগাঢ় ভালোবাসার লক্ষণ। এছাড়া এটাও অনুমিত হয় যে, অনুমতি সাপেক্ষে অন্যের মেসওয়াক ব্যবহার করা মাকরূহ নয়। বিশেষ করে স্বামী-স্ত্রীর এহেন কর্মে উভয়ের মাঝে প্রগাঢ় ভালোবাসা সৃষ্টি হয়।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٥٤ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَرَانِى فِى الْمَنَامِ اَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ فَجَاءَنِى رَجُلَانِ اَحَدُهُمَا اَكْبَرُ مِنَ الْاٰخَرِ فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الْاَصْغَرَ مِنْهُمَا فَقِيْلَ لِىْ كَبِّرْ فَدَفَعْتُهُ اِلَى الْاَكْبَرِ مِنْهُمَا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৫৪. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন– আমি একদা স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি মেসওয়াক দ্বারা দাঁত মাজছি, তখনই দু' ব্যক্তি আমার নিকট আগমন করল, তাদের একজন অপরজন হতে বড়। আমি ছোটজনকে মেসওয়াকটি দিতে চাইলাম, তখন আমাকে বলা হলো যে, বড়জনকে প্রদান করুন, সুতরাং আমি তাদের মধ্যকার বড়জনকে মেসওয়াক প্রদান করলাম। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ব্যাখ্যা : মেসওয়াক একটি উত্তম বস্তু। আর বড় ব্যক্তিও সাধারণত সম্মানী হয়ে থাকে, তাই উত্তমকে উত্তম বস্তু দেওয়াই যুক্তি সঙ্গত। তাই মহানবী ﷺ বড়জনকে মেসওয়াক প্রদান করেন। মূলতঃ এখানে মেসওয়াকের মর্যাদা বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য।

وَعَنْ ٣٥٥ اَبِىْ اُمَامَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَاجَائَنِىْ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَطُّ اِلَّا اَمَرَنِىْ بِالسِّوَاكِ لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ اُحْفِىَ مُقَدَّمَ فِىَّ . رَوَاهُ اَحْمَدُ

৩৫৫. **অনুবাদ :** হযরত আবূ উমামা বাহেলী (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, হযরত জিবরাঈল (আ.) আমার নিকট যখনই আগমন করতেন তখনই মেসওয়াক করার জন্য আদেশ প্রদান করতেন। এতে আমার আশঙ্কা হলো যে, [অতিরিক্ত মেসওয়াকের কারণে] আমার মুখের সম্মুখের দিক [অর্থাৎ, দাঁতের মাড়ি] উঠিয়ে ফেলি নাকি। –[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** হযরত জিবরঈল (আ.) এ রকম বার বার মেসওয়াক করার আদেশ দ্বারা এটা বুঝা যায় না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখে দুর্গন্ধ হতো বরং এর দ্বারা তিনি মেসওয়াক করার গুরুত্ব বুঝাতে চেয়েছেন যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতকে মিসওয়াক করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেন।

وَعَنْ ٣٥٦ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقَدْ اَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِى السِّوَاكِ . رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

৩৫৬. **অনুবাদ :** হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আমি তোমাদেরকে মেসওয়াক সম্পর্কে অনেক কিছুই বললাম [অর্থাৎ এটা যে, অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা বুঝাতে চেয়েছি]। –[বুখারী]

وَعَنْ ٣٥٧ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَنُّ وَعِنْدَهُ رَجُلَانِ اَحَدُهُمَا اَكْبَرُ مِنَ الْاٰخَرِ فَاُوْحِىَ اِلَيْهِ فِىْ فَضْلِ السِّوَاكِ اَنْ كَبِّرْ اَعْطِ السِّوَاكَ اَكْبَرَهُمَا ـ رَوَاهُ اَبُوْدَاوُد

৩৫৭. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ মেসওয়াক করছিলেন। তখন তাঁর নিকট দু' ব্যক্তি ছিল, তাদের একজন অপরজন হতে বড়। তখন তার প্রতি মিসওয়াকের ফজিলত সম্পর্কে ওহী নাজিল করা হলো যে, বড়কে দিন, অর্থাৎ, তাদের মধ্যে যে বড় তাকে দিন। –[আবূ দাউদ]

وَعَنْهَا ٣٥٨ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَفْضُلُ الصَّلٰوةُ الَّتِىْ يُسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلٰوةِ الَّتِىْ لَا يُسْتَاكُ لَهَا سَبْعِيْنَ ضِعْفًا ـ رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ

৩৫৮. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— যে নামাজে মিসওয়াক করা হয়েছে তার ফজিলত ঐ নামাজের তুলনায় সত্তরগুণ বেশি, যে নামাজের জন্য মেসওয়াক করা হয়নি। –[বাইহাকী শু'আবুল ঈমানে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন]

وَعَنْ ٣٥٩ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِىْ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ وَلَاَخَّرْتُ صَلٰوةَ الْعِشَاءِ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ قَالَ فَكَانَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ يَشْهَدُ الصَّلَوَاتِ فِى الْمَسْجِدِ وَسِوَاكُهُ عَلٰى اُذُنِهٖ مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِنْ اُذُنِ الْكَاتِبِ لَا يَقُوْمُ اِلَى الصَّلٰوةِ اِلَّا اسْتَنَّ ثُمَّ رَدَّهٗ اِلٰى مَوْضِعِهٖ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْدَاوُدَ اِلَّا اَنَّهٗ لَمْ يَذْكُرْ وَلَاَخَّرْتُ صَلٰوةَ الْعِشَاءِ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ـ

৩৫৯. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত আবূ সালামা হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী (রা.) হতে বর্ণনা করেন। তিনি [যায়েদ] বলেন– আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যদি আমার উম্মতের উপর কষ্টকর হবে বলে মনে না করতাম তবে প্রত্যেক নামাজের জন্য মিসওয়াক করার আদেশ প্রদান করতাম এবং ইশার নামাজকে রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করতাম। বর্ণনাকারী আবূ সালামা বলেন– হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ মসজিদে নামাজের জন্য হাজির হতেন, তখন তাঁর মিসওয়াক তাঁর কানের উপরে থাকত, যেখানে লেখকের কানের উপর কলম থাকে। যখনই তিনি নামাজের জন্য দাঁড়াতেন তখনই মিসওয়াক করে নিতেন, অতঃপর তা আবার যথাস্থানে রেখে দিতেন।–[তিরমিযী ও আবূ দাউদ]

কিন্তু ইমাম আবূ দাউদ (র.) "আমি ইশার নামাজকে দেরী করতাম রাতের তৃতীয়াংশ পর্যন্ত" এ বাক্যটি উল্লেখ করেননি। আর ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন– এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

بَابُ سُنَنِ الْوُضُوْءِ

পরিচ্ছেদ : অজুর সুন্নত

سُنَنٌ শব্দটি سُنَّةٌ -এর বহুবচন। শাব্দিক অর্থ- নিয়ম-নীতি, কর্মপন্থা, রাস্তা ও পদ্ধতি। শরিয়তের পরিভাষায় সুন্নতের বিভিন্ন সংজ্ঞা রয়েছে—

১. মুহাদ্দিসদের পরিভাষায় রাসূলের মুখ নিঃসৃত বাণী, সম্পাদিত কর্ম এবং তাঁর সম্মতিকে সুন্নত বলা হয়। এখানে সুন্নত এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

২. কুরআন ও হাদীস দ্বারা দীন সম্পর্কিত প্রচলিত ও গৃহীত পন্থাকেও সুন্নত বলা হয়।

৩. ফরজ ও ওয়াজিব ব্যতীত নবী করীম ﷺ ইবাদত হিসেবে যা করেছেন তাও ফকীহদের নিকট সুন্নত হিসেবে পরিচিত।

আলোচ্য অধ্যায়ে অজু সম্পর্কে মহানবী ﷺ -এর কথা, কাজ ও সম্মতি কি ছিল তাই বর্ণিত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে অজুর ফরজ, সুন্নত, মোস্তাহাব সব কিছুই এর অন্তর্ভুক্ত।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٦٠ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهٖ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهٗ فِى الْاِنَاءِ حَتّٰى يَغْسِلَهَا ثَلٰثًا فَاِنَّهٗ لَا يَدْرِىْ اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهٗ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৬০. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন- যখন তোমাদের কেউ ঘুম হতে জাগ্রত হয়, তখন সে যেন পানির পাত্রে হাত প্রবেশ না করায়, যে পর্যন্ত না তা তিনবার ধৌত করে নেয়। কেননা, সে জানে না যে, রাতে [ঘুমের মধ্যে] তার হাত কোথায় ছিল। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِىْ غُسْلِ الْيَدِ بَعْدَ الْاِسْتِيْقَاظِ ঘুম হতে জাগ্রত হওয়ার পর হাত ধৌত করার ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ :

مَذْهَبُ بَعْضِ الْاَئِمَّةِ : হাসান বসরী, মুহাম্মদ ইবনে জারীর, ইসহাক ও ইমাম আহমদের এক বর্ণনা অনুযায়ী রাতের ঘুম হতে জাগ্রত হওয়ার পর হাত ধৌত করা ওয়াজিব। হাত ধৌত করা ব্যতীত পানির পাত্রে হাত প্রবেশ করালে পানি নাপাক হয়ে যাবে। তাঁদের দলিল—

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهٖ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهٗ فِى الْاِنَاءِ حَتّٰى يَغْسِلَهَا ثَلٰثًا فَاِنَّهٗ لَا يَدْرِىْ اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهٗ .

مَذْهَبُ جُمْهُوْرِ الْاَئِمَّةِ : শাফেয়ী, হানাফী ও মালিকী সকল ইমাম এ কথার উপর একমত যে, দিনের ঘুম হোক বা রাতের হোক, যদি হাতে নাপাক লাগার কথা নিশ্চিতভাবে জানা না থাকে তবে ঘুম হতে জাগ্রত হওয়ার পর হাত ধৌত করা ওয়াজিব নয়; বরং মোস্তাহাব।

তাঁদের দলিল—

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهٗ এই অংশটি সন্দেহের উপর ব্যবহৃত, যা وَاجِبٌ সাব্যস্ত করে না।

২. হাদীসে এসেছে যে, عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ اِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

আর ঘুম হতে জাগ্রত হওয়ার পর তিনবার নাক পরিষ্কার করা কারো মতেই وَاجِبْ নয়, কাজেই হাত ধৌত করাও ওয়াজিব নয়।

اَلْجَوَابُ عَنْ اَدِلَّةِ الْمُخَالِفِيْنَ তাঁদের দলিলের জবাব :

১. তাদের উপস্থাপিত হাদীসের জবাবে বলা যায় যে, তাতে اِسْتِيْقَاظٌ مِنَ النَّوْمِ কথাটি قَيْدِ اِتِّفَاقِىْ যেমন, কুরআনে এসেছে— وَ رَبَائِبُكُمُ الَّتِىْ فِىْ حُجُوْرِكُمْ এখানেও فِىْ حُجُوْرِكُمْ কথাটি قَيْدِ اِتِّفَاقِىْ কাজেই এটা আবশ্যক হয়।

২. এমনিভাবে لَايَدْرِىْ -এর কারণটি عَامْ কাজেই তার হুকুমও عَامْ হবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, হাত ধৌত করার হুকুমের ভিত্তি হলো নাপাকী, তাই নাপাকী লাগা নিশ্চিত হলে হাত ধৌত করা ওয়াজিব, অন্যথায় মোস্তাহাব।

وَعَنْهُ ٣٦١ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّأْ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلٰثًا فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيْتُ عَلٰى خَيْشُوْمِهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৬১. অনুবাদ : উক্ত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— যখন তোমাদের কেউ ঘুম হতে জাগ্রত হয় এবং অজু করে তখন সে যেন তিনবার নাকে পানি দিয়ে পরিষ্কার করে নেয়। কেননা, শয়তান তার নাকের বাঁশিতে রাত কাটায়। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيْتُ عَلٰى خَيْشُوْمِهِ -এর তাৎপর্য : 'শয়তান মানুষের নাকের বাঁশিতে রাত যাপন করে।' এই কথাটির অর্থ—

মানুষ যখন ঘুমন্ত থাকে তখন শয়তান তাকে কু-মন্ত্রণা দেওয়ার সুযোগ পায় না, ফলে সে নাকের বাঁশিতে আশ্রয় নিয়ে নানাবিধ দুঃস্বপ্ন দেখায়, যার প্রভাব সে জাগ্রত হওয়ার পরও অনুভব করে। সুতরাং কেউ যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে পানি দ্বারা যখন নাক পরিষ্কার করে নেয় তখন শয়তান দূর হয়ে যায় এবং তার প্রভাব কেটে যায়। এই জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুম হতে জাগ্রত হওয়ার পর অজু করা ও নাকে পানি দেওয়ার আদেশ দিয়েছেন।

কাজি ইয়ায (র.) বলেন— নাকের ভিতরে মস্তিষ্ক সংলগ্ন স্থানকে خَيْشُوْمْ বলে। এখানে মানুষের খেয়াল ও অনুভূতি জাগ্রত হয়, মানুষ ঘুমালে এখানে আঠা জাতীয় বস্তু জমা হয়ে তা শুকিয়ে অনুভূতি শক্তি তিরোহিত করে এবং চিন্তা চেতনার মধ্যে গড়মিল করে, ফলে সে বিভিন্ন স্বপ্ন দেখে। এমনকি ঘুম হতে জাগার পরও সে অবস্থা বিরাজমান থাকে, ফলে অলসতা ও দুর্বলতা তাকে ঘিরে ফেলে। ফলে নামাজ আদায় করতেও মন চায় না। এতে শয়তান খুবই আনন্দিত হয়। তখন নাক পানি দ্বারা ভালো করে ধৌত করে ফেললে তার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে। এ জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুম হতে জাগার পর নাকের বাঁশি ধৌত করতে বলেছেন।

আল্লামা তূরপুশতী (র.) বলেন, উপরে যা বলা হয়েছে সবই ধারণা প্রসূত, সঠিক বক্তব্য হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ জাতীয় দুর্বোধ্য কথার তত্ত্ব ও তাৎপর্য অনুসন্ধানের চেষ্টা না করে মহানবী ﷺ যা বলেছেন তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করাই উত্তম। কেননা, এ সমস্ত কথার মর্ম একমাত্র মহানবী ﷺ ই জানেন, অন্য কেউ নয়।

৩৬২ وَعَنْ وَقِيلَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ (رضـ) كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ فَدَعَا بِوَضُوْءٍ فَأَفْرَغَ عَلٰى يَدَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلٰثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهٗ ثَلٰثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهٗ بِيَدَيْهِ فَاَقْبَلَ بِهِمَا وَاَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهٖ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا اِلٰى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتّٰى رَجَعَ اِلَى الْمَكَانِ الَّذِىْ بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ . رَوَاهُ مَالِكٌ وَالنَّسَائِىُّ وَلِاَبِىْ دَاوُدَ نَحْوَهٗ ذَكَرَهٗ صَاحِبُ الْجَامِعِ . وَفِى الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ قِيْلَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ تَوَضَّأْ لَنَا وُضُوْءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَدَعَا بِاِنَاءٍ فَاَكْفَأَ مِنْهُ عَلٰى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلٰثًا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهٗ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ فَفَعَلَ ذٰلِكَ ثَلٰثًا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهٗ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ وَجْهَهٗ ثَلٰثًا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهٗ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ يَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهٗ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَسَحَ بِرَأْسِهٖ

৩৬২. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আসেম (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি পদ্ধতিতে অজু করতেন ? এর জবাবে তিনি পানি আনালেন এবং দু'হাতের কব্জি পর্যন্ত দু'বার দু'বার করে ধৌত করলেন। অতঃপর কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করলেন তিনবার। অতঃপর মুখমণ্ডল ধৌত করলেন তিনবার। এরপর উভয় হাত কনুই পর্যন্ত দু'বার দু'বার করে ধৌত করলেন। তারপর তাঁর উভয় হাত দ্বারা মাথা মাসাহ করলেন, সম্মুখের দিক ও পিছনের দিক হতে মাসাহ করলেন। অর্থাৎ মাথার সম্মুখের দিক হতে শুরু করে পিছনের দিকে ঘাড় পর্যন্ত নিলেন, এরপর পুনরায় হাত ফিরিয়ে সামনের দিকে আনলেন, যেখান থেকে শুরু করেছিলেন সেখানে। অতঃপর উভয় পা ধৌত করলেন। -[ইমাম মালেক, নাসায়ী] আবূ দাউদও এরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং জামেউল উসূল -এর সংকলক তা উল্লেখ করেছেন]

আর বুখারী ও মুসলিম উভয়ের বর্ণিত হাদীসে আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আসেম (রা.)-কে বলা হলো যে, আপনি আমাদের [শিক্ষার] জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অজুর মতো অজু করে দেখান। তখন তিনি একপাত্র পানি আনালেন এবং তা হতে কিছু পানি কাত করে উভয় হাতে ঢেলে নিলেন এবং হাতদ্বয় তিনবার করে ধৌত করলেন। অতঃপর তাঁর হাত পাত্রে প্রবেশ করালেন এবং এক কোষ পানি দিয়েই কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন। এভাবে তিনবার করলেন। পুনরায় তাঁর হাত পাত্রে ঢুকালেন এবং বের করে এনে মুখমণ্ডল তিনবার করে ধৌত করলেন। এরপর আবার হাত প্রবেশ করালেন এবং বের করে এনে উভয় হাত কনুই পর্যন্ত দু'বার করে ধৌত করলেন। অতঃপর আবার হাত ঢুকালেন এবং বের করে এনে নিজ হস্তদ্বয়

فَاَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَاَدْبَرَ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا كَانَ وُضُوْءُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَفِىْ رِوَايَةٍ فَاَقْبَلَ بِهِمَا وَاَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهٖ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا اِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتّٰى رَجَعَ اِلَى الْمَكَانِ الَّذِىْ بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلٰثًا بِثَلٰثِ غُرُفَاتٍ مِنْ مَاءٍ وَفِىْ اُخْرٰى فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفَّةٍ وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذٰلِكَ ثَلٰثًا وَفِىْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِىِّ فَمَسَحَ رَأْسَهٗ فَاَقْبَلَ بِهِمَا وَاَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ وَفِىْ اُخْرٰى لَهٗ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ مِنْ غُرْفَةٍ وَاحِدَةٍ .

দ্বারা সামনের দিক হতে শুরু করে পিছনের দিকে মাথা মাসাহ করলেন। অবশেষে তাঁর পদদ্বয় গোড়ালি পর্যন্ত ধৌত করলেন। অতঃপর বললেন– রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অজু এরূপই ছিল।

অপর এক বর্ণনায় আছে যে, উভয় হাত দ্বারা সামনের দিক হতে পিছনের দিকে মাসাহ করলেন। অর্থাৎ, মাথার সম্মুখ ভাগ হতে আরম্ভ করে পিছনের দিকে ঘাড় পর্যন্ত এবং পুনরায় ফিরিয়ে এনে যেখান হতে আরম্ভ করেছিলেন সে স্থান পর্যন্ত পৌঁছান। অতঃপর দু'পা ধৌত করলেন। অন্য বর্ণনায় আছে যে, তিনি তিনবার করে তিন কোষ পানি দ্বারা কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন এবং নাক ঝাড়লেন। অপর বর্ণনায় আছে যে, তিনি এক কোষ পানি দ্বারা কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন আর এভাবে তিনবার করলেন। বুখারীর অপর এক বর্ণনায় আছে যে, তিনি মাথা মাসাহ করলেন দু' হাত একবার সামনে হতে পিছন দিকে এবং একবার পেছন হতে সামনের দিকে। অতঃপর দু'পা টাখনা পর্যন্ত ধৌত করলেন। বুখারীর অপর বর্ণনায় আছে যে, এক কোষ পানি দ্বারা তিনবার করে তিনি কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়লেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : মহানবী ﷺ হতে এটা সাবেত আছে যে, তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে অজু করেছেন। কখনো কোনো অঙ্গ একবার, কখনো দু'বার আবার কখনো তিনবার ধৌত করেছেন। কখনো কুলি ও নাকে পানি দিয়েছেন একই পানি দিয়ে, আবার কখনো ভিন্ন ভিন্নভাবে পানি নিয়েছেন। এ সবই উম্মতের সহজতার জন্য করেছেন, যাতে উম্মত কষ্টকর অবস্থার মধ্যে পড়ে না যায়। তবে তিনি সাধারণত মাথা মাসাহ একবারই এবং হাত, পা ও মুখমণ্ডল তিনবার করেই ধৌত করতেন। একবার করে ধৌত করা হলো ফরজ, সতকর্তার জন্যই তিনবার ধৌত করতেন এবং এটা উত্তমও বটে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) প্রতিবার কুলি করার পানি ও নাক ঝাড়ার পানি পৃথক পৃথকভাবে নেওয়া ভালো মনে করেন। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) এক কোষ পানি দিয়েই কুলি করা ও নাক ঝাড়া উভয় কাজ করাকে ভালো মনে করেন।

اَلْاِخْتِلَافُ فِىْ غُسْلِ الْمِرْفَقَيْنِ وَالْكَعْبَيْنِ কনুই এবং পায়ের গিরা ধৌত করার ব্যাপারে মতানৈক্য : আইনী এবং ফাতহুল মুলহিম গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম যুফার (র.) ও দাউদ যাহিরীর মতে অজুর সময় হাতের কনুই এবং পায়ের গিরা ধৌত করা ফরজ নয়।

১. তাদের প্রথম যুক্তি হলো, যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী– اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ তোমরা রোজা রাখো রাত পর্যন্ত [কিন্তু রাত সহকারে নয়] তাই গিরা ও কনুই ধৌত করা ফরজ নয়।

২. দ্বিতীয় যুক্তি হলো গাইয়াহ (غَايَةٌ) মুগাইয়া (مُغَيَّا) -এর মধ্যে শামিল কি না এ ব্যাপারে পরস্পর বিপরীতধর্মী দলিল বিদ্যমান। কোনো কোনো উক্তি দ্বারা অনুমতি হয় যে, একটি অপরটির অন্তর্ভুক্ত। যেমন, আরবদের উক্তি— حَفِظْتُ الْقُرْآنَ مِنْ اَوَّلِهِ اِلَى اٰخِرِهِ আবার কোনোটি থেকে বুঝা যায় যে, একটি অপরটির মধ্যে শামিল নয়। যেমন, আল্লাহর বাণী— وَاَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ সুতরাং নিশ্চিতভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। কেননা, এতে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। অতএব এ সন্দেহের মধ্যেও কনুই এবং গিরাকে ধৌত করা অপরিহার্য বলা যায় না।

مَذْهَبُ الْاَئِمَّةِ الْاَرْبَعَةِ : চার ইমাম এবং অধিকাংশ উম্মতের মতে হাতের দু'কনুই ও পায়ের দু'গোড়ালি সহ ধৌত করা ফরজ। কেননা, আল্লাহর বাণী- فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَ اَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوْا بِرُؤُوْسِكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ এখানে উভয় স্থানে (اِلَى) শব্দটি (مَعَ) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহর অপর বাণী لَاتَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ اِلَى اَمْوَالِكُمْ -এর মধ্যে (اِلَى) শব্দটি (مَعَ) অর্থাৎ সাথে এর অর্থে হয়েছে। ইমাম দারাকুতনী فِىْ صِفَةِ الْوَضْعِ অধ্যায়ে এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন—

فَغَسَلَ يَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ حَتّٰى مَسَّ اَطْرَافَ الْعَضُدَيْنِ .

৩. কতিপয় ভাষাবিদগণ বলেন, সীমানার পূর্ব ও পরবর্তী বস্তু যদি একই জাতীয় হয় তবে একটি অপরটির হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হয়। সুতরাং হাত ও পায়ের উল্লিখিত সীমানার দুই পার্শ্বের অংশ একই জাতীয় হওয়ার কারণে কনুই ও গোড়ালি পরবর্তী অংশের ধোয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে।

ইমাম যুফার এবং ইমাম দাউদ যাহিরী (র.) যে সমস্ত দলিল উপস্থাপন করেছেন ইমাম চতুষ্টয়ের দলিল দ্বারা তার উত্তর প্রদান করা যেতে পারে।

اَلْاِخْتِلَافُ فِى اِسْتِيْعَابِ الرَّأْسِ بِالْمَسْحِ : সমস্ত মাথা মাসাহ করার ব্যাপারে মতানৈক্য :

مَذْهَبُ مَالِكٍ : ইমাম মালিক (র.)-এর মতে, সমস্ত মাথা মাসাহ করা ফরজ। তিনি দলিল পেশ করেন—

১. **প্রথম প্রমাণ** : আল্লাহ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াতে বলেন— فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ অর্থাৎ, মুখমণ্ডল মাসাহ কর, এখানে পুরো মুখমণ্ডল মাসাহ করা ফরজ ; তেমনি পুরো মাথা মাসাহ করা ফরজ।

২. **দ্বিতীয় প্রমাণ** : অজুর সময় অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন পুরোপুরি ধৌত করতে হয় তেমনি পুরো মাথা মাসেহ করা অপরিহার্য।

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَالشَّافِعِىِّ وَغَيْرِهِمْ তাদের মতে পুরো মাথা নয়; বরং কিছু অংশ মাসাহ করা ফরজ। তারা وَامْسَحُوْا بِرُؤُوْسِكُمْ এ আয়াত দ্বারা দলিল উপস্থাপন করেন যে, এখানে بَا হরফটি تَبْعِيْض অর্থাৎ কিছু অংশ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

ইমাম মালিক (র.)-এর দলিলের উত্তর :

১. فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ -এর উপর কিয়াস করে সমস্ত মাথা মাসাহ করার হুকুম দিয়েছেন। এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, তাঁর এ কিয়াস যথার্থ নয়। কেননা, তায়াম্মুমের বেলায় মুখমণ্ডল মাসাহ করার নির্দেশ মূলতঃ ধৌত করার হুকুমের স্থলাভিষিক্ত। অতএব মাথা মাসাহ করার নির্দেশ ধৌত করার স্থলাভিষিক্ত নয়। সুতরাং একটি অপরটির সাথে কিয়াস করা যুক্তিসঙ্গত নয়।

২. তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে সমস্ত মুখমণ্ডল মাসাহ করার অপরিহার্যতা আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি ; বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমল দ্বারাই এর ফরজ সাব্যস্ত হয়েছে। বুখারী ও মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে—

اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ضَرَبَ ضَرْبَةً لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةً لِلْيَدَيْنِ .

৩. ইমাম মালিক (র.) যে সকল হাদীস দ্বারা পুরো মাথা মাসাহ করার উপর দলিল দেন সেগুলো দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সমস্ত মাথা মাসাহ করা সুন্নত।

اَلْاِخْتِلَافُ فِىْ تَعْيِيْنِ مِقْدَارِ الرَّأْسِ لِلْمَسْحِ : মাসাহের জন্য মাথার পরিমাণ নির্ধারণের ব্যাপারে মতানৈক্য :

مَذْهَبُ الشَّافِعِىِّ : (শাফেয়ীগণ বলেন) মাসাহ বলা যায় এ পরিমাণ স্থান মাসাহ করলেই মাসাহ করার ফরযিয়্যাত আদায় হয়ে যাবে, এমনকি এক চুল পরিমাণ হলেও চলবে। যেমন, আল্লাহর বাণী— وَامْسَحُوْا بِرُؤُوْسِكُمْ এতে নির্দিষ্ট কোনো পরিমাণ দেওয়া হয়নি।

مَذْهَبُ اَبِى حَنِيْفَةَ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও তাঁর অনুসারীগণের মতে (نَاصِيَةٌ) নাসিয়াহ পরিমাণ মাথা মাসেহ করা ফরজ। উল্লেখ্য যে, মাথার চারভাগের একভাগের সমপরিমাণ মাথার সামনের অংশকে নাসিয়াহ বলা হয়।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও তাঁর অনুসারীদের দলিল নিম্নরূপ—

১. اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَسَرَ عَنْ عِمَامَةٍ وَمَسَحَ عَلٰى نَاصِيَتِهِ .

২. وَعَنْ مُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ (رض) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلٰى عِمَامَتِهِ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ . رَوَاهُ الطَّحَاوِىْ

৩. وَعَنْ مُغِيْرَة (رض) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ اَبُوْدَاوٗد وَالنَّسَائِىُّ)

اَلْاِخْتِلَافُ فِى تَكْرَارِ الْمَسْحِ একাধিকবার মাসাহ্ করার ব্যাপারে মতানৈক্য :

مَذْهَبُ الشَّافِعِىِّ وَ اَحْمَدُ : ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.)-এর এক মতে মাথা তিনবার মাসাহ্ করা মোস্তাহাব। তাদের দলিলসমূহ—

১. حَدِيْثُ اَبِىْ سَلَمَةَ (رض) قَالَ ..... فِيْهِ ..... وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ)

২. وَفِى الصَّحِيْحَيْنِ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا .

৩. وَعَنْ عَلِىٍّ (رض) اَنَّهُ حَكٰى وُضُوْءَ النَّبِىِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَغَسَلَ ثَلَاثًا وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا .

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَ مَالِكٍ (رح) : পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক (র.)-এর মতে এবং ইমাম আহমদ (র.)-এর প্রসিদ্ধ অভিমত মুতাবিক মাথা তিনবার মাসাহ্ করা মোস্তাহাব নয়; বরং একবারই মাসাহ্ করবে। তাদের দলিল নিম্নরূপ–

১. عَنْ عَلِىٍّ (رض) فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً . (رَوَاهُ اَبُوْدَاوٗد)

২. وَفِىْ حَدِيْثٍ اٰخَرَ عَنْ عَلِىٍّ (رض) ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ مُقَدَّمَهُ وَمؤخره مَرَّةً .

৩. وَفِىْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَلِىٍّ (رض) مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً .

ইমাম শাফেয়ী প্রমুখের দলিলের উত্তর : ইমাম শাফেয়ী (র.) হযরত আবূ সালমা (রা.) হতে বর্ণিত হাদীস দ্বারা যে দলিল পেশ করেছেন তার উত্তরে বলা যায় যে, বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য রাবীদের রেওয়ায়েতের খেলাফ বর্ণনা করায় উক্ত হাদীস দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

হাফেজ ইবনে হাজার (র.) বলেন, তাছলীছের হাদীসকে সহীহ হিসেবে ধরা হলেও উত্তরে বলা যেতে পারে তা দ্বারা পুরা মাথা মাসাহ্ করা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ পিছনে একবার, সামনে একবার, দু'পাশে একবার এভাবে তিন দিকে সমস্ত মাথাকেই মাসাহ-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

اَلْاِخْتِلَافُ فِىْ كَيْفِيَةِ الْمَسْحِ : মাসাহ্ করার পদ্ধতি সম্পর্কে মতানৈক্য : হাসান ইবনে সালিহের মতে, মাথার পিছন দিক থেকে মাসাহ্ শুরু করতে হবে। দলিল হিসেবে নিম্নের হাদীস পেশ করেন।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَاَقْبَلَ بِهِمَا وَاَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ .

জমহুর ওলামায়ে কেরামদের মতে : সামনের দিক থেকে মাথা মাসাহ্ আরম্ভ করতে হবে। কেননা, সামনের দিক থেকে মাসাহ্ করার দলিল হলো—

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ (رض) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاَدْبَرَ بِيَدَيْهِ وَاَقْبَلَ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

اَلْاِخْتِلَافُ فِىْ غُسْلِ الرِّجْلَيْنِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ পদদ্বয় ধৌত করার ব্যাপারে মতানৈক্য : অজু করার সময় পা ধৌত করতে হবে না, মাসাহ্ করতে হবে। এ ব্যাপারে ইমামদের মতপার্থক্য রয়েছে। মতপার্থক্যের কারণ নিম্নোক্ত আয়াতটি—

قَوْلُهُ تَعَالٰى : فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُؤُوْسِكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ .

উক্ত আয়াতে أَرْجُلَكُمْ শব্দের মধ্যে তিন ধরনের কেরাত রয়েছে—

১. নাফের মতে, أَرْجُلُكُمْ -এর (لام) লাম হরফটি পেশযোগে।

২. হাসান, ইকরিমাহ, হামযাহ, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) মতে أَرْجُلِكُمْ এখানে (لام) লাম হরফটি যের যোগে।

৩. হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.), ইবরাহীম, যাহ্হাক ইবনে আমের, কাসায়ী, হাফস প্রমুখের মতে أَرْجُلَكُمْ এখানে (لام) লাম হরফটি যবর যোগে। এর মধ্যে যবর ও যের কেরাতই মাশহূর। যের যোগে পড়া হলে মাসাহ করাই বুঝায়। কেননা, পূর্ববর্তী بِرُءُوْسِكُمْ -এর بَاءٌ হরফের مَدْخُوْل -এর উপর আতফ হবে। আর যদি যবর যোগে পড়া হয়, তবে এর অর্থ ধৌত করা বুঝায়। এ অবস্থায় তার পূর্ববর্তী وُجُوْهَكُمْ وَ اَيْدِيَكُمْ -এর উপর। অর্থাৎ, فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَ اَيْدِيَكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ

সুতরাং উক্ত দু'কেরাতের বিধানে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়।

হযরত হাসান বসরী (র.), মুহাম্মদ ইবনে জারীর তাবারী প্রমুখের মতে, পদযুগল মাসাহ করা ও ধৌত করা অজুকারীর ইচ্ছাধীন। তাদের যুক্তি হল أَرْجُلَكُمْ শব্দটি যবর এবং যের যোগে পাঠ করার উভয় কেরাতেই প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য। এ দ্বারা বুঝা যায় অজুকারীর ইচ্ছার উপরই সিদ্ধান্ত দিতে হবে।

আহলে যাওয়াহেরদের মতে, ধৌত করা, মাসাহ করা উভয়টি করতে হবে। কেননা, উভয়টা নির্ভরযোগ্য। সুতরাং উভয় কেরাতের সমন্বয় সাধনের খাতিরে উভয় কাজ করতে হবে।

শিয়াপন্থী ইমামদের মতে অজুর সময় পদদ্বয় মাসাহ করা ফরজ। তাঁদের দলিল নিম্নরূপ—

١ - قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَ اَرْجُلِكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ (بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلٰى رُءُوْسِكُمْ تَحْتَ حُكْمِ الْمَسْحِ)

٢ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ (رض) اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ بِالْمَاءِ عَلٰى رِجْلَيْهِ . (رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ)

٣ - عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ (رض) اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَا يَتِمُّ صَلٰوةُ لِاَحَدٍ حَتّٰى يُسْبِغَ الْوُضُوْءَ كَمَا اَمَرَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فَيَغْسِلُ وَجْهَهٗ وَيَدَيْهِ وَيَمْسَحُ بِرَأْسِهٖ وَ رِجْلَيْهِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

পক্ষান্তরে ইমাম চতুষ্টয় এমনকি সকল আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতে অজু করার সময় পদযুগল ধৌত করা ফরজ। তাদের দলিল হলো— ١ - قَوْلُهٗ تَعَالٰى فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ .... وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ

٢ - عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ دَخَلَ عَلِيٌّ (رض) رَحْبَتَهُ الْكُوْفَةَ فَتَوَضَّأَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ هٰكَذَا كَانَ وُضُوْءُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

٣ - عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ (رض) قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ رِجْلَهٗ ثَلَاثًا ثَلَاثًا .

এগুলো ব্যতীত আরো অনেক রিওয়ায়েত রয়েছে। এ ছাড়াও আব্দুর রহমান ইবনে আবী লায়লার বর্ণনা মতে, সকল সাহাবী অজুর সময় পদযুগল ধৌত করার উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

اَلْجَوَابُ عَنْ اَدِلَّةِ الْمُخَالِفِيْنَ **বিরুদ্ধবাদীদের দলিলের জবাব :**

১. ইমাম ত্বাহাবী (র.) বলেন, যে সকল বর্ণনায় মাসাহ করার প্রমাণ মিলে তার হুকুম রহিত হয়ে গেছে।

২. যে সমস্ত রিওয়ায়াতে অজুর সময় পা মাসাহ করার কথা রয়েছে তা দ্বারা মূলত হালকাভাবে ধৌত করা উদ্দেশ্য, মাসাহ করা নয়। কেননা, হালকাভাবে ধৌত করাকেও মাসাহ নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে।

৩. অথবা, বলা যেতে পারে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিশেষ কোনো ওজরের কারণে ধৌত করার পরিবর্তে মাসাহ করতেন। এরূপ সব সময় করতেন না।

وَعَنْ ٣٦٣ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ تَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَرَّةً مَرَّةً لَمْ يَزِدْ عَلٰى هٰذَا ـ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩৬৩. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ অজু করলেন, অজুর স্থানগুলো একবার একবার করে ধৌত করলেন, একবারের বেশি ধৌত করলেন না। –[বুখারী]

وَعَنْ ٣٦٤ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ـ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩৬৪. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [একদিন] নবী করীম ﷺ অজু করলেন এবং তাতে অজুর অঙ্গগুলো দু'বার দু'বার করে ধৌত করলেন। – [বুখারী]

وَعَنْ ٣٦٥ عُثْمَانَ (رضـ) أَنَّهُ تَوَضَّأَ بِالْمَقَاعِدِ فَقَالَ أَلَا أُرِيْكُمْ وُضُوْءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتَوَضَّأَ ثَلٰثًا ثَلٰثًا ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৬৫. **অনুবাদ :** হযরত ওসমান (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা তিনি মাকায়েদ নামক স্থানে অজু করতে লাগলেন, তখন বললেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অজু করার পদ্ধতি দেখাব না ? অতঃপর তিনি অজু করলেন এবং প্রত্যেক অঙ্গকে তিনবার করে ধৌত করলেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : উল্লিখিত তিনটি হাদীসে তিন রকম তথা একবার, দু'বার ও তিনবার ধৌত করার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং বাহ্যিক দৃষ্টিতে তিনটি হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। মূলত এতে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। কেননা, একবার করে ধৌত করা ফরজ দু'বার করে ধৌত করা জায়েজ। আর তিনবার ধৌত করা সুন্নত। বিনা প্রয়োজনে এর বেশি ধৌত করা ঠিক নয়।

وَعَنْ ٣٦٦ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) قَالَ رَجَعْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ حَتّٰى إِذَا كُنَّا بِمَاءٍ بِالطَّرِيْقِ تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ الْعَصْرِ فَتَوَضَّأُوْا وَهُمْ عُجَّالٌ فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوْحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْبِغُوا الْوُضُوْءَ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৬৬. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মক্কা হতে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করছিলাম, যখন আমরা রাস্তায় পানির কূপের নিকট পৌঁছলাম তখন লোকেরা আসর নামাজের জন্য তাড়াহুড়া করে অজু করল। আমরা যখন তাদের কাছে গেলাম তখন দেখলাম যে, তাদের পায়ের গোড়ালি [শুকনা থাকার কারণে] চকচক করছে। তাতে পানি লাগেনি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সর্বনাশ গোড়ালিসমূহের, এগগুলো জাহান্নামে যাবে। তোমরা পরিপূর্ণরূপে অজু কর। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : অজুর মধ্যে পা ধৌত করা যে ফরজ তা উক্ত হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়। পা ধৌত করা ব্যতীত বা সামান্যতম শুষ্ক থাকলেও অজু হবে না। আর অজু না হলে নামাজ হবে না। তাই অজু করার সময় সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ভালোভাবে ধৌত করতে হবে এবং অজুর সকল ফরজ, সুন্নত ও মোস্তাহাবের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৩৬৭ وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ (رض) قَالَ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৬৭. **অনুবাদ :** হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– একদা নবী করীম ﷺ অজু করলেন এবং মাসাহ করলেন মাথার সম্মুখভাগের উপর এবং পাগড়ির উপর ও মোজার উপর। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ فِىْ مِقْدَارِ مَسْحِ الرَّأْسِ মাথা মাসাহের পরিমাণ নিয়ে ইমামদের মতভেদ : মাথা মাসাহ করার পরিমাণ নিয়ে ওলামায়ে কেরামদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন—

১. ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতানুসারে যতটুকু পরিমাণ মাসাহ করলে মাসাহ করা হয়েছে বলা যায় ততটুকু মাসাহ করা ফরজ। তাঁর অনুসারী কেউ কেউ বলেন, এর পরিমাণ এক চুল, আবার কেউ কেউ বলেন তিন চুল।

২. ইমাম মালিক (র.)-এর মতে, সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ করা ফরজ।

৩. হযরত হাসান বসরী (র.)-এর নিকট মাথার অধিকাংশ মাসাহ করা ফরজ।

৪. ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতাবলম্বীদের ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ অনুযায়ী হাতের তিন আঙ্গুল পরিমাণ মাসাহ করা ফরজ। তবে অধিকাংশ হানাফী আলিমের মতে, মাথার এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ নাসিয়া পরিমাণ মাসাহ করা ফরজ এবং অবশিষ্ট অংশ মাসাহ করা সুন্নত।

মাসাহ নিয়ে মতভেদের কারণ : কুরআনের আয়াত وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ এখানে স্পষ্টভাবে পরিমাণ বর্ণনা করা হয়নি। তা ছাড়া উক্ত আয়াতে বর্ণিত بَا -এর অর্থ নির্ণয়ে মতভেদ রয়েছে—

ইমাম মালিক (র.) বলেন, এখানে بَاءْ অতিরিক্ত। অতএব এখানে بِرُءُوْسِكُمْ অর্থাৎ كُلَّ رُءُوْسِكُمْ হবে।

ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, "بَاءْ" অংশ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

হানাফীদের দলিল উপরিউক্ত হাদীস–

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ (رض) قَالَ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ الخ

এবং হযরত হুযাইফা (রা.)-এর হাদীস– اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَتٰى سُبَاطَةَ قَوْمٍ وَمَسَحَ عَلٰى نَاصِيَةٍ الخ

اَلْاَقْوَالُ فِىْ جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخُفَّيْنِ : পাগড়ি ও মোজার উপর মাসাহ প্রসঙ্গে মতভেদ : মোজার উপর মাসাহ সম্পর্কে শরিয়ত বিশ্লেষকদের মধ্যে মতভেদ আছে। নিম্নে তাঁদের মতামত তুলে ধরা হলো—

১. হযরত সুফিয়ান ছাওরী, দাউদে যাহেরী ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে, পাগড়ির উপর মাসাহ করলে মাথা মাসাহ-এর ফরজ আদায় হবে। তবে ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে, পূর্ণ পবিত্রতা ও অজুর পর পাগড়ির উপর মাসেহ করলে ফরজ আদায় হবে।

২. ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে, পাগড়ির উপর মাসাহ করলে মাথা মাসাহ করার ফরজ আদায় হবে না। তবে হ্যাঁ, ফরজ পরিমাণ মাথা মাসাহ করার পর পাগড়ির উপর মাসাহ করা সুন্নত। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল বর্ণিত হাদীস–

فَمَسَحَ بِنَاصِيَةٍ وَعَلَى الْعِمَامَةِ .

৩. ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালিক (র.)-এর মতে, পাগড়ির উপর মাসাহ করা সাধারণত জায়েজ নয়।

তাদের দলিল– وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ যেহেতু খবরে ওয়াহেদ কুরআনের বিপরীত হতে পারে না, তাই এর কয়েকটি ব্যাখ্যা হতে পারে। যেমন—

১. সম্ভবত রাসূলে কারীম ﷺ মাথা মাসাহ করার পর পাগড়ি ঠিক করেছিলেন। এ কথার পর রাবী বুঝে নিয়েছেন যে, পাগড়ির উপর মাসাহ করেছেন। যেমন–হযরত ইবনে মা'কাল (রা.)-এর হাদীসে আছে। তিনি বলেছেন, আমি মহানবী ﷺ-কে অজু করতে দেখেছি। তাঁর মাথায় পাগড়ি ছিল, তিনি হাত পাগড়ির ভিতর ঢুকালেন এবং মাথা মাসাহ করলেন, কিন্তু পাগড়ি খুললেন না।

২. মাথার এক-চতুর্থাংশ মাসাহ করে এরপর পাগড়ির উপর মাসাহ করেছেন।

৩. وَعَلَى الْعِمَامَةِ বাক্যাংশ عَاطِفَةٌ নয়; বরং حَالِيَةٌ তাহলে অর্থ হয়, তিনি মাথার এক-চতুর্থাংশ এমন অবস্থায় মাসাহ করেছেন যে, তাঁর মাথায় পাগড়ি ছিল।

৪. এ হাদীসের مَسْحُ عِمَامَةٌ অংশটি রহিত হয়ে গেছে এবং مَسْحُ خُفَّيْن সর্বসম্মতিক্রমে জায়েজ আছে।

মোজার উপর মাসাহ করা প্রসঙ্গ : সকল স্তরের ওলামায়ে কেরাম এ কথার উপর একমত যে মোজার উপর মাসাহ করা জায়েজ আছে। কেননা, মোজা মাসাহের হাদীস অর্থের দিক দিয়ে مُتَوَاتِرْ।

হযরত মাইমুন (র.) হযরত আহমদ (র.)-হতে বর্ণনা করেন مَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ -এর হাদীস ৭৩ জন সাহাবী হতে বর্ণিত আছে।

١ . وَفِيْ تُحْفَةِ الْاَشْرَافِ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصَرِيْ اَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنِيْ بِالْمَسْحِ سَبْعُوْنَ صَحَابِيًّا .

٢ . وَقَالَ اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ (رحـ) مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ سَائِرُ اَهْلِ بَدْرٍ وَالْحُدَيْبِيَّةَ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَسَائِرِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَفُقَهَاءِ الْاَمْصَارِ وَعَامَّةِ اَهْلِ الْعِلْمِ وَالْاَثَرِ .

٣ . وَ فِى الْبَدَائِعِ رُوِىَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصَرِيِّ قَالَ اَدْرَكْتُ سَبْعِيْنَ بَدْرِيًّا مِنَ الصَّحَابَةِ كُلُّهُمْ يَرَوْنَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ .

কাজেই এর অস্বীকারকারীকে বিদআতী বলা হবে। এ জন্য ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেছেন—

اِنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ مِنْ شَرَائِطِ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ حَيْثُ قَالَ مِنَ الشَّرَائِطِ اَنْ تُفَضِّلَ الشَّيْخَيْنِ وَتُحِبَّ الْخَتَانَيْنِ وَتَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ .

এ জন্য ইমাম কারখী (র.) বলেছেন– اَخَافُ الْكُفْرَ عَلٰى مَنْ لَا يَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ অর্থাৎ, যারা মোজার উপর মাসাহ করাকে জায়েজ মনে করে না, আমি তাদের কাফির হওয়ার আশঙ্কা করি।

وَعَنْ ٣٦٨ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِيْ شَانِهِ كُلِّهِ فِيْ طُهُوْرِهٖ وَتَرَجُّلِهٖ وَتَنَعُّلِهٖ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৬৮. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কোনো কাজই যথাসম্ভব ডান দিক হতে আরম্ভ করতে ভালোবাসতেন। যেমন– পবিত্রতা অর্জনে, মাথা আঁচড়ানে ও জুতা পরিধানে। –[বুখারী ও মুসলিম]

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৩৬৯ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا لَبِسْتُمْ وَاِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوْا بِاَيَامِنِكُمْ . رَوَاهُ اَحْمَدُ وَ اَبُوْدَاوُدَ

৩৬৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— যখন তোমরা পোশাক পরিধান কর এবং যখন তোমরা অজু কর তখন ডান দিক হতে আরম্ভ কর। −[আহমদ ও আবূ দাঊদ]

৩৭০ وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ . وَرَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْدَاوُدَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَالدَّارِمِيُّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ عَنْ اَبِيْهِ وَ زَادُوْا فِىْ اَوَّلِهٖ لَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَا وُضُوْءَ لَهٗ .

৩৭০. অনুবাদ : হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— যে ব্যক্তি অজুর শুরুতে বিসমিল্লাহ পাঠ করেনি তার অজু হয়নি। −[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্] কিন্তু আহমদ ও আবূ দাঊদ এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে এবং দারেমী আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। আর আহমদ ও অন্যান্যদের বর্ণনার শুরুতে আছে যে, যার অজু হয় না তার নামাজও হয় না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلتَّسْمِيَةُ فِىْ اِبْتِدَاءِ الْوُضُوْءِ فَرْضٌ اَمْ سُنَّةٌ -**অজুর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা ফরজ না সুন্নত** : অজু করার শুরুতে বিসমিল্লাহ পাঠ করা ফরজ কি না এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ—

مَذْهَبُ اَهْلِ الظَّاهِرِ وَاَحْمَدَ وَاِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ (رح) : আহলে জাহের, আহমদ ও ইসহাক ইবনে রাহওয়াই (র.)-এর মতে, অজুর শুরুতে বিসমিল্লাহ পাঠ করা ওয়াজিব। ইচ্ছাকৃত বিসমিল্লাহ পরিত্যাগ করলে পুনরায় অজু করতে হবে। তাদের দলিল হলো— উল্লিখিত হাদীস— لَا وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ

مَذْهَبُ جُمْهُوْرِ الْاَئِمَّةِ : ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক (র.)-সহ জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে এবং ইমাম আহমদ (র.)-এরও বিশুদ্ধ মতে, বিসমিল্লাহ বলা সুন্নত, ওয়াজিব নয়। তাঁদের দলিল—

١ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ وَ ذَكَرَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ كَانَ طُهُوْرًا لِجَمِيْعِ بَدَنِهٖ وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ عَلَيْهِ كَانَ طُهُوْرًا لِاَعْضَاءِ وُضُوْئِهٖ

٢ . وَفِىْ رِوَايَةٍ اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ ذِكْرُ اِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى قَلْبِ مُؤْمِنٍ سَمَّاهُ اَوْ لَمْ يُسَمِّ

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِهِمْ **তাঁদের দলিলের জবাব :**

১. আহলে জাহের ও ইমাম আহমদ (র.)-এর দলিলের জবাবে আল্লামা কাশ্মীরী (র.) বলেন, এ হাদীসটি ضَعِيْف এমনকি ইমাম আহমদ (র.) বলেন . مَا وَجَدْتُ فِىْ هٰذَا حَدِيْثًا صَحِيْحًا অতএব এটা দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হবে না।

২. ইমাম طَحَاوِىْ (رح) বলেন, এখানে لَا وُضُوْءَ দ্বারা مُتَكَامِلٌ فِى الثَّوَابِ-কে বুঝানো হয়েছে। যেমন অন্যান্য হাদীসে আছে– لَا صَلٰوةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ اِلَّا فِى الْمَسْجِدِ

وَعَنْ ٣٧١ لَقِيْطِ بْنِ صَبِرَةَ (رضـ) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِىْ عَنِ الْوُضُوْءِ قَالَ اَسْبِغِ الْوُضُوْءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْاَصَابِعِ وَبَالِغْ فِى الْاِسْتِنْشَاقِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا . رَوَاهُ اَبُوْدَاوُد وَالتِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِىُّ اِلٰى قَوْلِهٖ بَيْنَ الْاَصَابِعِ .

৩৭১. অনুবাদ : হযরত লাকীত ইবনে সাবিরাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ! আমাকে অজু সম্পর্কে অবহিত করুন। [অর্থাৎ কিভাবে অজু করা উত্তম হবে।] রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, অজু পরিপূর্ণভাবে করবে [অর্থাৎ অজুর অঙ্গসমূহ ভালোভাবে ধৌত করবে।] আঙ্গুলসমূহ খিলাল করবে এবং নাকে ভালোভাবে পানি পৌঁছিয়ে পরিষ্কার করবে, যদি তুমি রোজাদার না হও। –[আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও নাসায়ী] আর ইবনে মাজাহ্ ও দারেমী بَيْنَ الْاَصَابِعِ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ فِى الْمَضْمَضَةِ وَالْاِسْتِنْشَاقِ : কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতভেদ : কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার বিধান সম্পর্কে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে :

مَذْهَبُ اَحْمَدَ وَاِسْحَاقَ اَبِىْ ثَوْرٍ وَغَيْرِهٖ ঃ ইমাম আহমদ, ইমাম ইসহাক, ইমাম আবূ ছাওর, ইমাম ইবনুল মুনযির ও আবূ উবায়দা (র.)-এর মতে, কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া ওয়াজিব। অজু গোসল উভয় অবস্থাতেই নাকে পানি দেওয়া ওয়াজিব কিন্তু উভয় অবস্থায় কুলি করা সুন্নত। তাঁদের দলিল হলো—

١ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ اِذَا تَوَضَّأَ اَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِىْ اَنْفِهٖ مَاءً ثُمَّ يَسْتَنْثِرُ .

٢ . عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ (رضـ) اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ اِنْ تَوَضَّأْتَ فَاسْتَنْثِرْ .

٣ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَمَرَ بِالْمَضْمَضَةِ وَالْاِسْتِنْشَاقِ .

مَذْهَبُ الشَّافِعِىِّ وَ مَالِكٍ وَالْاَوْزَاعِىِّ وَغَيْرِهٖ : ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক, ইমাম আওযা'ঈ, লাইস, হাসান বসরী (র.) প্রমুখ ওলামার মতে, অজু ও গোসল উভয় অবস্থায় কুলি করা এবং নাকে পানি দেওয়া সুন্নত। তাঁদের দলিল হলো—

১. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ هُمَا سُنَّتَانِ

২. এগুলো করা কুরআন দ্বারা সাব্যস্ত নয় ; বরং হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে; তাই সুন্নত হবে, ওয়াজিব নয়।

৩. অজুতে বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করার নির্দেশ রয়েছে, অভ্যন্তরীণ অঙ্গ ধৌত করার নির্দেশ নেই। সুতরাং নাকে মুখে পানি দেওয়া ওয়াজিব হতে পারে না।

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও তাঁর অনুসারীদের মতে অজুতে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া সুন্নত; কিন্তু ফরজ গোসলের সময় উভয়টিই ফরজ। তাঁদের দলিল—

١ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ اَلْمَضْمَضَةُ وَالْاِسْتِنْشَاقُ سُنَّةٌ .

এটা দ্বারা সুন্নত সাব্যস্ত হয়।

আর পবিত্র কুরআনে এসেছে— وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا এখানে اِطَّهَّرُوْا দ্বারা পবিত্রতার আধিক্য বুঝানো হয়েছে, ফলে তা গোসলে ফরজ হয়েছে।

وَعَنْ ٣٧٢ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ اَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ نَحْوَهُ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ .

৩৭২. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– যখন তুমি অজু কর তখন হাত ও পায়ের আঙ্গুলসমূহের মধ্যে খিলাল কর। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্; ইমাম তিরমিযী বলেন, এই হাদীসটি দুর্বল]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** এখানে আঙ্গুলসমূহ খিলাল করার নির্দেশ এ জন্য এসেছে, যাতে আঙ্গুলের ফাঁকে কোনো অংশ শুষ্ক না থাকে। কেননা, যদি কোনো অংশ শুষ্ক থেকে যায় তবে অজু হবে না। তাই আঙ্গুল যদি ফাঁক ফাঁক হয় তবে খিলাল করা মোস্তাহাব, আর যদি ঘন হয় তবে খিলাল করা ওয়াজিব। যেহেতু এ অবস্থায় আঙ্গুলের ফাঁকে পানি না পৌঁছার সম্ভাবনা রয়েছে।

وَعَنْ ٣٧٣ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ (رضـ) قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ يَدْلُكُ اَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْدَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

৩৭৩. **অনুবাদ :** হযরত মুসতাউরিদ ইবনে শাদ্দাদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি যে, যখন তিনি অজু করতেন তখন দুই পায়ের আঙ্গুলসমূহ তাঁর [বাম হাতের] কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা মর্দন করতেন। [তিরমিযী, আবূ দাঊদ ও ইবনে মাজাহ্]

وَعَنْ ٣٧٤ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ اَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَاَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ وَقَالَ هٰكَذَا اَمَرَنِيْ رَبِّيْ . رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ

৩৭৪. **অনুবাদ :** হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন অজু করতেন, তখন এক অঞ্জলি পানি নিয়ে চিবুকের নিচ দিয়ে দাড়িতে প্রবেশ করিয়ে দিতেন এবং তার দ্বারা দাড়ি খিলাল করতেন এবং বলতেন, এরূপ করার জন্য আমার প্রভু আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** মহানবী ﷺ-এর দাড়ি ছিল ঘন, তাই তিনি তাতে পানি প্রবেশ করিয়ে খিলাল করতেন। যাদের দাড়ি ঘন তাদের মুখমণ্ডলের সীমার মধ্যে দাড়ির উপরিভাগ ধৌত করা ফরজ এবং হাতের কোষ ভরে পানি নিয়ে নিচের দিক হতে দাড়িতে প্রবেশ করিয়ে আঙ্গুল বিস্তার করে দাড়ি খিলাল করা সুন্নত। আঙ্গুলকে নিচের দিক দিয়ে প্রবেশ করিয়ে উপরের দিকে উঠাতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এভাবে দাঁড়ি খিলাল করতেন।

আর যাদের দাড়ি পাতলা [তথা দাড়ির ফাঁকে চামড়া দেখা যায়] তাদের মুখমণ্ডলের সীমানা পর্যন্ত দাড়ির নিচের চামড়া ধৌত করা ফরজ, শুধু খিলাল করলে চলবে না।

وَعَنْ ٣٧٥ عُثْمَانَ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ . رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالدَّارِمِىُّ

৩৭৫. অনুবাদ : হযরত ওসমান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ তাঁর দাড়ি মুবারক খিলাল করতেন। –[তিরমিযী ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِىْ تَخْلِيْلِ اللِّحْيَةِ দাড়ি খিলাল করার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতভেদ: ইমাম আবূ ছাওর, হাসান ইবনে সালেহ ও দাউদ যাহেরীসহ প্রমুখ ওলামার মতে, অজু গোসল উভয় অবস্থায় দাড়ি খিলাল করা ওয়াজিব। তাঁদের দলিল— ١. عَنْ عُثْمَانَ (رضـ) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ

ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ (র.)-সহ প্রমুখ ওলামার মতে ফরজ গোসল করার সময় দাড়ি খিলাল করা ওয়াজিব। কিন্তু অজুর সময় তা ওয়াজিব নয়।

গোসল করার সময় দাড়ি খিলাল করা ওয়াজিব হওয়ার দলিল—

١ . قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا .

٢ . اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فَبَلِّغُوْا الشَّعْرَ وَاَنْقُوا الْبَشَرَ .

অজুর সময় দাড়ি খিলাল করা সুন্নত হওয়ার দলিল—

١ . عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَوَضَّاَ اَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَاَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ . (رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ)

وَعَنْ ٣٧٦ اَبِىْ حَيَّةَ قَالَ رَاَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّاَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ حَتّٰى اَنْقَاهُمَا ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلٰثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلٰثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلٰثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلٰثًا وَمَسَحَ بِرَاْسِهِ مَرَّةً ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَاَخَذَ فَضْلَ طُهُوْرِهِ فَشَرِبَهُ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ اَحْبَبْتُ اَنْ اُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ طُهُوْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ . رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ

৩৭৬. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত আবূ হাইয়্যাহ (র.) বলেন, আমি হযরত আলী (রা.)-কে অজু করতে দেখেছি যে, প্রথমে তিনি করদ্বয় [হাতের কব্জি পর্যন্ত] ধৌত করে পরিষ্কার করে নেন। অতঃপর তিনি তিনবার কুলি করেন এবং তিনবার নাকে পানি দেন। এরপর তিনবার মুখমণ্ডল ও তিনবার করে উভয় হাত [কনুই পর্যন্ত] ধৌত করেন। অতঃপর একবার মাথা মাসাহ করেন। তারপর টাখনা গিরা পর্যন্ত উভয় পা ধৌত করেন। এরপর দাঁড়ান এবং অজুর অবশিষ্ট পানি নিয়ে দাঁড়ানো অবস্থায় তা পান করেন। অবশেষে তিনি বলেন, আমি আমার আগ্রহ হলো যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অজু কিরূপ ছিল তা তোমাদের দেখাই। –[তিরমিযী ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَشَرِبَهُ وَهُوَ قَائِمٌ তিনি অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করেন : ইমামগণ এ কথার উপর একমত যে, অজুর অবশিষ্ট পানি এবং যমযম কূপের পানি দাঁড়িয়ে পান করা মোস্তাহাব। যমযমের পানি যে বরকতময় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর 'অজু করা' একটি ইবাদত। সুতরাং তার অবশিষ্ট পানির মধ্যে বরকত নিহিত আছে, কাজেই আদব ও শিষ্টাচারের প্রেক্ষিতে উভয় পানি দাঁড়িয়ে পান করা উচিত। নবী করীম ﷺ ও এভাবে দাঁড়িয়ে পান করেছেন।

وَعَنْ ٣٧٧ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ نَحْنُ جُلُوْسٌ نَنْظُرُ اِلٰى عَلِيٍّ حِيْنَ تَوَضَّأَ فَاَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنٰى فَمَلَأَ فَمَهُ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَنَثَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرٰى فَعَلَ هٰذَا ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى طُهُوْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَهٰذَا طُهُوْرُهُ . رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

৩৭৭. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত আবদু খায়ের (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা বসে দেখছিলাম হযরত আলী (রা.) অজু করছেন, অতঃপর তিনি তাঁর ডান হাত পানির মধ্যে প্রবেশ করালেন এবং মুখ ভরে পানি দ্বারা কুলি করলেন, আর নাকে পানি দিলেন। অতঃপর বাম হাত দ্বারা নাক পরিষ্কার করলেন, এভাবে তিনি তিনবার করলেন, এরপর বললেন, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অজু দেখতে আগ্রহ করে সে যেন দেখে যে, এটাই তাঁর [রাসূলুল্লাহর] অজু। –[দারেমী]

وَعَنْ ٣٧٨ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ (رضـ) قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ فَعَلَ ذٰلِكَ ثَلٰثًا . رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

৩৭৮. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখেছি যে, তিনি এক অঞ্জলি পানি দ্বারা কুলি করেছেন এবং নাকে পানি দিয়েছেন। এভাবে তিনি তিনবার করেছেন।–[আবূ দাঊদ ও তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, এক কোষ পানি দ্বারা কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া জায়েজ আছে। ইমাম শাফেয়ী (র.) উক্ত হাদীসকে দলিল হিসেবে পেশ করে বলেন যে, এক কোষ পানি দ্বারা কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া উত্তম, হানাফীগণ এরূপ করাকে উত্তম মনে করেন না; বরং জায়েজ হওয়া সাব্যস্ত করেন। কেননা, হয়ত রাসূলুল্লাহ ﷺ জায়েজ প্রমাণের জন্য কিংবা পানির স্বল্পতার কারণে এরূপ করেছেন।

وَعَنْ ٣٧٩ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاُذُنَيْهِ بَاطِنِهِمَا بِالسَّبَّابَتَيْنِ وَظَاهِرِهِمَا بِاِبْهَامَيْهِ . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

৩৭৯. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ [অজুর সময়] মাথা মাসাহ করেছেন এবং দু'কান মাসাহ করেছেন। তবে কানের অভ্যন্তরভাগ দুই তর্জনি [শাহাদাত] অঙ্গুলি দ্বারা এবং বাহিরের দিক দুই বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা। –[নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ও ইমাম আবূ ছাওর (র.) বলেন, কান মাসাহ করার জন্য নতুনভাবে পানি নিতে হবে, মাথা মাসাহ করার পর হাতে অবশিষ্ট তারল্যের দ্বারা মাসাহ করলে সুন্নত আদায় হবে না। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম সুফিয়ান ছাওরী (র.) বলেন, নতুনভাবে পানি নেওয়ার দরকার নেই। আল্লামা ইবনে কাইয়েম বলেন, মহানবী ﷺ কান মাসাহ করার জন্য নতুন পানি ব্যবহার করেছেন বলে সহীহ কোনো হাদীস বর্ণিত নেই ; বরং اَلْاُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ বলে মাসাহের ব্যাপারে একই অঙ্গ ধরতে বলেছেন।

উল্লেখ্য অজুর সময় কর্ণদ্বয় মাসাহ করার পদ্ধতি হলো, কানের অভ্যন্তর ভাগ তর্জনি দ্বারা আর বহির্ভাগ বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা মাসাহ করতে হবে।

وَعَنْ ٣٨٠ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ (رض) اَنَّهَا رَاَتِ النَّبِيَّ ﷺ يَتَوَضَّأُ قَالَتْ فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَا اَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا اَدْبَرَ وَ صُدْغَيْهِ وَ اُذُنَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَفِيْ رِوَايَةٍ اَنَّهُ تَوَضَّأَ فَاَدْخَلَ اِصْبَعَيْهِ فِيْ جُحْرَيْ اُذُنَيْهِ - رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ الرِّوَايَةَ الْاُوْلٰى وَاَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ الثَّانِيَةَ

৩৮০. **অনুবাদ :** হযরত রুবাই বিনতে মু'আব্বিয (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ-কে অজু করতে দেখেছেন। তিনি [রুবাই] বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথার সামনের দিক হতে এবং পিছনের দিক হতে মাসাহ করেন এবং উভয় কানের পট্টি ও উভয় কান একবার করে মাসাহ করেন।

অপর বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অজু করলেন, অতঃপর [মাসাহের সময়] তাঁর দু'আঙ্গুল দু'কর্ণ কুহরে প্রবেশ করালেন। –[আবূ দাঊদ, তিরমিযী। প্রথম রেওয়ায়াতটি উল্লেখ করেছেন। আর আহমদ ও ইবনে মাজাহ্ দ্বিতীয়টি]

وَعَنْ ٣٨١ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ (رض) اَنَّهُ رَاَى النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ وَاَنَّهُ مَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مَعَ زَوَائِدَ -

৩৮১. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী করীম ﷺ-কে অজু করতে দেখেছেন, তিনি তাঁর মাথা তাঁর হাতের উদ্বৃত পানি ছাড়া নতুন পানি দ্বারা মাথা মাসাহ করেছেন। –[তিরমিযী] তবে ইমাম মুসলিম কিছু বাড়িয়ে বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ- **হাদীসের ব্যাখ্যা :** ইমাম শাফেয়ী (র.)-সহ কিছু সংখ্যক ইমামের মতে মাথা মাসাহ করার জন্য নতুন পানি নেওয়া আবশ্যক, ভিজা হাত দ্বারা মাসাহ করলে অজু হবে না। তাঁদের দলিল উপরোল্লিখিত হাদীস।

আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও তাঁর অনুসারীদের মতে মাথা মাসাহ করার জন্য নতুন পানির দরকার নেই। হাত ধৌত করার পর হাতের তালুতে উদ্বৃত যে সিক্ততা থাকে তা দ্বারা মাথা মাসাহ করলেই যথেষ্ট হবে। তাঁদের দলিল হলো রুবাই বিনতে মু'আব্বিযের হাদীস। এ ছাড়া দারকুতনীতে আছে تَوَضَّأَ وَمَسَحَ بِبَلَلِ يَدَيْهِ অন্য বর্ণনায় রয়েছে فَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَا فَضَلَ فِيْ يَدَيْهِ

وَعَنْ ٣٨٢ اَبِيْ اُمَامَةَ (رض) ذَكَرَ وُضُوْءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَكَانَ يَمْسَحُ الْمَاقَيْنِ وَقَالَ الْاُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ - رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَذَكَرَا قَالَ حَمَّادٌ لَا اَدْرِيْ الْاُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ مِنْ قَوْلِ اَبِيْ اُمَامَةَ اَمْ مِنْ قَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

৩৮২. **অনুবাদ :** হযরত আবূ উমামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অজু সম্পর্কে বর্ণনা করে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ চক্ষুর দুই কোণকেও মর্দন করতেন, আর তিনি বলেন, কর্ণদ্বয় হলো মাথার অন্তর্ভুক্ত। –[ইবনে মাজাহ্, আবূ দাঊদ ও তিরমিযী]

তবে ইমাম আবূ দাঊদ ও ইমাম তিরমিযী (র.) উল্লেখ করেছেন যে, এ হাদীসের অপর রাবী হাম্মাদ (র.) বলেছেন যে, "কর্ণদ্বয় মাথার অন্তর্ভুক্ত" এই কথাটি আবূ উমামার কথা, নাকি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা, তা আমার জানা নেই।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْمَاقَيْنِ -এর বিশ্লেষণ : مَاقَيْنِ শব্দটি مَاقٌ -এর দ্বিবচন, এর অর্থ সম্পর্কে কিছুটা মতভেদ রয়েছে—

১. আল্লামা তুরপুশতী (র.) বলেন, নাকের সংলগ্ন চোখের কোণকে مَاقٌ বলে।

২. কিতাবুল জাওহারী নামক গ্রন্থে আছে যে, নাকের এবং কানের নিকটস্থ চোখের উভয় কোণকে ماق বলা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ অজু করার সময় এ উভয় কোণকে ধৌত করতেন। কেননা, এ স্থানদ্বয়ে চোখের ময়লা জমে থাকে, তাতে পানি প্রবেশ করানোর জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ খুব রগড়িয়ে ধৌত করতেন। আল্লামা তীবী একে মোস্তাহাব হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

اَلْاُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ -এর ব্যাখ্যা : এ বাক্যটির عَطْف দু' রকম হতে পারে। যথা—

১. এটা যদি পূর্ববর্তী قَالَ -এর উপর আতফ হয়, তখন তা হবে রাবী আবূ উমামার নিজস্ব উক্তি।

২. আর যদি তার আতফ كَانَ -এর সাথে হয়, তখন হবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী। এ সন্দেহের কারণে ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম তিরমিযী (র.)-বলেন, এ হাদীসের অপর বর্ণনাকারী হাম্মাদ (র.) সংশয়ের বশবর্তী হয়ে বলেছেন, আমি জানি না, এটা কার উক্তি, আবূ উমামার, না রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর।

وَعَنْ ٣٨٣ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوْءِ فَأَرَاهُ ثَلٰثًا ثَلٰثًا ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا الْوُضُوْءُ فَمَنْ زَادَ عَلٰى هٰذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدّٰى وَظَلَمَ ـ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَرَوٰى أَبُوْ دَاوُدَ مَعْنَاهُ

৩৮৩. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে শু'আইব (রা.) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর পিতামহ হতে বর্ণনা করেন যে, তার পিতামহ বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এক বেদুঈন এসে অজু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তিনবার করে ধৌত করে দেখালেন। অতঃপর বললেন, অজু এরূপই। যে ব্যক্তি এর উপর বাড়ায় সে মন্দ করে, সীমা অতিক্রম করে এবং জুলুম করে। –[নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্ ও আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَقَدْ اَسَاءَ وَتَعَدّٰى وَ ظَلَمَ -এর ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তি অজুর সময় তিনবারের বেশি অঙ্গ ধৌত করে তার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ এই তিনটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। এই তিনটির বিভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে। যথা—

- اَسَاءَ -এর অর্থ হলো শরিয়তের নিয়ম-নীতি অনুসরণের পরিপন্থি মন্দ কাজ করা।
- تَعَدّٰى অর্থ– শরিয়তের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করা আর ظُلْمٌ অর্থ– ছওয়াব কম প্রাপ্তির ব্যাপারে স্বীয় আত্মার উপর অবিচার করা ইত্যাদি।

وَعَنْ ٣٨٤ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ (رضـ) اَنَّهٗ سَمِعَ اِبْنَهٗ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْقَصْرَ الْاَبْيَضَ عَنْ يَمِيْنِ الْجَنَّةِ قَالَ اَىْ بُنَىَّ سَلِ اللّٰهَ الْجَنَّةَ وَتَعَوَّذْ بِهٖ مِنَ النَّارِ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّهٗ سَيَكُوْنُ فِىْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُوْنَ فِى الطُّهُوْرِ وَالدُّعَاءِ ـ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْدَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

৩৮৪. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি একদা তাঁর পুত্রকে এই বলে দোয়া করতে শুনলেন— "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জান্নাতের ডান দিককার সাদা প্রাসাদটির প্রার্থনা করছি।" তখন তিনি [আব্দুল্লাহ] বললেন, হে পুত্র ! তুমি আল্লাহর নিকট জান্নাত প্রার্থনা কর এবং দোজখ হতে মুক্তি চাও। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, অচিরেই এই উম্মতের মধ্যে এমন এক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হবে, যারা পবিত্রতা অর্জনে এবং দোয়া প্রার্থনায় বাড়াবাড়ি করবে। –[আহমদ, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ্]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : সাহাবী হযরত ইবনে মুগাফফাল (রা.) হতে তাঁর পুত্রকে জান্নাতের নির্দিষ্ট স্থানের জন্য দোয়া করতে নিষেধ করেছেন। কেননা, তা হলো নবীগণের জান্নাতের বাসস্থান। অথবা, সে নিজে যে আমল করে তাতে সে উক্ত জান্নাতে যাওয়ার উপযোগী হতে পারবে না সুতরাং এমন অসম্ভব আশা করা সীমা লঙ্ঘনের নামান্তর। অথবা, এ ধরনের আকাঙ্ক্ষা আদবের খেলাফ। অথবা, এ জন্য নিষেধ করেছেন যে, হয়তো সে এমন এক জান্নাতের আশা করছে, অথচ তার তাকদীরে রয়েছে এর বিপরীত একটি বেহেশত।

يَعْتَدُوْنَ فِى الطُّهُوْرِ وَالدُّعَاءِ -এর ব্যাখ্যা : পবিত্রতা অর্জনে বাড়াবাড়ি করার অর্থ হলো– অজু-গোসলে অকারণে পানির অপচয় না করা, শুধু সন্দেহের বশবর্তী হয়ে বারবার অঙ্গ ধৌত করা, অথবা মাসাহের স্থলে ধৌত করা।

আর দোয়ায় বাড়াবাড়ি করা হলো, লোক দেখানো দীর্ঘ মুনাজাত করা, নানাবিধ ভনিতার আশ্রয় গ্রহণ করা, অথবা মাসনূন দোয়াসমূহ বাদ দিয়ে ছন্দপূর্ণ বাক্যের মাধ্যমে দোয়া করা। অবশ্য অন্তরের আবেগ তাড়িত হয়ে কাব্যছন্দে মুনাজাত করা নিষেধ নয়। তথাপি মাসনূন দোয়া পরিত্যাগ করা ঠিক নয়।

وَعَنْ ٣٨٥ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ لِلْوُضُوْءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ الْوَلْهَانُ فَاتَّقُوْا وَسْوَاسَ الْمَاءِ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَلَيْسَ اِسْنَادُهٗ بِالْقَوِىِّ عِنْدَ اَهْلِ الْحَدِيْثِ لِاَنَّا لَا نَعْلَمُ اَحَدًا اَسْنَدَهٗ غَيْرُ خَارِجَةَ وَهُوَ لَيْسَ بِالْقَوِىِّ عِنْدَ اَصْحَابِنَا ـ

৩৮৫. অনুবাদ : হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— অজুর [মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার] জন্য একটি শয়তান আছে, তাকে "ওলাহান" বলা হয় ; কাজেই তোমরা [অজু করার সময়] পানির ওয়াসওয়াসা হতে বেঁচে থাকো। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্]

ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, এই হাদীসটি গরীব। হাদীসবিদদের নিকট এর সনদ শক্তিশালী নয়। কেননা, এটি খারিজা ইবনে মুসাব ব্যতীত অন্য কেউ মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। অথচ তিনি মুহাদ্দিসদের নিকট রাবী হিসাবে সবল নন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْوَلْهَان-এর অর্থ : وَلِهَ (س) يَوْلِهُ، وَلْهًا وَلْهَان শব্দটি হতে নির্গত। এটি صِفَتْ-এর সীগাহ্। মাসদারের অর্থ হলো– জ্ঞানশূন্য হওয়া, অস্থির হওয়া। এটা এমন শয়তানের নাম যে অজুর মধ্যে ধোঁকা দেয়। সে শুধু অজুর মধ্যে ধোঁকা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত। সে অজুকারীকে অস্থিরতার মধ্যে ফেলে দেয়। ফলে সে অজুকারী হাতমুখ বা পা কতবার ধৌত করল বা আদৌ ধৌত করল কি না? কিংবা অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পানি পৌছেছে কিনা? নানা প্রকার সংশয়ের মধ্যে নিপতিত হয়। এরূপ ধোকা হতে বাঁচার জন্য রাসূল ﷺ فاتقوا وسواس الماء বলে সতর্ক করেছেন।

وَعَنْ ٣٨٦ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رض) قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ مَسَحَ وَجْهَهُ بِطَرْفِ ثَوْبِهِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৩৮৬. অনুবাদ : হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি যে, যখন তিনি অজু করতেন তখন নিজের কাপড়রে কিনারা [পার্শ্ব] দিয়ে [নিজের] মুখমণ্ডল মুছতেন। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ بِاسْتِعْمَالِ الْمِنْدِيْلِ بَعْدَ الْوُضُوْءِ : **অজুর পর রুমাল ব্যবহার সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মতভেদ :**

مَذْهَبُ عَمْرِو بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى : হযরত আমর ইবনে আবী লায়লা (র.)-এর মতে, অজু করার পর রুমাল ব্যবহার করা মাকরূহ। তাঁর দলিল হলো—

١ ـ مَارَوَاهُ ابْنُ شَاهِيْنَ عَنْ اَنَسٍ (رض) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَكُنْ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالْمِنْدِيْلِ بَعْدَ الْوُضُوْءِ وَلَا اَبُوْبَكْرٍ وَلَا عُمَرُ وَلَا عَلِيٌّ وَلَا ابْنُ مَسْعُوْدٍ (رض) .

٢ ـ وَفِىْ رِوَايَةٍ اَنَّ مَاءَ الْوُضُوْءِ يُوْزَنُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ .

٣ ـ وَعَنْ مَيْمُوْنَةَ (رض) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اُتِىَ بِالْمِنْدِيْلِ فَلَمْ يَمْسَحْ بِهِ بَلْ مَسَحَ بِيَدِهِ .

مَذْهَبُ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَاَنَسٍ وَعُثْمَانَ (رض) وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ (رح) : হযরত হাসান, আনাস, ওসমান (রা.), সুফিয়ান ছাওরী ও মালেক (র.)-এর মতে, অজু করার পর রুমাল ব্যবহার করা মাকরূহ নয়; বরং جَائِزٌ بِلَا كَرَاهَتْ তাঁদের দলিল হলো—

١ ـ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رض) قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ اِذَا تَوَضَّأَ مَسَحَ وَجْهَهُ بِطَرْفِ ثَوْبِهِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

٢ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ خِرْقَةٌ يَنْشِفُ بِهَا اعْضَاءَهُ بَعْدَ الْوُضُوْءِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

مَذْهَبُ الْاَحْنَافِ : হানাফীদের মতে এটা মোস্তাহাব। কেননা, এতদসংক্রান্ত হাদীসগুলো সনদের দিক দিয়ে যদিও দুর্বল, তবু ফজিলতের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য দুর্বল হাদীসের উপর আমল করা জায়েজ।

اَلْجَوَابُ عَنْ اَدِلَّةِ الْمُخَالِفِيْنَ : আমর ইবনে আবী লাইলার হাদীসের জবাব—

১. তাঁর প্রথম হাদীস সম্পর্কে ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, এটি দুর্বল হাদীস।
২. দ্বিতীয় হাদীসের জবাব হলো, পানি না মোছলেও তা শুকিয়ে যাবে, সুতরাং ওজনের বেলায় তা মোছা না মোছার ভিন্ন কোনো বৈশিষ্ট্য নেই।
৩. হযরত মাইমুনা (রা.)-এর হাদীসের জবাব হলো, অজুর পানি না মোছাও যে বৈধ, তা বুঝানোর জন্য রাসূল ﷺ মোছেননি।

পরিশেষে বলা যায় যে, অজুর পরে হাত মোছা না মোছা উভয়ই প্রকার আমলই রাসূল ﷺ হতে বিদ্যমান রয়েছে।

وَعَنْ ٣٨٧ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خِرْقَةٌ يَنْشِفُ بِهَا اَعْضَائَهُ بَعْدَ الْوُضُوْءِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ لَيْسَ بِالْقَائِمِ وَاَبُوْ مُعَاذِ الرَّاوِىْ ضَعِيْفٌ عِنْدَ اَهْلِ الْحَدِيْثِ .

৩৮৭. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এক খণ্ড কাপড় ছিল, যা দ্বারা তিনি অজু করার পর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মুছে ফেলতেন। –[তিরমিযী] কিন্তু তিরমিযী (র.) বলেন, এ হাদীস সবল নয়। বর্ণনাকারী আবূ মুআয মুহাদ্দিসীনদের নিকট দুর্বল [অর্থাৎ, নির্ভরযোগ্য নন]।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٨٨ ثَابِتِ بْنِ اَبِىْ صَفِيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِاَبِىْ جَعْفَرٍ هُوَ مُحَمَّدُنِ الْبَاقِرُ حَدَّثَكَ جَابِرٌ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَثَلٰثًا ثَلٰثًا قَالَ نَعَمْ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ

৩৮৮. অনুবাদ : হযরত ছাবেত ইবনে আবূ সাফিয়্যাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি [আমার শিক্ষক] আবূ জাফর মুহাম্মদ বাকের [ইবনে যয়নুল আবেদীন]-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাকে কি হযরত জাবের (রা.) এই হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ অজু করেছেন একবার একবার, দু'বার দু'বার এবং তিনবার, তিনবার করে? [অর্থাৎ অজুর অঙ্গসমূহ এভাবে ধৌত করেছেন] তিনি জবাবে বললেন, হ্যাঁ। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : অজুর অঙ্গসমূহ একবার ধৌত করা ফরজ, আর তিনবার ধৌত করা সুন্নত। রাসূল ﷺ যখন একবার ধৌত করেছেন তখন তিনি ফরজের উপর আমল করে উম্মতকে দেখিয়েছেন, আর দু'বার করে ধুয়ে জায়েজের উপর আমল করেছেন। আর যখন তিনবার ধৌত করেছেন তখন সুন্নত পদ্ধতি শিক্ষা দান করার লক্ষ্যে করেছেন।

তাই সাব্যস্ত হলো যে, অজুর অঙ্গসমূহ একবার ধৌত করা ফরজ, দু'বার ধৌত করা জায়েজ, আর তিনবার ধৌত করা সুন্নত। বিনা প্রয়োজনে তিনবারের বেশি ধৌত করা মাকরূহ।

وَعَنْ ٣٨٩ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ (رض) قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَقَالَ هُوَ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ -

৩৮৯. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ অজু করলেন দু'বার করে [অর্থাৎ অজুর অঙ্গসমূহ দু'দুবার করে ধুইলেন] এবং বললেন এটা আলোর উপর আলো। –[রাযীন]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ দ্বারা উদ্দেশ্য : রাসূলুল্লাহ ﷺ অজুর অঙ্গসমূহ দু'বার ধৌত করে বলেছেন যে, এটা আলোর উপর আলো। এর ব্যাখ্যায় আল্লামা তীবী (র.) বলেন, মহানবী ﷺ এটা দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে,আমার উম্মতগণ অজুর প্রতি বেশি যত্নবান হওয়ার কারণে কিয়ামতের ময়দানে উজ্জ্বল হস্তপদবিশিষ্ট হবে। অথবা এর অর্থ হলো– ফরজের উপর সুন্নত তথা প্রথমবার ধোয়া ফরজ আর দ্বিতীয়বার ধোয়া সুন্নত। ফরজ এবং সুন্নতকে রূপকভাবে আলো বা নূর বলা হয়েছে।

وَعَنْ ٣٩٠ عُثْمَانَ (رض) قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأَ ثَلٰثًا ثَلٰثًا وَقَالَ هٰذَا وُضُوْئِىْ وَ وُضُوْءُ الْاَنْبِيَاءِ قَبْلِىْ وَ وُضُوْءُ اِبْرَاهِيْمَ - رَوَاهُمَا رَزِيْنُ وَالنَّوَوِىُّ ضَعَّفَ الثَّانِىَ فِىْ شَرْحِ مُسْلِمٍ -

৩৯০. অনুবাদ : হযরত ওসমান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অজু করলেন তিন তিনবার করে অতঃপর বললেন, এটাই হলো আমার এবং আমার পূর্ববর্তী নবীদের অজু এবং হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর অজু।–[ইমাম রাযীন এটিও এর পূর্ববর্তী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, কিন্তু ইমাম নববী (র.) শরহে মুসলিমে এই দ্বিতীয় হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ-হাদীসের ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনবার ধৌত করা যেমন আমাদের নবী ﷺ-এর সুন্নত, তেমনি তা হযরত ইব্রাহীম (আ.) সহ পূর্ববর্তী নবীদেরও সুন্নত, তাই অজুর সময় অঙ্গসমূহ তিনবার ধৌত করে নবীগণের সুন্নত অনুযায়ী চলা উচিত।

وَعَنْ ٣٩١ أَنَسٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ وَكَانَ اَحَدُنَا يَكْفِيْهِ الْوُضُوْءُ مَالَمْ يُحْدِثْ . رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

৩৯১. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাজের জন্য অজু করতেন, আর আমাদের এক অজুই যথেষ্ট যতক্ষণ পর্যন্ত, সে অজু ভঙ্গ না করে। –[দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : নবী করীম ﷺ প্রথম অবস্থায় প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাজের জন্য নতুন করে অজু করতেন। সম্ভবত এটা তাঁর জন্য ওয়াজিব ছিল। পরে তা মানসূখ হয়ে গেছে।
অথবা প্রত্যেক ওয়াক্তে যে অজু করা মোস্তাহাব তা বুঝাবার জন্য করেছেন।

وَعَنْ ٣٩٢ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيٰى بْنِ حَبَّانَ قَالَ قُلْتُ لِعُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَرَأَيْتَ وُضُوْءَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ لِكُلِّ صَلٰوةٍ طَاهِرًا كَانَ اَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ عَمَّنْ اَخَذَهُ فَقَالَ حَدَّثَتْهُ اَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ حَنْظَلَةَ بْنِ اَبِىْ عَامِرِ الْغَسِيْلِ حَدَّثَهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اَمَرَ بِالْوُضُوْءِ لِكُلِّ صَلٰوةٍ طَاهِرًا كَانَ اَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ فَلَمَّا شَقَّ ذٰلِكَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ وَ وُضِعَ عَنْهُ الْوُضُوْءُ اِلَّا مِنْ حَدَثٍ قَالَ فَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يَرٰى اَنَّ بِهٖ قُوَّةً عَلٰى ذٰلِكَ فَفَعَلَهُ حَتّٰى مَاتَ . رَوَاهُ اَحْمَدُ

৩৯২. অনুবাদ : মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে হাব্বান (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি ওবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আমাকে বলুন যে, আপনার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর যে প্রত্যেক নামাজে নতুন অজু করতেন, তিনি অজু অবস্থায় থাকুন বা না থাকুন। এটা তিনি কার নিকট হতে গ্রহণ করেছেন? ওবায়দুল্লাহ জবাবে বলেন, ইবনে ওমরকে [তার চাচাতো বোন] আসমা বিনতে যায়েদ ইবনে খাত্তাব (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হানযালা ইবনে আবূ আমের আলগাসীল (রা.) [সাহাবী] তাঁকে [আসমাকে] বলেছেন– প্রথমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রত্যেক নামাজের জন্য নতুন অজু করতে আদেশ দেওয়া হয়েছিল, অজুর সাথে থাকুন বা না থাকুন। অতঃপর যখন এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর কষ্টকর হয়ে পড়ল তখন তাঁকে প্রত্যেক নামাজের জন্য মিসওয়াক করতে আদেশ দেওয়া হলো এবং অজু ভঙ্গ হওয়া ব্যতীত অজু করার আদেশ রহিত করা হলো। হযরত ওবায়দুল্লাহ (রা.) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের এই ধারণা ছিল যে, তাঁর প্রত্যেক নামাজে অজু করার মতো পর্যাপ্ত শক্তি রয়েছে, সুতরাং তিনি তা মৃত্যু পর্যন্ত পালন করেছেন।–[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

غَسِيْلُ الْمَلَائِكَةِ-এর ঘটনা : হযরত হানযালা ইবনে আবূ আমের (রা.) স্ত্রী সহবাস করার পর গোসল করার পূর্বেই ওহুদের যুদ্ধের আহ্বান শুনে তাড়াহুড়া করে নাপাক অবস্থায়ই জিহাদে যোগ দেন এবং শহীদ হয়ে যান। তারপর যুদ্ধের ময়দানে হান্যালার লাশ খুঁজে পাওয়া যচ্ছিল না। এরপর বিস্ময়ের সহিত নবী করীম ﷺ দেখলেন, আকাশে ফেরেশতারা তাঁকে

গোসল করায়ে দুনিয়াতে পাঠাচ্ছেন। হুজুর ﷺ হানযালার স্ত্রীকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন, তিনি গোসল ফরজ অবস্থায় জিহাদে শরিক হয়ে শাহাদাত বরণ করেছেন। এ কারণে তিনি আল-গাসীল বা গাসীলুল মালায়িকা তথা ফেরেশতাদের দ্বারা গোসলকৃত উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন।

وَعَنْ ٣٩٣ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ مَاهٰذَا السَّرَفُ يَا سَعْدُ قَالَ اَفِى الْوُضُوْءِ سَرَفٌ قَالَ نَعَمْ وَاِنْ كُنْتَ عَلٰى نَهْرٍ جَارٍ - رَوَاهُ اَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ

৩৯৩. **অনুবাদ :** হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) হতে বর্ণিত। একদা নবী করীম ﷺ সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের নিকট দিয়ে গমন করছিলেন। তখন তিনি [সা'দ] অজু করছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে সা'দ! এভাবে অপব্যয় কেন করছ? তিনি বললেন, অজুতেও কি অপব্যয় রয়েছে? রাসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ, যদিও তুমি প্রবহমান নদীর তীরে অবস্থান কর না কেন। –[আহমদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْث -**হাদীসের ব্যাখ্যা :** অজুর মধ্যে অপব্যয় হলো অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করা। একই অঙ্গ বিনা প্রয়োজনে তিনবারের বেশি ধৌত করা অথবা অজু থাকা অবস্থায় কোনো ইবাদত মাকসূদা পালন না করে পুন: অজু করা।

وَعَنْ ٣٩٤ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَابْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ وَ ذَكَرَ اسْمَ اللّٰهِ فَاِنَّهُ يُطَهِّرُ جَسَدَهُ كُلَّهُ وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ لَمْ يُطَهِّرْ اِلَّا مَوْضِعَ الْوُضُوْءِ -

৩৯৪. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা, ইবনে মাসউদ এবং ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি অজু করে এবং তার সাথে আল্লাহর নাম স্মরণ করে, সে তার সমস্ত শরীরকে পবিত্র করে। আর যে ব্যক্তি অজু করে, অথচ আল্লাহর নাম স্মরণ করে না, সে শুধু অজুর স্থান পবিত্রকরণ ছাড়া আর কিছুই করে না। –[দারাকুতনী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْث **হাদীসের ব্যাখ্যা :** কিছু সংখ্যকের মতে অজুতে বিসমিল্লাহ বলা ওয়াজিব। হানাফীদের মতে সুন্নত। কেননা, ওয়াজিব হলে হাদীসে তা পরিত্যাগ করার কারণে অজু হবে না বলেই ঘোষণা প্রদান করা হতো, তাই উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, অজুতে বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নত। আর এটা এ জন্য পড়া জরুরি যে, তাহলে তার সমস্ত শরীর পবিত্র হয়ে যাবে।

وَعَنْ ٣٩٥ اَبِىْ رَافِعٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَوَضَّأَ وُضُوْءَ الصَّلٰوةِ حَرَّكَ خَاتَمَهُ فِىْ اِصْبَعِهِ - رَوَاهُمَا الدَّارَ قُطْنِىْ وَ رَوَى ابْنُ مَاجَةَ الْاَخِيْرَ

৩৯৫. **অনুবাদ :** হযরত আবূ রাফে' (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামাজের জন্য অজু করতেন তখন স্বীয় আঙ্গুলের আংটিকে নাড়াচাড়া করে দিতেন। [যাতে আংটির নিচেও পানি পৌঁছে]। –[দারাকুতনী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْث -**হাদীসের ব্যাখ্যা :** অজুর অঙ্গসমূহের মধ্যে যেন চুল পরিমাণও শুকনা না থাকে সেদিকে ভালো করে লক্ষ্য রাখতে হবে। কেননা এরূপ শুষ্ক থাকলে অজু হয় না। সুতরাং পুরুষ যদি আংটি আর মহিলা যদি চুড়ি বা আংটি পরিহিত থাকে তবে তা অজুর সময় ভালো করে নাড়াচাড়া করে নেবে।

بَابُ الْغُسْلِ
গোসলের বিবরণ

اَلْغُسْلُ শব্দের غَيْن -এর উপর তিন রকম হরকত দিয়ে তিনভাবে পড়া যায়। যেমন–

১. اَلْغُسْلُ [গাইন হরফে পেশ দিয়ে] তখন শব্দটি اِسْم হবে। আর অর্থ হবে– গোসল বা স্নান।

২. اَلْغَسْلُ [গাইন হরফে যবর দিয়ে] তখন শব্দটি মাসদার হবে। অর্থ– ধৌত করা।

৩. اَلْغِسْلُ [গাইন হরফে যের দিয়ে] তখন শব্দটি اِسْم হিসেবে ধৌত করার বস্তু বা পানি অর্থে ব্যবহৃত হবে। কারো কারো মতে اَلْغُسْلُ গাইন হরফে পেশ দিয়ে ধৌত করা ও ধৌত করার উপকরণ উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়।

مَعْنَى الْغُسْلِ اِصْطِلَاحًا : পারিভাষিক সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন— هُوَ سَيْلَانُ الْمَاءِ عَلَى الْبَدَنِ অর্থাৎ, শরীরে পানি প্রবাহিত করা।

মিরকাত প্রণেতার ভাষায়— سَيْلَانُ الْمَاءِ عَلَى الْبَدَنِ بِالتَّعْمِيْمِ بِالنِّيَّةِ অর্থাৎ, নিয়তের সাথে সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করা।

এক কথায় শরীরের যেসব স্থানে পানি পৌছানো সম্ভব, এ সব স্থানে পানি পৌছানো, তবে এর সাথে নিয়তের আবশ্যকতা রয়েছে। ফরজ গোসলের সময় নিয়ত একান্ত আবশ্যক, অন্যথা গোসল বিশুদ্ধ হবে না।

আলোচ্য অধ্যায়ে কি কি কারণে গোসল ফরজ হয় এবং কি পদ্ধতিতে গোসল করতে হয় তাই আলোচিত হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٩٦ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جَلَسَ اَحَدُكُمْ بَيْنَ شُعَبِهَا الْاَرْبَعَةِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَاِنْ لَمْ يُنْزِلْ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৯৬. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– যখন তোমাদের কেউ স্ত্রীলোকদের চারি শাখায় [দু'হাত ও দু'পায়ের মাঝে] বসে এবং বীর্যপাতের জন্য প্রয়াস চালায়, তখন তার উপর গোসল ফরজ হয়ে যায়; যদিও সে বীর্যপাত না করে থাকে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شُعَبِهَا الْاَرْبَعِ দ্বারা উদ্দেশ্য : شُعَبٌ শব্দটি شُعْبَةٌ -এর বহুবচন, এর অর্থ হলো– শাখা-প্রশাখা। উক্ত হাদীসে شُعَبِهَا الْاَرْبَعِ বা চার-শাখা দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে এ বিষয়ে হাদীস বিশারদগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে; যা নিম্নরূপ—

১. ইবনে দাকীকুলঈদ তার গ্রন্থে বলেছেন, এর অর্থ– স্ত্রীর দু'হাত ও দু পা। আর এ অর্থ বাস্তবতার অতি নিকটবর্তী। ২. কারো কারো মতে, স্ত্রীর দু'হাত ও দু'উরু। ৩. কেউ কেউ বলেন, স্ত্রীর দু'উরু ও দু'নিতম্ব। ৪. আবার কারো মতে, স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের পার্শ্ব। ৫. অপর একদলের মতে, স্ত্রীর দু'উরু ও জননেন্দ্রিয়ের দু'পার্শ্ব। কাজি ইয়ায (র.) ও এরূপ বলেছেন। তবে চার-শাখায় বসার অর্থ হলো– সঙ্গম করা।

مَتٰى يَجِبُ الْغُسْلُ গোসল কখন ওয়াজিব হয় ? এখানে তিনটি অবস্থা হতে পারে। প্রত্যেকটি অবস্থা ও তার বিধান নিম্নে প্রদত্ত হলো–

১. স্বপ্নদোষ, সহবাস, স্পর্শ, দেখা ইত্যাদি যে কোনো কারণে বীর্যপাত হলে সকল ইমামের ঐকমত্যে গোসল ফরজ হয়।

২. যদি শুধু যৌনকেলী করে, কিন্তু পুরুষাঙ্গ নারীর যৌনাঙ্গের ভিতরে প্রবিষ্ট না করে। আর রেতঃপাতও না হয়, তখন কারো মতেই গোসল ফরজ হয় না।

৩. যদি যৌনাঙ্গে পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ প্রবিষ্ট হয় এবং রেতঃপাত না হয় তবে এতে কিছুটা মতভেদ রয়েছে।

দাউদ যাহেরীর অভিমত : দাউদ যাহেরী, হযরত আনাস ও কোনো কোনো সাহাবীর মতে, এ তৃতীয় অবস্থায় গোসল ফরজ হয় না। তাঁদের দলিল রাসূলের বাণী– إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

জমহুরের অভিমত : অধিকাংশ সাহাবী, চার ইমাম ও তাবেয়ীদের মতে, পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ স্ত্রীর যৌনাঙ্গে প্রবেশ করালে গোসল ফরজ হয় রেতঃপাত হোক বা না হোক।

দলিল : إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إِذَا جَلَسَ اَحَدُكُمْ بَيْنَ شُعَبِهَا الْاَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَاِنْ لَمْ يُنْزِلْ

২. হযরত আয়েশা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসে এসেছে– إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ

তা ছাড়া অনেক সময় বীর্য বের হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে চেতনা নাও থাকতে পারে, কাজেই এরূপ অবস্থায় سَبَبٌ قَائِمٌ مَقَامَ مُسَبَّبٍ -এর সূত্রে উভয়ের উপর গোসল ফরজ হয়।

প্রতিপক্ষের জবাব : إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ হাদীসটি উবাই ইবনে কা'ব ইসলামের প্রথম যুগে বর্ণনা করেছেন, পরে এ হাদীস মানসূখ হয়ে গেছে।

আবার এটাও বলা হয় যে, এ হাদীস 'স্বপ্নদোষ' সংক্রান্ত অর্থাৎ স্বপ্নদোষ হয়েছে মনে করে কেউ যদি ঘুম থেকে উঠে কাপড়ে বা বিছানায় বীর্যের কোনো চিহ্ন না দেখে তখন তার উপর গোসল ফরজ হয় না। যেমন তিরমিযী শরীফে ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে— إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ فِى الْاِحْتِلَامِ

وَعَنْ ٣٩٧ أَبِىْ سَعِيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ . قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ مُحْيِى السُّنَّةِ رَحِمَهُ اللّٰهُ هٰذَا مَنْسُوْخٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ فِى الْاِحْتِلَامِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَلَمْ أَجِدْهُ فِى الصَّحِيْحَيْنِ

৩৯৭. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, পানির কারণেই পানির প্রয়োজন [অর্থাৎ বীর্যপাতের কারণেই গোসলের দরকার]। –[মুসলিম] ইমাম মহীউস সুন্নাহ বাগাবী (র.) বলেন– এ হাদীসটি রহিত হয়ে গেছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, পানির কারণেই পানির প্রয়োজন, কথাটির স্বপ্নদোষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রা.) বর্ণনা করেছেন, আমি এ হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে পাইনি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীসের প্রথম اَلْمَاءُ দ্বারা গোসলের পানি এবং দ্বিতীয় اَلْمَاءُ দ্বারা বীর্য বা রেতঃপাত উদ্দেশ্য। এখন পূর্ণ হাদীসের ভাষ্য হবে—

إِنَّمَا وُجُوْبُ إِسْتِعْمَالِ الْمَاءِ اَيِ الْغُسْلُ مِنْ اَجْلِ خُرُوْجِ الْمَاءِ اَيِ الْمَنِىِّ

অর্থ– রেতঃপাত হলে পানি দ্বারা গোসল করা ফরজ হবে। এর পূর্বে হযরত আবূ হুরায়রা এবং হযরত আয়েশা (রা.)-এর বর্ণিত, উক্ত দুই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর বর্ণিত এ হাদীস মানসূখ হয়ে গেছে।

وَعَنْ ٣٩٨ أُمِّ سَلَمَةَ (رضـ) قَالَتْ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِىْ مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَجْهَهَا وَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَوَ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ قَالَ نَعَمْ تَرِبَتْ يَمِيْنُكِ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَ زَادَ مُسْلِمٌ بِرِوَايَةِ أُمِّ سُلَيْمٍ أَنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيْظٌ اَبْيَضُ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيْقٌ اَصْفَرُ فَمِنْ اَيِّهِمَا عَلَا اَوْ سَبَقَ يَكُوْنُ مِنْهُ الشِّبْهُ ـ

৩৯৮. অনুবাদ : উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা উম্মে সুলাইম (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সত্য কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না। [অতএব আমিও বলতে লজ্জা করছি না] স্বপ্নদোষ হলে কি স্ত্রীলোকের উপর গোসল ফরজ হয়? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ। যখন সে [জাগ্রত হয়ে] পানি [বীর্য] দেখতে পায়। এতে উম্মে সালামা (রা.) লজ্জায় মুখ ঢাকলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! মেয়েলোকদের কি স্বপ্নদোষ হয়? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন– হ্যাঁ তোমার ডান হাত ধুলায় মলিন হোক। [কি আশ্চর্য] তা না হলে তার সন্তান তার সদৃশ হয় কিরূপে? –[বুখারী ও মুসলিম] কিন্তু ইমাম মুসলিম উম্মে সুলাইমের বর্ণনায় নিম্নোক্ত কথাগুলোও উল্লেখ করেছেন : [রাসূলুল্লাহ ﷺ এটাও বলেছেন—] পুরুষের বীর্য গাঢ় ও শুভ্র আর মেয়েলোকের বীর্য পাতলা ও হলুদবর্ণ। উভয়ের মধ্যে যেটির প্রাবল্য হয় অথবা যেটি জরায়ুতে আগে প্রবেশ করে সন্তান তারই সদৃশ হয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

أَوَ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ-এর ব্যাখ্যা : উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামার উক্ত উক্তির মাধ্যমে বুঝা যায় যে, তিনি মহিলাদের স্বপ্নদোষকে অস্বীকার করেন। এর উত্তর হলো স্বপ্নদোষ সাধারণত কু-চিন্তা হতে হয়ে থাকে। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিবিগণকে সম্ভবত আল্লাহ তা'আলা বিবাহের পূর্ব হতেই এই ধরনের কু-চিন্তা হতে বিশেষ হেফাজতে রেখেছেন। তাই তিনি এ ব্যাপারে অনবহিত থাকার কারণে এরূপ প্রশ্ন করেছেন।

تَرِبَتْ يَمِيْنُكِ -এর অর্থ : রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত উম্মে সালামা (রা.)-কে বলেছেন যে, তোমার ডান হাত ধুলায় মলিন হোক, এটা দ্বারা বদদোয়া করা উদ্দেশ্য নয়? এটা একটি প্রবাদ বাক্য মাত্র। আরবের লোকেরা আশ্চর্য ও বিস্ময়ের স্থলে এ ধরনের বাক্য উচ্চারণ করে থাকে। রাসূল ﷺ এটা বুঝাতে চেয়েছেন যে, তোমার মতো বয়স্কা ও প্রবীণ নারীর এ বিষয়ে অনবিজ্ঞ থাকা আশ্চর্যের ব্যাপার।

وَعَنْ ٣٩٩ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلٰوةِ ثُمَّ يُدْخِلُ اَصَابِعَهُ فِى الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا اُصُوْلَ شَعْرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلٰى

৩৯৯. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নাপাকীর গোসল করতে মনস্থ করতেন তখন প্রথমে দুই হাত ধুইতেন, অতঃপর নামাজের অজুর মতো অজু করতেন, অতঃপর আঙ্গুলসমূহ পানিতে ডুবাতেন এবং [ভিজা হাত দ্বারা] চুলের গোড়া খিলাল করতেন এবং দুই হাতের অঞ্জুলি ভরে তিনবার মাথার উপর পানি ঢালতেন। এরপর শরীরের সম্পূর্ণ ত্বককে

رَأْسِهِ ثَلٰثَ غُرَفَاتٍ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيْضُ الْمَاءَ عَلٰى جِلْدِهِ كُلِّهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ قَبْلَ اَنْ يُّدْخِلَهُمَا الْاِنَاءَ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِيْنِهِ عَلٰى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ .

পানি প্রবাহিত করতেন।-[বুখারী ও মুসলিম] কিন্তু মুসলিমের এক বর্ণায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন গোসল আরম্ভ করতেন তখন পাত্রে হাত প্রবেশ করার পূর্বে দুই হাত [কব্জি পর্যন্ত] ধুইয়ে নিতেন। অতঃপর ডান হাত দ্বারা বাম হাতে পানি ঢালতেন এবং তা দ্বারা পুরুষাঙ্গ ধুতেন, তারপর অজু করতেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** ফরজ গোসলের সময় নিয়ত সহকারে শরীরের সর্বাঙ্গে পানি পৌঁছানো একান্ত আবশ্যক, না হয় গোসল শুদ্ধ হবে না। চুলের গোড়ায় পানি ঠিক মতো পৌঁছে না বিধায় রাসূল ﷺ চুলের গোড়া খিলাল করতেন।

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَتْ مَيْمُوْنَةُ وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غُسْلًا فَسَتَرْتُهُ بِثَوْبٍ وَصَبَّ عَلٰى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ صَبَّ عَلٰى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ صَبَّ بِيَمِيْنِهِ عَلٰى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ فَضَرَبَ بِيَدِهِ الْاَرْضَ فَمَسَحَهَا ثُمَّ غَسَلَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ صَبَّ عَلٰى رَأْسِهِ وَاَفَاضَ عَلٰى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحّٰى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ فَنَاوَلْتُهُ ثَوْبًا فَلَمْ يَأْخُذْهُ فَانْطَلَقَ وَهُوَ يَنْفُضُ يَدَيْهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَفْظُهُ لِلْبُخَارِيِّ .

৪০০. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- [আমার খালা] উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা (রা.) বলেছেন, একবার আমি নবী করীম ﷺ-এর জন্য গোসলের পানি রাখলাম, অতঃপর একটা কাপড় দ্বারা তাকে পর্দা করলাম। তিনি প্রথমে নিজের দুই হাতের উপর পানি ঢাললেন এবং [কব্জি পর্যন্ত] হাতদ্বয় ধুইলেন। অতঃপর ডান হাত দ্বারা বাম হাতের ওপর [কিছু] পানি ঢাললেন এবং তা দ্বারা পুরুষাঙ্গ ধুয়ে নিলেন। এরপর হাত মাটিতে মারলেন এবং তা মুছে নিলেন। তারপর তা ধুয়ে নিলেন এরপর কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন এবং মুখমণ্ডল ও হাত [কনুই পর্যন্ত] ধুয়ে নিলেন। তারপর মাথার উপর পানি ঢাললেন এবং [সমস্ত] শরীরে পানি প্রবাহিত করলেন। তারপর তিনি সে স্থান হতে কিছু সরে গিয়ে উভয় পা ধৌত করলেন। অতঃপর আমি [পানি মুছে ফেলার জন্য] তাঁকে কাপড় দিলাম কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করলেন না; বরং তিনি হস্তদ্বয় ঝাড়তে ঝাড়তে চলে গেলেন। -[বুখারী ও মুসলিম ; তবে এর শব্দগুলো বুখারী শরীফের]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِىْ تَنْشِيْفِ الْمَاءِ بَعْدَ الْغُسْلِ **গোসল করার পর শরীর মোছা সম্পর্কে আলিমদের মতভেদ :** অধিকাংশ হানাফী উলামার মতে অজু বা গোসলের পরে ভিন্ন কাপড় দ্বারা পানি মুছে ফেলা মোস্তাহাব। তাঁরা হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসের অনুসরণ করেন। যেমন- তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন- "রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একখণ্ড কাপড় ছিল, অজুর পরে তিনি তা দ্বারা অঙ্গসমূহ মুছে ফেলতেন"। আবার কোনো কোনো হানাফী ও ইমাম শাফেয়ীর মতে, পানি মোছা মাকরূহ নয়, কিংবা সুন্নতও নয়। তাঁরা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীসের অনুসরণ করেন। তা ছাড়া অজু হলো নূর বা জ্যোতি, কাজেই তা না মোছাই ভালো। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ হানাফী ওলামা বলেন, এখানে হযরত আয়েশা

(রা.)-এর হাদীস অধিক সমর্থনযোগ্য। কেননা, তিনি হুজুরের নিত্যকার সাধারণ অভ্যাসের কথা বর্ণনা করেছেন। এতদ্ভিন্ন হযরত মায়মূনা (রা.) কর্তৃক হুজুর ﷺ-কে রুমাল এগিয়ে দেওয়া এটাই প্রমাণ করে যে, হুযূরের এ সময় হাত-মুখ ইত্যাদি মোছার অভ্যাস ছিল। তবে সে দিন রুমালটা কেন গ্রহণ করেননি, তার বিভিন্ন কারণ হতে পারে, যেমন– কাপড়টা সাধারণতঃ অপবিত্র ছিল, এটা হযরত মায়মুনা (রা.) জানতেন না; বরং হুজুর জানতেন। অথবা গ্রীষ্মের দিন ছিল দীর্ঘক্ষণ পানির শীতলতা উপভোগ করার জন্য শরীর মোছেননি, অথবা যাওয়ার জন্য ব্যস্ততা ছিল, অথবা না মোছাও জায়েজ প্রমাণের জন্য সেদিন রুমাল গ্রহণ করেননি। কাজেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়ভাবে হানাফীদের মতেরই সমর্থন পাওয়া যায়।

وَعَنْ ٤٠١ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ إِنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ مِنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيْضِ فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ ثُمَّ قَالَ خُذِىْ فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرِىْ بِهَا قَالَتْ كَيْفَ اَتَطَهَّرُ بِهَا فَقَالَ تَطَهَّرِىْ بِهَا قَالَتْ كَيْفَ اَتَطَهَّرُ بِهَا قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ تَطَهَّرِىْ بِهَا فَاجْتَذَبْتُهَا اِلَىَّ فَقُلْتُ تَبْتَغِىْ بِهَا اَثَرَ الدَّمِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪০১. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আনসারীদের এক মহিলা নবী করীম ﷺ-কে ঋতুস্রাবের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে গোসলের পদ্ধতি সম্পর্কে বলে দিলেন। অতঃপর বললেন, মেশকের সুগন্ধিযুক্ত এক খণ্ড কাপড় নিয়ে তা দ্বারা পবিত্রতা লাভ করবে। আনসারী মহিলা বলল, তার দ্বারা কিভাবে পবিত্রতা লাভ করব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তার দ্বারা পবিত্রতা লাভ করবে। সে পুনরায় বলল, তার দ্বারা কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন– সুবহানাল্লাহ [এটাও বুঝলে না!] তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে। হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, [রাসূলের কথা অনুধাবন করে] অতঃপর আমি মহিলাটিকে আমার দিকে টেনে নিলাম এবং [গোপনে] বললাম, [রক্তস্রাব শেষ হলে] তা দ্বারা [যৌনাঙ্গের ভিতরটা] মুছে রক্তের দাগ দূরীভূত করবে [ফলে দুর্গন্ধও দূর হয়ে যাবে]। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : হায়েযের গোসলের পর পাক হলেও লজ্জাস্থানের ভিতর রক্তের দাগ লেগে থেকে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করতে পারে। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত দাগ ও দুর্গন্ধ দূর করার জন্য একটি সুগন্ধিযুক্ত কাপড় ব্যবহার করতে পরামর্শ দিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ -এর مِسْك -এর মীম-এর নিচে যের হলে অর্থ হবে– প্রসিদ্ধ সুগন্ধি মেশক, আর যদি মীমের উপর যবর হয় তবে অর্থ হবে– পশমযুক্ত পুরাতন চামড়া। তবে এখানে শেষের অর্থটি বেশি যুক্তিযুক্ত। কেননা, সে যুগে মেশক সংগ্রহ করাটা অত্যন্ত দুঃসাধ্যের ব্যাপার ছিল।

وَعَنْ ٤٠٢ أُمِّ سَلَمَةَ (رضـ) قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اِمْرَأَةٌ اَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِىْ اَفَاَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ اِنَّمَا يَكْفِيْكِ اَنْ تَحْثِىْ عَلٰى رَأْسِكِ ثَلٰثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيْضِيْنَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِيْنَ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪০২. অনুবাদ : হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ রাসূল! আমি আমার চুলের বেণি শক্ত করে বাঁধি, অপবিত্রতার গোসলের সময় কি আমি তা খুলে ফেলব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, না ; বরং তুমি তোমার মাথার উপর তিন অঞ্জলি পানি ঢালবে [এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে]। অতঃপর তুমি সারা শরীরে পানি প্রবাহিত করবে এবং পবিত্রতা অর্জন করবে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : ফরজ গোসল খুব ভালোভাবে করতে হয়। শরীরের সর্বাঙ্গে পানি পৌঁছাতে হয়। একচুল পমিাণ জায়গা শুকনা থাকলেও গোসল শুদ্ধ হয় না। কোনো পুরুষ মাথায় বেণি বাঁধলে তা অবশ্যই খুলে ধৌত করতে হয়, নতুবা গোসল শুদ্ধ হয় না।

ইবনুল মালিক বলেন, এখানে তিন সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধতা উদ্দেশ্য নয়; বরং চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছানো উদ্দেশ্য। তা একবার বা তিনবারের বেশি যা দ্বারাই হোকনা কেন, তাতে আপত্তি নেই। তবে তিনবার পূর্ণ করা সুন্নত।

وَعَنْ ٤٠٣ أَنَسٍ (رضـ) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪০৩. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মুদ অর্থাৎ, প্রায় এক সের পানি দ্বারা অজু করতেন, আর এক সা হতে পাঁচ মুদ [অর্থাৎ, চার থেকে পাঁচ সের] পানি দ্বারা গোসল করতেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : মুদ ও সা' তৎকালীন আরবে ব্যবহৃত দু'টি পরিমাপক বস্তু, চার মুদে হয় এক সা'। আর ষাট সা'তে এক ওয়াসাক। এক সা' এর পরিমাণ প্রায় পৌনে চার সের। এ জন্য আমরা সদকায়ে ফিতর অর্ধ সা হিসেবে আদায় করি। একসের সাড়ে বারো ছটাক বা ১ কেজি ৬০০ গ্রাম আটা বা ময়দার মূল্য। তবে আরবের বিভিন্ন গোত্রে এর কিছুটা তারতম্য ছিল। উক্ত হাদীসে রাসূল ﷺ যে অজু গোসলে কম পানি ব্যবহার করতেন, তাই বুঝানো হয়েছে।

وَعَنْ ٤٠٤ مُعَاذَةَ قَالَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ فَيُبَادِرُنِيْ حَتّٰى أَقُوْلَ دَعْ لِيْ دَعْ لِيْ قَالَتْ وَهُمَا جُنُبَانِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪০৪. অনুবাদ : [মহিলা তাবেয়ী] হযরত মু'আযা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন– আমি ও রাসূলুল্লাহ ﷺ একই পাত্র হতে পানি নিয়ে গোসল করতাম। পাত্রটি আমার ও তাঁর মাঝে থাকত। যখন তিনি আমার আগে নিতেন, তখন আমি বলতাম, আমার জন্য পানি রাখুন।" হযরত মু'আযা (র.) বলেন, [উক্ত হাদীসে যে গোসলের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে,] তখন তারা উভয়ই ছিলেন অপবিত্র। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْاِخْتِلَافُ فِيْ فَضْلِ طُهُوْرِ الْمَرْأَةِ মেয়েলোকের ব্যবহৃত পানি হতে উদ্বৃত্ত পানি ব্যবহার সম্পর্কে মতভেদ : মেয়েলোকের ব্যবহার করার পর যে উদ্বৃত্ত পানি থাকে তা দ্বারা পুরুষের পবিত্রতা অর্জন বৈধ কি না এ বিষয়ে ইমামদের মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ—

مَذْهَبُ أَحْمَدَ وَ دَاوُدَ الظَّاهِرِيْ : ইমাম আহমদ ও দাউদ জাহেরীর মতে, মেয়েদের ব্যবহারের পর উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা পুরুষের পবিত্রতা অর্জন করা জায়েজ নয়। তাঁদের দলিল হলো–

١ . نَهَى النَّبِيُّ عَنْ فَضْلِ طُهُوْرِ الْمَرْأَةِ

অর্থাৎ, নবী করীম ﷺ মেয়েলোকের ব্যবহারের পর থেকে যাওয়া উদ্বৃত্ত পানি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন—

٢ . نَهَى النَّبِيُّ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طُهُوْرِ الْمَرْأَةِ .

مَذْهَبُ جُمْهُوْرِ الْأَئِمَّةِ : ইমাম আবূ হানীফা, শাফেয়ী, মালিকসহ সকল ইমামের মতে, মেয়েলোকের ব্যবহৃত উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা পুরুষের পবিত্রতা অর্জন করা জায়েজ আছে, যদিও তারা নির্জনে একাকী ব্যবহার করুক বা পুরুষের সম্মুখেই করুক।

তাদের দলিল হলো—

١ ـ عَنْ مُعَاذَةَ (رض) قَالَتْ عَائِشَةُ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ الخ

٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ اِغْتَسَلَ بَعْضُ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ جَفْنَةٍ فَاَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَتَوَضَّاَ مِنْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ كُنْتُ جُنُبًا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنَّ الْمَاءَ لَا يَجْنُبُ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ : জমহুরের পক্ষ হতে তাঁদের হাদীস দু'টির জবাবে বলা যায়— ইমাম বুখারীসহ হাদীসের ইমামগণ উক্ত হাদীসদ্বয়কে যা'ঈফ বলেছেন।

অথবা, তখন মেয়েলোকের ব্যবহারের পর উদ্বৃত্ত পানি প্রতি পুরুষের সংশয় বা ঘৃণাবোধ থাকার কারণে এরূপ নিষেধ করেছেন।

হযরত আয়েশা (রা.)-এর কথা حَتّٰى اَقُوْلَ دَعْ لِىْ দ্বারা উদ্দেশ্য : হযরত আয়েশা (রা.)-এর বাক্যটির অর্থ এ নয় যে, রাসূল ﷺ প্রথমে পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করতেন, আর আয়েশা (রা.) পরে গোসল করার জন্য কিছু পানি রেখে দেওয়ার জন্য তাঁকে অনুরোধ করতেন; বরং বাক্যটির অর্থ এই যে, তাঁরা উভয়ই একত্রে গোসল করতেন; কিন্তু রাসূল ﷺ গোসলের ক্ষেত্রে একটু তাড়াহুড়া করতেন। এতে হযরত আয়েশা (রা.) -এর সন্দেহ হতো যে, তাঁর গোসল সম্পন্ন হওয়ার পূর্বেই তিনি সব পানি ব্যবহার করে ফেলবেন কি না। আর এ জন্যই তিনি বলতেন, 'আমার জন্য পানি রাখুন' যাতে আমিও গোসল শেষ করতে পারি।

অথবা, স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশার্থে এ ধরনের উক্তি করেছেন।

وَهُمَا جُنُبَانِ-এর অর্থ : আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) বলেন, আমাদের ইমামদের মতে, যদি কোনো অপবিত্র ব্যক্তি কিংবা অজুবিহীন বা ঋতুবতী মহিলা অঞ্জলি ভরে পানি উঠানোর উদ্দেশ্যে পাত্রের মধ্যে হাত প্রবেশ করায় তবে উক্ত পানি ব্যবহৃত পানি হিসেবে পরিগণিত হয় না। কেননা, এখানে পানি হাত ঢুকানোর প্রয়োজন রয়েছে। তাঁরা এতে হাদীসটিকে দলিল হিসেবে পেশ করেন। এরপর ইবনে হুমাম (র.) বলেন, পক্ষান্তরে যদি কোনো অপবিত্র ব্যক্তি তার পা বা মাথা পাত্রে ঢুকায়, তবে সে পানি ব্যবহৃত পানিতে পরিণত হয়ে নষ্ট হয়ে যাবে। কেননা, তখন পা বা মাথা প্রবেশ করানোর প্রয়োজন ছিল না।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٤٠٥ - عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ اِحْتِلَامًا قَالَ يَغْتَسِلُ وَعَنِ الرَّجُلِ الَّذِىْ يَرٰى اَنَّهُ قَدْ اِحْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ بَلَلًا قَالَ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ قَالَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ هَلْ عَلَى الْمَرْاَةِ تَرٰى ذٰلِكَ غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ اِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْدَاوُدَ وَرَوَى الدَّارِمِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ اِلٰى قَوْلِهِ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ ـ

৪০৫. **অনুবাদ** : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, এক ব্যক্তি [জাগ্রত হয়ে বীর্যের] আর্দ্রতা পেয়েছে, অথচ স্বপ্নদোষের কথা মনে নেই, [সে কি করে?] রাসূল ﷺ বললেন, সে গোসল করবে। আর অপর এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, যার স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ আছে, অথচ সে বীর্যের আর্দ্রতা দেখতে পাচ্ছে না, [সে কি করবে?] তিনি বললেন, তার উপর গোসল ফরজ নয়। এমন সময় উম্মে সুলাইম জিজ্ঞসা করলেন, যে স্ত্রীলোক সেরূপ দেখে তার উপরও কি গোসল ফরজ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ, স্ত্রীলোকেরা পুরুষদেরই ন্যায়। –[তিরমিযী, আবূ দাঊদ] কিন্তু দারেমী ও ইবনে মাজাহ্ "তার উপর গোসল ফরজ নয়" পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْمَسَائِلُ الْمُتَعَلِّقَةُ **সংশ্লিষ্ট মাসায়েল :** হাদীসানুযায়ী অনেকগুলো মাসআলা নির্গত হয়। প্রথমঃ এর দু'টি অবস্থা—

ক. যদি পুরুষ বা নারীর ঘুম অবস্থায় স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ থাকে, কিন্তু জাগ্রত হয়ে তার কোনো চিহ্ন বা আর্দ্রতা দেখতে না পায় তবে সর্বসম্মতিক্রমে তার উপর গোসল ওয়াজিব হবে না।

খ. যদি কেউ জেগে আর্দ্রতা দেখতে পায়, তবে তাতে ১৪টি অবস্থা রয়েছে। যথা— ১. আর্দ্রতায় বীর্য হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া, ২. মযী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া, ৩. ওদী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া। ৪. মনী বা মযী হওয়ার ব্যাপারে সন্দিহান হওয়া। ৫. মযী বা ওদী হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হওয়া, ৬. মনী বা ওদী হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হওয়া, ৭. মনী, মযী বা ওদী হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হওয়া।

উপরোক্ত ৭টি অবস্থার প্রত্যেকটিতেই আবার দু'টি অবস্থা রয়েছে। তথা– (ক) স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ আছে, (খ) অথবা স্মরণ নেই। এতে সর্বমোট (৭ × ২ = ১৪) চৌদ্দটি অবস্থা হয়।

এ চৌদ্দটি অবস্থার মধ্যে ৭টি অবস্থায় হানাফী ইমামদের সর্বসম্মতিক্রমে গোসল করা ফরজ। সেই ৭টি অবস্থা এই– ১. আর্দ্রতা মনী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া এবং স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ থাকা, ২. মনী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া এবং স্বপ্নোদোষের কথা স্মরণ থাকা, ২. মনী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া এবং স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ না থাকা, ৩. মযী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া এবং স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ থাকা এবং ৪. ৫. ৬ এবং ৭ নং-এর চারটি অবস্থায় স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ থাকা।

আর নিম্নের চারটি অবস্থায় সর্বসম্মতিক্রমে গোসল করা ফরজ নয় :

১ ও ২. ওদী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া, স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ আছে বা নেই।

৩. মযী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া, কিন্তু স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ না থাকা।

৪. মযী বা ওদী সন্দেহ হওয়া, কিন্তু স্বপ্নদোষের কথা মনে থাকা।

আর নিম্নের এ তিনটি অবস্থায় গোসল ফরজ হওয়ার ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে, যার বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হলো– ১. যদি মযী ও মনী হওয়ার মধ্যে সন্দেহ হয়, ২. অথবা মনী ও ওদীর মধ্যে সন্দেহ হয়, কিংবা ৩. তিনটির মধ্যেই সন্দেহ হয়, এমতাবস্থায় স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ না পড়লে ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, গোসল করা ফরজ। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, গোসল করা ফরজ নয়।

ইমাম আহমদ (র.) বলেন, উপরোক্ত চৌদ্দটি অবস্থাতেই গোসল করা ফরজ। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, স্বপ্নদোষের কথা মনে পড়ুক বা না পড়ুক, মনী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হলেই গোসল ফরজ হবে।

اَلْفَرْقُ بَيْنَ الْمَنِيِّ وَالْمَذِيِّ وَالْوَدِيِّ **মনী, মযী ও ওদীর মধ্যকার পার্থক্য :**

১. পুরুষ বা স্ত্রীর কামভাবের সাথে যৌনাঙ্গ হতে যে তরল পদার্থ বের হয় তাকে মনী বলে, এটা বের হওয়ার পর যৌনাঙ্গ নিস্তেজ হয়ে যায়।

২. কামভাবের প্রাথমিক উত্তেজনায় যে পিচ্ছিল পদার্থ বের হয় তাকে মযী বলে। এটা বের হওয়ার পর উত্তেজনা আরো বাড়ে।

৩. আর কামভাব ছাড়া কোনো রোগের কারণে বা বোঝা বহনের ফলে কিংবা পেশাব-পায়খানার পূর্বে যৌনাঙ্গ দিয়ে যে পদার্থ বের হয় তাকে (ودى) ওদী বলা হয়।

إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ **-এর ব্যাখ্যা :** মহানবী ﷺ নারীগণকে পুরুষের মতো বলে আখ্যায়িত করেছেন। অর্থাৎ স্বভাব-চরিত্রে মহিলারা পুরুষেরই মতো। কেননা, হযরত হাওয়া (আ.)-কে হযরত আদম (আ.)-এর শরীরের অঙ্গ হতেই সৃষ্টি করা হয়েছে। উভয়ের স্বভাব এক রকম হওয়ার কারণে পুরুষের যেমন নিদ্রা হতে জাগ্রত হয়ে বীর্যের আর্দ্রতা দেখতে পেলে গোসল ফরজ হবে, তেমনি নারীরাও আর্দ্রতা দেখতে পেলে তাদের উপরও গোসল ফরজ হবে।

وَعَنْهَا ٤٠٦ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ فَعَلْتُهُ أَنَا وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاغْتَسَلْنَا - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

৪০৬. **অনুবাদ :** উক্ত হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– যখন [পুরুষের] খতনার স্থল [স্ত্রীলোকের] খতনার স্থল অতিক্রম করে, তখন গোসল করা ফরজ। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন– আমি ও রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ করেছি, অতঃপর আমরা গোসল করেছি।–[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের পটভূমিকা : আল্লামা ইবনে হামযা লিখিত اَلْبَيَانُ وَالتَّعْرِيْفُ কিতাবের বর্ণনা অনুযায়ী হাদীসটির পটভূমি এই যে, হযরত রিফায়া ইবনে রাফে বলেন, একদা আমি হযরত ওমর (রা.)-এর খেদমতে ছিলাম। তখন হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট বলা হলো যে, হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) মানুষকে ফতওয়া দেন যে, যে ব্যক্তি স্ত্রী সহবাস করে, কিন্তু তার মনী বের হয় না, তার উপর গোসল ফরজ হয় না। হযরত ওমর (রা.) বলেন, হে যায়েদ ! তুমি নিজের ধারণা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত দিতেছ। তখন হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার নিকট এরূপ ফতওয়া বর্ণনা করেছেন হযরত উবাই ইবনে কাব, আবূ আইয়ূব এবং রেফায়া। হযরত রিফায়া বলেন, এ সময় হযরত ওমর (রা.) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, রেফায়া! আপনি এই মর্মে কি বলেন– তখন হযরত রিফায়া বললেন, আমীরুল মু'মিনীন! আমরা রাসূলে কারীম ﷺ-এর যুগে এরূপ আমল করতাম এবং ঐকমত্য এই কথার উপর ছিল যে, إِنَّ الْمَاءَ لَا يَكُوْنُ إِلَّا مِنَ الْمَاءِ অর্থাৎ, মনী বাহির হওয়া ব্যতীত গোসল ওয়াজিব হয় না। কিন্তু হযরত আলী (রা.) ও হযরত মু'আয বলছিলেন উভয় যৌনাঙ্গ মিলিত হলেই গোসল ফরজ হবে। হযরত আলী (রা.)-এর প্রস্তাবে ব্যাপারটি স্পষ্ট হওয়ার জন্য হযরত হাফসার নিকট লোক প্রেরণ করা হলো। তখন হযরত হাফসা (রা.) বললেন, আমি এ বিষয়ে বলতে পারি না। অতঃপর হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট লোক প্রেরণ করা হলো। তখন হযরত আয়েশা (রা.) বললেন— إِذَا الْتَقَى الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ ﷺ ই রশাদ করেছেন, পুরুষের যৌনাঙ্গে অগ্রভাগ যোনির মধ্যে প্রবিষ্ট হলে গোসল ফরজ হবে। এর দ্বারা এটা বুঝা গেল যে, إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ হাদীসটি এ হাদীস দ্বারা مَنْسُوْخٌ হয়ে গেছে।

اَلْخِتَانُ-এর অর্থ : পুরুষের লজ্জাস্থানের খতনার জায়গাকে خِتَانٌ আর নারীর যোনির ভগাঙ্কুরের ছেদন স্থলকে خِفَاضٌ বলা হয়। এখানে উভয়কে تَغْلِيْبًا খিতান বলা হয়েছে। মূলত পুরুষাঙ্গের সম্মুখের অংশের চামড়া কেটে খতনা করা হয় বলে একে ختان বলা হয়।

وَعَنْ ٤٠٧ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَانْقُوا الْبَشَرَةَ - رَوَاهُ أَبُوْدَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَالْحَارِثُ بْنُ وَجِيْهِ الرَّاوِىْ وَهُوَ شَيْخٌ لَيْسَ بِذَاكَ -

৪০৭. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক চুলের নিচে নাপাকী রয়েছে। কাজেই তোমরা চুলগুলোকে ভালোভাবে ধৌত করো এবং গায়ের চামড়ার উপরিভাগ পরিষ্কার করো। –[আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ] ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এর বর্ণনাকারী হারেছ ইবনে ওয়াজীহ বয়]বৃদ্ধ ব্যক্তি। [বয়ঃবৃদ্ধতার কারণে স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়ায়] তিনি তেমন নির্ভরযোগ্য নন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ-হাদীসের ব্যাখ্যা : প্রত্যেক চুলের নিচে নাপাকী রয়েছে, এ কথাটির তাৎপর্য হলো– রক্ত হতেই শুক্র তৈরি হয়, যা শরীরের পুরো অংশে প্রবহমান। আর শুক্র ও রক্ত উভয়ই নাপাক। আর বীর্য নির্গত হওয়ার সময় সমস্ত শরীরে একটা উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, ফলে সমস্ত শরীর নাপাক হয়ে যায়। তাই শুক্র নির্গত হওয়ার পর সমস্ত শরীর ভালোভাবে ধৌত করতে হবে, একটি চুলও যেন শুকনা না থাকে।

فرائض الغسل গোসলের ফরজসমূহ : গোসলের ফরজ তিনটি– ১. ভালোভাবে কুলি করা, ২. ভালোভাবে নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করা ৩. এবং সমস্ত শরীর মর্দন করে ধৌত করা। ইমাম মালিক (র.) শরীর মর্দন করাকে ফরজ বলেছেন। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে, নিয়ত করা ও সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করা এ দু'টিই গোসলের ফরজ।

وَعَنْ ٤٠٨ عَلِيٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَرَكَ مَوْضَعَ شَعْرَةٍ مِّنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهَا كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ قَالَ عَلِيٌّ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِيْ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِيْ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِيْ ثَلٰثًا . رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَاَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ . اِلَّا اَنَّهُمَا لَمْ يُكَرِّرَا فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِيْ .

৪০৮. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– যে ব্যক্তি গোসল ফরজ হওয়ার পর একটি চুল পরিমাণ স্থানও না ধুয়ে ছেড়ে দেয় সে স্থানটিকে এরূপ এরূপ আগুনের শাস্তি দেওয়া হবে। এ কথা শুনে হযরত আলী (রা.) বলেন, সে সময় হতেই আমি আমার মাথার সাথে শত্রুতা করেছি। সে সময় হতেই আমি আমার মাথার সাথে শত্রুতা করেছি। সে সময় হতেই আমি আমার মাথার সাথে শত্রুতা করেছি। এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন। –[আবূ দাঊদ, আহমদ ও দারেমী] কিন্তু ইমাম আহমদ ও দারেমী "সে সময় হতেই আমি আমার মাথার সাথে শত্রুতা করছি" কথাটি বারবার উল্লেখ করেননি।

وَعَنْ ٤٠٩ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْدَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

৪০৯. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– নবী করীম ﷺ গোসল করার পর [পুনরায়] অজু করতেন না। –[তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ্]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : সাধারণত সুন্নত তরিকায় গোসল করলে গোসলের শুরুতে অজু করা হয়, তারপর গোসল করা হয়, তাই গোসলের পর অজুর প্রয়োজন নেই। এ ছাড়া গোসলের মাধ্যমে অজুর অঙ্গসমূহ ধৌত হয়ে যায় তাই দ্বিতীয়বার অজু করার দরকার নেই। রাসূল ﷺ গোসলের পর অজু করতেন না।

وَعَنْهَا ٤١٠ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ وَهُوَ جُنُبٌ يَجْتَزِئُ بِذٰلِكَ وَلَا يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ

৪১০. অনুবাদ : উক্ত হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– নবী করীম ﷺ খিতমী [এক প্রকার ঘাষ] দ্বারা নিজের মাথা ধৌত করতেন, অথচ তখন তিনি গোসল ফরজ অবস্থায় থাকতেন। এটাকেই যথেষ্ট মনে করতেন, মাথার উপর দ্বিতীয়বার পানি ঢালতেন না। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : তৎকালীন আরবের লোকেরা খিতমী নামক ঘাসকে সাবানের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করতেন। এটা সাবানের মতোই পরিষ্কার করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও খিতমী দ্বারা ধৌত করাকেই যথেষ্ট মনে করতেন। এরপর তিনি পুনঃ মাথায় পানি ঢালতেন না। এ জন্যই সাবানের পানি এবং জাফরানের পানি দ্বারা অজু-গোসল; বৈধ। যদি তাতে তরলতা বিদ্যমান থাকে।

وَعَنْ ٤١١ يَعْلَى (رضـ) قَالَ اِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى رَجُلًا يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَيٌّ سَتِيْرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالتَّسَتُّرَ فَاِذَا اغْتَسَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَفِيْ رِوَايَتِهٖ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ سَتِيْرٌ فَاِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّغْتَسِلَ فَلْيَتَوَارَ بِشَيْءٍ .

৪১১. অনুবাদ : হযরত ইয়া'লা [ইবনে মুররা] (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে খোলা জায়গায় উলঙ্গ হয়ে গোসল করতে দেখলেন। অতঃপর তিনি মিম্বরে উঠে আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতিবাদ ব্যক্ত করলেন। অতঃপর বললেন, আল্লাহ অত্যন্ত লজ্জাশীল ও অন্তরালকারী। তিনি লজ্জাশীলতা ও আড়ালে থাকাকে ভালোবাসেন। সুতরাং তোমাদের কেউ যদি খোলা জায়গায় গোসল করে তবে সে যেন নিজেকে আড়ালে রাখে অর্থাৎ পর্দা করে। –[আবূ দাউদ ও নাসায়ী] কিন্তু নাসায়ীর এক বর্ণনায় কিছু ব্যতিক্রমসহ আছে যে, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত পর্দাকারী। অতএব তোমাদের কেউ যদি গোসল করতে মনস্থ করে তবে সে যেন কোনো জিনিস দ্বারা নিজেকে আড়াল করে নেয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** খোলা জায়গায় পর্দার অন্তরাল ব্যতীত নগ্ন হয়ে গোসল করা জায়েজ নেই। তবে বস্ত্রাবৃত হয়ে গোসল করাতে দোষ নেই। মানুষের দৃষ্টি পড়তে পারে এমন উন্মুক্ত বা খোলা স্থানে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে গোসল করা হারাম। তবে নির্জন স্থান বা গোসলখানায় নগ্ন হয়ে গোসল করা জায়েজ আছে। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও বস্ত্রাবৃত হয়ে গোসল করা উত্তম।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤١٢ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ (رضـ) قَالَ اِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِيْ اَوَّلِ الْاِسْلَامِ ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْدَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ

৪১২. অনুবাদ : হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– পানির কারণেই পানি প্রয়োজন হয়। [অর্থাৎ গোসল ফরজ হয় বীর্যপাতের কারণেই।] এ কথাটি ইসলামের প্রথম যুগে [রেতঃপাতহীন সঙ্গমের পর গোসল না করার] অনুমতি স্বরূপ ছিল। অতঃপর তা হতে নিষেধ করা হয়েছে। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** ইসলামের প্রথম যুগে শুধু বীর্যপাত হলেই গোসল ফরজ হওয়ার বিধান ছিল। এমনকি সঙ্গম করার পর মনী বের না হলে গোসল ফরজ হতো না। কিন্তু পরবর্তীতে এ হুকুম রহিত হয়ে যায় এবং পুরুষাঙ্গ নারীর যৌনাঙ্গে প্রবেশ করলেই গোসল ফরজ হওয়ার বিধান দেওয়া হয়।

وَعَنْ ٤١٣ عَلِيٍّ (رض) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي اغْتَسَلْتُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَصَلَّيْتُ الْفَجْرَ فَرَأَيْتُ قَدْرَ مَوْضَعِ الظُّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْكُنْتَ مَسَحْتَ عَلَيْهِ بِيَدِكَ اَجْزَاكَ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

৪১৩. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– একদা এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে বলল, [হে আল্লাহর রাসূল!] আমি ফরজ গোসল করেছি এবং ফজরের নামাজ পড়েছি। অতঃপর দেখতে পেলাম যে, এক নখ পরিমাণ জায়গায় পানি পৌঁছেনি। [এতে আমার গোসল হয়েছে কি না?] জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যদি তুমি তার উপর দিয়ে তোমার [ভেজা] হাত দ্বারা মাসাহ করতে, তবে তাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট হতো। –[ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, যদি গোসলের সময় কোনো স্থান শুকনা থেকে যায়, তবে পরে ঐ স্থান ভিজিয়ে দিলেই চলবে। এমনিভাবে নাকে পানি দেওয়া এবং কুলি করতে ভুলে গেলে পরে শুধু ঐ কাজটা করে নিলেই চলবে, নতুনভাবে গোসল করতে হবে না। উক্ত অবস্থায় যে নামাজ পড়া হয়েছে তা পুনরায় আদায় করতে হবে।

وَعَنْ ٤١٤ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ كَانَتِ الصَّلٰوةُ خَمْسِيْنَ وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَغَسْلُ الْبَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَزَلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْأَلُ حَتّٰى جُعِلَتِ الصَّلٰوةُ خَمْسًا وَغُسْلُ الْجَنَابَةِ مَرَّةً وَغَسْلُ الثَّوْبِ مِنَ الْبَوْلِ مَرَّةً . رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ

৪১৪. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– নামাজ পঞ্চাশ ওয়াক্ত [ফরজ] ছিল, নাপাকীর গোসল সাতবার করা ফরজ ছিল এবং কাপড় হতে প্রস্রাব ধোয়ার বিধানও ছিল সাতবার। [মি'রাজ রজনীতে] রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর দরবারে তা কমানোর জন্য প্রার্থনা করতে থাকেন। অবশেষে নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ হয়, নাপাকীর গোসল ফরজ হয় একবার মাত্র এবং প্রস্রাব হতে কাপড় ধোয়া ফরজ হয় একবার। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, নামাজ কিছুদিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত ফরজ ছিল। মূলত তা নয়; বরং এর অর্থ হলো– মি'রাজ রজনীতে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজের বিধান দেওয়া হয়েছিল। পরে রাসূল ﷺ-এর প্রার্থনার কারণে তা কমানো হয়েছে। এমনিভাবে ফরজ গোসল সাতবার ছিল তথা গোসলে সাতবার ধৌত করতে হতো। তদ্রূপ কাপড়ে প্রস্রাব লাগলেও সাতবার ধৌত করার বিধান ছিল। রাসূল ﷺ-এর মি'রাজ রজনীতে বারবার প্রার্থনার কারণে তা কমিয়ে একবার ধোয়ার বিধান নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। তবে হানাফীদের মতে, 'পাক হয়েছে' বলে প্রবল ধারণা জন্মানো পর্যন্ত ধৌত করা ওয়াজিব। কমপক্ষে তা তিনবার হতে হবে।

بَابُ مُخَالَطَةِ الْجُنُبِ وَمَا يُبَاحُ لَهُ

অধ্যায় : অপবিত্র ব্যক্তির সাথে মেলামেশা এবং তার জন্য বৈধ কর্মসমূহ

اَلْجُنُبُ টি صِفَة -এর শব্দ, যা পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ, একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন সকল ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত। শাব্দিক অর্থ হলো– অপবিত্র। কোনো ব্যক্তি অপবিত্র হলে তখন বলা হয় أَجْنَبَ الرَّجُلُ অর্থাৎ, লোকটি অপবিত্র হয়েছে। এর إِسْم হলো اَلْجَنَابَةُ তথা অপবিত্রতা। এটি جَنْبٌ মূলধাতু হতে নির্গত। যার অর্থ হলো– اَلْبُعْدُ বা দূরীভূত হওয়া। যেহেতু অপবিত্র ব্যক্তিকে পবিত্রতা অর্জন ব্যতীত নামাজসহ অন্যান্য ইবাদত হতে দূরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়, তাই একে اَلْجَنَابَةُ বলা হয়েছে।

ইসলামপূর্ব যুগে লোকেরা ঋতুবতী ও প্রসূতি স্ত্রীদের সংস্রব হতে দূরে থাকত। কিন্তু ইসলাম একে অনুচিত ঘোষণা করেছে; বরং ঋতুবতী ও প্রসূতি নারীর সাথে উঠা-বসা, চলা-ফেরা, কথা-বার্তা, খাওয়া-দাওয়া, কোলাকুলি ইত্যাদি সব কাজ বৈধ। এমনকি সঙ্গম হতে সংযমে সক্ষম হলে একই বিছানায় তার সাথে রাত যাপনও বৈধ। এমনিভাবে জুনুবী ব্যক্তির সাথেও উল্লিখিত সকল কর্ম বৈধ।

◗ আল্লামা সিন্দী (র.) বলেন, মু'মিন ব্যক্তি জানাবাত অর্থাৎ, গোসল ফরজ হওয়ার কারণে এমন অপবিত্র হয় না যে, তার সাথে উঠা-বসা, কথা-বার্তা বন্ধ করে দিতে হবে।

উল্লেখ্য যে, নাজাসাত মোট পাঁচ রকম। যথা—

১. نَجَاسَةٌ حَقِيْقِيَّةٌ عَارِضِيَّةٌ مَرْئِيٌّ যেমন– পায়খানা।
২. نَجَاسَةٌ حَقِيْقِيَّةٌ عَارِضِيَّةٌ غَيْرُ مَرْئِيٍّ যেমন– পেশাব।
এ দু'টি হতে পবিত্রতা হলো উভয়টিকে ধৌত করে পরিষ্কার করা।
৩. نَجَاسَةٌ حَقِيْقِيَّةٌ ذَاتِيَّةٌ যেমন– শূকর। এটা পবিত্র করার কোনো ব্যবস্থা নেই।
৪. نَجَاسَةٌ حَقِيْقِيَّةٌ ذَاتِيَّةٌ بَدَنِيَّةٌ যেমন– جَنَابَةٌ যা থেকে গোসল বা তায়াম্মুমের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা যায়।
৫. نَجَاسَةٌ ذَاتِيَّةٌ حُكْمِيَّةٌ إِعْتِقَادِيَّةٌ যেমন– نَجَاسَةُ الْمُشْرِكِ

একজন জুনুবী বা ঋতুবতী নারীর সাথে কি পর্যায়ের মেলামেশা বৈধ, আলোচ্য অধ্যায়ে সে সংক্রান্ত হাদীসসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٤١٥ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ لَقِيَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَخَذَ بِيَدِيْ فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتّٰى قَعَدَ فَانْسَلَلْتُ فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ .

৪১৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমার সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাক্ষাত হলো, তখন আমি গোসল ফরজের অবস্থায় ছিলাম। তিনি আমার হাত ধরলেন, অতঃপর আমি তাঁর সাথে চলতে থাকলাম। অবশেষে তিনি একজায়গায় বসলেন। তখন আমি চুপি চুপি সরে পড়লাম এবং [নিজের] বাসস্থানে এসে গোসল করলাম। অতঃপর পুনরায় তাঁর খেদমতে হাজির হলাম। তখনও তিনি [সেখানে] বসেছিলেন। তিনি বললেন, হে আবূ হুরায়রা ! এতক্ষণ কোথায় ছিলে? আমি তাঁকে ব্যাপারটি বললাম। শুনে তিনি বললেন, সুব্হানাল্লাহ্ ! কি আশ্চর্য ! মু'মিন তো [কখনো] অপবিত্র হয় না।

هٰذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَلِمُسْلِمٍ مَعْنَاهُ وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ فَقُلْتُ لَهُ لَقَدْ لَقِيْتَنِيْ وَاَنَا جُنُبٌ فَكَرِهْتُ اَنْ اُجَالِسَكَ حَتّٰى اَغْتَسِلَ وَ كَذَا الْبُخَارِيُّ فِيْ رِوَايَةٍ اُخْرٰى .

এটা বুখারীর বর্ণনা। এর ভাবার্থ ইমাম মুসলিমও বর্ণনা করেছেন এবং বুখারীর কথার পর এ কথাটি অধিক বর্ণনা করেছেন— আমি উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললাম, যখন আপনার সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো, তখন আমি গোসল ফরজের অবস্থায় ছিলাম। অতএব গোসল না করে আপনার সাথে বসতে অপছন্দ করলাম। বুখারীর অপর এক বর্ণনায়ও এরূপ রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجَسُ **-এর অর্থ :** গোসল ফরজ হওয়ার কারণে মু'মিনের শরীর অপবিত্র হয় না। কেননা, এ অপবিত্রতা حُكْمِيْ তথা বিধানগত মৌলিক নয়। কাজেই যদি অপবিত্র ব্যক্তি কোনো কূপের বা চৌবাচ্চার পানিতে হাত প্রবেশ করায়, তবে তাতে পানি অপবিত্র হবে না যদি তার হাতে ভিন্ন কোনো অপবিত্র বস্তু না থাকে। এমনিভাবে অপবিত্র ব্যক্তির ঘামও পবিত্র। অতএব অপবিত্র ব্যক্তির সাথে করমর্দন ও কোলাকুলি করা জায়েজ আছে। যেমন– পরবর্তী এক হাদীসে আছে যে, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ গোসল করে এসে আমাকে আলিঙ্গন করতেন, অথচ তখনও আমি গোসল করে পবিত্র হইনি।

طَهَارَةُ الْاَبْدَانِ مُخْتَصٌّ بِالْمُؤْمِنِ اَمْ مُشْتَمِلٌ لِلْكَافِرِ শরীরের পবিত্রতা মু'মিনের জন্য নির্দিষ্ট না কাফিরও এর অন্তর্ভুক্ত : আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত বিধানটি শুধু মু'মিন বান্দার জন্য নির্দিষ্ট নয়, এতে কাফিররাও অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহর বাণী– اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ -এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে– কাফিররা নিজেদের খারাপ আকীদা ও মন্দ বিশ্বাসের কারণে বিধানগত অপবিত্র। কুফরির দরুন তাদের শরীর অপবিত্র নয়। হাদীসে বর্ণিত আছে, সুমামা ইবনে উসাল ইসলাম গ্রহণের পূর্বে রাসূল ﷺ তাঁর সাথে মসজিদে নববীতে বসে কথাবার্তা বলেছেন।

বনী সাকীফ গোত্রের লোকজন ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে মসজিদে বসে রাসূল ﷺ-এর সাথে কথাবার্তা বলেছিলেন। কুফরির কারণে কাফিররা আত্মিকভাবে অপবিত্র হলেও দৈহিকভাবে অপবিত্র নয়। তবে হাদীসের মধ্যে মুসলিম শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্বের কারণে। মু'মিনা ঋতুবতী নারীর হুকুমও জুনূবী পুরুষের মতো।

এতদ্ভিন্ন মু'মিনের শরীর অধিকাংশ সময় পবিত্র থাকে। আর কাফিররা পাক-নাপাকের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না, তাই তারা অধিকাংশ সময় নাপাক থাকে। কুরআনে তাই তাদের 'নাজাস' বলা হয়েছে।

হযরত কাতাদা (রা.) বলেন, কাফিররা নাপাকী হতে পবিত্রতা অর্জন করে না বা করতে জানে না, তাই তারা 'নাজাস'। এ ছাড়া তাদের শরীর নাপাক জিনিসে গঠিত। কেননা, তাদের অধিকাংশ খাদ্যই নাপাক।

এ জন্য হযরত হাসান বসরী (র.) বলেছেন, মুশরিকের সাথে করমর্দন করার পর অজু করা উচিত।

তবে অধিকাংশ আলিমের মত হলো, উল্লিখিত আয়াতের দ্বারা মু'মিনদেরকে কাফিরদের সাথে অধিক সখ্যতা ও মাখামাখি না করার জন্য বলা হয়েছে; বরং তাদের সংসর্গ হতে দূরে থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

---

٤١٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ تُصِيْبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪১৬. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা [আমার পিতা] ওমর ইবনুল খাত্তাব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বললেন যে, রাতে তাঁর গোসল ফরজ হয়, [তখন তিনি কি করবেন ?] রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, তখন তুমি অজু করবে এবং তোমার পুরুষাঙ্গ ধৌত করবে, অতঃপর ঘুমাবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

هَلْ يَجِبُ الْوُضُوْءُ وَغَسْلُ الذَّكَرِ لِلْجُنُبِ قَبْلَ نَوْمِهِ **জুনুবী ব্যক্তির জন্য নিদ্রার পূর্বে অজু করা ও পুরুষাঙ্গ ধৌত করা ওয়াজিব কি না?**

مَذْهَبُ دَاوُدَ الظَّاهِرِيِّ وَابْنِ حَبِيْبِ الْمَالِكِيِّ : দাঊদ যাহেরী ও ইবনে হাবীব মালেকী (র.)-এর মতে, গোসল ফরজ অবস্থায় নিদ্রার পূর্বে অজু করা ও যৌনাঙ্গ ধৌত করা ওয়াজিব। তাঁদের দলিল—

١. كَمَا فِىْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ .

٢. عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ .

مَذْهَبُ اَئِمَّةِ الْاَرْبَعَةِ : মাযহাব চতুষ্টয়ের ইমাম ও জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে জুনুবী ব্যক্তির জন্য নিদ্রার পূর্বে অজু করা ও পুরুষাঙ্গ ধৌত করা মোস্তাহাব, –ওয়াজিব নয়। তাঁদের দলিল—

١. كَمَا رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَ اَبُوْ عَوَانَةَ "اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ اِنَّمَا اُمِرْتُ بِالْوُضُوْءِ اِذَا قُمْتُ اِلَى الصَّلٰوةِ" .

٢. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا رَجَعَ مِنَ الْمَسْجِدِ صَلّٰى مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ مَالَ اِلٰى فِرَاشِهِ وَاِلٰى اَهْلِهِ فَاِنْ كَانَتْ حَاجَةً قَضَاهَا ثُمَّ يَنَامُ وَلَا يَمَسُّ الْمَاءَ .

٣. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْنُبُ ثُمَّ يَنَامُ وَلَا يَمَسُّ مَاءً حَتّٰى يَقُوْمَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَيَغْتَسِلُ .

اَلْجَوَابُ عَنْ اَدِلَّةِ الْمُخَالِفِيْنَ :

১. জমহুরের পক্ষ হতে হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসের জবাবে বলা হয় যে, উল্লিখিত হাদীসে تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ কথাটি মোস্তাহাব হিসেবে,–ওয়াজিব হিসেবে নয়।

২. হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসের জবাব হলো, এটা মোস্তাহাব হিসেবে রাসূল ﷺ মাঝে মাঝে করতেন। তবে রাসূল ﷺ জুনূবী অবস্থায় অজু করতেন تَخْفِيْفُ النَّجَاسَةِ -এর জন্য। যেমন বর্ণিত আছে—

كَمَا قَالَ شَدَّادُ بْنُ اَوْسٍ بِاَنَّ الْوُضُوْءَ نِصْفُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ .

وَعَنْ ٤١٧ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا كَانَ جُنُبًا فَاَرَادَ اَنْ يَاْكُلَ اَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪১৭. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -এর যখন গোসল ফরজ হতো এবং তিনি কিছু খেতে বা ঘুমাতে ইচ্ছা করতেন তখন তিনি অজু কতেন ; আর তা হতো নামাজের অজুর ন্যায়। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** স্ত্রী সহবাস কিংবা স্বপ্নদোষের কারণে শরীর নাপাক হয়ে গেলে গোসল করার পূর্বে পানাহার এবং নিদ্রাগমনের বা অন্য কোনো কর্মের উদ্দেশ্যে অজু করে নেওয়া মোস্তাহাব। এমনিভাবে লজ্জাস্থান ধৌত করে নেওয়াও মোস্তাহাব।

وَعَنْ ٤١٨ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتٰى اَحَدُكُمْ اَهْلَهُ ثُمَّ اَرَادَ اَنْ يَعُوْدَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوْءً . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪১৮. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— যখন তোমাদের কেউ নিজ স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, অতঃপর তা আবারও করতে ইচ্ছা করে, তবে সে যেন উভয় সহবাসের মাঝখানে একবার অজু করে নেয়। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

هَلْ يَجِبُ الْوُضُوْءُ بَيْنَ الْجِمَاعَيْنِ দু'বার স্ত্রীসঙ্গমের মাঝখানে অজু করা ওয়াজিব কি না?

مَذْهَبُ أَهْلِ الظَّاهِرِ وَابْنِ حَبِيْبِ الْمَالِكِيِّ : দাউদ যাহেরী ও ইবনে হাবীব মালেকী (র.)-এর মতে, দু' সঙ্গমের মাঝখানে অজু করা ওয়াজিব। তাঁদের দলিল— ١- إِنَّهُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ .... ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُوْدَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوْءً.

مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ : মাযহাব চতুষ্টয়ের ইমামসহ সকল ইমামের মতে, দু' সঙ্গমের মধ্যখানে অজু করা ওয়াজিব নয়; বরং মোস্তাহাব। কেননা, অন্য হাদীসে এসেছে যে, فَإِنَّهُ أَنْشَطُ إِلَى الْعَوْدِ অর্থাৎ, দ্বিতীয়বার অজু করা সঙ্গম করার পক্ষে তৃপ্তিদায়ক, সে হিসেবে অজু করার কথা বলা হয়েছে ; ওয়াজিব হিসেবে নয়।

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ : তাঁদের জবাবে বলা যায় যে, যদি উভয় সঙ্গমের মাঝে অজু ওয়াজিবই হতো; তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ তা কখনো ছাড়তেন না। আর فَإِنَّهُ أَنْشَطُ إِلَى الْعَوْدِ দ্বারা বুঝা যায় যে, অজু তৃপ্তিদায়ক হিসেবে বলা হয়েছে, ওয়াজিব হিসেবে নয়।

وَعَنْ ٤١٩ أَنَسٍ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَطُوْفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪১৯. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ এক রাতে তাঁর একাধিক বিবির নিকট গমন [সহবাস] করতেন [এবং শেষে] একই গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা হাসিল করতেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : অর্থাৎ, একই রাতে একাধিক স্ত্রীর সাথে সহবাসে মিলিত হতেন। আর সে জন্য একবারই গোসল করতেন। তবে মধ্যখানে মোস্তাহাব হিসেবে অজু করতেন।

هَلِ الْقِسْمَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ নবী ﷺ-এর উপর স্ত্রীদের মাঝে পালা বণ্টন করা ওয়াজিব কি না? একাধিক স্ত্রী থাকলে সে ক্ষেত্রে পালাক্রমে প্রত্যেক স্ত্রীর কাছে ন্যূনতম একরাত করে অবস্থান করা ওয়াজিব। কিন্তু রাসূল ﷺ পালা নির্ধারণ না করে কিভাবে একই রাতে সমস্ত স্ত্রীর সাথে সহবাস করলেন। নিম্নে এই বিষয়ে আলোচনা করা হলো–

১. মহানবী ﷺ-এর পালা নির্ধারণ করা বা তা রক্ষা করা আদৌ ওয়াজিব ছিল কি না? তার ব্যাপারে মতভেদ আছে।

২. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, পালা নির্ধারণ করা হুজুর ﷺ-এর উপর ওয়াজিব ছিল না, তবে তিনি অনুগ্রহপূর্বক স্বেচ্ছায় নিজের তরফ হতে তাদের মধ্যে সমান ব্যবহার করতেন।

৩. অধিকাংশ ওলামার মতে, তাঁর উপরও পালা নির্ধারণ করা ওয়াজিব ছিল বটে। তবে তিনি তাদের (স্ত্রীদের) অনুমতি ক্রমেই এরূপ করতেন।

৪. আল্লামা শওকানী (র.) বলেন, সম্ভবত হুজুর ﷺ কোনো সফরে যাওয়ার আগে বা সফর হতে আগমন করে কারো জন্য পালা বা দিন তারিখ নির্ধারণ করার পূর্বেই একরাতে স্ত্রীদের সাথে সহবাস করেছেন। এটা ছাড়া অন্য কোনো কারণও হতে পারে।

৫. ইবনুল আরাবী (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ-এর জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করেছিলেন যে, যখন তাঁর বিবিদের মধ্য হতে কারো জন্য কোনো পালা নির্ধারণ ছিল না। মুসলিম শরীফে রয়েছে যে, সে সময়টি ছিল আসরের পরের সময়।

৬. অথবা সেদিন যার পালা ছিল তার থেকে অনুমতি নিয়েই তিনি এরূপ করেছিলেন। শায়খ ওসমানী বলেন, তা ছিল বিদায় হজের ইহরাম বাঁধার পূর্বেকার সময়।

أَسْمَاءُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ الْمُطَهَّرَاتِ মহানবী ﷺ-এর পবিত্রতমা স্ত্রীগণের মুবারক নাম : ওলামায়ে কেরাম এ কথার উপর একমত যে, রাসূল ﷺ-এর স্ত্রীর সংখ্যা ছিল মোট এগারো জন। তাঁরা হলেন– ১. হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা.), ২. আয়েশা সিদ্দীকা (রা.), ৩. হাফসা (রা.), ৪. উম্মু হাবীবা (রা.), ৫. উম্মু সালামা (রা.), ৬. সাওদা (রা.), ৭. যায়নাব (রা.), ৮. মায়মূনা (রা.), ৯. উম্মুল মাসাকীন [যায়নাব] (রা.), ১০. জুওয়ায়রিয়া (রা.), ১১. সাফিয়্যা (রা.)।

وَعَنْ ٤٢٠ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى كُلِّ اَحْيَانِهٖ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَحَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ سَنَذْكُرُهُ فِىْ كِتَابِ الْاَطْعِمَةِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى ـ

৪২০. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ সর্বদা আল্লাহ তা'আলার স্মরণ করতেন [এমনকি জানাবতের অবস্থায়ও]। –[মুসলিম]

আর [এ সংক্রান্ত] হযরত ইবনে আব্বাসের হাদীস আমি 'খাওয়া দাওয়া' পর্ব বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْحَدِيْثَيْنِ দুই হাদীসের মধ্যকার দ্বন্দ্ব : উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সার্বক্ষণিকভাবে জিকির করতেন। এমনকি সহবাসের পর জানাবত অবস্থায়ও জিকির করতেন। অথচ অন্য হাদীসে তিনি বলেছেন— اِنِّىْ كَرِهْتُ اَنْ اَذْكُرَ اللّٰهَ اِلَّا عَلٰى طُهْرٍ এতে বুঝা যায় তিনি শুধু পবিত্র অবস্থায় জিকির করতেন। ফলে উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। যার সমাধান নিম্নরূপ—

১. كَرِهْتُ اَنْ اَذْكُرَ اللّٰهَ দ্বারা উদ্দেশ্য এই কথা বুঝানো যে, অপবিত্রতাবস্থায় জিকির না করা উত্তম। আর كُلِّ اَحْيَانِهٖ দ্বারা পবিত্র-অপবিত্র সর্বাবস্থায় জিকিরের বৈধতা প্রমাণিত।

২. অথবা كَرِهْتُ اَنْ اَذْكُرَ اللّٰهَ দ্বারা মৌখিক জিকির উদ্দেশ্য। আর كُلِّ اَحْيَانِهٖ দ্বারা অন্তরের জিকির উদ্দেশ্য।

৩. অথবা اَحْيَانِهٖ-এর ه সর্বনামটি দ্বারা রাসূল ﷺ উদ্দেশ্য নয় ; বরং জিকির উদ্দেশ্য। অর্থাৎ জিকিরের জন্য যে নির্ধারিত সময় রয়েছে সে সময়ে রাসূল ﷺ জিকির করতেন।

৪. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) বলেন, كَرِهْتُ দ্বারা স্বভাবগত ভাবে অপছন্দ করা উদ্দেশ্য, যা শরয়ী বৈধতার বিপরীত। আর يَذْكُرُ اللّٰهَ-এর হাদীসে বৈধতার বর্ণনা করা উদ্দেশ্য, আর এ বৈধতার দলিল হলো— اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ الخ ـ

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤٢١ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ اغْتَسَلَ بَعْضُ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ جَفْنَةٍ فَاَرَادَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّتَوَضَّأَ مِنْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ كُنْتُ جُنُبًا فَقَالَ اِنَّ الْمَاءَ لَا يَجْنُبُ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْدَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَ رَوَى الدَّارِمِىُّ نَحْوَهُ وَفِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ عَنْهُ عَنْ مَيْمُوْنَةَ بِلَفْظِ الْمَصَابِيْحِ ـ

৪২১. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর বিবিদের মধ্যে কেউ কেউ [মায়মুনা] একটি গামলায় [গামলা হতে পানি নিয়ে] গোসল করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তা হতে পানি নিয়ে অজু করতে চাইলেন, তখন বিবি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো নাপাক ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন– 'পানি নাপাক হয় না'। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ্]

ইমাম দারেমীও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর শরহে সুন্নাহতে মাসাবীহে উল্লিখিত হাদীসের ভাষা সহকারে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এটা [তাঁর খালা] হযরত মায়মূনা হতে বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, কারো ব্যবহারের পর উদ্বৃত্ত পানি নাপাক হয় না। এমনকি ব্যবহারকারী যদি অপবিত্রও হয় তথাপি তার ব্যবহারের কারণে পানি নাপাক হয় না। তবে তার ব্যবহৃত পানির কিছু অংশ যদি তাতে পড়ে তবে তা مَاءٌ مُسْتَعْمَلٌ হিসেবে পরিণত হয়ে যায়। আর مَاءٌ مُسْتَعْمَلٌ স্বয়ং পবিত্র হলেও অন্যকে পবিত্রকারী নয়।

وَعَنْ ٤٢٢ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ يَسْتَدْفِئُ بِيْ قَبْلَ أَنْ أَغْتَسِلَ - رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَ رَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ وَفِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ بِلَفْظِ الْمَصَابِيْحِ -

৪২২. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ [মাঝে মাঝে] নাপাকীর গোসল করতেন। অতঃপর গরম হওয়ার জন্য আমার গোসল করার পূর্বেই আমাকে জড়িয়ে ধরতেন। –[ইবনে মাজাহ, তিরমিযীও এরূপ বর্ণনা করেছেন। আর শরহে সুন্নাহ গ্রন্থে মাসাবীহে উল্লিখিত হাদীসের ভাষা সহকারে বর্ণিত হয়েছে।]

وَعَنْ ٤٢٣ عَلِيٍّ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ فَيُقْرِئُنَا الْقُرْاٰنَ وَ يَاْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ أَوْ يَحْجُزُهُ عَنِ الْقُرْاٰنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَ رَوَى ابْنُ مَاجَةَ نَحْوَهُ

৪২৩. **অনুবাদ :** হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ পায়খানা হতে বের হয়ে [অজু না করেই] আমাদেরকে কুরআন পড়াতেন এবং আমাদের সাথে গোশত খেতেন। তাঁকে কুরআন পাঠ হতে জানাবাত ব্যতীত কোনো কিছুই বাধা দিতে পারত না। [অর্থাৎ, গোসল ফরজ অবস্থায় তিনি কুরআন তিলাওয়াত করতেন না।] –[আবূ দাউদ, নাসায়ী আর ইবনে মাজাহ্ও এরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حُكْمُ تِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ لِلْجُنُبِيْ وَالْحَائِضِ জুনুবী ও ঋতুবতীর জন্য কুরআন তেলাওয়াতের বিধান : মনী বের হওয়ার কারণে অপবিত্রতা ও ঋতুবতী মহিলার জন্য কুরআন তেলাওয়াত বৈধ কি না? এ বিষয়ে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে—

مَذْهَبُ الْإِمَامِ مَالِكٍ : ইমাম মালেক (র.)-এর মতে, ঋতুবতী মহিলার জন্য কুরআন তেলাওয়াত জায়েজ। কেননা, সে কুরআন তিলাওয়াত হতে বিরত থাকলে ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অপরদিকে ঋতু থেকে বেঁচে থাকার ক্ষমতাও তার নেই। পক্ষান্তরে জুনূবী ব্যক্তির জন্য কুরআন তিলাওয়াত বৈধ নয়। কেননা, এ অপবিত্রতা দূর করার তার ক্ষমতা রয়েছে।

مَذْهَبُ جُمْهُوْرٍ : জমহুর ওলামার মতে, জুনূবী ও ঋতুবতী উভয়ের জন্য কুরআন তেলাওয়াত হারাম। তাঁদের দলিলসমূহ নিম্নরূপ—

١. لِحَدِيْثِ عَلِيٍّ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ عَنِ الْقُرْاٰنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ .

٢. عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا جُنُبٌ شَيْئًا مِنَ الْقُرْاٰنِ - (تِرْمِذِيٌّ)

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْإِمَامِ مَالِكٍ : ইমাম মালিক (র.)-এর দলিলের জবাবে বলা যায়—

১. হাদীসের মোকাবেলায় কিয়াস বা যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়।

২. তা ছাড়া আন্তরিক জিকির তো বৈধ। সুতরাং ভুলে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

وَعَنْ ٤٢٤ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْاٰنِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৪২৪. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— ঋতুবতী মহিলা এবং গোসল ফরজ হওয়া ব্যক্তি কুরআনের কোনো অংশ পড়বে না [তথা কুরআন পাঠ করবে না]। –[তিরমিযী]

وَعَنْ ٤٢٥ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَجِّهُوْا هٰذِهِ الْبُيُوْتَ عَنِ الْمَسْجِدِ فَإِنِّيْ لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪২৫. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— তোমাদের এ সমস্ত ঘরগুলোর দরজা মসজিদের দিক হতে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দাও। [যাতে মসজিদের ভেতর দিয়ে তোমাদের চলাচলের পথ না হয়] কেননা, আমি ঋতুবর্তী মহিলাকে এবং গোসল ফরজ হওয়া ব্যক্তির মসজিদে আসা জায়েজ মনে করি না। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حُكْمُ دُخُوْلِ الْمَسْجِدِ لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ অপবিত্র ও ঋতুবতী মহিলার মসজিদে প্রবেশের বিধান :

مَذْهَبُ دَاوُدَ الظَّاهِرِيِّ وَالْمُزَنِيِّ : দাউদ যাহেরী ও ইমাম মুযানী (র.)-এর মতে, গোসল ফরজ হওয়া ব্যক্তি ও ঋতুবতী মহিলার জন্য মসজিদে প্রবেশ করা জায়েজ নয়। তাঁরা উল্লিখিত হাদীস দলিল হিসেবে পেশ করেন।

مَذْهَبُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ : ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র.)-এর মতে, গোসল ফরজ হওয়া পুরুষ ও মহিলার জন্য মসজিদে প্রবেশ জায়েজ, যখন তারা অজু অবস্থায় হবে। কেননা, সাহাবীদের থেকে বর্ণিত আছে—

إِنَّهُمْ يَجْلِسُوْنَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمْ مُجْنِبُوْنَ إِذَا تَوَضَّأُوْا وُضُوْءَ الصَّلٰوةِ .

مَذْهَبُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَمَالِكٍ وَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ : ইমাম আবূ হানীফা, মালেক, সুফিয়ান ছাওরী প্রমুখ ইমামদের মতে, জুনূবী ও ঋতুবতী মহিলার অপবিত্র অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ ও তাতে অবস্থান করা নাজায়েজ। তাঁরা উল্লিখিত হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেন।

وَعَنْ ٤٢٦ عَلِيٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنُبٌ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

৪২৬. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— [রহমতের] ফেরেশতা সে ঘরে প্রবেশ করে না, যেখানে কোনো ছবি অথবা কুকুর কিংবা গোসল ফরজ হওয়া ব্যক্তি রয়েছে। –[আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

سَبَبُ إِرْشَادِ الْحَدِيْثِ হাদীসের পটভূমি : জাহিলিয়া যুগে আরবের লোকেরা তাদের পিতামাতা ও বংশের প্রসিদ্ধ লোকদের ছবি ঘরে রাখত এবং সেগুলোর সম্মান করত। আর এ প্রথার পরিণতিতেই মূর্তি পূজার প্রচলন হয়। তা ছাড়া তারা কুকুর পালনে খুবই আগ্রহী ছিল। কুকুর সাথে নিয়ে চলাফেরা এবং কুকুর দ্বারা কোনো কাজকর্ম সমাধা করা ইত্যাদির ব্যাপকতা ছিল। প্রাচীন আরবে কুকুরের রাতের আওয়াজ দ্বারা অতিথির আহ্বান ও পথহারা মুসাফিরের সহযোগিতা ইত্যাদি প্রসিদ্ধ। আর তারা ছিল অলস। অপরদিকে পানির একান্ত অভাব ছিল। স্ত্রী সঙ্গমে পর পবিত্রতা অর্জনের কোনো প্রয়োজন তারা মনে করত না। তাদের এই সকল চাল-চলন তথা আপত্তিকর জীবন-যাপন হতে সতর্ক করার জন্যই নবী করীম ﷺ উল্লিখিত হাদীস বর্ণনা করেন।

اَلْمَلَائِكَةُ الَّذِيْنَ اُرِيْدُوْا فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ এখানে যে সকল ফেরেশতাদের কথা বলা হয়েছে : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত এ হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, যে ঘরে ছবি, কুকুর ও নাপাক ব্যক্তি থাকে, সেখানে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। এতে বুঝা যায় যে, মৃত্যুর ফেরেশতা আমলনামা লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাদ্বয়ও গৃহে প্রবেশ করবে না, ফলে তাদের মৃত্যু ও আমলনামাও লেখা হবে না। তাই এখানে ফেরেশতা দ্বারা কোন ফেরেশতাকে বুঝানো হয়েছে তা নির্ণয় করা আবশ্যক।

বস্তুত এ হাদীসে যে সকল ফেরেশতার কথা বলা হয়েছে তারা হলেন রহমতের ফেরেশতা, যারা আল্লাহর নিকট হতে রহমত ও বরকত নিয়ে মানুষের কল্যাণার্থে অবতীর্ণ হন। তখন যে ঘরে উল্লিখিত বস্তুগুলো থাকে তারা সেখানে প্রবেশ করেন না। ফলে ঐ ঘরের অধিবাসীরা আল্লাহর রহমত ও বরকত হতে বঞ্চিত হয়। মৃত্যু ফেরেশতা ও কিরামুন কাতেবীন এর দ্বারা উদ্দেশ্য নয়। তারা যথা সময়েই উপস্থিত হয়ে যান।

প্রাসঙ্গিক ঘটনা : এ হাদীস শুনে জনৈক খ্রিস্টান পুরোহিত হযরত থানবী (র.)-কে বলেন, ইসলাম আমাদের প্রতি বড় অনুগ্রহ করেছে। আমরা কিয়ামত পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারব। কারণ, আমরা কুকুর ও ছবি রাখি। আমাদের ঘরে মৃত্যুর ফেরেশতা প্রবেশ করবে না, আর আমরা কখনো মরব না। এর জবাবে তিনি তিরস্কারের সাথে বলেন, কুকুরের প্রাণ যে ফেরেশতা হরণ করে, তোমার প্রাণও সে ফেরেশতাই হরণ করবে।

تَفْصِيْلُ صُوْرَةٍ ছবির ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে যে ছবির নিন্দা করা হয়েছে তা দ্বারা জীবের ছবিই বুঝানো হয়েছে। অন্য হাদীসে এই দিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রাণহীন বস্তুর ছবি ঘরে রাখা দূষণীয় নয়। যেমন– গাছ, ফুল, গৃহ বা এ জাতীয় কোনো আসবাবপত্রের ছবি। ছবি সম্পর্কীয় সমস্ত হাদীস আলোচনা ও পর্যালোচনা করে ফকীহ্গণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, প্রাণহীন ছবি অথবা এত ক্ষুদ্র প্রাণীর ছবি যা সহজে চেনা যায় না বা নজরে ধরা পড়ে না অথবা প্রাণীর ছবিই বটে, তবে তা বিছানায়, বালিশে বা পদদলিত হয় এমন স্থানে রাখা হয়েছে, এ ধরনের ছবি রাখা জায়েজ আছে। কিন্তু যা প্রকাশ্যে ঝুলানো হয় বা মর্যাদা প্রকাশার্থে ছাদে-দেয়ালে রাখা হয়, তা জায়েজ নেই। স্থুল প্রতিমূর্তি ভাস্কর্য কিংবা পুতুল, যা বর্তমানে অনেকের ঘরে দেখা যায় তা রাখা সম্পূর্ণ হারাম। কেননা, তা রক্ষিত ঘর মন্দিরে পরিণত হয়।

بَيَانُ الْكَلْبِ কুকুরের বর্ণনা : সব কুকুরের ব্যাপারে এ হাদীস প্রযোজ্য নয় ; বরং নিম্নের তিন শ্রেণীর কুকুর রাখা জয়েজ আছে। ১. শিকারী কুকুর, ২. ফসল পাহারাদার কুকুর এবং ৩. গবাদি পশুর নিরাপত্তায় নিয়োজিত কুকুর।

এগুলো ব্যতীত অন্য যে কোনো কুকুর রাখা নিষিদ্ধ।

مَنْ هُوَ الْجُنُبُ الْمَمْنُوْعُ নিষিদ্ধ জুনূবী কে ? উক্ত হাদীসে সেই গোসল ফরজ হওয়া ব্যক্তি সম্পর্কে নিন্দা করা হয়েছে, যার সাধারণ অভ্যাসই হলো গোসল না করা। এ রকম অবস্থায় এমন সময় পর্যন্ত থাকা যে, তাতে তার নামাজ ছুটে যায়। যে কোনো, গোসল ফরজ হওয়া ব্যক্তি এ হাদীসের আওতায় পড়ে না। কেননা হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে,

اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَطُوْفُ عَلٰى نِسَائِهٖ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ ـ

অন্য হাদীসে এসেছে যে,

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْنُبُ ثُمَّ يَنَامُ وَلَا يَمَسُّ مَاءً حَتّٰى يَقُوْمَ بَعْدَ ذٰلِكَ يَغْتَسِلُ ـ

তাই বুঝা গেল যে এখানে গোসল ফরজ হওয়া ব্যক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যারা অলসতা করে নাপাকীসহ ঘুমিয়ে থাকে এবং নামাজ কাযা করে।

٤٢٧ـ وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلٰثَةٌ لَا تَقْرَبُهُمُ الْمَلٰئِكَةُ جِيْفَةُ الْكَافِرِ وَالْمُتَضَمِّخُ بِالْخَلُوْقِ وَالْجُنُبُ اِلَّا اَنْ يَتَوَضَّأَ ـ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ

৪২৭. অনুবাদ : হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— এমন তিন ব্যক্তি আছে রহমতের ফেরেশতা যাদের নিকটবর্তী হয় না— ১. কাফিরের শরীর [জীবিত হোক কিংবা মৃত], ২. খালূকের সুগন্ধি ব্যবহারকারী ব্যক্তি এবং ৩. গোসল ফরজ হওয়া ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত সে অজু না করে। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** উক্ত হাদীসে خلوق দ্বারা এক প্রকার রঙিন রং বুঝানো হয়েছে, যা সুগন্ধি বা জাফরান দ্বারা তৈরি করা হয়। তবে তাতে লাল বর্ণটাই বেশি প্রবল থাকে। আর উক্ত হাদীসের নিষেধাজ্ঞা শুধু পুরুষের জন্য প্রযোজ্য ; নারীর বেলায় নয়। কেননা, নারীদের রঙিন বস্তু ব্যবহার করার অনুমতি আছে। যেমন– রাসূল ﷺ বলেছেন— اَللَّوْنُ لِلنِّسَاءِ وَالرِّيْحُ لِلرِّجَالِ আর পুরুষের জন্য রঙিন বস্তু ব্যবহার করা নিষেধ এ জন্য যে, তাতে পুরুষদেরকে নারীর সাদৃশ্য মতো মনে হয়। এরূপ ব্যক্তিকে রাসূল ﷺ অভিসম্পাত করেছেন।

وَعَنْ ٤٢٨ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِوبْنِ حَزْمٍ اَنَّ فِى الْكِتَابِ الَّذِىْ كَتَبَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِعَمْرِوبْنِ حَزْمٍ اَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْاٰنَ اِلَّا طَاهِرٌ - رَوَاهُ مَالِكٌ وَالدَّارُ قُطْنِىُّ

৪২৮. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হাযম (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমর ইবনে হাযম (রা.)-এর নিকট [ইয়ামনে] যে পত্র লিখেছেন, তাতে এটাও ছিল যে, পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কুরআন শরীফ স্পর্শ করবে না। –[মালেক ও দারকুতনী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, পবিত্র কুরআন অপবিত্রাবস্থায় স্পর্শ করা যায় না। রাসূল ﷺ ইয়ামনে নিযুক্ত রাজস্ব উসুলকারী সাহাবীকে এই মর্মে চিঠি লেখেন। তাতে শাসন সংক্রান্ত দায়িত্ব, রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত পদ্ধতি, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার উপায় এবং ফরজ, সুন্নতসহ বিভিন্ন বিষয়ের উল্লেখ ছিল। তাতে কুরআন শরীফ কিভাবে স্পর্শ করবে তাও উল্লেখ আছে।

وَعَنْ ٤٢٩ نَافِعٍ قَالَ اِنْطَلَقْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِىْ حَاجَةٍ فَقَضٰى ابْنُ عُمَرَ حَاجَتَهٗ وَكَانَ مِنْ حَدِيْثِهٖ يَوْمَئِذٍ اَنْ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ فِىْ سِكَّةٍ مِنَ السِّكَكِ فَلَقِىَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ اَوْ بَوْلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتّٰى اِذَا كَادَ الرَّجُلُ اَنْ يَتَوَارٰى فِى السِّكَّةِ ضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدَيْهِ عَلَى الْحَائِطِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهٗ ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً اُخْرٰى فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ وَقَالَ اِنَّهٗ لَمْ يَمْنَعْنِىْ اَنْ اَرُدَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ اِلَّا اَنِّىْ لَمْ اَكُنْ عَلٰى طُهْرٍ - رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ

৪২৯. **অনুবাদ :** হযরত নাফে' (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর সাথে তাঁর কোনো কাজে গিয়েছিলাম। অতঃপর হযরত ইবনে ওমর (রা.) তাঁর কাজ সমাধা করলেন। সেদিন তাঁর কথার মধ্যে এ কথাটিও ছিল যে, তিনি বলেন, একটি লোক কোনো এক গলির পথ অতিক্রম করার সময় রাসূল ﷺ-এর সাক্ষাৎ পেলেন, তখন তিনি পায়খানা অথবা পেশাব হতে বের হয়েছেন। সে লোকটি তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাম করলেন, কিন্তু তিনি কোনো উত্তর দিলেন না। এমনকি লোকটি যখন গলিতে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দু' হাত দেয়ালের উপর মারলেন এবং তা দ্বারা মুখমণ্ডল মাসাহ করলেন। অতঃপর পুনরায় হাত মারলেন এবং [তা দ্বারা] উভয় হাত মাসাহ করলেন। [অর্থাৎ তায়াম্মুম করলেন] তারপর লোকটির সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন, আমি অজুসহকারে ছিলাম না, এটাই তোমার সালামের উত্তর দিতে আমাকে বাধা দিয়েছিল। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْحَدِيْثَيْنِ দু'টি হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ পায়খানা হতে বের হয়ে আমাদেরকে কুরআন পড়াতেন, গোশত খেতেন বিনা অজুতে। আর এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, অজুবিহীন অবস্থায় সালামের জবাব তথা জিকির নিষিদ্ধ। কাজেই উভয়ের মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়, যার সমাধান নিম্নরূপ—

১. মানুষ হিসেবে রাসূলের মেজাজও সব সময় এক রকম থাকত না। ফলে যখন অস্বস্তি বোধ করতেন তখন বিনা অজুতে আল্লাহর জিকির করাকেও বেশি ভালো মনে করতেন না। হযরত নাফে'র হাদীসে তাই বুঝা যায়। আর যখন স্বস্তি বোধ করতেন তখন অজুবিহীন অবস্থায়ও জিকির করতেন। আর তা হযরত আলী (রা.)-এর হাদীস দ্বারা বুঝা যায়।

২. অথবা হযরত নাফে' (রা.)-এর হাদীস দ্বারা বিনা অজুতে জিকিরকে মাকরূহ বুঝিয়েছেন। তাই রাসূল ﷺ মাকরূহ পরিহার করে উত্তম কাজটি অবলম্বন করার জন্য অন্ততপক্ষে অজুর বদলে তায়াম্মুম করে সালামের উত্তর দিয়েছেন। আর হযরত আলী (রা.)-এর হাদীসে মাকরূহের সাথে জায়েজ হওয়াকে বুঝিয়েছেন। অতএব উভয়ের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই।

اَلْاَحْوَالُ الَّتِىْ لَا يَجِبُ فِيْهَا رَدُّ السَّلَامِ যেসব অবস্থায় সালামের জওয়াব দেওয়া ওয়াজিব নয় : হানাফী মাযহাব অনুযায়ী নিম্নলিখিত অবস্থাসমূহে সালাম দেওয়া উচিত নয়। আর সালাম প্রদান করলেও তার জওয়াব দেওয়া ওয়াজিব নয়—

১. নামাজরত অবস্থায়, ২. কুরআন তেলাওয়াতের সময়, ৩. জিকিরে লিপ্ত অবস্থায়, ৪. খানা-পিনায় লিপ্ত অবস্থায়, ৫. দোয়ার সময়, ৬. খুতবার সময়, ৭. মল-মূত্র ত্যাগ করার সময়, ৮. ইহরামের তালবিয়া পাঠের সময়, ৯. আযান দেওয়ার সময়, ১০. ইকামত দেওয়ার সময়, ১১. সতর খোলা অবস্থায়, ১২. দীনি শিক্ষাদানরত থাকা অবস্থায়, ১৩. মাতাল অবস্থায়, ১৪. গুনাহের কাজে লিপ্ত থাকা অবস্থায়, ১৫. মাদকদ্রব্য পানের সময়, ১৬. নিদ্রিত অবস্থায়, ১৭. স্ত্রী সহবাসরত অবস্থায়, ১৮. গোসলরত অবস্থায় ১৯. বিচার কার্যে লিপ্ত অবস্থায়।

وَعَنْ ٤٣٠ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ (رضـ) اَنَّهُ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَبُوْلُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتّٰى تَوَضَّأَ ثُمَّ اعْتَذَرَ اِلَيْهِ وَقَالَ اِنِّىْ كَرِهْتُ اَنْ اَذْكُرَ اللّٰهَ اِلَّا عَلٰى طُهْرٍ. رَوَاهُ اَبُوْدَاوُد وَ رَوَى النَّسَائِىُّ اِلٰى قَوْلِهٖ "حَتّٰى تَوَضَّأَ" وَقَالَ فَلَمَّا تَوَضَّأَ رَدَّ عَلَيْهِ.

৪৩০. **অনুবাদ :** হযরত মুহাজির ইবনে কুনফুয (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তিনি নবী করীম ﷺ-এর দরবারে আগমন করলেন, তখন তিনি প্রস্রাব করছিলেন এবং সে অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাম দিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তার অজু না করে সালামের উত্তর দিলেন না। অতঃপর তিনি নিজের অসুবিধা ব্যক্ত করলেন এবং বললেন, আমি পবিত্রতা ব্যতীত [বিনা অজুতে] আল্লাহকে স্মরণ করা অপছন্দ করেছি। –[আবূ দাউদ] আর নাসায়ী حَتّٰى تَوَضَّأَ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, তিনি অজু শেষ করে সালামের জবাব দিলেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইস্তিঞ্জায় রত থাকার কারণে সে ব্যক্তির সালামের জবাব দেননি, তবে ইস্তিঞ্জা শেষেও দিতে পারতেন। কিন্তু উত্তমতার দিকে লক্ষ্য করে অজু করে সালামের জবাব প্রদান করেছেন। বিনা অজুতেও সালামের জবাব দিতে বা সালাম করতে কোনো বাধা নেই।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤٣١ أُمِّ سَلَمَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجْنُبُ ثُمَّ يَنَامُ ثُمَّ يَنْتَبِهُ ثُمَّ يَنَامُ - رَوَاهُ اَحْمَدُ

৪৩১. অনুবাদ : উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গোসল ফরজ হতো, অতঃপর ঘুমিয়ে পড়তেন, আবার জাগতেন, আবার ঘুমিয়ে পড়তেন। –[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গোসল ফরজ হলে অজু করে ঘুমাতেন। এটাই ছিল তাঁর স্বাভাবিক নিয়ম। উক্ত হাদীসে সম্ভবত সংক্ষিপ্ততার কারণে অজুর কথা উল্লিখিত হয়নি। অথবা অপবিত্রতাসহও যে ঘুমানো জায়েজ আছে, তাই উক্ত হাদীসের উদ্দেশ্য। তবে পবিত্র হয়ে নেওয়াই সর্বোত্তম।

وَعَنْ ٤٣٢ شُعْبَةَ قَالَ اِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يُفْرِغُ بِيَدِهِ الْيُمْنٰى عَلٰى يَدِهِ الْيُسْرٰى سَبْعَ مِرَارٍ ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهٗ فَنَسِىَ مَرَّةً كَمْ اَفْرَغَ فَسَأَلَنِىْ فَقُلْتُ لَا اَدْرِىْ فَقَالَ لَا اُمَّ لَكَ وَمَا يَمْنَعُكَ اَنْ تَدْرِىَ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوْءَهٗ لِلصَّلٰوةِ ثُمَّ يُفِيْضُ عَلٰى جِلْدِهِ الْمَاءَ ثُمَّ يَقُوْلُ هٰكَذَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَطَهَّرُ - رَوَاهُ اَبُوْدَاوٗدَ

৪৩২. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত শো'বা [ইবনে দীনার] (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) যখন ফরজ গোসল করতেন তখন ডান হাত দ্বারা বাম হাতের উপর সাতবার পানি ঢালতেন। এরপর লজ্জাস্থান ধৌত করতেন। একবার তিনি [ইবনে আব্বাস] ভুলে গেলেন যে, কতবার পানি ঢাললেন, ফলে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বললাম 'আমি জানি না'। তিনি বললেন, তুমি মাতৃহীন হও। কিসে তোমাকে জানতে বাধা দিল। তারপর [হাত ও লজ্জাস্থান ধোয়ার পর] তিনি নামাজের অজুর মতো অজু করেন এবং সারা শরীরে পানি ঢালেন, আর বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এভাবেই পবিত্রতা অর্জন করতেন। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لِمَاذَا غَسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَبْعَ مِرَارٍ ইবনে আব্বাস (রা.) কেন সাতবার ধৌত করতেন ? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) কেন সাতবার ধৌত করতেন এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরাম নিম্নোক্ত মতামত পেশ করেছেন—

১. ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, সম্ভবত হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাতে কোনো অপবিত্র বস্তু লেগেছিল, তাই তিনি সাতবার ধৌত করেছিলেন।

২.অথবা সাতবার ধৌত করা যে রহিত হয়ে গেছে এ খবর তাঁর নিকট পৌঁছেনি।

৩. অথবা পৌঁছেছিল তবে তাঁর মতে, ওয়াজিব রহিত হয়ে গেলে মোস্তাহাব অবশিষ্ট থাকে, ফলে মোস্তাহাব হিসেবেই তিনি সাতবার ধৌত করেছিলেন।

আর রাসূলুল্লাহ ﷺ এভাবে পবিত্রতা অর্জন করতেন। কথাটির অর্থ হলো– এভাবে প্রথমে অজু করে পরে সর্বাঙ্গে পানি ঢালতেন।

وَعَنْ ٤٣٣ أَبِىْ رَافِعٍ (رضـ) قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلٰى نِسَائِهٖ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هٰذِهٖ وَعِنْدَ هٰذِهٖ قَالَ فَقُلْتُ لَهٗ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَا تَجْعَلُهٗ غُسْلًا وَاحِدًا اٰخِرًا قَالَ هٰذَا اَزْكٰى وَاَطْيَبُ وَاَطْهَرُ . رَوَاهُ اَحْمَدُ وَ اَبُوْدَاوُدَ

৪৩৩. **অনুবাদ :** হযরত আবূ রাফে' (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সকল স্ত্রীদের নিকট গমন করলেন [তথা সহবাস করলেন]। একবার এর কাছে আরেকবার ওর কাছে গোসল করলেন [অর্থাৎ সকল বিবির সাথে সহবাস করেই গোসল করলেন]। আবূ রাফে' বলেন– আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আপনি সর্বশেষ কেন একবার গোসল করলেন না ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এটা [প্রত্যেকবারে গোসল করা] অধিক পবিত্র করে, অধিক উৎফুল্ল রাখে এবং অধিক পরিচ্ছন্ন রাখে। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْحَدِيْثَيْنِ **দু' হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব :** উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূল ﷺ প্রত্যেক স্ত্রী সহবাসের পর গোসল করেছেন। আর হযরত আনাসের হাদীসে এসেছে যে, রাসূল ﷺ সর্বশেষ একবার গোসল করেছেন। ফলে উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। যার সমাধান নিম্নরূপ—

১. ইমাম আবূ দাউদ (র.) বলেছেন, আনাসের হাদীস আবূ রাফে'র হাদীস হতে অধিক সহীহ ও নির্ভুল।
২. অথবা স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের মতে, সহবাসের পর গোসল করলে সহবাস জনিত স্নায়ুবিক ক্লান্তি দূর হয় এবং ঘামের দুর্গন্ধ দূরীভূত হয়ে মনে উদ্যমতা ও উৎফুল্লতা ফিরে আসে। তাই রাসূল ﷺ বারবার গোসল করেছেন।
৩. অথবা গোসল ব্যতীত দ্বিতীয় স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে প্রতিপক্ষ ঘাম বা নাপাকীর গন্ধে অস্বস্তি বোধ করতে পারে বা যৌন উত্তেজনা স্তিমিত থাকতে পারে বলে বারবার গোসল করেছেন, আবশ্যক হিসেবে নয়।
৪. অথবা পূর্ববর্তী সঙ্গমের স্খলিত বীর্য পরবর্তী সঙ্গমে মৃত বীর্যে পরিণত হয়ে নানাবিধ যৌন ব্যাধি সৃষ্টি করতে পারে, তাই বারবার গোসল করেছেন।
৫. অথবা উত্তম হিসেবে করেছেন, আবশ্যক হিসেবে নয়। তবে একবার সহবাসের পর গোসল না করে শুধু অজু বা যৌনাঙ্গ ধৌত করে দ্বিতীয়বার সহবাস করাও জায়েজ।

وَعَنْ ٤٣٤ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طُهُوْرِ الْمَرْأَةِ . رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِىُّ . وَ زَادَ اَوْ قَالَ بِسُؤْرِهَا وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৪৩৪. **অনুবাদ :** হযরত হাকাম ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– রাসূলুল্লাহ ﷺ স্ত্রীলোকের অজুর অবশিষ্ট পানি দ্বারা পুরুষ লোককে অজু করতে নিষেধ করেছেন। –[আবূ দাউদ, ইবনে মাজা ও তিরমিযী]

আর তিরমিযী এ কথাটি বৃদ্ধি করেছেন, রাবী সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হয়তো [অজুর অবশিষ্ট পানির স্থলে] স্ত্রীলোকের অবশিষ্ট পানি বলেছেন। আর বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْحَدِيْثَيْنِ **দু'টি হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব :** আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূল ﷺ স্ত্রীলোকের ব্যবহারের পর অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করতে পুরুষ লোককে নিষেধ করেছেন। অথচ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জনৈক স্ত্রীর গোসল করার পর সে গামলা হতে পানি নিয়ে অজু করেছেন। কাজেই উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়, যার সমাধান নিম্নরূপ—

১. হযরত হাকামের বর্ণিত উক্ত হাদীসটি মাকরূহ তানযীহী প্রমাণ করার জন্য বলা হয়েছে, তাহরীমীর জন্য নয়।
২. অথবা নিষেধ করাটা অপরিচিত স্ত্রীলোকের ব্যবহারের উদ্বৃত্ত পানির ব্যাপারে ছিল। সেখানে অসাবধানতা বা কামভাব জাগ্রত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
৩. অথবা, এ হাদীসটির আমল করার মতো নয়। কেননা, ইমাম বুখারী (র.) একে দুর্বল বলে অভিহিত করেছেন।

وَعَنْ ٤٣٥ حُمَيْدِ الْحِمْيَرِيِّ (رحـ) قَالَ لَقِيْتُ رَجُلاً صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ اَرْبَعَ سِنِيْنَ كَمَا صَحِبَهُ اَبُوْهُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ اَوْ يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ زَادَ مُسَدَّدٌ وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيْعًا ـ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَ زَادَ اَحْمَدُ فِيْ اَوَّلِهِ نَهٰى اَنْ يَّمْتَشِطَ اَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ اَوْ يَبُوْلَ فِيْ مُغْتَسَلٍ ـ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجَسٍ ـ

৪৩৫. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত হুমাইদ হিমইয়ারী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– আমি এমন এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ পেলাম, যিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর মতো চার বৎসরকাল নবী করীম ﷺ-এর সোহবতে ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো স্ত্রীলোককে পুরুষের উদ্বৃত্ত পানি দিয়ে এবং পুরুষকে স্ত্রীলোকের উদ্বৃত্ত পানি দিয়ে গোসল করতে নিষেধ করেছেন। আর বর্ণনাকারী মুসাদ্দাদ এ কথাটুকু বৃদ্ধি করেছেন যে, বরং দু'জনে যেন [একই পাত্র হতে] একত্রে অঞ্জলি ভরে।–[আবূ দাঊদ ও নাসায়ী]

আর ইমাম আহমদ (র.) এ হাদীসের প্রথমে এ কথাগুলো বৃদ্ধি করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক দিন মাথায় চিরুনি করতে এবং গোসলখানায় প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন। আর ইবনে মাজাহ্ এ হাদীস হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সারজিস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে পুরুষ ও নারীর একে অপরের উদ্বৃত্ত পানি ব্যবহার করার ব্যাপারে যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে তা কঠোরতার জন্য নয় বরং উত্তমতার জন্য। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও হযরত আয়েশা (রা.) একে অপরের উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা গোসল করার প্রমাণ পাওয়া যায়। আর প্রতিদিন মাথায় চিরুনি করা বিলাসিতার পরিচায়ক। রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন পর পর চিরুণী করতেন। বিলাসিতা না হলে দৈনন্দিন চিরুনি করাতে কোনো আপত্তি নেই। আর গোসলখানায় পেশাব করলে তাতে গোসলের সময় পেশাবের মিশ্রিত পানি শরীরে লাগার সম্ভাবনা থেকে মনে ওয়াসওয়াসার সৃষ্টি হতে পারে। তাই গোসলখানায় পেশাব করতে নিষেধ করা হয়েছে। যদি এরূপ না হয় তবে তা নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে না।

كِتَابُ اَحْكَامِ الْمِيَاهِ

পরিচ্ছেদ : পানির বিধান

আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রতি যত অনুগ্রহ দান করেছেন তন্মধ্যে পানি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, পানি ব্যতীত জীবনের অস্তিত্ব কল্পনাতীত। এ জন্য পানির অপর নাম জীবন। সমস্ত প্রাণীজগত, গাছ-পালা, তরুলতা সবকিছুই পানির উপর নির্ভরশীল। যেমন, মহান আল্লাহ বলেন– وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ
কোনো ব্যক্তি বা বস্তু যখন অপবিত্র হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তা'আলা পানিকেই তা পবিত্র করার উপকরণ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। যেমন– কুরআনে এসেছে– وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ
আর এ কারণেই মহানবী ﷺ পানিকে কোনোভাবে দূষিত, অপবিত্র এবং অপব্যয় ও অপচয় করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

تَحْقِيقُ الْمِيَاهِ : مِيَاه শব্দটি مَاءٌ-এর বহুবচন (اَمْوَاهٌ ও বহুবচন হয়), শব্দিক অর্থ– পানি। مِيَاهٌ শব্দটি মূলে مِوَاهٌ ছিল। واو বর্ণটির পূর্বে যের থাকায় وَاوْ টিতে يَاءٌ দ্বারা পরিবর্তন করে مِيَاهٌ করা হয়েছে। আর مَاءٌ শব্দটি مَوَهٌ ছিল। وَاوْ বর্ণটির পূর্বে যবর থাকায় তাকে اَلِفْ দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। আর قَرِيْب مَخْرَجْ-এর কারণে "ه" (হা)-কে ء [হামযা] দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। আলোচ্য অধ্যায়ে পানির বিধান সংক্রান্ত বিভিন্ন হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٤٣٦ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِىْ لَا يَجْرِىْ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ لَا يَغْتَسِلُ اَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ قَالُوْا كَيْفَ يَفْعَلُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا .

৪৩৬. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— তোমাদের কেউ যেন আবদ্ধ পানিতে প্রস্রাব না করে, যা প্রবহমান নয় এবং যে পানিতে সে আবার গোসল করবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

তবে মুসলিমের বর্ণনায় [এরূপ বাক্য] রয়েছে যে, তোমাদের কেউ যেন গোসল ফরজ অবস্থায় বদ্ধ পানিতে গোসল না করে। তখন লোকেরা [বর্ণনাকারীকে] জিজ্ঞেস করল যে, হে আবূ হুরায়রা! সে কিভাবে গোসল করবে? তিনি বললেন, তা হতে পানি [হাত বা পাত্র দ্বারা] উঠিয়ে নেবে।

٤٣٧ - وَعَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّبَالَ فِى الْمَاءِ الرَّاكِدِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৩৭. **অনুবাদ :** হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– রাসূলুল্লাহ ﷺ বদ্ধ পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে আবদ্ধ বা স্থির পানি বলতে যে সমস্ত কূপ বা পুকুরে স্বল্প পানি রয়েছে তা বুঝানো হয়েছে। কেননা, তাতে সামান্য পরিমাণ নাপাক পড়লেই পানি অপবিত্র হয়ে যাবে। কিন্তু পানিভরা বড় পুকুর, দীঘি,

পানি এর আওতায় পড়ে না। কেননা, তাতে নাপাকীর গোসল করলে কিংবা নাপাক বস্তু পতিত হলে পানি অপবিত্র হয় না। তবে পানি কম হোক বা বেশি হোক, তাতে অপ্রয়োজনে পায়খানা-প্রস্রাব করা এমনিতেই নিষিদ্ধ তাছাড়া অন্য কোনো নাপাক বস্তু যেন না তাতে পড়ে সে দিকে খেয়াল রাখা উচিত।

وَعَنْ ٤٣٨ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ (رض) قَالَ ذَهَبَتْ بِيْ خَالَتِيْ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ ابْنَ اُخْتِيْ وَجِعٌ فَمَسَحَ رَأْسِيْ وَ دَعَالِيْ بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوْئِهِ ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ اِلٰى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৩৮. অনুবাদ : হযরত সাইব ইবনে ইয়াযীদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমার খালা আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট নিয়ে গেলেন। অতঃপর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার এ বোনপুত্র রোগগ্রস্ত। তখন তিনি আমার মাথার ওপর হাত বুলালেন এবং আমার জন্য বরকতের দোয়া করলেন। এরপর তিনি অজু করলেন আর আমি তাঁর অজুর [উদ্বৃত্ত] পানি হতে কিছু পানি পান করলাম, অতঃপর আমি তাঁর পিছনে দাঁড়ালাম এবং তাঁর দুই কাঁধের মাঝে মশারির বা খাটের পর্দার ঘুন্টির ন্যায় মোহরে নবুয়ত দেখলাম। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : মোহরে নবুয়ত রাসূলে কারীম ﷺ-এর দুই কাঁধের মধ্যখানে কবুতরের ডিমের আকারে কিছু স্থান খুব উজ্জ্বল ও চকচকে সুন্দর ও কিঞ্চিৎ স্ফীত ছিল। এটা সম্পর্কে পূর্ববর্তী কোনো কোনো আসমানী কিতাবেও ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল এবং শেষ নবীর পরিচয় চিহ্ন হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছিল। যেমন– হযরত সালমান ফারসী (রা.) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে শেষ নবীর তিনটি চিহ্নের মধ্যে মোহরে নবুয়তও তালাশ করেছিলেন।

نَبْذَةٌ مِنْ حَيَاةِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রা.)-এর জীবনী :

১. **নাম ও পরিচিতি :** তাঁর নাম আস-সাইব, উপনাম আবূ ইয়াযীদ আল-কিন্দী। পিতার নাম ইয়াযীদ।

২. **জন্ম :** তিনি হিজরি দ্বিতীয় সনে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মলগ্ন থেকেই ইসলামি পরিবেশেষে গড়ে উঠেন। রাসূল ﷺ বিদায়ী হজে যাওয়ার সময় তাঁর পিতা ইয়াযীদ (রা.) তাঁকে সাথে নিয়ে বিদায়ী হজে গমন করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৭ বছর। এ সুবাদে অতি অল্প বয়সেই তিনি হজ পালন করেন এবং বিদায়ী হজের ভাষণ শুনতে পান।

৩. **রাসূল ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা :** রাসূল ﷺ হতে তিনি মাত্র ৫টি হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী ৫টিই সহীহ বুখারীতে উল্লেখ করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস এত অল্প হওয়ার কারণ এই যে, রাসূল ﷺ-এর ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৮ বছর।

৪. **ইন্তেকাল :** হযরত সাইব ইবনে ইয়াযীদ (রা.) ৯১ হিজরিতে ৮৯ বছর বয়সে মদীনায় ইন্তেকাল করেন।

اَلْفَصْلُ الثَّانِى : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٤٣٩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمَاءِ يَكُوْنُ فِى الْفَلَاةِ مِنَ الْاَرْضِ وَمَا يَنُوْبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ اِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخُبْثَ . رَوَاهُ اَحْمَدُ وَ اَبُوْدَاوُدَ وَ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَفِى اُخْرٰى لِاَبِىْ دَاوُدَ فَاِنَّهُ لَا يَنْجَسُ .

৪৩৯. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এমন পানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, যা মাঠে-ময়দানে জমে থাকে, আর তাতে নানা ধরনের বন্য জীবজন্তু ও হিংস্র প্রাণী পানি পান করতে আসে। [তা পাক কি নাপাক?] উত্তরে তিনি বললেন, পানি যখন দু' কোল্লা পরিমাণ হয়, তখন তা অপবিত্রতাকে ধারণ করে না। [অর্থাৎ, নাপাক হয় না।] –[আহমদ, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসায়ী, দারেমী ও ইবনে মাজাহ্] আবূ দাঊদের অপর বর্ণনায় এসেছে যে, তা নাপাক হয় না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : উন্মুক্ত বা খোলা মাঠে অরক্ষিত অবস্থায় যদি পানি জমে থাকে, আর তা হতে বন্য জীব জন্তু ও হিংস্র প্রাণী পান করে তবে তার আয়তন ১০ × ১০ হাতের কম হলে তা নাপাক বলে গণ্য হবে। আর যদি তার পরিমাণ ততোধিক হয়, তবে তা বড় পুকুর তথা প্রবহমান পানির বিধানের আওতায় পড়বে।

قُلَّةٌ -এর সংজ্ঞা : قُلَّةٌ শব্দটি একবচন, বহুবচন হলো قُلَلٌ আর দ্বিবচন قُلَّتَيْنِ -এর অনেকগুলো অর্থ আছে। যেমন– ক. رَأْسُ الْجَبَلِ অর্থাৎ পাহাড়ের চূড়া। খ. حَمْلُ الْبَعِيْرِ অর্থাৎ উটের বোঝা। গ. اَلْجَرَّةُ الْكَبِيْرَةُ অর্থাৎ বড় মটকা, মশক। ঘ. قَامَةُ الْاِنْسَانِ অর্থাৎ মানুষের দেহের উচ্চতা।

শব্দটির বিভিন্ন অর্থ থাকায় এর পরিমাণ নিয়েও মতপার্থক্য আছে। যেমন–

১. আল্লামা আবুল হাসান (র.) বলেন, এক কোল্লার পরিমাণ হলো পাঁচ কলস বা মশক।

২. আবূ বকর বাকেল্লানী (র.) বলেন, এক কোল্লায় ৬৪ রতল, দ্বিগুণ ১২৮ রতল।

৩. তিরমিযীর حَاشِيَةٌ-তে আছে—

اَلْقُلَّةُ الْجَرَّةُ الْكَبِيْرَةُ الَّتِىْ تَسَعُ فِيْهَا مِائَتَيْنِ وَخَمْسِيْنَ رِطْلًا بِالْبَغْدَادِىْ فَالْقُلَّتَانِ خَمْسُ مِائَةِ رِطْلٍ .

৪. শাহ সাহেব বলেন, এক কোল্লায় দু' কলস।

৫. কেউ কেউ বলেন, اَلْقُلَّةُ الَّتِىْ يُسْقٰى بِهَا الْيَدُ تُقِلُّهَا

৬. আল্লামা শামী বলেন, কোল্লা সম্ভবত বালতিকে বলা হয়েছে।

৭. কেউ কেউ বলেন, قُلَّتَيْنِ-এর পরিমাণ ৬০০ রতল।

৮. কেউ বলেন—

اَلْقُلَّةُ مَا يَسْتَقِلُّهُ الْبَعِيْرُ وَالْاَصَحُّ اَنَّ قَدْرَ الْقُلَّتَيْنِ اَمْرٌ مَشْكُوْكٌ وَلِذَا تَرَكَهُ اَكْثَرُ الْمُحَدِّثِيْنَ . قَالَ الطَّحَاوِىْ اِنَّ حَدِيْثَ الْقُلَّتَيْنِ صَحِيْحٌ وَاِسْنَادُهُ ثَابِتٌ وَاِنَّمَا تَرَكْنَاهُ لِاَنَّنَا لَا نَعْلَمُ مَا الْقُلَّتَانِ وَهٰذَا الْقَوْلُ اَرْجَحُ عِنْدَنَا .

وَعَنْ ٤٤ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ (رضـ) قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِىَ بِئْرٌ يُلْقٰى فِيْهِ الْحِيَضُ وَلُحُوْمُ الْكِلَابِ وَالنَّتَنُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ . رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْدَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ .

৪৪০. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি 'বুযাআ' কূপের পানি দ্বারা অজু করতে পারি ? অথচ এটা এমন একটি কূপ, যাতে হায়েযের নেকড়া, মৃত কুকুর ও অন্যান্য দুর্গন্ধময় আবর্জনা নিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। উত্তরে নবীজী ﷺ বললেন, পানি পাক, কোনো জিনিসই তাকে নাপাক করতে পারে না।–[আহমদ, আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْحَدِيْثَيْنِ দুই হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব : হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস হতে প্রতীয়মান হয় যে, পানি দু'কোল্লা পরিমাণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাতে নাপাক পতিত হলে তা অপবিত্র হয়ে যাবে। কিন্তু হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর হাদীস হতে জানা যায়, কোনো অবস্থাতেই পানি অপবিত্র হয় না। বিপরতীতমুখী হাদীস দু'টির মধ্যে সমাধান বিধানে হাদীস বিশারদগণ নিম্নোক্ত অভিমতগুলো পেশ করেছেন—

১. বুযাআ কূপটি বৃহদায়তন ছিল, যা অধিক পানির বিধানের অন্তর্ভুক্ত। এ জন্য রাসূল ﷺ বলেছেন—
اِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.

২. অথবা, বুযাআ কূপ হতে ক্ষেত-খামারে পানি সেচন করা হতো। পানি শেষ হলে আবার নতুন পানি দিয়ে তা ভর্তি করা হতো। আর এরূপ অবস্থায় চলতে থাকলে পানিতে কিছু নাপাক পড়লেও পানি নাপাক হয় না।

৩. কেউ কেউ বলেন, রাসূল ﷺ-এর বাণী— اِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ কথাটি বুযাআ নামক কূপের সাথে সম্পৃক্ত, তবে সর্বক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয়।

৪. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) বলেন, নিক্ষেপ অর্থ এই নয় যে, তাতে মরা কুকুর, ঋতুবতীর নেকড়া ইত্যাদি নিক্ষেপ করা হতো। এটা সাহাবায়ে কেরামের নীতি-নৈতিকতার পরিপন্থি। কাজেই অপবিত্র কিছু নিক্ষেপ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ ছিল, সন্দেহ নিরসন কল্পে রাসূল ﷺ তাকে পবিত্র বলেছেন।

৫. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর হাদীসটি مَاءٌ كَثِيْر-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসটি مَاءٌ قَلِيْل-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৬. কেউ কেউ বলেন, بِئْرُ بُضَاعَةَ-এর হাদীসের সনদে দুর্বলতা আছে। কেননা, এ হাদীসের বর্ণনাকারী ওলীদ ইবনে কাছীর দুর্বল রাবী।

৭. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর হাদীসে পানির মৌলিক ধর্মের কথা বলা হয়েছে। পানির ধর্ম হচ্ছে طَاهِرْ ও مُطَهِّرْ ; তবে এতে নাপাকী পড়লে অবশ্যই অপবিত্র হবে, যা হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস হতে প্রতীয়মান হয়।

৮. আল্লামা তীবী (র.) বলেন, কূপটি এমন জায়গায় অবস্থিত ছিল যে, নালার স্রোতে মিশে নর্দমার ময়লা কূপে এসে পড়ার সম্ভাবনা ছিল, কাজেই কূপটির পবিত্রতার ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দেয়। সন্দেহ নিরসন কল্পে রাসূল ﷺ তাকে পবিত্র বলেছেন।

৯. কূপটির তলদেশ হতে পানি প্রবহমান ছিল, যার ফলে তাতে আবর্জনা পতিত হলে তা সাথে সাথে দূরীভূত হয়ে যেত।

১০. আল্লামা তকী ওসমানী (র.) বলেন, بِئْر بُضَاعَةْ থেকে পতিত ময়লা-আবর্জনা দূর করার পর সাহাবায়ে কেরামের সন্দেহ হলে নবীজী ﷺ -এর ব্যাখ্যায় বলেন— اِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ

اِخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِىْ تَعْرِيْفِ الْمَاءِ الْقَلِيْلِ وَالْكَثِيْرِ কম পানি ও বেশি পানির পরিমাণ নির্ধারণের ব্যাপারে ইমামদের মতামত :

১. ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.)-এর মতে— مِقْدَارُ الْقُلَّتَيْنِ كَثِيْرَةٌ وَمَا نَقَصَ مِنْهُ فَهُوَ قَلِيْلٌ অর্থাৎ, পানি দুই কোল্লা বা ততোধিক হলে مَاءٌ كَثِيْرٌ হিসেবে পরিগণিত হবে, ফলে তাতে নাপাক পড়লে পানি নাপাক হবে না। আর এর কম হলে তাতে যদি নাপাকী পড়ে তবে কম পানি হিসেবে পানি নাপাক হয়ে যাবে। তাঁরা কোল্লাতাইনের হাদীসকে দলিল হিসেবে পেশ করেন।

২. ইমাম মালিক (র.)-এর মতে নাপাকীর কারণে পানির তিনটি গুণের কোনো একটি পরিবর্তন হলে তা কম পানি হিসেবে নাপাক হয়ে যাবে। আর এরূপ না হলে বেশি পানির বিধান প্রযোজ্য হবে। তিনি বুযাআ কূপের হাদীস এবং مَالَمْ يَتَغَيَّرْ اَحَدُ اَوْصَافِهِ الثَّلَاثَةَ হাদীসকে দলিল হিসেবে পেশ করেন।

৩. ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, পানি কম-বেশি নিশ্চয় (رَأْىُ مُبْتَلَى بِهِ) ব্যক্তির মতামতের উপরই নির্ভরশীল। আবশ্য যদি কোনো পানিতে ময়লা পড়ার পর তৎক্ষণাৎ তা অপর প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে, তবে তাকে কম পানি বলা হবে, আর না ছড়ালে বেশি পানি বলা হবে। তবে হানাফী ইমামদের মাঝে কম পানি ও বেশি পানি নির্ধারণের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ—

ক. যদি পরিমাণ এরূপ হয় যে, এক প্রান্তে গোসল করলে অপর প্রান্তের পানি ঘোলা হয়ে যায়, তবে তাকে 'কম পানি' আর যদি ঘোলা না হয়, তবে তাকে 'বেশি পানি' বলা হবে। এটা হানাফী ফিকহবিদ মুহাম্মদ ইবনে সালাম (র.)-এর অভিমত।

খ. অপর ফিকহবিদ আবূ হাফস কবীর মত প্রকাশ করেন যে, এক প্রান্তে রং ফেললে যদি অপর প্রান্তে তার প্রভাব ছড়ায়, তবে তা 'কম পানি' এবং প্রভাব না ছড়ালে 'বেশি পানি' বলা হবে।

গ. গোসল বা অজুর সময় পানি নাড়াচাড়া করলে পানি যদি এতটুকু পরিমাণ হয় যে, অপর প্রান্ত পর্যন্ত আন্দোলিত হয় তবে তা কম পানি, আর আন্দোলিত না হলে তা বেশি পানি হবে।

ঘ. কোনো কোনো শরিয়তবিদ বলেন যে, দৈর্ঘ্য আট হাত এবং প্রস্থ আট হাত বিশিষ্ট কূপ হলে তার পানিকে 'বেশি পানি' বলা হবে, তার কম হলে 'কম পানি' বলা হবে।

ঙ. কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ দশ হাত প্রস্থ জলাধারকে 'বেশি পানি' এবং তার কমকে 'কম পানি' বলেন। কেউ কেউ দশ হাতের স্থলে পনেরো হাতের কথা উল্লেখ করেছেন।

চ. ইমাম মুহাম্মদ (র.) দশ হাত দৈর্ঘ্য ও দশ হাত প্রস্থ বিশিষ্ট কূপ বা জলাধারকে 'বেশি পানি' বলে আখ্যায়িত করেছেন। ওলামায়ে মুতাআখখিরীন এ মতই গ্রহণ করেছেন। তবে পরবর্তীতে ইমাম মুহাম্মদ (র.) ও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতের দিকে ফিরে গেছেন, আর সে সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন—

لَا اُوَقِّتَ فِيْهِ شَيْئًا بَلْ مُفَوَّضٌ اِلٰى رَأْىِ الْمُبْتَلٰى بِهِ .

ইমাম শাফেয়ীর قُلَّتَيْنِ -এর হাদীসের জবাব নিম্নরূপ :

১. উক্ত হাদীসটি মতন ও সনদ উভয় দিক দিয়ে اِضْطِرَابٌ যুক্ত।

২. সনদের দিক হতে যেমন কোনো সনদে আছে- فَقِيْلَ عَنْ وَلِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ
অন্যত্র আছে- وَقِيْلَ عَنْ وَلِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ ইত্যাদি।

১. আর মতনের দিক থেকে হলো, কুল্লাহ এর অনেকগুলো অর্থ আছে। যার নির্দিষ্ট কোনো অর্থ এখানে নেওয়া সম্ভব নয়।
আর কোনো বর্ণনায় তিন কুল্লা, কোনো বর্ণনায় চার কোল্লা পর্যন্ত রয়েছে।
তাই উক্ত হাদীসের উপর আমল করা দুষ্কর।

২. ইমাম ইবনুল কায়্যেম বলেন, ইবনে তাইমিয়া উক্ত হাদীসকে অগ্রহণযোগ্য বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

৩. ইবনে হুমামের মতে, قُلَّةٌ -এর হাদীসটি দুর্বল, তাই এর উপর আমল করা যাবে না।

إِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ-এর ব্যাখ্যা : রাসূল ﷺ -এর বাণী- "إِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ"-এর কয়েকটি ব্যাখ্যা হাদীসবিশারদগণ পেশ করেছেন। যেমন—

১. إِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ-এর মর্মার্থ হচ্ছে, পানির ধর্ম এই যে, তা নিজেও পবিত্র এবং অন্যকেও পবিত্রকরণে ক্ষমতাবান। তবু সকল পানি নিজে পবিত্র হলেও অন্যকে পবিত্র করার যোগ্যতা রাখে না। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন— إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ‧ (اِبْرَاهِيْم) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ مُبِيْنٌ ‧ (زُخْرُف) তদ্রূপ পানিও স্বভাবগতভাবে পবিত্র ও পবিত্রকারী হিসেবে সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু নাপাক পতিত হলে তা নাপাক হয়ে যায়।

২. অথবা مَاءٌ كَثِيْرٌ বা বেশি পানি সম্পর্কে حُكْم দিতে গিয়ে রাসূল ﷺ আলোচ্য উক্তিটি পেশ করেছেন।

৩. অথবা প্রবাহিত পানি হলে, তবে কম হোক আর বেশি হোক নাজাসাত পতিত হলে নাপাক হয় না। কিন্তু যদি পানি বদ্ধ ও অল্প হয়, তবে নাপাক হয়ে যায়। সুতরাং উল্লিখিত হাদীসটি প্রবহমান পানি সম্পর্কে বিধান দিচ্ছে।

৪. ইমাম আবূ নসর বাগদাদী বলেন, بِئْر بُضَاعَةُ থেকে পতিত ময়লা-আবর্জনা ও নাপাকী দূর করে দেওয়ার পর সাহাবীদের প্রশ্নের জবাবে রাসূল ﷺ বলেছেন-إِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ

৫. কেউ কেউ বলেন, রাসূল ﷺ -এর বাণী- إِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ কথাটি শুধুমাত্র بِئْرُ بُضَاعَةَ-এর পানির সাথে خَاصّ, সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

৬. খাতামুল মুহাদ্দিসীন আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) বলেন- إِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ অর্থ হলো-

إِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الْمَاءَ طَهُوْرًا اَىْ مِنْ شَأْنِ الْمَاءِ اَنْ يَكُوْنَ طَاهِرًا بِنَفْسِهٖ وَمُطَهِّرًا لِغَيْرِهٖ لَا كُلُّ فَرْدٍ مِنَ الْاَفْرَادِ فَهُوَ طَاهِرٌ وَهٰكَذَا فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى إِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ يَعْنِىْ إِنَّ الظُّلْمَ وَالْكُفْرَ مِنْ شَأْنِ الْاِنْسَانِ لٰكِنْ لَيْسَ كُلُّ فَرْدٍ مِنَ النَّاسِ ظَالِمٌ وَكَافِرٌ.

وَعَنْ ٤٤١ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيْلَ مِنَ الْمَاءِ فَاِنْ تَوَضَّأْنَا بِهٖ عَطِشْنَا اَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهٗ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهٗ ـ رَوَاهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْدَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِىُّ

৪৪১. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা [বনী মুদলাজ গোত্রের] এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা সমুদ্রে ভ্রমণ করি, তখন আমাদের সাথে সামান্য মিঠা পানি থাকে, যদি আমরা তা দ্বারা অজু করি তবে আমরা তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ি। এমতাবস্থায় আমরা সমুদ্রের [লোনা] পানি দ্বারা অজু করতে পারব কি? জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তার পানি পাক এবং মৃতও হালাল। -[মালিক, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ্]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

سَبَبُ اِرْشَادِ الْحَدِيْثِ হাদীসের পটভূমি : রাসূল ﷺ -এর হিজরতের পর মদীনায় একটি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর ইসলামের প্রচার ও প্রসারের এবং শত্রুদের দমন করার লক্ষ্যে সাহাবীদেরকে বিভিন্ন রাষ্ট্রে সফর করতে হতো। আর আরবের সফরে পাহাড়-পর্বত ও মরুভূমির পথেই চলতে হতো বিধায় পানিই ছিল তাদের সফরের বড় সম্বল। কিন্তু যেহেতু সে পানি তাদের বহন করে পথ চলতে হবে, তাই বেশি পানি সাথে নিয়ে চলাও তাদের জন্য সমস্যার ব্যাপার ছিল। কোনো কোনো সময় সাহাবীগণ আবার সামুদ্রিক পথেও চলতেন। আর সে সকল সমুদ্রের পানি স্বভাবত লবণাক্ত থাকত এবং লবণাক্ত

হওয়ার দরুন স্বাদ বিকৃত থাকত। তাই ঐ পানি দ্বারা অজু জায়েজ হবে কি না ? এ সকল সমস্যা ও সন্দেহ নিরসনের জন্য সাহাবীগণ হুজুরের সমীপে গিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে সঠিক সমাধান দানের জন্য উল্লিখিত হাদীসটি বর্ণনা করেন।

لِمَاذَا سَأَلَ الرَّجُلُ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ **নদীর পানি সম্পর্কে কেন লোকটি প্রশ্ন করল ?** এত বেশি পানি হওয়া সত্ত্বেও লোকটি কেন নদীর পানির পবিত্রতা সম্পর্কে প্রশ্ন করল, নিম্নে এ বিষয়ে আলিমগণ বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন—

১. কারো মতে, নদীর পানি বিভিন্ন বস্তুর মিশ্রণের কারণে তার মূল অবস্থায় নেই। তার রং ও স্বাদ পরিবর্তন হয়ে গেছে। ফলে তাতে অজু জায়েজ না হওয়ার সন্দেহের কারণে লোকটি প্রশ্ন করেছিল।

২. আর নদীতে অসংখ্য নদীর প্রাণী মারা যায়। আর মৃতরা তো অপবিত্র তাই প্রশ্ন করেছিল।

৩. অথবা নদীতে সবদিক হতে সর্বদা নাপাক পড়তে থাকে, ফলে লোকটির সন্দেহ হলো যে, তা দ্বারা অজু চলবে কি না।

৪. কিছু সংখ্যক বলেন, হাদীসে এসেছে যে, إِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا فَمَاءُ الْبَحْرِ مُخْتَلِطٌ بِأَثَرِ الْغَضَبِ তাই প্রশ্ন করেছিল।

৫. কারো মতে, মূলত নদীর পানি হলো হযরত নূহ (আ.)-এর তুফানের অবশিষ্ট পানি, তাও তো আল্লাহর গজবের চিহ্ন, তাই তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যাবে কি না এ সন্দেহ হওয়ার কারণে লোকটি প্রশ্ন করেছিল।

اِسْمُ السَّائِلِ **প্রশ্নকারীর নাম :** তিনি হলেন মুদাইহী বা মুদলাহী গোত্রের আব্দুল্লাহ বা উবাইদুল্লাহ কিংবা আবদ।

سَبَبُ الْاِطْنَابِ فِي الْجَوَابِ **উত্তর দীর্ঘায়িত করার কারণ :** রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, সাগরের পানি দ্বারা অজু করতে অনুমতি আছে কি না ? জবাবে তিনি হ্যাঁ অথবা না বললেই তো যথেষ্ট হতো, অথচ তিনি هُوَ الطَّهُوْرُ مَاءُهُ এত দীর্ঘ বাক্য ব্যবহার করার হেতু কি ? এর জবাবে বলা যায় যে, একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, প্রশ্নকারী তার প্রশ্নে অসুবিধা ও ঠেকার সময় সমুদ্রের পানি ব্যবহার করার অনুমতি আছে কি না তা জানতে চেয়েছিল। যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধু نَعَمْ বা হাঁ, বলতেন; তখন প্রশ্নকারী মনে করত কেবলমাত্র ঠেকার সময় তা ব্যবহার করা জায়েজ আছে, অন্য সময় জায়েজ নেই। সুতরাং তার এ ধারণা বদল করে হুজুর ﷺ যে জবাব দিয়েছেন তার অর্থ হলো, ঠেকা হোক বা না হোক, সমুদ্রের পানি সর্ব অবস্থায় পবিত্র। যে কোনো অবস্থায় তা দ্বারা অজু গোসল করা জায়েজ আছে।

سَبَبُ الْاِزْدِيَادِ فِي الْجَوَابِ **উত্তরে কথা বৃদ্ধি করার কারণ :** রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল সমুদ্রের পানি সম্পর্কে, সামুদ্রিক প্রাণী সম্পর্কে তার কোনো জিজ্ঞাসা ছিল না ; কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তরে এ কথাটি বৃদ্ধি করেন وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ তথা তার মৃত হালাল। আলিমগণ এর নিম্নরূপ জবাব প্রদান করেন—

১. মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন যে, লোকটির প্রশ্ন দ্বারা জানা গেল যে, তারা সমুদ্রের পানির বিধান জানে না, ফলে রাসূল ﷺ ধারণা করলেন যে, তারা সমুদ্রের শিকারের বৈধতাও জানে না। কেননা, আয়াতে আমভাবে বলা হয়েছে— حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ফলে তিনি জবাবে তা বাড়িয়ে বলেছেন।

২. مِرْقَاتُ الصُّعُوْدِ গ্রন্থকার বলেন, প্রশ্নের দ্বারা যখন জানা গেল যে, মিঠা পানি শেষ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তেমনি খাবারও শেষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর খাবার ও পানি উভয়ের দিকে মানুষ মুখাপেক্ষী। এ জন্য রাসূল ﷺ পানির পবিত্রতা বর্ণনার সাথে সাথে মাছের হালাল হওয়ার কথাও বলে দিয়েছেন।

৩. অথবা পানির পবিত্রতা অতি মাশহুর হওয়া সত্ত্বেও যখন তারা জানে না, তখন সমুদ্রের মৃত মাছের বিধানও তাদের জানা থাকার কথা নয়, তাই রাসূল ﷺ এ কথাটিও বলে দিয়েছেন।

أَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ فِيْ حِلِّ حَيَوَانَاتِ الْمَاءِ **পানির জীবের হালাল হওয়া সম্পর্কে আলিমদের মতভেদ :**

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ (رح) : ইমাম শাফেয়ী (র.) থেকে কয়েকটি মত পাওয়া যায়, তবে বিশুদ্ধ মত হলো সমুদ্রের সব প্রাণী এমন কি সামুদ্রিক কুকুর-শূকরসহ সব প্রাণী হালাল। তাঁর দলিল—

١. قَوْلُهُ تَعَالَى اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ .

এখানে صَيْدٌ হলো মাসদার, যা مَفْعُوْلٌ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, যাকে শিকার করা যায়। ফলে সব রকম জীব-এর মধ্যে شَامِلٌ হয়ে গেছে।

٢. قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ اَلْحِلُّ مَيْتَتُهُ .

এখানে সাধারণভাবে মাছ বা অন্য প্রাণী সকলকে হালাল করা হয়েছে।

مَذْهَبُ الْاَحْنَافِ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, সমুদ্রের মাছ ব্যতীত সব প্রাণী হারাম। তাঁর দলিল—

١. قَوْلُهُ تَعَالٰى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ .

এখানে مَيْتَةٌ হলো عَامٌ চাই তা পানির উপরের হোক বা নিচের, এমনিভাবে শূকরও।

٢. قَوْلُهُ تَعَالٰى وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ .

আর ব্যাঙ, কাঁকড়া, সাপ ইত্যাদি خَبَائِثْ -এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

٣. رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الضِّفْدَعِ يُجْعَلُ شَحْمُهُ فِى الدَّوَاءِ فَنَهٰى ﷺ عَنْ قَتْلِهِ وَذٰلِكَ نَهْىٌ عَنْ اَكْلِهِ .

অতএব যখন ব্যাঙ খাওয়া হারাম প্রমাণিত হলো তখন মাছ ব্যতীত সমুদ্রের অন্যান্য প্রাণীও হারাম সাব্যস্ত হলো।

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ তাঁদের দলিলের জবাব :

১. আল্লাহর বাণী— اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ -এর صَيْد শব্দটিকে مَفْعُوْل অর্থে নেওয়া مَجَازْ কেননা, এটি মাসদার হিসেবে মূল অর্থ হবে اَلْاِصْطِيَادُ আর এটাই হলো حَقِيْقِىْ অর্থ। অতএব বিনা দলিলে حَقِيْقِىْ অর্থ ছেড়ে مَجَازِىْ অর্থে নেওয়া যায় না।

২. দ্বিতীয় দলিল— اَلْحِلُّ مَيْتَتُهُ টি যদিও আম ; কিন্তু অন্য হাদীসে তা খাস হয়ে গেছে, যেমন— اُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ السَّمَكُ وَالْجَرَادُ ফলে মাছ ব্যতীত পানির সকল জীব বের হয়ে গেছে।

وَعَنْ ٤٤٢ اَبِىْ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَهُ لَيْلَةَ الْجِنِّ مَا فِىْ اِدَاوَتِكَ قَالَ قُلْتُ نَبِيْذٌ قَالَ تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُوْرٌ - رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَ زَادَ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ فَتَوَضَّاَ مِنْهُ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ اَبُوْ زَيْدٍ مَجْهُوْلٌ وَصَحَّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَمْ اَكُنْ لَيْلَةَ الْجِنِّ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৪২. **অনুবাদ :** [তাবেয়ী] হযরত আবূ যায়েদ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, জিনের রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমার মশকে কি আছে? তিনি বলেন, আমি বললাম, নাবীয আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, খেজুর হলো উত্তম জিনিস, আর তা ভিজানো পানি হলো পবিত্রকারী।—[আবূ দাউদ]

আর আহমদ ও তিরমিযী উক্ত হাদীসে এ অংশটুকু বৃদ্ধি করেছেন যে, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তা দ্বারা অজু করলেন। তিরমিযী আরো বলেন, আবূ যায়েদ একজন অপরিচিত ব্যক্তি, [সুতরাং তার মাধ্যমে বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। অথচ] সহীহ সূত্রে ইবনে মাসউদের অপর শাগরেদ আলকামা হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমি জিনের রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে ছিলাম না। —[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

نَبِيْذ-এর সংজ্ঞা ও তার প্রকারভেদ :

আল্লামা আইনী (র.) বলেন, نَبِيْذ এরূপ পানীয়কে বলা হয় যা حِنْطَة ও زَبِيْب - تَمَر ، عَسَل দ্বারা বানানো হয়।

কারো মতে— هُوَ اَنْ يُلْقٰى فِى الْمَاءِ شَيْئٌ مِنَ التَّمَرِ لِتُخْرِجَ حَلَاوَتُهَا অর্থাৎ, পানিতে কিছু খোরমা ফেলা, যাতে পানিতে মিষ্টি প্রকাশ পায়।

اَقْسَامُ النَّبِيْذِ নবীযের প্রকারভেদ : نَبِيْذ তিন প্রকার—

১. যে পানিতে খোরমা অনেক সময় রাখার কারণে পানিতে سُكْر এসে গেছে, সর্বসম্মতিতে এটা দ্বারা অজুজায়েয নেই।

২. অথবা এত অল্প সময় খেজুর রেখেছে ফলে তাতে মিষ্টি আসেনি। এরূপ নাবীয দ্বারা সর্বসম্মতিতে অজু জায়েয।

৩. আর যে নাবীযে মিষ্টি এসেছে কিন্তু নেশা আসেনি, তবে এরূপ পানি দ্বারা অজু জায়েজ কি না এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।

اَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ فِى الْوُضُوْءِ بِالنَّبِيْذِ নাবীয দ্বারা অজু করার ব্যাপারে আলিমদের মতভেদ : যে নবীযে মিষ্টতা এসেছে, কিন্তু নেশা আসেনি ; তা দ্বারা অজু জায়েজ কি না ? এ বিষয়ে আলেমদের মাঝে মতভেদ দেখা যায়।

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَاَحْمَدَ وَمَالِكٍ وَاَبِى يُوْسُفَ (رحـ) : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, মালিক ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, এ রকম নাবীয দ্বারা অজু জায়েজ নেই। যদি অন্য পানি না থাকে তবে তায়াম্মুম করবে। তাঁদের দলিল—

١. قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاِنْ لَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا .

এখানে পানি না পাওয়ার কারণে তায়াম্মুম করার কথা বলা হয়েছে, আর নাবীয তো সাধারণ পানি নয়।

٢. عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ كُلُّ شَرَابٍ اَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ .

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَ الْاَوْزَاعِيِّ وَالْحَسَنِ الخ : ইমাম আবূ হানীফা, আওযাঈ, হাসান বসরী, ইকরিমাসহ অনেক সাহাবীর মতে খেজুরের নাবীয দ্বারা অজু করা জায়েজ। তাঁদের দলিল—

١. حَدِيْثُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَهُ لَيْلَةَ الْجِنِّ مَافِىْ اِدَاوَتِكَ قَالَ نَبِيْذٌ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُوْرٌ ، وَزَادَ فِى الْمَصَابِيْحِ وَتَوَضَّأَ مِنْهُ وَقَالَ ابْنُ الْهُمَامِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ .

রাসূল ﷺ تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُوْرٌ বলে অজু করেন এবং নামাজও পড়েন।

اَلْجَوَابُ عَنِ الْاِعْتِرَاضِ الْوَارِدِ عَلَى الْحَدِيْثِ হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদীসের উপর আরোপিত সমালোচনার জবাব :

১. ইমাম তিরমিযী আবূ যায়েদকে مَجْهُوْل বলেছেন।

বাদায়ে গ্রন্থকার বলেন— اَبُوْ زَيْدٍ مِنْ زُهَّادِ التَّابِعِيْنَ আর উক্ত হাদীসটি اِبْنُ مَسْعُوْد (رضـ) থেকে اَبُوْزَيْدْ ব্যতীতও ১৪ জন রাবী বর্ণনা করেছেন।

২. দ্বিতীয়ত ইমাম তিরমিযী বলেন যে, হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) সে রাতে রাসূলের সাথে ছিলেন না। এর জবাব হলো—

রাসূল ﷺ যখন জিনদের সমাবেশে যান তখন হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-কে মাঠের এক পার্শ্বে বসিয়ে যান। যেমন তিরমিযীর অপর বর্ণনায় এসেছে যে, فَاَجْلَسَهُ

অথবা জিনদের ঘটনা ছয়বার হয়েছে। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) সব জায়গায় না থাকলেও بَقِيْعُ الْغَرْقَد এ ছিলেন তা তিরমিযীর বর্ণনায়ই পাওয়া যায়। যেমন— فَاَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) حَتّٰى خَرَجَ بِهِ اِلٰى بَطْحَاءَ فَاَجْلَسَهُ

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ ইমাম শাফেয়ীসহ অন্যান্যদের দলিলের জবাব—

১. তাদের تَيَمُّم সম্পর্কীয় আয়াতের জবাব হলো, আয়াতে মতলক পানি না পাওয়া অবস্থায় তায়াম্মুম করতে বলা হয়েছে। এখানে نَبِيْذ ও সাবান ও زَعْفَرَان মিশ্রিতি পানির ন্যায় مُطْلَقْ পানি, শুধু স্বাদে একটু পরিবর্তন হয়েছে। ফলে তা দ্বারা অজু করতে কোনো অসুবিধা নেই।

২. হাদীসের জবাব এই যে, যে নবীযে নেশা আসে তা দ্বারা অজু করা আমাদের মতেও জায়েজ নয়। কাজেই এটা দিয়ে দলিল দেওয়াও ঠিক নয়।

وَعَنْ ٤٤٣ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ (رحـ) وَكَانَتْ تَحْتَ اِبْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّ اَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوْءً فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ مِنْهُ فَاَصْغٰى لَهَا الْاِنَاءَ حَتّٰى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَاٰنِىْ اَنْظُرُ اِلَيْهِ فَقَالَ اَتَعْجَبِيْنَ يَا اِبْنَةَ اَخِىْ قَالَتْ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجِسٍ اِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ اَوِ الطَّوَّافَاتِ ـ رَوَاهُ مَالِكٌ وَاَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِىُّ ـ

৪৪৩. অনুবাদ : [মহিলা তাবেয়ী] হযরত কাবশা বিনতে কা'ব ইবনে মালিক (র.) হতে বর্ণিত। তিনি আবূ কাতাদার পুত্রবধূ ছিলেন। তিনি বলেন, একদা আবূ কাতাদা তার বাড়িতে গেলেন, তখন হযরত কাবশা তাঁর জন্য অজুর পানি ঢেলে দেন। এ সময় একটি বিড়াল এসে অজুর পানি থেকে পানি পান করতে লাগল। আর হযরত আবূ কাতাদা (রা.) পাত্রটি তার জন্য কাত করে ধরলেন। কাবশা বলেন, তখন তিনি আমাকে দেখলেন যে, আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে আছি। [এটা দেখে] তিনি বললেন, হে ভাতিজি! তুমি কি এটা দেখে আশ্চর্যবোধ করছ ? আমি বললাম, হাঁ ; তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বিড়াল নাপাক নয়। কেননা, তা তোমাদের নিকট ঘনঘন বিচরণকারী বা বিচরণকারিণী সেবক সেবিকার মতো। [সুতরাং তার উচ্ছিষ্টকে নাপাক সাব্যস্ত করা হলে তোমাদের ভীষণ অসুবিধা হবে]। -[আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِخْتِلَافُ الْاَئِمَّةِ فِىْ سُؤْرِ الْهِرَّةِ বিড়ালের উচ্ছিষ্ট সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ :

مَذْهَبُ الشَّافِعِىِّ وَمَالِكٍ وَاَحْمَدَ ইমাম শাফেয়ী, মালিক ও আহমদ (র.)-এর মতে, বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পবিত্র। তাঁদের দলিল—

১. حَدِيْثُ اَبِىْ قَتَادَةَ اَصْغٰى لَهَا الْاِنَاءَ حَتّٰى شَرِبَتْ ـ

২. عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجِسٍ ـ

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ : ইমাম আবূ হানীফা (রা.)-এর মতে, বিড়ালের উচ্ছিষ্ট طَاهِرٌ مَعَ الْكَرَاهَةِ পবিত্র বটে, তবে মাকরূহ। তাঁর দলিল—

১. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ يُغْسَلُ الْاِنَاءُ اِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَاِذَا وَلَغَتْ فِيْهِ الْهِرَّةُ غُسِلَتْ مَرَّةً ـ

২. كَذٰلِكَ اَخْرَجَ رِوَايَةَ مَعْمَرٍ مَوْقُوْفًا عَلٰى اَبِىْ هُرَيْرَةَ فِى الْهِرِّ بَلَغَ فِى الْاِنَاءِ قَالَ اِغْسِلْهُ مَرَّةً وَاَهْرِقْهُ ـ

৩. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ طُهُوْرُ الْاِنَاءِ اِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ يُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَالْهِرَّةُ مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ ـ

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ তাঁদের দলিলের জবাব :

১. আবূ কাতাদার হাদীসকে ইবনে মানদা مَعْلُوْلٌ বলেছেন। কেননা, এর বর্ণনাকারী حُمَيْدَةُ ও كَبْشَةُ উভয়ই مَجْهُوْلٌ বর্ণনাকারী।

২. صَاحِبُ الْجَوْهَرِ النَّقِىِّ গ্রন্থকার বলেন, উক্ত হাদীসের সনদে اِضْطِرَابٌ রয়েছে।

৩. আর হযরত আয়েশা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসে اِنَّهُ لَيْسَتْ بِنَجِسٍ অংশটি দু'টি হাদীসে এসেছে, আর উভয়টি جَهَالَتْ رَاوِىْ-এর কারণে دَلِيْلٌ হিসাবে গ্রহণের উপযুক্ত নয়। (تَنْظِيْمُ الْاَشْتَاتِ)

اِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য : রাসূল ﷺ তাঁর আলোচ্য বাণী দ্বারা এটা বুঝিয়েছেন যে, বিড়াল একটি গৃহপালিত প্রাণী, ঘরের প্রতিটি স্থানেই তার বিচরণ রয়েছে। সুতরাং তার অভ্যাস অনুযায়ী প্রতিটি স্থানেই সে মুখ দেবে। খাদ্যদ্রব্য বা পানি তার মুখ হতে হেফাজত করা কষ্টকর। অতএব শরিয়ত এদের উচ্ছিষ্টকে নাপাক বলে ঘোষণা করলে এটা মানুষের জন্য সমস্যার বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। তাই রাসূল ﷺ এ সমস্যার প্রতি ইঙ্গিত করে তা পাক হওয়ার কথা বলেছেন।

وَعَنْ ٤٤٤ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اُمِّهٖ اَنَّ مَوْلَاتَهَا اَرْسَلَتْهَا بِهَرِيْسَةٍ اِلٰى عَائِشَةَ قَالَتْ فَوَجَدْتُّهَا تُصَلِّيْ فَاَشَارَتْ اِلٰى اَنْ ضَعِيْهَا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَاَكَلَتْ مِنْهَا فَلَمَّا انْصَرَفَتْ عَائِشَةُ مِنْ صَلَاتِهَا اَكَلَتْ مِنْ حَيْثُ اَكَلَتِ الْهِرَّةُ فَقَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجِسٍ اِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ وَاِنِّيْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا - رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ

৪৪৪. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত দাউদ ইবনে সালেহ ইবনে দীনার তাঁর মাতা হতে বর্ণনা করেন যে, তাঁর মাতা বলেছেন, একদা তাঁর মুক্তিদানকারিণী মনিবা তাঁকে কিছু 'হারিসা' [ফিরনি জাতীয় খাবার] দিয়ে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট পাঠালেন। তিনি বলেন, তখন আমি হযরত আয়েশা (রা.)-কে নামাজরত অবস্থায় পেলাম। তখন তিনি আমাকে ইশারা করলেন যে, তা রেখে দাও। এমতাবস্থায় একটি বিড়াল এলো এবং তা হতে খেতে লাগল, অতঃপর যখন হযরত আয়েশা (রা.) নামাজ হতে অবসর হলেন, তখন বিড়াল যে স্থান হতে খেয়েছে তিনিও সেখান থেকে খেলেন। আর বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- বিড়াল নাপাক নয়, তা তোমাদের কাছে বারবার গমনকারী সেবকের মতো। তিনি আরো বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি যে, তিনি বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পানি দ্বারা অজু করতেন। -[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** হযরত আয়েশা (রা.) বিড়াল যে স্থানে খেয়েছে ঐ স্থান হতেই খেয়েছেন, অথচ উত্তম ছিল ঐ স্থান বাদ দিয়ে অন্য স্থান দিয়ে খাওয়া। এর কারণ হলো, যদি তিনি অন্য স্থান দিয়ে খেতেন তবে হারীসা নিয়ে অগত মহিলাটি ধারণা করত যে, বিড়ালের উচ্ছিষ্ট হারাম। এরূপ ধারণা যাতে সৃষ্টি না হয় সেজন্য তিনি এরূপ করেছেন।

আর এতে বুঝা যায় যে, প্রয়োজনে নামাজের মধ্যে ইশারা করাও জায়েজ আছে, যদি তা নামাজের পরিপন্থি আমলে কাছীর না হয়। আর এটাও জানা যায় যে, বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পানি দ্বারা অজু করা জায়েজ আছে, যদিও বিশুদ্ধ পানি থাকতে তা দ্বারা অজু না করাই উত্তম বটে। ভালো পানি না পেলে সেই পানি দ্বারাই যে অজু করা যাবে তা দেখানোর জন্যই হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ করেছেন। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও তার অনুসারীদের অভিমত।

وَعَنْ ٤٤٥ جَابِرٍ (رض) قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَتَوَضَّأُ بِمَا اَفْضَلَتِ الْحُمُرُ قَالَ نَعَمْ وَبِمَا اَفْضَلَتِ السِّبَاعُ كُلُّهَا - رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ

৪৪৫. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, গাধার উচ্ছিষ্ট পানি দ্বারা আমরা কি অজু করতে পারি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ এবং ঐ সমস্ত পানি দ্বারাও যা হিংস্র প্রাণী অবশিষ্ট রেখেছে? -[শরহুস সুন্নাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِيْ سُؤْرِ الْحِمَارِ **গাধার উচ্ছিষ্ট পানির ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ :**

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ : ইমাম শাফেয়ী (রা.)-এর মতে, গাধার উচ্ছিষ্ট পাক। কেননা, প্রত্যেক জীবের চামড়া দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়, আর গাধার চামড়া দ্বারা যখন উপকার অর্জন করা যায় তখন তার উচ্ছিষ্ট পাক হতে অপত্তি কোথায়? দ্বিতীয়ত হযরত জাবের (রা.) -এর বর্ণিত উপরিউক্ত হাদীসও এর পক্ষে দলিল হিসাবে গ্রহণযোগ্য।

مَذْهَبُ الْاَحْنَافِ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, গাধার উচ্ছিষ্ট নাপাক। যেমন, হাদীসে এসেছে-

اِنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَمَرَ مُنَادِيًا يُنَادِيْ بِاِكْفَاءِ الْقُدُوْرِ الَّتِيْ فِيْهَا لُحُوْمُ الْحُمُرِ فَاِنَّهَا رِجْسٌ - (رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ)

তবে অধিকাংশ হানাফী মাশায়েখের মতে, গাধা ও খচ্চরের উচ্ছিষ্ট مَشْكُوْكٌ বা সন্দেহযুক্ত। আবার কেউ কেউ একে সন্দেহের সাথে পবিত্র বলেন। আবার কারো মতে, পবিত্রকরণের ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। একেই বিশুদ্ধ মত হিসেবে অভিহিত করেছেন। كَمَا وَرَدَ فِي الْخَيْبَرِ اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَمَرَ بِاِلْقَاءِ الْقُدُوْرِ .

এজন্য গাধা ও খচ্চরের উচ্ছিষ্ট পানি ব্যতীত অন্য কোনো পানি না থাকলে অজুও তায়াম্মুম উভয়ের হুকুম দেওয়া হয়েছে।

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الشَّوَافِعِ :

১. ইমাম শাফেয়ী (র.) ও তার অনুসারীদের যুক্তিমূলক দলিলের জবাব এই যে, উচ্ছিষ্টের সম্পর্ক হলো গোশতের সাথে, চামড়ার সাথে নয়। কেননা, মুখের লালা গোশত হতেই তৈরি হয়। কাজেই এটা দ্বারা দলিল দেওয়া ঠিক নয়।

২. দ্বিতীয়ত জাবেরের হাদীসটি হলো مُرْسَلْ কেননা, তার বর্ণনাকারী دَاوُدُ بْنُ حُصَيْنٍ হযরত جَابِرْ-এর সাক্ষাৎ পাননি।

اِخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِىْ سُؤْرِ السِّبَاعِ **হিংস্র জন্তুর উচ্ছিষ্টের ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ :**

مَذْهَبُ الشَّافِعِىِّ : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, শূকর ও কুকুর ব্যতীত সকল হিংস্র প্রাণীর উচ্ছিষ্ট পাক। তাঁর দলিল—

১. حَدِيْثُ جَابِرٍ سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ اَنَتَوَضَّأُ بِمَا اَفْضَلَتِ الْحُمُرُ قَالَ نَعَمْ وَبِمَا اَفْضَلَتِ السِّبَاعُ كُلُّهَا .

২. وَفِىْ رِوَايَةٍ سُئِلَ عَنِ الْحِيَاضِ الَّتِىْ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ فَقِيْلَ اِنَّ الْكِلَابَ وَالسِّبَاعَ تَرِدُ عَلَيْهَا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَهَا مَا اَخَذَتْ فِىْ بُطُوْنِهَا وَمَا بَقِىَ شَرَابٌ وَطَهُوْرٌ .

مَذْهَبُ الْاَحْنَافِ : হানাফীদের মতে, সকল হিংস্র প্রাণীর উচ্ছিষ্ট অপবিত্র।

১. ওলামায়ে আহনাফদের প্রথম দলিল—

عَنْ يَحْيٰى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ عُمَرَ خَرَجَ فِىْ رَكْبٍ فِيْهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ حَتّٰى وَرَدُوْا حَوْضًا فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ هَلْ تَرِدُ حَوْضَكَ السِّبَاعُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ لَا تُخْبِرْنَا .

২. এ ছাড়া হিংস্র জন্তুর লালা তার মাংস হতেই সৃষ্টি হয়। মাংস হারাম হওয়ার কারণে তার লালাও হারাম, তাই তার লালাযুক্ত উচ্ছিষ্টও নাপাক।

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الشَّافِعِىِّ : ইমাম শাফেয়ীর দলিলের জবাব—

১. হযরত জাবেরের হাদীসটি مُرْسَلْ কেননা, তার বর্ণনাকারী دَاوُدُ بْنُ حُصَيْنٍ হযরত জাবেরের সাক্ষাৎ পাননি।

২. অথবা তা অধিক পানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৩. অথবা তা হারামের হুকুম আসার পূর্বেকার হাদীস।

৪. আর দ্বিতীয় হাদীসটি مَعْلُوْلْ কেননা, তার বর্ণনাকারী আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম مَعْلُوْلْ রাবী।

৫. অথবা এটি حُرْمَتٌ সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বেকার হাদীস।

وَعَنْ ٤٤٦ اُمِّ هَانِئٍ (رضـ) قَالَتْ اِغْتَسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ وَ مَيْمُوْنَةُ فِىْ قَصْعَةٍ فِيْهَا اَثَرُ الْعَجِيْنِ . رَوَاهُ النَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ

৪৪৬. **অনুবাদ :** হযরত উম্মেহানী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও উম্মুল মু'মিনীন হযরত ময়মূনা (রা.) একটি [কাঠের] গামলায় গোসল করেছেন, তাতে খামির করা আটার চিহ্ন ছিল। –[নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ্]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **-হাদীসের ব্যাখ্যা :** এখানে একই গামলায় গোসল করার অর্থ হলো– গামলা হতে উভয়ে অঞ্জলি ভরে বা পাত্রে করে পানি নিয়ে গোসল করেছেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় পরিচ্ছেদ

عَنْ ٤٤٧ يَحْيٰى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ اِنَّ عُمَرَ (رضـ) خَرَجَ فِىْ رَكْبٍ فِيْهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ حَتّٰى وَرَدُوْا حَوْضًا فَقَالَ عَمْرٌو يَاصَاحِبَ الْحَوْضِ هَلْ تَرِدُ حَوْضَكَ السِّبَاعُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ

৪৪৭. **অনুবাদ :** হযরত ইয়াহইয়া ইবনে আব্দুর রহমান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত ওমর (রা.) একটি কাফেলার সাথে বের হলেন। তাদের মধ্যে হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)ও ছিলেন। অবশেষে তারা এক হাউজের নিকট পৌঁছলেন, তখন হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) হাউজের মালিককে জিজ্ঞেস করলেন যে, হে হাউসের মালিক! আপনার হাউজে কি হিংস্র জন্তুরা আসে ? তখন হযরত ওমর ইবনুল

الْخَطَّابِ يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ لَا تُخْبِرْنَا فَإِنَّا نَرِدُ عَلَى السِّبَاعِ وَتَرِدُ عَلَيْنَا ـ رَوَاهُ مَالِكٌ وَزَادَ رَزِيْنٌ قَالَ زَادَ بَعْضُ الرُّوَاةِ فِيْ قَوْلِ عُمَرَ وَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَهَا مَا اَخَذَتْ فِيْ بُطُوْنِهَا وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَنَا طَهُوْرٌ وَ شَرَابٌ ـ

খাত্তাব (রা.) বললেন– হে হাউজের মালিক! আপনি আমাদেরকে এই সংবাদ দেবেন না। কেননা, কখনো আমরা হিংস্র জন্তুদের পানি পান করে যাওয়ার পর আমরা পানি ব্যবহার করতে আসি। আর কখনো আমাদের পানি ব্যবহার করে চলে যাওয়ার পর তারা আসে। [অর্থাৎ পানির ঘাটে কখনো তারা আসে, আবার কখনো আমরা আসি] –[মালিক] ইমাম রাযীন এই হাদীসটিতে এ কথাটুকু ও বৃদ্ধি করেছেন যে, কোনো কোনো বর্ণনাকারী হযরত ওমরের বাক্যের মধ্যে এটাও বলেছেন যে, "আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি– জন্তু বা যা পেটে নিয়েছে [তথা পান করেছে] তা তাদের জন্য। আর যা অবশিষ্ট রয়েছে তা আমাদের জন্য পবিত্রকারী ও পানযোগ্য।

وَعَنْ ٤٤٨ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْحِيَاضِ الَّتِيْ بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِيْنَةِ تَرِدُهَا السِّبَاعُ وَ الْكِلَابُ وَ الْحُمُرُ عَنِ الطُّهْرِ مِنْهَا فَقَالَ لَهَا مَاحَلَّتْ فِيْ بُطُوْنِهَا وَلَنَا مَا غَبَرَ طُهُوْرٌ ـ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

৪৪৮. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মক্কা-মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত সে সব কূপসমূহের পবিত্রতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যেগুলোতে হিংস্র জন্তু, কুকুর, ও গাধাসমূহ পানি পান করতে আসে। জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন– তাদের পেটে যা ধারণ করেছে তা তাদের জন্য, আর তারা যা অবশিষ্ট রেখেছে তা আমাদের জন্য পবিত্রকারী। –[ইবনে মাজাহ্]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ-**হাদীসের ব্যাখ্যা :** মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী কূপসমূহ গভীর ছিল। পথ অতিক্রমকারী কাফেলার জন্য এ সকল কূপই একমাত্র পানি লাভের উৎস ছিল। তাই সেগুলোতে হিংস্র জন্তু পানি পান করলে ও নাপাক হতো না।

وَعَنْ ٤٤٩ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضـ) قَالَ لَا تَغْتَسِلُوْا بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ فَاِنَّهُ يُوْرِثُ الْبَرَصَ ـ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيْ

৪৪৯. অনুবাদ : হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূর্যের কিরণে গরম করা পানিতে গোসল করো না। কেননা, তা শ্বেত রোগ সৃষ্টি করে। –[দারাকুতনী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** কিছু সংখ্যক ওলামা উক্ত হাদীসটিকে দূর্বল বলেছেন, তবে সহীহ সাব্যস্ত হলেও তাকে স্থায়ী অভ্যাসে পরিণত করতে নিষেধ করেছেন বলে অনুমিত হয়। কেননা, পানি তো পবিত্রই রয়েছে। ফলে তা দ্বারা গোসল করতে শরিয়তের কোনো বাঁধা নেই।

এ হাদীসের উপর ভিত্তি করে ইমাম শাফেয়ী (র.) সূর্যের কিরণে উত্তপ্ত পানি ব্যবহার করাকে মাকরূহ বলেছেন। তবে পরবর্তী যুগের শাফেয়ীগণ মাকরূহ বলা পরিহার করেছেন। আর ইমাম আবূ হানীফা, মালেক ও আহমদ (র.)-এর মতে সূর্যের তাপে গরম করা পানি ব্যবহার করা মাকরূহ নয়। আর আগুনে গরম করা পানি সর্বসম্মতিক্রমে মাকরূহ নয়।

بَابُ تَطْهِيْرِ النَّجَاسَاتِ
পরিচ্ছেদ : অপবিত্রকে পবিত্রকরণ

تَطْهِيْر শব্দটি বাবে تَفْعِيْل -এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ– পবিত্র করা। আর نَجَاسَاتٌ শব্দটি نَجَسٌ-এর বহুবচন' শাব্দিক অর্থ– নাপাক বা অপবিত্র বস্তুসমূহ।

نَجَاسَة দু'ভাবে বিভক্ত। যথা–

১. প্রথমতঃ نَجَاسَةٌ ذَاتِىْ [সত্তাগত অপবিত্র] তথা যা সৃষ্টিগতভাবেই অপবিত্র যেমন– শূকর, কুকুর, পেশাব-পায়খানা। এগুলোকে পবিত্র করার কোনো পন্থা নেই।

২. দ্বিতীয়তঃ نَجَاسَةٌ عَارِضِىْ [অস্থায়ী বা বহিরাগত কারণে অপবিত্র] অর্থাৎ, অন্য কোনো অপবিত্র বস্তু তার সাথে লেগে যাওয়ায় তা সাময়িকভাবে অপবিত্র হয়েছে। এটা পবিত্র করণের বিভিন্ন মাধ্যম আছে, যেমন শরীর বা কাপড়ে লাগলে ধোয়ার মাধ্যমে, তরবারি বা আয়নায় লাগলে ঘষার মাধ্যমে, তুলাতে লাগলে ধুনার মাধ্যমে ইত্যাদি।

আলোচ্য অধ্যায়ে এই দ্বিতীয় প্রকারের অপবিত্রতার কথাই বলা হয়েছে– তথা কোনো পবিত্র বস্তু অপবিত্র বস্তু দ্বারা অপবিত্র হয়ে গেলে তা কিভাবে পবিত্র করা হবে– এ অধ্যায়ে তৎসংক্রান্ত হাদীসগুলো সংকলিত হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤٥٠ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِىْ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ طُهُوْرُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُوْلٰهُنَّ بِالتُّرَابِ .

৪৫০. **অনুবাদ** : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– যখন তোমাদের কারো পাত্র থেকে কুকুর পানি পান করে, সে যেন ওটাকে সাতবার ধৌত করে নেয়।–[বুখারী ও মুসলিম]

আর মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে যে, তিনি বলেছেন– তোমাদের কারও পাত্রে যখন কুকুর মুখ দেয়, তখন তার পবিত্রকারী পদ্ধতি হলো সাতবার ধৌত করা এবং প্রথমবার মাটি দ্বারা ঘষা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

أَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ فِىْ حُكْمِ سُؤْرِ الْكَلْبِ وَفِىْ كَيْفِيَّةِ تَطْهِيْرِ إِنَائِهِ কুকুরের মুখ দেওয়া পাত্রের জিনিসের বিধান এবং পাত্র পবিত্র করার পদ্ধতি সম্পর্কে ফিকহবিদদের মতামত :

حُكْمُ سُؤْرِ الْكَلْبِ কুকুরের উচ্ছিষ্টের বিধান : কুকরের উচ্ছিষ্ট পবিত্র না অপবিত্র এই বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

مَذْهَبُ الْإِمَامِ مَالِكٍ : এই বিষয়ে ইমাম মালেক (র.) থেকে ৪টি মত পাওয়া যায়। (ক) অপবিত্র (খ) গ্রামের কুকুরের ঝুটা পবিত্র। আর শহরের কুকুরের ঝুটা অপবিত্র (গ) যে সকল কুকুর লালন পালন করা জায়েজ, সেগুলোর উচ্ছিষ্ট পবিত্র, এ ছাড়া অন্যগুলোর উচ্ছিষ্ট অপবিত্র (ঘ) তার বিশুদ্ধ অভিমত হলো কুকুরের উচ্ছিষ্ট মতলকভাবে পবিত্র। তাঁর দলিল–

১. قَوْلُهُ تَعَالٰى قُلْ لَّآ أَجِدُ فِيْمَآ أُوْحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ إِلَّآ أَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ এই আয়াতে سُؤْرُ الْكَلْبِ কে অপবিত্র বলা হয় নি।

২. কুকুরের শিকার হালাল হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ বলেন– فَكُلُوْا مِمَّا اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ অতএব কুকুরে শিকার হালাল হলে উচ্ছিষ্টও হালাল হবে।

৩. সাতবার ধৌত করার হুকুম নাপাক হওয়ার কারণে নয়; বরং তা اَمْرِ تَعَبُّدِىْ হিসেবে।

مَذْهَبُ الْاَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ : ইমাম আবূ হানিফা, শাফেয়ী ও আহমদ (র.)-এর মতে, কুকুরের উচ্ছিষ্ট অপবিত্র। তাদের দলিল–

١. قَوْلُهُ تَعَالٰى "وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ" ـ

٢. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِىْ إِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيُهْرِقْهُ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

٣. قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِىْ إِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ مَالِكٍ : ইমাম মালেকের দলিলের জবাব–

১. অনেক হারাম হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে, কুরআন দ্বারা যাবতীয় হারাম সাব্যস্ত হয়নি।

২. فَكُلُوْا مِمَّا اَمْسَكْنَ দ্বারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের শিকার হালাল বলা হয়েছে, তবে তার উচ্ছিষ্টকে হালাল বলা হয়নি।

৩. সাতবার ধৌতকরণ اَمْرِ تَعَبُّدِىْ হিসেবে নয়; বরং নাপাক হওয়ার কারণে।

حُكْمُ تَطْهِيْرِ الْاِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ : যে পাত্রে কুকুর মুখ দিয়েছে সে পাত্র পবিত্রকরণের পদ্ধতি সম্পর্কে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। যথা—

১. مَذْهَبُ الشَّافِعِىِّ : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে সাতবার ধৌত করতে হবে। তাঁর দলিল–

١ ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِىْ إِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ـ

٢ ـ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ طُهُوْرُ إِنَاءِ اَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ اَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ـ

২. مَذْهَبُ اَحْمَدَ : ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে ৮ বার ধৌত করতে হবে; আর ৮ম বার মাটি দ্বারা ঘষতে হবে। তাঁর দলিল–

١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَ عَفِّرُوْهُ فِى الثَّامِنَةِ بِالتُّرَابِ ـ

৩. مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তিনবার ধৌত করতে হবে। তাঁর দলিল–

١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِىْ إِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيُهْرِقْهُ وَلْيَغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ـ رَوَاهُ اِبْنُ عَدِىٍّ

٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّهُ يَغْسِلُ ثَلَاثًا اَوْ خَمْسًا اَوْ سَبْعًا ـ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِىُّ

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ :

১. সাতবার ধৌত করার হাদীস রহিত হয়ে গেছে। কেননা, উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) নিজেই তিনবার ধোয়ার হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২. অথবা সাতবার ধোয়ার করার কথা মোস্তাহাবের জন্য বলা হয়েছে।

৩. তিনবার ধৌত করা পবিত্রতার জন্য, আর সাতবার ধৌত করা পরিপূর্ণভাবে পবিত্রতার জন্য বলা হয়েছে।

৪. মাটি দ্বারা ঘষার কথা মোস্তাহাবের জন্য।

৫. অথবা চিকিৎসা বিজ্ঞান মতে মাটি দ্বারা ঘষা জীবাণু ধ্বংসের জন্য। কাজেই প্রমাণিত হলো যে, তিনবার ধৌত করাই ওয়াজিব।

اُوْلٰهُنَّ بِالتُّرَابِ -এর ব্যাখ্যা : মাটির দ্বারা ঘষার কথাটি বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে। যেমন– اُوْلٰهُنَّ بِالتُّرَابِ ـ فِى الثَّامِنَةِ بِالتُّرَابِ ـ اِحْدٰهُنَّ بِالتُّرَابِ ইত্যাদি। এই ধরনের বিচিত্র বর্ণনায় ভরা হাদীস আমলযোগ্য নয়। অথবা সন্দেহ দূর ও মনের ওয়াস্‌ওয়াসা দূর করণের নিমিত্তেই মাটিতে ঘষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অথবা আধুনিক কালের বিজ্ঞানের আবিষ্কার যে, কুকুরের লালার মধ্যে এক প্রকার ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম বিষাক্ত জীবাণু আছে, যা মাটিতে ঘষলে নষ্ট হয়ে যায়, সম্ভবত: মাটিকে উহার প্রতিষেধক হিসেবে মাটিতে ঘষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ওয়াজিব হিসেবে নয়। এর দ্বারা ভালোভাবে ধৌত করার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

٤٥١ - وَعَنْهُ قَالَ قَامَ اَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِى الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ دَعُوْهُ اَهْرِيْقُوْا عَلٰى بَوْلِهِ سِجْلًا مِّنْ مَاءٍ اَوْ ذَنُوْبًا مِنْ مَاءٍ فَاِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

৪৫১. অনুবাদ : উক্ত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা একজন বেদুইন দাঁড়িয়ে মসজিদে পেশাব করে দিল। ফলে লোকেরা তাকে ঘিরে ধরল। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, তাকে ছেড়ে দাও এবং তার পেশাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও, অথবা তিনি اَوْ ذَنُوْبًا مِنْ مَاءٍ বলেছেন। [উল্লেখ্য যে, ذَنُوْب -এর অর্থও বালতি] কেননা তোমাদিগকে [মানুষের জন্য] সহজ পন্থা অবলম্বনকারী হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে; জটিলতা সৃষ্টিকারী রূপে নয়। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِسْمُ الْاَعْرَابِيِّ **বেদুইন লোকটির নাম :** যে বেদুইন লোকটি মসজিদে পেশাব করেছিল, সে ছিল নও মুসলিম। তার পরিচিতি সম্পর্কে কয়েকটি বর্ণনা পাওয়া যায়।

১. আব্দুল্লাহ ইবনে নাফে মাদানীর বর্ণনা মতে, তিনি হলেন– اَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ (رضـ)

২. اَبُو الْحُصَيْنِ بْنُ فَارِسٍ -এর মতে, তিনি عُيَيْنَةُ بْنُ حُصَيْنٍ (رضـ)

৩. اَبُوْ مُوْسَى الْمَدِيْنِيُّ -এর মতে, তিনি হলেন ذُو الْخُوَيْصَرَةِ কিন্তু হাফেজ ওলী উদ্দীন বলেন ذُو الْخُوَيْصَرَةِ-এর মতটি ঠিক নয়। কেননা, সে ছিল মুনাফিক।

اَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ فِىْ طَهَارَةِ نَجَسِ الْاَرْضِ **অপবিত্র জমিনকে পবিত্র করার ব্যাপারে আলিমদের মতামত :**

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَ مَالِكٍ وَ زُفَرَ الخ : ইমাম শাফেয়ী, মালেক, যুফার সহ অনেক আলিমের মতে, অপবিত্র জমিন পানি ঢালার মাধ্যমে শুধু পবিত্র হয়, শুকানোর মাধ্যমে নয়। তাদের দলিল–

١. اِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ فِىْ بَوْلِ الْاَعْرَابِيِّ دَعُوْهُ اَهْرِيْقُوْا عَلٰى بَوْلِهِ سِجْلًا مِنْ مَاءٍ -

٢. عَنْ اَنَسٍ (رضـ) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَمَرَ رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ -

যদি শুকানোর মাধ্যমে পাক হয়ে যায় তবে কষ্ট করে পানি ঢালার দরকার ছিল না।

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَ اَبِىْ يُوْسُفَ : ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে পানি ঢালা ও শুকানো উভয়ের মাধ্যমে জমিন পবিত্র হয়। তাঁদের দলিল–

١. وَفِىْ اَبِىْ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) كُنْتُ اَبِيْتُ فِى الْمَسْجِدِ فِىْ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَتِ الْكِلَابُ تَبُوْلُ وَ تُدْبِرُ الْمَسْجِدَ فَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرُشُّوْنَ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ -

٢. وَ ذُكِرَ فِى الْمَبْسُوْطِ مَرْفُوْعًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَيُّمَا اَرْضٍ جَفَّتْ فَقَدْ ذَكَتْ اَىْ فَقَدْ طَهُرَتْ -

٣. وَعَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ ذَكٰوةُ الْاَرْضِ يُبْسُهَا -

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ **তাদের দলিলের জবাব :**

১. তারা যে দু'টি হাদীস দলিল হিসেবে পেশ করেছেন, তা তো হানাফীদের মতের বিপরীত নয়। কেননা তারা ও পানি ঢালাকে পবিত্র মনে করেন। তবে পবিত্রতা শুধু পানি ঢালাতে নিহিত তা বলেন না।
আর তখন নির্দিষ্ট করে পানি ঢালার হুকুম এই জন্য দিয়েছেন যে,

১. তখন দিনের বেলা ছিল, নামাজের ওয়াক্তের পূর্বে তা শুকাবে না বিধায় পানি ঢালতে বলেছেন।

২. অথবা তখন উভয়ভাবে পবিত্রকরণ সহজ ছিল বিধায় পানি ঢালতে বলেছেন।

৩. ইবনুল মালেক বলেন– তখন দুর্গন্ধ কমানোর জন্য এরূপ করতে বলেছেন।

৪. অথবা মসজিদের জমিন খুব শক্ত ছিল; তাই ধোয়ার জন্য আদেশ করেছেন। কেননা, পাথর বা শক্ত মাটি ধৌত করলে পবিত্র হয়ে যায়।

سَبَبُ الْاَمْرِ بِتَرْكِ الرَّجُلِ **লোকটিকে ছেড়ে দিতে নির্দেশ দেওয়ার কারণ :** বেদুইন লোকটির মসজিদে প্রস্রাব করতে দেখেও রাসূল ﷺ লোকটিকে বাধা দিতে নিষেধ করেন। এর কারণ–

১. লোকটি ছিল নও মুসলিম, মসজিদের আদব-কায়দা সম্পর্কে তার জানা ছিল না, তাই তাকে বাধা দিতে নিষেধ করেছেন।
২. অথবা তাকে বাধা দিলে তার নড়াচড়ার কারণে মসজিদের একাধিক স্থানে প্রস্রাব পড়তে পারে।
৩. অথবা প্রস্রাব করা কালীন বাধাদিলে হঠাৎ প্রসাব বন্ধ হলে মারাত্মক ধরনের রোগের সৃষ্টি হতে পারে।

وَعَنْ ٤٥٢ أَنَسٍ (رض) قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِى الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ فَقَامَ يَبُوْلُ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَهْ مَهْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُزْرِمُوْهُ دَعُوْهُ فَتَرَكُوْهُ حَتّٰى بَالَ ثُمَّ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ اِنَّ هٰذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَىْءٍ مِنْ هٰذَا الْبَوْلِ وَالْقَذَرِ وَاِنَّمَا هِىَ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ اَوْ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَ اَمَرَ رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৫২. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মসজিদে ছিলাম। এমন সময় একজন বেদুইন এসে মসজিদে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ বললেন, থাম! থাম! রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন– তোমরা তাকে [প্রস্রাব করা হতে] বাধা প্রদান করো না। তাকে ছেড়ে দাও! ফলে তাঁরা তাকে পেশাব করতে সুযোগ দিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ডাকলেন এবং বললেন– এই সব মসজিদে এরূপ প্রস্রাব-পায়খানা করা সঙ্গত কাজ নয়। এগুলো শুধু আল্লাহর জিকির, নামাজ ও কুরআন পাঠের জন্য। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঠিক এ বাক্য বলেছেন অথবা এরূপ অন্য বাক্য বলেছেন। বর্ণনাকারী বলেন তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ জনতার মধ্য হতে একজনকে [উক্ত স্থানে পানি ঢেলে দিতে] আদেশ দিলেন। সে এক বালতি পানি নিয়ে আসল এবং তার উপর ঢেলে দিল। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٤٥٣ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ (رض) قَالَتْ سَأَلَتْ اِمْرَأَةٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَأَيْتَ اِحْدٰنَا اِذَا اَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَصَابَ ثَوْبَ اِحْدٰكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ ثُمَّ لِتُصَلِّىْ فِيْهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৫৩. **অনুবাদ :** হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল যে, হে আল্লাহর রাসূল! বলুন, আমাদের মধ্যে কোনো মহিলার কাপড়ে যদি ঋতুস্রাবের রক্ত লাগে তবে সে কি করবে? জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন– যখন তোমাদের কারও কাপড়ে ঋতুস্রাবের রক্ত লাগে [আর তা শুকিয়ে যায়] তবে সে যেন প্রথমে আঙ্গুল দ্বারা ঘর্ষণ করে। অতঃপর পানি দ্বারা ধুয়ে ফেলে। তারপর তা পরে নামাজ পড়ে [ভেজা হোক বা শুকনা হোক]। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : تَنْضَحُ শব্দটির অর্থ– পানি ঢেলে ধীরে ধীরে ধুয়ে ফেলবে, আর لِتَقْرُصْهُ -এর অর্থ শুকনা হলে ঘষে ফেলবে আর ভিজা হলে পানি দিয়ে মর্দন করবে, শাফেয়ীদের মতে تَنْضَحُ অর্থ– পানির ছিটা দিবে। তাদের এই অর্থটি ঠিক নয়; কেননা পানির ছিটা দিলে রক্ত দূর না হয়ে বরং আরো শক্ত হয়ে লেগে যাবে।

وَعَنْ ٤٥٤ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ (رضـ) قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيْبُ الثَّوْبَ فَقَالَتْ كُنْتُ اَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيَخْرُجُ اِلَى الصَّلٰوةِ وَاَثَرُ الْغَسْلِ فِىْ ثَوْبِهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৫৪. **অনুবাদ :** হযরত সুলাইমান ইবনে ইয়াসার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা.)-কে কাপড়ে যে বীর্য লেগে থাকে তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি জবাবে বললেন– আমি এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাপড় হতে ধৌত করতাম। অতঃপর তিনি নামাজে বের হতেন, এমতাবস্থায় তাঁর কাপড়ে ধৌত করার চিহ্ন লেগে থাকত। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٤٥٥ الْاَسْوَدِ وَهَمَّامٍ عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كُنْتُ اَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَبِرِوَايَةِ عَلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ وَفِيْهِ ثُمَّ يُصَلِّىْ فِيْهِ .

৪৫৫. **অনুবাদ :** হযরত আসওয়াদ ও হাম্মাম [তাবেয়ীদ্বয়] হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন– আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাপড় হতে বীর্য খুঁচিয়ে ফেলতাম। –[মুসলিম]

[তাবেয়ী] হযরত আলকামা এবং আসওয়াদের রেওয়ায়েতেও হযরত আয়েশা (রা.) থেকে এরূপ বর্ণনার পর তাতে এ কথাটুকুও রয়েছে যে, "অতঃপর তিনি সে কাপড়েই নামাজ পড়তেন।"

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْحَدِيْثَيْنِ দু'টি হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব : হযরত সুলাইমান বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, হযরত আয়েশা (রা.) বীর্য ধুয়ে ফেলতেন। আর পরের হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, তিনি বীর্যকে খুঁটে ফেলে দিতেন। সুতরাং উভয়ের মধ্যে বাহ্যতঃ দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়, যার সমাধান নিম্নরূপ–

সমাধান : এখানে উল্লেখ্য যে, বীর্য দুই রকম শুকনা ও ভেজা, যদি বীর্য শুকনা হয় তবে খুঁচিয়ে ফেললে যদি বীর্যের চিহ্ন দূরীভূত হয়ে যায় তবে কাপড় পবিত্র হয়ে যাবে। যা হযরত আসওয়াদ ও হাম্মামের হাদীসের অর্থ।

আর বীর্য ভেজা হলে তা ধোয়া ছাড়া পবিত্র হবে না। কেননা, তা সারা শরীরে বিস্তৃত হয়। আর সুলাইমানের হাদীসের বর্ণনায় ভেজা বীর্যেরই অর্থ করা হয়েছে, যেমনি আবূ আওয়ানার সহীহ গ্রন্থে আছে যে, বীর্য শুষ্ক হলে আমরা তা টোকা দিয়ে ফেলে দিতাম, আর ভেজা হলে ধুয়ে ফেলতাম। কাজেই উভয় হাদীসের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই।

اِخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِىْ نَجَاسَةِ الْمَنِيِّ বীর্য অপবিত্র হওয়ার ব্যাপারে উলামাদের মতভেদ : বীর্য পবিত্র না অপবিত্র এই বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَاَحْمَدَ وَاِسْحَاقَ : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক ও দাউদ যাহেরীর মতে বীর্য পবিত্র। তাদের দলিল–

১. হযরত আয়েশা (রা.) বলেন كُنْتُ اَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ এখানে فَرْك مَنِى দ্বারা বুঝা যায় যে, বীর্য পবিত্র।

২. আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَخَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا এখানে বীর্যকে পানি বলা হয়েছে, তাই পানির ন্যায় বীর্যও পাক।

৩. বীর্য দ্বারা اَنْبِيَاء كِرَام কে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাই তা পবিত্র হওয়াই উচিত।

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمَالِكٍ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ-ইমাম আবূ হানীফা, মালেক ও সুফিয়ান ছাওরী (র.)-এর মতে বীর্য অপবিত্র। তাদের দলিল–

١ ـ قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ـ

٢ ـ عَنْ عَائِشَةَ (رض) اَنَّهَا قَالَتْ فِى الْمَنِيِّ اِذَا اَصَابَ الثَّوْبَ اِذَا رَأَيْتَهُ فَاغْسِلْهُ وَاِنْ لَمْ تَرَهُ فَانْضَحْهُ ـ

٣ ـ عَنْ مَيْمُوْنَةَ (رض) قَالَتْ اَدْنَيْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فِى الْاِنَاءِ ثُمَّ اَفْرَغَ بِهٖ عَلَى الْجَنَابَةِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهٖ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْاَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيْدًا ـ

এ ছাড়াও আরো অনেক প্রমাণ আছে, যা দ্বারা বুঝা যায় যে, বীর্য অপবিত্র।

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ : বিরুদ্ধবাদীদের দলিলের জবাব–

১. হযরত আয়েশা (রা.)-এর فَرْكُ مَنِىٍّ দ্বারা বীর্যের পবিত্রতা বুঝায় না; বরং অপবিত্রতাকেই বুঝায়।

২. বীর্যের উপর مَاءٌ শব্দ প্রয়োগ হওয়ার করণে তার পবিত্রতা সাব্যস্ত হয় না। কেননা, অন্যান্য প্রাণীর বীর্যকেও কুরআনে مَاءٌ বলা হয়েছে। যথা وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ

৩. বীর্য দ্বারা নবীদেরকে যেমন সৃষ্টি করা হয়েছে তেমনি বীর্য দ্বারা তো ফেরাউন, হামান, শাদ্দাদ ও নমরুদকেও সৃষ্টি করা হয়েছে।

وَعَنْ ٤٥٦ اُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ (رض) اَنَّهَا اَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيْرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَجْلَسَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حِجْرِهٖ فَبَالَ عَلٰى ثَوْبِهٖ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৫৬. অনুবাদ : হযরত উম্মে কায়েস বিনতে মিহসান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি একবার তাঁর ছোট্ট শিশু যে এখনও খাবার শুরু করেনি তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে নিজ কোলে বসালেন। অতঃপর সে শিশুটি তাঁর কোলে পেশাব করে দিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ পানি আনালেন এবং তাতে ঢেলে দিলেন। অথচ তা ধৌত করলেন না। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ فِىْ تَطْهِيْرِ بَوْلِ الصَّبِيِّ **শিশুর পেশাব পবিত্রকরণের ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ :** যে শিশু এখনো খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করেনি, তার পেশাব হতে কাপড় পবিত্র করণের পদ্ধতি সম্পর্কে ফিকহবিদদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যা নিম্নরূপ–

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَاَحْمَدَ (رح) : ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে, ছোট্ট মেয়েদের পেশাব ধৌত করতে হবে, আর ছেলেদের পেশাবের উপর পানি ছিটিয়ে দিলে চলবে। তাঁদের দলিল–

١ ـ وَعَنْ اُمِّ قَيْسٍ (رض) .... فَبَالَ عَلٰى ثَوْبِهٖ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ ـ

٢ ـ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رض) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ بَوْلُ الْغُلَامِ يُنْضَحُ وَ بَوْلُ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ ـ

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَ مَالِكٍ (رح) : ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালেক (র.)-এর মতে, শিশু ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই ; বরং উভয়ের পেশাব ধৌত করা ওয়াজিব। তাঁদের দলিল–

١ ـ قَوْلُهُ ﷺ اِسْتَنْزِهُوْا عَنِ الْبَوْلِ فَاِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ ـ

٢ ـ عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُؤْتٰى بِالصِّبْيَانِ فَاُتِىَ بِصَبِيٍّ مَرَّةً فَبَالَ عَلَيْهِ فَقَالَ صُبُّوْا ـ

٣ ـ وَفِىْ حَدِيْثِ عَمَّارٍ اِنَّمَا يُغْسَلُ ثَوْبُكَ مِنَ الْبَوْلِ ـ

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ : তাদের দলিলের জবাব–

১. হাদীসে نضح দ্বারা غسل উদ্দেশ্য ; যেমন–

إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إِذَا وَجَدَ اَحَدُكُمُ الْمَذِيَّ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ اَيْ فَلْيَغْسِلْ ـ

২. আল্লামা যারকানী (র.) বলেছেন, তাদের পেশকৃত প্রথম হাদীসে لَمْ يَغْسِلْهُ-এর অর্থ হলো– لَمْ يَغْسِلْ غَسْلًا شَدِيْدًا ـ কাজেই বুঝা গেল যে, ছোট শিশুর পেশাবও ধৌত করতে হবে।

وَعَنْ ٤٥٧ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا دُبِغَ الْاِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৫৭. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, যখন কাঁচা চামড়া দাবাগাত করা হয়, তখন তা পবিত্র হয়ে যায়। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلدِّبَاغَةُ -এর **অর্থ :** 'দাবাগত' শব্দের আভিধানিক অর্থ পাক করা। আর পারিভাষিক অর্থ– مُعَالَجَةُ الْجِلْدِ بِمَادَّةٍ لِيَلِيْنَ وَيَزُوْلَ مَا بِهِ رَطُوْبَةٌ وَنَتَنٌ অর্থাৎ, কোনো উপকরণের মাধ্যমে পরিশোধন করা, যাতে তা নরম হয় এবং তার সিক্ততা ও দুর্গন্ধ দূরীভূত হয়। শুধু রৌদ্রে শুকালেও চামড়া পরিশোধিত হয়। পরিশোধন বা দাবাগত দ্বারা চামড়া পবিত্র হয়।

اَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ فِيْ اِهَابٍ اِذَا دُبِغَ **পাকা চামড়া সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ :** ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, যে কোনো প্রকারের চামড়া, মৃত্যু পশুর হোক বা জবাই করা পশুর হোক, হালাল পশুর হোক কিংবা হারাম পশুর হোক, দাবাগত করার পর তা পাক হয়ে যায়। শুধু মানুষ ও শুকরের চামড়া কোনো অবস্থাতেই পাক হয় না। 'মানুষ' হলো মর্যাদা সম্পন্ন। আর 'শুকর' হলো প্রকৃতগত নাজাস। বস্তুত মানুষের চামড়া দাবাগত করাও হারাম। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, কুকুরের চামড়াও শুকরের চামড়ার ন্যায় দাবাগত করলেও পবিত্র হবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, বর্ণিত হাদীসে كُلّ শব্দের ব্যাপকতায় উক্ত নির্দিষ্ট দু'টি চামড়া ব্যতীত সর্ব প্রকারের প্রাণীর চামড়াকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

وَعَنْهُ ٤٥٨ قَالَ تُصُدِّقَ عَلٰى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُوْنَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ هَلَّا اَخَذْتُمْ اِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوْهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهٖ فَقَالُوْا اِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ اِنَّمَا حُرِّمَ اَكْلُهَا ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৫৮. অনুবাদ : উক্ত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা (রা.)-এর মুক্ত করা বাঁদীকে একটি বকরি দান করা হয়েছিল, হঠাৎ একদিন তা মারা গেল, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই পথ দিয়ে গমন করতে গিয়ে বললেন, তোমরা কেন তার চামড়া তুলে নিলে না? তা হলে তো তা দাবাগত করে [পাকিয়ে] তা দ্বারা তোমরা উপকৃত হতে পারতে। উপস্থিত লোকেরা বলল– এটা তো মরে গেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, মৃত্যু দ্বারা তো শুধু খাওয়া হারাম করা হয়েছে। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٤٥٩ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا ثُمَّ مَازِلْنَا نَنْتَبِذُ فِيْهِ حَتّٰى صَارَ شَنًّا ـ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৪৫৯. অনুবাদ : নবী করীম ﷺ -এর বিবি হযরত সাওদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের একটি বকরি মরে গেল। অতঃপর আমরা তার চামড়াখানি দাবাগাত করলাম। এরপর থেকে আমরা তাতে [খেজুর ভিজিয়ে] "নবীয" বানাতে থাকি। অবশেষে তা [অব্যবহারযোগ্য] পুরাতন মশকে পরিণত হয়ে গেল। –[বুখারী]

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤٦٠ لُبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ (رضـ) قَالَتْ كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ فِيْ حِجْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَبَالَ عَلٰى ثَوْبِهٖ فَقُلْتُ اِلْبَسْ ثَوْبًا وَاَعْطِنِيْ اِزَارَكَ حَتّٰى اَغْسِلَهٗ قَالَ اِنَّمَا يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْاُنْثٰى وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ . رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِاَبِيْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيْ عَنْ اَبِي السَّمَحِ قَالَ يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ .

৪৬০. অনুবাদ : হযরত লুবাবা বিনতে হারিছ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– একদা হুসাইন ইবনে আলী (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোলে ছিলেন এবং তিনি তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দেন, তখন আমি বললাম– আপনি অন্য কাপড় পরিধান করুন। আর আমাকে আপনার লুঙ্গিটি দিন, আমি তা ধুয়ে দেব। তখন তিনি বললেন, ধৌত করতে হয় কন্যা সন্তানের পেশাব। আর পুত্র সন্তানের পেশাব পানি ঢেলে দিলেই চলে। –[আহমদ, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

আর আবূ দাউদ ও নাসায়ী (র.)-এর অপর এক বর্ণনায় আবুস সামাহ হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কন্যা সন্তানের পেশাব ধৌত করতে হয়, আর পুত্র সন্তানের পেশাবের উপর পানি ছিটিয়ে দিতে হয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِيْ بَوْلِ الصَّبِيِّ **শিশুদের পেশাব সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ :** যে শিশু খাদ্যদ্রব্য আহার করে, ইমামগণের সর্বসম্মত অভিমত হলো– সে মেয়ে হোক, বা ছেলে হোক তার পেশাব কোনো কিছুতে লাগালে তা ধৌত করা ওয়াজিব। আর যে শিশু খাদ্যদ্রব্য খায় না; তার পেশাব ধৌত করার ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে, যা প্রথম পরিচ্ছেদ (৪৫৬) নং হাদীসের ব্যাখ্যায় আলোচিত হয়েছে।

وَجْهُ الْفَرْقِ بَيْنَ بَوْلِ الصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ **ছেলে ও মেয়ের পেশাবের মধ্যে পার্থক্যের কারণ :** ৫টি কারণে নবী করীম ﷺ পুরুষ ও মেয়েদের পেশাবের মধ্যে পার্থক্য করেছেন।

১. পুরুষদের স্বভাব উগ্র ও মেজাজ উত্তপ্ত হওয়ার কারণে তাদের পেশাব গাঢ় ও চটচটে হয় না। পক্ষান্তরে মেয়েদের স্বভাব নম্র ও শীতল হওয়ার কারণে তাদের পেশাব গাঢ় ও চটচটে হয়। ফলে কাপড়ে লাগে বেশি।
২. পুরুষদের পেশাব বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে না, এ জন্য তা ছড়ায় কম। অপরদিকে মেয়েদের পেশাব বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়ে।
৩. কারো মতে পুরুষের পেশাবের তুলনায় মহিলার পেশাবে দুর্গন্ধ বেশি।
৪. কেউ কেউ বলেন– পুরুষ হচ্ছে হযরত আদম (আ.)-এর অনুরূপ। আর নারী জাতি হচ্ছে হযরত হাওয়া (আ.)-এর অনুরূপ। আর فَضَلَاتُ اَنْبِيَاءِ পবিত্র, এই হিসেবে পুরুষের পেশাব পবিত্র না হলেও مُشَابَهَتْ -এর উপর ভিত্তি করে ধৌত করার ব্যাপারে কিছুটা হালকাভাবে করার হুকুম দেওয়া হয়েছে।
৫. কারো মতে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদেরকে স্নেহ বেশি করা হয়, তাই তাদেরকে কোলে বেশি নেওয়া হয় এই কারণেই ছেলেদের পেশাবের ব্যাপারে تَخْفِيْف করা হয়েছে।
৬. কারো মতে, ছোট কন্যা সন্তানের যদিও হায়েয ও নেফাস হয় না, কিন্তু তাদের রেহেম সেই অপবিত্র রক্তেরই স্থান। এ জন্যই তাদের পেশাব অতি দুর্গন্ধ হয় বলে ভালোভাবে ধৌত করার হুকুম দেওয়া হয়েছে।

وَعَنْ ٤٦١ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذٰى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُوْرٌ - رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ مَعْنَاهُ

৪৬১. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কেউ তার জুতা দ্বারা কোনো নাপাক বস্তুকে মাড়ায় তবে মাটিই হলো তার জন্য পবিত্রকারী। -[আবূ দাঊদ] ইবনে মাজাহ্ও এরূপ অর্থে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ -হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে نَعْلٌ দ্বারা জুতা ও মোজা উভয়কে বুঝানো হয়েছে। নাপাক বস্তু যদি তরল হয় তবে ঘষলে পবিত্র হয় না; বরং তখন ধৌত করতে হয়। যেমন- পেশাব, বীর্য, মদ। আর যদি নাপাক বস্তু স্থুল বা শক্ত হয় তবে মাটিতে ঘষলে পবিত্র হয়ে যায়।

وَعَنْ ٤٦٢ أُمِّ سَلَمَةَ (رض) قَالَتْ قَالَتْ لَهَا امْرَأَةٌ إِنِّىْ أُطِيْلُ ذَيْلِىْ وَأَمْشِىْ فِى الْمَكَانِ الْقَذِرِ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ - رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِىُّ قَالَا الْمَرْأَةُ أُمُّ وَلَدٍ لِإِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ -

৪৬২. **অনুবাদ :** হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক মহিলা তাঁকে বললেন, আমি আমার কাপড়ের আঁচল নিচের দিকে লম্বা করে দিই এবং অপবিত্র স্থান দিয়ে হাঁটাচলা করি [এর বিধান কি?]। হযরত উম্মে সালামা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তাকে তার পরবর্তী [জায়গার পবিত্র] মাটি পবিত্র করে দেয়। -[আহমদ, মালিক, তিরমিযী, আবূ দাঊদ ও দারেমী]

আর আবূ দাঊদ ও দারেমী বলেন, সে মহিলাটি হযরত ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.)-এর উম্মে ওলাদ ছিলেন। [অর্থাৎ, এরূপ দাসী ছিলেন, যিনি তার সন্তানের মা।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীসে নাপাকী দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শুকনা নাপাকী, যা রগড়ানোর মাধ্যমে কাপড়ে চিহ্ন না থাকলে পবিত্র হয়ে যায়। অথবা এখানে মহিলার মনে সন্দেহ দূর করাই উদ্দেশ্য, অপবিত্র বা ময়লাযুক্ত রাস্তা দিয়ে চলার সময় হয়তো যা তার কাপড়ে ময়লা লেগেছে, তাই তার মনের সন্দেহ সৃষ্টি করেছে। আর তা দূর করার জন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ কথাটি বলেছেন, প্রকৃত নাপাকীকে পাক করা উদ্দেশ্য নয়। উল্লেখ্য উক্ত মহিলাটির নাম ছিল حَمِيْدَةُ হামীদা।

وَعَنْ ٤٦٣ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ (رض) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ جُلُوْدِ السِّبَاعِ وَالرُّكُوْبِ عَلَيْهَا - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ

৪৬৩. **অনুবাদ :** হযরত মিকদাম ইবনে মা'দীকারাব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হিংস্র প্রাণীর চামড়া পরিধান করতে এবং তার উপর চড়তে নিষেধ করেছেন। -[আবূ দাঊদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ فِىْ اِسْتِعْمَالِ جُلُوْدِ السِّبَاعِ হিংস্র জন্তুর চামড়া ব্যবহারের ব্যাপারে আলিমদের মতামত :

১. বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ আল-মুযহির (র.) বলেন, আলোচ্য হাদীসে নিষেধাজ্ঞাটি হয়তো হারাম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, দাবাগাতের পূর্বে তা ব্যবহার করা এ জন্য হারাম যে, তা অপবিত্র। আর দাবাগাতের পরও ব্যবহার করা অবৈধ হবে, যদি তাতে পশম থাকে। কেননা, দাবাগাত দ্বারা পশম পবিত্র হয় না। কেননা দাবাগাতের কোনো প্রক্রিয়াই পশমের মধ্যে পবিরর্তন আনয়ন করতে পারে না।
অথবা নিষেধাজ্ঞাটি মাকরূহ তানযীহী অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে। কারণ কারো মতে দাবাগাতের দ্বারা মূল চামড়া পবিত্র হওয়ার সাথে সাথে পশমও পাক হয়ে যায়।

২. আল্লামা যারকাশী (র.) বলেন, আলোচ্য হাদীসের ভিত্তিতে হারাম প্রাণীর পশম থেকে প্রস্তুত বা পশমযুক্ত চর্ম নির্মিত বস্তু ব্যবহার করা হারাম। কেননা, হিংস্র জন্তু জবাই করা হয় না ; বরং গলা টিপে মারা হয় [তবে এটা হানাফীদের অভিমত নয়]।

৩. আল্লামা তীবী (র.) বলেন, হিংস্র প্রাণীর চামড়া পরিধান করা অহঙ্কারীদের কাজ। সুতরাং খাঁটি মু'মিনের জন্য তা পরিধান করা শোভনীয় নয়।

• উল্লেখ্য যে, হিংস্র প্রাণীর উপর আরোহণ করা যেহেতু জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ, তাই তা নিষিদ্ধ।

وَعَنْ ٤٦٤ اَبِى الْمَلِيْحِ بْنِ اُسَامَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَهٰى عَنْ جُلُوْدِ السِّبَاعِ - رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْدَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ وَ زَادَ التِّرْمِذِىُّ وَالدَّارِمِىُّ اَنْ تُفْتَرَشَ -

৪৬৪. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত আবূ মালীহ ইবনে উসামা (র.) তাঁর পিতা হতে, [তাঁর পিতা] হযরত নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ হিংস্র প্রাণীর চামড়া ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। –[আহমদ, আবূ দাউদ, নাসায়ী]
ইমাম তিরমিযী ও দারেমী [তাঁদের বর্ণিত রেওয়ায়াতে এ কথাটি] বৃদ্ধি করেছেন যে, "তা বিছানারূপে ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।"

وَعَنْ ٤٦٥ اَبِى الْمَلِيْحِ اَنَّهُ كَرِهَ ثَمَنَ جُلُوْدِ السِّبَاعِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

৪৬৫. অনুবাদ : হযরত আবূ মালীহ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি হিংস্র পশুর চামড়ার মূল্য ভোগ করাকে অপছন্দ করেছেন। –[তিরমিযী]

وَعَنْ ٤٦٦ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ اَتَانَا كِتَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنْ لَّا تَنْتَفِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِاِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ

৪৬৬. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উকাইম (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের নিকট এ মর্মে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি পত্র এসেছে যে, তোমরা মৃত জন্তুর কাঁচা চামড়া অথবা রগ দ্বারা উপকৃত হয়ো না।–[তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা:)-এর যুগেই তাঁর কোনো কোনো হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল।

وَعَنْ ٤٦٧ عَائِشَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ اَنْ يَسْتَمْتِعَ بِجُلُوْدِ الْمَيْتَةِ اِذَا دُبِغَتْ . رَوَاهُ مَالِكٌ وَاَبُوْدَاوُدَ

৪৬৭. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে; রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃত জন্তুর চামড়া দ্বারা উপকৃত হতে আদেশ প্রদান করেছেন, যখন তা দেবাগাত করা হয়। -[মালেক ও আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, মৃত প্রাণীর চামড়া দেবাগাত করলে তা পবিত্র হয়ে যায় এবং তা বিক্রয় করে বা অন্য কোনোভাবে উপকৃত হওয়া বৈধ।

وَعَنْ ٤٦٨ مَيْمُوْنَةَ (رض) قَالَتْ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَجُرُّوْنَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْحِمَارِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ اَخَذْتُمْ اِهَابَهَا قَالُوْا اِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ . رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْدَاوُدَ

৪৬৮. **অনুবাদ :** হযরত মাইমূনা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার কুরাইশদের একদল লোক একটি মৃত বকরিকে গাধার মতো টানতে টানতে হযরত নবী করীম ﷺ পর্যন্ত পৌঁছল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বললেন, যদি তোমরা তার চামড়া তুলে নিতে [তবে ভালো হতো]। তারা বলল, এটা তো মৃত। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকে পানি ও কীকর পাতা পবিত্র করবে। -[আহমদ ও আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** হাদীসের অর্থ এই নয় যে, কাঁচা চামড়া পাকা করতে পানির সাথে কীকর পাতা মিশ্রিত না করলে তা পাকা হবে না; বরং এটা পাকা করার একটি পদ্ধতি মাত্র। এখানে 'পানি ও কীকর পাতা'র কথা বলে চামড়া দেবাগত করার একটি ভেষজ দ্রব্যের ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন। সেকালে পানি, লবণ ও কীকর পাতা দ্বারা চামড়া পাকা করা হতো। এটা ছাড়াও যে কোনো উপাদান দ্বারা পঁচন ও দুর্গন্ধ নিবারণ করা যায় তা দ্বারা চামড়া পাকা করা যায়। লবণ দ্বারা রৌদ্রে শুকালেও পাকা হয়। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে উত্তম রূপে চামড়া পাকা করার বিভিন্ন উপায় উপকরণ আবিষ্কৃত হয়েছে।

وَعَنْ ٤٦٩ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ (رض) قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَاءَ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكٍ عَلٰى اَهْلِ بَيْتٍ فَاِذَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَسَالَ الْمَاءَ فَقَالُوْا لَهٗ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ دِبَاغُهَا طُهُوْرُهَا . رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ

৪৬৯. **অনুবাদ :** হযরত সালামাহ ইবনে মুহাব্বিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাবূকের যুদ্ধের সময় এক বাড়িতে পৌঁছলেন এবং সেখানে একটি মশক লটকানো দেখতে পেলেন। তখন তিনি তা হতে পানি চাইলেন। লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এটা তো মৃত জন্তুর চামড়া [দ্বারা তৈরি]। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তার দেবাগতই হলো তার পবিত্রকরণ। -[আহমদ ও আবূ দাউদ]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٤٧٠- عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِيْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لَنَا طَرِيْقًا اِلَى الْمَسْجِدِ مُنْتِنَةً فَكَيْفَ نَفْعَلُ اِذَا مُطِرْنَا قَالَتْ فَقَالَ اَلَيْسَ بَعْدَهَا طَرِيْقٌ هِيَ اَطْيَبُ مِنْهَا قُلْتُ بَلٰى قَالَ فَهٰذِهٖ بِهٰذِهٖ - رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ

৪৭০. অনুবাদ : আবদুল আশহাল গোত্রের জনৈকা মহিলা হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন– আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মসজিদে যাওয়ার পথ ময়লা ও আবর্জনাপূর্ণ। যখন বৃষ্টি হয় তখন আমরা কি করব? সে মহিলা বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ঐ রাস্তার পর কি এমন রাস্তা নেই, যা তার থেকে বেশি পবিত্র? আমি বললাম, হ্যাঁ, [আছে]। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাহলে এর প্রতিকার তা [অর্থাৎ পরে পবিত্র রাস্তা অতিক্রমের ফলে পাক মাটির স্পর্শে পূর্বের অপবিত্র বস্তু দূর হয়ে যাবে]। –[আবূ দাঊদ]

٤٧١- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ كُنَّا نُصَلِّيْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَا نَتَوَضَّأُ مِنَ الْمَوْطِيِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৪৭১. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নামাজ পড়তাম, অথচ রাস্তার চলার কারণে আমরা অজু করতাম না। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে অজু করতাম না, দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আমরা ধৌত করতাম না, তবে নাপাক লেগে গেলে আর তা তরল হলে ধৌত করতে হবে। আর শক্ত হলে তা পরবর্তী মাটি মাড়ানোর কারণে দূর হয়ে যাবে।

٤٧٢- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ كَانَتِ الْكِلَابُ تُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فِيْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرُشُّوْنَ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৪৭২. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জমানায় মসজিদে [নববীতে] কুকুর আসা যাওয়া করত; কিন্তু এর কারণে [সাহাবীগণ] সেখানে কোনো পানি ছিটাতেন না [বা ধৌত করতেন না]। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : শুকনা শরীরে কুকুর মসজিদে ঢুকে পড়লে মসজিদ ধৌত করার প্রয়োজন নেই। তবে কুকুর ভিজা হলে এবং তার গা চুয়ে পানি মসজিদে পড়লে— মসজিদের ভিটা পাকা হলে অবশ্যই ধৌত করে ফেলতে হবে। আর ভিটা যদি কাঁচা হয়, তখন ধৌত করা উত্তম। কিন্তু যদি মাটি চোষণ করে ফেলে বা শুকিয়ে যায় তখন ধৌত না করলেও চলবে। হযরত নবী করীম ﷺ-এর জমানায় মসজিদে নববীর বেড়া-দরজা কিছুই ছিল না, তাই কুকুর আসা-যাওয়া করত। এর অর্থ এই নয় যে, কুকুর পবিত্র।

٤٧٣- وَعَنِ الْبَرَاءِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَفِيْ رِوَايَةِ جَابِرٍ قَالَ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارُ قُطْنِيْ

৪৭৩. **অনুবাদ :** হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— যেসব পশুর গোশত খাওয়া হয় তার পেশাবে কোনো ক্ষতি নেই। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.)-এর এক বর্ণনায় [শব্দের আগে-পরের তারতম্য সহকারে বর্ণিত] আছে যে, যে প্রাণীর গোশত খাওয়া হয় তার পেশাবে কোনো ক্ষতি নেই।–[আহমদ ও দার কুতনী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِخْتِلَافُ الْاَئِمَّةِ فِىْ حُكْمِ اَبْوَالِ مَايُؤْكَلُ لَحْمُهُ হালাল প্রাণীর পেশাবের ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ :

مَذْهَبُ مَالِكٍ وَمُحَمَّدٍ (رحـ) : ইমাম মালেক ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, যে সব প্রাণীর গোশত হালাল তাদের পেশাব পবিত্র। তাঁদের দলিল হলো—

١. حَدِيْثُ الْبَرَاءِ لَا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ .

٢. حَدِيْثُ عُرَيْنَةَ اِشْرَبُوْا مِنْ اَبْوَالِهَا وَاَلْبَانِهَا .

٣. قَوْلُهُ ﷺ صَلُّوْا فِىْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ .

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَالشَّافِعِىِّ وَ اَحْمَدَ (رحـ) : ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে, সকল প্রাণীর পেশাব অপবিত্র। তার গোশত হালাল হোক বা হারাম। তাঁদের দলিল—

١. قَوْلُهُ ﷺ اِسْتَنْزِهُوْا عَنِ الْبَوْلِ فَاِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ .

٢. وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَامَّةُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ فَتَنَزَّهُوْا مِنَ الْبَوْلِ .

এ সব হাদীসে পেশাবকে عَامٌّ রাখা হয়েছে, তাই সব প্রাণীর পেশাব অপবিত্র।

جَوَابًا لَهُمْ তাঁদের দলিলসমূহের জবাব—

১. তাঁদের প্রথম হাদীসটি ضَعِيْفٌ কেননা তার বর্ণনাকারী سَوَّارُ بْنُ مَصْعَبٍ অখ্যাত ব্যক্তি।

২. মহানবী ﷺ উরাইনাদের চিকিৎসার জন্য উটের পেশাব পান করার অনুমতি দিয়েছেন। কেননা—

وَاِنَّمَا التَّدَاوِىْ بِالْمُحَرَّمَاتِ فِىْ حَالَةِ الْاِضْطِرَارِ جَائِزٌ .

৩. অথবা উরাইনার হাদীসটি اِسْتَنْزِهُوْا عَنِ الْبَوْلِ الخ হাদীস দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে।

৪. আর مَرَابِضُ الْغَنَمِ-এর উপর অন্যান্য প্রাণীর আবাসস্থলকে কিয়াস করা বৈধ হবে না। যেমন হাদীসে এসেছে—

صَلُّوْا فِىْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوْا فِىْ مَعَاطِنِ الْاِبِلِ .

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

পরিচ্ছেদ : মোজার উপর মাসাহ করা

اَلْمَسْحُ শব্দটি মাসদার। শাব্দিক অর্থ হলো– মোচন করা। পারিভাষিক অর্থ হলো— اِمْرَارُ الْيَدِ الْبَلَلِ عَلَى الْمَوْضَعِ الْمُعَيَّنِ অর্থাৎ নির্দিষ্ট অঙ্গের উপর ভিজা হাত সঞ্চালন করা। আর মোজার মাসাহ হয় তার উপরিভাগে, অভ্যন্তর বা নিম্নাংশে নয়।

আর خُفٌّ শব্দটি اِسْم একবচন, এর বহুবচন হলো خِفَافٌ ـ اَخْفَافٌ শাব্দিক অর্থ হলো– হালকা বা পাতলা। এটি জুতার তুলনায় হালকা বা পাতলা এ জন্য তাকে خُفٌّ বলা হয়।

পরিভাষায় خُفٌّ হলো— هُوَ مَا يُلْبَسُ فِى الرِّجْلِ مِنْ جِلْدٍ رَقِيْقٍ অর্থাৎ, পায়ের মধ্যে যে চামড়া পরিধান করা হয় তাকে خُفٌّ বলা হয়।

اَلْقَامُوْسُ الْفِقْهِىْ গ্রন্থকারের মতে— هُوَ السَّاتِرُ لِلْكَعْبَيْنِ فَاَكْثَرَ مِنْ جِلْدٍ وَنَحْوِهٖ

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ঐকমত্য হলো, মোজার উপর মাসাহ করা নিঃসন্দেহে বৈধ। কিন্তু রাফেযী ও খারেজী সম্প্রদায় এটাকে নাজায়েজ বলেছেন।

এর বৈধতা সম্পর্কে ইমাম হাসান বসরী (র.) বলেন—

اَدْرَكْتُ سَبْعِيْنَ بَدْرِيًّا مِنَ الصَّحَابَةِ كُلُّهُمْ يَرَوْنَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ‧

অর্থাৎ, আমি এমন সত্তরজন বদরী সাহাবী পেয়েছি যাঁরা মোজার উপর মাসাহের অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

١ ـ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ (رض) مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ سَائِرُ اَهْلِ الْبَدْرِ وَالْحُدَيْبِيَةِ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَسَائِرُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَ فُقَهَاءِ الْاَمْصَارِ وَعَامَّةِ اَهْلِ الْعِلْمِ وَالْاَثَرِ ـ

٢ ـ وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ قَدْ صَرَّحَ جَمْعٌ مِنَ الْحُفَّاظِ بِاَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ مُتَوَاتِرٌ وَجَمَعَ بَعْضُهُمْ رِوَايَةً فَجَاوَزُوا الثَّمَانِيْنَ وَمِنْهُمُ الْعَشَرَةُ الْمُبَشَّرَةُ ـ

এ জন্য ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন—

مِنْ شَرَائِطِ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ اَنْ تُفَضِّلَ الشَّيْخَيْنِ وَتُحِبَّ الْخَتَنَيْنِ وَتَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ‧

অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের শর্ত হলো হযরত আবূ বকর, হযরত ওমর (রা.)-কে সমস্ত উম্মতের উপর মর্যাদা দান করা ; হযরত ওসমান ও হযরত আলী (রা.)-কে মহব্বত করা এবং মোজার উপর মাসাহকে জায়েজ মনে করা। তিনি আরো বলেন— مَا قُلْتُ بِالْمَسْحِ حَتّٰى جَاءَنِىْ مِثْلُ ضَوْءِ النَّهَارِ

এ কারণেই ইমাম কারখী (র.) বলেন— اَخَافُ الْكُفْرَ عَلٰى مَنْ لَا يَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ অর্থাৎ, যারা মোজার উপর মাসাহ করাকে জায়েজ মনে করে না, আমি তাদের কাফের হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করি।

বস্তুত মোজার উপর মাসাহ করার বিধানটি মহান আল্লাহর একটি বড় অনুগ্রহ, যা অন্য কোনো উম্মতের ভাগ্যে জোটেনি। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন— وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ অর্থাৎ, দীনের কোনো ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর কঠোরতা আরোপ করেননি। মুকিম মুসাফির সকলের জন্য এ বিধান প্রযোজ্য। আলোচ্য অধ্যায়ের হাদীসগুলো মোজার উপর মাসাহের হুকুম সম্পর্কীয়।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٤٧٤ - عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيٍ قَالَ سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ (رضـ) عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ جَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيْمِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৭৪. **অনুবাদ :** [তাবেয়ী] হযরত শুরাইহ ইবনে হানী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব (রা.)-কে মোজার উপর মাসাহ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম [তার মুদ্দত কতদিন?]। উত্তরে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তা মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত, আর মুকীমের জন্য এক দিন এক রাত নির্ধারণ করেছেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْاِخْتِلَافُ فِيْ جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ মোজার উপর মাসাহের বৈধতার ব্যাপারে মতান্তর : মোজার উপর মাসাহ করা জায়েজ কি না? এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ—

مَذْهَبُ الْخَوَارِجِ وَالرَّوَافِضِ : খারেজী এবং রাফেযী আলিমদের মতে, মোজার উপর মাসাহ করা জায়েজ নেই। তাঁদের দলিল—

١ - قَوْلُهُ تَعَالٰى فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُؤُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ .

এখানে পা ধৌত করার কথা বলা হয়েছে, সুতরাং মোজার উপর মাসাহ করা জায়েজ হবে না।

٢ - قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) لَا يَجُوْزُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ .

مَذْهَبُ الْاِمَامِ مَالِكٍ (رحـ) : ইমাম মালিক (র.)-এর প্রসিদ্ধ অভিমত মতে, মুকিম ও মুসাফির উভয়ের জন্য কোনো সময় সীমা নেই, যত দিন ইচ্ছা মাসাহ করতে পারে। তাঁর দলিল আবূ দাউদে বর্ণিত হাদীস—

لَوِ اسْتَزَدْنَا لَزَادَنَا . (اَبُوْ دَاوُدَ)

مَذْهَبُ الْجُمْهُوْرِ : ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ (র.)-সহ জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, মুসাফির ও মুকিম উভয়ের জন্যই মোজার উপর মাসাহ করা জায়েজ। তবে মুকিমের জন্য এক দিন এক রাত আর মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত মাসাহ করার অনুমতি রয়েছে। তাঁদের দলিল—

١- عَنْ شُرَيْحٍ (رحـ) قَالَ سَأَلْتُ عَلِيَّ ابْنَ اَبِيْ طَالِبٍ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ جَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيْمِ .

٢- قَالَ بِلَالٌ : ذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ لِحَاجَتِهٖ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهٗ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهٖ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثُمَّ صَلّٰى .

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ তাঁদের দলিলের উত্তর :

১. মোজার উপর মাসাহের হাদীস مُتَوَاتِرٌ -এর পর্যায়ে পৌঁছেছে, তাই তা অস্বীকার করা যায় না।
২. হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, আমি এ রকম সত্তরজন বদরী সাহাবী পেয়েছি যারা মোজার উপর মাসাহকে বৈধ মনে করেন।
৩. আল্লামা আবূ বকর জাস্সাস (র.) বলেন, اَلْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ -এর বৈধতা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। কেননা অজুর আয়াতে اَرْجُلَكُمْ শব্দে দু'কেরাত পঠিত হয়— নসবের কেরাত পা ধৌত করার অর্থ বহন করে, আর যেরের কেরাতে পা মাসাহ করার অর্থ বহন করে, যা اَلْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ -এর বৈধতা প্রমাণ করে।
৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) পরবর্তী যুগে তাঁর মত প্রত্যাহার করে নেন।

৫. ইমাম মালিক (র.)-এর দলিলের উত্তরে জমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেন, আবূ দাউদে বর্ণিত হাদীস لَوْ اسْتَزَدْنَا لَزَادَنَا বাক্যাংশটি বর্ণনাকারীর ধারণামাত্র, এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী নয়।

اَلْاِخْتِلَافُ فِيْ مُدَّةِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ **মোজার উপর মাসাহের সময় সম্পর্কে মতভেদ** : মোজার উপর মাসাহের সময়সীমা নিয়েও ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন—

مَذْهَبُ اِمَامِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ : ইমাম মালিক (র.), হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) ও হযরত হাসান বসরী (র.) প্রমুখের মতে, মুকিম ও মুসাফির উভয়ের জন্য মাসাহ্ জায়েজ। তবে কোনো নির্ধারিত সময়ের জন্য নয়, যতদিন ইচ্ছা মাসাহ করতে পারবে। তাঁদের দলিল—

١ - عَنْ خُزَيْمَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَلَوِ اسْتَزَدْنَا لَزَادَنَا . رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ

٢ - عَنْ اُبَيِّ بْنِ عُمَارَةَ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ نَعَمْ، قَالَ يَوْمٌ قَالَ وَيَوْمَيْنِ قَالَ وَثَلٰثَةٌ قَالَ نَعَمْ وَمَا شِئْتَ وَفِيْ حَدِيْثٍ اٰخَرَ حَتّٰى بَلَغَ سَبْعًا رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ .

مَذْهَبُ الْجُمْهُوْرِ : ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ, ইমাম ইসহাক ও সাহেবাইন (র.) প্রমুখের মতে, মুকিমের জন্য এক দিন এক রাত আর মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত মোজার উপর মাসাহ করা জায়েজ। তাঁদের দলিল—

١ - عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ (رضـ) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ .

٢ - عَنْ عَلِيٍّ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ لِلْمُسَافِرِ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ .

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ : ইমাম মালিক (র.) ও অন্যান্যদের দলিলের নিম্নোক্ত জবাব দেওয়া যায়—

১. لَوِ اسْتَزَدْنَا الخ বাক্যাংশ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা নয় রাবীর অনুমান, আর দ্বিতীয় হাদীসখানা যা'ঈফ।

২. ইমাম বুখারী (র.) বলেন, দ্বিতীয় হাদীসের রাবী অজ্ঞাত এবং হাদীসটিও অশুদ্ধ। সুতরাং ইমামত্রয়ের দলিল কর্তৃক ইমাম মালিক (র.)-এর মত খণ্ডনযোগ্য। আর ইমামত্রয়ের মতই সঠিক ও আমলযোগ্য।

صِحَّةُ الْمَسْحِ **মাসাহ কখন শুদ্ধ হয়?** : হিদায়া গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, এমন হদস যা অজু ভঙ্গকারী, কেবলমাত্র সে হদস-এর উপরই পবিত্রতাবস্থায় মোজা পরিধান করা হয়ে থাকলে সে মোজার উপর মাসাহ করা জায়েজ। মোজার উপরি ভাগ মাসাহ করা ফরজ, নিচের অংশ মাসাহ করা ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালিক (র.)-এর মতে, সুন্নত বা মোস্তাহাব। ইমাম আবূ হানীফা ও আহমদ (র.)-এর মতে, মোস্তাহাব নয়। আদ-দুররুল মুখতার গ্রন্থে কোনো কোনো হানাফী ইমামদের মতে, মোস্তাহাব হওয়া উদ্ধৃত হয়েছে। অবশ্য যদি কেবলমাত্র মোজার নিচের অংশ মাসাহ করা হয়, তবে সর্বসম্মত মতেই তা শুদ্ধ হবে না। যেহেতু মোজার উপর মাসাহ সংক্রান্ত হাদীসগুলো مُتَوَاتِرٌ পর্যায়ে পৌঁছেছে, সেহেতু ইমাম কারখী (র.)-এর মতে মোজার উপর মাসাহ করা জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণকারী ব্যক্তির কাফির হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

وَقْتُ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ **মোজা পরিধান করার সময়** : ফিকহবিদগণের সর্বসম্মত মতে, অজু না থাকা অবস্থায় মোজা পরিধান করে তার উপর মাসাহ করা জায়েজ হবে না; বরং এর জন্য প্রয়োজন পূর্ণ পবিত্রতার। পূর্ণ পবিত্র হয়ে অজু করলেই মোজা পরিধান করতে পারবে।

وَقْتُ عَدِّ التَّوْقِيْتِ لِلْمَسْحِ **কখন থেকে মাসাহের সময় গণনা শুরু করবে** : মাসাহের সময়সীমা কখন থেকে গণ্য করা হবে সে সম্পর্কে ইসলামি আইনশাস্ত্র বিশারদগণের মতপার্থক্য নিম্নে উপস্থাপিত হলো—

ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে, পবিত্র অবস্থায় মোজা পরিধান করার সময় হতে মুকিম এবং মুসাফির নিজ নিজ সময়ের হিসাব করবে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, যখন অজু নষ্ট হয় এবং প্রথমবার মাসাহ করে তখন হতে সময়ের হিসাব করবে। কারণ হদসের পূর্বে এটা পরিধান করা বা না করা সমান।

وَعَنْ ٤٧٥ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ (رضـ) أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غَزْوَةَ تَبُوْكٍ قَالَ الْمُغِيْرَةُ فَتَبَرَّزَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قِبَلَ الْغَائِطِ فَحَمَلْتُ مَعَهُ إِدَاوَةً قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَمَّا رَجَعَ اَخَذْتُ اُهْرِيْقُ عَلٰى يَدَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوْفٍ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمُّ الْجُبَّةِ فَاَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ وَاَلْقَى الْجُبَّةَ عَلٰى مَنْكِبَيْهِ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ ثُمَّ اَهْوَيْتُ لِاَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ دَعْهُمَا فَاِنِّىْ اَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْتُ فَانْتَهَيْنَا اِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ قَامُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ وَيُصَلِّىْ بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً فَلَمَّا اَحَسَّ بِالنَّبِىِّ ﷺ ذَهَبَ يَتَاَخَّرُ فَاَوْمٰى اِلَيْهِ فَاَدْرَكَ النَّبِىُّ ﷺ اِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ مَعَهُ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِىُّ ﷺ وَقُمْتُ مَعَهُ فَرَكَعْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِىْ سَبَقَتْنَا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৭৫. অনুবাদ : হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তাবূক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। হযরত মুগীরা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের পূর্বেই পায়খানার উদ্দেশ্যে বের হলেন। আমি তাঁর সাথে একটি পানির পাত্র বহন করে চললাম। যখন তিনি শৌচাগার হতে প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন আমি উক্ত পাত্র হতে তাঁর হাতে পানি ঢালতে লাগলাম। তিনি তা দ্বারা তাঁর মুখমণ্ডল ও উভয় হাত ধৌত করলেন। তদবস্থায় তাঁর পরিধানে একটি পশমের জোব্বা ছিল। তিনি [জোব্বার হাতের সম্মুখ দিকে হতে] হাত বের করতে চেষ্টা করলেন; কিন্তু জোব্বার আস্তিন খুব সংকীর্ণ ছিল [তিনি হাত সম্মুখ দিকে বের করতে পারলেন না]। তখন তিনি জোব্বার নিচের দিক হতে হাত বের করলেন। এরপর জোব্বাটি তিনি তাঁর কাঁধে ছেড়ে রাখলেন এবং উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করলেন, অতঃপর তিনি মাথার সম্মুখ ভাগ এবং পাগড়ির উপর মাসাহ করলেন। এরপর আমি তাঁর পায়ের মোজা খুলে দেওয়ার জন্য ঝুঁকে পড়লাম। তখন তিনি বললেন, এগুলো এভাবেই থাকতে দাও, আমি ওগুলো পবিত্র অবস্থায় পরিধান করেছি। অতঃপর তিনি মোজার উপর মাসাহ করলেন। তারপর তিনি সওয়ার হলেন, আমিও সওয়ার হলাম। অতঃপর আমরা যখন কাফেলার নিকট পৌঁছলাম, তখন দেখলাম যে, তারা নামাজে দাঁড়ানো। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) তাঁদের ইমামতি করছেন এবং তিনি লোকদেরকে নিয়ে এক রাকআত পড়েও ফেলেছিলেন। অত:পর তিনি যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তাশরীফ আনয়নের বিষয় টের পেলেন, তখন পিছনে সরে যেতে উদ্যত হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে স্থির থাকতে ইঙ্গিত করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাথে দু'রাকাতের এক রাকাত পেলেন। যখন তিনি সালাম ফিরালেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আমিও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে গেলাম, আর যে রাকাত আমাদের ছুটে গিয়েছিল আমরা তা পড়ে নিলাম। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرَائِطُ جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ মোজার উপর মাসাহ করার শর্তসমূহ : মোজার উপর মাসাহ করার শর্তসমূহ নিম্নরূপ– (১) মুকিম হলে এক দিন ও এক রাতের বেশি মাসাহ না করা। (২) মুসাফির হলে তিন দিন ও তিন রাতের অতিরিক্ত মাসাহ না করা। (৩) এমন মোজা হওয়া যা كَعْبَيْن সহ পা ঢেকে রাখে। (৪) এমন হওয়া যা কোনো কিছু দিয়ে না বাঁধলেও পায়ের সাথে লেগে থাকে। (৫) এমন মজবুত হওয়া যা পায়ে দিয়ে কমপক্ষে তিন মাইল হেঁটে যাওয়া যায়। (৬) এতখানি মোটা হওয়া যে, ভিতর থেকে পায়ের চামড়া দেখা না যায়। (৭) এতটুকু পুরু হওয়া যে, উপর দিয়ে পানি ঢেলে দিলে পানি চুষতে না পারে। (৮) মোজা পায়ে দিয়ে চলতে গিয়ে যদি ফেটে যায়, তাহলে ফাটার পরিমাণ যেন এতটুকু না হয় যে, এক আঙ্গুল প্রকাশ হয়ে পড়ে। (৯) পরিপূর্ণ পবিত্র শরীরে মোজা পরিধান করা। (১০) মোজা পবিত্র থাকা। (১১) পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জনপূর্বক মোজা পরিধান করা ইত্যাদি।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤٧٦ اَبِىْ بَكْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً اِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ اَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا . رَوَاهُ الْاَثْرَمُ فِىْ سُنَنِهِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالدَّارُ قُطْنِىْ وَقَالَ الْخَطَّابِىُّ هُوَ صَحِيْحُ الْاِسْنَادِ هٰكَذَا فِى الْمُنْتَقٰى .

৪৭৬. **অনুবাদ :** হযরত আবূ বাকরা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত এবং মুকিমের জন্য একদিন একরাত মোজার উপর মাসাহ করার অনুমতি প্রদান করেছেন, যদি অজু করে মোজা পরিধান করে। –[সুনানে আছরাম, সহীহ ইবনে খুযাইমা, সুনানে দারাকুতনী]

আর ইমাম খাত্তাবী (র.) বলেন, এ হাদীসটি সনদের দিক থেকে সহীহ, এরূপ বর্ণনা [ইবনুল জরূদের] আল-মুনতাকা নামক কিতাবে রয়েছে।

وَعَنْ ٤٧٧ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُنَا اِذَا كُنَّا سَفَرًا اَنْ لَّا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ اِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلٰكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ . رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ

৪৭৭. **অনুবাদ :** হযরত সাফওয়ান ইবনে আস্সাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমরা সফরে যেতাম তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে হুকুম করতেন যে, যেন আমরা আমাদের মোজাসমূহ তিন দিন তিন রাত যাবৎ পা হতে না খুলি, শুধুমাত্র নাপাকীর গোসল ব্যতীত। এমনকি পায়খানা, প্রস্রাব ও নিদ্রা হতে জাগ্রত হয়ে অজু করতেও না। –[তিরমিযী ও নাসায়ী]

وَعَنْ ٤٧٨ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ (رضـ) قَالَ وَضَّأْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ فَمَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ ـ رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ مَعْلُوْلٌ وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ وَمُحَمَّدًا يَعْنِي الْبُخَارِيَّ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَا لَيْسَ بِصَحِيْحٍ وَكَذَا ضَعَّفَهُ أَبُوْدَاوُدَ ـ

৪৭৮. **অনুবাদ :** হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাবূকের যুদ্ধে হযরত নবী করীম ﷺ-কে অজু করিয়েছি, তিনি মোজার উপরিভাগ ও তলদেশ মাসাহ করেছেন। –[আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজা]

ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি মা'লূল [দোষযুক্ত]। আর আমি ইমাম আবূ যুরআ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) অর্থাৎ ইমাম বুখারী (র.)-কে এ হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তাঁরা উভয় বলেছেন যে, এটা সহীহ নয়। এমনিভাবে আবূ দাউদও এ হাদীসকে যা'ঈফ সাব্যস্ত করেছেন। [অর্থাৎ, এ হাদীসের সনদ হযরত মুগীরা পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন নয়। মধ্যে রাবী ছুটে গেছে।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

أَقْوَالُ الْأَئِمَّةِ فِي الْمَسْحِ أَعْلَى الْخُفَّيْنِ وَأَسْفَلَهُ মোজার উপর ও নিচে মাসাহ করা সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ :

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَ الزُّهْرِيِّ وَ إِسْحَاقَ (رحـ) : ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক, ইমাম যুহরী ও ইমাম ইসহাক (র.)-সহ কিছু সংখ্যক ওলামার মতে, মোজার উপরে ও নিচে মাসাহ করা আবশ্যক। তাঁদের দলিল—

١ ـ وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ (رضـ) قَالَ وَضَّأْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ فَمَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ ـ رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

২. এছাড়া পা ধৌত করা যেমন উপরে ও নিচে উভয় দিকে করা হয় তেমনি মাসাহও উপরে নিচে তথা উভয় দিকে হওয়া আবশ্যক।

৩. আর নিম্নাংশে ময়লা থাকার সম্ভাবনা বেশি তাই নিচের অংশ মাসাহ করা-ই উত্তম।

مَذْهَبُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَأَحْمَدَ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ (رحـ) : ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আহমদ, ইমাম সুফিয়ান ছাওরী (র.)-এর মতে, মোজার উপর অংশেই মাসাহ করা ওয়াজিব, নিম্নাংশে নয়। তাঁদের দলিল—

١ ـ عَنِ الْمُغِيْرَةِ (رضـ) قَالَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يَمْسَحُ عَلٰى ظَهْرِ الْخُفَّيْنِ ـ (رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ)

٢ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ (رضـ) قَالَ لَوْ كَانَ الدِّيْنُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلٰى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلٰى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ ـ (رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ)

٣ ـ وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ (رضـ) أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ عَلٰى ظَاهِرِهِمَا ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

٤ ـ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ (رضـ) قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ ـ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى خُفِّهِ الْأَيْمَنِ وَيَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى خُفِّهِ الْأَيْسَرِ ثُمَّ مَسَحَ أَعْلَاهُمَا مَسْحَةً وَاحِدَةً حَتّٰى كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلٰى أَصَابِعِ النَّبِيِّ ﷺ ـ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

٥ـ عَنْ أَنَسٍ (رضـ) أَنَّهُ مَسَحَ ظَاهِرَ خُفَّيْهِ بِكَفَّيْهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً ـ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

اَلْجَوَابُ عَنْ أَدِلَّةِ الْمُخَالِفِيْنَ : তাঁদের দলিলের উত্তর—

১. ইমাম বাইহাকী (র.)-এর মতে, হযরত মুগীরা (রা.)-এর হাদীসটি মুরসাল।

২. ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, উক্ত হাদীসটি مَعْلُوْلٌ

৩. আর মাসাহকে ধৌত করার উপর কিয়াস করা ঠিক নয়। কেননা, ধৌত করার তুলনায় মাসাহ হলো সহজ কাজ, তাই এটা হবে— قِيَاسٌ مَعَ الْفَارِقِ

৪. আর তাঁদের তৃতীয় যুক্তিমূলক দলিলের উত্তর হলো, মোজার নিচে যদি ময়লা থেকে থাকে তবে মাসাহের দ্বারা তা আরো ব্যাপক হয়ে যাবে; বরং তখন মোজার তলদেশ ধৌত করাই আবশ্যক হবে।

وَعَنْهُ ٤٧٩ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ عَلَى ظَاهِرِهِمَا . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْدَاوُدَ

৪৭৯. অনুবাদ : উক্ত হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে তাঁর মোজাদ্বয়ের উপরিভাগে মাসাহ্ করতে দেখেছি। -[তিরমিযী ও আবূ দাঊদ]

وَعَنْهُ ٤٨٠ قَالَ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْدَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

৪৮০. অনুবাদ : উক্ত হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ অজু করলেন এবং জাওরাবদ্বয় ও চটিদ্বদয়ের উপর মাসাহ করলেন। -[আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাঊদ ও ইবনে মাজাহ্]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَعْرِيْفُ الْجَوْرَبَيْنِ وَاَقْسَامُهَا জাওরাবাইনের পরিচয় এবং তার প্রকারভেদ : جَوْرَبَيْنِ শব্দটি جَوْرَبْ -এর দ্বিবচন। এর অর্থ কাপড়রের মোজা। তা সুতার হোক বা উলের হোক। এটা তিনভাগে বিভক্ত—

১. اَلْجَوْرَبَيْنِ الْمُجَلَّدَيْنِ : এটা এরূপ কাপড়ের মোজা, যার উপরিভাগে ও নিচে চামড়া লাগানো থাকে। এরূপ মোজার উপর সবার মতে, মাসাহ করা জায়েজ।

২. اَلْجَوْرَبَيْنِ الْمُنَعَّلَيْنِ : এরূপ কাপড়ের মোজা, যার কেবল নিচে চামড়া লাগানো থাকে। এরূপ মোজার উপরও মাসাহ করা জায়েজ।

৩. اَلْجَوْرَبَيْنِ غَيْرَ الْمُجَلَّدَيْنِ وَالْمُنَعَّلَيْنِ الرَّقِيْقَيْنِ : যদি জাওরাবের উপরে ও নিচে উভয় দিকে চামড়া না থাকে অথবা কেবল নিচেও চামড়া না থাকে এবং তা পাতলা হয়, অর্থাৎ, তা মোটা ও শক্ত বলে বিবেচিত হওয়ার মতো গুণাবলি সম্পন্ন নয়। তবে সকলের ঐকমত্যে এরূপ جَوْرَبْ -এর উপর মাসাহ করা জায়েজ নয়।

কাজেই বুঝা গেল যে, مُنَعَّلَيْنِ ও مُجَلَّدَيْنِ হলেই তার উপর মাসাহ করা জায়েজ আছে, তবে এটা চামড়ার মোজার মতো হতে হবে। মোজার মতো না হলে মাসাহ করা জায়েজ নয়।

৪. اَلْجَوْرَبَيْنِ غَيْرُ الْمُجَلَّدَيْنِ وَغَيْرُ الْمُنَعَّلَيْنِ الثَّخِيْنَيْنِ : যদি জাওরাবের উভয় দিকে বা কেবল নিচে চামড়া না থাকে এবং তা মোটা ও শক্ত বলে বিবেচিত হওয়ার মতো গুণাবলি সম্পন্ন হয় অর্থাৎ, যে পুরু কাপড়ের মোজার মধ্যে নিম্নে বর্ণিত গুণাবলি বিদ্যমান থাকে যেমন–

১. এরূপ পাতলা না হওয়া, যাতে উপরে পানি পড়লে ভেতরে চলে যায়,

২. এরূপ শক্ত হওয়া যে, যদি কোনো কিছু দ্বারা তা বাঁধা না হয় তবু পায়ের সাথে লেগে থাকে,

৩. এমন মজবুত হওয়া, যা পায়ে দিয়ে কমপক্ষে তিন মাইল হেঁটে যাওয়া যায়। এরূপ মোজার উপর মাসাহ করা সম্পর্কে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। জমহুর ওলামায়ে কেরাম অর্থাৎ, আইম্মায়ে ছালাছা ও সাহেবাইনের মতে এরূপ মোজার উপর মাসাহ করা জায়েজ। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মূল অভিমত হলো, এরূপ মোজার উপর মাসাহ করা জায়েজ নয়। তবে হিদায়া ও বাদায়ে প্রণেতার মতে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) জমহুরের অভিমতকে সমর্থন করেছেন। এক বর্ণনা মতে তিনি ইন্তেকালের তিন দিন বা নয়দিন পূর্বে এ অভিমত সমর্থন করেন।

ইমাম তাহাবী (র.) বলেন, কিছু সংখ্যক ওলামার মতে চটির উপর মাসাহ করা জায়েজ তবে তাদের নাম আমি তালাশ করে পাইনি। তাঁদের দলিল—

١ . عَنِ الْمُغِيْرَةِ (رض) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

২ . وَعَنْ اَوْسِ بْنِ اَبِىْ اَوْسٍ (رضـ) اَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ تَوَضَّاَ وَمَسَحَ عَلٰى نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ . (رَوَاهُ اَبُوْدَاوٗدَ وَالطَّحَاوِىُّ)

৩ . وَفِىْ رِوَايَةٍ اَنَّ عَلِيًّا (رضـ) دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّاَ وَمَسَحَ عَلٰى نَعْلَيْهِ . (كَمَا فِى الطَّحَاوِىِّ)

مَذْهَبُ الْجَمْهُوْرِ : জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, চটি বা জুতার উপর মাসাহ করা জায়েজ নয়। তাঁদের দলিল—

১. মোজার উপর মাসাহ করার যত সংখ্যক হাদীস আছে, চটি বা জুতার উপর মাসাহ করার হাদীস এত নেই।

২. ইমাম তাহাবী (র.) বলেন, মোজা ছিড়ে গিয়ে যদি অধিকাংশ পা বের হয়ে যায় তবে সর্বসম্মতিক্রমে তার উপর মাসাহ করা বৈধ নয়। আর জুতা পরিধান করার ফলে তো অধিকাংশ এমনিতেই খোলা থাকে তাই তার উপর মাসাহ করা বৈধ হতে পারে না।

اَلْجَوَابُ عَنْ اَدِلَّةِ الْمُخَالِفِيْنَ **তাঁদের দলিলের উত্তর :**

১. যেসব বর্ণনায় চটি বা জুতার উপর মাসাহ করার কথা রয়েছে তা দ্বারা মূলত উদ্দেশ্য হলো পায়ে যে মোজা ছিল তার উপর মাসাহ করার সময় চটি বা জুতার উপর মাসাহ হয়ে গিয়েছে। শুধু চটি বা জুতার উপর মাসাহ করা উদ্দেশ্য নয়।

২. অথবা বলা যেতে পারে, পদযুগল ও মোজাদ্বয়ের উপর মাসাহ করার বিধান ছিল, যখন কুরআনের আয়াত اَرْجُلِكُمْ -কে رُؤُوْسِكُمْ-এর উপর আতফ করত لَامْ বর্ণের নিচে যের-সহকারে পাঠ করা হতো; কিন্তু পরবর্তীতে তা রহিত হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ এখন আর জুতা বা পায়ের উপর মাসাহ করলে চলবে না।

৩. অথবা বলা যেতে পারে, যে সমস্ত হাদীস দ্বারা চটি বা জুতার উপর মাসাহ করা সাব্যস্ত হয় তা মূলত যা'ঈফ ও শায হাদীস ; যা দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

৪. অথবা এক অজু থাকা অবস্থায় অন্য অজু করার সময় এরূপ করা হয়েছে।

৬. অথবা ঐ সব হাদীসে জুতা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো جَوْرَبَيْنِ مُنَعَّلَيْنِ

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٤٨١ . عَنِ الْمُغِيْرَةِ (رضـ) قَالَ مَسَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَسِيْتَ قَالَ بَلْ اَنْتَ نَسِيْتَ بِهٰذَا اَمَرَنِىْ رَبِّىْ عَزَّ وَ جَلَّ . رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْدَاوٗدَ

৪৮১. **অনুবাদ :** হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মোজাদ্বয়ের উপর মাসাহ করলেন। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি পা ধৌত করতে ভুলে গিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, বরং তুমিই এ বিষয়ে ভুলে গেছ, [বা ভুল ধারণা করছ] আমাকে এরূপ করতে আমার মহীয়ান ও গরীয়ান প্রতিপালক আদেশ করেছেন। –[আহমদ ও আবূ দাঊদ]

---

٤٨٢ . وَعَنْ عَلِيٍّ (رضـ) قَالَ لَوْ كَانَ الدِّيْنُ بِالرَّاْىِ لَكَانَ اَسْفَلُ الْخُفِّ اَوْلٰى بِالْمَسْحِ مِنْ اَعْلَاهُ وَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلٰى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ . رَوَاهُ اَبُوْدَاوٗدَ وَ الدَّارِمِىُّ مَعْنَاهُ

৪৮২. **অনুবাদ :** হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি দীন মানুষের বুদ্ধি-বিবেক অনুযায়ী হতো, তাহলে [জ্ঞান অনুসারে] মোজার নিচের দিকে মাসাহ করা উপরের দিক অপেক্ষা উত্তম হতো। অথচ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর মোজাদ্বয়ের উপরের দিকে মাসাহ করতে দেখেছি। –[আবূ দাঊদ] আর ইমাম দারেমী অনুরূপ অর্থে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ التَّيَمُّمِ

পরিচ্ছেদ : তায়াম্মুম

তায়াম্মুমের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা উম্মতে মুহাম্মদীর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আর কোনো নবীর উম্মতের জন্য এ বৈশিষ্ট্য বা ফজিলত ছিল না।

সাধারণত تِلَاوَةُ قُرْآن ، صَلٰوة এবং طَوَافُ بَيْتِ اللّٰهِ -এর জন্যই ত্বাহারাত পূর্ব শর্ত। পানি এবং মাটি দ্বারাই ত্বাহারাত অর্জন করতে হয়। ফিক্‌হের পরিভাষায় পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করাকে বলে অজু আর মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করাকে تَيَمُّمْ বলে।

اَلتَّيَمُّمُ শব্দটি বাবে تَفَعُّلْ -এর মাসদার। এটি يَمَّ মূলধাতু হতে নির্গত। শাব্দিক অর্থ– সংকল্প বা ইচ্ছা করা। যেমন, কুরআন পাকে এসেছে— وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ অর্থাৎ, তোমরা অপবিত্র সম্পদ ব্যয়ের সংকল্প করো না।

পরিভাষায় এর পরিচয় হলো—

هُوَ طَهَارَةٌ تُرَابِيَّةٌ ضَرُوْرِيَّةٌ بِاَفْعَالٍ مَخْصُوْصَةٍ تُسْتَعْمَلُ عِنْدَ الْعِجْزِ عَنْ اِسْتِعْمَالِ الْمَاءِ اَوْ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْمَاءِ .

অর্থাৎ, তায়াম্মুম হলো পানি ব্যবহারে অক্ষমতা বা পানির অবর্তমানে কষ্টকর অবস্থায় নির্দিষ্ট কর্মের মাধ্যমে মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা।

এটা হলো- طَهَارَةٌ حُكْمِيْ আর অজু- গোসল হলো طَهَارَةٌ حَقِيْقِيْ ত্বাহারাতে হাকীকিয়াতে নিয়তের আবশ্যকতা নেই। কেননা, তাতে তো বাহ্যিকভাবে পবিত্রতা অর্জিত হয়। আর طَهَارَةٌ حُكْمِيْ -এর মধ্যে নিয়তের আবশ্যকতা রয়েছে। কেননা, এটা حَقِيْقِيْ -এর স্থলাভিষিক্ত। তায়াম্মুম করা কুরআন, হাদীস ও ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত। নিম্নে এ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ আলোচিত হবে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤٨٣ حُذَيْفَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ جُعِلَتْ صُفُوْفُنَا كَصُفُوْفِ الْمَلٰئِكَةِ وَجُعِلَتْ لَنَا الْاَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوْرًا اِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৮৩. অনুবাদ : হযরত হুযায়ফা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— তিনটি বিষয়ে আমাদেরকে সকল মানুষের [তথা সকল নবীর উম্মতের] উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। যথা– (১) আমাদের [সালাতের] সারিকে ফেরেশতাদের সারির মতো করা হয়েছে। (২) সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠকে আমাদের জন্য নামাজের স্থান বানানো হয়েছে। (৩) আর মাটিকে আমাদের জন্য পবিত্রকারী করা হয়েছে, যখন আমরা পানি না পাই। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে আল্লাহর ইবাদত করেন। সুতরাং আমরা তাদের ন্যায় নামাজে এবং জিহাদে সারি বেঁধে থাকি। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, এরূপ সারি বেঁধে নামাজ আদায় করার প্রচলন পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে ছিল না। আবার আমাদের জন্য সমগ্র পৃথিবীর যে কোনো জায়গায়, যদি উক্ত স্থানটি পবিত্র হয় নামাজের সময়

হলেই সে স্থানে নামাজ আদায় করার অনুমতি রয়েছে। কিন্তু পূর্ববর্তী নবী ও তাঁদের উম্মতদেরকে ইবাদতের নির্দিষ্ট স্থান যেমন– গীর্জা, কানীসা, বী'আ ইত্যাদি ব্যতীত অন্য স্থানে ইবাদত করার অনুমতি ছিল না। আর আমাদের জন্য পানির অনুপস্থিতিতে তায়াম্মুমের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু পূর্ববর্তী নবীদের উম্মতদের জন্য তায়াম্মুমের অনুমতি ছিল না। এটা আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ যে, অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এই কয়েকটি বিষয়ে তিনি উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য স্বাতন্ত্র্য প্রদান করেছেন।

اِخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِىْ جَوَازِ التَّيَمُّمِ بِغَيْرِ التُّرَابِ মাটি ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ :

مَذْهَبُ الشَّافِعِىِّ وَاَحْمَدَ وَ دَاوُدَ الظَّاهِرِىِّ (رحـ) : ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ (র.) ও দাউদ যাহেরীর মতে মাটি ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েজ হবে না। তাঁদের দলিল—

حَدِيْثُ حُذَيْفَةَ اَنَّهُ ﷺ قَالَ جُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوْرًا .

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَ مَالِكٍ وَالثَّوْرِىِّ (رحـ) : ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালেক ও ইমাম সুফিয়ান ছাওরী (র.)-এর মতে, মাটি ও মাটি জাতীয় পদার্থ দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েজ আছে। যেমন– পাথর, বালি, খড়িমাটি, চুনা পাথর ইত্যাদি। তাঁদের দলিল—

١ . قَوْلُهُ تَعَالٰى "فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا.

এখানে صَعِيْد দ্বারা মাটি ও মাটি জাতীয় বস্তুকে বুঝানো হয়েছে।

٢ . وَفِىْ رِوَايَةٍ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَيَمَّمَ مِنَ الْحَائِطِ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

٣ . وَفِىْ رِوَايَةٍ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ جُعِلَتْ لِىَ الْاَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا .

এখানে اَلْاَرْض শব্দটি عَامٌ যা সব রকম মাটি ও মাটি জাতীয় বস্তুকে বুঝায়।

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ : তাঁদের দলিলের উত্তরে বলা যায় যে—

تُرْبَتُهَا طَهُوْرًا-এর হাদীসটি আমাদের خِلَاف নয়। কেননা, অত্র হাদীস দ্বারা মাটি দিয়ে তায়াম্মুম সাব্যস্ত হয়, আর অন্যান্য হাদীস দ্বারা মাটি জাতীয় বস্তু দিয়েও তায়াম্মুম করা জায়েজ সাব্যস্ত হয়।

جُعِلَتْ لَنَا الْاَرْضُ مَسْجِدًا-এর মর্মার্থ : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তিনটি বিষয়ে আমাদেরকে গোটা মানব জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে "جُعِلَتْ لَنَا الْاَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا" অর্থাৎ, সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠকেই আমাদের জন্য নামাজের স্থান বানানো হয়েছে। এর দ্বারা বুঝানো হচ্ছে যে, উম্মতে মুহাম্মাদী ﷺ-এর জন্য সমগ্র পৃথিবীর যে কোনো জায়গায়, [যদি তা পবিত্র হয়] নামাজের সময় হলেই সে স্থানে নামাজ আদায় করার অনুমতি রয়েছে। কিন্তু পূর্ববর্তী নবী ও তাঁদের উম্মতের জন্য ইবাদতের নির্দিষ্ট স্থান, যেমন-গির্জা, কানীসা, বী'আ ইত্যাদি ব্যতীত অন্যস্থানে ইবাদত করার অনুমতি ছিল না। সুতরাং এটা আমাদের মর্যাদার স্বাক্ষর বহন করে।

وَعَنْ ٤٨٤ عِمْرَانَ (رضـ) قَالَ كُنَّا فِىْ سَفَرٍ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَصَلّٰى بِالنَّاسِ فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلٰوتِهِ اِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ اَنْ تُصَلِّىَ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ اَصَابَتْنِىْ جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّعِيْدِ فَاِنَّهُ يَكْفِيْكَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৮৪. অনুবাদ : হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার কোনো এক সফরে আমরা নবী করীম ﷺ -এর সাথে ছিলাম। তিনি লোকদেরকে নামাজ পড়ালেন। অতঃপর যখন তিনি নামাজ হতে অবসর হলেন তখন দেখলেন যে, এক ব্যক্তি পৃথকভাবে সরে রয়েছে, সে জনগণের সাথে নামাজ পড়েনি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে অমুক ! জনতার সাথে নামাজ আদায় করতে কিসে তোমাকে বারণ করেছে ? লোকটি বলল, আমি অপবিত্র হয়ে পড়েছি, অথচ [পবিত্র হওয়ার জন্য] কোনো পানি নেই, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার উচিত মাটি দ্বারা পবিত্র হওয়া। এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট হতো।–[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٤٨٥ عَمَّارٍ (رضـ) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضـ) فَقَالَ إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ الْمَاءَ فَقَالَ عَمَّارٌ لِعُمَرَ أَمَا تَذْكُرُ إِنَّا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ هٰكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيْهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَلِمُسْلِمٍ نَحْوَهُ وَفِيْهِ قَالَ إِنَّمَا يَكْفِيْكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الْأَرْضَ ثُمَّ تَنْفُخُ ثُمَّ تَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ -

৪৮৫. **অনুবাদ :** হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর নিকট আগমন করে বললেন, আমি অপবিত্র হয়েছি, অথচ পানি পেলাম না। এমন সময় হযরত আম্মার (রা.) হযরত ওমর (রা.)-কে বললেন, আপনার কি স্মরণ নেই যে, কোনো এক সফরে আমরা উভয়ে নাপাক হয়েছিলাম, [পানির সংকটে] আপনি নামাজ আদায় করেননি। আর আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়েছিলাম এবং নামাজ আদায় করেছিলাম। অতঃপর এ ঘটনা আমি নবী করীম ﷺ-এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বললেন, তোমার জন্য এরূপ করাই যথেষ্ট ছিল, এ বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ স্বীয় হাতের তালুদ্বয়কে মাটির উপর মারলেন এবং উভয়টিতে ফুঁক দিলেন [এবং ধুলা ঝাড়লেন] অতঃপর উভয় হাত দ্বারা আপন চেহারা এবং [হাতের] কব্জিদ্বয় মাসাহ করলেন।-[বুখারী] মুসলিমেও এরূপ বর্ণনা রয়েছে। আর তাতে এ কথাও আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, তোমার জন্য এটা যথেষ্ট হবে যে, তোমার দু' হাত জমিনে মারবে, অতঃপর ফুঁক দেবে; তারপর উভয় হাত দ্বারা তোমার চেহারা ও দু' কব্জী মাসাহ করবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَعْنَى التَّيَمُّمِ তায়াম্মুমের অর্থ :

مَعْنَى التَّيَمُّمِ لُغَةً : এটি বাবে تَفَعُّلْ-এর مَصْدَرْ যা يَمٌّ ধাতু হতে উৎপন্ন। আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- اَلْإِرَادَةُ وَالْقَصْدُ তথা ইচ্ছা করা বা সংকল্প করা। যেমন, পবিত্র কুরআনে রয়েছে— وَلَاتَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ-এর অর্থ হলো- وَلَاتَقْصِدُوا الْخَبِيْثَ

مَعْنَى التَّيَمُّمِ اِصْطِلَاحًا - اَلتَّيَمُّمُ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. اَلْقَصْدُ إِلَى الصَّعِيْدِ الطَّيِّبِ بِنِيَّةِ الطَّهَارَةِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْمَاءِ অর্থাৎ, পানির সংকটাবস্থায় পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে পবিত্র মাটির প্রতি সংকল্প করাকে তায়াম্মুম বলা হয়।

২. কেউ কেউ বলেছেন- مَسْحُ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ بِصَعِيْدٍ طَيِّبٍ عَلٰى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ

৩. কারো কারো মতে- اَلْقَصْدُ إِلَى الصَّعِيْدِ لِمَسْحِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ بِنِيَّةِ اِسْتِبَاحَةِ الصَّلٰوةِ وَغَيْرِهَا .

৪. হযরত ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন- اَلْقَصْدُ إِلَى الصَّعِيْدِ لِمَسْحِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ بِنِيَّةِ اِسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا .

৫. قَوَاعِدُ الْفِقْهِ গ্রন্থে বলা হয়েছে- هُوَ مَسْحُ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ مِنْ صَعِيْدٍ طَيِّبٍ

৬. اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْطِ এ বলা হয়েছে- هُوَ مَسْحُ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ بِالتُّرَابِ

৭. কুদূরীর হাশিয়ায় বলা হয়েছে- اَلتَّيَمُّمُ فِى الشَّرْعِ عِبَارَةٌ عَنِ الْقَصْدِ إِلَى الصَّعِيْدِ الطَّيِّبِ لِلتَّطْهِيْرِ

সরকথা হলো, পানির অবর্তমানে পবিত্র মাটি দিয়ে নির্দিষ্ট পন্থায় পবিত্রতা অর্জন করাকে تَيَمُّمْ বলে।

اِخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِىْ كَيْفِيَّةِ التَّيَمُّمِ তায়াম্মুমের পদ্ধতি সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ : তায়াম্মুম করার পদ্ধতি নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো—

مَذْهَبُ أَحْمَدَ وَ الْأَوْزَعِيِّ وَبَعْضِ الشَّوَافِعِ : ইমাম আহমদ, ইমাম আওযায়ী এবং কতিপয় শাফেয়ী মতাবলম্বী ওলামা বলেন— اَلتَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ অর্থাৎ, জমিনে একবারই হাত মেরে মুখমণ্ডল ও দু'হাত কব্জি ও কনুই পর্যন্ত মাসাহ করবে। তাঁদের দলিল হযরত আম্মার (রা.)-এর হাদীস—

فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيْهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ .

مَذْهَبُ جُمْهُوْرِ الْأَئِمَّةِ : ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক (র.) ও হযরত জাবের (রা.)-এর মতে, মাটিতে দু'বার হাত মারতে হবে। একবার হাত মেরে মুখমণ্ডল মাসাহ করবে এবং দ্বিতীয়বার হাত মেরে দু' হাত কব্জি হতে কনুই পর্যন্ত মাসাহ করবে। তাঁদের দলিল—

١ . عَنْ أَبِي أُمَامَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلتَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ .

٢ . عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ (رضـ) ...... فَضَرَبُوْا بِأَكُفِّهِمُ الصَّعِيْدَ ثُمَّ مَسَحُوْا بِوُجُوْهِهِمْ مَسْحَةً وَاحِدَةً ثُمَّ عَادُوْا فَضَرَبُوْا بِأَكُفِّهِمُ الصَّعِيْدَ مَرَّةً أُخْرَى .... الخ .

٣ . عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلتَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ .

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ : প্রতিপক্ষের দলিলের উত্তর–

১. নবী করীম ﷺ কর্তৃক হযরত আম্মার (রা.)-কে তায়াম্মুমের সম্পূর্ণ পদ্ধতি ও সংখ্যা বর্ণনা করার ইচ্ছা ছিল না ; বরং শুধু হাত মারার ধরন শিক্ষা দেওয়াই ইচ্ছা ছিল, যাতে পবিত্র হওয়ার জন্য মাটিতে গড়াগড়ি দেওয়া না লাগে।
২. এ ছাড়া হযরত আম্মার (রা.) হতেই দু'বার হাত মারা সম্বলিত হাদীস বর্ণিত আছে। হযরত আম্মার (রা.)-এর হাদীসে كَفَّيْهِ দ্বারা (কনুই পর্যন্ত) দু'হাতই বুঝানো হয়েছে। অতএব একবার হাত মারার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়।
৩. বর্ণনার ভিন্নতার কারণে দু'বার হাত মারাতেই অধিক সতর্কতা। এছাড়া অজুতে একবার পানি নিয়ে দু'অঙ্গ ধৌত করা জায়েজ নেই বিধায় অজুর পরিপূরক তায়াম্মুমে তো যৌক্তিক নয়। কাজেই দু'বারই হাত মারতে হবে। সুতরাং এ মতই অনুসরণযোগ্য।

فَرْضُ التَّيَمُّمِ **তায়াম্মুমের ফরজ** : ইমামগণ এ কথার উপর একমত যে, তায়াম্মুমের ফরজ তিনটি। যথা– ১. নিয়ত করা। ২. পবিত্র মাটিতে প্রথমবার হাত মেরে মুখমণ্ডল মাসাহ করা। ৩. দ্বিতীয়বার হাত মেরে উভয় হাত কনুই পর্যন্ত মাসাহ করা।

اِخْتِلَافُ الْأَئِمَّةِ فِيْ مِقْدَارِ الْمَسْحِ **মাসাহের পরিমাণ সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ** : মাসাহের পরিমাণ সম্পর্কে অনেকগুলো মত পাওয়া যায়, ফলে ইমামগণও বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন, যা নিম্নরূপ—

১. مَذْهَبُ الزُّهْرِيِّ (رحـ) : ইমাম যুহরী (র.)-এর মতে উভয় হাত বগল পর্যন্ত মাসাহ করতে হবে।

দলিল : ١ . قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى . فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ الخ

আলোচ্য আয়াতে দু'হাতের সীমানা নির্ধারণ করা হয়নি। সুতরাং পূর্ণ হাতই মাসাহ করতে হবে।

٢. عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ (رضـ) اَنَّهُ قَالَ فَامْسَحُوْا بِاَيْدِيْكُمْ كُلِّهَا اِلَى الْمَنَاكِبِ وَالْاٰبَاطِ . (اَبُوْدَاوُدَ)

২. مَذْهَبُ اَحْمَدَ وَاِسْحَاقَ وَعَطَاءٍ وَمَكْحُوْلٍ وَغَيْرِهِمْ (رحـ) : ইমাম আহমদ, ইসহাক, আতা, মাকহুল, আওযায়ী ইবনে মুনযির (র.)-এর মতে তায়াম্মুমের সময় উভয় হাতের (كَفَّيْنِ) কব্জি পর্যন্ত মাসাহ করতে হবে।

তাঁদের দলিল— ١ . عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ (رضـ) .... ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

٢ . وَفِيْ مُسْلِمٍ ثُمَّ تَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ .

مَذْهَبُ الْجَمْهُوْرِ : ইমাম আযম, ইমাম শাফি'ঈ, ইমাম মলেক, সুফইয়ান ছাওরী, ইমাম শা'বী ও হযরত হাসান বসরী প্রমুখ (র.)-এর মতে, হাতের কনুই পর্যন্ত মাসাহ করতে হবে।

তাঁদের দলিল— ١ . عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) مَرْفُوْعًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلتَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ .

٢ . عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلتَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ .

٣ . عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّهُ قَالَ اِنَّ قَوْمًا جَاءُوْا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ .... ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً اُخْرٰى فَمَسَحَ بِهَا عَلٰى يَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ .

◗ ইমাম মালেক (র.)-এর অপর মতে হাতের কব্জি পর্যন্ত মাসাহ করা ফরজ এবং কনুই পর্যন্ত ইচ্ছাধীন, করলেও কোনো দোষ নেই, না করলেও কোনো অসুবিধা নেই।

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ প্রতিপক্ষের দলিলের উত্তর : প্রতিপক্ষের দলিলের নিম্নোক্ত উত্তর দেওয়া যেতে পারে। যথা—

১. ইমাম যুহরী (র.) নিজ অভিমতের সপক্ষে পবিত্র কুরআনের যে আয়াত পেশ করেছেন সেটি হলো অজু সংক্রান্ত আয়াত। সেই আয়াতের ভিত্তিতে অজুতে দু'হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করা হয়। সুতরাং অজুর ন্যায় তায়াম্মুমেও কনুই পর্যন্ত মাসাহ করা উচিত।

২. হযরত আম্মার (রা.)-এর হাদীসের উত্তর এই যে, কনুই পর্যন্ত মাসাহ করার ব্যাপারে বর্ণিত অগণিত মারফূ' হাদীসের মোকাবিলায় সাহাবীদের বগল পর্যন্ত মাসাহ করার আমল হুজ্জত হতে পারে না।

৩. ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর মতে, বগল পর্যন্ত মাসাহ করার হাদীস অন্যান্য মারফূ' হাদীস দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে।

◗ ইমাম আহমদ, ইমাম ইসহাক (র.) এদের দলিলের উত্তর হলো, হযরত আম্মার (রা.) থেকেই কনুই পর্যন্ত মাসাহ করার হাদীস বর্ণিত আছে। যেমন- فَضَرَبْنَا ضَرْبَةً اُخْرٰى لِلْيَدَيْنِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ (رَوَاهُ الْبَزَّارُ) অতএব এ মতামত গ্রহণীয় নয়। আর যেসব হাদীসে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ হাতের কব্জি পর্যন্ত মাসাহ করতে বলেছেন বলে উল্লেখ করা হচ্ছে সেগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কথা বুঝানো যে, তায়াম্মুমের জন্য আপদ মস্তক মাটিতে গড়াগড়ি যাওয়ার প্রয়োজন নেই। কেবল নির্দিষ্ট কিছু অঙ্গ মাসাহ করাই যথেষ্ট। সুতরাং উভয় হাতের কনুই পর্যন্ত মাসাহ করা উচিত।

وَجْهُ تَرْكِ الصَّلٰوةِ لِعُمَرَ (رض) হযরত ওমর (রা.)-এর নামাজ ছেড়ে দেওয়ার কারণ : হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত ওমর (রা.) নাপাক থাকার কারণে নামাজ আদায় করেননি। নামাজ আদায় না করার কয়েকটি ব্যাখ্যা হতে পারে—

১. তিনি মনে করেছিলেন তায়াম্মুম শুধু حَدَثْ اَصْغَرْ বা ছোট নাপাকীর জন্য حَدَثْ اَكْبَرْ বা বড় নাপাকীর জন্য নয়।

২. অথবা নামাজের সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে পানি পাওয়ার আশা করেছিলেন, তাই তখনকার মতো নামাজ হতে বিরত ছিলেন।

৩. তিনি বুঝতে পারছিলেন না, এ অবস্থায় কি করবেন। আর নবী করীম ﷺ হতে অবগত হওয়ার সুযোগও ছিল না। ফলে নাপাক অবস্থায় নামাজ আদায় করা হারাম জেনে তিনি পড়েননি।

৪. অথবা তখনও তায়াম্মুমের নিয়ন প্রবর্তিত হয়নি, তাই হযরত ওমর (রা.) এরূপ করেছিলেন।

وَعَنْ ٤٨٦ اَبِى الْجُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ (رض) قَالَ مَرَرْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَبُوْلُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ حَتّٰى قَامَ اِلٰى جِدَارٍ فَحَتَّهُ بِعَصًا كَانَتْ مَعَهُ ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيَّ وَلَمْ اَجِدْ هٰذِهِ الرِّوَايَةَ فِى الصَّحِيْحَيْنِ وَلَا فِىْ كِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ وَلٰكِنْ ذَكَرَهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

৪৮৬. অনুবাদ : হযরত আবুল জুহাইম ইবনে হারেস ইবনে সিম্মাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী করীম ﷺ-এর নিকট দিয়ে গমন করছিলাম, তখন তিনি প্রস্রাব করছিলেন। আমি তাঁকে সালাম করলাম, কিন্তু তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন না। অতঃপর তিনি একটি দেয়ালের নিকট গেলেন এবং তাঁর সাথে থাকা লাঠি দ্বারা দেয়ালে খোঁচা দিলেন। অতঃপর তাঁর দু' হাত দেয়ালের উপর রাখলেন এবং নিজ মুখমণ্ডল ও দু' হাত মাসাহ করলেন। এরপর আমার সালামের উত্তর দিলেন।

মেশকাতের গ্রন্থকার বলেন, আমি মাসাবীহ-এর এই বর্ণনা বুখারী ও মুসলিম শরীফে পাইনি, এমনকি হুমাইদীর কিতাব জামে'উস সহীহাইনেও পাইনি, তবে ইমাম বাগাবী (র.) শরহুস সুন্নাহ উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, হাদীসটি হাসান।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা অজুর সাথে থাকাকে পছন্দ করতেন এবং অজু অবস্থাতেই থাকতেন, আর বিনা অজুতে আল্লাহর স্মরণকে অপছন্দ করতেন। এ জন্যই তিনি তায়াম্মুম করে সে ব্যক্তির সালামের উত্তর দিয়েছেন। তবে মাঝে মধ্যে এর ব্যতিক্রমও করেছেন, যাতে উম্মতের উপর কোনো কষ্টকর বিধান আবশ্যক হয়ে না যায়।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤٨٧ اَبِىْ ذَرٍّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ وَضُوْءُ الْمُسْلِمِ وَاِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشَرَ سِنِيْنَ فَاِذَا وُجِدَ الْمَاءُ فَلْيَمَسَّهُ بَشَرَهُ فَاِنَّ ذٰلِكَ خَيْرٌ ـ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْدَاوُدَ وَ رَوَى النَّسَائِىُّ نَحْوَهُ اِلٰى قَوْلِهِ عَشَرَ سِنِيْنَ ـ

৪৮৭. অনুবাদ : হযরত আবূ যার গিফারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— পাক মাটি মুসলমানদের জন্য পবিত্রকারী। যদি সে দশ বছর যাবৎও পানি না পায়। আর যখনই সে পানি পায় তখনই সে যেন শরীরে [উত্তম] পানি লাগায়। কেননা, তার জন্য এটাই উত্তম। -[আহমদ, তিরমিযী ও আবূ দাঊদ] এবং নাসায়ী "দশ বছর যাবৎ পানি না পায়" পর্যন্ত পূর্বানুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে শরীরে পানি লাগানোর অর্থ হলো– গোসল করা। আর উত্তম শব্দটি এখানে ফরজের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ হাদীসের উপর ভিত্তি করেই ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, এক তায়াম্মুমে যত ওয়াক্ত ইচ্ছা নামাজ আদায় করতে পারবে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, প্রতি ওয়াক্ত নামাজের জন্য নতুন করে তায়াম্মুম করা আবশ্যক।

আর হাদীসে দশ বছর দ্বারা সংখ্যা নির্ধারণ উদ্দেশ্য নয়; বরং তা দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, যতদিন পানি না পাওয়া যাবে ততদিন পাক মাটি বা মাটি জাতীয় বস্তুর দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা বৈধ এবং সেই পবিত্রতা দ্বারা সব রকমের ইবাদত করা যাবে। তবে পানি পাওয়ার সাথে সাথেই তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে।

وَعَنْ ٤٨٨ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ خَرَجْنَا فِىْ سَفَرٍ فَاَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِىْ رَأْسِهِ فَاحْتَلَمَ فَسَاَلَ اَصْحَابَهُ هَلْ تَجِدُوْنَ لِىْ رُخْصَةً فِى التَّيَمُّمِ قَالُوْا مَا نَجِدُلَكَ رُخْصَةً وَاَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِىِّ ﷺ اُخْبِرَ بِذٰلِكَ قَالَ قَتَلُوْهُ قَتَلَهُمُ اللّٰهُ اَلَّا سَاَلُوْا اِذَا لَمْ يَعْلَمُوْا فَاِنَّمَا شِفَاءُ الْعِىِّ السُّوَالُ اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْهِ اَنْ

৪৮৮. অনুবাদ : হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, একদা আমরা এক সফরে বের হলাম। হঠাৎ আমাদের একজনের [মাথায়] একটা পাথরের আঘাত লাগল, ফলে তার মাথাকে আহত করে দিল। এরপর তার স্বপ্নদোষ হলো এবং সে তার সাথীদেরকে জিজ্ঞেস করল, তোমরা কি [এ অবস্থায়] আমার জন্য তায়াম্মুমের অনুমতি আছে বলে মনে কর? তারা বলল, তোমার জন্য অনুমতি আছে বলে মনে করি না। কেননা তুমি পানি পাচ্ছ। সুতরাং সে গোসল করল, আর এতে সে মারা গেল। তারপর আমরা যখন মহানবী ﷺ-এর নিকট আসলাম তখন তাঁকে এ সংবাদ জানানো হলো। তিনি বললেন, তারা তাকে হত্যা করেছে। আল্লাহ তাদের সমুচিত শাস্তি দিন। তারা যখন জানেনা তখন অন্যদের নিকট থেকে জেনে নিল না কেন? কেননা, অজ্ঞতার নিরাময়ই হচ্ছে জিজ্ঞাসা করা। অথচ তার জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল যে, সে

يَتَيَمَّمَ وَيُعَصِّبَ عَلَى جَرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحُ عَلَيْهَا وَيَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ . رَوَاهُ اَبُوْدَاؤدَ وَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

তায়াম্মুম করে নিত এবং তার জখমের উপর একটি পট্টি বেঁধে নিত, তারপর তার উপর মাসাহ করত এবং বাকি শরীর ধৌত করত। [আবূ দাউদ] ইবনে মাজাহ্ হাদীসটি আতা ইবনে আবী রাবাহ (র.)-এর সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِخْتِلَافُ الْاَئِمَّةِ فِى الْجَمْعِ بَيْنَ التَّيَمُّمِ وَالْغُسْلِ তায়াম্মুম ও গোসল একত্রে করা সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : পানি ব্যবহার করলে যদি জীবন নাশের সম্ভাবনা থাকে তবে সর্বসম্মতিক্রমে তায়াম্মুম করা জায়েজ আছে। আর যদি রোগ বৃদ্ধি বা ক্ষত শুকাতে বিলম্ব হওয়ার ভয় থাকে, তখন কি করতে হবে এ বিষয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

مَذْهَبُ الشَّافِعِىِّ (رحـ) : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে এই অবস্থায় তায়াম্মুম ও গোসল উভয়ই করতে হবে। শুধু তায়াম্মুম বা শুধু গোসল করা যথেষ্ট নয়। তাঁর দলিল হলো—

١ . حَدِيْثُ جَابِرٍ (رضـ) .... اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْهِ اَنْ يَتَيَمَّمَ وَيُعَصِّبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحُ عَلَيْهَا وَيَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ . (رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ)

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمَالِكٍ (رحـ) : ইমাম আবূ হানিফা ও মালিক (র.)-এর মতে তার জন্য তায়াম্মুম করা জায়েজ আছে। তায়াম্মুম ও গোসল উভয়টি করতে হবে না। তাঁদের দলিল হলো—

১. গোসল হলো মূল, আর তায়াম্মুম হলো তার স্থলাভিষিক্ত বা একটি হলো مُبْدَلٌ مِنْهُ আরেকটি হলো بَدَلٌ যদি কেউ غُسْلٌ ও تَيَمُّمٌ উভয়টি করে তাহলে মূল ও তার স্থলাভিষিক্ত বিষয় একত্র হয়ে যাবে, এরূপ একত্রিকরণ কিয়াসের বিপরীত।

اَلْجَوَابُ عَنْ اَدِلَّةِ الْمُخَالِفِيْنَ বিরোধীদের দলিলের উত্তর :

১. উক্ত হাদীসটি ضَعِيْفٌ, কেননা زُبَيْرُ بْنُ خُرَيْقٍ একক বর্ণনাকারী, আর তিনি কোনো শক্তিশালী বর্ণনাকারীও নন।

২. অথবা নবী করীম ﷺ-এর বাণী— يتيمم و يعصب -এর মধ্যে "وَ" -এর অর্থ "اَوْ" হবে। তাহলে হাদীসের অর্থ হবে যে, ঐ অসমর্থ ব্যক্তি এ দু'টির মধ্যে যে কোনো একটি কার্য করবে। হয় তায়াম্মুম করবে নতুবা জখমে পট্টি বেঁধে তার উপর মাসাহ করবে এবং অবশিষ্ট শরীর ধৌত করে নেবে।

৩. অথবা এটাও বলা যেতে পারে যে, নবী করীম ﷺ-এর বাণী– اِنَّمَا يَكْفِيْهِ اَنْ يَتَيَمَّمَ -এর অর্থ এই যে, ঐ অপারগ ব্যক্তির জন্য তায়াম্মুমই যথেষ্ট এবং وَيُعَصِّبَ এটা তায়াম্মুমের উপরে 'আতফ' নয়; বরং এটা একটি ভিন্ন বাক্য এবং একটি উহ্য শর্তের জাযা (جَزَاءٌ) প্রকৃতপক্ষে বাক্যটি নিম্নরূপ ছিল–

اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْهِ اَنْ يَتَيَمَّمَ فَقَطْ وَاِنْ اَرَادَ الْغُسْلَ فَيُعَصِّبُ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً الخ

অর্থাৎ তার জন্য শুধু তায়াম্মুমই যথেষ্ট ছিল। যদি গোসলের ইচ্ছা করে, তবে ক্ষতের উপরে পট্টি বাঁধবে ....।

اِنَّمَا شِفَاءُ الْعِىِّ السُّوَالُ-এর দ্বারা উদ্দেশ্য : মহানবী ﷺ এর আলোচ্য বক্তব্যটির উদ্দেশ্য নিজে না জেনে অন্যকে পরামর্শ দেওয়া খুবই ক্ষতিকর বিষয়। যে ব্যক্তি কোনো বিষয় সম্পর্কে জানতে আগ্রহী, তার উচিত এমন এক ব্যক্তির নিকট সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা, যার সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে। আর এটাই হলো তার জন্য মুক্তি। সুতরাং এমন ব্যক্তির নিকট প্রশ্ন করা ঠিক হবে না। যে ব্যক্তির সে বিষয়ে কোনো জ্ঞান নেই। আর উত্তরকারীরও উচিত নয়, না জেনে কোনো বিষয়ের উত্তর দেওয়া।

وَعَنْ ٤٨٩ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ (رضـ) قَالَ خَرَجَ رَجُلَانِ فِىْ سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلٰوةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فِى الْوَقْتِ فَاَعَادَ اَحَدُهُمَا الصَّلٰوةَ بِوُضُوْءٍ وَلَمْ يُعِدِ الْاٰخَرُ ثُمَّ اَتَيَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ فَقَالَ لِلَّذِىْ لَمْ يُعِدْ اَصَبْتَ السُّنَّةَ وَاَجْزَاَتْكَ صَلٰوتُكَ وَقَالَ لِلَّذِىْ تَوَضَّأَ وَاَعَادَ لَكَ الْاَجْرُ مَرَّتَيْنِ . رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَالدَّارِمِىُّ وَ رَوَى النَّسَائِىُّ نَحْوَهُ وَقَدْ رَوٰى هُوَ وَ اَبُوْدَاوُدَ اَيْضًا عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلًا .

৪৮৯. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার দু' ব্যক্তি সফরে বের হলেন। অতঃপর নামাজের সময় হলো ; কিন্তু তাদের নিকট পানি ছিল না। সুতরাং উভয়ে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নামাজ আদায় করল, এরপর তারা নামাজের সময়ের মধ্যেই পানি পেল, তখন তাদের একজন অজু করে নামাজ পুনরায় আদায় করল। কিন্তু অপরজন নামাজ আদায় করল না। তারপর তারা উভয়েই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলো এবং এই বিষয়টি সম্পর্কে তাকে অবহিত করল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ যে ব্যক্তি নামাজ পুনরায় আদায় করেনি তাকে বললেন, তুমি সঠিক রীতিতে কাজ করেছ এবং তোমার নামাজ তোমার জন্য যথেষ্ট হয়েছে। আর যে ব্যক্তি পুনরায় অজু করে নামাজ আদায় করল তাকে বললেন, তোমার জন্য দ্বিগুণ ছওয়াব রয়েছে। –[আবূ দাঊদ ও দারেমী]

ইমাম নাসায়ীও এরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাসায়ী ও আবূ দাঊদ এ হাদীসটিকে হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রা.) হতে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَحُكْمُ الْمُتَيَمِّمِ الَّذِىْ وَجَدَ الْمَاءَ وَهُوَ فِى الصَّلٰوةِ তায়াম্মুমকারী নামাজে থাকা অবস্থায় পানি পেলে তার বিধান :
مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَالثَّوْرِىْ وَالْاَوْزَاعِىْ (رحـ) : ইমাম আবূ হানীফা, সুফিয়ান ছাওরী ও আওযা'ঈ (র.)-এর মতে, এমতাবস্থায় নামাজ ভঙ্গ করে অজু করা তার উপর আবশ্যক। কেননা, পানি পাওয়া যাওয়ার সাথে সাথে فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ الْاٰيَةُ এই নির্দেশ পালন করা তায়াম্মুমকারীর উপর আবশ্যক হয়ে পড়বে।

حُكْمُ مَنْ وَجَدَ الْمَاءَ قَبْلَ الصَّلٰوةِ নামাজ পড়ার পূর্বে তায়াম্মুকারী পানি পেলে তার বিধান : কিছু সংখ্যক ওলামার মতে তায়াম্মুম করে নামাজ আদায় করার পূর্বে পানি পাওয়া গেলে অজু করা ওয়াজিব নয়। কিন্তু জমহুর ওলামায়ে কেরামদের মতে এই অবস্থায় পানি দ্বারা অজু করা ওয়াজিব।

حُكْمُ مَنْ وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ اَدَاءِ الصَّلٰوةِ নামাজ শেষে পানি পেলে তার বিধান :
مَذْهَبُ بَعْضِ الْاَئِمَّةِ : ইমাম তাউস, ইমাম আতা, ইমাম মাকহুল, ইবনে সীরীন, যুহরী (র.) প্রমুখ ইমামের মতে তায়াম্মুম করে নামাজ সমাপনের পর পানি পেলে এবং নামাজের ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকলে পানি দ্বারা অজু করে পুনরায় নামায আদায় করা ওয়াজিব। কেননা, নামাজের জন্য অজু শর্ত, আর তখন অজু করা সম্ভব।

مَذْهَبُ الْاَئِمَّةِ الْاَرْبَعَةِ : ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে এ অবস্থায় পুনবার নামাজ আদায় করা ওয়াজিব নয়। তাঁদের দলিল–

حَدِيْثُ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رضـ) فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِلَّذِىْ لَمْ يُعِدِ الصَّلٰوةَ اَصَبْتَ السُّنَّةَ وَاَجْزَاَتْكَ صَلٰوتُكَ .

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ : তাদের যৌক্তিক দলিলের উত্তরে বলা যায় যে, প্রকাশ্য হাদীসের বিপরীত قِيَاسٌ গ্রহণযোগ্য নয়।

لَكَ الْاَجْرُ مَرَّتَيْنِ -এর অর্থ : "তোমাকে দ্বিগুণ ছওয়াব দেওয়া হবে"–এর অর্থ হলো উভয় নামাজের জন্য পৃথক পৃথক ছওয়াব দেয়া হবে। প্রথম বারে 'ফরজ' আদায় হয়ে গিয়েছে তজ্জন্য ফরজের ছওয়াব এবং দ্বিতীয় বারে 'নফল' আদায় হয়েছে, এ জন্য নফলের ছওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি পুনরায় নামাজ পড়েনি, সে শরিয়তসম্মত কাজ করেছে। ফলে সে কেবলমাত্র ফরজ নামাজের ছওয়াবই লাভ করবে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤٩٠ اَبِى الْجُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ (رض) قَالَ اَقْبَلَ النَّبِىُّ ﷺ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِىُّ ﷺ حَتّٰى اَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৯০. **অনুবাদ :** হযরত আবুল জুহাইম ইবনে হারেছ ইবনে সিম্মাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ জামাল নামক কূপের দিক থেকে আগমন করলেন, তখন তাঁর সাথে এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ হলো এবং সে তাঁকে সালাম করল। কিন্তু নবী করীম ﷺ তার সালামের কোনো উত্তর দিলেন না। তারপর তিনি একটি দেয়ালের নিকট আসলেন এবং নিজের মুখমণ্ডল ও দু' হাত মাসাহ করলেন [অর্থাৎ, তায়াম্মুম করলেন।] এরপর তার সালামের উত্তর দিলেন। −[বুখারী-মুসলিম]

وَعَنْ ٤٩١ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ (رض) اَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ اَنَّهُمْ تَمَسَّحُوْا وَهُمْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالصَّعِيْدِ لِصَلٰوةِ الْفَجْرِ فَضَرَبُوْا بِاَكُفِّهِمُ الصَّعِيْدَ ثُمَّ مَسَحُوْا بِوُجُوْهِهِمْ مَسْحَةً وَاحِدَةً ثُمَّ عَادُوْا فَضَرَبُوْا بِاَكُفِّهِمُ الصَّعِيْدَ مَرَّةً اُخْرٰى فَمَسَحُوْا بِاَيْدِيْهِمْ كُلِّهَا اِلَى الْمَنَاكِبِ وَالْاٰبَاطِ مِنْ بُطُوْنِ اَيْدِيْهِمْ - رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ

৪৯১. **অনুবাদ :** হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে ছিলেন, তখন তাঁরা ফজরের নামাজের জন্য পাক মাটি দ্বারা মাসাহ করলেন, তাঁরা তাঁদের হাত মাটিতে মারলেন, অতঃপর নিজেদের মুখমণ্ডল একবার করে মাসাহ করলেন। এরপর তাঁরা তাঁদের হাতগুলো পাক মাটিতে দ্বিতীয়বার মারলেন এবং সকলে উভয় হাতের বাহুমূল পর্যন্ত সম্পূর্ণ হাত মাসাহ করলেন এবং তাঁদের হাতের ভিতর দিকটা বগল পর্যন্ত মাসাহ করলেন। −[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** হানাফী মাযহাব মতে হাতের কনুই পর্যন্ত মাসাহ করতে হবে। বগল পর্যন্ত মাসাহের হাদীসটি চার ইমামের মধ্যে কোনো ইমামই গ্রহণ করেননি। কেননা, এ কথা অকাট্যভাবে বুঝা যায় না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদেরকে তায়াম্মুম করতে দেখেছেন এবং তা সমর্থন করেছেন।

بَابُ الْغُسْلِ الْمَسْنُوْنِ
পরিচ্ছেদ : সুন্নত গোসল

اَلْغَسْلُ শব্দটি তিনভাবে পড়া যায়। যথা—

১. اَلْغَسْلُ : غَيْن বর্ণের যবর যোগে, তখন এটি বাবে ضَرَبَ -এর মাসদার হিসেবে অর্থ হবে– ধৌত করা।

২. اَلْغِسْلُ : غَيْن বর্ণে যের যোগে, তখন এটি إِسْم হিসেবে অর্থ হবে– পানি তথা যা দ্বারা ধৌত করা হয়।

৩. اَلْغُسْلُ : غَيْن বর্ণে পেশ যোগে– তখনও এটি إِسْم হবে। আর অর্থ হবে– গোসল বলতে আমরা যা বুঝি। এখানে এটিই উদ্দেশ্য। গোসল সর্বমোট চার ভাগে বিভক্ত। যথা– ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ও মোস্তাহাব।

কামভাবের সাথে বীর্যপাতের পর, সহবাসের পর; যদিও বীর্যপাত না হয়, স্বপ্নদোষের কারণে বীর্যপাত হওয়ার পর, হায়েজের পর এবং নেফাসের পর গোসল করা ফরজ। জীবিতের উপর মৃত ব্যক্তিকে গোসল দান এবং বিধর্মীর ইসলাম গ্রহণকালে গোসল করা ওয়াজিব; যদি সে নাপাক থাকে। জুমার গোসল সুন্নত, কারও মতে এটা মোস্তাহাব। কিন্তু ইমাম মালিক (র.)-এর মতে ওয়াজিব। হজের জন্য ইহরাম বাঁধার পূর্বে, শিঙা লাগানোর পরে এবং মুর্দাকে গোসল দানের পরে গোসল করা মোস্তাহাব। আরাফাতের দিন ও দুই ঈদের দিনের গোসলকেও ফিকহবিদগণ মোস্তাহাব বলেছেন। আলোচ্য অধ্যায়ে এর কয়েকটি আলোজিদ হবে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٤٩٢ - عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৯২. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— যখন তোমাদের কেউ জুমার নামাজ পড়তে আসে; তখন সে যেন [মসজিদে গমন করার পূর্বে] গোসল করে নেয়। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

سَبَبُ وُرُوْدِ الْحَدِيْثِ **হাদীসের পটভূমি :** হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। ইরাকবাসী দু' ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে জুমার দিনের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল, তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, জুমার দিন গোসল করা উত্তম এবং তিনি বললেন যে, জুমার দিনের ইতিহাস হলো, আরবের লোকজন অভাবী ছিল এবং তারা পশমি কাপড় পরে সারাদিন কাজে ব্যস্ত থাকত এবং এ পরিশ্রমী অবস্থায় মসজিদে যেত। আর তখনকার মসজিদ ছিল ছোট। মসজিদে লোকজনের ভিড় হতো। একদা হুজুর ﷺ খোতবা পাঠ করছিলেন, এমন সময় মানুষের দেহ ঘামিয়ে পরস্পরের নিকট ঘামের গন্ধ অনুভূত হচ্ছিল। এমনকি সে গন্ধ নবী করীম ﷺ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছল। তখন নবী করীম ﷺ মিম্বারে থেকেই ইরশাদ করেন, জুমার দিন আগমন করলে তোমরা গোসল করবে এবং সুগন্ধি ব্যবহার করবে। উল্লিখিত ঘটনার প্রেক্ষিতে হাদীসটি বর্ণিত হয়।

٤٩٣ - وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُحْتَلِمٍ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৯৩. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— জুমার দিনের গোসল প্রত্যেক বালেগ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حُكْمُ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ **জুমার দিনে গোসলের বিধান :** আল্লামা নববী (র.) বলেন, জুমার গোসল সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন—

مَذْهَبُ الْإِمَامِ مَالِكٍ (رحـ) وَأَهْلِ الظَّاهِرِ : ইমাম মালিক ও আসহাবে যাহের বলেন, জুমার দিনে গোসল করা ওয়াজিব। তাঁদের দলিল— ١ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا جَاءَ اَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

٢ـ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُحْتَلِمٍ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

مَذْهَبُ جُمْهُوْرِ الْاَئِمَّةِ : ইমাম আবূ হানীফাসহ জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, জুমার দিন গোসল করা সুন্নত। তাঁদের দলিল সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.)-এর হাদীস—

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ (رضـ) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعِمَتْ وَمَنْ اِغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ اَفْضَلُ . رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

আল্লামা খাত্তাবী (র.) বলেন, যে সমস্ত কারণে গোসল ওয়াজিব বা ফরজ হয়, তা উক্ত সববের পরে হয়ে থাকে। যেমন– জানাবাত, হায়েয ও নিফাসের গোসল। আর যে গোসল সুন্নত বা মোস্তাহাব তা সববের পূর্বেই হয়। যেমন– ঈদের ও ইহরামের গোসল। আর জুমার দিনের গোসলও ঐ দু'টির ন্যায় সববের পূর্বে হয়ে থাকে। এ থেকে বুঝা যায়, জুমার গোসল ওয়াজিব নয়।

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ :

১. প্রতিপক্ষের দলিলের জবাবে জমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেন, বর্ণিত হাদীসে 'ওয়াজিব' অর্থ শরিয়তের পরিভাষায় ওয়াজিব নয় ; বরং এর অর্থ ثَابِتٌ [প্রমাণিত] অর্থাৎ, জুমার দিনে গোসল করা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য হাদীসে প্রমাণিত। সুতরাং এ ওয়াজিব প্রত্যাখ্যানকারী গুনাহগার হবে না। আসলে এর বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য করে ওয়াজিব শব্দটি বলা হয়েছে। যেমন– কোনো ব্যক্তির প্রতি আবেগাপ্লুত হয়ে আমরা বলে থাকি— رِعَايَةُ فُلَانٍ عَلَيْنَا وَاجِبَةٌ অর্থাৎ, অমুকের প্রতি লক্ষ্য রাখা আমাদের উপর ওয়াজিব। এখানে ওয়াজিব অর্থ উচিত বা বাঞ্ছনীয়।
২. অথবা ইসলামের প্রথম যুগে মুসলমানরা গরিব ছিলেন, মোটা পশমি কাপড় পরতেন। এক কাপড় দু'তিন দিন পরতে হতো, ফলে ঘামে ভিজে দুর্গন্ধ ছড়াত। জুমার দিন অন্যান্য লোকেরও কষ্ট হতো। এ দিকে চিন্তা করে ওয়াজিব করা হয়েছিল। পরে স্বচ্ছল হওয়ার পর সমস্যা রইল না, তারা পরিচ্ছন্নতার দিকেও মনোযোগ দিয়েছিলেন, ফলে কারণ বিদূরীত হওয়ার সাথে সাথে ওয়াজিবের বিধান রহিত হয়ে গেছে। বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত ইকরিমা (র.)-এর বর্ণনায় এ ব্যাখ্যা রয়েছে।

٤٩٤ـ وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَقٌّ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ اَنْ يَّغْتَسِلَ فِيْ كُلِّ سَبْعَةِ اَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيْهِ رَأْسَهٗ وَجَسَدَهٗ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪৯৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— প্রত্যেক [প্রাপ্তবয়স্ক বুদ্ধিসম্পন্ন] মুসলমানের উপর এটা কর্তব্য যে, সে প্রতি সাত দিনের মধ্যে একদিন গোসল করবে, আর সে গোসলে শরীর ও মাথা ধৌত করবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** মহানবী ﷺ-এর জমানায় আরবের লোকেরা প্রায় সকলেই মাথায় লম্বা চুল রাখত, পর্যাপ্ত পানির অভাবে নিয়মিত মাথার চুল ধৌত করত না। যা অন্যান্য মুসল্লিদের জন্য কষ্টের কারণ হতো। এ সব কারণেই নবী করীম ﷺ মাথা ধোয়ার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤٩٥ سُمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنْ اِغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ اَفْضَلُ ـ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ ـ

৪৯৫. অনুবাদ : হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— যে ব্যক্তি জুমার দিন অজু করে তার জন্য তাই যথেষ্ট এবং তা উত্তম কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়। আর যে গোসল করে, তার গোসল আরো উত্তম। –[আহমদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** উক্ত হাদীস হতে বুঝা যায় যে, জুমার গোসল ওয়াজিব নয় ; বরং সুন্নত বা মোস্তাহাব। এর প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পূর্বে উল্লিখিত হাদীসসমূহে জোর তাকিদ রয়েছে। আর সামুরা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীস অনুযায়ী হানাফী ফকীহ্গণ বলেন, জুমার গোসল সুন্নত। আমরা পূর্বেই বলেছি, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে তখনকার সময় মসজিদে নববী ছোট ছিল বিধায় গায়ের ঘামের গন্ধে অন্যান্য মুসল্লিদের কষ্ট হত, এ জন্য তখন গোসল করাটা ওয়াজিব করা হয়েছিল। পরে তা রহিত করে সুন্নতে পরিণত করা হয়েছে।

وَعَنْ ٤٩٦ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ ـ رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَةَ وَزَادَ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْدَاوُدَ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ـ

৪৯৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— যে ব্যক্তি কোনো মৃতকে গোসল করায় সে যেন নিজে গোসল করে নেয়। –[ইবনে মাজাহ্] আর ইমাম আহমদ, তিরমিযী ও আবূ দাউদ এ কথাটুকু ও বৃদ্ধি করেছেন যে, আর যে ব্যক্তি তাকে [মৃতকে] বহন করে সে যেন অজু করে নেয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** উক্ত হাদীসের দ্বারা বুঝা যায় যে, যে মৃতদেহ বহন করে তার অজু করা উচিত। এ অজু করার নির্দেশ জানাযার নামাজ পড়ার জন্য, অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়।

اِخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِى الْاِغْتِسَالِ بَعْدَ تَغْسِيْلِ الْمَيِّتِ **মৃতকে গোসল করানের পর গোসল করার ব্যাপারে মতানৈক্য :**

مَذْهَبُ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ : আত-'তা'লীকুস সাবীহ' গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, হযরত আলী (রা.) এবং হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তিকে গোসল করায় তার গোসল করা ওয়াজিব। তাঁদের দলিল—

١ـ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ ـ (رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ)

٢ـ وَعَنْ عَائِشَةَ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ اَرْبَعٍ مِنَ الْجَنَابَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمِنَ الْحِجَامَةِ وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ)

مذهب جمهور الائمة : জমহুর ইমামদের মতে মৃতকে গোসল করানোর পরে গোসল করা ওয়াজিব নয়। তাঁদের দলিল—

١ ـ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنَّ مَيِّتَكُمْ يَمُوْتُ فَحَسْبُكُمْ اَنْ تَغْسِلُوْا اَيْدِيَكُمْ ـ (اَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ)

٢ ـ وَفِيْ رِوَايَةٍ كُنَّا نَغْسِلُ الْمَيِّتَ فَمِنَّا مَنْ يَغْتَسِلُ وَمِنَّا مَنْ لَا يَغْتَسِلُ ـ (اَخْرَجَهُ الْخَطِيْبُ مِنْ حَدِيْثِ عُمَرَ (رض)

٣ ـ وَ رُوِيَ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِيْ بَكْرٍ (رض) غَسَّلَتْ اَبَا بَكْرٍ حِيْنَ تُوُفِّيَ ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَأَلَتْ مَنْ حَضَرَهَا مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ فَقَالَتْ اِنَّ هٰذَا يَوْمٌ شَدِيْدُ الْبَرْدِ وَاَنَا صَائِمَةٌ فَهَلْ عَلَيَّ غُسْلٌ قَالُوْا لَا ـ (رَوَاهُ مَالِكٌ فِى الْمُوَطَّا)

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ তাঁদের দলিলের জবাব :

১. পরবর্তী হাদীসসমূহ দ্বারা প্রথম হাদীসটি মানসূখ হয়ে গেছে।

২. আর দ্বিতীয় হাদীসটির বিধান মোস্তাহাব হিসেবে সাব্যস্ত হবে।

৩. অথবা এটা বলা যায় যে, গোসল করানোর সময় গোসল সম্পাদনকারীর শরীরে মৃত ব্যক্তির শরীর ধোয়া পানির ছিটা পড়লে সে ক্ষেত্রে উক্ত হাদীসটি প্রযোজ্য হবে।

وَعَنْ ٤٩٧ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ اَرْبَعٍ مِنَ الْجَنَابَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمِنَ الْحِجَامَةِ وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ ـ رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ

৪৯৭. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ চার কারণে গোসল করতেন— (১) নাপাক হওয়ার কারণে, (২) জুমার দিনে, (৩) শিঙ্গা নেওয়ার কারণে এবং (৪) মৃতকে গোসল দেওয়ার কারণে। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : নাপাকীর জন্য গোসল ফরজ এটা প্রাসঙ্গিক বিষয় হিসেবে এখানে উল্লিখিত হয়েছে। শিঙ্গা দেওয়ার ফলে শরীর হতে রক্ত বের হওয়ার কারণে গোসল করা সুন্নত। জুমার দিনে ঘাম ও ময়লার দুর্গন্ধ হতে বাঁচার জন্য প্রথমে ওয়াজিব ছিল, পরে তা সুন্নতে পরিণত হয়েছে। আর মৃতকে গোসল দেওয়ার পর গোসল করা মোস্তাহাব। রাসূল ﷺ মৃতকে গোসল করিয়েছেন বলে কোনো শক্তিশালী মত পাওয়া যায় না। তবে কাজি খাওয়ারেজমী তাঁর আল-হাবী (اَلْحَاوِىْ) নামক গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃতকে গোসল করিয়েছেন বলে মত প্রকাশ করেছেন।

وَعَنْ ٤٩٨ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ (رضـ) اَنَّهُ اَسْلَمَ فَاَمَرَهُ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْدَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ

৪৯৮. অনুবাদ : হযরত কায়েস ইবনে আসেম (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, [তিনি বলেন,] তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে [তথা ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করলে] নবী করীম ﷺ তাঁকে পানি ও বরই পাতা দ্বারা গোসল করতে নির্দেশ দেন। –[তিরমিযী, আবূ দাঊদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِخْتِلَافُ الْاَئِمَّةِ فِى الْغُسْلِ بَعْدَ الْاِسْلَامِ ইসলাম গ্রহণের পর গোসল করা সম্পর্কে মতভেদ :

مَذْهَبُ اَحْمَدَ وَاَبِىْ ثَوْرٍ : ইমাম আহমদ ও আবূ ছাওর (র.)-এর মতে, কাফির ব্যক্তি মুসলমান হওয়ার পর গোসল করা ওয়াজিব। তাঁদের দলিল— حَدِيْثُ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ (رضـ) اَنَّهُ اَسْلَمَ فَاَمَرَهُ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ

مَذْهَبُ جُمْهُوْرِ الْاَئِمَّةِ : জমহুর ইমামের মতে, এরূপ গোসল ওয়াজিব নয়; বরং মোস্তাহাব। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু' একজন লোক ব্যতীত কোনো নতুন ইসলাম গ্রহণকারীকে গোসল করার নির্দেশ প্রদান করেননি। যদি ওয়াজিব হতো, তবে সবাইকে গোসল করার নির্দেশ প্রদান করতেন।

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ তাদের হাদীসের জবাব :

১. হযরত কায়েস নাপাকী অবস্থায় থাকার কারণে রাসূল ﷺ তাঁকে গোসল করার আদেশ প্রদান করেন। আর নাপাকী অবস্থায় ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা করলে তখন গোসল করা সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব।

২. অথবা এ নির্দেশ ছিল মোস্তাহাব হিসেবে, যেমন কুরআনে আছে– فَاصْطَادُوْا

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤٩٩ عِكْرِمَةَ (رحـ) قَالَ اِنَّ نَاسًا مِنْ اَهْلِ الْعِرَاقِ جَاءُوا فَقَالُوا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ اَتَرَى الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبًا قَالَ لَا وَلٰكِنَّهُ اَطْهَرُ وَخَيْرٌ لِمَنِ اغْتَسَلَ وَمَنْ لَمْ يَغْتَسِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بِوَاجِبٍ وَسَاُخْبِرُكُمْ كَيْفَ بَدَأَ الْغُسْلُ كَانَ النَّاسُ مَجْهُوْدِيْنَ يَلْبَسُوْنَ الصُّوْفَ وَيَعْمَلُوْنَ عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ وَكَانَ مَسْجِدُهُمْ ضَيِّقًا مُقَارِبَ السَّقْفِ اِنَّمَا هُوَ عَرِيْشٌ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ يَوْمٍ حَارٍّ وَعَرِقَ النَّاسُ فِىْ ذٰلِكَ الصُّوْفِ حَتّٰى ثَارَتْ مِنْهُمْ رِيَاحٌ اٰذٰى بِذٰلِكَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَلَمَّا وَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تِلْكَ الرِّيَاحَ قَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِذَا كَانَ هٰذَا الْيَوْمُ فَاغْتَسِلُوْا وَلْيَمَسَّ اَحَدُكُمْ اَفْضَلَ مَا يَجِدُ مِنْ دُهْنِهٖ وَطِيْبِهٖ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ جَاءَ اللّٰهُ بِالْخَيْرِ وَلَبِسُوْا غَيْرَ الصُّوْفِ وَكُفُوا الْعَمَلَ وَ وُسِّعَ مَسْجِدُهُمْ ـ وَذَهَبَ بَعْضُ الَّذِىْ كَانَ يُؤْذِىْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا مِنَ الْعُرُوْقِ ـ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ

৪৯৯. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত ইকরিমা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইরাকের অধিবাসীদের একদল লোক আসল এবং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞেস করল, হে ইবনে আব্বাস! আপনি কি জুমার দিনের গোসলকে ওয়াজিব মনে করেন ? তিনি বললেন, না; বরং যে গোসল করে তার জন্য তা অতি পবিত্রতার কাজ এবং উত্তম কাজ। আর যে গোসল না করে তার জন্য তা ওয়াজিব নয়। আমি তোমাদেরকে এখন বলব, কিভাবে জুমার গোসল আরম্ভ হলো– লোকেরা তখন গরিব ছিল। তারা পশমের মোটা কাপড় পরিধান করত। আর পিঠে বোঝা বহনের কাজ করত। অথচ তাদের মসজিদ ছিল খুবই অপ্রশস্ত, নিচু ছাদ বিশিষ্ট, আর তাও ছিল খেজুরের ডালের তৈরি। একদিন গরমের সময় রাসূল ﷺ মসজিদে আসলেন, তখন জনগণ পশমের মোটা কাপড়ের মধ্যে ঘামে ভিজে গিয়েছিল এবং তাদের শরীর হতে ঘামের দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছিল, ফলে একের কারণে অন্যের কষ্ট হচ্ছিল। এ দুর্গন্ধ যখন রাসূল ﷺ অনুভব করলেন, তখন তিনি বললেন, হে লোক সকল! যখনই এ দিন [জুমার দিন] আসবে, তোমরা গোসল করবে। আর তোমাদের প্রত্যেকেই সাধ্যমতো ভালো তেল ও সুগন্ধি ব্যবহার করবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সম্পদ দান করলেন, তখন তারা পশমি মোটা কাপড় ছাড়া অন্য কাপড়ও পরিধান করতে লাগল, পরিশ্রমের অবসান ঘটল, আর তাদের মসজিদও প্রশস্ত হলো। ফলে ঘামের কারণে যে একের দ্বারা অন্যরা কষ্ট পেত তাও দূরীভূত হলো।

بَابُ الْحَيْضِ

পরিচ্ছেদ : ঋতুস্রাব

ঋতুস্রাব মহিলাদের একটি অবধারিত প্রাকৃতিক নিয়ম। বালেগা হওয়ার পর প্রত্যেক নারীরই ঋতুস্রাব দেখা দেয়। কোনো সুস্থ সবল যুবতী নারীই এ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। এ সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণিত আছে যে, 'মা' হাওয়া (আ.) জান্নাতে থাকাবস্থায় নিষিদ্ধ গাছের ফল ছিড়েছিলেন, তার শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন— "لَأُدْمِيَنَّكِ كَمَا أَدْمَيْتِهَا الخ" অর্থাৎ 'এ বৃক্ষকে তুমি যেভাবে রক্তাক্ত করেছ অনুরূপভাবে আমিও তোমাকে রক্তাক্ত করে ছাড়ব।' এর ফলশ্রুতিই মহিলাগণ কিয়ামত পর্যন্ত এ অবস্থা বহন করে চলবে। মহানবী ﷺ বলেছেন— هٰذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلٰى بَنَاتِ اٰدَمَ . (رَوَاهُ الشَّيْخَانِ) অর্থাৎ, 'আল্লাহ তা'আলা হায়েযকে আদম (আ.)-এর কন্যা সন্তানদের জন্য অবধারিত করে দিয়েছেন।' যারা বলেন, এটা বনী ইসরাঈলদের মহিলাদের থেকে শুরু হয়েছে, তাদের কথা ইমাম বুখারী (র.) এটাকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

হায়েয চলাকালীন অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে উঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া, আচার ব্যবহার সবকিছুই বৈধ। এমনকি সঙ্গমে লিপ্ত হওয়ার আশংকা না থাকলে একই বিছানায় সহ-অবস্থান এবং চুম্বন করাও বৈধ, একমাত্র সহবাস করা হারাম। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ .
অর্থাৎ, তারা আপনাকে হায়েয সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, তা অশুচি। তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে সঙ্গম করা থেকে দূরে থাকবে যে পর্যন্ত না তারা পবিত্র হয়, তাদের না। আলোচ্য অধ্যায়ে এ সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ বিস্তারিত আলোচিত হবে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٠٠ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) قَالَ اِنَّ الْيَهُوْدَ كَانُوْا اِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيْهِمْ لَمْ يُوَاكِلُوْهَا وَلَمْ يُجَامِعُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ فَسَاَلَ اَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ (اَلْاٰيَةَ) فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِصْنَعُوْا كُلَّ شَيْءٍ اِلَّا النِّكَاحَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ الْيَهُوْدَ فَقَالُوْا مَا يُرِيْدُ هٰذَا الرَّجُلُ اَنْ يَّدَعَ مِنْ اَمْرِنَا شَيْئًا اِلَّا خَالَفَنَا فِيْهِ فَجَاءَ اُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ فَقَالَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الْيَهُوْدَ

৫০০. অনুবাদ : হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন কোনো স্ত্রীলোক ঋতুবতী হতো তখন তারা তাদের সাথে একত্রে খেত না এবং তাদেরকে এক সাথে ঘরে রাখত না। একবার হযরত নবী করীম ﷺ-এর সাহাবীগণ তাঁকে [এ ব্যাপারে] জিজ্ঞেস করলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন, يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ .... "আর তারা আপনার নিকট হায়েয সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে ....।" তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাদের সাথে সঙ্গম ছাড়া সবকিছু করতে পার। এ কথা ইহুদিদের নিকট পৌঁছলে তারা বলল, এ ব্যক্তি কোনো বিষয়ে আমাদের বিরুদ্ধাচরণ না করে ছাড়তে চায় না। অতঃপর হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর এবং হযরত আব্বা ইবনে বিশর আসলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! ইহুদিরা এরূপ বলে, তবে কি আমরা স্ত্রীলোকদের সাথে সহবাস করার অনুমতি পেতে পারি না?

يَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَلَا نُجَامِعُهُنَّ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاَرْسَلَ فِىْ اٰثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا فَعَرَفَا اَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

[পেলে ইহুদিদের পুরোপুরি বিরুদ্ধাচরণ হবে।] এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তাতে আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি তাদের উপর রাগ করেছেন। অতঃপর তারা বের হয়ে গেল। তারপরই তাদের সম্মুখ দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কিছু দুধের হাদিয়া আসল। তারপর তিনি তাদের পিছনে লোক পাঠিয়ে তাদের ডেকে আনলেন এবং তাদেরকে তা পান করালেন। এতে তারা বুঝতে পারলেন যে, তিনি তাদের উপর রাগ করেননি। −[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَعْنَى الْحَيْضِ : হায়েযের অর্থ :

مَعْنَى الْحَيْضِ لُغَةً : حَيْض শব্দটি বাবে ضَرَبَ-এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ হলো— ১. اَلسَّيْلَانُ বা প্রবাহিত হওয়া। ২. اَلدَّمُ الْخَارِجُ বা নির্গত রক্ত। ৩. خُرُوْجُ الدَّمِ مِنَ الرَّحْمِ বা যৌনাঙ্গ থেকে রক্ত প্রবাহিত হওয়া।

مَعْنَى الْحَيْضِ اِصْطِلَاحًا :

১. ইমাম আযহারী (র.) বলেন− هُوَ دَمٌ يُرْخِيْهِ رِحْمُ الْمَرْأَةِ بَعْدَ بُلُوْغِهَا فِىْ اَوْقَاتٍ مُعْتَادَةٍ مِنْ قَعْرِ الرَّحْمِ لَا بِوِلَادَةٍ অর্থাৎ, হায়েয হচ্ছে এমন রক্ত যা নির্দিষ্ট কয়েকদিন যাবৎ নারীর জরায়ু থেকে সাবালিকা হওয়ার পর নির্গত হয়, তবে সেটা সন্তান প্রসব করার কারণে নয়।

২. اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْطُ গ্রন্থকারের মতে— هُوَ الدَّمُ الَّذِىْ يَسِيْلُ مِنْ رِحْمِ الْمَرْأَةِ فِىْ اَيَّامٍ مَعْلُوْمَةٍ كُلَّ شَهْرٍ

৩. কুদূরীর টীকাকার বলেন— هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ دَمٍ مَخْصُوْصٍ مِنْ مَخْرَجٍ مَخْصُوْصٍ مِنْ شَخْصٍ مَخْصُوْصٍ

৪. কারো মতে— هُوَ دَمٌ يَنْفُضُهُ رِحْمُ اِمْرَأَةٍ سَلِيْمَةٍ مِنَ الدَّاءِ وَالصِّغَرِ

৫. কেউ কেউ বলেন— هُوَ مَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحُمْرَةِ وَالصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ فِىْ اَيَّامِ الْحَيْضِ

اِخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِىْ اَقَلِّ مُدَّةِ الْحَيْضِ وَ اَكْثَرِهَا হায়েযের সর্বনিম্ন ও ঊর্ধ্বতম সীমা নির্ধারণের ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ :

مَذْهَبُ الْاِمَامِ مَالِكٍ (رحـ) : ইমাম মালিক (র.)-এর মতে, হায়েযের নিম্নতম কোনো সীমা নেই, এক ঘণ্টাও হতে পারে। আর উর্ধ্বতম সীমা হচ্ছে ১৭ দিন।

مَذْهَبُ الْاِمَامِ الشَّافِعِىِّ وَ اَحْمَدَ فِىْ رِوَايَةٍ (رحـ) : ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.)-এর এক বর্ণনা মতে, হায়েযের নিম্নসীমা এক দিন এক রাত, আর উর্ধ্বতম সীমা ১৫ দিন। তাঁদের দলিল—

قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِىْ نُقْصَانِ دِيْنِ الْمَرْأَةِ تَقْعُدُ اِحْدَاهُنَّ شَطْرَ عُمْرِهَا لَا تَصُوْمُ وَلَا تُصَلِّىْ .

مَذْهَبُ الْاِمَامِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَ مُحَمَّدٍ (رحـ) : হযরত ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, হায়েযের নিম্নতম সীমা তিন দিন তিন রাত, আর উর্ধ্বতম সীমা ১০ দিন ১০ রাত। তাঁদের দলিল হচ্ছে—

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَقَلُّ الْحَيْضِ لِلْجَارِيَةِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ الثَّلَاثُ وَاَكْثَرُ مَا يَكُوْنُ عَشَرَةَ اَيَّامٍ فَاِذَا زَادَ فَهِىَ مُسْتَحَاضَةٌ . رَوَاهُ الدَّارُ قُطْنِىْ

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ তাঁদের দলিলের জবাব :

১. ইমাম মালিক (র.)-এর কথার কোনো দলিল নেই, তাই তা গ্রহণীয় নয়।

২. ইবনে হুমাম (র.) বলেন, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.)-এর দাবির অনুকূলে কোনো বিশুদ্ধ হাদীস নেই।

৩. আল্লামা ইবনুল জাওযী (র.) বলেন, তাঁদের হাদীসটি বিশুদ্ধ বলে ধরে নিলেও নারীদের نِصْفُ عُمْرِ বা অর্ধ জীবন বসে থাকা সাব্যস্ত হয় না। কেননা, বাল্যকাল, গর্ভাবস্থায় ও বৃদ্ধ বয়সে তো হায়েয আসে না, তাই شَطْرُ عُمْرِهَا দ্বারা عَيْنِ شَطْرِ উদ্দেশ্য নয়; বরং مُقَارِبٌ لِلشَّطْرِ উদ্দেশ্য, আর তা হচ্ছে ১০ দিন।

حُكْمُ الْحَيْضِ হায়েযের বিধান : হায়েযের বিধান এই যে, হায়েজ চলাকালে রোজা, নামাজ সবকিছুই হারাম। তবে পরে রোজার কাযা আদায় করতে হয় ; কিন্তু নামাজের কাযা আদায় করতে হয় না। ঋতুস্রাব অবস্থায় সঙ্গম ও পরিধেয় বস্ত্রের নিচ দিয়ে কোনো প্রকার সম্ভোগের কার্য করা জায়েজ নেই; বরং হারাম। ঋতুবতী অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত করা, কুরআন পাক স্পর্শ করা এবং মসজিদে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ। ঠিক এরূপ বিধান নিফাসের সময়েও।

اَلْاِخْتِلَافُ فِىْ جَوَازِ الْاِنْتِفَاعِ بِالْحَائِضِ ঋতুবতীর সাথে দৈহিক উপভোগ করার ব্যাপারে মতভেদ : ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সম্ভোগ-এর ব্যাপারে শরিয়ত বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন– ঋতু চলাকালে ঋতুবতীর সাথে স্বাভাবিকভাবে যৌন সঙ্গম করা হারাম। অবশ্য পরিধেয় বস্ত্রের উপর দিয়ে জড়াজড়ি করা জায়েজ আছে। আর এরূপ অবস্থায় হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে তবে তাও করা উচিত নয়। অর্থাৎ মাকরূহ; নতুবা কোনো ক্ষতি নেই। সঙ্গম ব্যতীত নাভির নিচ থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত দেহের অংশ দ্বারা আনাবৃত অবস্থায় উপভোগ করার ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যেমন–

১. ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-এর এক বর্ণানায়, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর প্রথম মতে এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.), ইমাম আহমদ (র.) এবং কতিপয় মালিকী মতাবলম্বীদের মতে, পরিধেয় বস্ত্রের নিচে নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত স্থানে সঙ্গম ছাড়া যে কোনো যৌনকেলী করা জায়েজ আছে। তাঁদের দলিল হাদীসের অংশ– اِصْنَعُوْا كُلَّ شَيْءٍ اِلَّا النِّكَاحَ

২. ইমাম আবূ হানীফা (র.), ইমাম মালিক (র.) এবং ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-এর দ্বিতীয় বর্ণনা মতে এবং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পরবর্তী নতুন বর্ণনা মতে, উল্লিখিত দেহাংশের দ্বারা অনাবৃত অবস্থায় কোনো ধরনের সম্ভোগ করা জায়েজ নেই। তাঁদের দলিল–

১. হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস– كَانَ يَأْمُرُنِىْ فَاَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِىْ وَاَنَا حَائِضٌ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২. হযরত মু'আয (রা.)-এর হাদীস–

قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا يَحِلُّ لِىْ مِنْ اِمْرَأَتِىْ وَهِىَ حَائِضٌ مَا فَوْقَ الْاِزَارِ وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذٰلِكَ اَفْضَلُ . رَوَاهُ رَزِيْنٌ

৩. হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রা.)-এর হাদীস–

قَالَ اِنَّ رَجُلًا سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا يَحِلُّ لِىْ مِنْ اِمْرَأَتِىْ وَهِىَ حَائِضٌ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشُدُّ عَلَيْهَا اِزَارَهَا ثُمَّ شَأْنَكَ بِاَعْلَاهَا . رَوَاهُ مَالِكٌ وَالدَّارِمِىُّ

এ সব হাদীসই প্রমাণ করে পরিধেয় বস্ত্রের উপর ছাড়া নিচ দিয়ে সম্ভোগ করা জায়েজ নেই।

---

٥٠١ - وَعَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَالنَّبِىُّ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ وَكِلَانَا جُنُبٌ وَكَانَ يَاْمُرُنِىْ فَاَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِىْ وَاَنَا حَائِضٌ وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهٗ اِلَىَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَاَغْسِلُهٗ وَاَنَا حَائِضٌ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫০১. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং নবী করীম ﷺ একই পাত্র হতে পানি নিয়ে গোসল করতাম, অথচ আমরা উভয়ই তখন নাপাক অবস্থায় হতাম। তিনি আমাকে হুকুম করতেন আর আমি শক্ত করে আমার পরিধানের কাপড় পরে নিতাম অতঃপর তিনি তাঁর শরীর আমার শরীরের সাথে লাগাতেন, অথচ তখন আমি ঋতুবতী। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ ই'তিকাফে থাকা অবস্থায় তাঁর মাথা বের করে দিতেন, আমি তাঁর মাথা ধৌত করে দিতাম, অথচ তখন আমি ঋতুবতী। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসের মধ্যে তিনটি মাসআলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে–

প্রথমতঃ নারী-পুরুষ একত্রে গোসল করা এবং স্ত্রীর ব্যবহার করার পর অবশিষ্ট পানি পুরুষের জন্য ব্যবহার করা জায়েজ আছে।

দ্বিতীয়তঃ ঋতুবতী স্ত্রীলোককে স্পর্শ করা, তার সাথে শয়ন করা, তার শরীরের নাভি থেকে হাটু পর্যন্ত অংশ আবৃত অবস্থায় তার শরীরের সাথে শরীর লাগা নিষিদ্ধ নয়।

তৃতীয়তঃ ই'তিকাফকারী মসজিদে থেকে শরীরের কোনো অংশকে বের করলে অথবা ঋতুবতী নারী তাকে স্পর্শ করলে তাতে তার ই'তিকাফ নষ্ট হয় না।

---

৫০২ وَعَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ اَشْرَبُ وَاَنَا حَائِضٌ ثُمَّ اُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلٰى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ وَاَتَعَرَّقُ الْعَرَقَ وَاَنَا حَائِضٌ ثُمَّ اُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلٰى مَوْضِعِ فِيَّ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫০২. অনুবাদ : উক্ত হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ঋতুস্রাব অবস্থায় পানি পান করতাম, অতঃপর তা নবী করীম ﷺ -কে প্রদান করতাম। তিনি আমার মুখ রাখার জায়গায়ই মুখ রাখতেন এবং পানি পান করতেন। আর কখনো আমি ঋতুবতী অবস্থায় হাড্ডির গোশত খেতাম। অতঃপর ঐ হাড্ডি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দিতাম। তিনি আমার মুখ রাখার স্থানেই মুখ রাখতেন [এবং তা থেকে গোশত খেতেন।] –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে পানাহার করা তো নিষেধ নয়; বরং স্বামী স্ত্রীর একে অন্যের মুখের গ্রাস গ্রহণেও কোনো দোষ নেই।

---

৫০৩ وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَّكِئُ فِيْ حِجْرِيْ وَاَنَا حَائِضٌ ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫০৩. অনুবাদ : উক্ত হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আমার কোলে হেলান দিতেন। অতঃপর কুরআন তেলাওয়াত করতেন। অথচ তখন আমি ঋতুবতী। –[বুখারী ও মুসলিম]

---

৫০৪ وَعَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ نَاوِلِيْنِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ اِنِّيْ حَائِضٌ فَقَالَ اِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِيْ يَدِكِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫০৪. অনুবাদ : উক্ত হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী করীম ﷺ আমাকে বললেন, মসজিদ হতে আমাকে ছোট মাদুরটা এনে দাও। আমি বললাম, আমি তো ঋতুবতী। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার ঋতুস্রাব তো তোমার হাতে নয়। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসের ভাষ্যে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বাহির থেকে মাদুরটি নিতে বলেছেন। আর এটাও স্পষ্ট বুঝা যায় যে, অপবিত্র ব্যক্তির জন্য বাহির থেকে মসজিদে হতে হাত দিয়ে কিছু নেওয়া অথবা কোনো কিছু দেওয়া নিষেধ নয়।

وَعَنْ ٥٠٥ مَيْمُوْنَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ فِىْ مِرْطٍ بَعْضُهُ عَلَىَّ وَبَعْضُهُ عَلَيْهِ وَاَنَا حَائِضٌ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫০৫. অনুবাদ : হযরত মাইমূনা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি চাঁদরে নামাজ পড়তেন, তার কিছু অংশ আমার গায়ের উপর থাকত, আর অপর অংশ তাঁর গায়ের উপর থাকত, অথচ তখন আমি ঋতুবতী। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** কোনো নামাজী ব্যক্তির নামাজ পড়াকালীন সময়ে তার পরিধেয় বস্ত্রের কোনো অংশ নাপাকীর উপর থাকলে তার নামাজ শুদ্ধ হয় না, অথচ ঋতুস্রাবগ্রস্তা মহিলার উপর থাকলে নামাজ শুদ্ধ হয়। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, ঋতুবতী মহিলার শরীর حقيقى অপবিত্র নয়; বরং حكمى তথা বিধানগত নাপাক।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٠٦ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَتٰى حَائِضًا اَوْ اِمْرَأَةً فِىْ دُبُرِهَا اَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا اُنْزِلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ . رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِىُّ

وَفِىْ رِوَايَتِهِمَا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ لَا نَعْرِفُ هٰذَا الْحَدِيْثَ اِلَّا مِنْ حَكِيْمِ الْاَثْرَمِ عَنْ اَبِىْ تَمِيْمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ .

৫০৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন — যে ব্যক্তি ঋতুস্রাবগ্রস্তা স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে অথবা স্ত্রীলোকের পিছনের রাস্তায় সঙ্গম করেছে অথবা কোনো গণকের কাছে গেছে, সে ব্যক্তি মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে [তথা কুরআন] তাকে অস্বীকার করেছে। -[তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্ ও দারিমী]

আর তিরমিযী ও দারিমী (র.)-এর বর্ণনায় আরো আছে যে, গণক যা বলে তাকে যে সত্য বলে বিশ্বাস করেছে ; সে কুফরি করেছে। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে আবূ তামীমা, আর আবূ তামীমা হতে হাকীম আছরাম বর্ণনা করেছেন। এটা ছাড়া অন্য কোনো সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। [অথচ আবূ তামীমার বিশ্বস্ততা সম্পর্কে কোনো কোনো মুহাদ্দিস সন্দেহ পোষণ করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** জেনে-শুনে ঋতুবতীর সাথে সঙ্গম করা কিংবা স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে সহবাস করা এবং গণকের কথায় আস্থা স্থাপন করা কুফরি। যে ব্যক্তি এ সব কাজকে বৈধ মনে করবে সে কাফির হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি হারাম রূপে বিশ্বাস স্থাপন করার পরও এ সব কাজে লিপ্ত হয়, সে ফাসিক বা পাপাচারীরূপে গণ্য হবে।

وَعَنْ ٥٠٧ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رض) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا يَحِلُّ لِيْ مِنْ اِمْرَأَتِيْ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ مَا فَوْقَ الْاِزَارِ وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذٰلِكَ اَفْضَلُ - رَوَاهُ رَزِيْنٌ وَقَالَ مُحِيُ السُّنَّةِ اِسْنَادُهُ لَيْسَ بِقَوِيٍّ -

৫০৭. অনুবাদ : হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– আমি একদা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমার স্ত্রীর সাথে আমার কি কি কর্ম করা হালাল, যখন সে ঋতুগ্রস্তা হয়? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তহবন্দের [কাপড়ের] উপর দিয়ে যা কিছু কর তাই হালাল। তবে তা হতে বিরত থাকাই ভালো। –[রযীন; ইমাম মহীউস সুন্নাহ আল-বাগাবী (র.) বলেন, এ হাদীসের সনদ সবল নয়।]

وَعَنْ ٥٠٨ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِاَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِيْنَارٍ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

৫০৮. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ﷺ ইরশাদ করেন— যখন কোনো ব্যক্তি তার ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাসে লিপ্ত হয়ে যায় সে যেন [এর কাফ্ফারা হিসেবে] আধা দিনার সদকা করে দেয়। [তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ্]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَعْرِيْفُ الدِّيْنَارِ : স্বর্ণ মুদ্রাকে বলা হয় দিনার, আর রৌপ্য মুদ্রাকে বলা হয় দিরহাম। এক দিনারের পরিমাণ হলো সাড়ে চার মাশা। ১২ মাশায় এক তোলা বা এক ভরি। কাজেই এক দিনার হলো এক তোলার চব্বিশ ভাগের নয় ভাগ।

اِخْتِلَافُ الْاَئِمَّةِ فِي التَّصَدُّقِ عَلٰى مَنْ اَتٰى حَائِضًا ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে কাফ্ফারা দেওয়ার ব্যাপারে মতভেদ :

مَذْهَبُ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالْاَوْزَعِيْ وَاِسْحَاقَ وَقَوْلٌ لِاَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ (رحـ) : সাঈদ ইবনে জুবায়ের, হাসান বসরী, আওযা'ঈ ও ইসহাক (র.)-এর মাযহাব এবং ইমাম আহমদ (র.)-এর অভিমত ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পুরাতন অভিমত অনুযায়ী হায়েয অবস্থায় স্ত্রী সংবাস করলে সদকা দেওয়া ওয়াজিব তাঁদের দলিল হলো হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণিত উক্ত হাদীস।

مَذْهَبُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِمْ : ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী (র.)-সহ সলফে সালেহীনের সকল ইমামের মতে সদকা দেওয়া ওয়াজিব নয়; বরং তার জন্য তওবা করাই যথেষ্ট। তবে সদকা করা উত্তম ও মোস্তাহাবা। কেননা, হাদীসে এসেছে–. اَلصَّدَقَةُ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ তাঁদের হাদীসের জবাব :

ইমাম বাইহাকী উক্ত হাদীসকে معلول বলেছেন ; যেহেতু একদল লোক এটি شُعْبَه হতে مَوْقُوْفًا বর্ণনা করেছেন। আবার এটি مُرْسَلٌ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসের মতনে اِضْطِرَابٌ রয়েছে। সুতরাং হাদীসবিশারদদের নিকট এটি ضَعِيْف হাদীস। কাজেই এর দ্বারা وُجُوْب প্রমাণিত হবে না।

وَعَنْهُ ٥٠٩ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَدِينَارٌ وَإِذَا كَانَ دَمًا أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِيْنَارٍ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫০৯. **অনুবাদ :** উক্ত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি হযরত নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— [ঋতুস্রাব অবস্থায় সহবাস করলে যে সদকা দেওয়া হবে তার পদ্ধতি হলো] যদি রক্ত লাল থাকে তবে এক দিনার এবং যদি রক্ত পীত বর্ণের হয় তবে অর্ধ দিনার [সদকা দিতে হবে]। –[তিরমিযী]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥١٠ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ (رضـ) قَالَ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَا يَحِلُّ لِيْ مِنْ اِمْرَأَتِيْ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَشُدُّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ثُمَّ شَأْنُكَ بِأَعْلَاهَا - رَوَاهُ مَالِكٌ وَالدَّارِمِيُّ مُرْسَلًا

৫১০. **অনুবাদ :** হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করল, আমার স্ত্রী ঋতুবতী অবস্থায় আমার জন্য কি কি কাজ করা হালাল হবে? জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তার পায়জামা বা তহবন্দ শক্ত করে বেঁধে নেবে, তারপর তার উপর দিয়ে যা খুশি তুমি করতে পারবে। –[ইমাম মালিক ও দারেমী হাদীসটি মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** রাসূলুল্লাহ ﷺ এ অনুমতি ঐ সমস্ত লোকদেরকে দিয়েছেন যারা যথেষ্ট ধৈর্যশীল, যৌন উত্তেজনা থাকা সত্ত্বেও যারা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে সঙ্গম হতে বেঁচে থাকতে সক্ষম। আর যাদের ধৈর্য শক্তি নেই ; তাদের এরূপ অবস্থায় মেলামেশাও বৈধ নয়।

وَعَنْ ٥١١ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كُنْتُ إِذَا حِضْتُ نَزَلْتُ عَنِ الْمِثَالِ عَلَى الْحَصِيْرِ فَلَمْ يَقْرُبْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ نَدْنُ مِنْهُ حَتّٰى نَطْهُرَ - رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ

৫১১. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমি ঋতুবতী হতাম তখন শয্যা হতে নিচে মাদুরে নেমে আসতাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে ঘেষতেন না, আর আমরাও তাঁর কাছে যেতাম না, যতক্ষণ না আমরা পবিত্র হতাম। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীসের হুকুমটি ইসলামের প্রথম যুগে ছিল। পরবর্তীতে এ হুকুম রহিত হয়ে যায়। কেননা, যাতে এর দ্বারা মুসলমান মহিলারাও এরূপ কার্যে ইহুদি মহিলাদের মতো 'অচ্ছুৎ' হয়ে না যায়।

بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ

পরিচ্ছেদ : ইস্তেহাযা-গ্রস্ত নারী

اَلْمُسْتَحَاضَةُ শব্দটি إِسْتِحَاضَةٌ মাসদার হতে নির্গত হয়েছে, যার মূল অক্ষর حَيْضٌ শাব্দিক অর্থ— اَلسَّيْلَانُ তথা প্রবাহিত হওয়া এবং خُرُوْجُ الدَّمِ مِنَ الْفَرْجِ مُسَلْسَلًا তথা যৌনাঙ্গ হতে অনবরত রক্ত বের হওয়া।

পরিভাষায় এর পরিচয় দিতে গিয়ে কুদূরী গ্রন্থকার বলেন— هُوَ مَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ اَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ اَوْ اَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ اَيَّامٍ

অর্থাৎ, মেয়েলোক তিন দিনের চেয়ে কম এবং দশ দিনের চেয়ে বেশি সময় যে রক্তস্রাব লক্ষ্য করে তাকে ইস্তেহাযা বলে।

কারো মতে هُوَ دَمٌ يَخْرُجُ مِنْ عِرْقٍ اَوْ مِنْ رَحِمٍ لِدَاءٍ بِهٖ সাধারণত যে রক্তস্রাব حَيْض বা نِفَاس রূপে গণ্য নয় তাকে إِسْتِحَاضَة বলা হয়। এ হিসেবে ৬ ধরনের রক্তকে إِسْتِحَاضَة বলা হয়। যথা—

১. তিন দিনের কম যে রক্ত আসে। ২. দশ দিনের অধিক যে রক্ত বের হয়। ৩. বালেগা হওয়ার পূর্বে যে রক্তক্ষরণ হয়। ৪. গর্ভবতীর রক্তপাত। ৫. অতি বয়স্কার ঋতুস্রাব এবং ৬. প্রসূতি নারীর ৪০ দিনের উপরে যে রক্তস্রাব হয়।

ইস্তেহাযা রোগিণীর নামাজ, রোজা ও যৌনসঙ্গম নিষিদ্ধ নয়। তবে তাদেরকে প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য নতুন করে অজু করতে হবে। আগত হাদীসগুলোতে এ সম্পর্কে বিধান দেওয়া হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٥١٢. عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِىْ حُبَيْشٍ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اِمْرَأَةٌ اُسْتَحَاضُ فَلَا اَطْهُرُ اَفَاَدَعُ الصَّلٰوةَ فَقَالَ لَا اِنَّمَا ذٰلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ فَاِذَا اَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِى الصَّلٰوةَ وَاِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْسِلِىْ عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّىْ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৫১২. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত ফাতেমা বিনতে আবূ হুবাইশ (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আগমন করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একজন রক্তস্রাবের রোগিণী মহিলা। আমি তা হতে পবিত্র হই না, আমি কি নামাজ ছেড়ে দেব? জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, না। এটা একটি রোগ যা শিরার রক্ত, হায়েজের নয়। আর যখন তোমার ঋতুস্রাব দেখা দেবে, তখন তুমি নামাজ পরিত্যাগ করবে। যখন ঋতুস্রাবের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে; তখন তুমি তোমার শরীর হতে রক্ত ধৌত করে ফেলবে, অতঃপর নামাজ আদায় করবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

إِخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِيْ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ মুস্তাহাযা নারীর গোসলের ব্যাপারে মতভেদ:

১. مَذْهَبُ ابْنِ عُمَرَ وَ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَ عَطَاءٍ (رضـ) : আত-তা'লীকুস সাবীহ গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, হযরত ইবনে যুবায়ের ও হযরত আতা ইবনে আবী রাবাহ (রা.)-এর মতে, মুস্তাহাযার জন্য প্রত্যেক নামাজের পূর্বে গোসল করা আবশ্যক। তাঁদের দলিল—

(الف) عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ اِنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ اسْتُحِيْضَتْ فِىْ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَاَمَرَهَا بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلٰوةٍ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

(ب) عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ اُسْتُحِيْضَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ (رضـ) فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ اِغْتَسِلِىْ لِكُلِّ صَلٰوةٍ . (اَخْرَجَهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

২. مَذْهَبُ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) : হযরত আলী ও ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে, মুস্তাহাযা রমণী দু' নামাজকে এক সাথে করে একবার করে মোট তিনবার গোসল করবে। তবে প্রত্যেক ওয়াক্ত স্ব-স্ব ওয়াক্তের ভিতর হতে হবে। যেমন- যোহরকে দেরি করে আসরকে প্রথম ওয়াক্তে পড়ার জন্য একবার গোসল করবে, এমনিভাবে মাগরিব ও ইশার জন্য এক গোসল, আর ফজরের জন্য এক গোসল করবে। তাঁদের যুক্তি হলো, পাঁচবার গোসল করার হুকুম মানসূখ হয়েছে। নিম্নের হাদীসটি এর প্রমাণ বহন করে—

عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ اِنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ اُسْتُحِيْضَتْ فَاَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَاَمَرَهَا اَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ فَلَمَّا جَهَدَتْ ذٰلِكَ اَمَرَهَا اَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِغُسْلٍ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِغُسْلٍ وَتَغْتَسِلُ لِلصُّبْحِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩. مَذْهَبُ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَحَسَنِ الْبَصْرِيِّ (رح) : হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব ও হযরত হাসান বসরী (র.) -এর মতে, মুস্তাহাযা রমণী সারা দিন রাতে যোহরের সময় একবার মাত্র গোসল করবে। ইমাম আবূ দাঊদ এর উপর একটি শিরোনাম উপস্থাপন করেছেন।

৪. مَذْهَبُ جُمْهُوْرِ الْاَئِمَّةِ : সকল سَلَفْ ও خَلَفْ -এর ইমামগণের মতে مُسْتَحَاضَة নারীর হায়েয যখন শেষ হয়ে যায় তখন শুধুমাত্র একবার গোসল করবে। এরপর প্রত্যেক নামাজ বা দুই নামাজকে একসঙ্গে করে গোসল করা আবশ্যক নয়। তবে প্রত্যেক নামাজের ওয়াক্তের জন্য নতুন নতুন অজু করতে হবে। এটা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.), হযরত আয়েশা (রা.) এবং অন্যান্যদেরও অভিমত। তাঁদের দলিল—

১ . اِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ اَبِىْ حُبَيْشٍ فَاِذَا اَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِى الصَّلٰوةَ وَ اِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِىْ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

এ হাদীস দ্বারা বারবার গোসল করা প্রমাণিত হয় না।

২ . عَنْ عَائِشَةَ (رض) اَنَّهَا قَالَتْ فِى الْمُسْتَحَاضَةِ تَدَعِى الصَّلٰوةَ اَيَّامَ حَيْضَتِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ غُسْلًا وَاحِدًا وَتَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ . (رَوَاهُ الطَّحَاوِىُّ)

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥١٣ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ (رح) عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ اَبِىْ حُبَيْشٍ (رض) اَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ ﷺ اِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَاِنَّهُ دَمٌ اَسْوَدُ يُعْرَفُ فَاِذَا كَانَ ذٰلِكَ فَاَمْسِكِىْ عَنِ الصَّلٰوةِ فَاِذَا كَانَ الْاٰخَرُ فَتَوَضَّاِىْ وَصَلِّىْ فَاِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ . رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ

৫১৩. **অনুবাদ** : [তাবেয়ী] হযরত ওরওয়া ইবনে যুবায়ের (র.) হযরত ফাতেমা বিনতে আবী হুবাইশ (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি সর্বদা ইস্তেহাযা অবস্থায় থাকতেন। অতঃপর নবী করীম ﷺ তাঁকে বললেন, যখন হায়েযের রক্ত হয় তখন তা কালো রঙের রক্ত, [সহজে] চেনা যায়। অতএব যখন এরূপ রক্ত হবে তখন তুমি নামাজ হতে বিরত থাকবে। আর এটা ব্যতীত যখন অন্যরূপ রক্ত হবে তখন [প্রত্যেক ওয়াক্তে] ওজু করে নামাজ পড়তে থাকবে। কেননা, এটা শিরা বিশেষের রক্ত। –[আবু দাউদ ও নাসাঈ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِخْتِلَافُ الْاَئِمَّةِ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَالْاِسْتِحَاضَةِ **হায়েয ও ইস্তেহাযার রক্তের ব্যাপারে মতান্তর** : হায়েয এবং ইস্তেহাযার রক্তের মধ্যে পার্থক্যের ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন—

- مَذْهَبُ الشَّافِعِىِّ (رح) : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, হায়েয বা ঋতুস্রাবের রক্ত কালো এবং লাল বর্ণের হয়। সুতরাং অন্য কোনো বর্ণের হলেই তা ইস্তেহাযার রক্ত বলে সাব্যস্ত হবে। তাঁর দলিল ওরওয়ার হাদীস—
  قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِذَا كَانَ الْحَيْضُ فَاِنَّهُ دَمٌ اَسْوَدُ يُعْرَفُ الخ .
- مَذْهَبُ الْاِمَامِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) : ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও তাঁর অনুসারীদের মতে, রক্তের রঙের কোনো গুরুত্ব নেই। রক্তের রং বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। বরং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো মুদ্দত হিসেবে। কাজেই ঋতুস্রাবের সুনির্দিষ্ট মেয়াদের পরে যে রক্ত বের হবে তাই ইস্তেহাযার রক্ত। ঋতুস্রাবের মেয়াদ নির্ধারিত হলেও দশদিন অপেক্ষা করে দশ দিনের পরে যে রক্ত বের হবে তাই ইস্তেহাযার রক্ত, রক্তের বর্ণ যাই হোক না কেন। যেমন হযরত উম্মে সালামা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস— لِتَنْتَظِرْ عَدَدَ اللَّيَالِىْ وَالْاَيَّامِ অথচ এ হাদীসে রক্তের বর্ণের কথা উল্লেখ নেই।

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الشَّافِعِىِّ (رح) : হযরত ওরওয়া (রা.)-এর হাদীসের জবাবে হানাফী ফিকহবিদগণ বলেন, রক্তের বর্ণ কালো হওয়া অধিকাংশ নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে, তাই বলে সব নারীদের ব্যাপারে এ হুকুম নির্বিচারে দেওয়া যাবে না। এতদ্ভিন্ন হযরত ওরওয়া (র.)-এর হাদীস মুরসাল এবং তাঁর বর্ণনায়ও বিভ্রান্তি (اِضْطِرَابٌ) রয়েছে। অতএব এটা সহীহ এবং বিশুদ্ধ হাদীস নয়।

◗ ইমাম তাহাবী (র.) বলেন, রক্তের বর্ণ দ্বারা হায়েয এবং ইস্তেহাযার পার্থক্য করার ব্যাপারে যা বলা হয়েছে, তা হযরত ওরওয়া (র.)-এর নিজস্ব অভিমত। সুতরাং তা তাঁর পক্ষ হতে মুদরাজ বা সংযোজনকৃত বাক্য, নবী করীম ﷺ -এর বাণী নয়। কাজেই হানাফীদের কথাই যুক্তিযুক্ত।

وَعَنْ ٥١٤ أُمِّ سَلَمَةَ (رض) قَالَتْ إِنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدَّمُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لِتَنْظُرْ عَدَدَ اللَّيَالِيْ وَالْاَيَّامِ الَّتِيْ كَانَتْ تَحِيْضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ اَنْ يُّصِيْبَهَا الَّذِيْ اَصَابَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلٰوةَ قَدْرَ ذٰلِكَ مِنَ الشَّهْرِ فَاِذَا خَلَّفَتْ ذٰلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ لِتُصَلِّ . رَوَاهُ مَالِكٌ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ وَ رَوَى النَّسَائِيُّ مَعْنَاهُ

৫১৪. অনুবাদ : হযরত উম্মে সালমা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জমানায় এক মহিলার জন্য হযরত উম্মে সালমা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ফতোয়া চাইলেন। উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তার এ ব্যাধি হওয়ার পূর্বে প্রত্যেক মাসে তার যে ক'দিন ঋতুস্রাব হতো সে দিন ও রাতগুলোর সংখ্যা সে হিসাব করে রাখবে এবং প্রত্যেক মাসেই ততোদিন পরিমাণ সময় নামাজ ত্যাগ করবে, আর যখন সে পরিমাণ দিন অতিবাহিত হয়ে যাবে তখন সে যেন গোসল করে এবং কাপড় খণ্ড দ্বারা লেংটি বাঁধে তারপর নামাজ আদায় করে। −[মালেক, আবূ দাঊদ, দারিমী, আর নাসায়ীও এরূপ অর্থে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَقْسَامُ الْمُسْتَحَاضَةِ **ইস্তেহাযাগ্রস্ত নারীর প্রকারভেদ :** ইস্তেহাযারোগিণী সর্বমোট পাঁচ প্রকার—

১. مُبْتَدِئَة [মুবতাদিআ] : যার এই মাত্র ঋতুর সূচনা হলো, ইতঃপূর্বে সে অপ্রাপ্তবয়স্কা ছিল।
২. مُعْتَادَة [মু'তাদা] : যার প্রত্যেক মাসে কতদিন রক্ত-স্রাব হয় তার একটি নিয়ম চলে আসছে।
৩. مُتَحَيِّرَة [মুতাহাইয়িরাহ্] : যার রক্ত-স্রাব হওয়ার কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। যেমন− দু'দিন রক্ত আসল, মাঝে একদিন বন্ধ থাকল, আবার চারদিন আসল মাঝে একদিন আসল না। মোটকথা, সে অস্থির হয়ে আছে, কোনো কিছু স্থির করতে সক্ষম নয়।
৪. مُتَمَيِّزَة [মুতামাইয়িযাহ্] : যে রক্তের বর্ণ দেখে ঋতু ও রক্ত পার্থক্য করতে পারে।
৫. مُسْتَمِرَّة [মুসতামিররাহ্] : যার অনবরত বিরামহীনভাবে রক্ত-স্রাব চলতে থাকে। আলোচ্য হাদীসে ২য় নারীর হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে।

وَعَنْ ٥١٥ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ (رح) عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ جَدُّ عَدِيٍّ اِسْمُهٗ دِيْنَارٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهٗ قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَدَعُ الصَّلٰوةَ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا الَّتِيْ كَانَتْ تَحِيْضُ فِيْهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ وَتَصُوْمُ وَتُصَلِّيْ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ اَبُوْدَاوُدَ

৫১৫. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত আদী ইবনে ছাবেত (র.) তাঁর পিতার সূত্রে তাঁর দাদা [দীনার] হতে বর্ণনা করেন, [প্রখ্যাত মুহাদ্দিস] ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (র.) বলেন, আদীর দাদার নাম ছিল দীনার, নবী করীম ﷺ হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইস্তেহাযার রোগিণী সম্পর্কে বলেছেন, সে মহিলা ঐ দিনগুলোর নামাজ পরিত্যাগ করবে যে দিনগুলোতে তার হায়েয হওয়ার নিয়ম চলে আসছে। অতঃপর গোসল করবে এবং প্রত্যেক নামাজের সময় [নতুন] অজু করবে। আর রোজাও রাখবে এবং নামাজও আদায় করবে। −[তিরমিযী ও আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, ইস্তেহাযাগ্রস্ত নারীকে হায়েযের নির্দিষ্ট দিনগুলো ব্যতীত অন্য সময়ে নামাজ রোজা সবই করতে হবে। হায়েয শেষে গোসল করে নেবে। আর প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য নতুন করে অজু করবে।

وَعَنْ ٥١٦ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ (رضـ) قَالَتْ كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيْرَةً شَدِيْدَةً فَاَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ اَسْتَفْتِيْهِ وَ اُخْبِرُهُ فَوَجَدْتُهُ فِيْ بَيْتِ اُخْتِيْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيْرَةً شَدِيْدَةً فَمَا تَأْمُرُنِيْ فِيْهَا قَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلٰوةَ وَالصِّيَامَ قَالَ اَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فَاِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ قَالَتْ هُوَ اَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَتَلَجَّمِيْ قَالَتْ هُوَ اَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَاتَّخِذِيْ ثَوْبًا قَالَتْ هُوَ اَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ اِنَّمَا اَثُجُّ ثَجًّا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ سَاٰمُرُكِ بِاَمْرَيْنِ اَيَّهُمَا صَنَعْتِ اَجْزَأَ عَنْكِ مِنَ الْاٰخَرِ وَاِنْ قَوِيْتِ عَلَيْهِمَا فَاَنْتِ اَعْلَمُ قَالَ لَهَا اِنَّمَا هٰذِهٖ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ فَتَحَيَّضِيْ سِتَّةَ اَيَّامٍ اَوْ سَبْعَةَ اَيَّامٍ فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ ثُمَّ اغْتَسِلِيْ حَتّٰى اِذَا رَأَيْتِ اَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَاْتِ فَصَلِّيْ ثَلٰثًا وَّعِشْرِيْنَ لَيْلَةً اَوْ اَرْبَعًا وَّ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَاَيَّامَهَا وَ صُوْمِيْ فَاِنَّ ذٰلِكِ يَجْزِئُكِ وَكَذٰلِكِ فَافْعَلِيْ كُلَّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيْضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ مِيْقَاتَ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ وَاِنْ قَوِيْتِ عَلٰى اَنْ تُؤَخِّرِيْنَ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِيْنَ الْعَصْرَ فَتَغْتَسِلِيْنَ وَتَجْمَعِيْنَ بَيْنَ

৫১৬. অনুবাদ : হযরত হামনা বিনতে জাহ্‌শ (রা.) বলেন, আমি বেশি গুরুতর রকম ইস্তেহাযাগ্রস্ত হয়ে পড়লাম এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট এ অবস্থা বলতে ও এর মাসআলা জিজ্ঞেস করতে আসলাম। এসে আমি তাঁকে আমার বোন [উম্মুল মুমিনীন] জয়নব বিনতে জাহশের গৃহে গেলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বেশি গুরুতর রকম ইস্তেহাযাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। এ বিষয়ে আপনি আমাকে কি নির্দেশ দেন? এ রক্তস্রাব আমাকে নামাজ-রোজায় বাধা দিচ্ছে। উত্তরে তিনি বললেন, আমি তোমাকে সেখানে তুলা দেওয়ার উপদেশ দিচ্ছি। তা রক্ত বন্ধ করে দিবে। তিনি বললেন, আমার অবস্থা তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব। হুজুর বলেন, তবে তুমি তার উপর কাপড় দিয়ে লাগাম বেঁধে নিবে। তিনি বললেন, তা এর চেয়ে বেশি। হুজুর ﷺ বললেন, তাহলে তুমি কাপড়ের পুলটি বেঁধে দিবে। তিনি বললেন, হুজুর! তা এর চেয়ে বেশি। আমার জলধারার ন্যায় রক্ত ক্ষরণ হয়ে থাকে। তখন নবী ﷺ বললেন, তবে তোমাকে আমি দুটি নির্দেশ দিচ্ছি। এর মধ্যে যেটি তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। আর যদি তুমি উভয়টি করতে সক্ষম হও তবে তুমিই অধিক জান, [তুমি কোনটি অবলম্বন করবে] তারপর তিনি তাকে বলবেন, [চিন্তা করো না] এটা শয়তানের অনিষ্ট সাধানসমূহের মধ্যে একটা অনিষ্টসাধন ব্যতীত কিছুই নয়।

প্রথম আদেশ হল– তুমি রক্তস্রাবের ছয়দিন বা সাত দিনকে ঋতুস্রাবের মধ্যে গণ্য করবে, আসলটি আল্লাহ পাকের জ্ঞানে রয়েছে [তথা এতে আল্লাহ পাকের ওপর পূর্ণ আস্থা রাখবে]। অতঃপর তুমি গোসল করবে, যখনই তোমার মন সাক্ষ্য দেয় যে, তুমি পাক ও পবিত্র হয়েছ, তারপর মাসের অবশিষ্ট তেইশ দিন ও রাত অথবা চব্বিশ দিন ও রাত নামাজ পড়বে এবং রোজা রাখবে। এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট। যেভাবে অন্যান্য মহিলাগণ ঋতুবতী হয় এবং পবিত্র হয়। ঋতুস্রাবের ও পবিত্রতার মেয়াদ গণনা করে তুমিও প্রত্যেক মাসে তা করবে।

দ্বিতীয় আদেশ হলো– যদি তুমি সক্ষম হও তবে যোহরকে দেরি করবে এবং আসরকে তাড়াতাড়ি করবে

الصَّلٰوتَيْنِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَ تُؤَخِّرِيْنَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِيْنَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِيْنَ وَ تَجْمَعِيْنَ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ فَافْعَلِيْ وَ تَغْتَسِلِيْنَ مَعَ الْفَجْرِ فَافْعَلِيْ وَصُوْمِيْ اِنْ قَدَرْتِ عَلٰى ذٰلِكَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهٰذَا اَعْجَبُ الْاَمْرَيْنِ اِلَيَّ . رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

এবং গোসল করে যোহর ও আসর নামাজকে একসাথে করে [উভয়ের ওয়াক্তে] পড়বে, এরূপভাবে মাগরিবকে দেরি করবে এবং ইশাকে তাড়াতাড়ি করবে এবং গোসল করে উভয় নামাজকে একত্রে পড়বে। যদি পারো তা-ই করবে। আর যদি পারো ফজরের সময়ও গোসল করবে এবং রোজা রাখবে। যদি তুমি এটা করতে সক্ষম হও; তবে সর্বদা করবে। অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন- এই শেষোক্ত বিষয়টিই আমার কাছে বেশি পছন্দনীয়। -[আহমদ, আবূ দাঊদ ও তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

خُلَاصَةُ الْحَدِيْثِ হাদীসের সারমর্ম : আলোচ্য সুদীর্ঘ হাদীসটিতে ইস্তেহাযা রোগিণীর দু'টি বিধানের কথা উল্লিখিত হয়েছে। রোগিণী তার ক্ষমতা অনুযায়ী যে কোনো একটি পালন করতে পারে, বিধানদ্বয় হলো—

১. রক্তস্রাবের ছয় কি সাতদিনকে ঋতুস্রাবের মধ্যে গণ্য করবে। এ গণনায় তার সুস্থ থাকাকালীন সময়ের স্বাভাবিক নিয়মের উপর ভিত্তি করবে। যখন তার মন সাক্ষ্য দিবে যে, তার ঋতুস্রাবের মেয়াদ শেষ হয়েছে। সে প্রথমে ফরজ গোসল করবে। অতঃপর মাসের বাকি দিনগুলো প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য নতুন অজু করে নামাজ আদায় করবে। [অবশ্য তুলা, লেংটি কিংবা কাপড়ের পুলটিও পরিবর্তন করে ফেলবে]।
২. দৈনিক তিনবার গোসল করবে, একবার গোসল করে যোহর ও আসর একত্রে, আর একবার মাগরিব ও এশা একত্রে এবং তৃতীয় বার গোসল করে ফজরের নামাজ আদায় করবে।

اَلْمُرَادُ بِقَوْلِهٖ فَتَحِيْضُ سِتَّةَ اَيَّامٍ اَوْ سَبْعَةَ اَيَّامٍ 'তুমি ছয়দিন বা সাতদিন ঋতুস্রাবের মধ্যে গণ্য করবে' এর অর্থ : মহানবী ﷺ হযরত হামনাকে বলেছিলেন যে, 'তুমি ছয়দিন অথবা সাতদিন ঋতুস্রাবের মধ্যে গণ্য করবে' এর দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রথমে হামনার ছয় কিংবা সাতদিন ঋতুস্রাব থাকত, সঠিক কতদিন তা হামনার মনে ছিল না, এই অস্পষ্টতার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন আল্লাহর উপর ভরসা করে যে মেয়াদটি তোমার অন্তর সাক্ষ্য দেয় ; সে মেয়াদটি তুমি ধরে নেবে, ফলে ঋতুস্রাবের মেয়াদ সাতদিন ধরলে অবশিষ্ট ২৩ দিন আর ছয়দিন ধরলে অবশিষ্ট ২৪দিন ইস্তেহাযা হিসেবে গণ্য করে গোসল করে পবিত্র হয়ে নামাজ-রোজা যথা নিয়মে আদায় করবে।

اَلْمُرَادُ بِقَوْلِهٖ تُؤَخِّرِيْنَ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِيْنَ الْعَصْرَ 'তুমি যোহরকে দেরি করবে আর আসরকে তাড়াতাড়ি করবে' এর উদ্দেশ্য : যোহরকে দেরি করবে এবং আসরকে তাড়াতাড়ি করবে। এর দু'প্রকার অর্থ হতে পারে—

১. ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে যোহরের সময় শেষ হয়ে গেলে গোসল করে আসরের প্রথম সময়ে উভয় নামাজকে একত্র করে আদায় করা। এ অর্থে যোহর কাযা হয়ে অন্য ওয়াক্তে চলে যায় এবং এটা جَمْعٌ حَقِيْقِيٌّ অর্থাৎ প্রকৃতভাবেই একত্রিকরণ হবে।
২. ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, যোহরের ওয়াক্তের একেবারে শেষ ভাগে গোসল করে শেষ ওয়াক্তে যোহর পড়া এবং সে মুসাল্লায় থেকে আসরকে তার একেবারে প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা। এটা হবে جَمْعٌ صُوْرِيٌّ অর্থাৎ দেখতে মনে হবে উভয় নামাজকে একত্রে করা হয়েছে, আসলে তা নয়। বরং প্রত্যেক নামাজ নিজ নিজ ওয়াক্তের মধ্যে আদায় করা হবে। এই উভয় প্রথাটি জায়েজ ; আর দ্বিতীয়টি উত্তম।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥١٧ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ (رض) قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ اَبِيْ حُبَيْشٍ اُسْتُحِيْضَتْ مُنْذُ كَذَا وَ كَذَا فَلَمْ تُصَلِّ فَقَالَ رَسُوْلُ

৫১৭. **অনুবাদ :** হযরত আসমা বিনতে উমায়েস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! ফাতেমা বিনতে আবূ হুবায়েশ এত এত দিন যাবৎ [প্রথম বারের মতো] ইস্তেহাযায় ভোগছে, যার ফলে সে নামাজ পড়েনি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সুবহানাল্লাহ [কি আশ্চর্য!] এটা তো [ইস্তেহাযার রোগ]

اللّٰهِ ﷺ سُبْحَانَ اللّٰهِ اِنَّ هٰذَا مِنَ الشَّيْطَانِ لِتَجْلِسْ فِىْ مِرْكَنٍ فَاِذَا رَاَتْ صُفَارَةً فَوْقَ الْمَاءِ فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلاً وَاحِدًا وَتَغْتَسِلُ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلاً وَاحِدًا وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ غُسْلاً وَاحِدًا وَتَوَضَّأُ فِىْ مَا بَيْنَ ذٰلِكَ . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ

وَقَالَ رَوٰى مُجَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) لَمَّا اِشْتَدَّ عَلَيْهَا الْغُسْلُ اَمَرَهَا اَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ .

শয়তানের তরফ থেকে হয়ে থাকে; সে [ফাতেমা] যেন একটি গামলার মধ্যে বসে, যখন সে পানির উপরিভাগে পীত রং দেখে তখন সে যেন যোহর ও আসরের জন্য একবার গোসল করে এবং মাগরিব ও ইশার জন্য একবার গোসল করে। আর শুধু ফজরের জন্য একবার গোসল করে এবং দুই নামাজের মধ্যখানে অজু করে। [অর্থাৎ যোহর ও আসরের মধ্যখানে একবার এবং মাগরিব ও ইশার মধ্যখানে একবার অজু করে]।–[আবূ দাঊদ]

ইমাম আবূ দাঊদ (র.) আরো বলেন, বর্ণনাকারী মুজাহিদ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, যখন তার পক্ষে প্রতি নামাজের জন্য গোসল করা কষ্টকর হয়ে পড়ল তখন নবী করীম ﷺ তাকে দু'নামাজ একত্রে পড়তে আদেশ করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : ইস্তেহাযা রোগিণীর প্রত্যেক ওয়াক্তে গোসল করা ফরজ নয় ; বরং প্রত্যেক ওয়াক্তে অজু করাই ফরজ, এক ওয়াক্তের অজু দিয়ে অপর ওয়াক্ত পড়া যাবে না। আর ঠাণ্ডা পানিতে রক্তস্রাব কিছুটা কমে যায় বিধায় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে প্রথমে প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য গোসল করার নির্দেশ দিয়েছেন। এটা তার পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়লে দু' নামাজের জন্য গোসল করার নির্দেশ দিয়েছেন। অথবা এই হুকুম ইসলামের প্রথম যুগে ছিল পরবর্তীতে তা মানসূখ হয়ে যায়।

اَلْمُرَادُ بِقَوْلِهٖ اِنَّ هٰذَا مِنَ الشَّيْطَانِ 'এটা তো শয়তানের পক্ষ হতে হয়' এর তাৎপর্য : হযরত ফাতেমা বিনতে আবূ হুবাইশ (রা.) اِسْتِحَاضَة তে আক্রান্ত হওয়ার ফলে কয়েক ওয়াক্ত নামাজ পরিত্যাগ করেন। এটা শ্রবণ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ উল্লিখিত কথাটি বলেন। কেননা, কোনো ব্যক্তিকে সারাক্ষণ নাপাক অবস্থায় রাখা এবং ইবাদত হতে বিরত রাখতে পারলে শয়তান খুশি হয়, এ কারণে ইস্তেহাযার ব্যাধিকে শয়তানের দিকে সম্পর্কিত করা হয়।

اَسْمَاءُ النِّسْوَانِ الْمُسْتَحَاضَةِ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে ইস্তেহাযাগ্রস্তা মহিলাদের নাম : এরা মোট ১১ জন।

১. اُمُّ حَبِيْبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ
২. اُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ زَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَةَ
৩. حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ
৪. اَسْمَاءُ اُخْتُ مَيْمُوْنَةَ لِاُمِّهَا
৫. فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِىْ حُبَيْشٍ
৬. سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ
৭. اُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ
৮. اُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ
৯. زَيْنَبُ بِنْتُ اُمِّ سَلَمَةَ
১০. اَسْمَاءُ بِنْتُ الْمَرْثَدِ الْحَارِثِيَّةِ
১১. مَارِيَةُ بِنْتُ غَيْلَانَ

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত